তফসীরে

মা'আরেফুল-কোরআন

সপ্তম খণ্ড

[সূরা লোকমান, সূরা সাজদাহ, সূরা আহযাব, সূরা সাবা, সূরা ফাতির, সূরা ইয়া-সীন, সূরা সাফফাত, সূরা ছোয়াদ, সূরা যুমার, সূরা মু'মিন, সূরা হা-মীম সিজদাহ, সূরা শূরা, সূরা যুখরুফ, সূরা দুখান, সূরা জাসিয়া, সূরা আহকাফ]

মূল

হযরত মাওলানা

মুফতী মুহাম্মদ শফী' (র)

অনুবাদ

মাওলানা মুহিউদ্দীন খান

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

দ্বিতীয় সংস্করণে

অনুবাদকের আরয

بسم الله الرحمن الرحيم

তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন এ যুগের কোরআন চর্চাকারীগণের জন্য একটি নিয়ামত বিশেষ। উর্দু ভাষায় রচিত এ অনুপম তফসীরগ্রন্থটি ইতিমধ্যেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়ে পবিত্র কোরআনের রস-আস্বাদন পিপাসু বিভিন্ন ভাষাভাষী জনগণের জ্ঞান-তৃষ্ণা নিবারণে সহায়তা করেছে।

এ মহত্তম তফসীর গ্রন্থটি যুগশ্রেষ্ঠ সাধক আলিম হযরত আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র)-র অসাধারণ কীর্তি। এতে পাক কোরআনের মূল ব্যাখ্যাতা খোদ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের তফসীর সম্পর্কিত বাণীগুলোর উদ্ধৃতি, সাহাবায়ে কিরাম, তাবেয়ীন এবং পরবর্তী প্রাজ্ঞ মনীষীগণের ব্যাখ্যা ও বর্ণনার সাথে সাথে আধুনিক জিজ্ঞাসাদির কোরআন-ভিত্তিক জবাবও যুক্তিপূর্ণভাবে পরিবেশন করা হয়েছে। ফলে এ অনন্য তফসীরগ্রন্থখানির উপযোগিতা বহুলাংশে বর্ধিত হয়েছে। একই কারণে বাংলা ভাষায় তফসীরে মা'আরেফুল কোরআনের অনুবাদ একটি স্মরণীয় ঘটনারূপে অনেক বিজ্ঞ পাঠক মন্তব্য করেছেন।

আট খণ্ডে সমাপ্ত এই বিরাট গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে এ দেশের পাঠক সমাজে বিপুলভাবে সমাদৃত হয়েছে। ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই এর দ্বিতীয় সংস্করণ এমনকি প্রথম দিককার খণ্ডগুলির তৃতীয় সংস্করণও প্রকাশ করতে হয়েছে।

বর্তমান গ্রন্থটি উক্ত মহাগ্রন্থের সপ্তম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ। সর্বশেষ খণ্ডটিরও প্রথম সংস্করণ বহু আগেই নিঃশেষ হয়ে গেছে। এই থেকেই মা'আরেফুল কোরআনের কবুলিয়ত ও জনপ্রিয়তা প্রমাণিত হয়।

মেহেরবান আল্লাহ তুচ্ছ বস্তুকে মুহূর্তের মধ্যে মহামূল্যবান করে দিতে পারেন। তেমনি অতি সাধারণ অযোগ্য কোন লোক দ্বারাও বড় কাজ করিয়ে নিতে পারেন। তফসীরে মা'রেফুল কোরআনের ন্যায় মহাগ্রন্থের অনুবাদ কর্মও অত্যন্ত বড় একটি কাজ বলে আমি মনে করি। আর আমার মতো একটি অসহায় বান্দাকে দিয়ে এ কাজ করিয়ে নেওয়া তাঁর একটি অসাধারণ অনুগ্রহ বলেই আমি বিবেচনা করি। অবনত মস্তকে শুকুর আদায় করি তাঁর এই অনুপম অনুগ্রহের প্রতি।

সপ্তম খণ্ডের প্রথম সংস্করণে যে সামান্য কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি ছিল, সেগুলোর প্রতি বেশ কয়েকজন সহৃদয় পাঠক পত্র মারফত আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বর্তমান সংস্করণে সে সব ত্রুটি সংশোধন করার ব্যাপারে সহযোগিতা করেছেন। আমি কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁদের সে ঋণ স্বীকার করে দোয়া করি, আল্লাহ পাক যেন তাঁদের এ সহৃদয়তাটুকুর যোগ্য প্রতিফলন দান করেন।

প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় উল্লেখ করা হয়েছিল যে, মা'আরেফুল কোরআন অনুবাদের পরিকল্পনা ও তা দ্রুত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের পূর্ববর্তী দু'জন মহাপরিচালক যথাক্রমে জনাব আ.জ.ম. শামসুল আলম ও জনাব আবুল ফায়েদ মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া ও সচিব জনাব মোঃ সাদেকুদ্দিন এবং প্রকাশনা পরিচালক জনাব অধ্যাপক আবদুল গফুরের নিষ্ঠা ও আগ্রহ ছিল অসাধারণ। পরবর্তী সংস্করণগুলি দ্রুত প্রকাশের ক্ষেত্রে বর্তমান মহাপরিচালক জনাব এম. সোবহান, সচিব জনাব ফিরোজ আহমদ আখতার, প্রকাশনা পরিচালক অধ্যাপক আবদুল গফুর ও উপ-পরিচালক জনাব লুতুফুল হকের নিষ্ঠাপূর্ণ আগ্রহ স্মরণ করার মত। এ খণ্ডটির অনুবাদের কপি প্রস্তুত, অনূদিত কপি নিরীক্ষা ও মুদ্রণ কর্মে আন্তরিক সহযোগিতা প্রদান করেছিলেন যথাক্রমে জনাব মাওলানা আবদুল আজীজ, বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদের খতীব ও ঢাকা আলীয়া মাদরাসার তদানীন্তন হেড মাওলানা জনাব মাওলানা উবায়দুল হক জালালাবাদী। এঁদের সবার প্রতিই আমি ঋণী।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সবাইকে স্ব স্ব শ্রমের যোগ্য পুরস্কার দান করবেন বলে আমি বিশ্বাস করি।

সহৃদয় পাঠকদের দোআ প্রার্থনা করি, যেন মহান আল্লাহ বাংলা ভাষায় প্রকাশিত এ সর্ববৃহৎ তফসীর গ্রন্থটির অবশিষ্ট সব কয়টি খণ্ডের সংশোধিত পরবর্তী সংস্করণ প্রকাশ করার তওফীক দান করেন। আমীন!!

বিনয়াবনত
মুহিউদ্দীন খান

তাঃ ২রা যিলকদ
১৪০৭ হিঃ

সূচীপত্র

سورة لقمان مكية

সূরা লোকমান

মক্কায় অবতীর্ণ, ৪ রুকূ, ৩৪ আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓمّٓ ۝١ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ ۝٢ هُدًى وَّرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِيْنَ ۝٣
الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ
يُوْقِنُوْنَ ۝٤ اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُوْنَ ۝٥ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِيْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ
عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ وَّيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ۗ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ
عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ۝٦ وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا وَلّٰى مُسْتَكْبِرًا كَاَنْ
لَّمْ يَسْمَعْهَا كَاَنَّ فِيْٓ اُذُنَيْهِ وَقْرًا ۚ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝٧ اِنَّ
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنّٰتُ النَّعِيْمِ ۝٨ خٰلِدِيْنَ
فِيْهَا ۗ وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا ۗ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝٩

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু।

(১) আলিফ-লাম-মীম। (২) এগুলো প্রজ্ঞাময় কিতাবের আয়াত। (৩) হিদায়ত ও রহমত সৎকর্মপরায়ণদের জন্য। (৪) যারা সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আখিরাত সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে। এসব লোকই তাদের পরওয়ারদিগারের তরফ থেকে আগত হিদায়তের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এরাই সফলকাম। (৬) এক শ্রেণীর লোক আছে যারা মানুষকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে গোমরাহ করার উদ্দেশ্যে অবান্তর

কথাবার্তা সংগ্রহ করে অন্ধভাবে এবং উহাকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। এদের জন্য রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি। (৭) যখন ওদের সামনে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন ওরা দম্ভের সাথে এমনভাবে মুখ ফিরিয়ে নেয়, যেন ওরা তা শুনতেই পায়নি অথবা যেন ওদের দু'কান বধির। সুতরাং ওদেরকে কষ্টদায়ক আযাবের সংবাদ দাও। (৮) যারা ঈমান আনে আর সৎকাজ করে তাদের জন্য রয়েছে নিয়ামত ভরা জান্নাত। (৯) সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আল্লাহ্‌র ওয়াদা যথার্থ। তিনি পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আলীফ-লাম-মীম (এর অর্থ আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন। এ সূরায় অথবা কোরআনে উল্লিখিত)। এগুলো এক প্রজ্ঞাময় কিতাবের (অর্থাৎ কোরআনের) আয়াত যা সৎকর্মপরায়ণদের জন্য হিদায়ত ও রহমতের কারণ, যারা নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং পরকাল সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে। (অতএব) তারাই (কোরআনের বিশ্বাস ও কর্মের বদৌলতে) তাদের পালনকর্তার তরফ থেকে আগত সরল পথের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তারাই সফলকাম। (সুতরাং কোরআন এভাবে তাদের জন্য হিদায়ত ও রহমতের কারণ হয়ে গেছে, যার ফলে তারা সফলকাম হয়েছে। এ হচ্ছে কতক লোকের অবস্থা। পক্ষান্তরে) এক শ্রেণীর লোক আছে, যারা (কোরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে) এমন বিষয় ক্রয় করে (অর্থাৎ অবলম্বন করে,) যা (আল্লাহ্ থেকে) গাফিল করে দেয়, (অতএব প্রথমত ক্রীড়া-কৌতুক অবলম্বন করা, তৎসহ আল্লাহ্‌র আয়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া স্বয়ং কুফর ও পথভ্রষ্টতা; বিশেষত তা যদি এই উদ্দেশ্যে অবলম্বন করা হয়,) যাতে (এর মাধ্যমে অন্য লোকদেরকেও) আল্লাহ্‌র পথ (অর্থাৎ সত্য ধর্ম থেকে) অন্ধভাবে পথভ্রষ্ট করে এবং (পথভ্রষ্ট করার সাথে) এর (অর্থাৎ সত্য-ধর্মের) প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে (যাতে মানুষের মন এর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে যায় তবে তো এটা কুফরই কুফর এবং পথভ্রষ্টতাই পথভ্রষ্টতা)। এদের (অর্থাৎ এরূপ লোকদের) জন্য (পরকালে) রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি, (যেমন তাদের বিপরীত লোকদের জন্য সফলতা রয়েছে বলে জানা গেছে। উপরোক্ত ব্যক্তি এভাবে মুখ ফিরিয়ে নেয় যে,) যখন তার সামনে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন সে দম্ভভরে (এমন আনমনা হয়ে) মুখ ফিরিয়ে নেয়, যেন সে শুনেইনি, তার কানে যেন ছিপি লাগানো আছে (অর্থাৎ সে যেন বধির)। সুতরাং তাকে এক যন্ত্রণা-দায়ক শাস্তির সংবাদ শুনিয়ে দিন। (যে মুখ ফিরিয়ে নেয়, এ হচ্ছে তার শাস্তির বর্ণনা। অতপর যারা হিদায়তের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাদের প্রতিদান বর্ণিত হচ্ছে। এ প্রতিদান প্রতিশ্রুত সফলতারও ব্যাখ্যা)। আর যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎ-কাজ করে, তাদের জন্য রয়েছে ভোগ-বিলাসের জান্নাত। সেথায় তারা চিরকাল থাকবে। এটা আল্লাহ্‌র সাচ্চা ওয়াদা। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (সুতরাং পরাক্রমশালী

হওয়ার কারণে ওয়াদা ও শাস্তিবাণী বাস্তবায়িত করতে পারেন এবং প্রজ্ঞাময় হওয়ার কারণে তা ওয়াদা অনুযায়ী বাস্তবায়িত করবেন)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

يُؤْتُونَ الزَّكٰوةَ—মক্কায় অবতীর্ণ এ আয়াতে যাকাতের বিধান উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে জানা যায় যে, মূল যাকাতের আদেশ হিজরতের পূর্বে মক্কা মোয়ায্যমাতেই অবতীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। হিজরতের দ্বিতীয় সনে যাকাতের বিধান কার্যকর হয় বলে যে খ্যাতি আছে, এর অর্থ এই যে, যাকাতের নিসাব নির্ধারণ, পরিমাণের বিবরণ এবং ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে তা আদায় করা ও যথার্থ খাতে ব্যয় করার ব্যবস্থাপনা হিজরী দ্বিতীয় সনে সম্পন্ন হয়েছে।

সূরা মুযাম্মিলের أَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ—আয়াতের অধীনে ইবনে কাসীর এ বক্তব্যই সপ্রমাণ করেছেন। কেননা সূরা মুযাম্মিল কোরআন অবতরণের প্রাথমিককালে মক্কায় অবতীর্ণ হয়। এ থেকে জানা যায় যে, কোরআন পাকের আয়াতসমূহে যেমন অধিকাংশ ক্ষেত্রে নামায ও যাকাত একত্রে উল্লিখিত হয়েছে, তেমনি এগুলো ফরযও সাথে সাথেই হয়েছে।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِىْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ اشتروا শব্দের আভিধানিক অর্থ ক্রয় করা। কোন কোন সময় এক কাজের পরিবর্তে অন্য কাজ অবলম্বন করার অর্থেও اشتراء শব্দ ব্যবহৃত হয়। اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى ইত্যাদি আয়াতে এ অর্থই বোঝানো হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতটি একটি বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষাপটে অবতীর্ণ হয়েছে। মক্কার মুশরিক ব্যবসায়ী নযর ইবনে হারেস বাণিজ্য ব্যপদেশে বিভিন্ন দেশে সফর করত। সে একবার পারস্য দেশ থেকে কিসরা প্রমুখ আজমী সম্রাটের ঐতিহাসিক কাহিনীর বই ক্রয় করে আনল এবং মক্কার মুশরিকদেরকে বলল, মুহাম্মদ তোমাদেরকে আদ, সামূদ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের কিস্সা-কাহিনী শোনায়। আমি তোমাদেরকে রুস্তম, ইসফেন্দিয়ার প্রমুখ পারস্য সম্রাটের সেরা কাহিনী শুনাই। মক্কার মুশরিকরা অত্যন্ত আগ্রহভরে তার আনীত কাহিনী শুনতে থাকে। কারণ এগুলোতে শিক্ষা বলতে কিছু ছিল না, যা পালন করার শ্রম স্বীকার করতে হয়; বরং এগুলো ছিল চটকদার গল্প-গুচ্ছ। এর ফলে অনেক মুশরিক, যারা এর আগে কোরআনের অলৌকিকতা ও অদ্বিতীয়তার কারণে একে শোনার আগ্রহ রাখত এবং গোপনে শুনতও, তারাও কোরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার ছুঁতা পেয়ে গেল।—(রূহুল মা'আনী)

দুররে মনসূরে ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, উল্লিখিত ব্যবসায়ী বিদেশ থেকে একটি গায়িকা বাঁদী ক্রয় করে এনে তাকে কোরআন শ্রবণ থেকে মানুষকে ফিরানোর কাজে নিয়োজিত করলো। কেউ কোরআন শ্রবণের ইচ্ছা করলে তাকে গান শোনাবার জন্য সে বাঁদীকে আদেশ করত ও বলত, মুহাম্মদ তোমাদেরকে কোরআন শুনিয়ে নামায পড়া, রোযা রাখা এবং ধর্মের জন্য প্রাণ বিসর্জন দেওয়ার কথা বলে। এতে কষ্টই কষ্ট। এস এ গানটি শোন এবং উল্লাস কর।

আলোচ্য আয়াতটি এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হয়েছে; এতে لَهْوَ الْحَدِيْث ক্রয় করার অর্থ আজমী সম্রাটগণের কিস্‌সা কাহিনী অথবা গায়িকা বাঁদী ক্রয় করা। শানে-নুযূলের প্রতি লক্ষ্য করলে আয়াতে اشتراء শব্দটি আক্ষরিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে অর্থাৎ ক্রয় করা।

পরে বর্ণিত لهو الحديث -এর ব্যাপক অর্থের দিক দিয়ে اشتراء শব্দটিরও এ স্থলে ব্যাপক অর্থ হবে অর্থাৎ এক কাজের পরিবর্তে অন্য কাজ অবলম্বন করা। ক্রীড়া-কৌতুকের উপকরণ ক্রয় করাও এতে দাখিল।

لَهْوَ الْحَدِيْث বাক্যটিতে حديث শব্দের অর্থ কথা, কিসসা-কাহিনী এবং لهو শব্দের অর্থ গাফিল হওয়া। যেসব বিষয় মানুষকে প্রয়োজনীয় কাজ থেকে গাফিল করে দেয়, সেগুলোকে لهو বলা হয়। মাঝে মাঝে এমন কাজকেও لهو বলা হয়, যার কোন উল্লেখযোগ্য উপকারিতা নেই, কেবল সময় ক্ষেপণ অথবা মনোরঞ্জনের জন্য করা হয়।

আলোচ্য আয়াতে لَهْوَ الْحَدِيْث--এর অর্থ ও তফসীর কি, এ সম্পর্কে তফসীরবিদগণের উক্তি বিভিন্ন রূপ। হযরত ইবনে মাসউদ, ইবনে আব্বাস ও জাবের (রা)-এর এক রেওয়ায়েতে এর তফসীর করা হয়েছে গানবাদ্য করা। —(হাকেম, বায়হাকী)

অধিকাংশ সাহাবী, তাবেয়ী ও তফসীরবিদের মতে গান, বাদ্যযন্ত্র ও অনর্থক কিস্‌সা কাহিনীসহ যেসব বস্তু মানুষকে আল্লাহ্‌র ইবাদত ও স্মরণ থেকে গাফিল করে সেগুলো সবই لَهْوَ الْحَدِيْث—বুখারী ও বায়হাকী স্ব-স্ব কিতাবে لَهْوَ الْحَدِيْث এর এ তফসীরই অবলম্বন করেছেন। তাঁরা বলেনঃ لَهْوَ الْحَدِيْث هُوَ الْغِنَاء

وَأَشْبَاهُهُ অর্থাৎ لهو الحديث বলে গান ও তদনুরূপ অন্যান্য বিষয় বোঝানো হয়েছে (যা আল্লাহ্‌র ইবাদত থেকে গাফেল করে দেয়)। বায়হাকীতে আছেঃ لهو الحديث ক্রয় করার অর্থ গায়ক পুরুষ অথবা গায়িকা নারী ক্রয় করা কিংবা তদনুরূপ এমন অনর্থক বস্তু ক্রয় করা যা মানুষকে আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে গাফেল করে দেয়, ইবনে জারীরও এই ব্যাপক অর্থ অবলম্বন করেছেন। (রূহুল-মা'আনী) তিরমিযীর এক রেওয়ায়েত থেকেও এরূপ ব্যাপক অর্থ প্রমাণিত হয়। এতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, গায়িকা বাঁদীদের ব্যবসা করো না। অতপর তিনি বলেন, এ ধরনের ব্যবসা সম্পর্কেই وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي আয়াত নাযিল হয়েছে।

ক্রীড়া-কৌতুক ও তার সাজ-সরঞ্জামাদি সম্পর্কে শরীয়তের বিধানঃ প্রথম লক্ষণীয় বিষয় এই যে, কোরআন পাক কেবল নিন্দার স্থলেই ক্রীড়া ও খেলাধুলার উল্লেখ করেছে। এই নিন্দার সর্বনিম্ন পর্যায় হচ্ছে মাকরূহ হওয়া। (রূহুল মা'আনী, কাশশাফ) আলোচ্য আয়াতটি ক্রীড়া-কৌতুকের নিন্দায় সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য।

মুস্তাদরাক হাকেমে বর্ণিত হযরত আবূ হুরায়রার রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ

كل شيء من لهو الدنيا باطل الا ثلثة انتضالك بقوسك وتاديبك لفرسك وملاعبتك لاهلك فانهن من الحق -

অর্থাৎ পার্থিব সকল খেলাধুলা বাতিল; কিন্তু তিনটি বাতিল নয়; (১) তীরধনুক নিয়ে খেলা, (২) অশ্বকে প্রশিক্ষণ দানের খেলা এবং (৩) নিজের স্ত্রীর সাথে হাস্যরসের খেলা। এ তিন প্রকার খেলা বৈধ।

এ হাদীসে প্রত্যেক খেলাকে বাতিল সাব্যস্ত করে যে তিনটি বিষয়ের ব্যতিক্রম বর্ণনা করা হয়েছে, সেগুলো প্রকৃতপক্ষে খেলার অন্তর্ভুক্তই নয়। কেননা, খেলা এমন কাজকে বলা হয়, যাতে কোন উল্লেখযোগ্য ধর্মীয় ও পার্থিব উপকারিতা নেই। উপ-রোক্ত তিনটি বিষয়ই উপকারী কাজ। এগুলোর সাথে অনেক ধর্মীয় ও পার্থিব উপ-কারিতা জড়িত আছে। তীর নিক্ষেপ ও অশ্বকে প্রশিক্ষণ দেওয়া তো জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণের অন্তর্ভুক্ত এবং স্ত্রীর সাথে হাস্যরস সন্তান প্রজনন ও বংশবৃদ্ধির লক্ষ্যকে পূর্ণতা দান করে। এগুলোকে কেবল দৃশ্যত ও বাহ্যিক দিক দিয়ে খেলা বলে দেওয়া হয়েছে; নতুবা প্রকৃতপক্ষে এগুলো খেলাই নয়। অনুরূপভাবে এই তিনটি বিষয় ছাড়া আরও অনেক কাজ আছে, যেগুলোর সাথে ধর্মীয় ও পার্থিব উপকারিতা সম্পৃক্ত রয়েছে এবং কেবল দৃশ্যত সেগুলোকে খেলা মনে করা হয়। অন্যান্য হাদীসে সেগুলোকেও

বৈধ বরং কতককে উত্তম কাজ সাব্যস্ত করা হয়েছে। পরে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

সারকথা এই যে, যেসব কাজ প্রকৃতপক্ষে খেলা অর্থাৎ যাতে কোন ধর্মীয় ও পার্থিব উপকারিতা নেই, সেগুলো সব অবশ্যই নিন্দনীয় ও মাকরূহ। তবে কতক একেবারে কুফর পর্যন্ত পৌঁছে যায়, কতক প্রকাশ্য হারাম এবং কতক কমপক্ষে মাকরূহ তানযিহী অর্থাৎ অনুত্তম। যেসব কাজ প্রকৃতই খেলা, তার কোনটিই এ বিধানের বাইরে নয়। হাদীসে যেসব খেলাকে ব্যতিক্রমভুক্ত প্রকাশ করা হয়েছে, সেগুলো আসলে খেলার অন্তর্ভুক্তই নয়। আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে মাজায় বর্ণিত হযরত ওকবা ইবনে আমেরের হাদীসে একথা পরিষ্কার ব্যক্তও করা হয়েছে। হাদীসের ভাষা এরূপ ঃ

ليس من اللهو ثلاث تاديب الرجل فرسه وملاعبة اهله ورميه بقوسه ونبله -

এ হাদীস পরিষ্কার করে দিয়েছে যে, ব্যতিক্রমভুক্ত তিনটি বিষয় প্রকৃতপক্ষে খেলাই নয় এবং যা প্রকৃতপক্ষে খেলা, তা বাতিল ও নিন্দনীয়। অতপর খেলার নিন্দনীয় হওয়ার বিভিন্ন স্তর রয়েছে ঃ

(১) যে খেলা দীন থেকে পথভ্রষ্ট হওয়ার অথবা অপরকে পথভ্রষ্ট করার উপায় হয়, তা কুফর, যেমন আলোচ্য وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِىْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ আয়াতে এর কুফর ও পথভ্রষ্টতা হওয়া বর্ণিত হয়েছে এবং এর শাস্তি অবমাননাকর আযাব উল্লেখ করা হয়েছে, যা কাফিরদের শাস্তি। কারণ, আয়াতটি নযর ইবনে হারেসের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে। সে এই খেলাকে ইসলামের বিরুদ্ধে মানুষকে পথভ্রষ্ট করার কাজে ব্যবহার করেছিল। তাই এ খেলা হারাম তো বটেই, কুফর পর্যন্ত পৌঁছে গেছে।

(২) যে খেলা মানুষকে ইসলামী বিশ্বাস থেকে সরিয়ে নেয় না; কিন্তু কোন হারাম কাজে ও গোনাহে লিপ্ত করে দেয়, এরূপ খেলা কুফর নয়; কিন্তু হারাম ও কঠোর গোনাহ্ যেমন জুয়ার ভিত্তিতে হারজিতের সকল প্রকার খেলা অথবা যে খেলা নামায, রোযা ইত্যাদি ফরয কর্মে অন্তরায় হয়।

অশ্লীল ও বাজে নভেল, অশ্লীল কবিতা এবং বাতিল পন্থীদের পুস্তক পাঠ করাও নাজায়েয ঃ বর্তমান যুগে অধিকাংশ যুবক অশ্লীল নভেল, পেশাদার অপরাধীদের কাহিনী অথবা অশ্লীল কবিতা পাঠে অভ্যস্ত। এসব বিষয় উপরোক্ত হারাম খেলার অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপভাবে পথভ্রষ্ট বাতিল পন্থীদের চিন্তাধারা অধ্যয়ন করাও সর্ব সাধারণের জন্য পথভ্রষ্টতার কারণ বিধায় নাজায়েয। তবে গভীর জ্ঞানের অধিকারী আলিমগণ জওয়াব দানের উদ্দেশ্যে এগুলো পাঠ করলে তাতে আপত্তি নেই।

(৩) যে সব খেলায় কুফর নেই কোন প্রকার গোনাহ্ নেই, সেগুলো মাকরূহ। কারণ, এতে অনর্থক কাজে আপন শক্তি ও সময় বিনষ্ট করা হয়।

খেলার সাজ-সরঞ্জাম ক্রয়-বিক্রয়ের বিধান ঃ উপরোক্ত বিবরণ থেকে খেলার সাজসরঞ্জাম ক্রয়-বিক্রয়ের বিধানও জানা গেছে যে, যেসব সাজসরঞ্জাম কুফর অথবা হারাম খেলায় ব্যবহৃত হয় সেগুলো ক্রয়-বিক্রয় করাও হারাম এবং যেগুলো মাকরূহ খেলায় ব্যবহৃত হয়, সেগুলোর ব্যবসা করাও মাকরূহ। পক্ষান্তরে যেসব সাজসরঞ্জাম বৈধ ও ব্যতিক্রমভুক্ত খেলায় ব্যবহার করা হয়, সেগুলোর ব্যবসাও বৈধ এবং যেগুলো বৈধ ও অবৈধ উভয় প্রকার খেলায় ব্যবহার করা হয়; সেগুলোর ব্যবসাও বৈধ।

অনুমোদিত ও বৈধ খেলা ঃ পূর্বে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে যে, যে খেলায় কোন ধর্মীয় ও পার্থিব উপকারিতা নেই, সেই খেলাই নিন্দনীয় ও নিষিদ্ধ। যে খেলা শারীরিক ব্যায়াম তথা স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য অথবা অন্য কোন ধর্মীয় ও পার্থিব উপকারিতা লাভের জন্য অথবা কমপক্ষে মানসিক অবসাদ দূর করার জন্য খেলা হয়, সেই খেলা শরীয়ত অনুমোদন করে যদি তাতে বাড়াবাড়ি না করা হয় এবং এতে ব্যস্ত থাকার কারণে প্রয়োজনীয় কাজকর্ম বিঘ্নিত না হয়। আর ধর্মীয় প্রয়োজনের নিয়তে খেলা হলে তাতে সওয়াবও আছে।

উপরে বর্ণিত হাদীসে তিনটি খেলাকে নিষেধাজ্ঞার বাইরে রাখা হয়েছে---- তীর নিক্ষেপ, অশ্বারোহণ এবং স্ত্রীর সাথে হাস্যরস করা। হযরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনা এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ خير لهو المؤمن السباحة وخير لهو المرأة المغزل অর্থাৎ মু'মিনের শ্রেষ্ঠ খেলা সাঁতার কাটা এবং নারীর শ্রেষ্ঠ খেলা সুতা কাটা।

সহীহ্ মুসলিম ও মনসদে আহমদে হযরত সালমা ইবনে আকওয়া বর্ণনা করেন, জনৈক আনসারী দৌড়ে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। প্রতিযোগিতায় কেউ তাকে হারাতে পারত না। তিনি একদিন ঘোষণা করলেন কেউ আমার সাথে দৌড় প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে প্রস্তুত আছে কি? আমি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে অনুমতি চাইলে তিনি অনুমতি দিলেন। অতপর প্রতিযোগিতায় আমি জয়ী হয়ে গেলাম। এ থেকে জানা গেল যে, দৌড় অনুশীলন করাও বৈধ।

খ্যাতনামা কুস্তিগীর রোকানা একবার রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাথে কুস্তিতে অবতীর্ণ হলে তিনি তাকে ধরাশায়ী করে দেন।----(আবু দাঊদ)

আবিসিনিয়ার কতিপয় যুবক মদীনা তাইয়্যেবায় সামরিক কলাকৌশল অনুশীলন-কল্পে বর্শা ইত্যাদি নিয়ে খেলায় প্রবৃত্ত ছিল। রসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আয়েশা (রা)-কে নিজের পশ্চাতে দাঁড় করিয়ে তাদের খেলা উপভোগ করাচ্ছিলেন। তিনি তাদেরকে বলেছিলেন ঃ الهوا والعبوا অর্থাৎ খেলাধুলা অব্যাহত রাখ। (বায়হাকী, কানুয)

কতক রেওয়ায়েতে আরও আছে : فانی اکرہ ان یری فی دینکم غلظة অর্থাৎ তোমাদের ধর্মে শুষ্কতা ও কঠোরতা পরিলক্ষিত হোক---এটা আমি পছন্দ করি না।

অনুরূপভাবে কতক সাহাবায়ে কিরাম সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, যখন তাঁরা কোরআন ও হাদীস সম্পর্কিত কাজে ব্যস্ততার ফলে অবসন্ন হয়ে পড়তেন, তখন অবসাদ দূর করার জন্য মাঝে মাঝে আরবের প্রচলিত কবিতা ও ঐতিহাসিক ঘটনাবলী দ্বারা মনোরঞ্জন করতেন।

এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে : روحوا القلوب ساعة فساعة অর্থাৎ তোমরা মাঝে মাঝে অন্তরকে বিশ্রাম ও আরাম দেবে।---(আবূ দাউদ) এ থেকে অন্তর ও মস্তিষ্কের বিনোদন এবং এর জন্য কিছু সময় বের করার বৈধতা প্রমাণিত হল।

এসব বিষয়ের শর্ত এই যে, এসব খেলার অন্তর্নিহিত বিশুদ্ধ লক্ষ্য অর্জনের নিয়তেই খেলায় প্রবৃত্ত হতে হবে। খেলার জন্য খেলা উদ্দেশ্য না হওয়া চাই, প্রয়োজনের সীমা অতিক্রম না করা এবং বাড়াবাড়ি না করা চাই। এসব খেলা বৈধ হওয়ার কারণ পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, সীমার ভিতর থাকলে এগুলো لهو তথা নিষিদ্ধ ক্রীড়া-কৌতুকের মধ্যে দাখিল নয়।

কতক খেলা, যেগুলো পরিষ্কার নিষিদ্ধ : এমনও কতক খেলা রয়েছে যেগুলো রসূলুল্লাহ্ (সা) বিশেষভাবে নিষিদ্ধ করেছেন, যদিও সেগুলোতে কিছু কিছু উপকারিতা আছে বলেও উল্লেখ করা হয়। যেমন দাবা, চওসর ইত্যাদি। এগুলোর সাথে হারজিত ও টাকা-পয়সার লেন-দেন জড়িত থাকলে এগুলো জুয়া ও অকাট্য হারাম। অন্যথায় কেবল চিত্ত বিনোদনের উদ্দেশ্যে খেলা হলেও হাদীসে এসব খেলা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সহীহ্ মুসলিমে বর্ণিত হযরত বুরায়দা (রা)-র রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (স) বলেন, যে ব্যক্তি চওসর খেলায় প্রবৃত্ত হয়, সে যেন তার হাতকে শূকরের রক্তে রঞ্জিত করে। অনুরূপভাবে এক হাদীসে দাবা খেলোয়াড়ের প্রতি অভিশাপ বর্ণিত হয়েছে।---(নসবুররায়াহ)

এমনিভাবে কবুতর নিয়ে খেলা করাকে রসূলুল্লাহ্ (স) অবৈধ সাব্যস্ত করেছেন। (আবূ দাউদ, কানুয) এই নিষেধাজ্ঞার বাহ্যিক কারণ এই যে, সাধারণভাবে এ সব খেলায় মগ্ন হলে মানুষ জরুরী কাজকর্ম এমনকি নামায, রোযা ও অন্যান্য ইবাদত থেকেও অসাবধান হয়ে যায়।

গান ও বাদ্যযন্ত্র সম্পর্কিত বিধান : কয়েকজন সাহাবী উল্লিখিত আয়াতে لَهْوَ الْحَدِيْثِ এর তফসীর করেছেন গান-বাজনা করা। অন্য সাহাবীগণ ব্যাপক তফসীর করে বলেছেন যে, আয়াতে এমন প্রত্যেক খেলা বোঝানো হয়েছে, যা মানুষকে আল্লাহ্ থেকে গাফেল করে দেয়। তাঁদের মতেও গান-বাজনা এতে দাখিল আছে।

কোরআন পাকের لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ আয়াতে ইমাম আবূ হানীফা, মুজাহিদ মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়া প্রমুখ আলিম زور শব্দের তফসীর করেছেন গান-বাজনা।

আবূ দাউদ, ইবনে মাজা ও ইবনে-হিব্বান বর্ণিত হযরত আবূ মালেক আশ-'আরীর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

ليشربن ناس من امتى الخمر ويسمونها بغير اسمها يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات يخسف الله بهم الارض ويجعل الله منهم القردة والخنازير-

আমার উম্মতের কিছু লোক মদের নাম পাল্টিয়ে তা পান করবে। তাদের সামনে গায়িকারা বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র সহকারে গান করবে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে ভূ-গর্ভে বিলীন করে দেবেন এবং কতকের আকৃতি বিকৃত করে বানর ও শূকরে পরিণত করে দেবেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (স) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা মদ, জুয়া, তবলা ও সারেঙ্গী হারাম করেছেন। তিনি আরও বলেন, নেশা-গ্রস্ত করে—এমন প্রত্যেক বস্তু হারাম। —(আহমদ, আবূ দাউদ)

روى عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتخذ الفى دولا والامانة مغنما والزكوة مغرما وتعلم لغير الدين واطاع الرجل امرأته وعق امه وادنى صديقه واقصى اباه وظهرت الاصوات فى المساجد وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم ارذلهم واكرم الرجل مخافة شره وظهرت القيان والمعازف وشربت الخمور ولعن اخر هذه الامة اولها فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا وايات تتابع كنظام بال قطع سلكه فتتابع بعضه بعضا-

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, যখন জিহাদলব্ধ সম্পদকে ব্যক্তিগত সম্পদে পরিণত করা হবে, যখন গচ্ছিত বস্তুকে লুটের মাল গণ্য করা হবে, যাকাতকে জরিমানার মত কঠিন মনে করা হবে, যখন পার্থিব সম্পদ লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মীয় জ্ঞান শিক্ষা করা হবে, যখন মানুষ স্ত্রীর আনু-গত্য ও মাতার অবাধ্যতা শুরু করবে, যখন বন্ধুকে নিকটে টেনে নেবে ও পিতাকে দূরে সরিয়ে রাখবে, যখন মসজিদসমূহে হট্টগোল হবে, যখন পাপাচারী কুকর্মী ব্যক্তি

গোত্রের নেতা হবে, যখন নীচতম ব্যক্তি তার সম্প্রদায়ের প্রধান হবে, যখন দুষ্ট লোক-দের সম্মান করা হবে তাদের অনিষ্টের ভয়ে, যখন গায়িকা নারী ও বাদ্যযন্ত্রের ব্যাপক প্রচলন হবে, যখন মদ্যপান শুরু হবে, যখন মুসলিম সম্প্রদায়ের পরবর্তী লোক-গণ পূর্ববর্তিগণকে অভিসম্পাত করবে, তখন তোমরা প্রতীক্ষা কর একটি লালবর্ণযুক্ত বায়ুর, ভূমিকম্পের, ভূমি ধসের, আকার-আকৃতি বিকৃত হয়ে যাওয়ার এবং কিয়ামতের এমন নিদর্শনসমূহের, যেগুলো একের পর এক প্রকাশমান হতে থাকবে, যেমন কোন মালার সূতা ছিঁড়ে গেলে দানাগুলো একের পর এক খসে পড়তে থাকে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ এ হাদীসের শব্দগুলো বারবার পড়ুন এবং দেখুন, এ যেন বর্তমান জগতের পরিপূর্ণ চিত্র। যেসব গোনাহ্ বর্তমান যুগে মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করছে, চৌদ্দশ বছর পূর্বেই রসূলুল্লাহ্ (সা) তার সংবাদ দিয়ে গেছেন। এ ধরনের পরিস্থিতি সম্পর্কে খবরদার থাকার জন্য এবং পাপকর্ম থেকে নিজে বাঁচার ও অপরকে বাঁচানোর সযত্ন প্রয়াস অব্যাহত রাখার জন্য তিনি মুসলমানদেরকে সাবধান করে দিয়েছেন।

অন্যথায় যখন এসব পাপ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়বে, তখন এ ধরনের পাপী-দের উপর আসমানী আযাব নাযিল হবে এবং কিয়ামতের সর্বশেষ লক্ষণ প্রকাশ পেয়ে যাবে। মেয়েদের নৃত্যগীত এবং সঙ্গীত ও বাদ্যযন্ত্রসমূহ যথা ঃ তবলা, সারিন্দা ইত্যাদিও এ পাপসমূহের অন্তর্ভুক্ত। এখানে এ হাদীসটি এই প্রেক্ষাপটেই নকল করা হয়েছে।

এতদ্ভিন্ন বহু প্রামাণ্য ও নির্ভরযোগ্য হাদীস রয়েছে যাতে গানবাদ্য হারাম ও নাজায়েয বলা হয়েছে, এ ব্যাপারে বিশেষ সতর্কবাণী রয়েছে এবং কঠিন শাস্তির ঘোষণা রয়েছে।

বাদ্যযন্ত্র ব্যতীত সুললিত কণ্ঠে উপকারী তথ্যপূর্ণ কবিতা পাঠ নিষিদ্ধ নয় ঃ অপর পক্ষে কতক রেওয়ায়েত থেকে গান বৈধ বলেও জানা যায়। এ দুয়ের সামঞ্জস্য বিধান এই যে, তবলা, সারিন্দা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রযুক্ত নারীকণ্ঠ নিঃসৃত গান হারাম। যেমন উপরোক্ত কোরআনী আয়াত ও হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু কেবল সুললিত কণ্ঠে যদি কোন কবিতা পাঠ করা হয় এবং পাঠক কোন নারী বা কিশোর না হয়, সাথে সাথে কবিতার বিষয়বস্তু অশ্লীল বা অন্য কোন পাপ-পঙ্কিলতা-যুক্ত না হয়, তবে জায়েয।

কোন কোন সূফী সাধক গান শুনেছেন বলে যে কথা প্রচলিত আছে তা এ ধরনের বৈধ গানেরই অন্তর্ভুক্ত, কেননা তাঁদের শরীয়তের অনুসরণ ও রসূল (সা)-এর অনুগমন দিবালোকের ন্যায় সুনিশ্চিত ও সুস্পষ্ট। তাঁদের সম্পর্কে এরূপ পাপে জড়িয়ে পড়ার ধারণাও করা যেতে পারে না। অনুসন্ধানী সূফীগণ নিজেরাই ব্যাপারটা পরিষ্কার করে দিয়েছেন।

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَاَلْقٰى فِي الْاَرْضِ رَوَاسِيَ

أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ ۚ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿١٠﴾ هَٰذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ۚ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿١١﴾

(১০) তিনি খুঁটি ব্যতীত আকাশমণ্ডলী সৃষ্টি করেছেন; তোমরা তা দেখছ। তিনি পৃথিবীতে স্থাপন করেছেন পর্বতমালা, যাতে পৃথিবী তোমাদেরকে নিয়ে ঢলে না পড়ে এবং এতে ছড়িয়ে দিয়েছেন সর্বপ্রকার জন্তু। আমি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছি, অতপর তাতে উদগত করেছি সর্বপ্রকার কল্যাণকর উদ্ভিদরাজি। (১১) এটা আল্লাহ্র সৃষ্টি। অতপর তিনি ব্যতীত অন্যেরা যা সৃষ্টি করেছে, তা আমাকে দেখাও। বরং জালিমরা সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় পতিত আছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আল্লাহ্ পাক আসমানসমূহকে স্তম্ভ ব্যতীতই সৃষ্টি করেছেন যা তোমরা স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছ। এবং ভূ-পৃষ্ঠে সুবিশাল পর্বতসমূহ স্থাপন করে রেখেছেন; যেন পৃথিবী তোমাদের নিয়ে আন্দোলিত না হয়---কোন দিকে ঝুঁকে না পড়ে। এবং ভূ-পৃষ্ঠের উপর সর্বত্র সকল প্রকারের জীবজন্তু সম্প্রসারিত করে রেখেছেন। এবং আমি আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেছি, অতপর ভূ-পৃষ্ঠে সকল প্রকারের উত্তম উদ্ভিদ ও তরুলতা উদ্গত করেছি। (এবং যারা আমার অংশী স্থির করে তাদেরকে বলুন) এগুলো তো আল্লাহ্র সৃষ্ট বস্তু (এখন যদি তোমরা অন্যদেরকে আল্লাহ্ পাকের অংশীদার স্থির করে থাক) তবে তিনি ভিন্ন (তোমাদের স্থিরীকৃত অন্যান্য মাবুদ) যে সব বস্তু সৃষ্টি করেছে সেগুলো আমাকে প্রদর্শন কর [যাতে করে তাদের আল্লাহ্ বলে আখ্যায়িত হওয়ার যোগ্যতা প্রমাণিত হয়। এ প্রমাণের পরিপ্রেক্ষিতে এ সব লোকের সঠিক পথ (হিদায়ত) পেয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু তারা সে হিদায়ত গ্রহণ করলো না।] বরং এসব অত্যাচারী রীতিমত স্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় পড়ে আছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا এই একই বিষয়ে পূর্বে আলোচিত সূরায়ে রা'দের প্রথমদিকে এক আয়াত রয়েছে : اَللّٰهُ الَّذِىْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ—

تَرَوْنَهَا ব্যাকরণগত শব্দ প্রকরণ অনুযায়ী এ বাক্যের দু'টি অর্থ হতে পারে :

(১) تَرَوْنَهَا-কে عَمَدٍ-এর صِفَتْ (বিশেষণ) রূপে পরিগণিত করে এর ضَمِيْر (সর্বনাম)-কে عَمَدٍ-এর প্রতি ধাবিত করা---তখন অর্থ হবে----আল্লাহ্ তা'আলা আকাশসমূহকে স্তম্ভবিহীনভাবে সৃষ্টি করেছেন, যা তোমরা দেখতে পাচ্ছ। অর্থাৎ স্তম্ভ থাকলে তোমরা তা অবলোকন করতে। যখন স্তম্ভ দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না তখন বোঝা গেল যে, বিশাল ছাদরূপ এ আকাশ স্তম্ভবিহীনভাবে তৈরী করা হয়েছে। এ তফসীর হযরত হাসান এবং কাতাদাহ্ (র) কৃত। (ইবনে কাসীর)

(২) تَرَوْنَهَا-এর ضَمِيْر (সর্বনাম) سَمٰوٰتْ-এর দিকে ধাবিত। এবং এটা একটা স্বতন্ত্র বাক্য বলে পরিগণিত হবে।---অর্থ হবে যে, তোমরা আকাশসমূহ দেখতে পাচ্ছ, মহান আল্লাহ্ সেগুলোকে স্তম্ভবিহীনভাবে সৃষ্টি করেছেন।

প্রথম বাক্য প্রকরণের পরিপ্রেক্ষিতে এক অর্থ এরূপও হতে পারে যে, আকাশ স্তম্ভসমূহের উপর সংস্থাপিত---সেগুলো তোমরা দেখতে সক্ষম নও---সেগুলো অদৃশ্য বস্তু। এটা হযরত ইবনে আব্বাস, ইকরামাহ ও মুজাহিদ কৃত তফসীর। (ইবনে-কাসীর)

সর্বাবস্থায় এই আয়াতে মহান আল্লাহ্ পাক এই বিস্তীর্ণ ও প্রশস্ত আকাশকে কোন স্তম্ভবিহীনভাবে সুবিশাল ছাদরূপে সৃষ্টি করাকে তাঁর অনন্য ক্ষমতা ও সৃষ্টি-কৌশলের উজ্জ্বল নিদর্শন বলে বর্ণনা করেছেন।

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর ঃ এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, জ্যোতির্বিজ্ঞানীগণ বলেন এবং সাধারণভাবে প্রচলিত যে, আকাশ একটি গোলাকার বস্তু এবং এরূপ গোলাকার বস্তুতে সাধারণত কোন স্তম্ভ থাকে না। তা হলে আকাশের স্তম্ভ না থাকার কি বিশেষত্ব আছে ?

এর উত্তর এরূপ হতে পারে যে, কোরআনে করীম যেরূপভাবে অধিকাংশ জায়গায় পৃথিবীকে বিছানা বলে আখ্যায়িত করেছে---যা বাহ্যত গোলাকার হওয়ার পরিপন্থী। কিন্তু এর বিশালত্ব ও সুবিস্তীর্ণতার দরুন সাধারণ দৃষ্টিতে তা সমতল বলে প্রতীয়মান হয়। এই সাধারণ ধারণার উপর ভিত্তি করেই কোরআনে করীম একে বিছানা বলে আখ্যায়িত করেছে। অনুরূপভাবে আকাশ একটি ছাদের মত পরিদৃষ্ট হয়---যা নির্মাণের জন্য সাধারণত স্তম্ভের প্রয়োজন। সাধারণভাবে প্রচলিত এরূপ ধারণা অনুযায়ীই আকাশকে স্তম্ভবিহীন বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এবং প্রকৃত প্রস্তাবে তার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা---কুদরতে কামেলা প্রকাশ ও প্রমাণের জন্য এই সুবিশাল গোলকের সৃষ্টিই যথেষ্ট। ইবনে-কাসীর এবং কিছুসংখ্যক তফসীরকারের গবেষণা নিঃসৃত সিদ্ধান্ত এই যে, কোরআন হাদীস অনুসারে আকাশ ও পৃথিবী সম্পূর্ণ গোলাকার হওয়ার প্রমাণ মেলে না। বরং কোরআনের কতক আয়াত ও হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী উহা গুম্বজাকৃতি বলে জানা যায়। তাদের বক্তব্য এই যে, এক সহীহ হাদীসে সূর্য

আরশের পাদদেশে পৌঁছে সিজদা করে বলে যে বর্ণনা রয়েছে আকাশ পূর্ণ গোলাকার না হলে পরই তা হওয়া সম্ভব। কেননা কেবল এ অবস্থাতেই এর উর্ধ্ব ও নিম্নদিক নির্ধারিত হতে পারে।---পরিপূর্ণ গোলকের কোন দিককে উপর বা নিচ বলা চলে না।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا لُقْمٰنَ الْحِكْمَةَ اَنِ اشْكُرْ لِلّٰهِ ؕ وَمَنْ يَّشْكُرْ فَاِنَّمَا
يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ﴿١٢﴾ وَاِذْ قَالَ
لُقْمٰنُ لِابْنِهٖ وَهُوَ يَعِظُهٗ يٰبُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ ؕ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ
عَظِيْمٌ ﴿١٣﴾ وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ۚ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ
وَّفِصٰلُهٗ فِيْ عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْ لِيْ وَلِوَالِدَيْكَ ؕ اِلَيَّ الْمَصِيْرُ ﴿١٤﴾ وَاِنْ
جَاهَدٰكَ عَلٰٓى اَنْ تُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ۙ فَلَا تُطِعْهُمَا
وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا ۫ وَّاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَيَّ ۚ ثُمَّ
اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿١٥﴾ يٰبُنَيَّ اِنَّهَآ اِنْ تَكُ
مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِيْ صَخْرَةٍ اَوْ فِي السَّمٰوٰتِ
اَوْ فِي الْاَرْضِ يَاْتِ بِهَا اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ ﴿١٦﴾ يٰبُنَيَّ
اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ
عَلٰى مَآ اَصَابَكَ ؕ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ﴿١٧﴾ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ
لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ
مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ ﴿١٨﴾ وَاقْصِدْ فِيْ مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ؕ اِنَّ
اَنْكَرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ ﴿١٩﴾

(১২) আমি লোকমানকে প্রজ্ঞা দান করেছি এই মর্মে যে, আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞ হও। যে কৃতজ্ঞ হয়, সে তো কেবল নিজ কল্যাণের জন্যই কৃতজ্ঞ হয়। আর যে অকৃতজ্ঞ হয়, আল্লাহ্ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত। (১৩) যখন লোকমান উপদেশছলে তার পুত্রকে বলল ঃ হে বৎস, আল্লাহ্র সাথে শরীক করো না। নিশ্চয় আল্লাহর সাথে শরীক করা মহা অন্যায়। (১৪) আর আমি মানুষকে তার পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহারের জোর নির্দেশ দিয়েছি। তার মাতা তাকে কষ্টের পর কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেছে। তার দুধ ছাড়ানো দু'বছরে হয়। নির্দেশ দিয়েছি যে, আমার প্রতি ও তোমার পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। অবশেষে আমারই নিকট ফিরে আসতে হবে। (১৫) পিতামাতা যদি তোমাকে আমার সাথে এমন বিষয়কে শরীক স্থির করতে পীড়াপীড়ি করে, যার জ্ঞান তোমার নেই; তবে তুমি তাদের কথা মানবে না এবং দুনিয়াতে তাদের সাথে সদ্ভাবে সহ-অবস্থান করবে। যে আমার অভিমুখী হয়, তার পথ অনুসরণ করবে। অতপর তোমাদের প্রত্যাবর্তন আমারই দিকে এবং তোমরা যা করতে, আমি সে বিষয়ে তোমাদেরকে জ্ঞাত করবো। (১৬) হে বৎস! কোন বস্তু যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয় অতপর তা যদি থাকে প্রস্তর গর্ভে অথবা আকাশে অথবা ভূ-গর্ভে তবে আল্লাহ্ তাও উপস্থিত করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ গোপন ভেদ জানেন, সবকিছুর খবর রাখেন। (১৭) হে বৎস! নামায কায়েম কর, সৎকাজে আদেশ দাও, মন্দকাজে নিষেধ কর এবং বিপদাপদে সবর কর। নিশ্চয় এটা সাহসিকতার কাজ। (১৮) অহংকার বশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করো না এবং পৃথিবীতে গর্বভরে পদচারণ করো না। নিশ্চয় আল্লাহ্ কোন দাম্ভিক অহংকারীকে পছন্দ করেন না। (১৯) পদচারণায় মধ্যবর্তিতার অবলম্বন কর এবং কণ্ঠস্বর নীচু কর। নিঃসন্দেহে গাধার স্বরই সর্বাপেক্ষা অপ্রীতিকর।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং আমি হযরত লোকমানকে প্রজ্ঞা (যার প্রকৃত অর্থ কর্মসহ জ্ঞান) প্রদান করেছি। (এবং সাথে সাথে এ নির্দেশও প্রদান করেছি) যে (সাধারণভাবে যাবতীয় অনুগ্রহ এবং বিশেষভাবে প্রজ্ঞারূপ শ্রেষ্ঠ অনুগ্রহের জন্য) মহান আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে থাক। এবং যে ব্যক্তি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে---তার নিজস্ব লাভের উদ্দেশ্যে করে (অর্থাৎ এর দরুন তার নিয়ামত ও সম্পদে বৃদ্ধি লাভ মূলত তারই উপকার। যেমন আল্লাহ্ পাক ফরমান ঃ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ধর্মীয় সম্পদের সমৃদ্ধি ইহকাল ও পরকাল উভয় স্থানেই হবে। দুনিয়ায় তো নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করলে জ্ঞান বৃদ্ধি পায় এবং আমলের তওফীক বৃদ্ধি লাভ করে। আর পরকালের বিপুল সওয়াবের অধিকারী হবে। ইহকালে পরকালের অগ্রগতি অর্থাৎ সওয়াব বৃদ্ধি লাভ তো একেবারে সুনিশ্চিত। আবার কখনো কখনো কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ফলে পার্থিব সম্পদও বেড়ে যায়) এবং যে অকৃতজ্ঞ হবে সে তার নিজস্ব ক্ষতিই সাধন করবে। কারণ আল্লাহ্ পাক তো কারো মুখাপেক্ষী নন এবং

যাবতীয় সৌন্দর্য ও গুণাবলীর অধিকারী। (অর্থাৎ যেহেতু তাঁর মহান সত্তা একেবারে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং حميد যাবতীয় প্রশংসা ও গুণাবলীর অধিকারী বলতে তাই বোঝায়। সুতরাং তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন।---কারো কৃতজ্ঞতা বা স্তুতিবাক্যের তাঁর কোন প্রয়োজন নেই। এমনটি হলে তাঁর অপরের সাহায্যে পূর্ণতা অর্জন বোঝাবে। এবং যেহেতু লোকমান প্রজ্ঞা---অর্থাৎ জ্ঞান ও কর্মগুণে গুণান্বিত ছিলেন, যদ্দ্বারা বোঝা যায় যে, তাঁকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ প্রণালী শিক্ষা প্রদানের জন্যও তিনি হয়ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাকবেন। সুতরাং তিনি কৃতজ্ঞও ছিলেন। যার ফলে তাঁর প্রজ্ঞায় উন্নতি ঘটেছিল। যদ্দরুন তিনি সর্বোচ্চ শ্রেণীর প্রজ্ঞাবানে পরিণত হন।) এবং (এরূপ প্রজ্ঞাবানের শিক্ষা অবশ্যই অনুকরণযোগ্য। সুতরাং তাঁর শিক্ষা ও উপদেশাবলী জনমণ্ডলীর নিকটে বর্ণনা করুন) যখন লোকমান তাঁর ছেলেকে উপদেশছলে বললেন, হে বৎস! আল্লাহ্ পাকের কোন অংশীদার স্থাপন করো না; কেননা, অংশীস্থাপন (শিরক) নিঃসন্দেহে গুরুতর অপরাধ। (আলিমগণের মতে যুলুমের অর্থ কোন বস্তুকে যথাস্থানে ব্যবহার না করা; এবং একথা শিরকের ক্ষেত্রে সবিশেষ প্রযোজ্য।) এবং (কাহিনীর মধ্যস্থলে তওহীদের উপর জোর প্রদান উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন যে) আমি মানবকে তার পিতামাতা সম্পর্কে বিশেষ আদেশ প্রদান করেছি (যেন তাঁদেরকে মান্য করে এবং তাঁদের সেবাযত্ন করে। কেননা, মাতা-পিতা বিশেষ করে মা তাদের জন্য নানাবিধ জ্বালা-যন্ত্রণা ভোগ করেছেন। বস্তুত) মা দুঃখের উপর দুঃখ সয়ে তাদেরকে উদরে বহন করেছেন (কেননা গর্ভধারণ কাল বৃদ্ধির সাথে সাথে গর্ভবতীর দুঃখ-কষ্টের মাত্রাও বেড়ে যায়) এবং দুবছর পর্যন্ত স্তন্য দানের পর তা ছাড়াতে হয় (এ সময়ে মা সব ধরনের সেবাযত্ন করে থাকেন। অনুরূপভাবে পিতাও অবস্থানুযায়ী ত্যাগ স্বীকার ও নানা প্রকারের দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেন। তাই আমি আমার প্রাপ্যসমূহ আদায়ের সাথে সাথে পিতামাতার প্রাপ্যসমূহ আদায় করার নির্দেশও প্রদান করেছি। তাই এ ইরশাদ করেছি) যেন তুমি আমার প্রতি এবং তোমার পিতামাতা উভয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর। (আল্লাহ্ পাকের কৃতজ্ঞতা স্বীকার তো তাঁর ইবাদত ও তাঁর প্রতি সঠিক আনুগত্য প্রকাশের মাধ্যমে হয়। আর পিতামাতার কৃতজ্ঞতা স্বীকার হয় তাঁদের খিদমত ও শরীয়ত নির্ধারিত তাঁদের প্রাপ্যসমূহ আদায়ের মাধ্যমে) কেননা আমার নিকটেই (সকলের) ফিরে আসতে হবে (সে সময়েই কর্মফল---পুরস্কার বা শাস্তি প্রদান করবো। এ জন্য নির্দেশাবলী পালন অবশ্য কর্তব্য) এবং (পিতামাতার এরূপ অধিকার থাকা সত্ত্বেও 'তওহীদ' এমন সুমহান ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে) যদি তারা উভয়েও তোমাদের উপর আমার সহিত এমন কোন বস্তুকে অংশী স্থির করতে পীড়াপীড়ি করেন যার (আল্লাহ্ পাকের অংশী হওয়ার) ব্যাপারে তোমার নিকটে কোন প্রমাণ নেই। (এবং একথা সুস্পষ্ট যে, এমন কোন বস্তু নেই যার অংশী হওয়ার যোগ্যতার সপক্ষে কোন প্রমাণ রয়েছে; বরং অযোগ্য হওয়ার সম্পর্কে অসংখ্য প্রমাণাদি রয়েছে। সুতরাং সারকথা এই যে, যদি তারা কোন বস্তুকে আল্লাহ্র অংশী স্থাপন করতে তোমাদের উপর শক্তি প্রয়োগ করে) তবে তাদের একথা মানবে না এবং (একথা অবশ্যই ঠিক যে) দুনিয়ার (পার্থিব

প্রয়োজনাদি ও পারস্পরিক আদান-প্রদান যথা---তাদের আবশ্যকীয় খরচাদি, সেবাযত্ন প্রভৃতির) ক্ষেত্রে তাদের সহিত সদ্ব্যবহার রক্ষা করে চলবে। এবং (ধর্মীয় ব্যাপারে শুধু) এমন ব্যক্তির পথ অনুসরণ করবে যে আমার দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়।—(অর্থাৎ আমার নির্দেশাবলীর প্রতি বিশ্বাসী এবং সেগুলোর অনুসারী) অতপর তোমাদের সবাইকে আমার নিকটে ফিরে আসতে হবে। তৎপর (আগমনক্ষণে) তোমরা যা কিছু করতে, সে সব কিছু সম্পর্কে তোমাদেরকে অবহিত করে দেব। (সুতরাং আমার নির্দেশের পরিপন্থী কোন কাজ করো না। এরপরে মহাত্মা লোকমান কর্তৃক তাঁর পুত্রের উদ্দেশে কৃত উপদেশাবলীর অবশিষ্টাংশ বর্ণিত হয়েছে। তিনি তওহীদ ও আকায়েদ প্রসঙ্গে এ উপদেশও প্রদান করেন যে,) বৎস, (মহান আল্লাহ্‌র জ্ঞান ও ক্ষমতা এমন অসীম যে,) যদি (কারো) কোন কাজ (যত প্রচ্ছন্নই থাকুক না কেন। উদাহরণ স্বরূপ ধরলেও যে তা পরিমাণে) একটি সরষে বীজ তুল্য। আবার (ধরে নাও যে) তা কোন পাথরের অভ্যন্তরে (লুকিয়ে) রাখা হয়েছে (এটা এমন আবরণ, যা হটানো একান্ত দুষ্কর এবং তা না হটিয়ে এর ভেতর সম্পর্কে কোন জ্ঞান লাভ সম্ভবপর নয়) অথবা তা আকাশের অভ্যন্তরে থাকুক (যা সাধারণ সৃষ্টবস্তুসমূহ থেকে অবস্থানগতভাবে বহু দূরে) অথবা তা ভূ-তলে থাকুক (যে জায়গা গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন। সাধারণ সৃষ্টবস্তুর দৃষ্টি থেকে প্রচ্ছন্ন থাকার এগুলোই কারণ। কেননা কখনো কখনো কোন বস্তু ক্ষুদ্র ও সূক্ষ্ম হওয়ার কারণে দৃষ্টিগোচর হয় না; আবার কখনো কঠিন আবরণে আচ্ছন্ন থাকার কারণে; কখনো বহু দূরে অবস্থিত বলে, কখনো ঘনকৃষ্ণ অন্ধকারের ফলে। কিন্তু আল্লাহ্ পাকের এমনই শান যে, প্রচ্ছন্ন থাকার উল্লিখিত যাবতীয় কারণও যদি বর্তমান থাকে) তবুও (কিয়ামতের দিনে হিসাব-নিকাশের সময়) আল্লাহ্ পাক তা উপস্থিত করবেন। (এদ্বারা তাঁর অসাধারণ জ্ঞান ও ক্ষমতা উভয়ই প্রমাণিত হলো।) নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ পাক অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শী ও সর্বজ্ঞাত। (এবং কর্ম সম্পর্কে এ উপদেশ প্রদান করেন) হে বৎস! নামায প্রতিষ্ঠা করবে (যা আকায়েদ পরিশুদ্ধির পরবর্তী সর্বশ্রেষ্ঠ আমল) এবং (যেরূপভাবে আকীদা ও আমল পরিশুদ্ধির মাধ্যমে নিজের পূর্ণতা লাভ করলে, অনুরূপভাবে অপরের পূর্ণতা অর্জনের জন্যও সচেষ্ট থাকা চাই; সুতরাং লোকদেরকে) সৎ কাজের আদেশ করবে ও অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে এবং (এই সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করতে গিয়ে বিশেষভাবে এবং সকল অবস্থায় সাধারণভাবে) তোমার উপর যে বিপদাপদ আপতিত হবে, তাতে ধৈর্য ধারণ করবে। এটা (এরূপ ধৈর্য ধারণ) উন্নত মনোবল ও সৎসাহসিকতাপূর্ণ কাজ এবং (স্বভাব চরিত্র সম্পর্কে এ উপদেশ প্রদান করেন যে, হে বৎস) মানুষের প্রতি বিমুখ হয়ো না এবং ভূ-পৃষ্ঠে দম্ভভরে পদ-চারণা করো না। নিশ্চয় আল্লাহ্ কোন দাম্ভিক ও আত্মগর্বী লোককে ভালবাসেন না। এবং চলাফেরায় মধ্যপন্থা অবলম্বন করবে। [খুব দ্রুতগতিতেও চলো না, যা ব্যক্তিত্ব ও মান-মর্যাদার পরিপন্থী---এতে পড়ে যাওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। আবার আত্মাভিমানীদের ন্যায় একেবারে গণে গণেও পা ফেলো না; বরং কৃত্রিমতা-বিমুক্ত মধ্যম গতি, বিনম্র ও সাদাসিধে চালচলন অবলম্বন কর। যা অন্য আয়াতে

'يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا' (তারা ধরাপৃষ্ঠে অতি বিনম্রভাবে চলাফেরা করে) এর মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে] এবং (বাক্যালাপের সময়) অনুচ্চস্বরে কথা বলবে। (অর্থাৎ শোরগোল করে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলো না। কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে, এমন মৃদু স্বরে কথা বলবে যে, অপর লোক তা শুনতেও পাবে না। পরবর্তী পর্যায়ে হৈ-হল্লোড়ের প্রতি ঘৃণা ও অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হচ্ছে এবং বলা হচ্ছে যে,) বস্তুত গাধার চীৎকারই স্বরসমূহের মধ্যে নিকৃষ্টতর। (সুতরাং মানুষ হয়ে গাধার ন্যায় বিকট রবে চীৎকার করা শোভা পায় না। এতদ্ভিন্ন উচ্চরবে চীৎকার কোন কোন সময় অপরকে পীড়া দেয় ও তাদের বিরক্তির কারণ ঘটায়)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمٰنَ الْحِكْمَةَ---ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বেহের বর্ণনানুযায়ী মহাত্মা লোকমান হযরত আইয়্যুব (আ)-এর ভাগ্নে ছিলেন। মুকাতেল তাঁর খালাতো ভাই বলে বর্ণনা করেছেন। 'বায়যাবী' ও অন্যান্য তফসীরে রয়েছে যে, তিনি দীর্ঘায়ু লাভ করেছিলেন এবং হযরত দাউদ (আ)-এর সময়েও বেঁচে ছিলেন। একথা অন্যান্য রেওয়ায়েত থেকেও প্রমাণিত যে, মহাত্মা লোকমান হযরত দাউদ (আ)-এর কালেও বর্তমান ছিলেন।

তফসীরে দুর্‌রে মনসূরে হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর বর্ণনানুযায়ী লোকমান জনৈক আবিসিনীয় ক্রীতদাস ছিলেন---কাঠ চেরার কাজ করতেন। (ইবনে আবী শায়বাহ্, আহমদ, ইবনে জারীর ও ইবনুল মুন্‌যির প্রমুখ যুহদ্ নামক গ্রন্থে এরূপ বর্ণনা করেছেন।) হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা)-র নিকটে তাঁর (লোকমান) অবস্থাদি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করায় তিনি বলেন যে, তিনি চেপ্টা ও থেবড়া নাক বিশিষ্ট, বেঁটে আকারের আবিসিনীয় ক্রীতদাস ছিলেন। মুজাহিদ (র) বলেন যে, তিনি ফাটা পা ও পুরো ঠোঁট বিশিষ্ট আবিসিনীয় ক্রীতদাস ছিলেন।----(ইবনে কাসীর)

জনৈক কৃষ্ণকায় হাবশী হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়্যেবের খিদমতে কোন মাস-'আলা জিজ্ঞেস করতে হাযির হয়। হযরত সাঈদ তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, তুমি কৃষ্ণকায় বলে দুঃখ করো না। কারণ কালো বর্ণধারীদের মধ্যে এমন তিনজন মহান ব্যক্তি আছেন, যাঁরা মানবকুলে শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত---হযরত বিলাল, হযরত ওমর বিন খাত্তাব কর্তৃক মুক্ত গোলাম হযরত 'মাহজা' এবং হযরত লোকমান (আ)।

প্রাচীন ইসলাম বিশেষজ্ঞগণের মতে হযরত লোকমান কোন নবী ছিলেন না; বরং ওলী, প্রজ্ঞাবান ও বিশিষ্ট মনীষী ছিলেনঃ ইবনে কাসীর বলেন যে, প্রাচীন ইসলামী মনীষীবৃন্দ এ ব্যাপারে একমত যে, তিনি নবী ছিলেন না। কেবল হযরত

ইকরামা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি নবী ছিলেন। কিন্তু এর বর্ণনা সূত্র (সনদ) দুর্বল। ইমাম বাগাবী বলেন যে, একথা সর্বসম্মত যে, তিনি বিশিষ্ট ফকীহ ও প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি ছিলেন, নবী ছিলেন না।---(মাযহারী)

ইবনে কাসীর (র) বলেন যে, তাঁর সম্পর্কে হযরত কাতাদাহ্ (রা) থেকে এক বিস্ময়কর রেওয়ায়েত আছে যে, আল্লাহ্ পাক হযরত লোকমানকে নবুয়ত ও হিক্‌মত (প্রজ্ঞা)---দুয়ের মধ্যে যে কোন একটি গ্রহণের সুযোগ দেন। তিনি হিক্‌মতই (প্রজ্ঞা) গ্রহণ করেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, তাঁকে নবুয়ত গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। তিনি আরয করলেন যে, "যদি আমার প্রতি এটা গ্রহণ করার নির্দেশ হয়ে থাকে তবে তা শিরোধার্য। অন্যথায় আমাকে ক্ষমা করুন।"

হযরত কাতাদাহ (রা) থেকে আরও বর্ণিত আছে যে, মনীষী লোকমানের নিকট এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেছিল যে, আপনি হিক্‌মতকে (প্রজ্ঞা) নবুয়ত থেকে সমধিক গ্রহণযোগ্য কেন মনে করলেন, যখন আপনাকে যে কোন একটা গ্রহণ করার অধিকার দেওয়া হয়েছিল? তিনি বললেন যে, নবুয়ত বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ পদ। যদি তা আমার ইচ্ছা ব্যতীতই প্রদান করা হতো, তবে স্বয়ং মহান আল্লাহ্ তার দায়িত্ব গ্রহণ করতেন, যাতে আমি সে কর্তব্যসমূহ পালন করতে সক্ষম হই। কিন্তু যদি আমি তা স্বেচ্ছায় চেয়ে নিতাম তবে সে দায়িত্ব আমার উপর বর্তাতো।---(ইবনে কাসীর)

যখন মহাত্মা লোকমানের নবী না হওয়ার কথা অধিকাংশ ইসলামী বিশেষজ্ঞ কর্তৃক স্বীকৃত, তখন তাঁর প্রতি কোরআনে বর্ণিত যে নির্দেশ أَنِ اشْكُرْ لِي (আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর)--তা ইলহামের মাধ্যমেও হতে পারে, যা আল্লাহ্র ওলীগণ লাভ করে থাকেন।

মহাত্মা লোকমান হযরত দাউদ (আ)-এর আবির্ভাবের পূর্বে শরীয়তী মাস-'আলাসমূহ সম্পর্কে জনগণের নিকট ফতোয়া দিতেন। হযরত দাউদ (আ)-এর নবুয়ত প্রাপ্তির পর তিনি এ ফতোয়া প্রদানকার্য পরিত্যাগ করেন এই বলে যে, এখন আর তার প্রয়োজন নেই। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, তিনি ইসরাঈল গোত্রের বিচারপতি ছিলেন। হযরত লোকমানের বহু জ্ঞানগর্ভ বাণী লিপিবদ্ধ আছে। ওয়াহাব বিন মুনাব্বেহ্ বলেন যে, আমি হযরত লোকমানের জ্ঞান-বিজ্ঞানের দশ হাজারের চাইতেও বেশি অধ্যায় অধ্যয়ন করেছি।---(কুরতুবী)

একদিন হযরত লোকমান এক বিরাট সমাবেশে উপস্থিত জন-মণ্ডলীকে বহু জ্ঞানগর্ভ কথা শুনাচ্ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞেস করলো যে, আপনি কি সেই ব্যক্তি---যে আমার সাথে অমুক বনে ছাগল চরাতো। লোকমান বললেন, হ্যাঁ---আমি সে লোকই। অতপর লোকটি বললো, তবে আপনি এ মর্যাদা কিভাবে লাভ করলেন যে, আল্লাহ্র গোটা সৃষ্টিকুল আপনার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে এবং আপনার বাণী শোনার জন্য দূরদূরান্ত থেকে লোক এসে জমায়েত হয়? প্রতি-উত্তরে

লোকমান বললেন যে, এর কারণ আমার দুটি কাজ---এক. সর্বদা সত্য বলা, দুই. অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা পরিহার করা। অপর এক রেওয়ায়েতে আছে যে, হযরত লোকমান বলেছেন, এমন কতকগুলো কাজ আছে যা আমাকে এ স্তরে উন্নীত করেছে। যদি তুমি তা গ্রহণ কর তবে তুমিও এ মর্যাদা ও স্থান লাভ করতে পারবে। সে কাজগুলো এই ঃ নিজের দৃষ্টি নিম্নমুখী রাখা এবং মুখ বন্ধ করা, হালাল জীবিকাতে তুষ্ট থাকা, নিজের লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করা, সত্য কথায় অটল থাকা, অঙ্গীকার পূর্ণ করা, মেহমানের আদর-আপ্যায়ন ও তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, প্রতিবেশীর প্রতি সর্বদা লক্ষ্য রাখা এবং অপ্রয়োজনীয় কাজ ও কথা পরিহার করা।---(ইবনে কাসীর)

হযরত লোকমানকে প্রদত্ত হিকমতের অর্থ কি? حكمت শব্দটি কোরআনে করীমে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে---বিদ্যা, বিবেক, গাম্ভীর্য, নবুয়ত, মতের বিশুদ্ধতা।

আবূ 'হাইয়্যান' বলেছেন যে, হিকমত বলতে সেসব বাক্য সমষ্টিকে বোঝায় যদ্দ্বারা মানুষ উপদেশ গ্রহণ করতে পারে, তাদের অন্তরকে প্রভাবান্বিত করে এবং যা মানুষ সংরক্ষণ করে অপরের নিকটে পৌঁছায়। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন যে, হিকমত অর্থ---বিবেক, প্রজ্ঞা ও মেধা। আবার কোন কোন মনীষী বলেন, জ্ঞানানুসারে কাজ করার নাম হিকমত। প্রকৃত প্রস্তাবে এগুলোর মধ্যে কোন প্রকারের বিরোধ বা বৈপরীত্য নেই।---এগুলো সবই হিকমতের অন্তর্গত। উপরের তফসীরের সার-সংক্ষেপে হিকমতের অনুবাদ 'প্রজ্ঞা' বলে এবং তার ব্যাখ্যা 'কার্যে পরিণত জ্ঞান' বলে করা হয়েছে, যা সর্বব্যাপী ও অত্যন্ত সুস্পষ্ট।

উল্লিখিত আয়াতে হযরত লোকমানকে প্রজ্ঞা (হিকমত) প্রদানের কথা বর্ণনার পর বলা হয়েছে ঃ أَنِ اشْكُرْ لِي (আমার কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর) এতে এক সম্ভাবনা তো এই রয়েছে যে, এখানে قُلْنَا (আমরা বললাম) শব্দটি উহ্য আছে বলে ধরে নেওয়া। অর্থ হবে এই যে, আমি (আল্লাহ্) লোকমানকে প্রজ্ঞা (হিকমত) প্রদান পূর্বক এ নির্দেশ দিলাম যে, আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। আবার কোন কোন মনীষী বলেন যে, أَنِ اشْكُرْ لِي স্বয়ং হিকমতেরই ব্যাখ্যা। অর্থাৎ লোকমানকে যে হিকমত প্রদান করা হয়েছিল তা হলো তার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নির্দেশ---যা সে কার্যে পরিণত করেছে। তখন এর মর্মার্থ হবে এই যে, আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও করুণাবলীর জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা সর্বশ্রেষ্ঠ হিকমত। অতপর এ বিষয় অবহিত করে দেন যে আমি যে শুকরিয়া আদায়ের নির্দেশ দিলাম---তা আমার কোন নিজস্ব লাভের জন্য নয়। আমার কারো কৃতজ্ঞতার কোন প্রয়োজন নেই; বরং এ নির্দেশ

তারই উপকারার্থে দিয়েছি। কারণ আমার চিরন্তন বিধান, যে ব্যক্তি আমার প্রদত্ত নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করবে, আমি তার নিয়ামত আরো বাড়িয়ে দেবো।

অতপর মহাত্মা লোকমানের কয়েকটি জ্ঞানগর্ভ বাণী বর্ণনা করা হয়েছে, যেগুলো তিনি তাঁর পুত্রকে সম্বোধন করে ইরশাদ করেছিলেন, যাতে অন্যান্য লোকও উপকৃত হতে পারে। সেজন্য কোরআনে করীমও সেসব জ্ঞানগর্ভ বাণীসমূহ উল্লেখ করেছে।

এসব জ্ঞানগর্ভ বাণীসমূহের মধ্যে সর্বাগ্রে হলো আকীদাসমূহের পরিশুদ্ধিতা। তন্মধ্যে সর্বপ্রথম কথা হলো, কোন প্রকারের অংশীদারিত্ব স্থির না করে আল্লাহ্ পাককে গোটা বিশ্বের স্রষ্টা ও প্রভু বলে বিশ্বাস করা। সাথে সাথে আল্লাহ্ পাক ব্যতীত অন্য কাউকে উপাসনা-আরাধনায় অংশী স্থাপন না করা। আল্লাহ্ পাকের কোন সৃষ্ট বস্তুকে স্রষ্টার সমমর্যাদাসম্পন্ন মনে করার মত গুরুতর অপরাধ দুনিয়াতে আর কিছু হতে পারে না। তাই তিনি বলেছেন ঃ يٰبُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ

(হে আমার প্রিয় বৎস! আল্লাহ্র অংশী স্থির করো না, অংশী স্থাপন করা গুরুতর জুলুম।) পরবর্তী পর্যায়ে মনীষী লোকমানের অন্যান্য উপদেশ ও জ্ঞানগর্ভ বাণী-সমূহ বর্ণনা করা হয়েছে, যা তিনি স্বীয় পুত্রকে সম্বোধন করে ইরশাদ করেছিলেন। শির্ক যে গুরুতর অপরাধ; সুতরাং কোন অবস্থাতেই এর নিকটবর্তী না হওয়ার হিদায়তের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ পাক অন্য এক নির্দেশ দান করেন।

মাতাপিতার কৃতজ্ঞতা স্বীকার ও তাদেরকে মান্য করা ফরয; কিন্তু আল্লাহ্ পাকের নির্দেশ-বিরোধী হলে অন্য কারো আনুগত্য জায়েয নয় ঃ আল্লাহ্ পাক ফরমান যে, যদিও সন্তানের প্রতি পিতামাতাকে মান্য করার ও তাঁদের কৃতজ্ঞতা স্বীকারের বিশেষ তাকীদ রয়েছে এবং নিজের (আল্লাহ্র) প্রতি আনুগত্য প্রকাশ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সাথে সাথে পিতামাতার প্রতিও তা করার জন্য সন্তানকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু শির্ক এমন গুরুতর অন্যায় ও মারাত্মক অপরাধ যে, মাতাপিতার নির্দেশে এমনকি বাধ্য করলে পরও কারো পক্ষে তা জায়েয হয়ে যায় না। যদি কারো পিতামাতা তাকে আল্লাহ্র সাথে অংশী স্থাপনে বাধ্য করতে চেষ্টা করতে থাকেন এ বিষয়ে পিতামাতার কথাও রক্ষা করা জায়েয নয়।

এখানে যখন পিতামাতার প্রতি কর্তব্য পালন এবং তাঁদের কৃতজ্ঞতা স্বীকা-রের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে, তখন এর হিকমত ও অন্তর্নিহিত রহস্য এই বর্ণনা করেছেন যে, তার মা ধরাধামে তার আবির্ভাব ও অস্তিত্ব বজায় রাখার ক্ষেত্রে অসাধারণ ত্যাগ স্বীকার ও অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট বরদাশত করেছেন। নয় মাস কাল উদরে ধারণ করে তার রক্ষণাবেক্ষণ করেছেন এবং এ কারণে ক্রমবর্ধমান দুঃখ-কষ্ট বরদাশত করেছেন। আবার ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরও দু'বছর পর্যন্ত স্তন্যদানের কঠিন ঝামেলা পোহায়েছেন, যাতে দিনরাত মাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে। ফলে

তাঁর দুর্বলতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। আর সন্তানের লালন-পালন ক্ষেত্রে মাকেই যেহেতু অধিক ঝক্কি-ঝামেলা পোহাতে হয়, সেজন্য শরীয়তে মায়ের স্থান ও অধিকার পিতার অগ্রে রাখা হয়েছে وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ আয়াতের মর্ম ইহাই। অতপর وَإِنْ جَاهَدَاكَ আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ পাকের সাথে অন্য কাউকে অংশী স্থাপন-বিষয়ে পিতা-মাতাকে মান্য করাও হারাম।

ইসলামের অনন্য ন্যায়নীতিঃ যদি পিতামাতা আল্লাহ্র অংশী স্থাপনে বাধ্য করার চেষ্টা করেন, তখন আল্লাহ্র নির্দেশ হল তাঁদের কথা না মানা। এমতাবস্থায় মানুষ স্বভাবত সীমার মধ্যে স্থির থাকে না। এ নির্দেশ পালন করতে গিয়ে সন্তানের পক্ষে পিতামাতার প্রতি কটু বাক্য প্রয়োগ ও অশোভন আচরণ প্রদর্শন করে তাঁদেরকে অপমানিত করার আশংকা ছিল। ইসলাম তো ন্যায়নীতির জ্বলন্ত প্রতীক---প্রত্যেক বস্তুরই একটি সীমা আছে। তাই অংশী স্থাপনের বেলায় পিতামাতার অনুসরণ না করার নির্দেশের সাথে সাথে এ হুকুমও প্রদান করেছেঃ صَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا

---অর্থাৎ দীন সংক্রান্ত ব্যাপারে তো তাঁদের কথা মানবে না। কিন্তু পার্থিব কাজকর্ম ---যথা শারীরিক সেবাযত্ন বা ধনসম্পদ ব্যয় ও অন্যান্য ক্ষেত্রে যেন কার্পণ্য প্রদর্শিত না হয়; বরং পার্থিব বিষয়াদিতে সাধারণ নিয়মানুযায়ী কাজকর্ম করবে। তাঁদের প্রতি বেয়াদবী ও অশালীনতা প্রদর্শন করো না। তাদের কথাবার্তার এমনভাবে উত্তর দিও না, যাতে অহেতুক মনোবেদনার উদ্রেক করে। মোট কথা, শিরক-কুফরীর ক্ষেত্রে তাঁদের কথা না মানার কারণে যে মর্মপীড়ার উদ্রেক হবে, তা তো অপারকতা হেতু বরদাশ্ত করবে। কিন্তু প্রয়োজনকে তার সীমার মধ্যেই রাখতে হবে। অন্যান্য ব্যাপারে যেন মনোকষ্টের কারণ না ঘটে সে সম্পর্কে সচেতন থাকবে।

বিসেষ দ্রষ্টব্যঃ---এ আয়াতে দুধ ছাড়ানোর কাল যে দু'বছর বলা হয়েছে--- তা প্রচলিত সাধারণ অভ্যাস অনুযায়ী। এখানে এর কোন ব্যাখ্যা বা স্পষ্ট বর্ণনা নেই যে, এর চাইতে অধিককাল দুধ পান করালে তার কি হুকুম। এ মাস'আলার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ সূরায়ে আহ্কাফ এর حَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلٰثُونَ شَهْرًا আয়াতে ইনশাল্লাহ্ করা হবে।

মহাত্মা লোকমানের দ্বিতীয় উপদেশ আকায়েদ সম্পর্কেঃ অটুট বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আকাশ ও পৃথিবী এবং এর মাঝে যা কিছু আছে এর প্রতিটি বিন্দুকণা আল্লাহ্ পাকের অসীম জ্ঞানের আওতাধীন; এবং সব কিছুর উপর তাঁর পূর্ণ ক্ষমতা ও আধিপত্য রয়েছে। কোন বস্তু যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন যা সাধারণ দৃষ্টিতে দেখতে পাওয়া যায় না,

অনুরূপভাবে কোন বস্তু যত দূরেই অবস্থিত থাক না কেন অথবা কোন বস্তু যত গভীর আঁধার বা যবনিকার অন্তরালেই থাক না কেন মহান আল্লাহ্‌র জ্ঞান ও দৃষ্টির আড়ালে থাকতে পারে না এবং তিনি যে কোন বস্তুকে যখন ও যেখানে চান উপস্থিত করতে পারেন। يٰبُنَىَّ اِنَّهَا اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ الاية-এর মর্মার্থ তাই। যাবতীয় বস্তু মহান আল্লাহ্‌র জ্ঞান ক্ষমতার আওতাভুক্ত হয়ে থাকা--- ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস এবং একত্ববাদের আকীদার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দলীল।

মহাত্মা লোকমানের তৃতীয় উপদেশ কর্ম পরিশুদ্ধিতা সম্পর্কেঃ অবশ্য করণীয় কাজ তো অনেক। তন্মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ নামায এবং গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার সাথে সাথে অন্যান্য কাজের পরিশুদ্ধির কারণ ও মাধ্যমও বটে। যেমন নামায সম্পর্কে মহান পালনকর্তার ইরশাদ রয়েছেঃ -- اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ (নিশ্চয়ই নামায যাবতীয় অশ্লীল ও গর্হিত কাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখে)। এজন্য অবশ্য করণীয় সৎকাজগুলোর মধ্য হতে শুধু নামাযের বর্ণনা দিয়েই যথেষ্ট করেছেন। يٰبُنَىَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ—অর্থাৎ হে বৎস! নামায প্রতিষ্ঠা কর। যেমন আগে বলা হয়েছে যে, নামায প্রতিষ্ঠার অর্থ শুধু নামায পড়ে নেওয়া নয়, বরং যাবতীয় অংগসমূহ ও নিয়মাবলী পরিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করা---যথাসময়ে আদায় করা, এর উপর স্থায়ী ও দৃঢ়পদ থাকা---এসবই নামায প্রতিষ্ঠার মর্মের অন্তর্গত।

মহাত্মা লোকমানের চতুর্থ উপদেশ চরিত্র সংশোধন সম্পর্কেঃ ইসলাম একটি সমষ্টিগত ধর্ম---ব্যক্তির সাথে সাথে সমষ্টির সংশোধন এ জীবন ব্যবস্থার প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ অংগ। এজন্য নামাযের ন্যায় অবশ্য করণীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজের সাথে সাথেই সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ---এ অবশ্য করণীয় কর্তব্যের বর্ণনাও দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে---মানুষকে সৎকাজের প্রতি আহবান কর ও অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখ। এক. নিজের পরিশুদ্ধি, দ্বিতীয়. গোটা মানবকুলের পরিশুদ্ধি--- এর উভয়টাই পালন করতে বেশ দুঃখ-কষ্ট বরদাশত করতে হয়, শ্রম সাধনার প্রয়োজন হয়। এর উপর দৃঢ়পদ থাকা খুব সহজ ব্যাপার নয়। বিশেষ করে সৃষ্টিকুলের পরিশুদ্ধির উদ্দেশ্যে সৎ কাজের আদেশের প্রতিদানে দুনিয়ায় সর্বদা শত্রুতা ও বিরোধিতাই জুটে থাকে। সুতরাং এ উপদেশের সাথে সাথে এরূপ উপদেশও প্রদান করা হয়েছে যে, وَاصْبِرْ عَلٰى مَا اَصَابَكَ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ—অর্থাৎ এসব কাজ সম্পন্ন করতে যে দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হবে তাতে ধৈর্য ধারণ করে স্থিরতা অবলম্বন করবে।

মনীষী লোকমানের পঞ্চম উপদেশ সামাজিক শিষ্টাচার সম্পর্কে ঃ وَلَا تُصَعِّرْ

لَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ -এর উৎপত্তি صعر ধাতু থেকে—যার অর্থ উটের এক প্রকার ব্যাধি—যার ফলে এর ঘাড় বেঁকে যায়। যেমন মানুষের 'লাকওয়া' নামক প্রসিদ্ধ ব্যাধি, যার ফলে মুখমণ্ডল বাঁকা হয়ে যায়। এর অর্থ চেহারা ফিরিয়ে রাখা। যার মর্ম এই যে, লোকের সাথে সাক্ষাৎ বা কথোপকথনের সময় মুখ ফিরিয়ে রেখো না—যা তাদের প্রতি উপেক্ষা ও অহংকারের নিদর্শন এবং ভদ্রোচিত স্বভাব ও আচরণের পরিপন্থী। وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا—مرح শব্দের অর্থ গর্বভরে ঔদ্ধত্যের সাথে বিচরণ করা অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক ভূমিকে যাবতীয় বস্তু হতে নত ও পতিত করে সৃষ্টি করেছেন। তোমাদের সৃষ্টিও এ মাটি দিয়েই। তোমরা এর উপর দিয়েই চলাফেরা কর—নিজের নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝতে চেষ্টা কর। আত্মাভিমানীদের ধারা অনুসরণ করে অহংকার ভরে বিচরণ করো না। সুতরাং এরপর বলেছেন ঃ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ —আল্লাহ্ পাক কোন অহংকারী আত্মাভিমানীকে পছন্দ করেন না।

وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ —-অর্থাৎ নিজ গতিতে মধ্যপন্থা অবলম্বন কর, দৌড় ধাপসহও চলো না, যা ভব্যতা ও শালীনতার পরিপন্থী। হাদীস শরীফে আছে যে, দ্রুতগতিতে চলা মু'মিনের সৌন্দর্য ও মর্যাদা হানিকর (জামে সগীর হযরত আবূ হুরায়রা থেকে বর্ণিত)। এরূপভাবে চলার ফলে নিজেও দুর্ঘটনায় পতিত হওয়ার আশংকা আছে বা অপরের দুর্ঘটনার কারণও ঘটতে পারে। আবার অত্যধিক মন্থর গতিতেও চলো না—যা সেসব গর্বস্ফীত আত্মাভিমানীদের অভ্যাস যারা অন্যান্য মানুষের চাইতে নিজের অসার কৌলীন্য ও শ্রেষ্ঠত্ব দেখাতে চায়। অথবা সেসব স্ত্রীলোকদের অভ্যাস, যারা অত্যধিক লজ্জা-সংকোচের দরুন দ্রুত গতিতে বিচরণ করে না। অথবা অক্ষম ব্যাধিগ্রস্তদের অভ্যাস। প্রথমটি তো হারাম। দ্বিতীয়টি যদি নারী জাতির অনুসরণে করা হয় তাও না-জায়েয। আর যদিএ উদ্দেশ্য না থাকে তবে পুরুষের পক্ষে এটা একটা কলংক। তৃতীয় অবস্থায় আল্লাহ্র প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন—সুস্থ থাকা সত্ত্বেও রোগগ্রস্তদের রূপ ধারণ করা।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসঊদ ফরমান যে সাহাবায়ে-কিরামকে ইহুদীদের মত দৌড়াতে বারণ করা হতো। আবার খৃস্টানদের ন্যায় ধীর গতিতে চলতেও বারণ করা হতো; বরং উভয়ের মধ্যবর্তী চালচলন গ্রহণের নির্দেশ ছিল।

হযরত আয়েশা (রা) জনৈক ব্যক্তিকে অত্যন্ত মন্থর গতিতে চলতে দেখলেন। মনে হচ্ছিল যেন সে এক্ষণি পড়ে যাবে। সুতরাং তিনি লোকের নিকটে তার এরূপ-ভাবে চলার কারণ জিজ্ঞেস করাতে তারা বললো যে, সে কারীগণের একজন; সে যুগে যারা বিশুদ্ধভাবে কোরআন তিলাওয়াত করতে সক্ষম ছিলেন---সাথে সাথে কোরআনের আলিমও ছিলেন তাঁদেরকেই কারী বলে আখ্যায়িত করা হতো। সারকথা, সে একজন আলিম ও কারী বলে এরূপভাবে চলে। এর পরিপ্রেক্ষিতে হযরত আয়েশা (রা) ফরমান যে, খলীফা হযরত উমর (রা) এর চাইতে অনেক উন্নতমানের কারী। কিন্তু তিনি যখন পথ চলতেন দ্রুতগতিতে চলতেন (কিন্তু এমন দ্রুত নয় যেমন দ্রুত চলা নিষেধ)। তিনি কথা বলার সময় এমন আওয়াযে বলতেন যেন অপর লোক অনায়াসে তা শুনতে পায়; (এমন ক্ষীণভাবেও নয় যে, তিনি কি বললেন শ্রোতৃমণ্ডলীর তা আবার জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন হয়)।

وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ---অর্থাৎ তোমাদের স্বর ক্ষীণ কর। যার অর্থ স্বর প্রয়োজনাতিরিক্ত উচ্চ করো না এবং হট্টগোল করো না। যেমন এইমাত্র ফারুকে আযম সম্পর্কে বলা হলো যে, তিনি এমনভাবে কথা বলতেন যেন উপস্থিত জনমণ্ডলী অনায়াসে তা শুনতে পায়, কোন প্রকারের অসুবিধা না হয়।

অতপর বলা হয়েছে : إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ --- অর্থাৎ চতুষ্পদ জন্তুসমূহের মধ্যে গাধার চীৎকারই অত্যন্ত বিকট ও শ্রুতিকটু। এখানে সামাজিক শিষ্টাচার সম্পর্কে চারটি বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে। (১) লোকের সঙ্গে সাক্ষাত ও কথোপকথনকালে আত্মম্ভরিতার সুরে মুখ ফিরিয়ে কথা বলতে বারণ করা হয়েছে। (২) ধরাপৃষ্ঠে অহংকার ভরে বিচরণ করতে বারণ করা হয়েছে। (৩) মধ্যবর্তী চাল-চলন গ্রহণ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করে কথা বলতে নিষেধ করা হয়েছে।

রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আচার-আচরণেও এসব গুণের অপূর্ব সমাবেশ ঘটেছিল। শামায়েলে তিরমিযীতে হযরত হুসায়ন (রা) ফরমান---আমি আমার পিতা হযরত আলী (রা)-র নিকট রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মানুষের সাথে উঠাবসা ও মেলা-মেশার কালে আঁ হযরত (সা)-এর আচার-ব্যবহার ও প্রকৃতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করায় তিনি বলেন :

كان دائم البشر سهل الخلق لين الجانب ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب فى الاسواق ولا فحاش ولا عياب ولا مشاح يتغافل عما لا يشتهى ولا يؤيس منه ولا يجيب فيه قد ترك نفسه من ثلاث المراء والاكبار وما لا يعنيه -

অর্থাৎ নবীজী (সা)-কে সর্বদা প্রসন্ন ও হাস্যোজ্জ্বল মনে হতো---তাঁর চরিত্রে নম্রতা, আচার-ব্যবহারে বিনয় বিদ্যমান ছিল। তাঁর স্বভাব মোটেই রুক্ষ ছিল না, কথা-বার্তাও নিরস ছিল না। তিনি উচ্চৈঃস্বরে বা অশ্লীল কথা বলতেন না, কারো প্রতি দোষারোপ করতেন না। কৃপণতা প্রকাশ করতেন না। যে সব দ্রব্য মনঃপূত হতো না সেগুলোর প্রতি আসক্তি প্রকাশ করতেন না। কিন্তু (সেগুলো হালাল হলে এবং তার প্রতি কারো আকর্ষণ থাকলে) তা থেকে তাদেরকে নিরাশ করতেন না এবং সে সম্পর্কে কোন মন্তব্যও করতেন না (বরং নীরবতা অবলম্বন করতেন), তিন বস্তু সম্পূর্ণভাবে (চিরতরে) বর্জন করেছিলেন। (১) ঝগড়া-বিবাদ (২) অহংকার (৩) অপ্রয়োজনীয় ও অর্থহীন কাজে আত্মনিয়োগ করা।

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَّبَاطِنَةً ط وَمِنَ النَّاسِ مَنْ
يُّجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّلَا هُدًى وَّلَا كِتٰبٍ مُّنِيرٍ ﴿٢٠﴾ وَإِذَا
قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللّٰهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا
عَلَيْهِ آبَاءَنَا ط أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطٰنُ يَدْعُوهُمْ إِلٰى عَذَابِ
السَّعِيرِ ﴿٢١﴾ وَمَن يُّسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ
اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ط وَإِلَى اللّٰهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿٢٢﴾ وَمَن
كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ ط إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا ط
إِنَّ اللّٰهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٢٣﴾ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلٰى
عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿٢٤﴾ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ
لَيَقُولُنَّ اللّٰهُ ط قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ ط بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٥﴾ لِلّٰهِ مَا
فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ط إِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٢٦﴾ وَلَوْ أَنَّ مَا

فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ
أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٧﴾ مَا خَلْقُكُمْ
وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿٢٨﴾ أَلَمْ تَرَ
أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ
الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرٌ ﴿٢٩﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ
الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿٣٠﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ
تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيَكُم مِّنْ آيَاتِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ
لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿٣١﴾ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ
دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ ۚ
وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ ﴿٣٢﴾

(২০) তোমরা কি দেখ না আল্লাহ্ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই তোমাদের কাজে নিয়োজিত করে দিয়েছেন এবং তোমাদের প্রতি তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নিয়ামতসমূহ পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন? এমন লোকও আছে যারা জ্ঞান, পথনির্দেশ ও উজ্জ্বল কিতাব ছাড়াই আল্লাহ্ সম্পর্কে বাকবিতণ্ডা করে। (২১) তাদেরকে যখন বলা হয়, আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন, তোমরা তার অনুসরণ কর, তখন তারা বলে, বরং আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে যে বিষয়ের উপর পেয়েছি, তারই অনুসরণ করব। শয়তান যদি তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তির দিকে দাওয়াত দেয়, তবুও কি? (২২) যে ব্যক্তি সৎকর্মপরায়ণ হয়ে স্বীয় মুখমণ্ডলকে আল্লাহ্ অভিমুখী করে, সে এক মজবুত হাতল ধারণ করে। সকল কর্মের পরিণাম আল্লাহ্‌র দিকে। (২৩) যে ব্যক্তি কুফরী করে, তার কুফরী যেন আপনাকে চিন্তিত না করে। আমারই দিকে তাদের প্রত্যাবর্তন, অতপর আমি তাদের কর্ম সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত

করব। অন্তরে যা কিছু রয়েছে সে সম্পর্কে আল্লাহ্ সবিশেষ পরিজ্ঞাত। (২৪) আমি তাদেরকে স্বল্পকালের জন্য ভোগবিলাস করতে দেব, অতপর তাদেরকে বাধ্য করব গুরুতর শাস্তি ভোগ করতে। (২৫) আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল কে সৃষ্টি করেছে? তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ্। বলুন, সকল প্রশংসাই আল্লাহ্র। বরং তাদের অধিকাংশই জ্ঞান রাখে না। (২৬) নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু রয়েছে সবই আল্লাহ্র। আল্লাহ্ অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ। (২৭) পৃথিবীতে যত বৃক্ষ আছে, সবই যদি কলম হয় এবং সমুদ্রের সাথেও সাত সমুদ্র যুক্ত হয়ে কালি হয়, তবুও তাঁর বাক্যাবলী লিখে শেষ করা যাবে না। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় (২৮) তোমাদের সৃষ্টি ও পুনরুত্থান একটি মাত্র প্রাণীর সৃষ্টি ও পুনরুত্থানের সমান বৈ নয়। নিশ্চয় আল্লাহ্ সবকিছু শোনেন, সবকিছু দেখেন। (২৯) তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ্ রাত্রিকে দিবসে প্রবিষ্ট করেন এবং দিবসকে রাত্রিতে প্রবিষ্ট করেন? তিনি চন্দ্র ও সূর্যকে কাজে নিয়োজিত করেছেন। প্রত্যেকেই নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত পরিভ্রমণ করে। তুমি কি আরও দেখ না যে, তোমরা যা কর, আল্লাহ্ তার খবর রাখেন? (৩০) এটাই প্রমাণ যে, আল্লাহ্ই সত্য এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তারা যাদের পূজা করে সব মিথ্যা। আল্লাহ্ সর্বোচ্চ, মহান। (৩১) তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ্র অনুগ্রহে জাহাজ সমুদ্রে চলাচল করে, যাতে তিনি তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করেন? নিশ্চয় এতে প্রত্যেক সহনশীল, কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য নিদর্শন রয়েছে। (৩২) যখন তাদেরকে মেঘমালা সদৃশ তরংগ আচ্ছাদিত করে নেয়, তখন তারা খাঁটি মনে আল্লাহ্কে ডাকতে থাকে। অতপর তিনি যখন তাদেরকে স্থলভাগের দিকে উদ্ধার করে আনেন, তখন তাদের কেউ কেউ সরল পথে চলে। কেবল মিথ্যাচারী, অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিই আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তোমরা কি (সৃষ্টি জগতে বিরাজমান চাক্ষুষ প্রমাণাদি দ্বারা) একথা উপলব্ধি করতে পার না যে, আল্লাহ্ পাক যাবতীয় বস্তু যা ভূ-মণ্ডল বা নভোমণ্ডলে অবস্থিত (প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে) তোমাদের কাজ ও কল্যাণে নিয়োজিত রেখেছেন। এবং তিনি তোমাদেরকে তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য যাবতীয় নিয়ামত পরিপূর্ণভাবে প্রদান করেছেন। (প্রকাশ্য যা চোখ-কান প্রভৃতির সাহায্যে উপলব্ধি করা যায় এবং অপ্রকাশ্য যা জ্ঞান ও বিবেকের সাহায্যে উপলব্ধি করা যায়। এবং নিয়ামতরাজি দ্বারা সেসব নিয়ামত বোঝানো হয়েছে, যা আল্লাহ্ পাক কর্তৃক নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলকে ব্যবহারোপ-যোগী ও আয়ত্তাধীন করে দেওয়ার ফলে মানুষ লাভ করেছে। সুতরাং সব সম্বোধিত ব্যক্তি ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হতে হবে এ থেকে একথা বোঝা যায় না। এসব দলীলাদি দ্বারা তওহীদ প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও) এমন কতক লোক রয়েছে, যারা আল্লাহ্ পাকের (একত্ব) সম্পর্কে কোন অভিজ্ঞতা (অর্থাৎ বাস্তব জ্ঞান) কোন দলীল (অর্থাৎ বুদ্ধি ও বিবেক নিঃসৃত প্রমাণ-ভিত্তিক জ্ঞান) এবং কোন (সুস্পষ্ট) গ্রন্থ (অর্থাৎ

বর্ণনাভিত্তিক প্রমাণ সংশ্লিষ্ট জ্ঞান) ব্যতীতই তর্ক ও বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হয়। এবং যখন আল্লাহ্ পাক যে সব বিষয় অবতীর্ণ করেছেন, তাদের সেগুলো অনুসরণ করতে বলা হয় (অর্থাৎ হক প্রমাণকারী দলীলাদি সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করে তা অনুসরণ করতে) তখন (প্রতি-উত্তরে) তারা বলে যে, (আমরা তো তা অনুসরণ করি) না। আমাদের পিতৃপুরুষকে যা করতে পেয়েছি আমরা (তো) তাই অনুসরণ করবো। (পরে তাদের এ যুক্তি খণ্ডন করে বলা হচ্ছে যে,) যদি শয়তান তাদের---পূর্বপুরুষকে জাহান্নামের শাস্তির প্রতি (অর্থাৎ পথভ্রষ্টতার প্রতি যা দোযখের শাস্তির কারণ) আহবান করতে থাকে তবুও কি! তারা তাদেরই অনুসরণ করবে? এর মর্ম এই যে, এরা এমন শত্রুভাবাপন্ন ও হঠকারী যে, যুক্তি ও প্রমাণের দিকে আহবান করা সত্ত্বেও কোন প্রমাণাদি ব্যতীত এবং প্রমাণের বিরুদ্ধে পথভ্রষ্ট পিতৃপুরুষের পথে চলতেই থাকে। এ তো বিভ্রান্তদেরই অবস্থা) আর যে ব্যক্তি সত্যানুগামী, নিজ মুখমণ্ডল আল্লাহ্র সামনে নত করে (অর্থাৎ আকীদা-আমল উভয় ক্ষেত্রে একান্ত বাধ্য ও অনুগত থাকে। এর অর্থ ইসলাম ও তওহীদ) এবং (সাথে সাথে) যে নিষ্ঠাবান ও ঐকান্তিকতা সম্পন্নও বটে (অর্থাৎ নিছক বাহ্যিক ইসলাম নয়) তবে সে অত্যন্ত সুদৃঢ় গ্রন্থি ধারণ করে নিয়েছে (অর্থাৎ সে ঐ ব্যক্তি সদৃশ হয়ে পড়েছে, যে কোন দৃঢ় রজ্জু হাতে ধারণ করে পড়ে যাওয়া থেকে নিরাপদ থাকে)। ফলে সে ক্ষতি ও ধ্বংস থেকে অব্যাহতি পেয়েছে এবং পরিশেষে যাবতীয় কাজের পরিণাম ও ফলাফল আল্লাহ্র নিকটেই পৌঁছুবে (সুতরাং এসব আমলও অর্থাৎ হক ও বাতিলের অনুসরণের পরিণামফলও তার সম্মুখে পেশ করা হবে। বস্তুত তিনি প্রত্যেককে যথাযোগ্য পুরস্কার ও শাস্তি প্রদান করবেন।) এবং যে ব্যক্তি (হক প্রমাণকারী দলীলাদি থাকা সত্ত্বেও) কুফরী করবে তার এ কুফরী আপনার দুশ্চিন্তার কারণ না হওয়া উচিত। (অর্থাৎ আপনি সন্তাপ প্রকাশ করবেন না।) এদের সবাইকে আমার নিকটেই ফিরে আসতে হবে। সে দুনিয়াতে যা করেছে তখন আমি তা সবই বর্ণনা করে দেব। কেননা আল্লাহ্ পাক অন্তরের কথাও ভালরূপে জ্ঞাত আছেন। (সুতরাং আমার নিকট কোন কিছুই প্রচ্ছন্ন নেই---সবকিছুই প্রকাশ করে যথাযোগ্য শাস্তি প্রদান করবো। এ সম্পর্কে আপনি কোন চিন্তা করবেন না। যদি এসব লোক স্বল্পকালীন জীবনের উপর গর্বিত হয়ে থাকে তবে তা তাদের মারাত্মক ভুল। কেননা এ জীবনের কোন স্থায়িত্ব নেই। বরং) আমি তাদেরকে মাত্র কয়েক দিন উপভোগের সময় দিয়েছি। অনন্তর তাদেরকে কঠিন শাস্তির দিকে টেনে টেনে নিয়ে আসবো (সুতরাং এর উপর আত্মম্ভরিতা নিছক মূর্খতা)। আর (যে তওহীদের প্রতি তাদেরকে আমি আহবান করছি, তারাও এর মর্ম সমর্থন করে। কিন্তু ঠিক ফললাভের কাজে তা ব্যবহার করে না। তাই) আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন যে, আকাশ ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছে? তবে তারা 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পাক সৃষ্টি করেছেন' বলে উত্তর দেবে। (অতপর) আপনি বলুন! যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্রই। (যে বিষয়টা ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তা তোমাদের স্বীকারোক্তির ফলে প্রমাণিত হয়ে গেল। এখন অপর বিষয়টি নিতান্ত স্পষ্ট যে, যা নিজেই সৃষ্ট তা উপাসনার

যোগ্য নয়। সুতরাং কাম্য বস্তু তো প্রমাণিত হলো কিন্তু তা মানে না।) বরং তাদের অধিকাংশ (তো গোটা বিষয় সম্পর্কেও) অবহিত নয় [তাই একেবারে সুস্পষ্ট অপর বিষয়টির প্রতিও তারা দৃষ্টিপাত করে না যে, মাবূদ (পূজ্য) রূপে পরিণত হওয়া কেবল স্রষ্টারই অধিকার---শুধু তাঁর জন্য মানায় এবং আল্লাহ্ পাকের স্বরূপ এবং মর্যাদা তো এই যে,] আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব আল্লাহ্রই কর্তৃত্বাধীন। (বস্তুত তাঁর রাজত্ব এমনই বিশাল ও সুবিস্তীর্ণ) এবং আল্লাহ্ পাক (স্বয়ং) সম্পূর্ণরূপে অমুখাপেক্ষী (এবং যাবতীয় সৌন্দর্য ও গুণাবলীর অধিকারী। সুতরাং একমাত্র তিনিই উপাস্য হওয়ার যোগ্য) এবং (তাঁর গুণাবলী এতই অগণিত যে,) ধরাপৃষ্ঠে যত গাছপালা রয়েছে যদি তা সবগুলো কলমে রূপান্তরিত হয় (অর্থাৎ প্রচলিত কলমের সমান করে যাবতীয় গাছপালা খণ্ড খণ্ড করে যদি তা দিয়ে কলম তৈরি করা হয় এবং এটা সুস্পষ্ট যে, এরূপভাবে একই গাছ দিয়ে হাজার হাজার কলম তৈরি হবে এবং এই যে সমুদ্র---এর সাথে আরো সাত সমুদ্র সংযুক্ত হয়ে যদি কালিতে পরিণত হয়) এবং সে সব কলম ও কালি দিয়ে আল্লাহ্ পাকের মহিমা কৃতিত্ব-গাঁথা লিখতে আরম্ভ করা হয় তবে (কলম কালি নিঃশেষ হয়ে যাবে)। আল্লাহ্র বাক্যাবলী (অর্থাৎ যে সব বাক্যাবলী দিয়ে আল্লাহ্ পাকের প্রশংসা ও স্তুতি এবং কৃতিত্বগাঁথা বর্ণনা করা হয়) শেষ হবে না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ পাক মহা প্রজ্ঞাবান (অর্থাৎ তিনি ক্ষমতা ও জ্ঞান এবং উভয় ক্ষেত্রে পরিপূর্ণতার অধিকারী এবং এ দুটি গুণ যেহেতু অন্যান্য যাবতীয় গুণ ও কার্যক্রমের সহিত সম্পর্ক রাখে---সম্ভবত এজন্যই সাধারণভাবে যাবতীয় গুণ বর্ণনার পর আবার বিশেষভাবে এ দুটো গুণের উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাঁর নিরঙ্কুশ ক্ষমতা গুণের পরিপূর্ণতার এক অংশ ও নিদর্শন পরজগতও বটে---নির্বোধরা তো তা কঠিন বলে মনে করে---অথচ তিনি এমন ক্ষমতাবান যে) তোমাদের সবার (প্রথমবার) সৃষ্টি এবং (দ্বিতীয় বার) জীবন দান (তাঁর পক্ষে) যেন ঠিক একটি মাত্র ব্যক্তিকে সৃষ্টি ও তাকে জীবন দানের ন্যায়। (যদিও এখানে স্থান দৃষ্টে পুনরুত্থানের বর্ণনাই উদ্দেশ্য; কিন্তু সৃষ্টিতত্ত্বের বর্ণনার মাধ্যমে প্রমাণিত করায় তা অধিক শক্তিশালী ও তাৎপর্যবহ হয়েছে।) আল্লাহ্ পাক নিঃসন্দেহে সবকিছু দেখেন ও শোনেন। (অতপর যেসব লোক এসব প্রমাণাদি সত্ত্বেও কিয়ামতের বিচার দিবস অস্বীকার করে এবং ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে গর্হিত ও অপকৃষ্ট কাজ এবং পাপাচারে লিপ্ত থাকে। আল্লাহ্ পাক তাদের এসব কীর্তিকাণ্ড দেখেছেন---শুনেছেন---এদের যথোচিত শাস্তিবিধানও করবেন। এরপর পুনরায় তওহীদের বর্ণনা প্রসংগে বলা হয়েছে যে,) তোমরা কি উপলব্ধি করতে পারছ না যে, আল্লাহ্ রাতের (কিছু অংশ) দিনের ভেতরে এবং দিনের (কিছু অংশ) রাতের ভেতরে প্রবিষ্ট করে-ছেন এবং চন্দ্র-সূর্যকে কাজে নিয়োজিত রেখেছেন (যে,) এবং প্রত্যেকটি এক নির্দিষ্ট সময় (অর্থাৎ কিয়ামত পর্যন্ত) চলতে থাকবে এবং (তোমার কি) একথা (জানা নেই) যে, আল্লাহ্ পাক তোমাদের যাবতীয় কার্যক্রম সম্পর্কে পুরোপুরিভাবে জ্ঞাত (সুতরাং শিরকী পরিহার করাই এ সম্পর্কের পরিপূর্ণ জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক।

আর উপরে যেসব কার্যাবলী কেবল মহান আল্লাহ্ পাকের সহিত নির্দিষ্ট করা হয়েছে) তা এ কারণে যে, শুধু আল্লাহ্ পাকই নিখুঁত ও পরিপূর্ণ সত্তার অধিকারী (ও অবিনশ্বর) এবং এরা আল্লাহ্ পাক ব্যতীত অন্য যেসব বস্তুর উপাসনা করে তা সম্পূর্ণ অসত্য ও অযৌক্তিক এবং আল্লাহ্ পাক অতি মহান ও সর্বশ্রেষ্ঠ (সুতরাং) এসব কার্যক্রম তাঁর জন্যই নির্দিষ্ট। অবশ্য অন্যান্য সত্তা যদি অসত্য, নশ্বর ও ম্রিয়মাণ না হতো বরং 'নাউযুবিল্লাহ্' অপর কোন অবিনশ্বর সত্তার অস্তিত্ব থাকতো তবে এসব কার্যক্রম কেবল আল্লাহ্ পাকের জন্য নির্দিষ্ট থাকতো না যা একেবারে সুস্পষ্ট।

হে সম্বোধিত ব্যক্তি! তোমার কি (আল্লাহ্র একত্বের) এ (প্রমাণ) জানা নেই যে, আল্লাহ্ পাকের একান্ত অনুগ্রহেই সমুদ্র বক্ষে নৌকা চলাচল করে থাকে----যেন তিনি এতে তোমাদেরকে স্বীয় (কুদরতের) নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করেন। (ফলত প্রত্যেকটি সৃষ্ট বস্তুর অস্তিত্ব স্বীয় স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রমাণ ও সাক্ষ্য প্রদান করে। অনুরূপভাবে) এতেও প্রত্যেক ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য আল্লাহ্র (কুদরতের) অজস্র নিদর্শন রয়েছে। (এ দ্বারা মু'মিনকেই বোঝানো হয়েছে ; কেননা ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ক্ষেত্রে পূর্ণতা লাভ করা কেবল এদেরই বৈশিষ্ট্য। এতদ্ভিন্ন সবর ও শুক্র বিশ্বজগৎ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করতেও অনুপ্রাণিত করে এবং প্রমাণ লাভের জন্য চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা একান্ত আবশ্যক। তাই এই উভয় গুণ এ স্থলে বেশ উপযোগী হয়েছে। বিশেষত নৌকার অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে---কেননা, সমুত্থিত তরঙ্গমালা ধৈর্য ধারণের স্থল এবং নিরাপদে তীরে পৌঁছানো কৃতজ্ঞতা প্রকাশের স্থল। বস্তুত এসব ঘটনা সম্পর্কে যারা গবেষণা করেন প্রমাণ লাভের তওফীক তাঁরাই পেয়ে থাকেন) এবং (যেমন পূর্বোল্লিখিত আয়াত وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ --এ উক্ত কাফিরদের পক্ষ থেকে যেরূপভাবে দলীলের বিষয়াদির স্বীকৃতি পাওয়া যায়, কোন কোন সময় স্বয়ং দলীলের ফলশ্রুতি অর্থাৎ তওহীদ সম্পর্কেও স্বীকারোক্তি জ্ঞাপন করে থাকে। যদ্দ্বারা তওহীদ অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে গেল। তাই) যখন তাদেরকে শামিয়ানা (অর্থাৎ মেঘমালা) সদৃশ তরঙ্গরাজি (তাদের চতুর্দিকে) পরিবেষ্টিত করে ফেলে তখন তারা অকপট বিশ্বাসে আল্লাহ্ পাককে আহবান করতে থাকে। অনন্তর যখন তিনি তাদেরকে উদ্ধার করে ভূ-ভাগের দিকে নিয়ে আসেন, তখন তাদের কিয়দংশ মধ্যপন্থা অবলম্বন করে (অর্থাৎ বক্র শির্ক পরিহার করে তওহীদের সরলতম মধ্যপথ অবলম্বন করে) এবং (কিয়দংশ আবার আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে বসে। এবং) যারা প্রবঞ্চক ও অকৃতজ্ঞ কেবল তারাই আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে (অর্থাৎ নৌকায় যে তওহীদের প্রতিজ্ঞা করেছিল তা ভংগ করে ফেলে এবং ভূ-ভাগে পৌঁছুতে পেরেছে বলে যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত ছিল তাও ছেড়ে দেয়)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

মহান আল্লাহ্র সর্বব্যাপী অসীম জ্ঞান ও অসাধারণ ক্ষমতার দৃশ্যাবলী অবলোকন করা সত্ত্বেও কাফির ও মুশরিকগণ স্বীয় শির্ক ও কুফরীতে অনড় রয়েছে বলে সূরার প্রারম্ভে তাদের সম্পর্কে সতর্কবাণী ছিল। আর অপরপক্ষে স্বভাবসুলভ-অনুগত মু'মিনগণের প্রশংসা-স্তুতি ও শুভ পরিণতির বর্ণনা ছিল। মধ্যস্থলে মহামতি লোকমানের উপদেশাবলীও এক প্রকার সেসব বিষয়ের পরিপূরকই ছিল। উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ্ পাকের সর্বব্যাপী ও সর্বতোমুখী জ্ঞান ও ক্ষমতা এবং সৃষ্টিকুলের প্রতি তাঁর অজস্র কৃপা ও করুণারাজি বর্ণনা করে পুনরায় তওহীদের প্রতি আহবান করা হয়েছে।

سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ —অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের যাবতীয় বস্তু তোমাদের অনুগত করে দিয়েছেন—অনুগত করে দেয়ার অর্থ কোন বস্তুকে কারো আজ্ঞাবহ করে দেওয়া। প্রশ্ন হতে পারে যে, ভূ-মণ্ডলের সকল বস্তু তো আজ্ঞাবহ নয়। বরং অনেক বস্তুই তো মানুষের মর্জির বিপরীত কাজ করে। বিশেষ করে যেসব বস্তু নভোমণ্ডলে বিদ্যমান সেগুলো মানুষের আজ্ঞাবহ হওয়ার তো কোন সম্ভাবনাই নেই। উত্তর এই যে, تسخير অর্থ কোন বস্তুকে কোন বিশেষ কাজে বাধ্যতামূলকভাবে নিয়োজিত করে রাখা। আকাশ ও পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু মানুষের অনুগত করে দেওয়ার অর্থ এই যে, সেসব বস্তু মানুষের সেবা ও কল্যাণ সাধনে নিয়োজিত করে দেওয়া হয়েছে। তন্মধ্যে অনেক বস্তু তো এমন যে, সেগুলোকে মানুষের সেবায় নিয়োজিত করার সাথে সাথে তাদের আজ্ঞাবহও করে দেওয়া হয়েছে—তারা যখন যেভাবে ইচ্ছা সেগুলোকে ব্যবহার করে। আবার কতক বস্তু এমনও আছে যেগুলো মানুষের কাজে তো লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে—ফলে তা মানবসেবায় যথারীতি অবশ্যই নিয়োজিত—কিন্তু প্রতিপালকোচিত হিকমতের পরিপ্রেক্ষিতে সেগুলোকে মানুষের অনুগত করে দেওয়া হয়নি। যেমন নভোমণ্ডলে অবস্থিত সৃষ্টিজগৎ, গ্রহ-নক্ষত্র, বজ্র-বিদ্যুৎ, বৃষ্টিবাদল প্রভৃতি; যেগুলো মানুষের আজ্ঞাবহ করে দেওয়া হলে পর সেগুলোর উপর মানুষের স্বভাব, রুচি, প্রকৃতি ও অবস্থাবলীর বিভিন্নতার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া প্রতিফলিত হতো। একজন কামনা করতো যে, সূর্য অনতিবিলম্বে উদিত হোক। আবার অপরজন তার নিজস্ব প্রয়োজনে এর বিলম্বে উদয়নই কামনা করতো। একজন বৃষ্টি কামনা করতো; অপরজন উন্মুক্ত প্রান্তরে সফরে আছে বলে বৃষ্টি না হওয়াই কামনা করতো। এমতাবস্থায় এরূপ পরস্পর বিপরীতধর্মী চাহিদা আকাশমণ্ডলের বস্তুসমূহের কার্যক্রমে বৈপরীত্য ও বৈসাদৃশ্যের উদ্ভব ঘটাতো। এজন্যই আল্লাহ্ পাক এসব বস্তু মানব সেবায় নিয়োজিত অবশ্যি রেখেছেন; কিন্তু তার আজ্ঞাবহ করে রাখেননি। এও এক প্রকারের করায়ত্তকরণই বটে।

وَاَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهٗ ظَاهِرَةً وَّبَاطِنَةً — اسباغ অর্থ পরিপূর্ণ

করে দেওয়া। যার অর্থ আল্লাহ্ পাক তোমাদের উপর তাঁর প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল প্রকারের নিয়ামত পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। প্রকাশ্য নিয়ামত বলতে সেসব নিয়ামত-কেই বোঝায় যা মানুষ তার পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনুধাবন করতে পারে। যেমন মনোরম আকৃতি, মানুষের সুঠাম ও সংবদ্ধ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং প্রত্যেক অংগ এমন সুসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে তৈরী করা যেন তা মানুষের কাজে সর্বাধিক সহায়কও হয় অথচ আকৃতি-প্রকৃতিতেও কোন প্রকারের বিকৃতি না ঘটায়। অনুরূপভাবে জীবিকা, ধন-সম্পদ, জীবন-যাপনের মাধ্যমসমূহ, সুস্থতা ও কুশলাবস্থা----এ সবই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নিয়া-মত ও অনুকম্পাসমূহের অন্তর্ভুক্ত। তদ্রূপ দীন ইসলামকে সহজ ও অনায়াসলব্ধ করে দেওয়া, আল্লাহ্-রসূলের অনুসরণ ও আনুগত্য প্রদর্শনের তওফীক প্রদান, অন্যান্য ধর্মের উপর ইসলামের বিজয় ও প্রভাবশীলতা এবং শত্রুদের মোকাবেলায় মুসলমানদের প্রতি সাহায্য ও সহায়তা----এসবই প্রকাশ্য নিয়ামতসমূহের পর্যায়ভুক্ত। আর গোপনীয় নিয়ামত সেগুলো যা মানব হৃদয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত---যথা ঈমান, আল্লাহ্ পাকের পরিচয় লাভ এবং জ্ঞানবুদ্ধি, সচ্চরিত্র, পাপসমূহ গোপন করা ও অপরাধসমূহের ত্বরিত শাস্তি আরোপিত না হওয়া ইত্যাদি।

وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ---এই আয়াতে মহান আল্লাহ্ তাঁর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা, তাঁর ক্ষমতার ব্যবহার এবং তাঁর নিয়ামত (কৃপা ও দয়াসমূহ) যে একেবারে অসীম ও অফুরন্ত,---কোন ভাষার সাহায্যে তা প্রকাশ করা চলে না, কোন কলম দিয়ে তা লিপিবদ্ধ করা চলে না, এ তথ্যটুকুই সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন। অধিকন্তু তিনি এরূপভাবে উদাহরণ পেশ করেছেন যে, ভূ-পৃষ্ঠে যত বৃক্ষ আছে যদি সেগুলোর সব শাখা-প্রশাখা দিয়ে কলম তৈরী করা হয় এবং বিশ্বের সাগরসমূহের পানি কালিতে রূপান্তরিত করে দেওয়া হয় এবং এসব কলম আল্লাহ্ তা'আলার প্রজ্ঞা ও জ্ঞান-গরিমা এবং তাঁর ক্ষমতা ব্যবহারের বিবরণ লিখতে আরম্ভ করে তবে সমুদ্রের পানি নিঃশেষ হয়ে যাবে; তবু তাঁর অফুরন্ত প্রজ্ঞা ও মহিমার বর্ণনা শেষ হবে না। কেবল একটি মাত্র সমুদ্র কেন---যদি অনুরূপ আরো সাত সমুদ্রও অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয় তবুও সব সাগর শেষ হয়ে যাবে তথাপি আল্লাহ্ পাকের মহিমা প্রকাশক বাণীসমূহের পরি-সমাপ্তি ঘটবে না। كَلِمَاتُ اللّٰهِ-এর ভাবার্থ আল্লাহ্ পাকের জ্ঞানপূর্ণ ও প্রজ্ঞাময় বাক্যাবলী।----(রূহ ও মাযহারী) আল্লাহ্ পাকের মহিমা, কৃপা ও করুণাবলীও এর অন্তর্ভুক্ত। সাত সমুদ্র অর্থ এ নয় যে, সাত সমুদ্রের সংখ্যা সাতটিই; বরং এর অর্থ এই যে, এক সমুদ্রের সাথে আরো সাতটি সমুদ্র সংযুক্ত হয়েছে বলে যদি ধরেও নেওয়া হয় তা সত্ত্বেও এগুলোর পানি দিয়ে আল্লাহ্‌র প্রজ্ঞাময় বাক্যসমূহ লিখে শেষ করা যাবে না। এখানে সাতের সংখ্যা উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা হয়েছে---সীমিত করে দেওয়া উদ্দেশ্য নয়। যার প্রমাণ কোরআনের অন্য এক আয়াত---যেখানে বলা হয়েছে ঃ قُلْ لَوْ كَانَ

قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمٰتِ رَبِّىْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمٰتُ رَبِّىْ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهٖ مَدَدًا অর্থাৎ আল্লাহ্‌র মহিমা কীর্তনসূচক বাণীসমূহ প্রকাশ করতে যদি সমুদ্রকে কালিতে রূপান্তরিত করে দেওয়া হয়, তবে সমুদ্র শূন্য হয়ে যাবে---কিন্তু সে বাণীসমূহ শেষ হবে না। আর শুধু এ সমুদ্র নয়, অনুরূপ আরো সমুদ্র অন্তর্ভুক্ত করলেও অবস্থা একই থাকবে। এ আয়াতে بِمِثْلِهٖ বলে এরূপ ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যদি এ ধারা বহুদূর পর্যন্ত চলতে থাকে যে, এক সমুদ্রের সাথে অনুরূপ অপর সমুদ্র সংযুক্ত হয়ে তার সাথে অনুরূপ তৃতীয়টা, অনুরূপ চতুর্থটা----মোটকথা সমুদ্রসমূহের যতগুণ বা সংখ্যাই মেনে নেওয়া হোক না কেন-এগুলোর পানি কালি হলেও আল্লাহ্‌র মহিমা প্রকাশক বাণীসমূহ লিখে শেষ করতে পারবে না। যুক্তি-বুদ্ধির দিক দিয়ে একথা সুস্পষ্ট যে, সমুদ্র সাতটি কেন, সাত হাজারও যদি হয় তবুও তা সীমাবদ্ধ, শেষ অবশ্যই হবে--কিন্তু كلمات الله অর্থাৎ আল্লাহ্‌র বাক্যাবলী অসীম ও অনন্ত---কোন সসীম বস্তু অসীমকে কিরূপে সীমিত করতে পারে?

কতক রেওয়ায়েতে আছে যে, এ আয়াত ইহুদী পাদ্রীদের এক প্রশ্নের উত্তরে নাযিল হয়েছে। মহানবী হযরত (সা) যখন মদীনায় তশরীফ আনেন তখন কিছু সংখ্যক ইহুদী পাদ্রী হাযির হয়ে কোরআনের আয়াত وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا (অর্থাৎ তোমাদেরকে অতি সামান্য পরিমাণ জ্ঞানই প্রদান করা হয়েছে) প্রসংগে আপত্তির সুরে বললো, আপনি (নবীজী) বলেন যে, তোমাদেরকে অতি সামান্য জ্ঞান প্রদান করা হয়েছে। এতে আপনি কি শুধু আপনাদের অবস্থা বর্ণনা করেছেন, না আমাদেরকেও এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন? মহানবী হযরত (সা) বললেন----আমার উদ্দেশ্য সকলেই। অর্থাৎ আমাদের জাতিও এবং ইহুদী-খৃস্টানগণও। তখন তারা আপত্তি করে বললো---আমাদেরকে তো আল্লাহ্ পাক তওরাত প্রদান করেছেন----যা تِبْيَانٌ لِّكُلِّ شَيْءٍ অর্থাৎ সকল বস্তুর (রহস্য) বর্ণনাকারী। তিনি বললেন, এও আল্লাহ্‌র জ্ঞানের তুলনায় অতি নগণ্য। আবার তওরাতে যেসব জ্ঞান রয়েছে সে সম্পর্কেও তোমরা পুরোপুরি অবহিত নও। কিন্তু আল্লাহ্‌র জ্ঞানের তুলনায় যাবতীয় আসমানী গ্রন্থ এবং সমস্ত নবীর সমষ্টিগত জ্ঞানও অতিশয় কিঞ্চিৎকর ও নগণ্য। এ বক্তব্যের সমর্থনেই এ আয়াত নাযিল হয়েছে।

وَلَوْ اَنَّ مَا فِى الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ الاية ---(ইবনে-কাসীর)

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِىْ وَالِدٌ عَنْ وَّلَدِهٖ وَلَا مَوْلُوْدٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَّالِدِهٖ شَيْـًٔا اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ ﴿٣٣﴾ اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِى الْاَرْحَامِ وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ بِاَىِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ﴿٣٤﴾

(৩৩) হে মানব জাতি ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর এবং ভয় কর এমন এক দিবসকে যখন পিতা পুত্রের কোন কাজে আসবে না এবং পুত্রও তার পিতার কোন উপকার করতে পারবে না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য। অতএব পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে ধোঁকা না দেয় এবং আল্লাহ্ সম্পর্কে প্রতারক শয়তানও যেন তোমাদেরকে প্রতারিত না করে। (৩৪) নিশ্চয় আল্লাহ্‌র কাছেই কিয়ামতের জ্ঞান রয়েছে। তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং গর্ভাশয়ে যা থাকে, তিনি তা জানেন। কেউ জানে না আগামীকল্য সে কি উপার্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন দেশে সে মৃত্যুবরণ করবে। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে লোকসকল! তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর (এবং কুফরী ও শির্‌ক পরিহার কর) এবং সেদিনের ভয় কর যেদিন না কোন পিতা স্বীয় পুত্রের জন্য, না কোন পুত্র স্বীয় পিতার জন্য কোন দাবী আদায় করতে সক্ষম হবে। সেদিনের আগমন একেবারে অবশ্যম্ভাবী। কেননা এ সম্পর্কে আল্লাহ্ পাকের অঙ্গীকার রয়েছে। আর আল্লাহ্ পাকের অঙ্গীকার নিঃসন্দেহে সত্য (প্রতিপন্ন) হয়। সুতরাং এ পার্থিব জীবন তোমাদেরকে যেন প্রতারিত না করে। (সুতরাং এর প্রবঞ্চনায় পড়ে আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে শাস্তি দেবেন না বলে যেন মনে না কর। যেমন এরা বলে বেড়াতো وَلَئِنْ رُّجِعْتُ اِلٰى رَبِّىْٓ اِنَّ لِىْ عِنْدَهٗ لَلْحُسْنٰى অর্থাৎ যদি আমাকে আমার পালনকর্তার সমীপে ফিরে যেতেও হয় তবে নিশ্চয় তাঁর নিকটেও আমার জন্য অতি চমৎকার আয়োজন থাকবে)। নিঃসন্দেহে কেবল আল্লাহ্ পাকই কিয়ামতের সংবাদ

রাখেন এবং তিনিই (স্বীয় জ্ঞানানুযায়ী বৃষ্টি বর্ষণ করেন। সুতরাং এ সম্পর্কেও পূর্ণ জ্ঞান কেবল তাঁরই তরে নির্দিষ্ট।) এবং (গর্ভবতীর) গর্ভাশয়ে যা (পুত্র না কন্যা) রয়েছে তা কেবল তিনিই জানেন। এবং কোন ব্যক্তিই জানে না যে, আগামীকাল সে কি কাজ করবে। (এ সম্পর্কেও শুধু তিনিই জ্ঞাত) এবং কোন ব্যক্তি জানে না যে, তার মৃত্যু কোথায় হবে (এ সংবাদও শুধু তাঁর জ্ঞানেই রয়েছে। কেবল এগুলো কেন, যত অদৃশ্য বস্তু রয়েছে) নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ পাকই সেসব কথা জানেন। (এবং এ-গুলো সম্পর্কে) পরিপূর্ণভাবে জ্ঞাত (এ ক্ষেত্রে অপর কারো অংশীদারিত্ব নেই)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

উপরোল্লিখিত আয়াতদ্বয়ের প্রথম আয়াতে মু'মিন-কাফির নির্বিশেষে সমগ্র মানব-কুলকে সম্বোধন করে আল্লাহ্ তা'আলা ও কিয়ামত দিবস সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করে সেজন্য প্রস্তুতি নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ ---অর্থাৎ হে মানবজাতি! স্বীয় পালনকর্তাকে ভয় কর। এক্ষেত্রে আল্লাহ্ পাকের মূল বা অন্য কোন গুণবাচক নামের স্থলে 'রব' (---পালনকর্তা) বিশেষ-ণটি চয়ন করার মধ্যে এ ইঙ্গিত রয়েছে যে, আল্লাহ্কে ভয় করার যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তা কোন হিংস্র জন্তু বা শত্রু সম্পর্কে স্বাভাবিকভাবে মনে যেরূপ ভয়ের উদ্রেক হয়ে থাকে সেরূপ ভয় নয়। কেননা আল্লাহ্ পাক তো তোমাদের পালনকর্তা---সুতরাং তাঁর সম্পর্কে এ ধরনের কোন আশংকা থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। বরং এ স্থলে সে ধর-নের ভয় বোঝানো হয়েছে, যা বয়োজ্যেষ্ঠ ও গুরুজনের প্রতি তাঁদের মানমর্যাদা ও প্রতাপ-প্রতিপত্তির পরিপ্রেক্ষিতে হয়ে থাকে। যেমন পুত্র পিতাকে এবং ছাত্র তার শিক্ষককে ভয় করে। অথচ এঁরা তার শত্রু বা ক্ষতি সাধনকারী কেউ নয়। কিন্তু তাঁদের সম্ভ্রম ও প্রভাব হৃদয়ে বিদ্যমান থাকে। তাই তাদেরকে পিতা ও ওস্তাদের অনুসরণে ও নির্দেশ পালনে বাধ্য করে। এ খানেও একথাই বোঝানো হয়েছে---যেন আল্লাহ্ পাকের মহান মর্যাদা ও প্রতাপ তোমাদের হৃদয়ে পুরোপুরি স্থান করে নেয়, যেন তোমরা অনায়াসে তাঁর অনুসরণ ও নির্দেশ পালন করতে পার।

وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا ---অর্থাৎ সেদিনকে ভয় কর, যেদিন কোন পিতাও স্বীয় পুত্রের উপকার সাধন করতে পারবে না। অনুরূপভাবে কোন পুত্রও স্বীয় পিতার কোন কল্যাণ সাধন করতে পারবে না।

এখানে ঐ শ্রেণীর পিতা-পুত্রকে বোঝানো হয়েছে, যাদের মধ্যে একজন মু'মিন অপরজন কাফির। কেননা, মু'মিন পিতা স্বীয় কাফির পুত্রের শাস্তি বিন্দুমাত্রও হ্রাস করতে পারবে না এবং তার কোন উপকারও সাধন করতে পারবে না। অনুরূপভাবে মু'মিন পুত্র কাফির পিতার কোন কাজে আসবে না।

এরূপ নির্দিষ্টকরণের কারণ, কোরআন করীমের অন্য আয়াতসমূহ এবং হাদীসের বিভিন্ন রেওয়ায়েত---যেখানে একথা স্পষ্টরূপে বর্ণনা করা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন পিতামাতা সন্তানের জন্য এবং সন্তান পিতামাতার জন্য সুপারিশ করবেন। আর এ সুপারিশ দ্বারা তারা লাভবান ও সফলকাম হবে। কোরআনে করীমে রয়েছে : وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ অর্থাৎ যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের সন্তান-সন্ততিও ঈমানের ক্ষেত্রে তাদের অনুসরণ করেছে---আর তারাও মু'মিনে পরিণত হয়েছে ; আমি এ সন্তান-সন্ততিদেরকে তাদের পিতামাতার মর্যাদায় উন্নীত করে দেব। যদিও তাদের কার্যাবলী এ স্তরে পৌঁছার উপযোগী নয়। কিন্তু সৎ পিতামাতার কল্যাণে কিয়ামতের দিন তারা এ ফল লাভ করতে সক্ষম হবে যে, পিতামাতার স্তরে তাদেরকে পৌঁছে দেওয়া হবে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে শর্ত এই যে, সন্তানকে মু'মিন হতে হবে---যদিও কাজকর্মে কোন ত্রুটি ও শৈথিল্য থেকে থাকে।

অনুরূপভাবে অপর এক আয়াতে রয়েছে : جَنّٰتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ অর্থাৎ তারা অক্ষয় ও অবিনশ্বর স্বর্গোদ্যানে প্রবেশ করবে এবং এক্ষেত্রে তাদের যোগ্য হিসাবে প্রতিপন্ন পিতামাতা, স্ত্রীগণ ও পুত্র-পরিজনও তাদের সাথে প্রবেশ করবে। যোগ্য বলতে মু'মিন হওয়া বোঝানো হয়েছে।

এ আয়াতদ্বয় দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পিতামাতা ও সন্তান-সন্ততি, অনুরূপভাবে স্বামী এবং স্ত্রী মু'মিন হওয়ার ক্ষেত্রে যদি সমশ্রেণীভুক্ত হয় তবে হাশর ময়দানে একের দ্বারা অপরের উপকার সাধিত হবে। অনুরূপভাবে বিভিন্ন হাদীসের রেওয়ায়েতে সন্তান কর্তৃক পিতামাতার জন্য সুপারিশ করার কথা বর্ণিত আছে। সুতরাং উল্লিখিত আয়াতে বর্ণিত বিধি যে, হাশর ময়দানে কোন পিতা সন্তানের বা কোন সন্তান পিতার কোন উপকার সাধন করতে পারবে না---তা শুধু সে ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য যখন এদের মধ্যে একজন মু'মিন এবং অপরজন কাফির হবে।-----(মাযহারী)

ফায়েদা ঃ এখানে একথা প্রণিধানযোগ্য যে, এ আয়াতে পিতা পুত্রের কোন উপকার সাধন করতে পারবে না---এ স্থলে ক্রিয়াবাচক বাক্যরূপে لَا يَجْزِىْ وَالِدٌ عَنْ وَّلَدِهٖ---এই শব্দসমূহের ব্যবহার করা হয়েছে। পক্ষান্তরে দুটো পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এক. একে বিশেষ্যবাচক বাক্যরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত. এখানে ولد শব্দের পরিবর্তে مولود শব্দ গৃহীত হয়েছে। তাৎপর্য এই যে, তুলনা-মূলকভাবে ক্রিয়াবাচক বাক্যের চাইতে বিশেষ্যবাচক বাক্য অধিক জোরদার হয়ে থাকে। বাক্যের এরূপ পরিবর্তনের মাধ্যমে এ পার্থক্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যা পিতাপুত্রের মাঝে বিদ্যমান। তা এই যে, সন্তানের প্রতি পিতার ভালবাসা অধিকতর গভীর। পক্ষান্তরে পিতার জন্য সন্তানের ভালবাসা দুনিয়াতেও সে স্তর পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না। আর এখানে হাশর ময়দানে উপকার সাধনে উভয়ের অক্ষমতার কথাই বলা হয়েছে। কিন্তু সন্তানের কোন উপকার সাধন না করার কথা বিশেষ জোর দিয়ে বলা হয়েছে। আর ولد শব্দের স্থলে مولود শব্দ ব্যবহারের তাৎপর্য এই যে, مولود বলতে শুধু সন্তানগণকেই বোঝানো হয় আর ولد শব্দ অধিকতর ব্যাপক। ---সন্তানগণের সন্তানগণও এর অন্তর্ভুক্ত। এতে অপরদিক দিয়ে এ বিষয়েরও সমর্থন পাওয়া গেল যে, স্বয়ং ঔরসজাত পুত্রও পিতার কোন কাজে আসবে না। তাহলে পৌত্র ও প্রপৌত্রের কথা বলা নিষ্প্রয়োজন।

অপর আয়াতে পাঁচটি বস্তুর জ্ঞান সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ্ পাকেরই জন্য নির্দিষ্ট থাকা এবং অপর কোন সৃষ্টির সে জ্ঞান না থাকার কথা বলা হয়েছে। সুতরাং এর মাধ্যমেই সূরায়ে লোকমান শেষ করা হয়েছে।

اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِى الْاَرْحَامِ وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ بِاَىِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ

অর্থাৎ কিয়ামত সম্পর্কিত জ্ঞান কেবল আল্লাহ্ পাকেরই রয়েছে (অর্থাৎ কোন্ বছর কোন্ তারিখে সংঘটিত হবে) এবং তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন ও মাতৃগর্ভে কি আছে তা তিনিই জানেন (অর্থাৎ কন্যা না পুত্র; কোন্ আকৃতি-প্রকৃতির) এবং আগামী কাল কি অর্জন করবে তা কোন ব্যক্তি জানে না (অর্থাৎ ভাল মন্দ কি লাভ করবে) অথবা কোন্ স্থানে মৃত্যুবরণ করবে তাও কেউ জানে না।

প্রথম তিন বস্তু সম্পর্কিত জ্ঞান যদিও একথা স্পষ্টভাবে বলা হয়নি যে, আল্লাহ্ পাক ব্যতীত অন্য কারো এগুলোর জ্ঞান নেই। কিন্তু বাক্য বিন্যাস ও প্রকাশভংগী থেকে

একথাই বোঝা যায় যে, এসব বস্তুর জ্ঞান কেবল আল্লাহ্ পাকের অসীম জ্ঞান ভাণ্ডারেই সীমিত রয়েছে। অবশ্য অবশিষ্ট বস্তুদ্বয় সম্পর্কে একথা স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ পাক ব্যতীত অন্য কারো এগুলোর তথ্য ও তত্ত্ব জানা নেই। এ পাঁচ বস্তুকে সূরায়ে আন'আমের আয়াতে مفاتح الغيب অদৃশ্য জগতের চাবিসমূহ) বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। বলা হয়েছে : وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ---অর্থাৎ কেবল আল্লাহ্ পাকের নিকটই অদৃশ্য জ্ঞানভাণ্ডারের চাবিকাঠি, তিনি ভিন্ন অন্য কেউ এ সম্পর্কে জ্ঞাত নয়। হাদীসে একে مفاتح الغيب বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে : مفاتح ও مفاتيح - مفتاح —এর বহুবচন, যার অর্থ তালা খোলার চাবি। সুতরাং এর অর্থ অদৃশ্য জ্ঞান ভাণ্ডারের মূল---যার সাহায্যে অদৃশ্য জ্ঞান ভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত করা হয়।

অদৃশ্য জ্ঞান সম্পর্কিত মাস'আলা : এ মাস'আলার প্রয়োজনীয় বর্ণনা সূরায়ে নামলের আয়াত قل لا يعلم من في السموات والارض الغيب الا الله এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে প্রদান করা হয়েছে। এ আয়াতে যাবতীয় অদৃশ্য জ্ঞান কেবল আল্লাহ্ পাকেরই জন্য নির্দিষ্ট বলে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে; এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী গোটা উম্মতের আকীদা-বিশ্বাসও এই। আলোচ্য আয়াতে যে পাঁচ বস্তু উল্লেখ করে এর জ্ঞান কোন সৃষ্টির নেই, কেবল আল্লাহ্ পাকেরই রয়েছে বলে যা বলা হয়েছে তা শুধু এ কয়টিকেই নির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ করে দেয়ার উদ্দেশ্যে নয়। অন্যথায় সূরায়ে নামলের আয়াতের সহিত বৈপরীত্য দেখা দেবে। বরং এ পাঁচ বস্তুর বিশেষ গুরুত্ব প্রকাশার্থে সেগুলো এখানে বর্ণনা করা হয়েছে এবং বিশেষীকরণ ও গুরুত্ব আরোপের কারণ এই যে, সাধারণত যেসব অদৃশ্য বস্তুর তথ্য সম্পর্কে অবহিত হতে মানুষ আগ্রহান্বিত—তা এ পাঁচ বস্তুই। এ ছাড়া অদৃশ্য জ্ঞানের দাবীদার জ্যোতিষিগণ যেসব বস্তুর তথ্য মানুষের নিকটে প্রকাশ করে নিজেদেরকে অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী বলে প্রমাণ করতে চায়---তাও এ পাঁচ বস্তুই। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, জনৈক ব্যক্তি মহানবী হযরত (সা)-কে এ পাঁচ বস্তু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয়, যাতে এ পাঁচ বস্তুর জ্ঞান কেবল আল্লাহ্ পাকের রয়েছে বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

ইবনে উমর (রা) ও ইবনে মসউদ (রা) হতে বর্ণিত হাদীসে ইরশাদ হয়েছে اوتيت مفاتح كل شيء الا الخمس (امام احمد ابن كثير) অর্থাৎ পাঁচটি ব্যতীত যাবতীয় বস্তুর চাবি আমাকে প্রদান করা হয়েছে---এতে اوتيت স্বয়ং একথা প্রকাশ করে দিয়েছে যে, এ পাঁচ বস্তু ব্যতীত যে সব অদৃশ্য জ্ঞান নবীজির অর্জিত ছিল তা আল্লাহ্ পাকের পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে প্রদত্ত হয়েছিল। সুতরাং

তা অদৃশ্য জ্ঞানের সংজ্ঞাভুক্ত নয়। কেননা নবীগণকে (সা) ওহী এবং ওলীগণকে ইলহামের মাধ্যমে যে অদৃশ্য তথ্যাবলী আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবগত করানো হয় তা প্রকৃতপক্ষে অদৃশ্য জ্ঞানই নয়---যার উপর ভিত্তি করে তাদেরকে অদৃশ্য জ্ঞানের অধি-কারী বলা যেতে পারে। বরং সেগুলো أَنْبَاءُ الْغَيْبِ —অর্থাৎ অদৃশ্য বার্তা আল্লাহ্ পাক যখন চান এবং যতটুকু চান ফেরেশতাকুলকে, নবীগণকে এবং তাঁর মনোনীত সিদ্ধ পুরুষগণকে প্রদান করেন। কোরআন করীমে এগুলোকে أَنْبَاءُ الْغَيْبِ ---অদৃশ্যবার্তাসমূহ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে---বলা হয়েছে ঃ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ---অর্থাৎ (এগুলো) অদৃশ্য তথ্যাবলী, যা ওহীর মাধ্যমে আমি আপ-নাকে অবহিত করেছি।

সুতরাং হাদীসের মর্মার্থ এই যে, এ পাঁচ বস্তুকে তো আল্লাহ্ পাক নিজ সত্তার সাথে এমনভাবে নির্দিষ্ট করে রেখেছেন যে, أنباء الغيب---অদৃশ্য বার্তা হিসেবেও ফেরেশতা বা নবীগণকে এ জ্ঞান প্রদান করা হয়নি। এগুলো ছাড়া অন্যান্য অদৃশ্য জ্ঞানের অনেক কিছু নবীগণকে ওহীর মাধ্যমে প্রদান করা হয়।

এ বক্তব্য থেকেও এ পাঁচ বস্তু বিশেষভাবে উল্লেখের আরও এক কারণ জানা গেল।

আরও একটি সন্দেহ ও তার উত্তর ঃ উল্লিখিত আয়াতে একথা প্রমাণিত হলো যে, সাধারণ অদৃশ্য জ্ঞান যা আল্লাহ্ পাকের বৈশিষ্ট্য তন্মধ্যে বিশেষ করে উক্ত পাঁচ বস্তু এমন যে, যার জ্ঞান কোন নবী (সা)-কে ওহীর মাধ্যমেও প্রদান করা হয় না। সুতরাং এসব বস্তু সম্পর্কে কারো কিছু জানার কথা নয়। অথচ আল্লাহ্ পাকের ওলীগণ সম্পর্কে এমন অসংখ্য ঘটনা বর্ণিত আছে যে, তারা বৃষ্টি বর্ষণের আগাম সংবাদ দিয়েছেন বা কোন গর্ভস্থ সন্তান সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করেছেন বা কারো সম্পর্কে কোন কাজ করা বা না করার অগ্রিম সংবাদ দিয়েছেন, কারো মৃত্যুস্থান নির্দিষ্ট করে বলে দিয়েছেন এবং তাঁদের এসব আগাম বার্তা বাস্তবে ঠিক প্রমাণিতও হয়েছে।

অনুরূপভাবে কোন কোন গণক ও জ্যোতিষশাস্ত্রবিদ এসব বস্তু সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্য প্রদান করে থাকে এবং কখনো কখনো তা ঠিকও হয়ে যায়। তবে এ পাঁচ বস্তুর জ্ঞান কেবল আল্লাহ্রই সংগে কিভাবে নির্দিষ্ট রইলো?

এর এক উত্তর তো উহাই যা 'সূরায়ে নামলে' সবিস্তার বর্ণনা করা হয়েছে এবং সংক্ষিপ্তভাবে উপরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রকৃত প্রস্তাবে অদৃশ্য জ্ঞান (ইল্‌মে গায়েব) তাকেই বলা হয়, যা কোন প্রচলিত ও স্বাভাবিক কারণের মাধ্যমে হয় না;

বরং কোন মাধ্যম ছাড়া নিজে নিজেই হয়। এসব জ্ঞান যদি নবীগণ (সা)-এর ওহীর মাধ্যমে, ওলীগণের ইলহামের মাধ্যমে এবং গণক ও জ্যোতিষিগণের নিজস্ব গণনা বা অন্য কোন স্বাভাবিক কারণের মাধ্যমে অর্জিত হয় তবে তা ইলমে গায়েব বা অদৃশ্য জ্ঞান নয় বরং অদৃশ্য বার্তা (انباء الغيب)---যা আংশিকভাবে কোন ব্যক্তিগত ব্যাপারে কারো অর্জিত হয়ে যাওয়া উল্লেখিত আয়াতের পরিপন্থী নয়। কেননা, এ আয়াতের সারমর্ম এই যে, সমগ্র সৃষ্টি ও যাবতীয় অবস্থা সম্পর্কিত এ পাঁচ বস্তুর পরিপূর্ণ জ্ঞান আল্লাহ্ পাক কাউকে ওহী বা ইলহামের মাধ্যমে প্রদান করেন নি। ইলহামের মাধ্যমে কোন এক-আধটা ঘটনা প্রসংগে আংশিক জ্ঞানলাভ, এর পরিপন্থী নয়।

ইলমে গায়েব বা অদৃশ্য জ্ঞান সম্পর্কে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য : বরেণ্য ওস্তাদ শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা শাব্বীর আহমদ ওসমানী (র) তাঁর তফসীরের সংশ্লিষ্ট টীকায় এক সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপক অর্থ ও তাৎপর্যবহ তথ্য প্রকাশ করেছেন। যদ্দ্বারা উল্লিখিত সব ধরনের প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে যায়। তা এই যে, গায়েব দু'প্রকারের। (এক) অদৃশ্য নির্দেশাবলী, যথা শরীয়তের নির্দেশাবলী, আল্লাহ্ পাকের যাত ও সিফত, সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কিত জ্ঞানও এর অন্তর্গত, যাকে ইলমে আকায়েদ বলা হয়। আর শরীয়তের সেসব নির্দেশা যেগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ্ পাকের কোন কোন্ কাজ পছন্দ-নীয়, কোন্গুলো অপছন্দনীয়, তা জানা যায়---এসব বস্তু গায়েব বা অদৃশ্যই বটে।

দ্বিতীয় প্রকার : —اكوان غيبية (অদৃশ্য ঘটনাবলী) অর্থাৎ ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য ঘটনাবলী সংশ্লিষ্ট জ্ঞান। প্রথম শ্রেণীভুক্ত অদৃশ্য বস্তুসমূহের জ্ঞান হক তা'আলা নবী ও রসূলগণ (স)-কে প্রদান করেছেন, যার উল্লেখ কোরআনে করীমে এরূপভাবে রয়েছে : —فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ —অর্থাৎ আল্লাহ্ পাকের মনোনীত ও পছন্দনীয় রসূল ব্যতীত অন্য কেহ তাঁর গোপনীয় ও অদৃশ্য তথ্যাদি সম্পর্কে অবহিত হতে পারে না।

দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ اكوان غيبية (ভবিষ্যতে অনুষ্ঠিতব্য ঘটনাবলী) ---এর পূর্ণ জ্ঞান তো হক তা'আলা কাউকে প্রদান করেন না---তা সম্পূর্ণভাবে সেই মহান সত্তার সাথে নির্দিষ্ট। কিন্তু বিশেষ বিশেষ ঘটনার আংশিক জ্ঞান যখন এবং যতটুকু চান প্রদান করেন। এরূপভাবে মূল অদৃশ্য জ্ঞান তো পুরোপুরিই আল্লাহ্র জন্য নির্দিষ্ট। অনন্তর তিনি নিজ অদৃশ্য ও গোপনীয় জ্ঞান হতে অদৃশ্য নির্দেশাবলীর জ্ঞানতত্ত্ব সম্পর্কে ওহীর মাধ্যমে নবীগণ (সা)-কে তো স্বাভাবিকভাবেই অবহিত করেন। তাঁদের প্রেরণের উদ্দেশ্যও এটাই। اكوان غيب (ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য ঘটনাবলীর) আংশিক জ্ঞানও যতটুকু আল্লাহ্ পাক চান নবী ও ওলীগণকে ওহী ও ইলহামের মাধ্যমে প্রদান করেন। যা আল্লাহ্ পাকের পক্ষ থেকে প্রদত্ত বলে একে ইল্মে গায়েব বা অদৃশ্য জ্ঞান বলা চলে না---বরং গোপন বার্তা (انباء الغيب) বলা হয়।

আয়াতের শব্দাবলী সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি ঃ এ আয়াতে পাঁচ বস্তুর জ্ঞান হক তা'আলার জন্য নির্দিষ্ট থাকার কথা বিশেষ গুরুত্বসহ বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য। সুতরাং পাঁচ বস্তুকে একই শিরোনামভুক্ত করে এগুলোর জ্ঞান মহান আল্লাহ্‌রই জন্য নির্দিষ্ট করে অন্য কোন সৃষ্টির এ জ্ঞান নেই—এ কথা বলে দেওয়াই বাহ্যত বাঞ্ছনীয় ছিল বলে মনে হয়। কিন্তু উল্লিখিত আয়াতে এমনটি করা হয়নি। বরং প্রথম তিন বস্তুর জ্ঞান তো ইতিবাচকভাবে আল্লাহ্ পাকের জন্যই নির্দিষ্ট থাকার কথা বর্ণনা করা হয়েছে ও অপর দু'বস্তু সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক ব্যতীত অন্য কারো কোন জ্ঞান নেই বলে বর্ণনা করা হয়েছে। আবার প্রথম তিন বস্তুর মধ্য হতে কিয়ামতের বর্ণনা এরূপভাবে করা হয়েছে ঃ—إِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ অর্থাৎ কিয়ামতের তথ্য কেবল আল্লাহ্ পাকেরই জানা রয়েছে। দ্বিতীয় বস্তুর বর্ণনা শিরোনাম পাল্‌টিয়ে ক্রিয়াবাচক বাক্যে এরূপভাবে করা হয়েছে ঃ—يُنَزِّلُ الْغَيْثَ অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক বৃষ্টি বর্ষণ করেন। এখানে বৃষ্টি সম্পর্কিত জ্ঞানের কোন উল্লেখই নেই বরং এখানে অবতরণ করার উল্লেখ রয়েছে। তৃতীয় বস্তুর বর্ণনা আবার শিরোনাম পাল্‌টিয়ে এরূপভাবে করা হয়েছে ঃ وَيَعْلَمُ مَا فِى الْأَرْحَامِ শিরোনামের এরূপ পরিবর্তন বাক্য বিন্যাসের এক প্রকার রীতিও বলা যেতে পারে। গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে আরো কিছু অভিনব তত্ত্ব ও তাৎপর্য পরিলক্ষিত হবে, যা হযরত থানবী (র) 'বয়ানুল কোরআনে' বর্ণনা করেছেন। এর সংক্ষিপ্তসার এই যে, শেষোক্ত দু'বস্তু অর্থাৎ আগামীকাল মানুষ কি উপার্জন করবে এবং সে কোন্ স্থানে মৃত্যুবরণ করবে যা মানুষের নিজ সত্তা-সংশ্লিষ্ট ব্যাপার, মানুষের এগুলোর জ্ঞান অর্জন করার সম্ভাবনা হয়তো থাকতে পারতো। এ সম্ভাবনা অপনোদনের উদ্দেশ্যে এ দুয়ের ক্ষেত্রে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো কোন জ্ঞান নেই বলে বিশেষভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। যদ্দ্বারা প্রথম তিন বস্তুর জ্ঞান ও তথ্য আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো না থাকার কথা অতি উত্তমভাবে প্রমাণিত হয়ে গেছে। কেননা যখন মানুষ নিজ কার্যাবলী ও উপার্জনাদি এবং নিজ পরিণতি অর্থাৎ মৃত্যু ও মৃত্যুস্থল সম্পর্কে কিছু জানে না, তখন আকাশ, বৃষ্টি বর্ষণ ও মাতৃগর্ভের গভীর অন্ধকারে প্রচ্ছন্ন ভ্রূণ সম্পর্কে জানতে সক্ষম হবে কি? সর্বশেষ বস্তুতে কেবল মৃত্যুস্থল সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান না থাকার কথা বলা হয়েছে। অথচ মৃত্যুস্থলের ন্যায় মৃত্যুক্ষণও মানুষের জানা নেই। কারণ এই যে, মৃত্যুস্থল নির্দিষ্টভাবে জানা না থাকলে বাহ্যিক অবস্থাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে মানুষ এ সম্পর্কে কিছুটা অনুধাবন করতে পারে যে, সে যেখানে বসবাস করছে সেখানেই মৃত্যুবরণ করবে। অন্তত যে স্থানে মারা যাবে সে স্থানটি দুনিয়াতে তো বিদ্যমান আছে। পক্ষান্তরে মৃত্যুক্ষণ যা অনাগত ভবিষ্যৎকাল; এখনো অস্তিত্ব

পর্যন্ত লাভ করেনি। সুতরাং যে ব্যক্তি মৃত্যুস্থান কার্যত বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তা জানে না, তার সম্পর্কে এরূপ ধারণা কিভাবে করা যেতে পারে যে, মৃত্যুক্ষণ যার এখনো অস্তিত্বও নেই তা সে জেনে নিতে সক্ষম হবে।

মোটকথা এখানে এক বস্তুর নিষেধের সাথে সাথে অপর বস্তুসমূহের নিষেধও অতি উত্তমভাবে বোধগম্য হয়ে যায়। তাই এ দু'বস্তুকে নেতিবাচক শিরোনামে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথমোক্ত তিন বস্তু প্রকাশ্যতই মানুষের নাগালের বাইরে বলে তাতে মানুষের জ্ঞানের কোন অধিকার না থাকাটাই সুস্পষ্ট। এ জন্য এক্ষেত্রে হাঁ-সূচক শিরোনাম অবলম্বন করে সেগুলো হক তা'আলারই জন্য নির্দিষ্ট বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

এগুলোর মধ্যে প্রথম বাক্য বিশেষ্যবাচক ও পরবর্তী দু'বাক্য ক্রিয়াবাচক বাক্য-রূপে ব্যবহার করার মধ্যে সম্ভবত এ প্রজ্ঞা ও তাৎপর্য নিহিত রয়েছে যে, কিয়ামত তো এক সুনির্দিষ্ট বিষয়---এতে কোন নতুনত্ব নেই। পক্ষান্তরে সন্তান ধারণ ও বৃষ্টি বর্ষণের বিষয়টা ঠিক এমনটি নয়---এতে নতুনত্ব ও অভিনবত্ব আরোপিত হতে থাকে। কিন্তু ক্রিয়াবাচক বাক্য নতুনত্ব প্রকাশ করে। এজন্যই ইহাকে উভয় স্থানেই ব্যবহার করা হয়েছে। আবার এ দুয়ের মধ্যেও হামলের (সন্তান ধারণ) ক্ষেত্রে তো আল্লাহ্ পাকের ইলমের উল্লেখ রয়েছেঃ وَيَعْلَمُ مَا فِى الْأَرْحَامِ (অর্থাৎ মাতৃগর্ভে কি রয়েছে তা তিনিই জানেন) এবং বৃষ্টি বর্ষণের ক্ষেত্রে ইলমের উল্লেখ নেই। এর কারণ এই যে, এখানে বৃষ্টি বর্ষণের কথা উল্লেখ করে আনুষঙ্গিকভাবে এও ব্যক্ত করে দেওয়া হয়েছে যে, বৃষ্টির সাথে মানবজাতির অগণিত কল্যাণ ও উপকার বিজড়িত, তা মহান আল্লাহ্ কর্তৃকই বর্ষিত হয়। এতে অন্য কারো কোন কর্তৃত্ব বা ভূমিকা নেই। অতএব এ সম্পর্কিত জ্ঞান বাক্যের বর্ণনাভংগী থেকেই প্রমাণিত হয়।

সূরা সাজদাহ্

মক্কায় অবতীর্ণ, ৩ রুকূ, ৩০ আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓمّٓ ۝١ تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝٢ اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ۚ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ اَتٰىهُمْ مِّنْ نَّذِيْرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ ۝٣

পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা'আলার নামে আরম্ভ।

(১) আলিফ-লাম-মীম, (২) এ কিতাবের অবতরণ বিশ্বপালনকর্তার নিকট থেকে এতে কোন সন্দেহ নেই। (৩) তারা কি বলে, এটা সে মিথ্যা রচনা করেছে? বরং এটা আপনার পালনকর্তার তরফ থেকে সত্য, যাতে আপনি এমন এক সম্প্রদায়কে সতর্ক করেন, যাদের কাছে আপনার পূর্বে কোন সতর্ককারী আসেনি। সম্ভবত এরা সুপথ প্রাপ্ত হবে।

তফসীরের সার সংক্ষেপ

আলিফ-লাম-মীম (যার অর্থ আল্লাহ্ পাকই জানেন)। এটা অবতরিত গ্রন্থ (এবং) এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। (এবং) এটা বিশ্বজগতের পালনকর্তার পক্ষ হতে অবতীর্ণ হয়েছে। (যেমন এ গ্রন্থের অলৌকিকত্ব ও অনন্যতার প্রমাণ এ গ্রন্থ স্বয়ং। অবিশ্বাসী) লোকেরা কি এরূপ কথা বলে যে, এ গ্রন্থ পয়গম্বর (সা)-এর স্বকপোল কল্পিত রচনা (অর্থাৎ এরূপ উক্তি সম্পূর্ণ অমূলক ও মিথ্যা—ইহা মানব রচিত নয়) বরং ইহা আপনার পালনকর্তার নিকট থেকে (আগত) সম্পূর্ণ সত্য গ্রন্থ ----যেন আপনি (এর মাধ্যমে) সেসব লোকদের (আল্লাহ্র শাস্তি সম্পর্কে) ভীতি প্রদর্শন করেন যাদের নিকটে আপনার পূর্বে কোন ভয় প্রদর্শনকারী আগমন করেন নি।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

مَا أَتٰهُم مِّن نَّذِيرٍ এখানে نَذِير ---ভয়প্রদর্শক বলে রসূলকে বোঝানো হয়েছে। যার মর্ম এই যে, মহানবী হযরত (সা)-এর পূর্বে মক্কার কুরায়শগণের নিকট কোন নবী আগমন করেন নি। কিন্তু এ দ্বারা এ কথা বোঝায় না যে, এ পর্যন্ত নবীগণের দাওয়াতও তাদের নিকট পৌঁছেনি। কেননা, কোরআন করীমের অপর এক আয়াতে স্পষ্টভাবে ইরশাদ হয়েছে যে, وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ— অর্থাৎ দুনিয়াতে এমন কোন সম্প্রদায় নেই, যার মাঝে আল্লাহ্ পাক সম্পর্কে কোন ভয়প্রদর্শক এবং তাঁর পক্ষ থেকে কোন দাওয়াত প্রদানকারীর আগমন হয়নি।

এ আয়াতে نَذِير—শব্দটি সাধারণ আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে অর্থাৎ আল্লাহ্ পাকের প্রতি আহবানকারী, চাই তিনি রসূল ও পয়গম্বর হোন বা তাদের কোন প্রতিনিধি বা ধর্মীয় আলিম হোন। এ আয়াত দ্বারা সকল সম্প্রদায় ও দল-সমূহের নিকটে তওহীদের দাওয়াত পৌঁছে গেছে বলে বোঝা যায়। একথা স্বস্থানে সম্পূর্ণ ঠিক এবং আল্লাহ্ পাকের সর্বব্যাপী করুণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যেমন ইমাম আবূ হাইয়্যান বলেন যে, তওহীদ ও ঈমানের দাওয়াত কোন কালে, কোন স্থানে এবং কোন সম্প্রদায়ে কখনো ছিন্ন ও ক্ষুন্ন হয়নি। যখনি এক নবুয়তের উপর দীর্ঘ-কাল অতিবাহিত হওয়ার পর সেই নবুয়ত ভিত্তিক জ্ঞানের অধিকারী আলিমগণ নিতান্ত নগণ্য সংখ্যক হয়ে পড়তেন, তখনি অপর নবী বা রসূল প্রেরিত হতেন। এ দ্বারা এ কথা বোঝা যায় যে, আরব সম্প্রদায়সমূহের মধ্যেও সম্ভবত তওহীদের দাওয়াত পূর্ব থেকেই অবশ্য পেঁ ৗছেছিল। কিন্তু এজন্য এটা আবশ্যক নয় যে, এ দাওয়াত স্বয়ং কোন নবী বা রসূল বহন করে এনেছিলেন---হতে পারে তাঁদের প্রতিনিধি আলিম-গণের মাধ্যমে পৌঁছেছিল ; সুতরাং এ সূরা এবং সূরায়ে ইয়াসিন ও অন্যান্য সূরার যেসব আয়াত দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয় যে, আরবের কুরায়শ গোত্রে তাঁর পূর্বে কোন نَذِير (ভয়প্রদর্শক) আগমন করেন নি, তখন نَذِير বলতে এর পারিভাষিক তথ্যানুযায়ী নবী-রসূলকেই বোঝাবে এবং অর্থ এই হবে যে, এ সম্প্রদায়ে অপনার পূর্বে কোন রসূল বা নবী আগমন করেন নি। যদিও অন্যান্য উপায়ে তওহীদ ও ঈমানের দাওয়াত এখানেও পেঁ ৗছেছিল।

রসূলুল্লাহ্ (স)-র প্রেরণের পূর্বে বহু ব্যক্তি সম্পর্কে এ কথা প্রমাণিত হয়েছে যে, তাঁরা ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ)-এর দীনের (জীবন বিধান) উপর অবস্থিত ছিলেন। তওহীদের (একত্ববাদ) প্রতি তাদের ঈমান ছিল। প্রতিমা পূজা করতে ও প্রতিমার নামে কোরবানী করতে তাঁরা ঘৃণা প্রকাশ করতেন।

রূহুল মা'আনীতে মূসা বিন ওক্‌বা হতে এ রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে যে, ওমর বিন নুফায়েল যিনি মহানবী হযরত (সা)-এর নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বে তাঁর সাথে সাক্ষাতও করেছিলেন। কিন্তু নবুয়ত লাভের পূর্বে তাঁর ইন্তেকাল ঐ সালে হয়, যে সালে কুরায়শগণ বায়তুল্লাহ্ পুনঃ নির্মাণ করেন এবং এটা তাঁর নবুয়ত লাভের পাঁচ বছর পূর্বের ঘটনা।—মূসা বিন ওকবাহ তাঁর সম্পর্কে এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, তিনি কুরায়শদেরকে প্রতিমা পূজা থেকে বিরত রাখতেন এবং প্রতিমার নামে কোরবানী করাকে গর্হিত ও অশোভন বলে মন্তব্য করতেন। তিনি পৌত্তলিকদের জবাইকৃত জন্তুর গোশত খেতেন না।

আবু দাউদ তায়ালেসী উমর বিন নুফায়েল-তনয় হযরত সায়ীদ বিন উমর (রা) হতে (যিনি আশারায়ে-মুবাশশারাহভুক্ত সাহাবী ছিলেন) এ রেওয়ায়েত করেছেন যে, তিনি নবীজির খেদমতে আরয করেছিলেন, আমার পিতার অবস্থা আপনি জানেন যে তিনি তওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন—প্রতিমা পূজার প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করতেন। এমতাবস্থায় আমি তাঁর মাগফিরাতের জন্য দোয়া করতে পারি কি? রসূলুল্লাহ্ (সা) ফরমান যে হ্যাঁ, তাঁর মাগফিরাত কামনা করে দোয়া করা জায়েয। তিনি কিয়ামতের দিন এক স্বতন্ত্র উম্মতরূপে উঠবেন।—(রূহুল)

অনুরূপভাবে ওরাকা বিন নাওফেল যিনি হুযূর (সা)-র নবুয়ত প্রাপ্তির প্রারম্ভিক স্তরে এবং কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার সূচনা পর্বে বর্তমান ছিলেন—তিনি তওহীদের উপরই বিশ্বাস রাখতেন এবং রসূলুল্লাহ্‌কে (সা) দীন প্রচারে সাহায্য করতে সংকল্প প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু অনতিবিলম্বেই তিনি পরলোকগমন করেন। এসব ঘটনা প্রমাণ করে যে, আরব জাতিসমূহ আল্লাহ্‌র তওহীদ ও ঈমানের দাওয়াত থেকে তো বঞ্চিত ছিলেন না। কিন্তু তাদের মাঝে কোন নবীর আবির্ভাব ঘটেনি। আল্লাহ্ পাকই ভাল জানেন। এ তিন আয়াত—কোরআন যে সত্য এবং রসূলুল্লাহ্ যে প্রকৃত নবী তা প্রমাণ করে।

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ
ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ؕ مَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّلِىٍّ وَّلَا
شَفِيْعٍ ؕ اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ ۝ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ مِنَ السَّمَآءِ اِلَى
الْاَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ اِلَيْهِ فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗۤ اَلْفَ سَنَةٍ
مِّمَّا تَعُدُّوْنَ ۝ ذٰلِكَ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۝

الَّذِىٓ اَحْسَنَ كُلَّ شَىْءٍ خَلَقَهٗ وَبَدَاَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِيْنٍ ۝ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهٗ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِيْنٍ ۝ ثُمَّ سَوّٰىهُ وَنَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِهٖ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ۝

(৪) আল্লাহ্, যিনি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি আরশে বিরাজমান হয়েছেন। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন অভিভাবক ও সুপারিশকারী নেই। এরপরও কি তোমরা বুঝবে না? (৫) তিনি আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত সমস্ত কর্ম পরিচালনা করেন, অতপর তা তাঁর কাছে পৌঁছবে এমন এক দিনে, যার পরিমাণ তোমাদের গণনায় হাজার বছরের সমান। (৬) তিনিই দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী, পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু, (৭) যিনি তাঁর প্রত্যেকটি সৃষ্টিকে সুন্দর করেছেন এবং কাদামাটি থেকে মানব সৃষ্টির সূচনা করেছেন। (৮) অতপর তিনি তার বংশধর সৃষ্টি করেন তুচ্ছ পানির নির্যাস থেকে। (৯) অতপর তিনি তাকে সুষম করেন, তাতে রূহ্ সঞ্চার করেন এবং তোমাদেরকে দেন কর্ণ, চক্ষু ও অন্তঃকরণ। তোমরা সামান্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তিনিই আল্লাহ্—যিনি ভূ-মণ্ডল ও নভোমণ্ডল এবং উভয়ের মধ্যস্থিত যাবতীয় সৃষ্ট বস্তু ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অনন্তর (রাজ সিংহাসন সদৃশ) আরশের উপর (যেরূপ তাঁর মান ও মহান মর্যাদা উপযোগী সেরূপভাবে) সুপ্রতিষ্ঠিত (ও বিকশিত) হয়েছেন। (তিনি এমন মহান যে তাঁর সম্মতি ও অনুমোদন) ব্যতীত কোন সাহায্য-কারী ও সুপারিশকারী থাকবে না। (অবশ্য তাঁর অনুমতি সাপেক্ষে সুপারিশ কার্যকর হতে পারে কিন্তু সাহায্যের সাথে অনুমতি সংশ্লিষ্ট থাকবে না) সুতরাং তোমরা কি অনুধাবন কর না (যে এমন মহান সত্তার কোন শরীক হতে পারে না) তিনি (এমন যে) আকাশ হতে পৃথিবী পর্যন্ত (যত কিছু আছে) সব কিছুর পরিকল্পনা (ও ব্যবস্থাপনা) তিনিই করেন। অতপর প্রত্যেক বস্তু তাঁর সমীপে এমন একদিন পেঁৗছে যাবে, তোমাদের গণনানুসারে যার পরিমাণ এক হাজার বছরের সমান হবে (অর্থাৎ কিয়ামতের দিন যাবতীয় বস্তু এবং তৎসংশ্লিষ্ট সব কিছু তাঁর সমীপে উপস্থিত হবে—যেমন আল্লাহ্ পাক ফরমান—وَاِلَيْهِ يُرْجَعُ الْاَمْرُ كُلُّهٗ অর্থাৎ, তাঁর সমীপেই সব কিছু

ফিরে যাবে।) তিনিই অদৃশ্য ও প্রকাশ্য বস্তুর (তথ্যাদি) সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞাত,—মহা পরাক্রান্ত ও পরম করুণাময়। তিনি যাবতীয় সৃষ্ট বস্তু অত্যন্ত নিপুণভাবে সৃষ্টি করেছেন (অর্থাৎ যে উদ্দেশ্যে সেগুলো সৃষ্টি করেছেন সম্পূর্ণভাবে তার উপযোগী করেই সৃষ্টি করেছেন) এবং মানব [অর্থাৎ হযরত আদম (আ)] সৃষ্টির সূচনা করেছেন মাটি দিয়ে। তৎপর তুচ্ছ পানির সারাংশ —(অর্থাৎ বীর্য) থেকে মানবের (অর্থাৎ আদম (আ)-এর বংশধর সৃষ্টি করেছেন। অনন্তর (মাতৃগর্ভে) তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুসংগঠিত করেছেন এবং তন্মধ্যে নিজ (পক্ষ) থেকে আত্মা ফুৎকার করে দিয়েছেন। এবং (ভূমিষ্ট হওয়ার পর) তোমাদেরকে কান, চোখ ও অন্তঃকরণসমূহ (অর্থাৎ বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয়বিধ অনুধাবন যন্ত্র) প্রদান করেছেন—(এবং তাঁর অসীম ক্ষমতা ও কৃপা নির্দেশক এসব বস্তুসমূহের স্বাভাবিক দাবি এটাই, যেন তোমরা আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর—যার সর্বোচ্চ রূপ হলো তওহীদ কিন্তু) তোমরা অত্যল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাক (অর্থাৎ মোটেও কর না)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

কিয়ামত দিবসের দৈর্ঘ্য : فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ

অর্থাৎ সেদিনের পরিমাণ তোমাদের গণনানুসারে এক হাজার বছর এবং সূরায়ে 'মা'আরিজের আয়াতে রয়েছে :— فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ

অর্থাৎ সেদিনের পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর হবে।

এর এক সহজ উত্তর তো এই—যা 'বয়ানুল-কোরআনে' উল্লেখ করা হয়েছে যে, সেদিনটি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর হবে বলে মানুষের নিকট অতিশয় দীর্ঘ মনে হবে। এরূপ দীর্ঘানুভূতি নিজ নিজ ঈমান ও আমলানুপাতে হবে। যারা বড় অপরাধী তাদের নিকট দীর্ঘ এবং যারা কম অপরাধী তাদের নিকট কম দীর্ঘ বলে বোধ হবে। এমনকি সেদিন কতক লোকের নিকট এক হাজার বছর বলে মনে হবে আবার সেদিনটি অন্যদের নিকট পঞ্চাশ হাজার বছর বলে মনে হবে।

তফসীরে রূহুল মা'আনীতে ওলামা ও সূফীগণ কর্তৃক উক্ত আয়াতের আরো কয়েকটি ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু তা সবই কাল্পনিক ও অনুমান প্রসূত। কোনটাই কোরআনের মর্মভিত্তিক বা বিশ্বাসযোগ্য নয়। সুতরাং সলফে সালেহীন—সাহাবায়ে কিরাম ও তাবিয়ীন কর্তৃক অনুসৃত পদ্ধতিই সর্বাধিক বিশুদ্ধ ও নিরাপদ—তা হলো, তাঁরা পঞ্চাশ ও একের এ পার্থক্য আল্লাহ্ পাকের জ্ঞান ও অবগতির উপরই ছেড়ে দিয়েছেন এবং এ তত্ত্ব তাঁদের জানা নেই, একথা বলেই ক্ষান্ত হয়েছেন।

এ সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন : هما يوما ن ذكرهما الله تعالى فى كتابه الله تعالى اعلم بهما واكره ان اقول فى كتاب

যে, তোমরা সবাই জান যে, মক্কার কুরায়শ হোক বা আমাদের গাতফান গোত্র হোক বা অন্যান্য ইহুদী গোত্র হোক---এদের কারো মাতৃভূমি বা দেশ এটা নয়। যদি তারা পরাজিত হয়ে পালিয়ে যায় তবে তাদের কোন ক্ষতি নেই, কিন্তু তোমাদের ব্যাপারটা তাদের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, মদীনা তোমাদের মাতৃভূমি, তোমাদের পরিবার-পরিজন, ধনসম্পদ সবই এখানে। যদি তোমরা তাদের পক্ষ নিয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ কর---পরিণামে যদি এরা পরাজিত হয়ে পালিয়ে যায়, তবে তোমাদের কি গতি হবে? তোমরা মুসলমানদের সাথে মুকাবিলা করে টিকে থাকতে পারবে কি? তাই আমি তোমাদের হিতাকাঙক্ষী হয়ে এ পরামর্শ দিচ্ছি যে, যে পর্যন্ত এরা তাদের কিছুসংখ্যক বিশিষ্ট নেতাকে তোমাদের নিকটে যিম্মি হিসাবে না রাখে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করো না---যাতে তারা তোমাদেরকে মুসলমানদের মুখোমুখি ঠেলে দিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম না হয়। তাঁর এ পরামর্শ বনূ কুরায়যার বেশ মনঃপূত হলো এবং যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়ে তারা বলল যে, আপনি উত্তম পরামর্শ দিয়েছেন।

অতপর নুয়াইম (রা) কুরায়শ দলপতিদের নিকটে যান এবং তাদের বলেন যে, আপনারা জানেন যে, আমি আপনাদের আন্তরিক বন্ধু এবং মুহাম্মদ (সা)-এর সংগে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমি একটা সংবাদ পেলাম---আপনাদের একান্ত সুহৃদ বলে এ সম্পর্কে আপনাদেরকে অবহিত করা আমার বিশেষ কর্তব্য। অবশ্যই আপনারা আমার নাম প্রকাশ করতে পারবেন না। সংবাদটি এই যে, বনূ কুরায়যা আপনাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার পর এরূপ সিদ্ধান্তের জন্য তারা অনুতপ্ত এবং তারা মুহাম্মদ (সা)-কে এ সম্পর্কে এই বলে অবহিত করে দিয়েছে যে, আপনারা কি আমাদের এ শর্তে সম্মতি প্রদান করতে পারেন যে, আমরা কুরায়শ ও গাতফান গোত্রের কতিপয় নেতাকে এনে আপনাদের হাতে তুলে দেব আপনারা তাদেরকে হত্যা করবেন, অতপর আমরা আপনাদের সাথে একত্রিত হয়ে এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হব। মুহাম্মদ (সা) তাদের এ প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন। এখন বনূ কুরায়যা যিম্মি হিসাবে আপনাদের কিছু সংখ্যক নেতাকে তাদের নিকটে সমর্পণ করার জন্য দাবি পেশ করতে যাচ্ছে। এখন আপনাদের ব্যাপার---নিজেরা ভালভাবে ভেবেচিন্তে দেখুন।

অতপর নুয়াইম (রা) নিজের গোত্র বনূ গাতফানের নিকট গেলেন এবং তাদেরকেও এ সংবাদই শোনালেন। এর সাথে সাথেই আবূ সুফিয়ান কুরায়শদের পক্ষ থেকে ইকরামা বিন আবূ জেহেলকে এবং বনূ গাতফানের পক্ষ থেকে ওয়ার্‌কা বিন্ গাতফানকে এ কাজের জন্য নিযুক্ত করলো যে, তারা বনূ কোরায়যার নিকট গিয়ে একথা বলবে যে, আমাদের যুদ্ধোপকরণ নিঃশেষ হওয়ার পথে এবং আমাদের লোক অবিরাম যুদ্ধের কারণে ক্লান্ত ও নিরুৎসাহিত হয়ে পড়ছে---আমরা চুক্তি অনুসারে আপনাদের সাহায্য ও যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য প্রতীক্ষারত। উত্তরে বনূ কোরায়যা বলল, যে পর্যন্ত তোমাদের উভয় গোত্রের কিছু সংখ্যক নেতাকে যিম্মি হিসাবে আমাদের হাতে সমর্পণ না করা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবো না। ইকরামা ও ওয়ার্‌কা এ সংবাদ আবূ সুফিয়ানের নিকট পেঁৗছালে পর গাতফান ও কুরায়শ নেতৃবৃন্দ পূর্ণভাবে

বিশ্বাস করলো যে, নুয়াইম বিন মাসুদ (রা)-এর প্রদত্ত সংবাদ সম্পূর্ণ ঠিক। তারা বনূ কুরায়যার নিকট সংবাদ পাঠিয়ে দিল যে, আমাদের কোন লোক আপনাদের হাতে সমর্পণ করা যাবে না। এখন মনে চাইলে আপনারা আমাদের সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করুন আর না চাইলে না করুন। এ অবস্থা দেখে হযরত নুয়াইম প্রদত্ত সংবাদের উপর বনূ কুরায়যার বিশ্বাস আরো দৃঢ় ও ঘনীভূত হল। এরূপভাবে আল্লাহ্ শত্রু পক্ষের এক ব্যক্তির মাধ্যমে তাদের পরস্পরের মধ্যে বিভেদ ও ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি করে তাদেরকে বিচ্ছিন্ন ও দুর্বল করে দেন।

তদুপরি তাদের উপর আকাশ থেকে এই বিপদ ও বিপর্যয় নেমে এলো যে, এক প্রচণ্ড বায়ু তাদের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে তাদের তাঁবুগুলো ভূলুণ্ঠিত করে দিল—চুলোর হাঁড়ি-পাতিল পর্যন্ত উড়িয়ে নিয়ে গেল। তাদেরকে মূলোৎপাটিত ও ছিন্নভিন্ন করার জন্য এগুলো তো ছিল আল্লাহ্ পাকের বাহ্যিক মাধ্যম ও উপকরণ। তদুপরি অভ্যন্তরীণভাবে তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চারের জন্য আল্লাহ্ পাক তদীয় ফেরেশতা-মণ্ডলীকে প্রেরণ করেন। উল্লিখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ্ পাকের এই উভয়বিধ সাহায্যের বর্ণনা এরূপভাবে দেওয়া হয়েছে ঃ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَّجُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا

অর্থাৎ অতপর আমি তাদের উপর দিয়ে প্রচণ্ড বায়ু প্রবাহিত করে দেই এবং এমন এক সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে দেই, যা তোমাদের দৃষ্টিগোচর ছিল না। এর ফলে তাদের পক্ষে পালিয়ে যাওয়া ব্যতীত অন্য কোন পথ ছিল না।

হযরত হুযায়ফা (রা)-র শত্রু সৈন্যের মাঝে গমন ও খবর নিয়ে আসার ঘটনা ঃ অপর দিকে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নিকট হযরত নুয়াইম (রা) অনুসৃত ভূমিকা ও কার্য বিবরণ এবং শত্রু বাহিনীর মাঝে বিভেদ সৃষ্টিজনিত ঘটনাবলীর সংবাদ পৌঁছুলে পর তিনি নিজেদের কোন লোক পাঠিয়ে শত্রুপক্ষের অবস্থা ও তাদের গতিবিধি সম্পর্কে সঠিক তথ্য সংগ্রহের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। কিন্তু শত্রুদের উদ্দেশে প্রেরিত সেই প্রচণ্ড হিম বায়ুর প্রভাব সমগ্র মদীনার উপর ছড়িয়ে পড়েছিল। মুসলমানগণও এই ঠাণ্ডায় কাতর হয়ে পড়েন। রাত্রিকাল সাহাবায়ে কিরাম সারাদিনের কঠোর পরিশ্রম ও শত্রুর মুকাবিলার ফলে ক্লান্ত ও অবসন্ন শরীরে প্রচণ্ড শীতের দরুন জড়সড় হয়ে বসে আছেন। সমবেত জনমণ্ডলীকে সম্বোধন করে রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন যে, শত্রুপক্ষের মধ্য থেকে তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে কেউ যাওয়ার জন্য প্রস্তুত আছে কি, যার বিনিময়ে আল্লাহ্ পাক তাকে জান্নাত প্রদান করবেন, উৎসর্গিত প্রাণ সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর সমাবেশ—কিন্তু অবস্থা এমন অপারক করে রেখেছিল যে, কেউ দাঁড়াতে সাহস পাচ্ছিলেন না। রসূলুল্লাহ্ (সা) নামাযে আত্মনিয়োগ করলেন। কিছুক্ষণ নামাযে লিপ্ত থাকার পর আবার জনমণ্ডলীকে সম্বোধন করে বললেন ঃ শত্রু সৈন্যদের মধ্য থেকে তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করার জন্য দাঁড়াতে পারে এমন কেউ আছে কি ?—প্রতিদানে আল্লাহ্ পাক তাকে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন ; এবার

গোটা সমাবেশ সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ। কেউ দাঁড়ালেন না। হুযূর (সা) আবার নামাযে দাঁড়ালেন, খানিকটা পরে তৃতীয়বারও একই রকম সম্বোধন করলেন, যে এ কাজ করবে সে আমার সাথে বেহেশতে অবস্থান করবে। কিন্তু সমবেত জনমণ্ডলী সারাদিনের প্রাণান্তকর পরিশ্রম, উপরের প্রচণ্ড শীত এবং কয়েক বেলা থেকে অভুক্ত থাকার দরুন এমন কাতর ও অবসন্ন হয়ে পড়েছিলেন যে, কেউ সাহসে ভর করে দাঁড়াতে পারছিলেন না।

হাদীসের বর্ণনাকারী হযরত হোযায়ফা বিন ইয়ামান (রা) বলেন ঃ অতপর রসূলুল্লাহ্ (সা) আমার নাম ধরে বললেন যে, তুমি যাও। আমার অবস্থাও অন্য সকলের মতই ছিল। কিন্তু নাম ধরে আদেশ করার দরুন তা পালন করা ব্যতীত কোন উপায় ছিল না।—আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম ; কিন্তু প্রচণ্ড শীতে আমার শরীর থরথর করে কাঁপছিল। তিনি তাঁর হাত আমার মাথা ও মুখমণ্ডলে বুলিয়ে বললেন—শত্রু সেনাদের মাঝে গিয়ে কেবল সংবাদটা নিয়ে আমাকে দেবে এবং আমার নিকট ফিরে আসার আগে অন্য কোন কাজ করতে পারবে না। অতপর তিনি আমার নিরাপত্তার জন্য দোয়া করলেন। আমি তীর-ধনুক তুলে নিয়ে সমর সজ্জায় সজ্জিত হয়ে শত্রু শিবির অভিমুখে রওয়ানা করলাম।

এখান থেকে রওয়ানার পর এক বিস্ময়কর ঘটনা দেখতে পেলাম। তাঁবুতে অবস্থানকালে শরীরে যে কম্পন ছিল, তা বন্ধ হয়ে গেল। আর আমি এমনভাবে চলতে ছিলাম যেন কোন গরম গোসলখানার ভেতরে আছি। এভাবে আমি শত্রু সেনাদের মাঝে পৌঁছে গেলাম। দেখতে পেলাম যে, ঝড়ে তাদের তাঁবু উৎপাটিত হয়ে গেছে—হাঁড়িপাতিল উল্টে পড়ে আছে। আবূ সুফিয়ান আগুনের পাশে বসে তাপ নিচ্ছিল। তাকে এরূপ অবস্থায় দেখে আমি তীর-ধনুক প্রস্তুত করতে উদ্যত হলাম। এমন সময় হুযূরের সে আদেশ স্মরণ পড়ল যে, ওখান থেকে ফিরে আসার আগে অন্য কোন কাজ করবে না। আবূ সুফিয়ান একেবারে আমার নাগালের মধ্যে ছিল। কিন্তু হুযূরের ফরমানের পরিপ্রেক্ষিতে তীর ধনুক থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেললাম। আবূ সুফিয়ান অবস্থা বেগতিক দেখে ফিরে যাওয়ার মর্মে ঘোষণা দিতে চাচ্ছিল। কিন্তু এ সম্পর্কে বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গের সাথে পরামর্শের প্রয়োজন ছিল। নিথর নিস্তব্ধ গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রিতে তাদের মাঝে কোন গুপ্তচর অবস্থান করে তাদের সিদ্ধান্ত জেনে নিতে পারে এমন আশংকাও ছিল। তাই আবূ সুফিয়ান এরূপ হুঁশিয়ারি প্রদান করলেন যে, কথাবার্তা আরম্ভ করার পূর্বে উপস্থিত জনমণ্ডলীর প্রত্যেকে যেন নিজের সম্মুখবর্তী লোককে চিনে নেয়—যাতে বহিরাগত কোন লোক আমাদের পরামর্শ শুনতে না পায়।

হযরত হোযায়ফা (রা) বলেন ঃ এখন আমি প্রমাদ গুণতে লাগালাম যে, যদি আমার সম্মুখবর্তী লোক আমার পরিচয় জিজ্ঞেস করে তবে হয়ত আমি ধরা পড়ে যাব। তাই তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণতা ও সাহসিকতার সাথে নিজে অগ্রণী হয়ে নিজের

সম্মুখস্থ ব্যক্তির হাতের উপর হাত রেখে জিজ্ঞেস করলেন যে, তুমি কে ? সে বলল, আশ্চর্য ! তুমি আমাকে চিনতে পাচ্ছ না, আমি অমুকের ছেলে অমুক---সে হাওয়াযিন গোত্রের লোক ছিল। আল্লাহ্ পাক এভাবে হযরত হোযায়ফা (রা)-কে শত্রুর হাতে বন্দী হওয়া থেকে রক্ষা করলেন।

আবূ সুফিয়ান যখন এ সম্পর্কে স্থির নিশ্চিত হলেন যে, সমাবেশ তাদের নিজস্ব লোকদেরই---অপর কেউ নেই, তখন তিনি উদ্বেগজনক অবস্থাবলী, বনূ কোরায়যার বিশ্বাসঘাতকতা ও যুদ্ধ সামগ্রী নিঃশেষ হয়ে যাওয়া সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী বিবৃত করে বল-লেন যে, আমার মতে এখন আমাদের সকলের ফিরে যাওয়া উচিত। আমিও ফিরে চল্ছি। একথা বলার সাথে সাথেই সৈন্যদের মাঝে পালাও পালাও রব পড়ে গেল এবং সবাই ফিরে চল্লো।

হযরত হোযায়ফা (রা) বলেন যে, আমি যখন এখান থেকে ফিরে রওয়ানা কর-লাম, তখন এমন মনে হচ্ছিল যেন আমার আশেপাশেই কোন্ গরম গোসলখানা আমাকে ঠাণ্ডা থেকে বাঁচিয়ে রাখছে। ফিরে গিয়ে হুযূর (সা)-কে নামাযরত দেখতে পেলাম। সালাম ফেরানোর পর আমি তাঁর নিকট সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করার পর তিনি আনন্দে হেসে ফেললেন। এমনকি রাতের আঁধারেও তাঁর দাঁতগুলো চমকে উঠছিল। অতপর রসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে তাঁর পায়ের দিকে স্থান করে দিয়ে তাঁর গায়ে জড়ানো চাদরের একাংশ আমার গায়ের উপর জড়িয়ে দিলেন। আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। যখন ভোর হয়ে গেল তখন তিনি আমাকে এই বলে সজাগ করলেন---قم يا نومان হে ঘুমকাতুরে উঠ !

আগামীতে কাফিরদের মনোবল ভেংগে যাওয়ার সুসংবাদ : বুখারী শরীফে হযরত সুলায়মান বিন সারদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, আহ্যাব ফিরে যাওয়ার পর রসূলুল্লাহ্ (সা) ফরমান : الان نغزوهم ولا يغزوننا نحن نسير اليهم-بخارى এখন থেকে আমরাই আক্রমণ চালাবো, ওরা আক্রমণ করতে আর সাহসী হবে না। অদূর ভবিষ্যতে আমরা তাদের দেশে পৌঁছে যাব এবং অধিকার প্রতিষ্ঠা করব। এরূপ ইরশাদ করার পর রসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবায়ে কিরাম (রা)-সহ মদীনায় ফিরে আসেন এবং সুদীর্ঘ একমাস পর তাঁরা নিরস্ত্র হন।

প্রণিধানযোগ্য বিষয় : হযরত হোযায়ফা (রা)-সংশ্লিষ্ট এ ঘটনা মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে। ঘটনাটি বিশেষভাবে শিক্ষাপ্রদ।---নানাবিধ উপদেশাবলী এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বেশ কিছুসংখ্যক মু'জিযা এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। চিন্তাশীল সুধীবর্গ নিজে নিজেই তা অনুধাবন করে নিতে পারবেন---বিস্তারিতভাবে লেখার প্রয়োজন নেই।

বনূ কুরায়যার যুদ্ধ : রসূলুল্লাহ্ (সা) এবং সাহাবায়ে কিরাম মদীনায় পৌঁছার পর পরই হঠাৎ করে জিবরাঈল (আ) হযরত দাহ্ইয়ায়ে কালবীর আকৃতি ধারণ করে

তশরীফ আনেন এবং বলেন যে, যদিও আপনারা অস্ত্র-শস্ত্র খুলে রেখে দিয়েছেন---ফেরেশতাগণ কিন্তু তাদের অস্ত্র সংবরণ করেন নি। আল্লাহ্ পাক আপনাদেরকে বনী কোরায়যার উপর আক্রমণ করতে হুকুম করেছেন এবং আমি আপনাদের আগে আগে সেখানে যাচ্ছি।

রসূলুল্লাহ্ তাঁর এ নির্দেশ মদীনাবাসীদের মাঝে প্রচার করে দেওয়ার জন্য জনৈক সাহাবী (রা)-কে প্রেরণ করেন যে لا يصلين احد ن العصر الا فى بنى قريظة অর্থাৎ কোরায়যা গোত্রে না পৌঁছে তোমাদের কেউ যেন আসরের নামায না পড়ে।

সমস্ত সাহাবায়ে কিরাম তৎক্ষণাৎ দ্বিতীয় জিহাদের জন্য প্রস্তুত হয়ে বনূ কোরায়যা অভিমুখে রওয়ানা করেন। রাস্তায় আসরের সময় হলে পর কিছু সংখ্যক সাহাবায়ে কিরাম নবীজীর বাহ্যিক নির্দেশ মুতাবিক আসরের নামায আদায় করলেন না বরং নির্দিষ্ট স্থল বনূ কোরায়যা পর্যন্ত পৌঁছে আদায় করলেন। আবার কতক সাহাবী এরূপ মনে করলেন যে, হুযূর (সা)-এর উদ্দেশ্য আসরের সময় থাকতে থাকতে বনূ কোরায়যা পৌঁছে যাওয়া। সুতরাং আমরা যদি পথে নামায আদায় করে আসরের সময় থাকতে থাকতেই সেখানে পৌঁছে যাই তবে হুযূরের হুকুম অমান্য করা হবে না। তাই তারা আসরের নামায যথাসময়ে পথিমধ্যেই আদায় করে নিলেন।

পরস্পর বিরোধী মত পোষণকারীর কোন পক্ষই দোষী নয় বলে কেউই ভর্ৎসনা পাওয়ার যোগ্য নন : রসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবায়ে কিরামের এই বিপরীতমুখী কার্যক্রম গ্রহণ সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর কোন পক্ষকেও ভর্ৎসনা করেন নি। উভয় পক্ষই সঠিক পন্থী বলে সাব্যস্ত করেন। তাই বিশিষ্ট উলামায়ে কিরাম এই মূলনীতি বের করেছেন যে, যাঁরা প্রকৃত মুজতাহিদ এবং যাঁদের ইজতিহাদের সত্যিকার যোগ্যতা রয়েছে তাঁদের বিপরীতমুখী মতামতের কোনটাই ভ্রান্ত ও অপকৃষ্ট বলে মন্তব্য করা চলে না। উভয় পক্ষই নিজ নিজ ইজতিহাদানুযায়ী কাজ করলেও সওয়াবের অধিকারী হবেন।

বনূ কুরায়যার উদ্দেশ্যে জিহাদের জন্য বের হওয়ার কালে রসূলুল্লাহ্ (সা) পতাকা হযরত আলী (রা)-কে প্রদান করেন। বনূ কুরায়যা রসূলুল্লাহ্ (সা) ও সাহাবায়ে কিরামের আগমন সংবাদ পেয়ে সুরক্ষিত দুর্গে আশ্রয় নেয়। মুসলিম বাহিনী এ দুর্গ অবরোধ করেন।

কুরায়যা গোত্রপতি কা'বের বক্তৃতা : কুরায়যা গোত্রপতি কা'ব---যে নবীজীর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে আহযাবের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল---সেই পরিপ্রেক্ষিতে গোত্রের সম্মুখে অবস্থার নাজুকতা বর্ণনার পর তিন প্রকারের কার্যক্রম পেশ করে :

(১) তোমরা সকলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র অনুসারী হয়ে যাও। কেননা আমি শপথ করে বলতে পারি যে, তিনি (সা) সত্য নবী---যা তোমরাও

জ্ঞান এবং তোমাদের ধর্মীয় গ্রন্থ তওরাতেও সে সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে, তোমরা নিজেরাও তা পাঠ করেছ। যদি তোমরা এমন কর তবে ইহজগতে নিজেদের ধন-প্রাণ ও সন্তান-সন্ততিদেরকে রক্ষা করতে পারবে এবং তোমাদের পরকালও শুভ ও শান্তিময় হবে।

(২) অথবা তোমরা নিজেদের পুত্র-পরিজন ও স্ত্রীগণকে নিজ হাতে হত্যা করে বীর বিক্রমে যুদ্ধ করার পর নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দাও।

(৩) তৃতীয় পথ এই যে, শনিবার মুসলমানদের উপর অতর্কিতভাবে আক্রমণ কর। কেননা মুসলমানগণ জানে যে, আমাদের ধর্মে শনিবার যুদ্ধ-বিগ্রহ নিষিদ্ধ। তাই তারা সে দিন আমাদের সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকবে। আমরা অতর্কিতভাবে আক্রমণ করলে জয় লাভের সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।

গোত্রপতি কা'বের এ বক্তৃতার পর গোত্রের সমস্ত লোক জবাবে বলল যে, প্রথম প্রস্তাব---অর্থাৎ মুসলমান হয়ে যাওয়ার কথা কল্পনাও করা যায় না। কেননা আমরা তওরাত ছেড়ে দিয়ে অন্য কোন গ্রন্থের উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে পারি না। এখন রইল দ্বিতীয় প্রস্তাব, নারী ও শিশুরা কি অপরাধ করেছে যে আমরা তাদেরকে হত্যা করব! অবশিষ্ট তৃতীয় প্রস্তাব সম্পর্কে কথা হল--ইহা স্বয়ং তওরাতের হুকুম ও আমাদের ধর্ম-বিশ্বাসের পরিপন্থী। তাই এটাও আমরা করতে পারি না।

অতপর সকলে এ ব্যাপারে একমত হল যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সামনে অস্ত্র ছেড়ে দিয়ে তিনি যা করেন তাতেই রাযী থাকব। আনসারদের মধ্যে যাঁরা আউস গোত্রভুক্ত ছিলেন---তাঁরা প্রাচীন কাল থেকেই বনূ কোরায়যার সাথে একটা মৈত্রীচুক্তিতে আবদ্ধ ছিলেন। তাই আউস গোত্রভুক্ত সাহাবায়ে কিরাম হুযূর (সা)-এর খিদমতে আরয করলেন যে, তাদেরকে আমাদের দায়িত্বে ছেড়ে দিন। রসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করলেন যে, তোমাদের ব্যাপার তোমাদেরই এক নেতার উপর ন্যস্ত করতে চাচ্ছি। তোমরা এতে রাযী আছ কি-না? তারা এতে রাযী হয়ে গেলে পর নবীজী বললেন যে, তোমাদের সে নেতা সা'আদ বিন মুয়ায---এর মীমাংসার ভার আমি তাঁর উপর ন্যস্ত করছি। এ প্রস্তাবে সবাই সম্মতি জানালো।

খন্দকের যুদ্ধে হযরত সা'আদ বিন মুয়ায (রা) বিশেষভাবে ক্ষত-বিক্ষত হন। তাঁর সেবা-যত্নের জন্য রসূলুল্লাহ্ (সা) মসজিদে নববীর গণ্ডীতেই তাঁবু টানিয়ে দেন। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নির্দেশ মুতাবিক বনূ কোরায়যাভুক্ত কয়েদীদের মীমাংসার ভার হযরত সা'আদ বিন মুয়াযের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়। তিনি এদের মধ্যে যারা যুবক যোদ্ধা রয়েছে, তাদেরকে হত্যা করে দেওয়ার এবং নারী, শিশু ও বৃদ্ধদেরকে যুদ্ধবন্দীর মর্যাদা দেওয়ার রায় প্রদান করেন। ফলে এ সিদ্ধান্তই কার্যকর করা হয়। এ রায় দেওয়ার অব্যবহিত পরেই হযরত সা'আদ (রা)-এর ক্ষত থেকে রক্ত প্রবাহিত হতে লাগল এবং এর ফলেই তিনি পরলোক গমন করেন। আল্লাহ্ পাক তাঁর তিনটি দোয়াই কবূল করেছেন। প্রথমত আগামীতে কুরায়শ আর যেন রসূলুল্লাহ্ (সা)-র উপর আক্রমণ

করতে সাহস না পায়। দ্বিতীয়ত বনূ কুরায়যা নিজেদের বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি যেন পেয়ে যায় যা আল্লাহ্ পাক তাঁর মাধ্যমেই বাস্তবায়িত করেন। তৃতীয়ত তিনি শহীদের মৃত্যু বরণ করেন।

যাদেরকে হত্যা করা সাব্যস্ত হলো তাদের মধ্যে কেউ কেউ মুসলমান হয়ে যাওয়ায় তাদেরকে মুক্তি দেওয়া হলো। প্রসিদ্ধ সাহাবী আতিয়া কুরাযী (রা)-ও এঁদের অন্যতম। হযরত যুবায়ের বিন বাতাও এঁদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। হযরত সাবেত বিন কায়েস (রা) আঁ হযরত (সা)-এর নিকট দরখাস্ত করে এদেরকে মুক্তির ব্যবস্থা করেন। এর কারণ এই যে, অন্ধকার যুগে যুবায়ের বিন বাতা তার প্রতি এক বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছিল। তা এই যে, অন্ধকার যুগে বুয়াসের যুদ্ধে হযরত সাবেত বিন কায়েস (রা) যুবায়ের বিন বাতার হাতে বন্দী হন। যুবায়ের তাঁকে হত্যা না করে তার মাথার চুল কেটে মুক্ত করে দেয়।

অনুগ্রহের প্রতিদান এবং জাতীয় মর্যাদাবোধের দুটি অনন্য ও বিস্ময়কর উদাহরণঃ হযরত সাবেত বিন কায়েস যুবায়ের বিন বাতার মুক্তির নির্দেশ লাভ করে তার নিকট গিয়ে বললেন যে, তুমি বুয়াসের যুদ্ধে আমার প্রতি যে অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছিলে তারই প্রতিদান হিসাবে তোমার এই মুক্তির ব্যবস্থা করলাম। যুবায়ের বলল যে, সম্ভ্রান্তজন অপর সম্ভ্রান্তজনের প্রতি এরূপ ব্যবহারই করে থাকে। কিন্তু একথা বল দেখি যে, যে ব্যক্তির পরিবার-পরিজন বেঁচে থাকবে না, তার বেঁচে থাকার সার্থকতা কি? একথা শুনে হযরত সাবেত বিন্ কায়েস হুযূর (সা)-এর খিদমতে গিয়ে তার পরিবার-পরিজনকেও মুক্ত করে দেবার আবেদন করলেন। তিনিও তা গ্রহণ করলেন। যুবায়ের আরো এক ধাপ অগ্রসর হয়ে বলল যে, পরিবার-পরিজন বিশিষ্ট কোন মানুষ তার ধনসম্পদ ব্যতীত কিভাবে বেঁচে থাকতে পারে। সাবেত বিন্ কায়েস পুনরায় হযরত নবী করীম (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে তার ধনসম্পদও ফেরত দেওয়ার আবেদন করলেন। এটাই ছিল একজন মু'মিনের শালীনতা ও কৃতজ্ঞতাবোধের উদাহরণ---হযরত সাবেত বিন্ কায়েস (রা) তা প্রদর্শন করেছিলেন।

অতপর যখন যুবায়ের বিন্ বাতা স্বীয় পরিবার-পরিজন ও ধনসম্পদ ফেরত প্রাপ্তি সম্পর্কে নিশ্চিত হল তখন সে হযরত সাবেত বিন্ কায়েস (রা)-এর নিকট ইহুদী সম্প্রদায়ের বিভিন্ন নেতৃবৃন্দের পরিণতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করে বলল যে, চীনা দর্পণের ন্যায় উজ্জ্বল ও সাদা মুখমণ্ডল বিশিষ্ট ইবনে আবিল হুকায়েক, কোরায়যা গোত্রপতি কা'ব বিন কুরায়যা ও আমর বিন কুরায়যার অবস্থা কি? উত্তরে বললেন যে, তাদের সবাইকে হত্যা করে দেওয়া হয়েছে। অতপর আরো দুটি দল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করায় তাদেরকেও হত্যা করে ফেলা হয়েছে বলে সংবাদ দেওয়া হলো।

একথা শুনে যুবায়ের বিন্ বাতা হযরত সাবেত বিন্ কায়েস (রা)-কে বলল যে, আপনি আমার অনুগ্রহের প্রতিদান পূর্ণভাবে আদায় করেছেন এবং নিজ দায়িত্ব পুরোপুরিই পালন করেছেন। কিন্তু এসব লোকদের অন্তর্ধানের পর আমি আমার বিষয়াশয়

জমাজমি আবাদ করব না। আমাকেও হত্যা করে তাদেরই দলভুক্ত করে দেন। হযরত সাবেত (রা) তাকে হত্যা করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলেন। অবশ্য তার পীড়াপীড়িতে অপর এক মুসলমান তাকে হত্যা করে ফেলে।—(কুরতুবী)

এটাই ছিল জনৈক কাফিরের জাতীয় অনুভূতি ও আত্মমর্যাদাবোধ—যে সকল কিছু ফিরে পাওয়ার পরও নিজের সঙ্গীহারা অবস্থায় বেঁচে থাকা পছন্দ করল না। একজন মু'মিন ও একজন কাফিরের এরূপ কর্মকাণ্ড এক ঐতিহাসিক স্মারক রূপে বিদ্যমান থাকবে।

বনূ কুরায়যার বিরুদ্ধে এ বিজয় পঞ্চম হিজরীতে যিলকদ মাসের শেষে ও যিলহজ্ব মাসের প্রথম ভাগে অনুষ্ঠিত হয়।—(কুরতুবী)

প্রণিধানযোগ্য বিষয়ঃ আহযাব (সম্মিলিত বাহিনী) ও বনূ কুরায়যার যুদ্ধদ্বয়কে এখানে খানিকটা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করার এক কারণ এই যে, স্বয়ং কোরআনেও এর সবিস্তার বর্ণনা দু'রুকূ ব্যাপী স্থান দখল করে আছে। দ্বিতীয় কারণ এর মধ্যে মানব জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কেও নানাবিধ উপদেশমালা, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সুস্পষ্ট মু'জিযাসহ আরো বহু শিক্ষাপ্রদ বিষয় রয়েছে। যেগুলোকে এ কাহিনীর মধ্য দিয়ে বিভিন্ন শিরোনামায় বর্ণনা করা হয়েছে। এ সম্পূর্ণ ঘটনা অবহিত হওয়ার পর উল্লিখিত আয়াতসমূহের ব্যাখ্যার জন্য তফসীরের সার-সংক্ষেপ দেখে নেওয়াই যথেষ্ট—অতিরিক্ত বিশ্লেষণ নিষ্প্রয়োজন। অবশ্য কয়েকটি কথা প্রণিধানযোগ্য।

(১) এই যুদ্ধে মুসলমানদের কঠিন বিপদ ও দুঃখ-কষ্টে পতিত হওয়ার কথা বর্ণনা করে এ দুর্যোগপূর্ণ বিশ্বে মুসলমানদের এক অবস্থা এরূপভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যেঃ تَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا—অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক সম্পর্কে তোমরা বিভিন্ন ধারণা পোষণ করছিলে। এসব ধারণা দ্বারা সেসব ইচ্ছা বহির্ভূত ধারণাসমূহকেই বোঝানো হয়েছে—যেগুলো সঙ্কটকালে মানব মনে উদয় হয়—যেমন মৃত্যু আসন্ন ও অনিবার্য, বাঁচার আর কোন উপায় নেই ইত্যাদি। এরূপ ইচ্ছাবহির্ভূত ধারণা ও কল্পনাসমূহ পরিপক্ক ঈমান বা পরিপূর্ণ নির্ভরশীলতার পরিপন্থী নয়। অবশ্য এগুলো চরম দুর্বিপাক ও কঠিন বিপদের পরিচায়ক ও সাক্ষ্যবাহক। কেননা পর্বতবৎ অনড় ও দৃঢ়পদ সাহাবায়ে কিরামের অন্তরেও এ ধরনের দুর্বলতা সৃষ্টি হয়েছে।

(২) মুনাফিকদের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তারা প্রকাশ্যভাবে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের অঙ্গীকারসমূহকে ভাওতা ও প্রতারণা বলে আখ্যায়িত করতে লাগলঃ

إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللهُ

وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا যখন কপট বিশ্বাসী এবং ব্যাধিগ্রস্ত অন্তর বিশিষ্ট লোকেরা বলতে লাগল যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের এসব অঙ্গীকার প্রতিশ্রুতি প্রতারণা বৈ কিছুই নয়। এ তো ছিল তাদের অভ্যন্তরীণ কুফরীর বহিঃপ্রকাশ। পরবর্তী পর্যায়ে যেসব মুনাফিক কার্যত---বাহ্যিকভাবে মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে শরীক ছিল তাদের দু'শ্রেণীর বর্ণনা রয়েছে। প্রথম শ্রেণী---যারা কিছু না বলেই পালাতে লাগল---যারা বলতে লাগল : يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا— অর্থাৎ হে ইয়াসরিববাসীগণ! তোমাদের টিকে থাকার উপায় নেই সুতরাং ফিরে চল। আর অপর শ্রেণী যারা ছল-চাতুরী বের করে হযরত (সা)-এর নিকট ফিরে যাওয়ার আবেদন করল। যাদের অবস্থা এরূপভাবে বর্ণনা করা হয়েছে : وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ (অর্থাৎ এদের মাঝে একদল নবীজীর নিকট এই বলে ফিরে যাওয়ার অনুমতি চাইতে লাগল যে, আমাদের বাড়ি অরক্ষিত অবস্থায় রয়েছে।) কোরআন করীম এদের ছল-চাতুরীর স্বরূপ উদঘাটন করে দিয়েছে যে, এসব কিছু মিথ্যা ---আসলে এরা যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে যেতে চায়, - إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا

পরবর্তী কয়েক আয়াতে এদের কু-কীর্তি ও অপকৃষ্টতা এবং মুসলমানদের সাথে এদের শত্রুতা, অতপর এদের করুণ ও মর্মন্তুদ পরিণতির বর্ণনা রয়েছে।

এরপর অকপট ও খাঁটি মুসলিমগণের বর্ণনা প্রসংগে এদের অসম দৃঢ়তার প্রশংসা করা হয়েছে। এরই প্রেক্ষিতে রসূলুল্লাহ্ (সা) অনুসরণ ও অনুকরণের প্রয়োজনীয়তা ও অপরিহার্যতা এক মূলনীতিরূপে বর্ণনা করা হয়েছে।—لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (অর্থাৎ নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মধ্যে উত্তম---অনুপম আদর্শ রয়েছে।) এ দ্বারা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বাণীসমূহ ও কার্যাবলী উভয়ই অনুসরণের হুকুম রয়েছে বলে প্রমাণিত হয়। কিন্তু বিশিষ্ট মুফাস্সিরগণের মতে এর বাস্তব ও কার্যকরী রূপ এই যে, যেসব কাজ করা বা পরিহার করা সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (সা) দ্বারা অবশ্য করণীয় স্তর পর্যন্ত পৌঁছেছে বলে প্রমাণিত, তা অনুসরণ ওয়াজিব ও অপরিহার্য। আর যেগুলো করা বা বর্জন করা উত্তম (মুস্তাহাব) হওয়ার স্তর পর্যন্ত পৌঁছেছে তা করা বা বর্জন করা আমাদের ক্ষেত্রেও মুস্তাহাবের স্তরেই থাকবে।---তা অমান্য করা অপরাধ বলে গণ্য হবে না।

উল্লিখিত আয়াতসমূহের সর্বশেষ তিন আয়াতে বনূ কুরায়যার ঘটনা বিবৃত হয়েছে। — وَاَنْزَلَ الَّذِيْنَ ظَاهَرُوْهُمْ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ صَيَاصِيْهِمْ

অর্থাৎ যে সকল আহ্‌লে কিতাব সম্মিলিত শত্রু বাহিনীর সহযোগিতা করেছে আল্লাহ্ পাক তাদের অন্তরে রসূলুল্লাহ্ (সা) ও সাহাবায়ে কিরামের প্রতি ভীতি সঞ্চার করে তাদেরকে তাদের সুরক্ষিত দুর্গ থেকে নীচে নামিয়ে দেন এবং তাদের ধনসম্পদ ও ঘরবাড়ি মুসলমানগণের স্বত্বভুক্ত করে দেন।

সর্বশেষ আয়াতে মুসলমানদের অদূর ভবিষ্যতে জয়যাত্রার সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে যে, এখন থেকে কাফিরদের অগ্রাভিযানের অবসান এবং মুসলমানদের বিজয় যুগের সূচনা হলো আর এমন সব ভূখণ্ড তাদের অধিকারভুক্ত হবে যেগুলোর উপর কখনো তাদের পদচারণা পর্যন্ত হয়নি, যার বাস্তবায়ন সাহাবায়ে কিরামের যুগে বিশ্বমানব প্রত্যক্ষ করেছে। পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্যের এক বিশাল ও সুবিস্তীর্ণ অঞ্চল তাঁদের অধিকারভুক্ত হয়। আল্লাহ্ পাক যা চান তাই করেন।

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا

وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ اُمَتِّعْكُنَّ وَاُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا ﴿٢٨﴾ وَاِنْ كُنْتُنَّ

تُرِدْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالدَّارَ الْاٰخِرَةَ فَاِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْمُحْسِنٰتِ

مِنْكُنَّ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿٢٩﴾ يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ مَنْ يَّاْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ

مُّبَيِّنَةٍ يُّضٰعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ؕ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ﴿٣٠﴾

وَمَنْ يَّقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَاۤ اَجْرَهَا

مَرَّتَيْنِ ۙ وَاَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيْمًا ﴿٣١﴾ يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ

مِّنَ النِّسَآءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِيْ فِيْ

قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَّقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ﴿٣٢﴾ وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ

تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى وَاَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَاٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ وَاَطِعْنَ اللّٰهَ

وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ
وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ
اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴿٣٤﴾

(২৮) হে নবী! আপনার পত্নীগণকে বলুন, তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও তার বিলাসিতা কামনা কর, তবে আস, আমি তোমাদের ভোগের ব্যবস্থা করে দেই এবং উত্তম পন্থায় তোমাদেরকে বিদায় দেই। (২৯) পক্ষান্তরে যদি আল্লাহ্, তাঁর রসূল ও পরকাল কামনা কর, তবে তোমাদের সৎকর্মপরায়ণদের জন্য আল্লাহ্ মহা পুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন। (৩০) হে নবী-পত্নীগণ,! তোমাদের মধ্যে কেউ প্রকাশ্যে অশ্লীল কাজ করলে তাকে দ্বিগুণ শাস্তি দেয়া হবে। এটা আল্লাহ্‌র জন্যে সহজ। (৩১) তোমাদের মধ্যে যে কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের অনুগত হবে এবং সৎকর্ম করবে, আমি তাকে দু'বার পুরস্কার দেব এবং তাঁর জন্য আমি সম্মানজনক রিযিক প্রস্তুত রেখেছি। (৩২) হে নবী-পত্নীগণ! তোমরা অন্য নারীদের মত নও; যদি তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর, তবে পরপুরুষের সাথে কোমল ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথা বলো না, ফলে সেই ব্যক্তি কুবাসনা করে, যার অন্তরে ব্যাধি রয়েছে। তোমরা সঙ্গত কথা-বার্তা বলবে। (৩৩) তোমরা গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করবে--মূর্খতাযুগের অনুরূপ নিজেদেরকে প্রদর্শন করবে না, নামায কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে। হে নবী-পরিবারের সদস্যবর্গ! আল্লাহ্ কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে পূর্ণরূপে পূত-পবিত্র রাখতে। (৩৪) আল্লাহ্‌র আয়াত ও জ্ঞানগর্ভ কথা, যা তোমাদের গৃহে পঠিত হয় তোমরা সেগুলো স্মরণ করবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ সূক্ষ্মদর্শী, সর্ববিষয়ে খবর রাখেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে নবী (সা)! আপনি আপনার পত্নীগণকে (রা) বলে দিন---(তোমাদের সামনে দু'টো স্পষ্ট কথা পেশ করা হচ্ছে---সে কথা দু'টো এই যে,) যদি তোমরা পার্থিব জীবনের (সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য) এবং তার জৌলুস ও চাকচিক্য কামনা কর তবে আস (অর্থাৎ তা গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত হও) আমি তোমাদেরকে কিছু (পার্থিব) ধনসম্পদ প্রদান করব (অথবা এর অর্থ সেই যুগল বস্ত্র যা তালাকপ্রাপ্তা পত্নীকে তালাকের পর প্রদান করা মুস্তাহাব বা এর অর্থ স্ত্রীর ইদ্দত পালনকালীন খোরপোষ উভয়ই এর অন্তর্ভুক্ত) এবং (সে সম্পদ প্রদান করে) তোমাদেরকে অত্যন্ত শালীনতার সাথে বিদায় করব (অর্থাৎ সুন্নত অনুসারে তালাক দিয়ে দেব, যাতে যেখানে চাও গিয়ে পার্থিব সম্পদ লাভ করতে পার) আর যদি তোমরা আল্লাহ্কে পেতে চাও এবং (এখানে

আল্লাহ্কে পেতে চাওয়ার অর্থ) তাঁর রসূল (সা)-কে (চাও অর্থাৎ বর্তমান দীন-হীন দারিদ্র্য পীড়িত অবস্থা বরণ করে রসূল (সা)-এরই পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ থাকতে চাও) এবং পরকালের (সুউচ্চ মর্যাদাসমূহ) লাভ করতে চাও (যা নবীজীর সাথে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ থাকার পরিপ্রেক্ষিতে লাভ করা যাবে) তবে (এটা তোমাদের সদাচার ও সৎস্বভাবের পরিচায়ক। এবং) তোমাদের সৎস্বভাব বিশিষ্ট পুণ্যবতীগণের জন্য আল্লাহ্ পাক (পরকালে) বিশেষ প্রতিদান ও পারিতোষিক প্রস্তুত করে রেখেছেন। (অর্থাৎ এটা ঐ প্রতিদান যা নবী-পত্নীগণের জন্য নির্দিষ্ট যা অন্যান্য নারীগণের প্রতিদান হতে উন্নততর এবং নবীজীর সাথে দাম্পত্যসূত্রে আবদ্ধ না থাকলে তা থেকে বঞ্চিত হবে। যদিও সাধারণ দলীলাদি দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, এমতাবস্থাতেও ঈমান ও সৎকর্মসমূহের প্রতিফল লাভ করবে। এ পর্যন্ত তো ইচ্ছা প্রদর্শন সংশ্লিষ্ট বিষয়, যে ক্ষেত্রে রসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর পুণ্যবতী স্ত্রীগণকে এ স্বাধীনতা প্রদান করেছেন যে বর্তমান অবস্থার উপর তুষ্ট থেকে তাঁর সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ থাকাকেই পছন্দ করে নিক অথবা তালাক গ্রহণ করুক। পরবর্তী পর্যায়ে আল্লাহ্ তা'আলা দাম্পত্যসূত্রে আবদ্ধ থাকার পরিপ্রেক্ষিতে যেসব নির্দেশ অবশ্য পালনীয় সেগুলো বর্ণনা করেছেন। ইরশাদ হচ্ছেঃ) হে নবী-পত্নীগণ! তোমাদের মধ্য হতে যে অশ্লীল আচরণ প্রদর্শন করবে [অর্থাৎ এমন আচরণ যদ্দ্বারা নবীজী (সা) অতিষ্ঠ উদ্বেগাকুল হয়ে উঠেন। তবে] তাদেরকে (এ কারণে পরকালে) দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান করা হবে। (অর্থাৎ অন্যান্য নারীগণ স্বামীর সাথে মন্দ আচরণের ফলে যে পরিমাণ শাস্তি ভোগ করতো তার দ্বিগুণ শাস্তি ভোগ করবে) এবং একথা আল্লাহ্ পাকের পক্ষে (একেবারে) সহজ (এমনটি নয় যে, দুনিয়ার শাসকবর্গের ন্যায় পর্যায়ক্রমে শাস্তি বৃদ্ধি করার পথে কারো পদমর্যাদা প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে।) আর তোমাদের মাঝে যারা আল্লাহ্ পাক ও তাঁর রসূলের অনুসরণ করবে (অর্থাৎ যে সব কাজ আল্লাহ্ পাক অবশ্য করণীয় করে দিয়েছেন তা পালন করবে ও স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সা) স্বামী হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের উপর যে অতিরিক্ত কর্তব্য ও দায়িত্ব আরোপিত হয় তা পালন করে) এবং (অবশ্য করণীয় কর্মসমূহের বাইরে যে) সৎকাজসমূহ (রয়েছে, তা) করবে তবে আমি তার সওয়াবও দ্বিগুণ করে দেব এবং আমি তাদের জন্য (এই প্রতিশ্রুত দ্বিগুণ প্রতিদান ছাড়াও) এক (বিশেষ) উত্তম খাবার (যা নবী-পত্নীগণের জন্য নির্দিষ্ট থাকবে এবং যা কর্মফলের অতিরিক্ত হবে) প্রস্তুত করে রেখেছি। (আনুগত্যের দরুন দ্বিগুণ পুরস্কার ও প্রতিফল এবং আনুগত্যহীনতার জন্য তদ্রূপ দ্বিগুণ শাস্তির কারণ নবীজীর সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ থাকার সৌভাগ্য লাভ ---যে কথা

يٰنِسَاءَ النَّبِيِّ الخ আয়াত দ্বারা প্রকাশ পাচ্ছে। কেননা বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের

ত্রুটি-বিচ্যুতি সাধারণ লোকের ত্রুটির চাইতে অধিক আপত্তিকর ও শাস্তিযোগ্য

বলে বিবেচিত হয়। অনুরূপভাবে তাদের আনুগত্যও সাধারণ লোকের আনুগত্যের চাইতে অধিক প্রশংসনীয় ও অধিক পুরস্কার লাভের যোগ্য। সুতরাং পুরস্কার ও তিরস্কার, শাস্তি ও শান্তি উভয় ক্ষেত্রে তারা সাধারণ লোকের চাইতে বিশিষ্ট মর্যাদা ও স্বাতন্ত্র্যের দাবীদার। আর বিশেষ করে প্রসংগত একথাও বলা চলে, উম্মাহাতুল মু'মিনীনের (মু'মিনকুলের মহীয়সী মাতৃবর্গ) খিদমত ও আনুগত্য প্রদর্শন নবীজী (সা)-র অন্তরতুষ্টি ও শান্তি বৃদ্ধির বিশেষ সহায়ক হবে। সুতরাং তাঁর (সা) তৃপ্তি ও তুষ্টি সাধন অধিক প্রতিদান ও পুরস্কার লাভের কারণ হবে। অপরপক্ষে এর বিপরীত দিকটাও অনুরূপই মনে করতে হবে। এ পর্যন্ত পুণ্যবতী স্ত্রী (রা)-গণের প্রতি তাঁর (সা) অধিকার সম্পর্কিত বিষয়ের বর্ণনা ছিল। পরবর্তী পর্যায়ে অধিক গুরুত্ব আরোপের উদ্দেশ্যে সাধারণ হুকুমাবলী সম্পর্কিত সম্বোধন তা এই যে) হে নবী-পত্নীগণ! (তোমরা নিছক এ কারণে যেন গর্বস্ফীত ও উল্লসিত না হও যে, তোমরা নবীর অর্ধাঙ্গিনী—সুতরাং সাধারণ স্ত্রীকুলের চাইতে বিশিষ্ট মর্যাদা ও স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী এবং এ সম্পর্ক ও মর্যাদাই তোমাদের জন্য যথেষ্ট। তাই এরূপ ধারণা যেন পোষণ না কর। একথা ঠিক যে) তোমরা অপরাপর সাধারণ স্ত্রীলোকদের ন্যায় নও (নিঃসন্দেহে তাদের চাইতে তোমরা বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী। কিন্তু তা শুধু এমনিতেই নয়; বরং এর সাথে একটি শর্তও জড়িত রয়েছে। তা এই যে) যদি তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর (তবে তো তোমরা এ সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে প্রকৃতপক্ষেই অন্যান্যদের চাইতে অধিক মর্যাদার অধিকারিণী হবে ও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করবে। এমনকি দ্বিগুণ সওয়াব অর্জন করবে। পক্ষান্তরে যদি এ শর্ত প্রতিফলিত না হয় তবে এ শর্তই দ্বিগুণ শাস্তির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। যখন তাকওয়াহীন আত্মীয়তার সম্পর্ক সম্পূর্ণ মূল্যহীন) তখন (তোমাদের পক্ষে সাধারণভাবে শরীয়তের যাবতীয় আহ্‌কাম এবং বিশেষভাবে পরবর্তী আয়াতসমূহ বর্ণিত আহ্‌কামের অনুসরণ একান্ত বাঞ্ছনীয়। আর সেসব আহ্‌কাম এই যে,) তোমরা (গায়রে মুহরম পুরুষের সাথে) কথা-বার্তা বলতে গিয়ে (যখন তা বলার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়) কোমলতার আশ্রয় গ্রহণ করো না। (এর অর্থ এটা নয় যে ইচ্ছাকৃতভাবে কোমলতার আশ্রয় নিও না; কেননা এটা যে গর্হিত তা একেবারে সুস্পষ্ট। নবীজী (সা)-র শুদ্ধচারিণী স্ত্রীগণের পক্ষে এরূপ হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। বরং অর্থ এই যে, যেমন করে নারীগণের স্বভাবগত ভংগী কোমল ও বিনম্রভাবে কথা-বার্তা বলা, তোমরা এরূপ ভংগী ও নীতির অনুসরণ করো না) কেননা (এর ফলে) এমন সব লোকের মনে (ভ্রান্ত) ধারণার উদ্রেক করতে থাকে—যাদের অন্তঃকরণ কলুষতাপূর্ণ এবং অসৎ; বরং এক্ষেত্রে কৃত্রিমভাবে এই স্বাভাবিক ভংগী পরিবর্তন করে কথাবার্তা বল এবং নীতি পবিত্রতা মোয়াফেক কথা-বার্তা বল (অর্থাৎ এমন ভংগীতে যা হবে অপেক্ষাকৃত কর্কশ যা সতীত্ব রক্ষায় সহায়ক—এবং ইহা অসদাচরণ রূপে গণ্য নয়। অসদাচরণ ওটাই যাতে অন্তর ব্যথিত হয়। অশ্লীল কামনা ও ঘৃণ্য লালসা প্রতিহত করাকে কষ্ট দেওয়া বলা হয় না। এতে তো কেবল কথা বলা সম্পর্কে হুকুম করা হয়েছে।) এবং (পরবর্তী পর্যায়ে পর্দা সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে আর উভয়ের মধ্যে সাধারণ বিষয় হল—

সতীত্ব ও শুদ্ধাচারিতা। অর্থাৎ) তোমরা নিজ বাড়ীর মধ্যেই অবস্থান করতে থাক (অর্থাৎ---কেবল শালীন পোশাক পরিধান করাই পর্দার জন্য যথেষ্ট মনে করো না; বরং পর্দা এরূপভাবে কর, যাতে শরীর বা পোশাক-পরিচ্ছদ কোনটাই দৃষ্টিগোচর না হয়। যেমন পর্দার যে পদ্ধতি অধুনা ও সম্ভ্রান্ত পরিবারসমূহে প্রচলিত আছে যে, স্ত্রীলোকগণ বাড়ী থেকেই বের হয় না। অবশ্য প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে বাইরে বের হওয়ার কথা অন্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত।) এবং (পরবর্তী পর্যায়ে এ হুকুমেরই তাকীদের জন্য ইরশাদ হয়েছে যে,) প্রাচীন বর্বর যুগের রীতি মাফিক ঘোরাফেরা করো না (সে সময় পর্দার প্রচলন ছিল না---হোক না তা অশ্লীলতা বিবর্জিত। প্রাচীন বর্বর যুগের দ্বারা ইসলাম পূর্ববর্তী বর্বর যুগকে বোঝানো হয়েছে। এর মুকাবিলায় পরবর্তী এক বর্বরতাও আছে---তা হলো আহ্‌কামে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের পরও তার উপর আমল না করা। সুতরাং ইসলাম-পরবর্তীকালীন বর্বরতা উত্তরকালীন বর্বরতা বলে গণ্য হবে। তাই উপমাচ্ছলে পূর্বকালীন বর্বরতা বিশেষভাবে উল্লেখের কারণ সুস্পষ্ট। এর মর্মার্থ এই যে, উত্তরকালীন বর্বরতা চালু করে পূর্ববর্তী বর্বরতার অনুসরণ করো না---যেগুলোর মূলোৎপাটিত করার জন্য ইসলামের আবির্ভাব। এ পর্যন্ত ছিল সতীত্ব ও শুদ্ধাচারিতা বিষয়ক আহ্‌কাম।) আর (সামনে শরীয়তের অন্যান্য আহ্‌কাম সম্পর্কে ইরশাদ হচ্ছে যে,) তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা করবে এবং যাকাত আদায় করবে (যদি তোমরা নিসাবের অধিকারী হও। কেননা উভয়টাই ইসলামের বিশিষ্ট রুকন। তাই এ দু'টোকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে) এবং (তোমাদের জাত অন্যান্য যেসব হুকুম রয়েছে সেসব ক্ষেত্রে) আল্লাহ্ পাক ও তাঁর রসূলের কথা মেনে চল। (আর আমি যে তোমাদের উপর এসব আহ্‌কাম পালন ও অনুসরণে দায়িত্ব আরোপ করেছি তা তোমাদের কল্যাণ ও মঙ্গলার্থেই। কেননা) আল্লাহ্ পাকের (শরীয়তানুযায়ী এসব নির্দেশ প্রদানের) উদ্দেশ্য (হে পয়গম্বরের) পরিবার-পরিজন তোমাদের থেকে (পাপ-পঙ্কিলতা ও অবাধ্যতার) আবিলতা দূরে সরিয়ে রাখা এবং তোমাদেরকে (বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ, আমল-আকীদা ও চরিত্রগতভাবে সম্পূর্ণ) পূত-পবিত্র রাখা (কেননা বিরুদ্ধাচরণ পবিত্রতা অর্জনের পরিপন্থী এবং আবিলতা ও পঙ্কিলতার কারণ, এ থেকে বেঁচে থাকা আহ্‌কাম সম্পর্কিত জ্ঞানের মাধ্যমেই সম্ভব) এবং (যেহেতু এসব আহ্‌কামের উপর আমল করা ওয়াজিব এবং আমল-আহ্‌কাম সম্পর্কিত জ্ঞান আর তা স্মরণ রাখার উপর নির্ভরশীল সুতরাং) তোমরা আল্লাহ্ পাকের এসব আয়াতসমূহ (অর্থাৎ কোরআন) এবং (আহ্‌কাম সম্পর্কিত) যে ইলমের চর্চা তোমাদের গৃহে রয়েছে তা স্মরণ (হৃদয়ঙ্গম) করবে (এবং এটাও মনে রাখবে যে,) নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ পাক অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শী ও গোপন তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী (সুতরাং অন্তরের গোপন কার্যক্রম সম্পর্কেও পুরোপুরি অবহিত এবং) সম্পূর্ণ জ্ঞাত (সুতরাং বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ প্রকাশ্য ও গোপন যাবতীয় আদেশসমূহ পালন ও নিষেধাবলীর প্রতি যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করা ওয়াজিব)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এই সূরার উদ্দেশ্যাবলীর মধ্যে অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য সেসব বস্তু ও কার্যাবলী পরিহার করার প্রতি তাকীদ প্রদান, যেগুলো রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কষ্ট ও মর্মবেদনার কারণ হতে পারে। এতদ্ভিন্ন তাঁর (সা) আনুগত্য ও সন্তুষ্টি বিধান সম্পর্কিত নির্দেশাবলীও রয়েছে। উপরে বর্ণিত পরিখার যুদ্ধের বিস্তারিত ঘটনার মধ্যে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রতি কাফির ও মুনাফিকদের অসহনীয় দুঃখ-কষ্ট প্রদান পরিণামে নির্যাতনকারী কাফির ও মুনাফিকদের চরম লাঞ্ছনা ও অবমাননা এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রে মুসলমানদের অতুলনীয় বিজয় ও সাফল্যের বিবরণ ছিল। সংগে সংগে সেসব নিষ্ঠাবান মু'মিনগণের প্রশংসা এবং পরকালে তাঁদের উচ্চ মর্যাদারও বর্ণনা ছিল, যারা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আদেশ-ইঙ্গিতে নিজেদের সর্বস্ব---কোরবান করে দিয়েছিলেন।

উপরোল্লিখিত আয়াতসমূহে নবীজী (সা)-র পুণ্যবতী স্ত্রীগণের প্রতি বিশেষ নির্দেশ রয়েছে যেন তাঁদের কোন কথা ও কাজের দ্বারা হুযূরে পাকের (সা) প্রতি কোন দুঃখ-যন্ত্রণা না পৌঁছে; সেদিকে যেন তাঁরা যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করেন। আর তা তখনই হতে পারে, যখন তাঁরা আল্লাহ্ পাক ও তাঁর রসূল (সা)-এর প্রতি পূর্ণভাবে অনুগত থাকবেন। এ প্রসঙ্গে পুণ্যবতী পত্নীগণকে (রা) সম্বোধন করে কয়েকটি নির্দেশ রয়েছে।

শুরুর আয়াতসমূহে তাঁদেরকে যে তালাক গ্রহণের অধিকার প্রদানের কথা বর্ণনা করা হয়েছে, এ সম্পর্কিত পুণ্যবতী স্ত্রীগণ (রা) কর্তৃক সংঘটিত এক বা একাধিক এমন ঘটনা রয়েছে, যা নবীজীর মর্জির পরিপন্থী ছিল, যদ্দ্বারা রসূলুল্লাহ্ (সা) অনিচ্ছাকৃতভাবেই দুঃখ পান।

এসব ঘটনার মধ্যে একটি ঘটনা যা সহীহ্ মুসলিম প্রভৃতি হাদীসগ্রন্থে হযরত জাবের (রা)-এর রেওয়ায়েতে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে, বলা হয়েছে, একদা পুণ্যবতী স্ত্রীগণ (রা) সমবেতভাবে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র খিদমতে তাঁদের জীবিকা ও অন্যান্য খরচাদির পরিমাণ বৃদ্ধির দাবি পেশ করেন। বিশিষ্ট মুফাস্সির আবু হাইয়ান এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা তফসীরে বাহরে-মুহীতে এরূপভাবে প্রদান করেন যে, আহযাব যুদ্ধের পর বনূ নযীর ও বনূ কোরায়যার বিজয় এবং গনীমতের মাল বন্টনের ফলে সাধারণ মুসলমানগণের মধ্যে খানিকটা স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে আসে। এ পরিপ্রেক্ষিতে পুণ্যবতী স্ত্রীগণ (রা) ভাবলেন যে, তাঁ হযরত (সা)-ও হয়ত এসব গনীমতের মাল থেকে নিজস্ব অংশ রেখে দিয়েছেন। তাই তাঁরা সমবেতভাবে আরয করলেন----ইয়া রসূলাল্লাহ্ (সা)! পারস্য ও রোমের সাম্রাজ্ঞীগণ নানাবিধ গহনাপত্র ও বহু মূল্যবান পোশাক পরিচ্ছদ ব্যবহার করে থাকে; এবং তাদের সেবা-যত্নের জন্য অগণিত দাস-দাসী রয়েছে। আমাদের দারিদ্র্য পীড়িত জীর্ণ-শীর্ণ করুণ অবস্থা তো আপনি স্বয়ংই দেখতে পাচ্ছেন। তাই মেহেরবানী পূর্বক আমাদের জীবিকা ও অন্যান্য খরচাদির পরিমাণ খানিকটা বৃদ্ধির কথা বিবেচনা করুন।

রসূলুল্লাহ্ (সা) পুণ্যবতী স্ত্রীগণের (রা) পক্ষ থেকে দুনিয়াদার ভোগ বিলাসী রাজ-রাজড়াদের পরিবেশে বিদ্যমান জৌলুস ও সুযোগ-সুবিধা প্রদানের দাবিতে উপস্থাপিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ কারণে বিশেষভাবে মর্মাহত হন যে, তাঁরা নবীগৃহের প্রকৃত মর্যাদা অনুধাবন করতে সক্ষম হন নি। এর ফলে নবীজী (সা) যে দুঃখিত হবেন তা তাঁরা ধারণা করতে পারেন নি। সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে প্রাচুর্য ও সম্পদ বৃদ্ধি দেখে তাঁদের মাঝে খানিকটা প্রাচুর্যের অভিলাষের উদ্রেক করেছিল। ভাষ্যকার আবূ হাইয়ান বলেন যে, আহযাবের যুদ্ধের পর এ ঘটনা বর্ণনা করার দ্বারা একথাই সমর্থিত হয় যে, নবী-পত্নীগণের (রা) এ দাবীই ছিল তাঁদেরকে তালাক গ্রহণের অধিকার প্রদানের কারণ।

কোন কোন রেওয়ায়েত অনুসারে পরবর্তী সূরায়ে তাহ্‌রীমে সবিস্তার বর্ণিত হযরত যয়নব (রা)-এর গৃহে মধু পানের কারণে স্ত্রীগণের (রা) পারস্পরিক আত্মমর্যাদা-বোধের পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভূত পরিস্থিতিই তালাকের অধিকার প্রদানের কারণ। এক্ষণে যদি উভয় ঘটনা কাছাকাছি সময়েই সংঘটিত হয়ে থাকে, তবে উভয়ই কারণরূপে বিবেচিত হতে পারে। কিন্তু অধিকার প্রদান সংশ্লিষ্ট আয়াতে ব্যবহৃত শব্দাবলী দ্বারা একথারই সমর্থন অধিক মিলে যে, পুণ্যবতী স্ত্রীগণের পক্ষ থেকে কোন প্রকারের আর্থিক দাবিই এর কারণ ছিল। কেননা আয়াতে ইরশাদ হয়েছে যে: إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا الاية অর্থাৎ যদি তোমরা পার্থিব জীবনের জৌলুস ও চাকচিক্য কামনা কর ...।

এ আয়াতে সকল পুণ্যবতী স্ত্রীগণকে (রা) অধিকার প্রদান করা হয়েছে যে, তাঁরা নবীজী (সা)-র বর্তমান দারিদ্র্য পীড়িত চরম আর্থিক সঙ্কটপূর্ণ অবস্থা বরণ করে হয় তাঁর (সা) সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রেখে জীবন যাপন করবেন অথবা তালাকের মাধ্যমে তাঁর থেকে মুক্ত হয়ে যাবেন। প্রথমাবস্থায় অন্যান্য স্ত্রীলোকের তুলনায় পুরস্কার এবং পরকালে স্বতন্ত্র ও সুউচ্চ মর্যাদাসমূহের অধিকারী হবেন! আর দ্বিতীয় অবস্থায়, অর্থাৎ---তালাক গ্রহণের পরিপ্রেক্ষিতেও তাঁদেরকে দুনিয়ার অপরাপর লোকের ন্যায় বিশেষ জটিলতা ও অপ্রীতিকর অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে না; বরং সুন্নত মুতাবিক যুগল বস্ত্র প্রভৃতি প্রদান করে সসম্মানে বিদায় দেওয়া হবে।

তিরমিযী শরীফে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, যখন অধিকার প্রদানের এ আয়াত নাযিল হয় তখন রসূলুল্লাহ্ (সা) আমার থেকে ইহা প্রকাশ ও প্রচারের সূচনা করেন। আর আয়াত শুনানোর পূর্বে বলেন যে, আমি তোমাকে একটি কথা বলব---উত্তরটা কিন্তু তাড়াহুড়া করে দেবে না। বরং তোমার পিতামাতার সাথে পরামর্শের পর উত্তর দেবে। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) বলেন, আমাকে আমার পিতামাতার সাথে পরামর্শ না করে মতামত প্রকাশ করা থেকে যে

বারণ করেছিলেন, তা ছিল আমার প্রতি তাঁর (সা) এক অপার অনুগ্রহ। কেননা তাঁর অটুট বিশ্বাস ছিল যে, আমার পিতামাতা কখখনো আমাকে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র থেকে বিচ্ছেদ অবলম্বনের জন্য পরামর্শ প্রদান করবেন না। এ আয়াত শুনার সংগে সংগেই আমি আরয করলাম যে, এ ব্যাপারে আমার পিতামাতার পরামর্শ গ্রহণের জন্য আমি যেতে পারি কি? আমি তো আল্লাহ্ পাক, তাঁর রসূল ও পরকালকে বরণ করে নিচ্ছি। আমার পরে অন্যান্য সকল পুণ্যবতী পত্নীগণকে (রা) কোরআনে পাকের এ নির্দেশ শোনানো হলো। আমার ন্যায় সবাই একই মত ব্যক্ত করলেন। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাথে দাম্পত্য সম্পর্কের মুকাবিলায় ইহলৌকিক প্রাচুর্য ও স্বাচ্ছন্দ্যকে কেউ গ্রহণ করলেন না (তিরমিযী শরীফে এ হাদীস সহীহ্ ও হাসান বলে মন্তব্য করা হয়েছে)।

ফায়দা ঃ তালাক গ্রহণের দু'টো পদ্ধতি রয়েছে---প্রথমটি এই যে, তালাকের অধিকার স্ত্রীর হাতে ন্যস্ত করা, অর্থাৎ সে যদি চায় তালাকের মাধ্যমে নিজেকে মুক্ত করে নিতে পারে। দ্বিতীয়টি এই যে, তালাকের অধিকার স্বামীর নিকটেই থাকবে। অবশ্য যদি স্ত্রী চায় তখন সে তালাক দেবে।

উল্লিখিত আয়াতে কোন কোন মুফাস্সির প্রথমটি এবং কোন কোন মুফাস্সির দ্বিতীয়টি গ্রহণ করেছেন। হাকীমুল উম্মাত হযরত থানভী (র) বয়ানুল কোরআনে ফরমান যে, উল্লিখিত আয়াতে ব্যবহৃত শব্দসমূহ অনুযায়ী প্রকৃত প্রস্তাবে উভয়টারই সম্ভাবনা রয়েছে। সুস্পষ্ট আয়াত বা হাদীস দ্বারা কোন একটা নির্দিষ্ট না হওয়া পর্যন্ত নিজের পক্ষ থেকে কোনটা নির্দিষ্ট করার প্রয়োজন নেই।

মাস'আলা ঃ এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মিলমিশ স্থাপন সম্ভবপর না হয়, তবে স্ত্রীকে এ অধিকার প্রদান করা মুস্তাহাব যে, চাই সে স্বামীর বর্তমান অবস্থার উপর তুষ্ট থেকে তার সাথে যথারীতি বসবাস করুক, অন্যথায় সুন্নাত মুতাবিক তালাক দিয়ে যুগল বস্ত্রদ্বয় প্রদান করে তাকে সসম্মানে বিদায় দেওয়া হোক।

উল্লিখিত আয়াত দ্বারা এ ব্যাপারটি কেবল মুস্তাহাব বলেই প্রমাণ করা যায়--ইহা ওয়াজিব হওয়ার কোন দলীল নেই। কোন কোন ফিকাহ্ শাস্ত্রবিদ্ এ আয়াত থেকেই ইহা ওয়াজিব হওয়ার প্রমাণ বের করেছেন। এ কারণেই কোন দরিদ্র ব্যক্তি যদি স্ত্রীর যাবতীয় ব্যয়ভার নির্বাহ করতে সক্ষম না হয় সেক্ষেত্রে আদালত তালাক দেওয়ার অধিকার স্ত্রীকেই প্রদান করে। এ মাস'আলার বিস্তারিত বিবরণ আরবী ভাষায় লিখিত আহ্কামুল কোরআনের পঞ্চম পরিচ্ছেদে এ আয়াতেরই প্রসংগক্রমে বর্ণনা করা হয়েছে।

পুণ্যবতী স্ত্রীগণের (রা) একটি বৈশিষ্ট্য ঃ يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ مَنْ يَّأْتِ مِنْكُنَّ

بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُّضٰعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ٥ وَمَنْ يَّقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَآ اَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ الاية এ দু' আয়াতে পুণ্যবতী স্ত্রীগণের (রা) এ বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাঁরা যদি ঘটনাক্রমে কোন পাপ কাজ করেন, তবে তাঁদেরকে অন্যান্য মহিলাগণের তুলনায় দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান করা হবে। অর্থাৎ, তাঁদের এক পাপ দু'টোর স্থলাভিষিক্ত বলে গণ্য করা হবে। অনুরূপভাবে তাঁদের দ্বারা কোন নেক কাজ সংঘটিত হলেও অন্যান্য স্ত্রীলোকের তুলনায় দ্বিগুণ সওয়াব লাভ করবেন, আর তাঁদের একটি নেক কাজ দু'টোর স্থলাভিষিক্ত হবে।

একদিক দিয়ে আয়াত পুণ্যবতী স্ত্রীগণের (ازواج مطهرات) ঐ আমলের প্রতিদান যা তারা অধিকার প্রদানের আয়াত (ايات تخيير) নাযিল হওয়ার পর পার্থিব ভোগ-বিলাস ও প্রাচুর্যের উপর নবীজী (সা)-র সাথে দাম্পত্য সম্পর্ককে অগ্রাধিকার প্রদানের মাধ্যমে সম্পন্ন করেছেন। যার বিনিময়ে আল্লাহ্ পাক তাঁদের একটি আমলকে দু'য়ের মানে উন্নত করেছেন। আর গুনাহ্র বেলায় দ্বিগুণ শাস্তি লাভও তাঁদের স্বতন্ত্র মর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতেই হয়েছে। কেননা একথা সম্পূর্ণ যুক্তিসংগত ও বাস্তব ভিত্তিক যে, যাদের মান মর্যাদা যত উন্নত সে অনুপাতে তাদের নির্লিপ্ততা ও অবাধ্যতার শাস্তিও বৃদ্ধি পায়।

পুণ্যবতী স্ত্রীগণের (ازواج مطهرات) উপর আল্লাহ্ পাকের অনুগ্রহরাজি ছিল অতি মহান। কেননা আল্লাহ্ পাক তাঁদেরকে নবীজী (সা)-র পত্নীরূপে মনোনীত করেছেন---তাঁদের গৃহে ওহী নাযিল করেছেন। সুতরাং তাঁদের নগণ্য ত্রুটি-বিচ্যুতি আর দুর্বলতাও বড় বলে বিবেচিত হবে। যদি এঁদের দ্বারা কোন বেদনাদায়ক কথা বা আচরণ সংঘটিত হয়, তবে তা অন্যদের অনুরূপ আচরণের তুলনায় নবীজীর পক্ষে অধিকতর কঠিন ও মনোকষ্টের কারণ হবে। কোরআনে করীমের এসব শব্দ-সমূহে এর কারণের প্রতি ইঙ্গিত হয়েছে ঃ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلٰى فِىْ بُيُوْتِكُنَّ-

ফায়েদা ঃ সাধারণ উম্মতের তুলনায় পুণ্যবতী স্ত্রীগণ (ازواج مطهرات) তাঁদের কৃতকর্মের দ্বিগুণ ফল লাভ করবেন---এ বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে একথা বোঝায় না যে, উম্মতের কোন ব্যক্তি বা দল বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিগুণ পুরস্কার ও প্রতিদান লাভের অধিকারী হতে পারবে না। বস্তুত আহ্লে

কিতাবের মধ্যে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছেন তাঁদের সম্পর্কে কোরআনে পাকে ইরশাদ হয়েছে أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ তাদেরকে দু'বার প্রতিদান প্রদান করা হবে)।

রসূলুল্লাহ্ (সা) রোম সম্রাটের নামে যে চিঠি প্রেরণ করেন কোরআনের এই ইরশাদানুসারে তিনি (সা) তাতে রোমান সম্রাটকে লিখেন যেঃ يُؤْتِكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ (আল্লাহ্ পাক আপনার প্রতিফল দু'বার প্রদান করবেন)। যেসব আহ্লে কিতাব (কোরআন ব্যতীত অন্য কোন ঐশী গ্রন্থে বিশ্বাসী) ইসলাম গ্রহণ করবে তাদের দু'বার প্রতিফল লাভের কথা তো কোরআনে পাকে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে। অপর এক হাদীসেও তিন ব্যক্তি সম্পর্কে দ্বিগুণ প্রতিফল লাভের কথা বর্ণিত আছে, যা বিস্তারিতভাবে সূরা কাসাসে (سورة قصص) يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ আয়াত প্রসঙ্গে বর্ণনা করা হয়েছে।

আলিমের সৎকাজের প্রতিফল এবং পাপের শাস্তিও অন্যদের চাইতে অধিক ঃ ইমাম আবূ বকর জাস্সাস আহ্কামুল কোরআনে উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহ্ পাক যে কারণে পুণ্যবতী স্ত্রীগণের (أزواج مطهرات) নেক কাজের সওয়াব ও পাপের শাস্তি দ্বিগুণ হবে বলে ঘোষণা করেছেন---তা হলো যে, তারা উলূমে নবুয়ত ও ওহীয়ে ইলাহীর বিশেষ অবতরণ স্থল। সুতরাং যে সব আলিম নিজ ইলম অনুযায়ী আমল করবেন, তাঁরাও তাঁদের আমলের সওয়াব অন্যদের চাইতে অধিক লাভ করবেন। পক্ষান্তরে যদি তাঁরা কোন পাপ কাজে লিপ্ত হন, তবে শাস্তিও হবে অন্যদের চাইতে বেশি।

فَاحِشَةٍ---بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ আরবী ভাষায় অশ্লীলতা, ব্যভিচার প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ শব্দটি সাধারণ পাপ-পঙ্কিলতা অর্থেও কোরআনে পাকে বহু জায়গায় ব্যবহৃত হয়েছে। এ আয়াতে فَاحِشَةٍ শব্দ যিনা বা ব্যভিচার অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে না। কেননা আল্লাহ্ পাক সমস্ত নবীর স্ত্রীকুলকে এই জঘন্য ত্রুটি থেকে মুক্ত রেখেছেন। সমস্ত আম্বিয়া (আ)-র স্ত্রীগণের মধ্যে কারো দ্বারা এরূপ অপকর্ম সংঘটিত হয়নি। হযরত লূত ও নূহ (আ)-এর স্ত্রীগণ তাঁদের ধর্ম থেকে পরান্মুখ ছিল ---অবাধ্যতা ও ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করেছিল---যার শাস্তিও তারা লাভ করেছিল। কিন্তু তাদের কারো উপরই ব্যভিচারের অপবাদ ছিল না। আযওয়াজে মুতাহ্হারাতের থেকে কোন প্রকারের অশালীনতা ও অশ্লীলতার বহিপ্রকাশ তো সম্ভবই ছিল না। সুতরাং এ আয়াতে فَاحِشَةٍ অর্থ সাধারণ গুনাহ্ বা রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দুঃখ-কষ্ট

দেওয়া। এ জায়গায় فاحشة শব্দের সাথে ব্যবহৃত مبينة শব্দের দ্বারা এ কথাই প্রমাণিত হয়। কেননা যিনা বা ব্যভিচার কখনো প্রকাশ্যভাবে সংঘটিত হয় না। বরং তা পর্দার আড়ালে গোপনে সংঘটিত হয়ে থাকে। সুতরাং فاحشة مبينة এর অর্থ সাধারণ পাপ বা রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দুঃখ-যন্ত্রণা দেয়া। বিশিষ্ট মুফাস্সিরগণের মধ্যে মোকাতেল বিন সোলায়মান এ আয়াতে ফাহেশার (فاحشة) অর্থ রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নাফরমানী বা তাঁর নিকট এমন দাবি পেশ করা, যা তাঁর (সা) পক্ষে পূরণ করা কঠিন বলে ব্যক্ত করেছেন।---(বায়হাকী)

কোরআনে করীমে শাস্তি লাভ কেবল (فاحشة مبينة) ---ফাহেশায়ে মোবাইয়েনার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু দ্বিগুণ সওয়াব ও প্রতিফল লাভের জন্য কয়েকটি শর্ত আরোপ করা হয়েছে ; ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا এখানে قنوت অর্থাৎ---আল্লাহ্ পাক ও তাঁর রসূল (সা)-এর অনুসরণ ও আনুগত্য শর্ত এবং সৎকাজও শর্ত। কেননা প্রতিফল ও সওয়াব তো কেবল তখনই লাভ করা যায়, যখন পরিপূর্ণ আনুগত্য ও অনুকরণ পাওয়া যায়। কিন্তু শাস্তির জন্য কেবল একটি পাপই যথেষ্ট।

পুণ্যবতী স্ত্রীগণের প্রতি বিশেষ হিদায়ত ঃ ينساء النبي لستن كاحد من النساء ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول ---পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে পুণ্যবতী স্ত্রীগণকে (রা) রসূলুল্লাহ্ (সা) সমীপে এমন সব দাবি পেশ করতে বারণ করা হয়েছে, তাঁর পক্ষে যা পূরণ করা কঠিন বা যা তাঁর মহান মর্যাদার পক্ষে অশোভনীয়। যখন তাঁরা তা মেনে নিয়েছেন, তখন সাধারণ নারীদের থেকে তাঁদের মর্যাদা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং তাঁদের এক আমলকে দু'য়ের সমতুল্য করে দেওয়া হয়েছে। পরবর্তী পর্যায়ে তাঁদের কর্মের পরিশুদ্ধি এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সান্নিধ্য ও দাম্পত্য সম্পর্কের যোগ্য করে গড়ে তোলার জন্য কয়েকটি হিদায়ত প্রদান করা হয়েছে। এসব হিদায়ত যদিও পুণ্যবতী স্ত্রীগণের (ازواج مطهرات) জন্য নির্দিষ্ট নয়; বরং সমগ্র মুসলিম নারীকুলের প্রতিই তা নির্দেশিত। কিন্তু এখানে তাঁদেরকে (সা) বিশেষভাবে সম্বোধন করে তাঁদের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট করা হয়েছে যে, এসব আমল ও আহ্কাম তো সমস্ত মুসলিম

রমণীকুলের প্রতি ওয়াজিব ও অবশ্য পালনীয়। তাই এগুলোর প্রতি তাঁদের বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা উচিত। আর لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ দ্বারা এ বিশেষত্বই বোঝানো হয়েছে।

নবীজী (সা)-র পুণ্যবতী স্ত্রীগণ বিশ্বের সমস্ত নারীকুলের চাইতে শ্রেষ্ঠ কি? আয়াতের শব্দাবলী দ্বারা বাহ্যিকভাবে বোঝা যায় রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পুণ্যবতী স্ত্রীগণ বিশ্বের সমস্ত নারীকুলের চাইতে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু হযরত মরিয়ম (আ) সম্পর্কে কোরআনের বাণী এই اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفٰكِ عَلٰى نِسَاءِ الْعٰلَمِيْنَ (অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পাক আপনাকে মনোনীত করেছেন, পবিত্র ও কালিমামুক্ত করেছেন এবং বিশ্বের সমস্ত নারীকুলের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছেন।) এ দ্বারা হযরত মরিয়ম (আ) সমস্ত নারীজাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে প্রমাণিত হন। তিরমিযী শরীফে হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন---সমগ্র রমণীকুলের মধ্যে হযরত মরিয়ম, উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজাতুল কোবরা, হযরত ফাতেমা এবং ফিরাউন-পত্নী হযরত আসিয়া (আ)-ই তোমাদের জন্য যথেষ্ট। এ হাদীসে হযরত মরিয়মের সাথে আরো তিনজনকে নারী জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

এ আয়াতে আযওয়াজে মুতাহ্হারাতের যে শ্রেষ্ঠত্ব ও উচ্চ মর্যাদার কথা বলা হয়েছে তা এক বিশেষ দিক বিবেচনায়---নবী-পত্নী হিসাবে। এদিক দিয়ে তাঁরা নিঃসন্দেহে সমস্ত রমণীকুলের চাইতে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু এ দ্বারা সকল দিক দিয়ে তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয় না---যা অনান্য কোরআনের আয়াত ও হাদীসের পরিপন্থী। ---(মাযহারী)

لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ এর পর اِنِ اتَّقَيْتُنَّ আল্লাহ্ পাক তাঁদের নবী-পত্নী হিসাবে যে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছেন, তারই ভিত্তিতে এ শর্ত, এর উদ্দেশ্য এ বিষয়ে সতর্ক করে দেওয়া যেন তাঁরা নবীজী (সা)-র পত্নী হওয়ার সম্পর্কের উপর ভরসা করে বসে না থাকেন। বস্তুত তাঁদের শ্রেষ্ঠত্বের শর্ত হলো তাক্ওয়া এবং আহকামে ইলাহিয়ার অনুসরণ ও অনুকরণ।----(কুরতুবী ও মাযহারী)

এর পর আযওয়াজে মুতাহহারাতের উদ্দেশ্যে কয়েকটি হিদায়ত রয়েছে।

প্রথম হিদায়ত ঃ নারীদের পর্দা সম্পর্কিত তাঁদের কণ্ঠ ও বাক্যালাপ নিয়ন্ত্রণ সংশ্লিষ্ট ঃ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ অর্থাৎ যদি পরপুরুষের সাথে পর্দার অন্তরাল থেকে কথা বলার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় তবে বাক্যালাপের সময় কৃত্রিমভাবে নারী

কণ্ঠের স্বভাবসুলভ কোমলতা ও নাজুকতা পরিহার করবে। অর্থাৎ এমন কোমলতা যা শ্রোতার মনে অবাঞ্ছিত কামনা সঞ্চার করে। যেমন এর পরে বিবৃত হয়েছে فَيَطْمَعَ الَّذِىْ فِىْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ অর্থাৎ---এরূপ কোমল কণ্ঠে বাক্যালাপ করো না যাতে ব্যাধিগ্রস্ত অন্তর বিশিষ্ট লোকের মনে কুলালসা ও আকর্ষণের উদ্রেক করে। ব্যাধি অর্থ নিফাক (কপটতা) বা এর শাখা বিশেষ। প্রকৃত মুনাফিকদের মনে এমন লালসার সঞ্চার হওয়া তো স্বাভাবিক। কিন্তু কোন লোক খাঁটি মু'মিন হওয়া সত্ত্বেও যদি কোন হারামের প্রতি আকৃষ্ট হয় তবে সে মুনাফিক নয় সত্য কিন্তু অবশ্যই দুর্বল ঈমান বিশিষ্ট। এরূপ দুর্বল ঈমান যা হারামের দিকে আকৃষ্ট করে প্রকৃত প্রস্তাবে তা কপটতারই (নিফাকের) শাখা বিশেষ। কপটতার লেশ বিমুক্ত খাঁটি ঈমান বিশিষ্ট লোক কোন হারামের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে না।---(মাযহারী)

প্রথম হিদায়তের সারমর্ম এই যে, নারীদেরকে পরপুরুষ থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করে পর্দার এমন উন্নত স্তর অর্জন করা উচিত, যাতে কোন অপরিচিত দুর্বল ঈমান বিশিষ্ট লোকের অন্তরে কোন কামনা ও লালসার উদ্রেক তো করবেই না বরং তার নিকটেও যেন ঘেঁষতে না পারে। নারীদের পর্দার বিস্তারিত বিবরণ এই সূরারই পরবর্তী আয়াতসমূহের আলোচনা প্রসঙ্গে আলোচিত হবে। এখানে নবীজীর সহ-ধর্মিনীগণের বিশেষ হিদায়তসমূহের সহিত প্রাসংগিকভাবে যা এসেছে শুধু তারই ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। আয়াতে বর্ণিত বাক্যালাপ-সংশ্লিষ্ট হিদায়তসমূহ শ্রবণ করার পর উম্মাহাতুল মু'মিনীনগণের কেহ যদি পরপুরুষের সাথে কথা-বার্তা বলতেন, তবে মুখে হাত রেখে বলতেন---যাতে কণ্ঠস্বর পরিবর্তিত হয়ে যায়। এজন্যই হযরত আমর ইবনুল আস (রা) কর্তৃক বর্ণিত এক হাদীসে রয়েছে ঃ ان النبى صلعم نهى ان تكلم النساء الا باذن ازواجهن — অর্থাৎ নবী করীম (সা) নারী-দেরকে নিজ নিজ স্বামীর অনুমতি ব্যতীত বাক্যালাপ করতে বিশেষভাবে বারণ করেছেন। ---(তাবারানী-মাযহারী)

মাস'আলা ঃ এ আয়াত ও উল্লিখিত হাদীস থেকে এতটুকু প্রমাণিত হয়েছে যে, নারীদের কণ্ঠস্বর সতরের অন্তর্ভুক্ত নয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও সতর্কতামূলক নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়েছে, যা যাবতীয় ইবাদত ও আহকামে অনুসৃত হয়েছে। পরপুরুষ শুনতে পায়---নারীদেরকে এমন উচ্চস্বরে কথা-বার্তা বলতে বারণ করা হয়েছে। নামাযের সময় ইমাম কোন ভুল করলে মুক্তাদিদের মৌখিকভাবে লুকমা দেওয়ার হুকুম রয়েছে। কিন্তু মেয়েদেরকে মৌখিক লুকমা দেওয়ার পরিবর্তে এ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, নিজের এক হাতের পিঠের উপর অপর হাত মেরে তালি বাজিয়ে ইমামকে অবহিত করবে----মুখে কিছু বলবে না।

দ্বিতীয় হিদায়ত---পূর্ণ পর্দা করা সম্পর্কিত। وَقَرْنَ فِىْ بُيُوْتِكُنَّ

وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى- অর্থাৎ তোমরা তোমাদের গৃহে অবস্থান কর এবং জাহিলিয়াত যুগের নারীদের ন্যায় দেহ সৌষ্ঠব ও সৌন্দর্য প্রদর্শন করে ঘোরাফেরা করো না। এখানে পূর্ববর্তী অন্ধযুগ বলে ইসলাম-পূর্ব অন্ধ যুগকে বোঝানো হয়েছে---যা বিশ্বের সর্বত্র বিস্তৃত ছিল। এ শব্দে এ ইঙ্গিত রয়েছে যে, এরপর আবার অপর কোন অজ্ঞতার প্রাদুর্ভাবও ঘটতে পারে, যে সময় এই প্রকার নির্লজ্জতা ও পর্দাহীনতাই বিস্তার লাভ করবে। সেটা সম্ভবত এ যুগের অজ্ঞতাই যা অধুনা বিশ্বের সর্বত্র পরিদৃষ্ট হচ্ছে। এ আয়াতে পর্দা সম্পর্কিত আসল হুকুম এই যে, নারীগণ গৃহেই অবস্থান করবে (অর্থাৎ শরয়ী প্রয়োজন ব্যতীত যেন বাইরে বের না হয়)। সাথে সাথে এ কথাও বলা হয়েছে যে, যেভাবে ইসলামপূর্ব অজ্ঞ যুগের নারীরা প্রকাশ্যভাবে বেপর্দা চলাফেরা করত---তোমরা সেরকম চলাফেরা করো না। تَبَرُّج শব্দের মূল অর্থ---প্রকাশ ও প্রদর্শন করা। এখানে এর অর্থ পরপুরুষ সমীপে স্বীয় সৌন্দর্য প্রদর্শন করা। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছেঃ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ (অর্থাৎ সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে)। নারীদের পর্দা সম্পর্কিত পূর্ণ আলোচনা ও বিস্তারিত আহকাম এ সূরারই পরবর্তী অধ্যায়ে বর্ণিত হবে। এখানে কেবল উল্লিখিত আয়াতের ব্যাখ্যা প্রদত্ত হচ্ছে। এ আয়াতে পর্দা সম্পর্কিত দু'টি বিষয় জানা গেছে। প্রথমত---প্রকৃত প্রস্তাবে আল্লাহ্ পাকের নিকট নারীদের বাড়ি থেকে বের না হওয়াই কাম্য---গৃহকর্ম সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যেই তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে ; এতেই তারা পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করবে। বস্তুত শরীয়তকাম্য আসল পর্দা হল গৃহের অভ্যন্তরে অনুসৃত পর্দা।

দ্বিতীয়ত, একথা জানা গেছে যে, শরয়ী প্রয়োজনের তাকীদে যদি নারীকে বাড়ি থেকে বের হতে হয়, তবে যেন সৌন্দর্য ও দেহ সৌষ্ঠব প্রদর্শন না করে বের হয় ; বরং বোরকা বা গোটা শরীর আবৃত করে ফেলে---এমন চাদর ব্যবহার করে বের হবে। যেমন সামনে সূরা আহযাবেরই وَيُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ- আয়াতে ইনশাআল্লাহ্, বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

গৃহে অবস্থান প্রয়োজন সম্পর্কিত হুকুমের অন্তর্গত নয়ঃ قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ দ্বারা নারীদের ঘরে অবস্থান ওয়াজিব করে দেওয়া হয়েছে। এর মর্ম এই যে, নারীর পক্ষে ঘর থেকে বের হওয়া সাধারণভাবে তো নিষিদ্ধ ও হারাম। কিন্তু প্রথমত এ আয়াতেই وَلَا تَبَرَّجْنَ দ্বারা এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, প্রয়োজনের পরি-প্রেক্ষিতে বের হওয়া নিষিদ্ধ নয়। বরং সৌন্দর্য প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে বের হওয়া নিষিদ্ধ।

দ্বিতীয়ত, এই সূরায়ে আহযাবেরই পরবর্তীতে উল্লিখিত يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ আয়াতে এ হুকুমই রয়েছে যে, বিশেষ প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে মেয়েদের বোরকা বা অন্য কোন প্রকারে পর্দা করে ঘর হতে বের হওয়ার অনুমতি আছে।

এতদ্ভিন্ন রসূলুল্লাহ্ (সা) এক হাদীস দ্বারাও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রসমূহ যে এ হুকুমের অন্তর্গত নয়, তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন। যেখানে পুণ্যবতী সহধর্মিণীগণকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে ঃ قد اذن لكن ان تخرجن لحاجتكن (رواه مسلم) অর্থাৎ "প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে তোমাদেরকে বাড়ি থেকে বের হওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।" এতদ্ভিন্ন পর্দার আয়াত নাযিল হওয়ার পরও রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আমল এ সাক্ষ্য প্রদান করে যে, প্রয়োজনীয় স্থলে মেয়েদের ঘর থেকে বের হওয়ার অনুমতি রয়েছে। যেমন হজ্জ ও ওমরার সময় হুযূর (সা)-এর সাথে তাঁর সহধর্মিণীগণের গমনের কথা বহু বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। অনুরূপভাবে তাঁর সাথে তাঁদের বিভিন্ন যুদ্ধে গমন করাও প্রমাণিত রয়েছে। আবার অনেক রেওয়ায়েতে এ প্রমাণও পাওয়া যায় যে, নবীজীর পুণ্যবতী স্ত্রীগণ পিতা-মাতা ও অন্যান্য মুহ্‌রিম আত্মীয়দের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে নিজেদের বাড়ি থেকে বের হতেন এবং আত্মীয়-স্বজনের রোগ-ব্যাধির তথ্য নিতে যেতেন ও শোকানুষ্ঠান প্রভৃতিতে অংশগ্রহণ করতেন। এছাড়া নবীজী (সা)-র জীবদ্দশায় তাঁদের মসজিদে যাওয়ারও অনুমতি ছিল।

শুধু হুযূর (সা)-এর সাথে ও তাঁর সময়েই এমন ঘটেনি ; বরং হুযূরের ইন্তেকালের পরও হযরত সাওদা ও যয়নাব বিনতে জাহ্‌শ (রা) ব্যতীত অন্যান্য সকল পুণ্যবতী স্ত্রীগণের হজ্জ ও ওমরার উদ্দেশ্যে গমন করার প্রমাণ রয়েছে। আর এ সম্পর্কে সাহাবায়ে কিরাম (রা)-ও কোন আপত্তি তোলেন নি। বরং ফারুকে আযম (রা)-এর খিলাফতকালে তিনি স্বয়ং উদ্যোগ নিয়ে তাদেরকে হজ্জে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। হযরত উসমান গনী (রা)-ও আবদুর রহমান বিন আওফ (রা)-কে তাঁদের ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধানের জন্য প্রেরণ করেন। হুযূর (সা)-এর ইন্তেকালের পর উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাওদা ও হযরত যয়নাব বিনতে জাহ্‌শের হজ্জ ও ওমরায় না যাওয়া এ আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে ছিল না ; বরং অপর এক হাদীসের ভিত্তিতে ছিল। তা এই যে, বিদায় হজ্জে রসূলুল্লাহ্ (সা) নিজের সাথে সহধর্মিণীগণকে হজ্জ সমাপনান্তে ফেরার পথে বলেন هذه ثم لزوم الحصر — এখানে هذه দ্বারা হজ্জের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং حصر—حصير-এর বহুবচন। যার অর্থ—চাটাই। হাদীসের মর্ম এই যে, তোমাদের বের হওয়া কেবল এজন্য হয়েছে। এরপর নিজেদের বাড়ির চাটাই আঁকড়ে ধরবে—সেখান থেকে বের হবে না। হযরত সাওদা (রা) ও যয়নাব (রা) হাদীসের অর্থ এরূপ করেছেন যে, তোমাদের বের হওয়া কেবল বিদায় হজ্জের জন্যই

বৈধ ছিল, এর পরে আর জায়েয নেই। বাকী অন্য সহধর্মিণীগণ, যাঁদের মধ্যে হযরত আয়েশা (রা)-র ন্যায় শ্রেষ্ঠ ফকীহও শামিল ছিলেন, সবাই হাদীসের মর্ম এরূপ বলে মন্তব্য করেছেন যে, তোমাদের এ সফর যেরূপ এক শরয়ী ইবাদত সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে ছিল তোমাদের অনুরূপ উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হওয়া জায়েয। অন্যথায় গৃহেই অবস্থান করা অবশ্য কর্তব্য।

সারকথা এই যে, কোরআনে পাকের ইঙ্গিত, নবীজীর আমল ও সাহাবাগণের ইজমা (সর্বসম্মত মত) অনুসারে প্রয়োজন স্থলসমূহ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ আয়াতের মর্মের অন্তর্গত নয়, হজ্জ-ওমরাহও যার অন্তর্ভুক্ত। আর স্বাভাবিক প্রয়োজনাদি, নিজের পিতামাতা, মুহ্‌রিম আত্মীয়দের সহিত সাক্ষাৎ, অসুস্থ থাকা বিধায় এদের সেবা-শুশ্রূষা, অনুরূপভাবে যদি কারো জীবিকা নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় সামান বা অন্য কোন পন্থা না থাকে, তবে চাকুরী ও কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে বের হওয়াও এরই আওতাভুক্ত। প্রয়োজন স্থলসমূহে বের হওয়ার জন্য শর্ত হলো—অঙ্গ সৌষ্ঠব ও সৌন্দর্য প্রদর্শন করে বের না হওয়া; বরং বোরকা বা বড় চাদর পরে বের হওয়া।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-র বসরা গমন এবং উষ্ট্র যুদ্ধে (জংগে জামাল) তাঁর ভূমিকা সম্পর্কে রাফেযীদের অসার ও অযৌক্তিক মন্তব্য :

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা একথা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়েছে যে, কোরআন পাকের ইঙ্গিত, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আমল এবং সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর ইজমা (সর্বসম্মত রায়) দ্বারা প্রমাণিত যে, প্রয়োজনীয় স্থলসমূহ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ--আয়াতের আওতাবহির্ভূত---হজ্জ ও ওমরাহ প্রভৃতি ধর্মীয় প্রয়োজনসমূহ যার অন্তর্ভুক্ত। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা, হযরত উম্মে সালমা এবং সফিয়্যা (রা) হজ্জ উপলক্ষে মক্কায় তশরীফ নেন, তাঁরা সেখানে হযরত উসমান (রা)-এর শাহাদত ও বিদ্রোহ-সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলীর সংবাদ পেয়ে অত্যন্ত মর্মাহত হন এবং মুসলমানদের পারস্পরিক অনৈক্যের ফলে মুসলিম উম্মতের সংহতি বিনষ্ট হওয়া আর সম্ভাব্য অশান্তি ও উচ্ছৃংখলার আশংকায় বিশেষভাবে উৎকণ্ঠিত ও উদ্বেগাকুল হয়ে পড়েন। এমতাবস্থায় হযরত তালহা, হযরত যুবায়ের, হযরত নোমান বিন বশীর, হযরত কা'ব বিন আযরা এবং আরো কিছুসংখ্যক সাহাবী (রা) মদীনা থেকে পালিয়ে মক্কা পৌঁছেন। কেননা হযরত উসমান (রা)-এর হত্যাকারীগণ এঁদেরকেও হত্যা করার পরিকল্পনা নিয়েছিল। এঁরা বিদ্রোহীদের সাথে শরীক হতে পারেন নি। বরং এ কাজ থেকে তাদেরকে বারণ করছিলেন। হযরত উসমান (রা)-এর হত্যার পর বিদ্রোহীরা এঁদেরকেও হত্যার পরিকল্পনা করে। তাই তাঁরা প্রাণ নিয়ে মক্কা মোয়াজ্জমা এসে পৌঁছেন এবং উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা)-র খিদমতে এসে পরামর্শ চান। হযরত সিদ্দীকা (রা) তাঁদেরকে পরামর্শ দিলেন যে, যে পর্যন্ত বিদ্রোহীরা হযরত আলীকে পরিবেষ্টন

করে থাকবে সে পর্যন্ত যেন তাঁরা মদীনায় ফিরে না যান। আর যেহেতু তিনি তাদের প্রতিকার ও বিচার-বিধান থেকে বিরত থাকছেন ; সুতরাং আপনারা কিছুকাল যেখানে নিজেদেরকে নিরাপদ মনে করেন সেখানে গিয়ে অবস্থান করুন। যে পর্যন্ত আমীরুল মু'মিনীন (রা) পরিস্থিতি আয়ত্তে এনে শৃংখলা বিধানে সক্ষম না হন, সে পর্যন্ত আপনারা বিদ্রোহীদেরকে আমীরুল মু'মিনীনের চতুর্দিক থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার লক্ষ্যে সাধ্যানুসারে চেষ্টা করতে থাকুন, যাতে আমীরুল মু'মিনীন তাদের প্রতিকার ও প্রতিশোধ গ্রহণে সক্ষম হন।

এসব মহাত্মাবৃন্দ এ কথায় রাযী হয়ে বসরা চলে যেতে মনস্থ করেন। কেননা সে সময় তথায় মুসলিম সৈন্যবাহিনী অবস্থান করছিল। এসব মহাত্মাবৃন্দ তথায় যেতে মনস্থির করার পর তাঁরা উম্মুল মু'মিনীন হযরত সিদ্দীকা (রা)-র খিদমতে আরয করলেন যে, যতদিন পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় শৃংখলা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত না হয়, ততদিন পর্যন্ত তিনিও যেন তাঁদের সাথে বসরাতেই অবস্থান করেন।

সে সময়ে হযরত উসমান (রা)-এর হত্যাকারীদের দাপট ও দৌরাত্ম্য এবং তাদের প্রতি আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী (রা)-র শরীয়তী শাস্তি প্রয়োগ অক্ষমতার কথা স্বয়ং নাহজুল-বালাগতের রেওয়ায়েতেও স্পষ্টভাবে বিদ্যমান। উল্লেখযোগ্য যে, নাহজুল-বালাগা শিয়া পণ্ডিতবর্গের নিকট বিশেষ প্রামাণ্য গ্রন্থ বলে সমাদৃত। এই গ্রন্থে রয়েছে যে, হযরত আলী (রা)-কে তাঁর বেশ কিছুসংখ্যক সুহৃদ ও অন্তরঙ্গ বন্ধুবর্গ পর্যন্ত এই মর্মে পরামর্শ দেন যে, যদি আপনি হযরত উসমান (রা)-এর হত্যাকারীদের যথোচিত শাস্তি বিধান করেন তবেই তা বিশেষ কল্যাণ ও সুফল বয়ে আনবে। প্রতিউত্তরে হযরত আমীরুল মু'মিনীন ফরমান যে, ভাই সকল! তোমরা যা বলছ সে সম্পর্কে আমি অজ্ঞ নই। কিন্তু এসব হাঙ্গামা সৃষ্টিকারীদের দ্বারা মদীনা পরিবেষ্টিত থাকা অবস্থায় তা কি করে সম্ভব? তোমাদের ক্রীতদাস ও পার্শ্ববর্তী বেদুঈনরা পর্যন্ত তাদের সাথে রয়েছে। এমতাবস্থায় যদি তাদের শাস্তির নির্দেশ জারী করে দেই তবে তা কার্যকর হবে কিভাবে?

হযরত সিদ্দীকা (রা) একদিকে আমীরুল-মু'মিনীন (রা)-এর অক্ষমতা সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিফহাল ছিলেন। অপরদিকে হযরত উসমান (রা)-এর শাহাদতের কারণে মুসলমানগণ যে চরমভাবে মর্মাহত হয়েছেন সে সম্পর্কেও পূর্ণভাবে অবহিত ছিলেন। হযরত উসমান (রা)-এর হত্যাকারীরা আমীরুল-মু'মিনীন (রা)-এর মজলিস-সমূহে সশরীরে শরীক থাকা সত্ত্বেও---তিনি একান্ত অক্ষম ছিলেন বলে তাদের শাস্তি বিধান ও তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ বিলম্বিত হচ্ছিল, যারা আমীরুল মু'মিনীন (রা)-এর এই অক্ষমতা সম্পর্কে অবহিত ছিল না, এ ব্যাপারেও তারা তাঁকে অভিযুক্ত করছিল। যাতে এ অভিযোগ-অনুযোগ অন্য কোন অশান্তি ও উচ্ছৃংখলার সূচনা না করে, সেজন্য জনগণকে ধৈর্য ধারণের অনুরোধ করা, আমীরুল-মু'মিনীনের শক্তি সঞ্চার করে রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা সুদৃঢ় করা এবং পারস্পরিক অভিযোগ-অনুযোগ ও ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটিয়ে উম্মতের মাঝে শান্তি ও সংহতি স্থাপনের উদ্দেশ্যে

তিনি (হযরত সিদ্দীকা) বসরা রওয়ানা করেন। এ সময়ে ভাগ্নে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যুবায়ের (রা) প্রমুখও তাঁর সাথে ছিলেন। এ সফরের যে উদ্দেশ্য স্বয়ং উম্মুল মু'মিনীন (রা) হযরত কা'কার (রা) নিকট ব্যক্ত করেছেন, তা পরবর্তী পর্যায়ে বর্ণিত হবে। এই চরম অশান্তি ও অরাজকতার সময় মু'মিনদের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা যে কত মহান ও গুরুত্বপূর্ণ দীনি খিদমত ছিল, তা একেবারে সুস্পষ্ট। এতদুদ্দেশ্যে যদি উম্মুল মু'মিনীন (রা)-এর স্বীয় মুহ্‌রিম আত্মীয়-স্বজনের সাথে উটের হাওদায় পূর্ণ পর্দার মধ্যে বসরা গমনকে কেন্দ্র করে "তিনি কোরআনী আহকামের বিরুদ্ধাচরণ করেছেন" বলে শিয়া ও রাফেযী সম্প্রদায় অপপ্রচার করে থাকে, তবে তার কোন যৌক্তিকতা ও সারবত্তা আছে কি?

মুনাফিক ও দুষ্কৃতকারীদের যে অপকীর্তি পরবর্তী পর্যায়ে গৃহযুদ্ধের রূপ পরিগ্রহ করেছিল, সে সম্পর্কে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-র কোন ধারণা বা কল্পনাও ছিল না। এ আয়াতের তফসীরের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। উষ্ট্রযুদ্ধের (জঙ্গে জামাল) সবিস্তার আলোচনার স্থান এটা নয়। নিছক প্রকৃত সত্য উদঘাটনের উদ্দেশ্যে এ প্রসংগে সংক্ষিপ্তভাবে কয়েকটি কথা লিখা হচ্ছে মাত্র।

পারস্পরিক বিভেদ ও দ্বন্দ্ব-কলহের সময় সাধারণত যে সব অবস্থার সৃষ্টি হয় ও যে সব রূপ ধারণ করে, সে সম্পর্কে চক্ষুষ্মান ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ গাফিল ও নির্লিপ্ত থাকতে পারে না। এ ক্ষেত্রেও এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল যে, সাহাবায়ে কিরাম সমেত হযরত সিদ্দীকা (রা)-র মদীনা হতে বসরা গমনের ঘটনাকে মুনাফিক ও দুষ্কৃতকারীরা আমীরুল-মু'মিনীন হযরত আলী (রা)-র সমীপে বিকৃত করে এভাবে পেশ করে যে, এরা সব আপনার সাথে মুকাবিলা করার জন্য প্রয়োজনীয় সৈন্য সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে বসরা যাচ্ছে। সুতরাং আপনি যদি সত্যি খলীফা হয়ে থাকেন, তবে যাতে এ ফিতনা অগ্রসর হতে না পারে সেজন্য সেখানে গিয়ে অঙ্কুরেই এটা প্রতিহত করা আপনার একান্ত কর্তব্য। হযরত হাসান, হযরত হুসায়ন, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাফর, হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) প্রমুখ বিশিষ্ট সাহাবী তাঁদের এ মতের বিরুদ্ধাচরণ করে খলীফা (রা)-কে এ পরামর্শ দেন যে, সেখানকার প্রকৃত অবস্থা অনুধাবন না করা পর্যন্ত আপনি তাদের মুকাবিলার জন্য সৈন্য প্রেরণ করবেন না। কিন্তু অপর মত পোষণকারীদের সংখ্যাই ছিল অনেক বেশি। হযরত আলী (রা)-ও এদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে সৈন্যদের সাথে বের হয়ে পড়েন এবং এই অপকৃষ্ট অশান্তি সৃষ্টিকারী বিদ্রোহীরাও তাঁর সাথে রওয়ানা করে।

এঁরা বসরার সন্নিকটে পেঁৗছে অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হযরত উম্মুল মু'মিনীনের খিদমতে হযরত কা'কা (রা)-কে প্রেরণ করেন। তিনি উম্মুল মু'মিনীনের খেদমতে আরয করেন যে, আপনার এখানে আগমনের কারণ কি? প্রত্যুত্তরে হযরত সিদ্দীকা (রা) বলেনঃ أى بنى الاصلاح بين الناس – অর্থাৎ হে প্রিয় বৎস! মানুষের মাঝে শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এখানে এসেছি। অতঃপর হযরত তালহা ও

হযরত যুবায়ের (রা)-কেও হযরত কা'কা (রা)-র আলোচনা সভায় ডেকে আনা হল। হযরত কা'কা (রা) তাঁদেরকে বললেন যে, আপনারা কি চান। তাঁরা বললেন যে, হযরত উসমানের হত্যাকারীদের প্রতি শরীয়তী শাস্তি প্রয়োগ করা ব্যতীত আমাদের অন্য কোন দাবি বা আকাঙ্ক্ষা নেই। হযরত কা'কা (রা) তাঁদেরকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন, যে পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহ সুসংবদ্ধ ও সুসংহত না হয়, সে পর্যন্ত এটা কার্যকর করা সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় আপোস-মীমাংসা ও শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করা আপনাদের একান্ত কর্তব্য।

এসব মহান ব্যক্তিও একথা সমর্থন করলেন। হযরত কা'কা (রা) ফিরে গিয়ে আমীরুল মু'মিনীনকে এ সম্পর্কে অবহিত করায় তিনিও বিশেষভাবে সন্তুষ্ট ও আনন্দিত হন এবং সবাই ফিরে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। আর এ প্রান্তরে পরবর্তী তিন দিন পর্যন্ত অবস্থানকালে এমন পরিস্থিতি বিরাজমান ছিল যে, এ সম্পর্কে কারো বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না যে, উভয় পক্ষের মাঝে শান্তিচুক্তি অনুষ্ঠিত হওয়ার ঘোষণা অনতিবিলম্বে প্রচারিত হয়ে যাচ্ছে। চতুর্থ দিন ভোরে হযরত উসমান (রা)-এর হত্যাকারীদের অনুপস্থিতিতে হযরত তালহা ও হযরত যুবায়েরের সাথে আমীরুল মু'মিনীনের সাক্ষাত-কারের পর এরূপ ঘোষণা প্রচারিত হতে যাচ্ছিল। কিন্তু এরূপ শান্তি প্রতিষ্ঠা হযরত উসমানের হত্যাকারী দুর্বৃত্তদের মোটেও কাম্য ও মনঃপূত ছিল না। তাই তারা এরূপ পরিকল্পনা গ্রহণ করল যে, তারা প্রথমে হযরত সিদ্দীকা (রা)-র দলের মধ্যে প্রবেশ করে ব্যাপকভাবে হত্যাকাণ্ড ও লুটতরাজ আরম্ভ করবে, যাতে তিনি (হযরত সিদ্দীকা) ও তাঁর সঙ্গীগণ হযরত আলী (রা)-র পক্ষ থেকে বিশ্বাসঘাতকতা ও চুক্তি ভঙ্গ হয়েছে বলে মনে করেন। আর এরা এই ভুল বোঝাবুঝির শিকার হয়ে হযরত আলী (রা)-র সৈন্যবাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। এদের এ চাল ও কূট-কৌশল সফল হল। হযরত আলী (রা)-র বাহিনীভুক্ত দুষ্কৃতকারীদের পক্ষ থেকে যখন হযরত সিদ্দীকা (রা)-র জামাতের উপর আক্রমণ শুরু হল তখন তাঁরা একথা বুঝতে একান্ত বাধ্য ছিলেন যে, এ আক্রমণ আমীরুল মু'মিনীনের সৈন্যবাহিনীর পক্ষ থেকেই হয়েছে। তাই এদের পক্ষ থেকে প্রতি-আক্রমণও আরম্ভ হয়ে গেল। এ পরিস্থিতিতে আমীরুল মু'মিনীন যুদ্ধ ভিন্ন অন্য কোন গতি দেখতে পেলেন না। আর গৃহ-যুদ্ধের যে মর্মন্তুদ ঘটনা হওয়ার ছিল তা হয়ে গেল إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ তাবারী ও অন্যান্য প্রামাণ্য ঐতিহাসিকগণ এ ঘটনা ঠিক এরূপভাবেই হযরত হাসান (রা), হযরত আবদুল্লাহ বিন জাফর (রা), হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রা) প্রমুখ সাহাবায়ে কিরামের রেওয়ায়েত থেকে উদ্ধৃত করেছেন।--- روح المعانى

মোটকথা দুষ্কৃতকারী পাপাচারীদের দুরভিসন্ধি ও কূট-কৌশলের পরিণতিতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃতভাবে নিরপরাধ ও পূত-পবিত্র এ দু'পক্ষের মাঝে যুদ্ধ পর্যন্ত সংঘটিত

হয়ে গেল, কিন্তু ফিতনা ও দুর্যোগ কেটে যাওয়ার পর উভয় মহান ব্যক্তিত্বই অত্যন্ত মর্মাহত ও বিচলিত হন। এ মর্মন্তুদ ঘটনা হযরত সিদ্দীকা (রা)-র স্মরণ হলে তিনি এমন অজস্র ধারায় কাঁদতে থাকতেন যে, তাঁর দোপাট্টা পর্যন্ত অশ্রুসিক্ত হয়ে যেত। অনুরূপভাবে হযরত আলী (রা)-ও এ ঘটনায় বিশেষভাবে মর্মাহত হন। ফিতনা ও দুর্যোগ স্তিমিত হওয়ার পর যখন তিনি নিহতদের লাশ স্বচক্ষে দেখতে তশরীফ নেন তখন নিজ উরুতে হাত মেরে মেরে বলতে লাগলেন যে, যদি এ ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই আমি মৃত্যুবরণ করতাম কতই না ভাল হত।

কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, উম্মুল মু'মিনীন (রা) যখন কোরআনের আয়াত وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ পাঠ করতেন তখন কেঁদে ফেলতেন। ফলে তাঁর দোপাট্টা অশ্রুসিক্ত হয়ে যেত।---(রূহুল মা'আনী)

উল্লিখিত আয়াত পাঠকালে কেঁদে ফেলা এজন্য ছিল না যে, তিনি গৃহে অবস্থানের বিরুদ্ধাচরণ পাপ বলে মনে করতেন অথবা প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে সফর নিষিদ্ধ ছিল। বরং বাড়ি থেকে বের হওয়ার দরুন যে অবাঞ্ছিত ও অনভিপ্রেত হৃদয়-বিদারক ঘটনা সংঘটিত হল তারই পরিপ্রেক্ষিতে স্বভাবত সৃষ্ট সন্তাপ ও মর্মবেদনাই ছিল এর কারণ (এসব রেওয়ায়েত ও যাবতীয় তথ্য তফসীরে রূহুল মা'আনী থেকে সংগৃহীত হয়েছে)।

নবীজীর সহধর্মিণীগণের প্রতি কোরআনের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম হিদায়ত ঃ وَأَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَاٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ وَاَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ অর্থাৎ নামায প্রতিষ্ঠা কর, যাকাত প্রদান কর এবং মহান আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা)-এর অনুসরণ কর। দু'-হিদায়ত সংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণ পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, পরপুরুষের সাথে বাক্যালাপের সময় আপত্তিকর কোমলতা ও নাজুকতা পরিহার---বিনা প্রয়োজনে গৃহাভ্যন্তর থেকে বের হওয়া এবং এ আয়াতে রয়েছে তিন হিদায়ত। এ হল সর্বমোট পাঁচ হিদায়ত---যা নারীকুল সম্পর্কিত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় বিষয়সমূহের অন্তর্গত।

এ পাঁচ হিদায়তের সব কয়টি সমস্ত মুসলমানগণের প্রতি সমভাবে প্রযোজ্য ঃ উপরোক্ত হিদায়তসমূহের মধ্যে শেষোক্ত তিনটি নবীজীর পুণ্যবতী সহধর্মিণীগণের জন্য নির্দিষ্ট না হওয়া সম্পর্কে তো কারো সন্দেহের অবকাশ নেই। কোন মুসলিম নারী-পুরুষই নামায, যাকাত এবং আল্লাহ্ ও রসূলের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের আওতা-বহির্ভূত নয়। বাকী রইল নারীকুলের পর্দা সংশ্লিষ্ট অবশিষ্ট দু-হিদায়ত। একটু চিন্তা করলে এও পরিষ্কার হয়ে যায় যে, উহাও কেবল নবীজীর পুণ্যবতী স্ত্রীগণের জন্য নির্দিষ্ট নয়---বরং সমস্ত মুসলিম নারীগণের প্রতিও একই হুকুম। এখন কথা হল এসব হিদায়ত বর্ণনার পূর্বেই কোরআনে পাকে বলা হয়েছে যে ঃ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ

مِّنَ النِّسَاءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ অর্থাৎ পুণ্যবতী নবী-পত্নীগণ যদি তাক্ওয়া ধারণ করে তবে তাঁরা অন্যান্য সাধারণ নারীদের ন্যায় নন। এদ্বারা বাহ্যত এ হিদায়তসমূহ নবী-পত্নীগণের জন্যই নির্দিষ্ট বলে মনে হয়। এর স্পষ্ট জওয়াব এই যে, এ নির্দিষ্টকরণ আহ্কামের দিক দিয়ে নয়; বরং এগুলোর উপর আমলের গুরুত্বের উপর নির্ভরশীল অর্থাৎ পুণ্যবতী স্ত্রীগণ অন্যান্য সাধারণ নারীদের ন্যায় নন। বরং এঁদের মর্যাদা-সর্বাধিক উন্নত ও উর্ধ্বতম। সুতরাং যেসব হুকুম সমস্ত নারীকুলের প্রতি ফরয, এগুলোর প্রতি এঁদের সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা উচিত। আল্লাহ্ মহীয়ান গরীয়ানই সর্বাধিক জ্ঞাত।

اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে পুণ্যবতী স্ত্রীগণকে সম্বোধন করে যেসব হিদায়ত প্রদান করা হয়েছে, সেগুলো যদিও তাঁদের জন্যে নির্দিষ্ট ছিল না; বরং গোটা উম্মতের প্রতিই এসব হুকুম প্রযোজ্য। কিন্তু পুণ্যবতী স্ত্রীগণকে এজন্য বিশেষভাবে সম্বোধন করা হয়েছে, যাতে তাঁরা নিজেদের মর্যাদা ও নবীগৃহের বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে এসব আমল ও ক্রিয়াকর্মের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। এ আয়াতে এই বিশেষ সম্বোধনের তাৎপর্য বর্ণনা প্রসংগে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্র নিকট আমল (কর্ম) পরিশুদ্ধির বিশেষ হিদায়তের মর্ম ও তাৎপর্য নবীজীর গৃহবাসীগণকে যাবতীয় কলুষতা বিমুক্ত করে দেওয়া

رِجْس শব্দটি আরবী ভাষায় বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। এক জায়গায় رِجْس প্রতিমা ও বিগ্রহ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। وَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ আবার কখনো নিছক পাপ অর্থে, কখনো আযাব অর্থে, কখনো কলুষতা ও অপবিত্রতা অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ আয়াতে এ অর্থই বোঝানো হয়েছে। (বাহরে মুহীত)

আয়াতে আহ্লে বায়তের মর্ম কি? উপরোক্ত আয়াতসমূহে নবী-পত্নীগণকে সম্বোধন করা হয়েছিল বলে স্ত্রীলিঙ্গ বাচক ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু এখানে পুণ্যবতী স্ত্রীগণের সাথে সাথে তাঁদের সন্তান-সন্ততি এবং পিতামাতাও আহ্লে বায়তের (اَهْلِ بَيْت) অন্তর্ভুক্ত। সেজন্যই পুংলিঙ্গ পদ عَنْكُمْ وَيُطَهِّرَكُمْ ব্যবহার করা হয়েছে। আবার কোন কোন মুফাস্সিরের মতে আহ্লে বায়ত দ্বারা কেবল নবীজীর পুণ্যবতী স্ত্রীগণকেই বোঝানো হয়েছে। হযরত ইকরামা এবং হযরত মুকাতিল এ মতই পোষণ করেছেন হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হযরত সাঈদ বিন যুবায়েরের রেওয়ায়েতেও তিনি আহ্লে বায়তের অর্থ পুণ্যবতী স্ত্রীগণ (রা)

বলেই মন্তব্য করেছেন এবং প্রমাণ স্বরূপ এ আয়াত وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ পেশ করেছেন (ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন) এবং পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে نِسَاءَ النَّبِيِّ দিয়ে সম্বোধনও এরই সমর্থন করে। হযরত ইকরামা (রা) তো প্রকাশ্য বাজারে উচ্চৈস্বরে বলতে থাকতেন যে, এ আয়াতে আহলে বায়ত দ্বারা পুণ্যবতী স্ত্রীগণকেই বোঝানো হয়েছে---কেননা এ আয়াত তাঁদের শানেই নাযিল হয়েছে। তিনি বলতেন যে, এ সম্পর্কে আমি মোবাহালা (পুত্র-পরিজনের মাথায় হাত রেখে শপথ) করে বললে বলতেও প্রস্তুত আছি।

কিন্তু হাদীসের বিভিন্ন রেওয়ায়েতে, যেগুলো ইবনে কাসীর এখানে নকল করেছেন---এ কথারই সাক্ষ্য বহন করে যে, হযরত ফাতিমা, হযরত হাসান-হুসায়নও আহলে বায়তের অন্তর্ভুক্ত। যেমন মুসলিম শরীফে হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, একদা হযরত রসূলুল্লাহ্ (সা) বাড়ি থেকে বাইরে তশরীফ নিতে যাচ্ছিলেন। সে সময় তিনি একটি কালো রুমী চাদর জড়ানো ছিলেন। এমন সময় সেখানে হযরত হাসান, হযরত হুসায়ন, হযরত ফাতিমা ও হযরত আলী (রা)---এঁরা সবাই একের পর এক তশরীফ আনেন। নবীজী (সা) এদের সবাইকে চাদরের ভিতরে প্রবেশ করিয়ে নিয়ে আয়াত إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا তিলাওয়াত করেন। আবার কোন কোন রেওয়ায়েতে এরূপ রয়েছে যে, আয়াত তিলাওয়াত করার পর তিনি ফরমান اللهم هؤلاء اهل بيتى (হে আল্লাহ্ এরাই আমার আহ্‌লে বায়ত।---(ইবনে জারীর)

ইবনে কাসীর এ সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীস বর্ণনা করে বলেন যে, প্রকৃত প্রস্তাবে মুফাসসিরগণ প্রদত্ত এসব মতাবলীর মধ্যে পরস্পর কোন বিরোধ নেই। যারা একথা বলেন যে, আয়াত পুণ্যবতী স্ত্রীগণের শানে নাযিল হয়েছে এবং আহ্‌লে বায়ত বলে তাঁদেরকেই বোঝানো হয়েছে, তাঁদের এ মত অন্যান্যগণও---আহ্‌লে বায়তের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পরিপন্থী নয়। সুতরাং এটাই ঠিক যে, পুণ্যবতী স্ত্রীগণও আহ্‌লে বায়তের অন্তর্গত। কেননা, এ আয়াতের শানে নুযূলও এই। শানে নুযূলের মর্ম আয়াতে অন্তর্ভুক্ত হওয়া সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। আবার নবীজীর ইরশাদ মুতাবিক হযরত ফাতিমা, আলী, হাসান-হুসায়ন (রা)-ও আহ্‌লে বায়তের অন্তর্গত। আর এ আয়াতের পূর্বে ও পরে উভয় স্থলে نِسَاءَ النَّبِيِّ শিরোনামে

সম্বোধনা করা হয়েছে এবং এজন্য স্ত্রীলিঙ্গবাচক পদ ব্যবহৃত হয়েছে। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে فلا تخضعن بالقول থেকে আরম্ভ করে শেষ পর্যন্ত সমস্ত পদ স্ত্রীলিঙ্গ রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। আর পরবর্তী পর্যায় واذكرن ما يتلى-তেও স্ত্রীলিঙ্গ-বিশিষ্ট পদে সম্বোধন করা হয়েছে। এই মধ্যবর্তী আয়াতেও পূর্বাপরের ব্যতিক্রম করে পুংলিঙ্গ পদ عنكم ও يطهركم এর ব্যবহারও একথা বিশেষভাবে প্রমাণ করে যে, এ আয়াতে কেবল নারীগণ অন্তর্ভুক্ত নয়, কিছুসংখ্যক পুরুষও এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

উল্লিখিত আয়াতে ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا দ্বারা স্পষ্টত একথাই বোঝানো হয়েছে যে, এসব হিদায়তের মাধ্যমে আল্লাহ্ পাক আহ্লে বায়তকে শয়তানের প্রতারণা, পাপ-পঙ্কিলতা ও অশ্লীলতাসমূহ থেকে রক্ষা করবেন এবং পবিত্র করে দেবেন। মোটকথা এখানে শরীয়তগত পবিত্র-করণকে বোঝানো হয়েছে। সৃষ্টি ও জন্মগত পবিত্রকরণ, যা নবীগণের বৈশিষ্ট্য তা বোঝানো হয়নি। কিন্তু এদ্বারা এ কথা বোঝা যায় না যে, এরা সব নিষ্পাপ; এবং নবীগণ (সা)-এর ন্যায় তাঁদের দ্বারা কোন পাপ সংঘটিত হওয়া সম্ভবপরই নয়। জন্মগত শুদ্ধাচারিতা ও পবিত্রতার যা বৈশিষ্ট্য---সে সম্পর্কে শিয়া সম্প্রদায় সংখ্যাগরিষ্ঠ উম্মতের থেকে ভিন্নমত পোষণ করে প্রথমত আহ্লে বায়ত শব্দ কেবল রসূলের সন্তান-সন্ততিদের জন্যই নির্দিষ্ট বলে এবং পুণ্যবতী স্ত্রীগণ এঁদের থেকে বহির্ভূত বলে দাবি করেছে। দ্বিতীয়ত উল্লিখিত আয়াতে পবিত্রকরণ অর্থ তাঁদের জন্মগত নিষ্কলুষতা বলে মন্তব্য করে আহ্লে বায়তকে নবীগণের ন্যায় সম্পূর্ণ নিষ্পাপ বলে আখ্যায়িত করেছে। এর উত্তর এবং মাস'আলার বিস্তারিত বর্ণনা আহ্কামুল কোরআন নামক গ্রন্থে সূরায়ে আহ্যাব অধ্যায়ে প্রদান করেছি, যাতে নিষ্কলুষতার সংজ্ঞা এবং তা নবী ও ফেরেশতাকুলের জন্য নির্দিষ্ট থাকা এবং তাঁরা ব্যতীত অন্যকেও নিষ্পাপ না হওয়ার কথা শরয়ী প্রমাণাদিসহ সবিস্তার বর্ণনা করেছি। বিদগ্ধ সমাজ তা দেখে নিতে পারেন---সাধারণ লোকের জন্য তা নিষ্প্রয়োজন।

واذكرن ما يتلى فى بيوتكن من ايات الله والحكمة — ايات الله অর্থ কোরআন আর حكمت অর্থ রসূলুল্লাহ্ (সা) প্রদত্ত শিক্ষা-দীক্ষা এবং তাঁর সুন্নত ও আদর্শ। যেমন অধিকাংশ তফসীরকার حكمت এর তফসীর সুন্নত বলে বর্ণনা করেছেন। اذكرن শব্দের দুটি ভাবার্থ হতে পারে---(১) এসব বিষয় স্বয়ং

স্মরণ রাখা----যার ফলশ্রুতি ও পরিচয় হলো এগুলোর উপর আমল করা। (২) কোর-আন পাকের যা কিছু তাঁদের গৃহে তাঁদের সামনে নাযিল হয়েছে বা রসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁদেরকে যেসব শিক্ষা প্রদান করেছেন, উম্মতের অন্যান্য লোকদের সঙ্গে সেসবের আলোচনা করা এবং তাদেরকে সেগুলো পৌঁছে দেওয়া।

ফায়দা ঃ ইবনে আরাবী আহ্কামুল-কোরআন নামক গ্রন্থে লিখেছেন যে, এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, যদি কোন ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নিকট থেকে কোন আয়াতে কোরআন বা হাদীস শুনে তবে তা অন্যান্য লোকের নিকট পৌঁছে দেওয়া তার অবশ্য কর্তব্য। এমনকি কোরআনের যেসব আয়াত নবীজীর পুণ্যবতী স্ত্রীগণের গৃহে নাযিল হয়েছে অথবা নবীজী (সা)-র নিকট থেকে তাঁরা যেসব শিক্ষা লাভ করেছেন, সেগুলো সম্পর্কে অপর লোকের সাথে আলোচনা করা তাঁদের উপরও বাধ্যতামূলক করে দেওয়া হয়েছে। আর আল্লাহ্ পাকের এ আমানত উম্মতের অপরাপর লোকদের নিকট পৌঁছানো তাঁদের (পুণ্যবতী স্ত্রীগণের) অপরিহার্য কর্তব্য।

কোরআনের ন্যায় হাদীসের সংরক্ষণ ঃ এ আয়াতে যেরূপভাবে আয়াতে-কোর-আনের প্রচার-প্রসার ও শিক্ষা প্রদান উম্মতের জন্য বাধ্যতামূলক করে দেওয়া হয়েছে, অনুরূপভাবে হিকমত (حكمت) শব্দের মাধ্যমে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র হাদীসসমূহের প্রচার এবং শিক্ষা প্রদানও বাধ্যতামূলক করে দেওয়া হয়েছে। এ কারণেই সাহা-বায়ে কিরাম (রা) সর্বাবস্থায়ই এ নির্দেশ পালন করেছেন। সহীহ্ বুখারী শরীফে হযরত মা'আয (রা) সম্পর্কেও এরূপ ঘটনা বর্ণিত আছে যে, তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নিকট থেকে একখানা হাদীস শুনেন, কিন্তু জনগণ এর প্রতি যথাযথ মর্যাদা আরোপ না করতে পারে অথবা কোন ভুল বোঝাবুঝিতে পতিত হতে পারে এরূপ আশংকা করে তিনি তা সর্বসাধারণের সামনে বর্ণনা করেন নি। কিন্তু যখন তাঁর (মা'আযের) মৃত্যুক্ষণ ঘনিয়ে এলো, তখন তিনি জনগণকে একত্রিত করে তাদের সামনে সে হাদীস পেশ করলেন এবং বললেন যে, নিছক ধর্মীয় স্বার্থে আমি এ যাবত এ সম্পর্কে কারো সাথে আলোচনা করিনি। কিন্তু এক্ষণে আমার মৃত্যু অত্যাসন্ন। সুতরাং উম্মতের এ আমানত তাদের হাতে পৌঁছিয়ে দেওয়া একান্ত কর্তব্য বলে মনে করি। হযরত মা'আয হাদীসে-রসূল উম্মতের নিকট না পৌঁছানোর পাপে যাতে পতিত না হন সেজন্য তিনি মৃত্যুর পূর্বেই জনগণকে ডেকে এ হাদীস শুনিয়ে দেন।

এ ঘটনাও এ সাক্ষ্যই প্রদান করে যে, সমস্ত সাহাবায়ে কিরামই কোরআনের এ হুকুম পালন ওয়াজিব ও অবশ্যকরণীয় বলে মনে করতেন। আর সাহাবায়ে কিরাম অত্যন্ত সতর্কতার সাথে হাদীসসমূহ জনগণের নিকট পৌঁছাবার ব্যবস্থা করতেন বলে হাদীস সংরক্ষণের গুরুত্ব কোরআনের কাছাকাছি হয়ে পড়লো। **এ সম্পর্কে সন্দেহের অবতারণা করা কোরআনে পাকে সন্দেহের অবতারণা করারই নামান্তর।**

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمٰتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنٰتِ وَالْقٰنِتِينَ
وَالْقٰنِتٰتِ وَالصّٰدِقِينَ وَالصّٰدِقٰتِ وَالصّٰبِرِينَ وَالصّٰبِرٰتِ
وَالْخٰشِعِينَ وَالْخٰشِعٰتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقٰتِ وَالصّٰٓئِمِينَ
وَالصّٰٓئِمٰتِ وَالْحٰفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحٰفِظٰتِ وَالذّٰكِرِينَ اللّٰهَ كَثِيرًا
وَّالذّٰكِرٰتِ أَعَدَّ اللّٰهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَّأَجْرًا عَظِيمًا ۝

(৩৫) নিশ্চয় মুসলমান পুরুষ, মুসলমান নারী ঈমানদার পুরুষ, ঈমানদার নারী অনুগত পুরুষ, অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ, সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ, ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ, বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ, দানশীল নারী, রোযা পালনকারী পুরুষ, রোযা পালনকারী নারী, যৌনাঙ্গ হিফাযতকারী পুরুষ, যৌনাঙ্গ হিফাযতকারী নারী, আল্লাহ্র অধিক যিকিরকারী পুরুষ ও যিকিরকারী নারী---তাদের জন্য আল্লাহ্ প্রস্তুত রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নিঃসন্দেহে ইসলামের কার্যাবলী সম্পন্নকারী পুরুষগণ, ইসলামের কার্যাবলী সম্পন্নকারিণী নারীগণ, ঈমান আনয়নকারী পুরুষগণ ও ঈমান আনয়নকারিণী নারীগণ (مسلمين ও مسلمات এর এই তফসীরের পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামের মর্মার্থ দীন সংশ্লিষ্ট কার্যাবলী---যথা নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত প্রভৃতি এবং مؤمنين ও مؤمنات এর অন্তর্গত ঈমানের অর্থ আকীদা-বিশ্বাসসমূহ। যেরূপ হযরত জিবরাঈল (আ)-এর জিজ্ঞাসার পরিপ্রেক্ষিতে হযরত (সা)-ও ইসলাম এবং ঈমান সম্পর্কে এরূপ উত্তর দিয়েছেন বলে সহীহ্ বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে।) আনুগত্য স্বীকারকারী পুরুষ, আনুগত্য স্বীকারকারিণী নারীগণ, সত্যপরায়ণ পুরুষ ও সত্যপরায়ণা নারীগণ, (কথায় সত্য-পরায়ণ, কাজে-কর্মে সত্যপরায়ণ এবং ঈমা'ন ও নিয়তে সত্যপরায়ণ---এরা সবাই এ সত্য পারায়ণতার অন্তর্গত। অর্থাৎ এঁদের কথাবার্তায় মিথ্যার লেশমাত্র নেই, কাজে-কর্মে কোন প্রকারের শৈথিল্য ও অনাসক্তি নেই এবং লোক দেখানোর মন-মানসিকতা এবং কপটতাও নেই) এবং ধৈর্য ধারণকারী পুরুষ ও ধৈর্য ধারণকারিণী নারীগণ (সকল প্রকারের ধৈর্যই-এর অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ উপাসনা-আরাধনায় অটল ও দৃঢ়পদ থাকা, পাপ-পঙ্কিলতা থেকে নিজকে মুক্ত রাখা এবং বিপদে-আপদে ধৈর্য ধারণ করা) এবং বিনয়ী পুরুষ ও বিনয়ী নারীগণ, (নামায ও অন্যান্য ইবাদতে বিনয় এবং একাগ্রতাও

খুশুর অন্তর্ভুক্ত। যেন অন্তরও ইবাদতমুখী থাকে এবং অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও অনুরূপ থাকে। অহঙ্কার ও আত্মম্ভরিতার বিপরীত সাধারণ বিনয়-নম্রতাও এর অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ এরা গর্ব ও আত্মাভিমান থেকে মুক্ত আর নামায ও অন্যান্য ইবাদতে নম্রতা---একাগ্রতা তাদের অবিচ্ছিন্ন গুণ ও সাধারণ বৈশিষ্ট্য।) এবং দানশীল পুরুষ ও দানশীলা নারীগণ (যাকাত ও অন্যান্য নফল দান-খয়রাত প্রভৃতি সবই এর অন্তর্গত) আর রোযাদার পুরুষ ও রোযাদার নারীগণ, স্বীয় গুপ্তাংগ সংরক্ষণকারী পুরুষ ও গুপ্তাঙ্গ সংরক্ষণকারিণী নারীগণ এবং অধিক পরিমাণে আল্লাহ্‌কে স্মরণকারী পুরুষ ও স্মরণকারিণী নারীগণ (অর্থাৎ যারা ফরয যিকিরসমূহের সাথে সাথে নফল যিকিরসমূহ আদায় করে) এদের জন্য আল্লাহ্ পাক ক্ষমা ও মহান প্রতিদান তৈরী করে রেখেছেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

কোরআনে পাকে সাধারণভাবে পুরুষদেরকে সম্বোধন করে নারীদেরকে আনুষঙ্গিকভাবে তার অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়ার তাৎপর্য ঃ যদিও নারী-পুরুষ উভয়ই কোরআনে পাকের সাধারণ নির্দেশাবলীর আওতাধীন, কিন্তু সাধারণত সম্বোধন করা হয়েছে পুরুষদেরকে। আর নারীজাতি পরোক্ষভাবে এর অন্তর্গত। সর্বত্র يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا শব্দ-সমষ্টি ব্যবহার করে আনুষঙ্গিকভাবে নারীদেরকেও সম্বোধনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এতে এ ইঙ্গিতই রয়েছে যে, নারীদের সকল বিষয়ই প্রচ্ছন্ন ও গোপনীয়। এর মধ্যেই তাদের মান-মর্যাদা নিহিত। বিশেষ করে সমস্ত কোরআনে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যাবে যে, কেবল হযরত মরিয়ম বিন্‌তে ইমরান ব্যতীত অন্য কোন স্ত্রীলোকের নাম কোরআনে পাকে উল্লেখ নেই। যেখানে তাদের প্রসংগ এসেছে সেখানে পুরুষের সাথে তাদের সম্পর্কসূচক শব্দ যথা امرأة فرعون ও امرأة نوح প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। হযরত মরিয়মের বিশেষত্ব সম্ভবত এই যে, কোন পিতার সাথে হযরত ঈসা (আ)-র সম্পর্ক স্থাপন সম্ভবপর ছিল না। তাই মায়ের সাথেই তাঁকে সম্পর্কযুক্ত করতে হয়েছিল এবং এ কারণেই তাঁর (মরিয়মের) নাম উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ্ পাকই সর্বাধিক জ্ঞাত।

কোরআন করীমের এই প্রকাশভংগী যদিও এক বিশেষ প্রজ্ঞা, যৌক্তিকতা ও মঙ্গলের ভিত্তিতেই অনুসৃত হয়েছিল, কিন্তু এ পরিপ্রেক্ষিতে নারীগণের হীনমন্যতাবোধের উদ্রেক হওয়া একান্ত স্বাভাবিক ছিল। তাই বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থে এমন বহু রেওয়ায়েতে রয়েছে, যাতে নারীগণ রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে এ মর্মে আরয করেছে যে, আমরা দেখতে পাচ্ছি---আল্লাহ্ পাক কোরআনের সর্বত্র পুরুষদেরই উল্লেখ করেছেন এবং তাদেরকেই সম্বোধন করেন। এ দ্বারা বোঝা যায় যে, আমাদের (নারীদের) মাঝে কোন প্রকার পুণ্য ও কল্যাণই নিহিত নেই। সুতরাং আমাদের কোন ইবাদতই গ্রহণযোগ্য নয় বলে আশংকা হচ্ছে। (পুণ্যবতী স্ত্রীগণ থেকে ইমাম বাগবী রেওয়ায়েত

করেছেন) এবং তিরমিযী শরীফে হযরত উম্মে আম্মারা থেকে, আবার কোন কোন রেওয়ায়েতে হযরত আস্‌মা বিনতে উমায়েস (রা) থেকেও এ ধরনের আবেদন উপস্থাপনের কথা বর্ণিত আছে---আর এসব রেওয়ায়েতে এ আবেদন উপরোল্লিখিত আয়াতসমূহ নাযিল হওয়ার কারণ বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে।

উল্লিখিত আয়াতসমূহে নারীদেরকে স্বস্তি ও সান্ত্বনা প্রদান এবং তাদের আমল গ্রহণযোগ্য হওয়ার শর্তাবলী সংশ্লিষ্ট বিশেষ আলোচনা রয়েছে। বলা হয়েছে, আল্লাহ্ পাক সমীপে মানমর্যাদা ও তাঁর নৈকট্য লাভের ভিত্তি হল সৎ-কার্যাবলী, আল্লাহ্‌র আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকার। এ ক্ষেত্রে নারীপুরুষের মাঝে কোন ভেদাভেদ নেই।

অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকিরের নির্দেশ এবং তার যৌক্তিকতা ও তাৎপর্য ঃ ইসলামের স্তম্ভ পাঁচ প্রকারের ইবাদত। যথা---নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ও জিহাদ। কিন্তু সমস্ত কোরআনে এর মধ্য থেকে কোন ইবাদত অধিক পরিমাণে করার নির্দেশ নেই। কিন্তু কোরআনে পাকের বহু সংখ্যক আয়াতে আল্লাহ্‌র যিকির অধিক পরিমাণে করার নির্দেশ রয়েছে। সূরায়ে আনফাল, সূরায়ে জুম'আ এবং এই সূরায় وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ (অধিক পরিমাণে আল্লাহ্‌কে স্মরণ-কারিগণ ও স্মরণকারিণীগণ) বলা হয়েছে। এর তাৎপর্য সম্ভবত এই যে প্রথমত আল্লাহ্‌র যিকির সকল ইবাদতের প্রকৃত রূহ। হযরত মা'আয বিন্ আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নিকট জিজ্ঞেস করল যে, মুজাহিদ-গণের মাঝে সর্বাধিক প্রতিদান ও সওয়াবের অধিকারী কোন্ ব্যক্তি হবে? তিনি (সা) বললেন, যে সবচেয়ে বেশি আল্লাহ্‌র যিকির করবে। অতপর জিজ্ঞেস করল যে, রোযাদারদের মধ্যে সর্বোচ্চ সওয়াবের অধিকারী কে হবে? তিনি বললেন, যে আল্লাহ্‌র যিকির সবচেয়ে বেশি করবে। এরূপভাবে নামায, যাকাত, হজ্জ, সদ্‌কা প্রভৃতি সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করল। তিনি প্রতিবার এ উত্তরই দিলেন যে, যে ব্যক্তি সর্বাধিক পরিমাণে আল্লাহ্‌র যিকির করবে, সে-ই সর্বোচ্চ প্রতিদান লাভ করবে (ইবনে কাসীর থেকে আহমদ বর্ণনা করেছেন)।

দ্বিতীয়ত, যাবতীয় ইবাদতের মধ্যে এটাই (যিকির) সহজতর। এটা আদায় করা সম্পর্কে শরীয়তও কোন শর্ত আরোপ করেনি---ওযুসহ বা বিনা ওযুতে উঠতে-বসতে চলতে-ফিরতে সব সময়ে আল্লাহ্‌র যিকির করা যায়। এর জন্য মানুষের কোন পরিশ্রমই করতে হয় না, কোন অবসরেরও প্রয়োজন নেই। কিন্তু এর লাভ ও ফলশ্রুতি এত বেশি ও ব্যাপক যে, আল্লাহ্‌র যিকিরের মাধ্যমে পার্থিব কাজকর্ম ও দীন (ধর্ম) ইবাদতে রূপান্তরিত হয়। আহার গ্রহণের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী দোয়া; বাড়ি থেকে বের হওয়ার ও ফিরে আসার দোয়া, সফরে রওয়ানা করা ও সফরকালীন বাড়ি

ফিরে আসার দোয়া, কোন কারবারের সূচনাপর্বে ও শেষে রসূলুল্লাহ্ (সা) নির্দেশিত দোয়া---প্রভৃতি দোয়ার সারমর্ম এই যে, মুসলমান যেন কোন সময়েই আল্লাহ্ সম্পর্কে অমনোযোগী ও গাফিল থেকে কোন কাজ না ক'রে, আর তাঁরা যদি সকল কাজকর্মে এ নির্ধারিত দোয়াসমূহ পড়ে নেয় তবে পার্থিব কাজ দীনে (ধর্মে) পর্যবসিত হয়ে যায়।

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ ؕ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا ۝٣٦ وَاِذْ تَقُوْلُ لِلَّذِيْٓ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاَنْعَمْتَ عَلَيْهِ اَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللّٰهَ وَتُخْفِيْ فِيْ نَفْسِكَ مَا اللّٰهُ مُبْدِيْهِ وَتَخْشَى النَّاسَ ۚ وَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشٰىهُ ؕ فَلَمَّا قَضٰى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنٰكَهَا لِكَيْ لَا يَكُوْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ فِيْٓ اَزْوَاجِ اَدْعِيَآئِهِمْ اِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ؕ وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا ۝٣٧ مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيْمَا فَرَضَ اللّٰهُ لَهٗ ؕ سُنَّةَ اللّٰهِ فِي الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ؕ وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ قَدَرًا مَّقْدُوْرًا ۝٣٨ اۨلَّذِيْنَ يُبَلِّغُوْنَ رِسٰلٰتِ اللّٰهِ وَيَخْشَوْنَهٗ وَلَا يَخْشَوْنَ اَحَدًا اِلَّا اللّٰهَ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا ۝٣٩

---

(৩৬) আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল কোন কাজের আদেশ করলে কোন ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন ক্ষমতা নেই যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আদেশ অমান্য করে, সে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় পতিত হয়। (৩৭) আল্লাহ্ যাকে অনুগ্রহ করেছেন; আপনিও যাকে অনুগ্রহ করেছেন; তাকে যখন আপনি বলেছিলেন, তোমার স্ত্রীকে তোমার কাছেই থাকতে দাও এবং আল্লাহ্কে ভয় কর। আপনি অন্তরে এমন বিষয় গোপন করছিলেন, যা আল্লাহ্ পাক প্রকাশ করে দেবেন। আপনি লোকনিন্দার ভয় করছিলেন; অথচ আল্লাহ্কেই অধিক ভয় করা উচিত! অতপর যায়েদ যখন যয়নবের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করল, তখন আমি তাকে আপনার সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করলাম, যাতে মু'মিনদের পোষ্যপুত্ররা তাদের স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলে সেসব

স্ত্রীকে বিবাহ করার ব্যাপারে মু'মিনদের কোন অসুবিধা না থাকে। আল্লাহ্‌র নির্দেশ কার্যে পরিণত হয়েই থাকে। (৩৮) আল্লাহ্ নবীর জন্য যা নির্ধারিত করেন, তা করতে তাঁর কোন বাধা নেই। পূর্ববর্তী নবীগণের ক্ষেত্রে এটাই ছিল আল্লাহ্‌র চিরাচরিত বিধান। আল্লাহ্‌র আদেশ নির্ধারিত, অবধারিত। (৩৯) সেই নবীগণ আল্লাহ্‌র পয়গাম প্রচার করতেন ও তাঁকে ভয় করতেন। তাঁরা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় করতেন না। হিসাব গ্রহণের জন্য আল্লাহ্ যথেষ্ট।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

কোন মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীর পক্ষে সম্ভব নয় যে--যখন আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা) কোন কাজের (তা পার্থিব কাজই হোক না কেন---অবশ্য করণীয় বলে) নির্দেশ প্রদান করেন, তখন সেকাজে সেসব মু'মিনগণের কোন অধিকার অবশিষ্ট থাকে (অর্থাৎ ইচ্ছানুযায়ী করার বা না করার) অধিকার থাকে না। বরং তা কার্যে পরিণত করাই ওয়াজিব ও বাধ্যতামূলক হয়ে যায় আর যে ব্যক্তি (এরূপ বাধ্যতা-মূলক নির্দেশের পর) আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা)-এর কথা অমান্য করে, সে স্পষ্ট পথ-ভ্রষ্টতায় পতিত হল। আর (সে সময়ের কথা স্মরণ করুন) যখন আপনি (উপদেশ ও পরামর্শছলে) ঐ ব্যক্তিকে বলতে ছিলেন, যার প্রতি আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছেন; (যথা ইসলাম গ্রহণের তওফিক দিয়েছেন --যা দীনী অনুগ্রহ এবং দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছেন---যা পার্থিব অনুগ্রহ) এবং আপনিও যার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন (দীনী শিক্ষা প্রদান করেছেন এবং মুক্ত করে দিয়েছেন; অতপর ফুফাত বোনের সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করে দিয়েছেন অর্থাৎ যায়েদ বিন হারিসা, যাকে তিনি বোঝাচ্ছিলেন) যে, তুমি নিজ স্ত্রীকে (যয়নব) তোমার বিবাহাধীনে থাকতে দাও (এবং তার সাধারণ ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো ধরতে যেও না---অন্যথায় তোমাদের মাঝে গরমিল ও সামঞ্জস্যের অভাব পরিলক্ষিত হতে পারে।) এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর। (আর তার সাধারণ অধিকারসমূহ আদায়ে শৈথিল্য প্রদর্শন করো না, অন্যথায় তা সামঞ্জস্যহীনতার উদ্রেক করে) এবং (যখন অভিযোগসমূহ সীমা অতিক্রম করে গেল ---আকার ইঙ্গিতে সংশোধন ও সামঞ্জস্য বিধানের আশা আর অবশিষ্ট রইল না, তখন মুখে বলারই আশ্রয় নেওয়া হল) আপনি নিজ অন্তরে সে কথা গোপন রাখছিলেন, যা আল্লাহ্ তা'আলা (পরিশেষে) প্রকাশ করার ছিলেন [এর অর্থ হযরত যয়নবের সাথে তাঁর (সা) বিয়ে--যখন হযরত যায়েদ তাকে তালাক দিয়ে দেবেন, যা আল্লাহ্ পাক زَوَّجْنٰكَهَا -এর সাহায্যে কথার মাধ্যমে এবং স্বয়ং বিয়ের মাধ্যমে প্রকাশ করছেন] এবং (এই শর্তসাপেক্ষ ইচ্ছার সাথে সাথে) আপনি মানুষের (রটানো দুর্নামের) ভয় ও আশংকা করছিলেন। (কেননা সে সময় পর্যন্ত সম্ভবত এই বিয়ের মাঝে নিহিত গুরুত্বপূর্ণ দীনী কল্যাণ ও মঙ্গলের কথা তাঁর মনে উদিত হয়নি। হযরত যয়নবের খেয়ালে কেবল পার্থিব বিশেষ মঙ্গলের কথাই ছিল এবং পার্থিব

বিষয়ে এরূপ আশংকা ক্ষতিকর নয়। বরং কোন কোন ক্ষেত্রে কাম্যও বটে। যখন প্রশ্ন তুললে অপরের ধর্মীয় ক্ষতি ও অমঙ্গলের আশংকা থাকে এবং তাদেরকে এ থেকে অব্যাহতি দেওয়া উদ্দেশ্য হয়।) আর আপনার পক্ষে আল্লাহ্ পাকই তো ভয় করার অধিকতর যোগ্য (অর্থাৎ) যেহেতু প্রকৃত প্রস্তাবে এতে ধর্মীয় মঙ্গল বিদ্যমান। যেমন পরবর্তী لِكَيْ لَا يَكُونَ الخ তে উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং সৃষ্টিকুল থেকে কোন আশংকা করবেন না। বস্তুত ধর্মীয় মঙ্গল সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর তিনি আর কোন প্রকারের আশংকা করেন নি, যার বর্ণনা পরবর্তী পর্যায়ে রয়েছে। অতপর যখন তাঁর (যয়নব) থেকে যায়েদের মন উঠে গেল (অর্থাৎ অভ্যন্তরীণ গরমিল ও বনিবনা না হওয়ার দরুন তালাক দিয়ে দিল এবং ইদ্দতও অতিবাহিত হয়ে গেল, তখন) আমি আপনাকে তাঁর সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করে দিলাম, যাতে মুসলমানদের মধ্যে নিজেদের পোষ্যপুত্রদের স্ত্রীদের (বিয়ে) সম্পর্কে কোন সংকীর্ণতা না থাকে; যখন তারা (পোষ্যপুত্রগণ) এদের প্রতি অনাসক্ত ও বিরাগী হয়ে পড়ে (ও তালাক দিয়ে দেয়। মোটকথা শরীয়তের এ নির্দেশ প্রকাশ করাই উদ্দেশ্য ছিল।) আর আল্লাহ্র এ নির্দেশ তো প্রকাশ পাওয়ারই ছিল। (কেননা যুক্তি এটাই চাচ্ছিল। পরবর্তী পর্যায়ে অপবাদের জওয়াব দেওয়া হচ্ছে, বলা হচ্ছে যে,) এ নবীর জন্য আল্লাহ্ পাক যে বিষয় (পার্থিবভাবে বা শরীয়তগতভাবে) নির্ধারিত করে দিয়েছেন সে সম্পর্কে নবীর উপর কোন দোষারোপ (এবং অপবাদ) নেই। যেসব (নবী) অতীত হয়ে গেছেন তাঁদের জন্যও আল্লাহ্ পাক এ রীতিই নির্ধারিত করে রেখেছেন (অর্থাৎ তাঁরা যেসব কাজের অনুমতি পেতেন নিঃসংকোচে তা সম্পন্ন করে ফেলতেন। এতে তারা দুর্নাম ও অপবাদের লক্ষ্যস্থলে পরিণত হন নি। অনুরূপভাবে এ নবীও প্রশ্নের লক্ষ্যস্থলে পরিণত হন নি) এবং (সেসব পয়গম্বর কর্তৃকও) এ ধরনের যত কাজ সাধিত হয় (সেগুলো সম্পর্কেও) আল্লাহ্র হুকুম (পূর্ব হতেই) নির্ধারিত হয়ে থাকে।

(এবং তদনুসারেই তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয় এবং তাঁরা আমল করেন। তাঁর অর্থাৎ নবীজীর ঘটনা মাঝে এ বিষয়ের অবতারণা, পুনরায় নবীগণের আলোচনার মধ্যে একে পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করা--সম্ভবত এ ইঙ্গিতই প্রদান করে যে, এসব বস্তু অন্যান্য যাবতীয় সৃষ্ট পার্থিব বস্তুসমূহের ন্যায় এমন হিকমত বিশিষ্ট ও তাৎপর্য সম্বলিত যে--তা পূর্ব থেকেই আল্লাহ্র ইলমে নির্ধারিত ও সাব্যস্ত হয়ে থাকে। সুতরাং এ বিষয়ে নবীকে অপবাদ ও ভর্ৎসনা দেওয়া যেন আল্লাহ্কে অপবাদ দেওয়া। পক্ষান্তরে যে সব বিষয় ও কার্যাদি সম্পর্কে হক তা'আলা স্বয়ং ভর্ৎসনা ও নিন্দাবাদ জ্ঞাপন করবেন---যদিও সেগুলো পূর্বনির্ধারিত বলে অবশ্যই হিকমত বিশিষ্ট; কিন্তু তা ভর্ৎসনাস্থল ও শাস্তিযোগ্য হওয়া, এ কথাই প্রমাণ করে যে, সেগুলো অপকৃষ্টতা ও পাপ-পঙ্কিলতার উপাদান সম্বলিত। সুতরাং এ অপকৃষ্টতা ও পাপ-পঙ্কিলতার পরিপ্রেক্ষিতে এসব কাজ ও বিষয়ের জন্য নিন্দাবাদ ও শাস্তিবিধান জায়েয। পরবর্তী পর্যায়ে নবীজীকে সান্ত্বনা প্রদানের উদ্দেশ্যে ওসব মহান পয়গম্বরের এক বিশেষ প্রশংসা বিবৃত হয়েছে। অর্থাৎ) এসব (অতীত কালের পয়গম্বরগণ) এমন ছিলেন

যে, আল্লাহ্ তা'আলার হুকুমসমূহ পৌঁছাতেন (যদি মৌখিকভাবে পৌঁছাতে নির্দেশিত হতেন তবে মৌখিকভাবে আর যদি কর্মের মাধ্যমে পৌঁছাতে নির্দেশিত হতেন তবে কর্মের মাধ্যমে) এবং (এ পর্যায়ে) আল্লাহ্‌কেই ভয় করতেন; এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় করতেন না। [সুতরাং তিনি এ বিয়ে তাবলীগে ফেলী অর্থাৎ কাজের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নির্দেশ পৌঁছানো বলে অবহিত না হওয়া পর্যন্ত এরূপ আশংকিত হওয়া দোষের নয়। কিন্তু এখন যেহেতু আপনি এ সম্পর্কে জ্ঞাত হয়েছেন, সুতরাং পুনরায় এরূপ আশংকা করবেন না---রিসালতের পদমর্যাদা এরূপ হওয়াই দাবি করে। বস্তুত এ কথা প্রকাশিত হওয়ার পর তিনি আর এরূপ আশংকা করেন নি। যদিও আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলী পৌঁছানোর ক্ষেত্রে তিনি কাউকে ভয় করতেন না---বস্তুত এর সম্ভাবনাও ছিল না। তবুও নবী (আ) গণের ঘটনার উল্লেখ---একান্তভাবে হৃদয়ে অধিক শক্তি ও সাহস সঞ্চারের উদ্দেশ্যে এবং তাঁকে অধিক সান্ত্বনা প্রদানের উদ্দেশ্যে ফরমান যে, আমলসমূহের] হিসাব-নিকাশ গ্রহণের জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট। (সুতরাং অপর কাউকে ভয় করা কেন?---তাঁর প্রতি ভর্ৎসনাকারীকেও আল্লাহ্ পাক শাস্তি প্রদান করবেন। আপনি এ অপবাদ ও ভর্ৎসনার দরুন বিচলিত ও সন্তাপগ্রস্ত হবেন না)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এ কথা পূর্বে কয়েকবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, সূরায়ে আহযাবের অধিকাংশ আহকামই রসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রতি ভালবাসা, সম্মান ও পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শন সংশ্লিষ্ট অথবা তাঁকে দুঃখ-যন্ত্রণা পৌঁছানো নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কিত।

উপরোল্লিখিত আয়াতসমূহও এ সম্পর্কিত কয়েকটি ঘটনা প্রসংগেই নাযিল হয়েছে।

এক ঘটনা এই যে, হযরত যায়েদ বিন্ হারিসা (রা) এক ব্যক্তির ক্রীতদাস ছিলেন। অজ্ঞতার যুগে রসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে অতি অল্প বয়সে 'ওকায' নামক বাজার থেকে খরিদ করে এনে মুক্ত করে দেন। আর আরব দেশের প্রথানুযায়ী তাঁকে পোষ্য পুত্রের গৌরবে ভূষিত করে লালন-পালন করেন। মক্কাতে তাঁকে 'মুহম্মদ (সা)-এর পুত্র যায়েদ' নামে সম্বোধন করা হত। কোরআনে করীম এটাকে অজ্ঞতার যুগের ভ্রান্ত রীতি আখ্যায়িত করে তা নিষিদ্ধ করে দেয় এবং পোষ্য পুত্রকে তার প্রকৃত পিতার সাথে সম্পর্কযুক্ত করতে নির্দেশ দেয়। এ প্রসঙ্গেই এ সূরার প্রথমাংশের আয়াতসমূহ اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَآئِهِمْ الاٰيَةَ নাযিল হয়েছে। এসব হুকুম নাযিল হওয়ার পর সাহাবায়ে কিরাম (রা) যায়েদ বিন্ মুহাম্মদ (সা) নামে ডাকা পরিহার করেন এবং তাঁর পিতা হারিসার সাথে সম্পর্কযুক্ত করতে থাকেন।

একটি সূক্ষ্ম কথা: সমগ্র কোরআনে নবী (সা)-গণ ব্যতীত কোন শ্রেষ্ঠ বিশিষ্টতম সাহাবীর নামেরও উল্লেখ নেই। একমাত্র যায়েদ বিন্ হারিসা (রা)-র নাম রয়েছে। কোন

কোন মহাত্মা এর তাৎপর্য এটাই বর্ণনা করেছেন যে, কোরআনের নির্দেশানুসারে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাথে তাঁর পুত্রত্বের সম্পর্ক ছিন্ন করে দেওয়ার ফলে এক বিশেষ সম্মান থেকে বঞ্চিত হন। আল্লাহ্ পাক কোরআনে করীম তাঁর নাম অন্তর্ভুক্ত করে এর বিনিময় প্রদান করেছেন। যায়েদ শব্দটি কোরআনে করীমের একটি শব্দ হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে হাদীসের মর্মানুসারে এর প্রতিটি অক্ষর পাঠের বিনিময়ে আমলনামায় দশ দশ নেকী লিপিবদ্ধ হয়। কোরআনে পাকে কেবল তাঁর নাম পাঠ করলে পর ত্রিশ নেকী লাভ করা যায়।

রসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর প্রতি বিশেষ মর্যাদা প্রদর্শন করতেন। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) ফরমান যে, যখনই তিনি (সা) তাঁকে কোন সৈন্যবাহিনীভুক্ত করে পাঠিয়েছেন---তাকেই সেনাপতি নিযুক্ত করেছেন।---(ইবনে কাসীর)

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ ইসলামে এই ছিল গোলামির মর্মার্থ---শিক্ষা-দীক্ষা প্রদানের পর যারা যোগ্য প্রতিপন্ন হয়েছেন তাঁদেরকে নেতার মর্যাদায় উন্নীত করা হয়েছে।

যায়েদ বিন্ হারিসা (রা) যৌবনে পদার্পণের পর রসূলুল্লাহ্ (সা) নিজ ফুফাতো বোন হযরত যয়নব বিন্তে জাহ্শ (রা)-কে তাঁর নিকট বিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব পাঠান। হযরত যায়েদ (রা) যেহেতু মুক্তিপ্রাপ্ত দাসের কালিমা বিজড়িত ছিলেন সুতরাং হযরত যয়নব ও তাঁর ভ্রাতা আবদুল্লাহ্ বিন্ জাহ্শ এ সম্বন্ধ স্থাপনে এই বলে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন যে, আমরা বংশমর্যাদায় তার চাইতে শ্রেষ্ঠ ও উন্নত।

এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ الاية নাযিল হয়। যাতে এ হিদায়ত রয়েছে যে, যদি রসূলুল্লাহ্ (সা) কারো প্রতি বাধ্যতামূলকভাবে কোন কাজের নির্দেশ প্রদান করেন তবে সে কাজ করা তার উপর ওয়াজিব হয়ে যায়। শরীয়তানুযায়ী তার তা না করার অধিকার থাকে না। শরীয়তে এ কাজ মূলত ওয়াজিব ও জরুরী না হলেও যেহেতু তিনি এ কাজের নির্দেশ প্রদান করেছেন, সুতরাং তার উপর সে কাজ ওয়াজিব ও অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। যে ব্যক্তি তা করবে না আয়াতের পরিশেষে একে স্পষ্ট গোমরাহী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

হযরত যয়নব ও তাঁর ভাই এ আয়াত শুনে তাদের অসম্মতি প্রত্যাহার করে নিয়ে বিয়েতে রাযী হয়ে যান। অতপর বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। যার মহর দশটি লাল দীনার (প্রায় চার তোলা স্বর্ণ) ও ষাট দিরহাম (প্রায় আঠারো তোলা রৌপ্য) এবং একটি বার বরদারীর জন্তু, এক পরস্ত লাওয়াযেমাত আনুমানিক পঁচিশ সের আটা ও পাঁচ সের খেজুর—রসূলুল্লাহ্ (সা) স্বয়ং নিজের পক্ষ থেকে আদায় করে দেন। (ইবনে কাসীর) অধিকাংশ তফসীরকারের নিকট হযরত যায়েদ ও হযরত যয়নবের বিয়ে সংশ্লিষ্ট ঘটনাই এ আয়াতের শানে-নুযূল।---(ইবনে কাসীর, কুরতুবী, মাযহারী)

ইবনে কাসীর প্রমুখ মুফাস্সির অনুরূপ আরো দু'টি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যেও একথার উল্লেখ রয়েছে যে, উপরে বর্ণিত আয়াত এসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই

নাযিল হয়েছে। তন্মধ্যে একটি হযরত জুলায়বীব (রা)-এর ঘটনা। তা এই যে, তিনি এক আনসার সাহাবীর মেয়ের সাথে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করতে ইচ্ছুক ছিলেন। এই আনসার ও তাঁর পরিবার-পরিজন এ সম্বন্ধ স্থাপনে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলেন। কিন্তু এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর সবাই রাযী হয়ে যান এবং যথারীতি বিয়েও সম্পন্ন হয়ে যায়। নবীজী (সা) তাদের জন্য পর্যাপ্ত জীবিকা কামনা করে দোয়া করলেন। সাহাবায়ে কিরাম বলেন যে, তার গৃহে এত বরকত ও ধনসম্পদের এত আধিক্য ছিল যে, মদীনার গৃহসমূহের মধ্যে এ বাড়িটিই ছিল সর্বাধিক উন্নত ও প্রাচুর্যের অধিকারী এবং এর খরচের অংকও ছিল সবচাইতে বেশি। পরবর্তীকালে হযরত জুলায়বীব (রা) এক জিহাদে শাহাদাত বরণ করেন। রসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর দাফন-কাফন নিজ হাতে সম্পন্ন করেন।

অনুরূপভাবে উম্মে কুলসুম বিন্তে ওকবা বিন্ আবী মুয়ীত সম্পর্কেও হাদীসের রেওয়ায়েতসমূহে এক ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। ---(ইবনে কাসীর, কুরতুবী)। প্রকৃত প্রস্তাবে এগুলোর মাঝে কোন বিরোধ বা অসামঞ্জস্য নেই। এরূপ একাধিক ঘটনাই আয়াত নাযিল হওয়ার কারণ হতে পারে।

বিয়ে-শাদীতে বংশগত সমতা রক্ষার নির্দেশ এবং তার স্তরঃ উল্লিখিত বিয়েতে হযরত যয়নব ও তাঁর ভ্রাতা আবদুল্লাহ্ (রা)-র প্রথম পর্যায়ে অসম্মতির কারণ ছিল, উভয় পক্ষে বংশগত সমতা ও সাদৃশ্যের অনুপস্থিতি এবং এ কারণ সম্পূর্ণ শরীয়ত-সম্মত। রসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন যে, মেয়েদের বিয়ে-শাদী সমমর্যাদাসম্পন্ন বংশে দেওয়া উচিত---যার সঠিক ব্যাখ্যা পরে আসছে। এখন প্রশ্ন উঠে যে, এক্ষেত্রে হযরত যয়নব (রা) ও তাঁর ভাইয়ের আপত্তি কেন গৃহীত হলো না।

উত্তর এই যে, ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দম্পতিদ্বয়ের উভয় পক্ষে সকল ক্ষেত্রে সমতা ও সাদৃশ্য একান্ত প্রয়োজনীয়। কোন কাফিরের সহিত কোন মুসলিম মেয়ের বিয়ে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। যদিও মেয়ের এতে সম্মতি থাকে। কেননা এটা কেবল মেয়ের অধিকার নয় যে, শুধু তার সম্মতির কারণেই তা রহিত হয়ে যাবে; বরং আল্লাহ্‌র হক ও অধিকার এবং আল্লাহ্ কর্তৃক আরোপিত ফরয ও অবশ্য পালনীয় নির্দেশ। পক্ষান্তরে বংশগত ও অর্থনৈতিক সমতার ব্যাপারটা এর থেকে সম্পূর্ণ পৃথক---কেননা এটা হলো মেয়ের অধিকার। আর বংশগত সমতার অধিকারের বেলায় মেয়ের সাথে সাথে তার অভিভাবকগণও শরীক আছে। যদি কোন বিবেকসম্পন্না পূর্ণ বয়স্কা মেয়ে ধনাঢ্য পরিবারভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও কোন দরিদ্র ছেলের সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হতে রাযী হয়ে নিজস্ব অধিকার পরিহার করে দেয়, তবে তার সে অধিকার রয়েছে। কোন বিশেষ কল্যাণ ও মঙ্গলের কথা বিবেচনা করে কোন মেয়ে ও অভিভাবকবৃন্দ যদি বংশগত সমতার দাবি পরিহার করে এমন এক ব্যক্তির সহিত বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে রাযী হয়ে যায়, যারা বংশগতভাবে তাদের চাইতে হেয়, তবে তাদের এ অধিকার রয়েছে। বরং ধর্মীয় মঙ্গলামঙ্গলের কথা বিবেচনা করে এ অধিকার পরিহার করা বিশেষ

প্রশংসনীয় ও কাম্য। এ জন্যই রসূলুল্লাহ্ (সা) বহু ক্ষেত্রে ধর্মীয় মঙ্গলের কথা বিবেচনা করে এ অধিকার পরিহারপূর্বক বিয়ের কাজ সম্পন্ন করার পরামর্শ দিয়েছেন।

কোরআন করীমের ব্যাখ্যা ও মর্মানুযায়ী একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে উম্মতের প্রত্যেকের উপর রসূলুল্লাহ্ (সা)-র হক ও অধিকার সবচাইতে বেশি। এমনকি স্বয়ং নিজের চাইতে বেশি। যেমন কোরআনে হাকীমে ইরশাদ হয়েছে ঃ اَلنَّبِیُّ اَوْلٰی بِالْمُؤْمِنِیْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ অর্থাৎ---মু'মিনগণের উপর নবীর হক স্বয়ং তাদের নিজেদের চাইতেও বেশি। তাই হযরত যয়নব ও আবদুল্লাহ্র ব্যাপারে যখন রসূলুল্লাহ্ (সা) বংশগত সমতার অধিকার পরিহার করে হযরত যায়েদ বিন হারিসার সাথে বিয়েতে সম্মতি দানের নির্দেশ দেন, তখন এই হুকুমের সামনে নিজেদের মতামত ও অধিকার পরিত্যাগ করা তাদের উপর ফরয ও অপরিহার্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু এতে তাঁরা অসম্মতি প্রকাশ করায় কোরআনে করীমে এ আয়াত নাযিল হয়।

এখন প্রশ্ন উঠে যে, যখন স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সা)-ও বংশগত সমতা বজায় রাখা প্রয়োজনীয় বলে মনে করতেন, তবে তা রাখলেন না কেন? এর উত্তর উল্লিখিত বর্ণনার মাঝেই প্রকাশ পেয়ে গেছে যে, অন্য কোন ধর্মীয় মঙ্গলের দিক বিবেচনা করে এই বংশগত সমতা পরিহারযোগ্য। রসূলুল্লাহ্ (সা) জীবদ্দশায়ও এরূপ ধর্মীয় মঙ্গলের কথা বিবেচনা করে বংশগত সমতার অবর্তমানেও বহু বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। এর ফলে মূল মাস'আলার উপর কোন প্রভাব পড়ে না।

সমতার মাস'আলা ঃ বিয়ে-শাদী এমন এক ব্যাপার যে, এতে দম্পতির উভয়ের মাঝে স্বভাবগত সাদৃশ্য না থাকলে বিয়ের মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়ে যায়, পরস্পরের হক ও অধিকার আদায়ের ব্যাপারে ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়---পরস্পর কলহ-বিবাদ সৃষ্টি করে। তাই শরীয়তে সমতা ও পারস্পরিক সাদৃশ্য বিধানের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু তার অর্থ এটা নয় যে, কোন উঁচু পরিবারের ব্যক্তি অপেক্ষাকৃত নীচু পরিবারের লোককে অপকৃষ্ট বলে মনে করবে। ইসলামে মানমর্যাদার মূলভিত্তি তাকওয়া, নিষ্ঠা ও ধর্মপরায়ণতা, এক্ষেত্রে বংশগত কৌলীন্য যতই থাকনা কেন আল্লাহ্র নিকটে এর সবিশেষ গুরুত্ব নেই। নিছক সামাজিক রীতিনীতি ও শৃংখলা বজায় রাখার জন্য বিয়ে-শাদীতে সমতা রক্ষার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন যে, মেয়েদের বিয়ে তাদের অভিভাবকগণের মাধ্যমেই অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত অর্থাৎ প্রাপ্তবয়স্কা মেয়েদের পক্ষেও নিজের বিয়ের ব্যাপারে নিজে উদ্যোগী হয়ে ঢুকানো সংগত নয়--লজ্জা ও সম্ভ্রমের দিক বিবেচনায় এ দায়িত্ব পিতামাতা ও অন্যান্য অভিভাবকবৃন্দের উপরই ন্যস্ত থাকা উচিত। তিনি আরো ইরশাদ করেছেন যে, মেয়েদের বিয়ে সমকক্ষ পরিবারেই দেওয়া উচিত। হাদীসের সনদ যদিও দুর্বল; কিন্তু সাহাবায়ে কিরামের বিভিন্ন উক্তি ও

বাণীসমূহ দ্বারা সমর্থিত হওয়ায় এ হাদীস দলীল হিসেবে পেশ করার যোগ্যতা অর্জন করেছে। ইমাম মুহাম্মদ (র) 'কিতাবুল আসার' নামক গ্রন্থে হযরত ফারুকে আযম (রা)-এর উক্তি বর্ণনা করেছেন যে, আমি এ মর্মে ফরমান জারি করে দেব--যেন কোন সম্ভ্রান্ত খ্যাতনামা বংশের মেয়েকে অপেক্ষাকৃত অখ্যাত স্বল্প মর্যাদাসম্পন্ন পরিবারে বিয়ে দেয়া না হয়---অনুরূপভাবে হযরত আয়েশাও হযরত আনাস (রা)-এর প্রতি বিশেষ তাকীদ দিয়েছেন যেন সমতা রক্ষার প্রতি যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করা হয়, যা বিভিন্ন সনদে বর্ণিত আছে। ইমাম ইবনে হুমাম (র)-ও ফতহুল কাদীরে একথা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন।

সারকথা এই যে, বিয়ে-শাদীতে উভয় পক্ষের সমতা ও সাদৃশ্যের প্রতি যথাযথ গুরুত্ব আরোপ শরীয়তে বিশেষভাবে কাম্য---যাতে উভয়ের মধ্যে সম্প্রীতি ও মনের মিল স্থাপিত হয়। কিন্তু কুফূ'র (সার্বিক সমতা বিধান) চাইতে অধিক গুরুত্বপূর্ণ কল্যাণ ও মঙ্গলের দিক যদি সামনে আসে তবে কনে ও তার অভি-ভাবকবৃন্দের পক্ষে তাদের এ অধিকার পরিত্যাগ করে বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে নেওয়া জায়েয আছে। বিশেষ করে কোন ধর্মীয় কল্যাণ ও মঙ্গল সাধনের উদ্দেশ্যে এরূপ করা উত্তম ও অধিক কাম্য। যেমন সাহাবায়ে কিরামের বিভিন্ন ঘটনা থেকে এ কথার প্রমাণ মিলে। এ দ্বারা এ কথাও বোঝা যায় যে, এসব ঘটনা কুফূ'র (সমতা বিধান) মূল মাস'আলার পরিপন্থী নয়।

দ্বিতীয় ঘটনা ঃ নবীজী (সা)-র নির্দেশ মুতাবিক হযরত যায়েদ বিন হারিসার সাথে হযরত যয়নবের বিয়ে সম্পন্ন হয়ে যায়। কিন্তু তাদের স্বভাব-প্রকৃতিতে মিল হয়নি। হযরত যায়েদ (রা) হযরত যয়নব (রা) সম্পর্কে ভাষাগত শ্রেষ্ঠত্ব, গোত্রগত কৌলীন্যাভিমান এবং আনুগত্য ও শৈথিল্য প্রদর্শনের অভিযোগ উত্থাপন করতেন। অপর দিকে নবীজী (সা)-কে ওহীর মাধ্যমে একথা জ্ঞাত করানো হয় যে, হযরত যায়েদ (রা) হযরত যয়নবকে তালাক দিয়ে দেবেন; অতপর হযরত যয়নব (রা) হুযূরে পাক (সা)-র পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হবেন। একদিন হযরত যায়েদ (রা) রসূলুল্লাহ্ (সা)-র খিদমতে এসব অনুযোগ পেশ করতে গিয়ে হযরত যয়নবকে তালাক দেওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করেন। নবীজী (সা) যদিও আল্লাহ্ পাক কর্তৃক অবহিত হয়েছিলেন যে, ঘটনার পরিণতি এ পর্যায়ে গিয়ে গড়াবে যে, হযরত যায়েদ (রা) হযরত যয়নব (রা)-কে তালাক দিয়ে দেবেন, অতপর হযরত যয়নব (রা) নবীজীর সহিত পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হবেন। কিন্তু দু'কারণে তিনি হযরত যায়েদকে তালাক দিতে বারণ করলেন। প্রথমত, তালাক দেওয়া যদিও শরীয়তে জায়েয, কিন্তু পছন্দনীয় ও কাম্য নয় বরং বৈধ বস্তুসমূহের মাঝে নিকৃষ্টতম ও সর্বাধিক অবাঞ্ছনীয়। আর পার্থিব দিক থেকে কোন কার্য সংঘটিত হওয়া শরীয়তের হুকুমকে প্রভাবান্বিত করে না। দ্বিতীয়ত, নবীজী (সা)-র অন্তরে এরূপ ধারণা সৃষ্টি হয় যে, যদি হযরত যায়েদ তালাক দেওয়ার পর তিনি হযরত যয়নবের পাণি গ্রহণ করেন তবে আরববাসী বর্বর

যুগের প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী এই অপবাদ দেবে যে, তিনি নিজ পুত্রবধূকে বিয়ে করেছেন। যদিও কোরআনে পাক সূরায়ে আহযাবের পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বর্বর যুগের এ কুপ্রথাকে ভ্রান্ত ও অযৌক্তিক বলে খন্ডন করে দিয়েছে। এরপর কোন মু'মিনের মনে এরূপ ধারণা সৃষ্টির আশংকা ছিল না; কিন্তু যে কাফিরদের কোরআনের প্রতি কোন আস্থাই নেই, তারা বর্বর যুগের প্রথানুযায়ী পালক পুত্রকে সকল ব্যাপারে প্রকৃত পুত্রতুল্য মনে করে অপবাদের ঝড় তুলবে।---এ আশংকাও তালাক প্রদান থেকে হযরত যায়েদকে বারণ করার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ পরিপ্রেক্ষিতে হক তা'আলার পক্ষ থেকে বন্ধুসুলভ দরদমাখা শাসনবাক্য কোরআনে পাকের এ আয়াতসমূহে নাযিল হয়ঃ اِذْ تَقُوْلُ لِلَّذِىْٓ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاَنْعَمْتَ عَلَيْهِ

اَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللّٰهَ وَتُخْفِىْ فِىْ نَفْسِكَ مَا اللّٰهُ مُبْدِيْهِ

وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشٰىهُ

অর্থাৎ (সেই সময়ের কথা স্মরণ করুন) যখন আপনি, আল্লাহ্ পাক ও আপনি যার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, তাকে বলছিলেন যে, তুমি নিজ স্ত্রীকে তোমার বিবাহাধীনে থাকতে দাও। এ ব্যক্তি হযরত যায়েদ। আল্লাহ্ পাক তাঁকে ইসলামে দীক্ষিত করে তার প্রতি প্রথম অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন। দ্বিতীয়ত, নবীজীর সাহচর্য লাভের গৌরব প্রদান করেন এবং নবীজী তাঁর প্রতি প্রথম অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন---তাঁকে গোলামি থেকে অব্যাহতি দানের মাধ্যমে। দ্বিতীয়ত, নবীজী (সা) তাঁকে এমন শিক্ষাদীক্ষার মাধ্যমে গড়ে তোলেন যে, তাঁর প্রতি বিশিষ্ট সাহাবায়ে কিরাম পর্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করতেন। পরবর্তী পর্যায়ে হযরত যায়েদের প্রতি নবীজী (সা)-র প্রয়োগকৃত উক্তি নকল করা হয়েছেঃ اَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللّٰهَ অর্থাৎ নিজ স্ত্রীকে তোমার বিবাহাধীনে থাকতে দাও এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর। এক্ষেত্রে আল্লাহ্‌কে ভয় করার নির্দেশ এ মর্মেও হতে পারে যে, তালাক একটি অপকৃষ্ট ও গর্হিত কাজ, সুতরাং এ থেকে বিরত থাক। আবার এ অর্থেও ব্যবহৃত হতে পারে যে, বিবাহাধীনে বহাল রাখার পর স্বভাবগত গরমিল ও অবজ্ঞার দরুন তাঁর অধিকারসমূহ আদায়ের বেলায় যেন কোন প্রকারের শৈথিল্য প্রদর্শন না করে। তাঁর (সা) এ উক্তি এ জায়গায় সম্পূর্ণ ঠিক ও যথার্থই ছিল। কিন্তু আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সংঘটিতব্য ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার এবং অন্তরে হযরত যয়নবের পাণি গ্রহণের বাসনা উদ্রেকের পর হযরত যায়েদের প্রতি তালাক না দেওয়ার উপদেশ এক প্রকারের বাহ্যিক ও আনুষ্ঠানিক হিতাকাঙ্ক্ষার বহিঃপ্রকাশেরই পর্যায়ভুক্ত ছিল, যা রসূলের পদমর্যাদার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। বিশেষ করে এ কারণে যখন এর সাথে জনমণ্ডলীর

অপবাদের আশংকাও বিদ্যমান ছিল। তাই উল্লিখিত আয়াতে শাসন বাক্যের ভাষা ছিল এরূপ যে, আপনি যে কথা মনে মনে লুকিয়ে রাখছিলেন তা আল্লাহ্ পাক প্রকাশ করে দেবেন। যখন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হযরত যয়নবের সহিত আপনার পরিণয় সম্পর্ক স্থাপনের সংবাদ সম্পর্কে আপনি অবহিত রয়েছেন এবং আপনার অন্তরেও বিয়ের বাসনার উদ্রেক করেছে তখন এ ইচ্ছা ও বাসনা গোপন রেখে এমন প্রকারের বাহ্যিক ও আনুষ্ঠানিক আলোচনা করেছেন যা আপনার মর্যাদার পরিপন্থী। জনমণ্ডলীর অপবাদের ভয় সম্পর্কে ফরমান যে, আপনি মানুষকে ভয় করছেন, অথচ ভয় তো করা উচিত কেবল আল্লাহ্কে। অর্থাৎ যখন আপনি জ্ঞাত ছিলেন যে, এ ব্যাপার আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই সংঘটিত হবে---এতে যখন তাঁর অসন্তুষ্টির কোন আশংকাই নেই তখন নিছক মানুষের ভয়ে এ ধরনের উক্তি যুক্তিযুক্ত হয়নি।

এ ঘটনা সংশ্লিষ্ট উপরে বর্ণিত বিবরণ 'তফসীরে ইবনে কাসীর' 'কুরতুবী' ও 'রূহুল মা'আনী' থেকে সংগৃহীত হয়েছে এবং আয়াত تُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبْدِيهِ -এর ব্যাখ্যা এই যে, আপনি অন্তরে যে বিষয় গোপন রেখেছেন তা এ বাসনা যে, হযরত যায়েদ (রা) হযরত যয়নবকে তালাক দিলে পর আপনি তাঁর পাণি গ্রহণ করবেন। এ ব্যাখ্যা হাকেম, তিরমিযী, ইবনে আবী হাতেম প্রমুখ মুহাদ্দিসীনে কিরাম হযরত আলী বিন হুসায়ন যয়নুল আবেদীনের রেওয়ায়েত থেকে নকল করেছেন। রেওয়ায়েতের নকল নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

اوحى الله تعالى اليه صلى الله عليه وسلم ان زينب سيطلقها زيد ويتزوجها بعده عليه الصلوة والسلام --অর্থাৎ মহান আল্লাহ্ স্বীয় নবী (সা)-কে একথা ওহীর মাধ্যমে জ্ঞাত করেছেন যে, হযরত যায়েদ অনতিবিলম্বে হযরত যয়নবকে তালাক দেবেন, অতপর যয়নব নবীজী (সা)-র সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হবেন। (রূহুল মা'আনী---হাকেমে তিরমিযী থেকে উদ্ধৃত)।

ইবনে কাসীর ইবনে আবী হাতেমের উদ্ধৃতি দিয়ে নিম্নোক্ত শব্দ সমষ্টি নকল করেছেন ঃ

ان الله اعلم نبيه انها ستكون من ازواجه قبل ان يتزوجها فلما اتاه زيد ليشكوها اليه قال اتق الله امسك عليك زوجك فقال اخبرتك انى مزوجكها وتخفى فى نفسك ما الله مبديه

অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক তাঁর নবী (সা)-কে এ মর্মে অবহিত করেছেন যে, হযরত যয়নবও অনতিবিলম্বে পুণ্যবতী স্ত্রীগণের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবেন। অতপর যখন

হযরত যায়েদ তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে নবীজী (সা)-র খিদমতে উপস্থিত হন, তখন তিনি (সা) বলেন যে, আল্লাহ্কে ভয় কর এবং স্বীয় স্ত্রীকে তালাক দিও না। অতপর আল্লাহ্ পাক বলেন যে, আমি তো আপনাকে এ কথা বলে দিয়েছিলাম যে, আমি তাঁকে আপনার (সা) সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করে দেব এবং আপনি এমন একটি বিষয় গোপন করে রেখে আসছিলেন, যা আল্লাহ্ প্রকাশ করে দেবেন।

অধিকাংশ তফসীরকার যথা যুহ্‌রী, বকর ইবনুল আলা, কুশাইরী ও কাযী আবূ বকর ইবনুল আরাবী প্রমুখ এ তফসীরই গ্রহণ করেছেন, যে বিষয় অন্তরে গোপন রয়েছে বলে বর্ণনা করা হয়েছে ওহীয়ে ইলাহী অনুযায়ী রেওয়ায়েতে ما فى نفسك -এর তফসীর হযরত যয়নব (রা)-র প্রতি ভালবাসা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সে সম্পর্কে প্রখ্যাত মুফাস্‌সির ইবনে কাসীর মন্তব্য করেন যে, এসব রেওয়ায়েতের মধ্যে কোনটাই বিশুদ্ধ ও প্রামাণ্য নয় বলে আমরা এগুলোর উল্লেখ বাঞ্ছনীয় মনে করিনি।

বস্তুত কোরআন পাকের শব্দাবলীতেও হযরত যয়নুল আবেদীন (রা)-এর রেওয়ায়েতে উপরে বর্ণিত এ তফসীরেরই সমর্থন মেলে। কেননা এ আয়াতে স্বয়ং আল্লাহ্ পাক বলে দিচ্ছেন যে, অন্তরে লুকায়িত বস্তু তাই ছিল যা আল্লাহ্ পাক প্রকাশ করে দেবেন। আল্লাহ্ পাক পরবর্তী আয়াতে যে বিষয় প্রকাশ করেছেন তা হলো হযরত যয়নবের সাথে হুযুর (সা)-এর বিয়ে। যেমন--বলেছেন زوجنكها অর্থাৎ আমি আপনাকে তাঁর (হযরত যয়নব) সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করে দিলাম।--(রূহুল মা'আনী)।

অপবাদ থেকে বেঁচে থাকা বাঞ্ছনীয়ঃ প্রশ্ন উঠে যে, মানুষের অপবাদ ও ভর্ৎসনা থেকে বাঁচার জন্য রসূলুল্লাহ্ (সা) এমন বিষয়কে গোপন করলেন কেন, যা আল্লাহ্র অসন্তুষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়াল। এর উত্তর এই যে, এ ক্ষেত্রে কোরআন-হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আসল বিধান হল, যে কাজ করলে মানুষের মাঝে ভুল বোঝাবুঝি এবং তাদের ভর্ৎসনা ও অপবাদ দেওয়ার পাপে লিপ্ত হওয়ার আশংকা থাকে, সেগুলোকে পরিহার করা সেক্ষেত্রে তো অবশ্যই জায়েয যখন এ কাজ শরীয়তের মূল লক্ষ্য-বস্তুসমূহের অন্তর্ভুক্ত না হয় এবং হালাল-হারাম জনিত কোন দীনী নির্দেশ এর সাথে জড়িত না থাকে, যদিও কাজটি মূলত প্রশংসনীয়ই হয়। যার উদাহরণ নবীজী (সা)-র হাদীসে বিদ্যমান রয়েছে। যথা নবীজী (সা) ইরশাদ করেছেন যে, অজ্ঞতা ও বর্বরতার যুগে যখন কা'বাঘর নির্মিত হয়, তখন এতে কয়েকটি কাজ হযরত ইব্রাহীম (আ) অনুসৃত রূপরেখার উল্টো করা হয়। ১. কা'বা গৃহের অংশ-বিশেষ নির্মাণ বহির্ভূত করে রাখা হয়। ২. হযরত ইব্রাহীম (আ) কর্তৃক নির্মাণ-কালে বায়তুল্লাহ্র অভ্যন্তরে প্রবেশের জন্য দুটি দরজা ছিল, একটি পশ্চিম দিকে অপরটি পূর্বদিকে। ফলে বায়তুল্লাহ্র ভেতরে যাতায়াতে কোন প্রকারের অসুবিধা হতো না। জাহিলিয়াত যুগের লোকেরা এতে দু'ভাবে হস্তক্ষেপ করল। পশ্চিম দিকের দরজা একেবারে বন্ধ করে দেওয়া হল এবং পূর্ব দিকের দরজা যা--ভূতলের প্রায় সম উচ্চতা

বিশিষ্ট ছিল, তা এতটুকু উঁচু করা হল যে, সিঁড়ি ব্যতীত সে দরজা দিয়ে প্রবেশ করা যেত না। উদ্দেশ্য এই ছিল যে, যাকে তাঁরা অনুমতি দেবে কেবল সে-ই এর ভিতর প্রবেশ করতে পারবে।

রসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন যে, যদি নও-মুসলিমগণের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টির আশংকা না থাকত তবে আমি কা'বাঘর হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর রূপরেখা অনুযায়ী পুনর্নির্মাণের ব্যবস্থা করতাম, এ হাদীস প্রত্যেক প্রামাণ্য গ্রন্থেই রয়েছে। এর দ্বারা বোঝা গেল যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) মানুষকে ভুল বোঝাবুঝি থেকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে তাঁর এ বাসনা শরীয়ত মতে প্রশংসনীয় হওয়া সত্ত্বেও পরিত্যাগ করেছেন। অবশ্য এ পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অসন্তুষ্টি জ্ঞাপন কোন ওহীও আসেনি। সুতরাং এ কাজ আল্লাহ্ পাকের নিকট গৃহীত হয়েছে বলেই বোঝা যায়। কিন্তু হযরত ইবরাহীম (আ)-এর রূপরেখা অনুযায়ী বায়তুল্লাহ্র পুনর্নির্মাণ এমন কোন ব্যাপার নয়, যার উপর শরীয়তের কোন উদ্দেশ্য নির্ভরশীল অথবা যার সাথে হালাল-হারাম সংশ্লিষ্ট হুকুমসমূহ জড়িত।

পক্ষান্তরে হযরত যয়নব (রা)-এর বিয়ের ঘটনার সাথে তথাকথিত পালক পুত্রের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর সঙ্গে বিয়ে হারাম হওয়া সংক্রান্ত বর্বর যুগের প্রচলিত কুপ্রথা ও ভ্রান্ত ধারণা কার্যকরভাবে অপনোদনের এক বিশেষ শরীয়তী উদ্দেশ্য জড়িত ছিল। কেননা সমাজ প্রচলিত কুপ্রথার কার্যকরভাবে মূল উৎপাটন তখনই সম্ভব, যখন হাতেকলমে বাস্তবে করে দেখান হয়। হযরত যয়নবের বিয়ে সংশ্লিষ্ট আল্লাহ্ পাকের নির্দেশ এ উদ্দেশ্যের পূর্ণতা সাধনের জন্যই ছিল। এ বক্তব্যের মাধ্যমে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর নক্শা অনুযায়ী বায়তুল্লাহ্ পুনর্নির্মাণের পরিকল্পনা কার্যকর না করা এবং আল্লাহ্ পাকের ইরশাদ মুতাবিক যয়নব (রা)-এর বিয়ে কার্যকরী করার মধ্যকার বাহ্যত প্রতীয়মান বিরোধ ও বৈপরীত্যের উত্তর হয়ে গেল।

এ প্রসঙ্গে বোঝা যায়, যেন রসূলুল্লাহ্ (সা) সূরায়ে আহযাবের প্রথম আয়াতসমূহে বর্ণিত এই হুকুমের মৌখিক প্রচারই যথেষ্ট বলে মনে করতেন। এর কার্যকর ও বাস্তব প্রয়োগের তাৎপর্য ও প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ্য করেন নি। তাই জানা ও ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তা গোপন রেখেছিলেন। উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ্ পাক এটি সংশোধন করে তা প্রকাশ করেছেন ঃ— لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا অর্থাৎ আমি আপনার সাথে যয়নবের বিয়ে সম্পন্ন করেছি যাতে মুসলমানগণ নিজেদের পালক পুত্রের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিয়ে করতে গিয়ে কোন জটিলতার সম্মুখীন না হয়।

زَوَّجْنٰكَهَا—এর শাব্দিক অর্থ আপনার সাথে তাঁর বিয়ে স্বয়ং আমি সম্পন্ন করে দিয়েছি। এর ফলে এ কথা বোঝা যায় যে, এ বিয়ে স্বয়ং আল্লাহ্ পাক সম্পন্ন করে দেওয়ার মাধ্যমে বিয়ে-শাদীর সাধারণভাবে প্রচলিত শর্তাবলীর ব্যতিক্রম ঘটিয়ে এ বিয়ের প্রতি বিশেষ মর্যাদা আরোপ করেছেন। আবার এর অর্থ এরূপও হতে পারে যে, এ বিয়ের নির্দেশ আমি প্রদান করলাম, এখন আপনি শরীয়তী বিধিবিধান ও শর্তাবলী মুতাবিক তা সম্পন্ন করে নিন। মুফাস্‌সিরগণের মধ্যে কিছু সংখ্যক প্রথম অর্থ এবং কিছু সংখ্যক দ্বিতীয় অর্থ অধিক যুক্তিযুক্ত বলে মন্তব্য করেছেন।

অন্যান্য স্ত্রীলোকের সম্মুখে হযরত যয়নবের এরূপ উক্তি যে, তোমাদের বিয়ে তো তোমাদের পিতামাতা কর্তৃক সম্পন্ন হয়; কিন্তু আমার বিয়ে স্বয়ং আল্লাহ্ পাক আকাশে সম্পন্ন করেছেন---যা বিভিন্ন রেওয়ায়েতে পরিলক্ষিত হয়। একথা উপরোক্ত উভয় অর্থের বেলায়ই প্রযোজ্য। যা প্রথম অর্থে অধিক স্পষ্ট; অবশ্য দ্বিতীয় অর্থও এর পরিপন্থী নয়।

বিভিন্ন সন্দেহ ও প্রশ্নাবলীর উত্তরের সূচনাঃ سُنَّةَ اللّٰهِ فِى الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ۚ وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ قَدَرًا مَّقْدُوْرًا এ আয়াতের মাধ্যমে এ বিয়ের পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভূত সন্দেহসমূহের উত্তরের সূচনা এরূপভাবে করা হয়েছে যে, অন্যান্য পুণ্যবতী স্ত্রীগণ থাকা সত্ত্বেও এ বিয়ের পেছনে কি উদ্দেশ্য নিহিত ছিল?---ইরশাদ হয়েছে যে, এটা আল্লাহ্ পাকের চিরন্তন বিধান যা কেবল মুহাম্মদ (সা)-এর জন্যই নির্দিষ্ট নয়; আপনার পূর্ববর্তী নবীগণের কালেই ধর্মীয় স্বার্থ ও মঙ্গলামঙ্গলের কথা বিবেচনা করে বহু সংখ্যক স্ত্রীলোকের পাণি গ্রহণের অনুমতি ছিল। তন্মধ্যে হযরত দাউদ ও হযরত সুলায়মান (আ)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হযরত দাউদ ও হযরত সুলায়মান (আ)-এর যথাক্রমে একশত ও তিনশত স্ত্রী ছিল। সুতরাং রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বেলায়ও বিভিন্ন ধর্মীয় স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে এ বিয়ে সহ একাধিক বিয়ের অনুমতি লাভ বিচিত্র কিছু নয়। এটা নবুয়ত ও রিসালতের মহান মর্যাদা ও তাক্ওয়া পরহিযগারীর পরিপন্থীও নয়। সর্বশেষ বাক্যে এ কথাও বলে দেওয়া হয়েছে যে, বিয়ে-শাদী অর্থাৎ কার সাথে কার বিয়ে অনুষ্ঠিত হবে তা মানুষের জীবিকার ন্যায় আল্লাহ্ পাক কর্তৃক সম্পূর্ণভাবে পূর্ব-নির্ধারিত ব্যাপার। এ সম্পর্কে ভাগ্যলিপিতে যা আছে তাই বাস্তবায়িত হবে। এ ক্ষেত্রেও হযরত যায়েদ ও হযরত যয়নবের স্বভাব-প্রকৃতির বিভিন্নতা, হযরত যায়েদের অসন্তুষ্টি---পরিশেষে তালাক প্রদানের সংকল্প, এ সব কিছুই ভাগ্যলিপির পর্যায়ক্রমিক বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

পরবর্তী পর্যায়ে অতীতকালে যেসব নবী (আ)-র বহু সংখ্যক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি ছিল বলে উপরে জানা গেছে, তাঁদের বৈশিষ্ট্য ও বিশেষ গুণাবলীর বর্ণনা

দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسٰلٰتِ اللّٰهِ অর্থাৎ এসব মহীয়ান নবীগণ (আ) সবাই আল্লাহ্ পাকের বাণীসমূহ নিজ নিজ উম্মতের নিকটে পৌঁছিয়েছেন।

একটি জ্ঞানগর্ভ নিগূঢ় তত্ত্ব ঃ সম্ভবত এতে নবীগণ (আ)-এর বহু সংখ্যক স্ত্রী থাকার তাৎপর্য ও যৌক্তিকতার প্রতি ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে যে, এঁদের (আ) যাবতীয় কাজকর্ম ও বাণীসমূহ উম্মত পর্যন্ত পৌঁছা একান্ত আবশ্যক। পুরুষদের জীবনের এক বিরাট অংশ ঘরোয়া পরিবেশে স্ত্রী ও পুত্র-পরিজনের সাথে কাটাতে হয়। এ সময় যে সব ওহী নাযিল হয়েছে বা স্বয়ং নবীজী যেসব নির্দেশ প্রদান করেছেন অথবা কোন কাজ করেছেন—এগুলো সবই উম্মতের আমানত স্বরূপ, যেগুলো কেবল পুণ্যবতী স্ত্রীগণের মাধ্যমেই সহজতরভবে উম্মতের নিকট পৌঁছানো সম্ভব ছিল। পৌঁছানোর অন্যান্য পদ্ধতি জটিলতামুক্ত নয়। তাই নবীগণ (আ)-এর অধিক সংখ্যক স্ত্রী থাকলে তাঁদের পারিবারিক জীবনের কার্যক্রম ও কথাবার্তা এবং তাদের ঘরোয়া পরিবেশের চরিত্র ও রূপরেখা সাধারণ উম্মত পর্যন্ত পৌঁছা সহজতর হবে।

নবীগণ (আ)-এর যে অপর এক গুণ বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে তা এই—وَيَخْشَوْنَهٗ وَلَا يَخْشَوْنَ اَحَدًا اِلَّا اللّٰهَ অর্থাৎ এসব মহাত্মা আল্লাহ্ পাককে ভয় করেন এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় করেন না। ধর্মীয় কল্যাণ ও মঙ্গলার্থে কোন কাজ বা বিষয় প্রকাশ্য ও সরাসরি তাবলীগের জন্য যদি তাঁরা আদিষ্ট হন তবে এতে তাঁরা কোন প্রকারের শৈথিল্য প্রদর্শন করেন না। এরূপ করতে গিয়ে তাঁরা কোন মহলের কটাক্ষপাত ও বিরূপ সমালোচনারও কোন পরোয়া করেন না।

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর ঃ এখানে যখন সমগ্র নবীরই এরূপ অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাঁরা আল্লাহ্ পাক ভিন্ন আর কাউকে ভয় করেন না। অথচ এর পূর্ববর্তী আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে ঃ تَخْشَى النَّاسَ (অর্থাৎ আপনি মানুষকে ভয় করেন)—এটা কিভাবে সম্ভব? উত্তর এই যে, উল্লিখিত আয়াতে নবীগণ (আ)-এর আল্লাহ্ পাক ভিন্ন অন্য কাউকে ভয় না করা—এটা কেবল রিসালত সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি এবং তবলীগের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মাঝে এমন এক বিষয় সম্পর্কে কটাক্ষপাতের ভয় উদ্রেক করেছে, যা ছিল বাহ্যত একটি পার্থিব কাজ। তবলীগ ও রিসালতের সাথে এর কোন সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু উল্লিখিত আয়াত-সমূহের মাধ্যমে যখন আপনার নিকট একথা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, এ বিয়ে বাস্তব ও কার্যকর তবলীগ এবং রিসালতের অংশ বিশেষ, তখন কারো কটাক্ষপাত ও নিন্দাবাদের ভয় তাঁর কর্তব্য পথেও কোন বাধা বা প্রতিবন্ধকতা আরোপ করতে পারেনি। তাই অবিশ্বাসী কাফিরদের পক্ষ থেকে নানাবিধ আপত্তি ও প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়া সত্ত্বেও এ বিয়েকে

বাস্তব রূপ প্রদান করা হয়েছিল। বস্তুত অদ্যাবধিও এ সম্পর্কে বিভিন্ন অবান্তর প্রশ্নের অবতারণা হতে দেখা যায়।

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٤٠﴾

(৪০) মুহাম্মদ তোমাদের কোন ব্যক্তির পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহ্‌র রসূল এবং শেষ নবী। আল্লাহ্ সব বিষয়ে জ্ঞাত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

[প্রথম আয়াতসমূহে হযরত যয়নব (রা)-এর বিয়ে একটি শরীয়তী বিধান ও তত্ত্বের বাস্তব তবলীগ এবং নবীগণের সুন্নত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে কাম্য ও প্রশংসনীয় বলে বর্ণনা করা হয়েছিল। পরবর্তী পর্যায়ে সেসব প্রশ্নকারীদের উত্তর দেওয়া হয়েছে, যারা এ বিয়ে গর্হিত মনে করে কটাক্ষপাত করছিল অর্থাৎ] মুহাম্মদ (সা) তোমাদের পুরুষগণের মধ্য থেকে কারো পিতা নন [অর্থাৎ যেসব লোকের রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাথে সন্তানগত সম্পর্ক নেই। যেমন এ আয়াতে সাধারণ সাহাবাবৃন্দকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে رجالكم অর্থাৎ তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে কারো পিতা নন। এখানে নবীজী ব্যতীত অপরাপর লোকদেরকে এর আওতাভুক্ত করা হয়েছে। নবীজী এর আওতাভুক্ত নন। সুতরাং নিজ পরিবারের কোন ব্যক্তির পিতা হওয়া এর পরিপন্থী নয়। যার মর্মার্থ এই যে, সাধারণ উম্মতভুক্ত কারো সাথে তাঁর পিতৃত্বের সম্পর্ক বিদ্যমান নেই, যা কোন নির্ভুল প্রমাণাদির দ্বারা তাদের তালাক-প্রদত্ত স্ত্রীর সাথে বিয়ে হারাম হওয়ার কারণ বলে বিবেচিত হতে পারে] কিন্তু (অপর এক প্রকারের আত্মিক পিতৃত্ব অবশ্যই বিদ্যমান রয়েছে। বস্তুত) তিনি আল্লাহ্‌র রসূল (এবং প্রত্যেক রসূল আত্মিক অভিভাবক হিসেবে সমগ্র উম্মতের আধ্যাত্মিক পিতা) এবং (এই আধ্যাত্মিক পিতৃত্বের ক্ষেত্রে তিনি এমন চরম উৎকর্ষ সাধন করেছেন যে, তিনি সমস্ত রসূলের মধ্যে সর্বোত্তম ও পূর্ণতম। বস্তুত তিনি) সকল নবীর মোহর বিশেষ (এবং যে নবী এমন হবেন তিনি আধ্যাত্মিক পিতৃত্বের ক্ষেত্রে সর্বাধিক অগ্রগণ্য। কেননা তাঁর এ আধ্যাত্মিক পিতৃত্ব ধারা কিয়ামত পর্যন্ত বহাল থাকবে। ফলে তাঁর আধ্যাত্মিক সন্তান সর্বাধিক হবে। মোটকথা উম্মতের জন্য তাঁর পিতৃত্ব শারীরিক বা বংশগত নয়---বিয়ে হারাম হওয়া যার সাথে সম্পর্কিত; বরং এ পিতৃত্বের সম্পর্কটা একান্তই আধ্যাত্মিক। তাই পালক পুত্রের পরিত্যক্ত স্ত্রীর সাথে বিয়ে অনুষ্ঠিত হওয়া কোন আপত্তিজনক ব্যাপার নয়। বরং সমগ্র মানব তাঁর প্রতি পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন করুক---আধ্যাত্মিক পিতৃত্ব এ কথাই কামনা করে) এবং (যদি এরূপ ওয়াস-ওয়াসার উদ্রেক করে যে, এ বিয়ে তো নাজায়েয

ছিল না, তবে সংঘটিত না হওয়াই উত্তম ছিল। এমতাবস্থায় কোন প্রশ্ন তোলার বা কটাক্ষ করার সুযোগই মিলত না। তবে একথা বুঝে নেওয়া উচিত যে) মহান আল্লাহ্ প্রত্যেক বস্তুর (অস্তিত্ব লাভ করা ও না করার উপকার ও উপযোগিতা সম্পর্কে) ভাল-ভাবেই জ্ঞাত।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

উল্লিখিত আয়াতে সেসব লোকের ধারণা অপনোদন করা হয়েছে, যারা বর্বর যুগের প্রথা অনুযায়ী হযরত যায়েদ বিন হারিসা (রা)-কে নবীজীর সন্তান বলে মনে করতো এবং তিনি হযরত যয়নব (রা)-কে তালাক দেওয়ার পর নবীজীর সাথে তাঁর বিয়ে অনুষ্ঠিত হওয়ায় তাঁর প্রতি পুত্রবধূকে বিয়ে করেছেন বলে কটাক্ষ করত। এ ভ্রান্ত ধারণা অপনোদনের জন্য এটুকু বলাই যথেষ্ট ছিল যে, হযরত যায়েদের পিতা রসূলুল্লাহ্ (সা) নন বরং তাঁর পিতা হারিসা (রা)। কিন্তু এ বিষয়টির প্রতি বিশেষ তাকীদ দেয়াচ্ছলে ইরশাদ হয়েছে: مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ (অর্থাৎ রসূলুল্লাহ্ (সা) তোমাদের মধ্যকার কোন পুরুষের পিতা নন। যে ব্যক্তির সন্তান-সন্ততি-দের মধ্যে কোন পুরুষ নেই, তাঁর প্রতি এরূপ কটাক্ষ করা কিভাবে যুক্তিসংগত হতে পারে যে, তাঁর পুত্র রয়েছে এবং তাঁর পরিত্যক্তা স্ত্রী নবীজীর পুত্রবধূ বলে তাঁর জন্য হারাম হবে।

এই মর্মার্থ প্রকাশের জন্য সংক্ষিপ্ত শব্দ সমষ্টি (اَبَا اَحَدٍ مِّنْكُمْ) বললেই চলত। তদস্থলে কোরআনে হাকীমে অতিরিক্ত رِجَال শব্দ ব্যবহার করে এরূপ সন্দেহ অপনোদন করা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র তো হযরত খাদীজা (রা)-র গর্ভস্থ তিন পুত্র সন্তান কাসেম, তাইয়্যেব ও তাহের এবং হযরত মারিয়ার গর্ভস্থ এক সন্তান ইব্রাহীম--- মোট চার পুত্র-সন্তান ছিলেন। কেননা এঁরা সবাই শৈশবাবস্থায় ইন্তিকাল করেন। এঁরা কেউই (পূর্ণবয়স্ক) পুরুষ পর্যায়ে পৌঁছেন নি। আবার এরূপও বলা যেতে পারে যে, এ আয়াত নাযিল হওয়াকালে কোন পুত্র সন্তান ছিল না। কাসেম, তাইয়্যেব, তাহের (রা) তো ইতিমধ্যেই ইন্তেকাল করেছিলেন। আর ইব্রাহীম তখন পর্যন্ত জন্মলাভই করেন নি।

বিরুদ্ধবাদীদের প্রশ্ন ও কটাক্ষের উত্তর এ বাক্য দ্বারাই হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে অপরাপর সন্দেহাবলী দূরীকরণার্থে ইরশাদ করেন: وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ— আরবী ভাষায় لٰكِن শব্দ পূর্ববর্তী বাক্যে কোন প্রকারের সন্দেহের অবকাশ থাকলে তা দূরীকরণার্থে ব্যবহৃত হয়। এ স্থলে রসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পর্কে যখন একথা বর্ণনা করা

হয়েছে যে, তিনি উম্মতের অন্তর্গত কোন পুরুষের পিতা নন; তখন এরূপ সন্দেহের উদ্রেক করতে পারে যে, নবীগণ প্রত্যেকেই তো নিজ নিজ উম্মতের জনক। এ পরিপ্রেক্ষিতে রসূলুল্লাহ্ (সা) সকল পুরুষ---বরং সমগ্র নারী-পুরুষের পিতা। তাঁর প্রতি পিতৃত্ব আরোপের কথা অস্বীকার করা প্রকারান্তরে নবুয়তকেই অস্বীকার করার নামান্তর।

وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ শব্দত্রয়ের মাধ্যমে এর উত্তর এরূপভাবে দেওয়া হয়েছে যে, প্রকৃত ঔরসী পিতা---যে ভিত্তিতে বিয়ে শাদী হালাল-হারাম সংক্রান্ত নির্দেশাবলী আরোপিত হয়---তা ভিন্ন জিনিস। আর নবী হিসেব গোটা উম্মতের আত্মিক পিতা হওয়া ভিন্ন জিনিস, এর সাথে উল্লিখিত আহ্কামের কোন সম্পর্ক নেই। সুতরাং সম্পূর্ণ বাক্যের মর্মার্থ এই দাঁড়াল যে, তিনি উম্মতের অন্তর্গত কোন পুরুষের পিতা নন, কিন্তু আধ্যাত্মিক পিতা সকলেরই।

এর মাধ্যমে কতক মুশরিক কৃত অপর এক কটাক্ষেরও উত্তর হয়ে গেল। তা এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) অপুত্রক। অর্থাৎ ভবিষ্যতে যে কারো মাধ্যমে তাঁর বাণী ও কর্মধারা গতিশীল থাকতে পারে ও তাঁর বংশ বজায় থাকতে পারে---এমন কোন পুত্র সন্তান তাঁর নেই। কিছু কাল পরেই এগুলো মিটে যাবে। উপরোক্ত শব্দসমূহের দ্বারা একথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, যদিও তাঁর ঔরসজাত পুত্রসন্তান নেই, কিন্তু তাঁর নবুয়ত মিশনের প্রসার ও অগ্রগতি সাধনের জন্য ঔরসজাত পুত্র সন্তানের কোন প্রয়োজন নেই। এ দায়িত্ব রূহানী সন্তানগণই পালন করে যাবেন। যেহেতু তিনি আল্লাহ্র রসূল এবং রসূল উম্মতের রূহানী পিতা; সুতরাং তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে তোমাদের সকলের চাইতে অধিক সন্তানের অধিকারী।

এখানে যেহেতু রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বর্ণনা এসেছে এবং নবী হিসাবে তিনি বিশেষ ও অনন্য মর্যাদার অধিকারী, সুতরাং পরবর্তী পর্যায়ে তাঁকে وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ বিশেষণে ভূষিত করার মাধ্যমে এ কথাই প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি নবীকুলের মধ্যে অনন্য বৈশিষ্ট্য ও বিশেষ মর্যাদায় অভিষিক্ত শ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম জন। وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ— خاتم শব্দে দু'প্রকারের কিরাত রয়েছে। ইমাম হাসান ও ইমাম আসেমের কিরাতে خاتم এর تاء এর উপর যবর রয়েছে। অন্যান্য ইমামগণের কিরাতানুযায়ী উক্ত تاء যের বিশিষ্ট। কিন্তু উভয়ের সারমর্ম এক ও অভিন্ন---অর্থাৎ নবীগণের আবির্ভাব ধারার সমাপ্তি সাধনকারী। কেননা خاتم এর تاء যের বিশিষ্ট হোক বা যবর বিশিষ্ট---উভয়ের এক অর্থ শেষও রয়েছে। আবার উভয় শব্দ মোহরের অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। দ্বিতীয় অর্থের বেলায়ও সারকথা শেষ অর্থই দাঁড়ায়। কেননা কোন বস্তু বন্ধ করে দেয়ার জন্য মোহর সর্বশেষেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যের ও যবর বিশিষ্ট

خاتم শব্দ উভয়টার উভয় অর্থই কামূস, সিহাহ্, লিসানুল-আরাব, তাজুল-উরূস প্রভৃতি শীর্ষস্থানীয় আরবী অভিধানসমূহে রয়েছে। এই তফসীরে রূহুল মা'আনীতে خاتم এর অর্থ মোহরের সারমর্ম ও শেষ বলেই বর্ণনা করা হয়েছে। রূহুল মা'আনীর শব্দ-সমূহ্ এরূপ ঃ

والخاتم اسم الة لما يختم به فمعنى خاتم النبيين الذى ختم به النبيون وما له اخر النبيين অর্থাৎ خاتم ঐ যন্ত্রের নাম যার মাধ্যমে সমাপ্তি সাধন করা হয়। সুতরাং خاتم النبيين অর্থ যার মাধ্যমে নবীগণের আগমন ধারার পরিসমাপ্তি সাধন করা হয়েছে—যার সারকথা নবীগণের সর্বশেষ ব্যক্তি।) তফসীরে বায়যাবী ও তফসীরে আহমদীতেও অনুরূপ বর্ণনাই রয়েছে। ইমাম রাগেব 'মুফরাদাতুল কোরআনে' বলেন ঃ وخاتم النبوة لانه ختم النبوة اى تممها بمجيئه অর্থাৎ তাঁকে খাতেমে-নবুয়ত এজন্য বলা হয় যে, তিনি তাঁর আগমনের মাধ্যমে নবুয়তের পরিসমাপ্তি ও পরিপূর্ণতা সাধন করেছেন।

মাহকাম ইবনে সাবদাতে (محكم ابن سبده) রয়েছে ঃ وخاتم كل شئ وخاتمة عاقبته واخره অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুর خاتم বা خاتمة সে বস্তুর শেষ পরিণতি ও পরিসমাপ্তিকে বলা হয়।

সারকথা خاتم এর تاء যবর বিশিষ্ট হোক বা যের বিশিষ্ট হোক উভয় অবস্থায় অর্থ এই যে, তিনি নবীকুলের আগমন ধারার সমাপ্তকারী অর্থাৎ তিনি সবার পরে প্রেরিত হয়েছেন।

خاتم الانبياء এমন এক গুণ যা নবুয়ত ও রিসালতের পূর্ণতার ক্ষেত্রে তাঁর সর্বোচ্চ স্থান ও মর্যাদার সাক্ষ্য বহন করে। কেননা প্রত্যেক বস্তুই ক্রমান্বয়ে উন্নতির দিকে ধাবিত হয় এবং সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছলে এর পরিপূর্ণতা সাধিত হয়। আর সর্বশেষ পরিণতিই এর মোক্ষম উদ্দেশ্য; স্বয়ং কোরআনও তা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিয়েছে ঃ

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ অর্থাৎ আজ আমি তোমাদের দীন (জীবন-বিধান) পূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামতও (অনুগ্রহ) পূর্ণ করে দিলাম।

পূর্ববর্তী নবীগণের দীনও নিজ নিজ যুগানুসারে পরিপূর্ণই ছিল,—কোনটাই অসম্পূর্ণ ছিল না। কিন্তু সার্বিক পরিপূর্ণতার কথা সর্বতোভাবে নবীজীর দীনের প্রতিই প্রযোজ্য, যা পূর্ববর্তী সবারই জন্য দলীলস্বরূপ এবং সে দীন কিয়ামত পর্যন্ত চালু থাকবে।

এ ক্ষেত্রে خاتم النبيين বিশেষণ সংযোজনের ফলে এ বিষয়টাও একেবারে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, নবীজী যেহেতু সমগ্র উম্মতের জনকের মর্যাদায় ভূষিত, সুতরাং তাঁকে অপুত্রক বলে আখ্যায়িত করা নির্বুদ্ধিতা বৈ কিছুই নয়। কেননা خاتم النبيين শব্দদ্বয় একথাও ব্যক্ত করে দিয়েছে যে, পরবর্তীকালে কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী গোটা মানবকুলই তাঁর (নবীজীর) উম্মতভুক্ত। তাই তাঁর উম্মতের সংখ্যা অন্যান্য উম্মতের চাইতে অনেক বেশী হবে। ফলে নবীজী (সা)-র আধ্যাত্মিক সন্তানও অন্যান্য নবীগণের চাইতে বেশি হবে। خاتم النبيين বিশেষণটি একথাও বোঝাচ্ছে যে, সমগ্র উম্মতের প্রতি হযরতের (সা) স্নেহ-মমতা অন্যান্য নবীগণের তুলনায় অধিকতর হবে। তাঁর পরে কোন ওহী বা নবীর আগমন হবে না বলে তিনি কিয়ামত পর্যন্ত উদ্ভূত যাবতীয় সমস্যার সমাধান ও যাবতীয় প্রয়োজন মেটাবার পথ বাতলে দিয়েছেন। পক্ষান্তরে পূর্ববর্তী নবীগণের একথা ভাবতে হতো না, কেননা তাঁরা জানতেন যে, জাতির মাঝে গোমরাহী ও বিভ্রান্তি প্রসার লাভ করলে তাঁদের পর অন্যান্য নবী আবির্ভূত হয়ে এসবের সংশোধন ও সংস্কার সাধন করবেন। কিন্তু খাতামুল আম্বিয়ার (সা) এ কথাও ভাবতে হতো যে, কিয়ামত পর্যন্ত উম্মত যে বিভিন্নমুখী অবস্থা ও সমস্যার সম্মুখীন হবে সেগুলো সম্পর্কে উম্মতকে প্রয়োজনীয় পথনির্দেশ তাঁকেই দিতে হবে। যে সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বিভিন্ন হাদীস সাক্ষ্য প্রদান করে যে, তাঁর পর অনুসরণযোগ্য যেসব ব্যক্তি'র আবির্ভাব ঘটবে তাঁদের অধিকাংশের নামই তিনি উল্লেখ করে দিয়েছেন। অনুরূপভাবে ভবিষ্যতে অন্যায় ও অসত্যের যত পতাকাবাহীর প্রাদুর্ভাব ঘটবে ওদেরও যাবতীয় লক্ষণ, অবস্থা ও তথ্যাদি এমন স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে দিয়েছেন যেন একজন সাধারণ চিন্তাশীলেরও এ সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ না থাকে। এ কারণেই রসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন যে, আমি তোমাদের জন্য এমন উজ্জ্বল ও জ্যোতিষ্মান সম পথ রেখে গেলাম যেথায় দিবারাত্রি দুটোই সমান---কখনো পথভ্রষ্ট হওয়ার আশংকা নেই।

এ আয়াতে একথাও প্রণিধানযোগ্য যে, উপরে হুযুর (সা)-এর উল্লেখ 'রসূল' বিশেষণে করা হয়েছে। এজন্য বাহ্যত خاتم الرسل বা خاتم المرسلين শব্দের ব্যবহার অধিক যুক্তিসংগত ছিল বলে মনে হয়। অথচ কোরআনে হাকীম তদস্থলে خاتم النبيين শব্দ গ্রহণ করেছে।

কারণ এই যে, অধিকাংশ আলিমের মতে নবী ও রসূলের মাঝে পার্থক্য শুধু একটাই---তা এই যে, নবী সেসব ব্যক্তি, যাঁদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টিকুলের পরিশুদ্ধি ও সংস্কার সাধনের জন্য প্রেরণ করেছেন এবং তাঁদের প্রতি ওহী নাযিল করে ধন্য করেছেন, চাই তাঁদের জন্য কোন স্বতন্ত্র আসমানী গ্রন্থ ও স্বতন্ত্র শরীয়ত নির্ধারিত হয়ে থাকুক---অথবা পূর্ববর্তী কোন নবীর গ্রন্থ ও শরীয়তের অনুসারীগণের হিদায়তের জন্য

আদিষ্ট হয়ে থাকুক--যেমন হযরত হারুন (আ) হযরত মূসা (আ)-র গ্রন্থ ও শরীয়তের অনুসারীগণের হিদায়তের জন্য আদিষ্ট হয়েছিলেন।

অপরপক্ষে 'রসূল' শব্দটি বিশেষভাবে ঐ নবীর প্রতি প্রযোজ্য, যাঁকে স্বতন্ত্র গ্রন্থ ও শরীয়ত প্রদান করা হয়েছে। অনুরূপভাবে 'রসূল' শব্দের চাইতে 'নবী' শব্দের মর্মার্থে ব্যাপকতা অধিক। সুতরাং আয়াতের মর্মার্থ এই যে, তিনি (সা) নবীকুলের আগমন ধারা সমাপ্তকারী এবং সর্বশেষ আগমনকারী। চাই তিনি স্বতন্ত্র শরীয়তের অধিকারী নবী হোন বা পূর্ববর্তী নবীর অনুসারী হোন। এ দ্বারা বোঝা গেল যে, আল্লাহ্ পাকের নিকটে যত প্রকারের নবী হতে পারেন তাঁর (নবীজী) মাধ্যমে এঁদের সবার পরিসমাপ্তি ঘটলো। তাঁর পরে অন্য কোন নবী প্রেরিত হবেন না।

ইমাম ইবনে কাসীর স্বীয় তফসীরে ফরমান ঃ

فهذه الاية فى انه لا نبى بعده واذا كان لا نبى بعده فلا رسول بالطرلق الاولى لان مقام الرسالة اخص من مقام النبوة فان كل رسول نبى ولا ينعكس بذالك وردت الاحاديث المتواترة عن رسول الله (صلعم) من حديث جماعة من الصحابة -

অর্থাৎ এ আয়াত এ আকীদার পক্ষে স্পষ্ট প্রমাণ যে, তাঁর পরে কোন নবী নেই এবং যখন কোন নবী নেই তখন রসূল থাকার প্রশ্নই উঠে না। কেননা 'নবী' ব্যাপক অর্থবোধক এবং 'রসূল' শব্দটি বিশিষ্টতা জ্ঞাপক। এটা এমন এক আকীদা, যার সমর্থন-সূচক বহুসংখ্যক প্রামাণ্য হাদীস রয়েছে যা সাহাবায়ে কিরামের এক বিরাট জামাতের দ্বারা বর্ণিত হয়ে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে। এ আয়াতের শব্দগত বিশ্লেষণ খানিকটা বিস্তারিতভাবে এ জন্য করা হয়েছে যে, আমাদের দেশে নবুয়তের দাবীদার গোলাম আহমদ কাদিয়ানী এ আয়াতকে স্বীয় হীন উদ্দেশ্য সাধনের পথে অন্তরায় মনে করে এর তফসীরে নানাবিধ বিকৃতি ও মনগড়া সম্ভাব্যতা উদ্ভাবন করেছে। উপরোল্লিখিত বক্তব্যের মাধ্যমে আলহামদুলিল্লাহ্---এগুলোর উত্তর হয়ে গেছে।

খতমে-নবুয়তের মাস'আলা ঃ রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নবীকুলের আগমনধারার পরিসমাপ্তকারী হওয়া, তাঁর সর্বশেষ নবী হওয়া, তাঁর পরে আর কোন নবী প্রেরিত না হওয়া এবং প্রত্যেক নবুয়তের দাবীদার মিথ্যাবাদী ও কাফির প্রতিপন্ন হওয়া---এমন এক মাস'আলা যে সম্পর্কে প্রত্যেক যুগের মুসলমানগণ ঐক্যবদ্ধ ও অভিন্ন মত পোষণ করে আসছেন। সুতরাং এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু কাদিয়ানী সম্প্রদায় এ সম্পর্কে মুসলমানদের মনে সন্দেহ ও বিভ্রান্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রাণান্তকর চেষ্টায় রত। তারা শত শত পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশ করে অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত মানুষকে পথভ্রষ্ট করতে প্রয়াস পাচ্ছে। সুতরাং আমি এ মাস'আলার বিশদ আলোচনা পূর্ণ 'খতমে-নবুয়ত' নামে এক স্বতন্ত্র কিতাব লিখেছি। যাতে একশত আয়াত,

দু'শতাধিক হাদীস এবং পূর্ববর্তী মুসলিম মনীষিগণের অসংখ্য উক্তি ও উদ্ধৃতির মাধ্যমে এ মাস'আলা বিস্তারিত ও সুস্পষ্ট বিশ্লেষণ করেছি এবং কাদিয়ানীদের দ্বারা সৃষ্ট অমূলক সন্দেহাবলীর যথোপযুক্ত উত্তর দিয়েছি। এখানে সেগুলো থেকে কয়েকটি প্রয়োজনীয় কথা উল্লেখ করা হচ্ছে।

তাঁর খাতামুন্নাবিঈন হওয়া শেষ যমানায় হযরত ঈসা (আ)-র পুনরাবির্ভাবের পরিপন্থী নয়ঃ যেহেতু কোরআনে করীমের বেশ কিছু সংখ্যক আয়াত এবং প্রামাণ্য হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত যে, শেষ যমানায় কিয়ামতের পূর্বে হযরত ঈসা (আ) পুনরায় দুনিয়াতে আবির্ভূত হবেন, দাজ্জালকে হত্যা করবেন এবং তদানীন্তন বিশ্বে বিরাজমান সকল প্রকারের গোমরাহীর মূলোৎপাটন করবেন, যার বিস্তারিত বর্ণনা আমি আমার التصريح بما تواتر فى نزول المسيح নামক পুস্তিকায় প্রদান করেছি।

কোরআন-হাদীসের অসংখ্য বাণী দ্বারা প্রমাণিত ও সমর্থিত হযরত ঈসা (আ)-র আকাশে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়ার এবং শেষ যমানায় তাঁর পুনরাবির্ভাবের কথা মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী সরাসরি অস্বীকার করে নিজেই প্রতিশ্রুত মসীহ্ বলে দাবী করেছে এবং প্রমাণ স্বরূপ বলেছে যে, হযরত ঈসা ইবনে মরিয়মের (আ) দুনিয়াতে পুনরায় আগমনের কথা যদি মেনে নেয়া হয় তবে এটা হুযূর (সা)-এর خاتم النبيين হওয়ার পরিপন্থী হবে।

উত্তর একেবারে সুস্পষ্ট--- خاتم النبيين এবং সর্বশেষ নবী হওয়ার অর্থ আপনার পরে কোন ব্যক্তি নবী পদে অধিষ্ঠিত হবেন না। এ দ্বারা এ কথা বোঝা যায় না যে, তাঁর পূর্বে যাঁরা নবুয়ত প্রাপ্ত হয়েছেন তাঁদের নবুয়ত প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে বা এ জগতে এঁদের কারো পুনরাবির্ভাব ঘটতে পারে না। অবশ্যই হযরত (সা)-র পরে তাঁর উম্মতের সংস্কার ও পরিশুদ্ধির উদ্দেশ্যে যিনিই আবির্ভূত হবেন, তিনি স্বীয় নবুয়ত পদে বহাল থেকে আঁ হযরতের (সা) প্রবর্তিত আদর্শ ও শিক্ষাদীক্ষার অনুসারী হয়েই এ উম্মতের পরিশুদ্ধি ও সংস্কারের দায়িত্ব পালন করবেন। যেমন সহীহ্ হাদীস-সমূহে পরিষ্কারভাবে বর্ণিত আছে। ইমাম ইবনে কাসীর এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে বলেন ঃ

والمراد بكونه عليه السلام خاتمهم انقطاع حدوث وصف النبوة فى احد من الثقلين بعد تحليته عليه السلام بها فى هذه النشأة ولا يقدح فى ذالك ما اجمعت عليه الامة واشتهرت فيه الاخبار ولعلها بلغت مبلغ التواتر المعنوى ونطق به الكتاب على قول ووجب الايمان به واكفر منكره كالفلاسفة من نزول عيسى عليه السلام اخر الزمان - لانه كان نبيا قبل ان يتحلى نبينا صلى الله عليه وسلم بالنبوة فى هذه النشأة -

অর্থাৎ রসূলুল্লাহ্ (সা)-র খাতামুন্নাবীঈনের অর্থ এই যে, তাঁর আবির্ভাবের পরে নবুয়ত পদের পরিসমাপ্তি ঘটবে। এখন আর কেউ এ গুণ ও পদের অধিকারী হবেন না। এ দ্বারা শেষ যমানায় হযরত ঈসা (আ)-র দুনিয়ায় পুনঃ অবতরণের মাস'আলা সম্পর্কে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় না—যে সম্পর্কে গোটা উম্মত একমত, কোরআন পাকেও এ সম্পর্কে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে এবং তাওয়াতুরের (تواتر) সমমর্যাদাসম্পন্ন হাদীসসমূহ এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করছে। কেননা, তিনি এ জগতে আমাদের নবীজী (সা)-র পূর্বেই আবির্ভূত হয়েছিলেন।

নবুয়তের মর্মার্থের বিকৃতি সাধন এবং ছায়া ও উপনবীত্ব পদের আবিষ্কার ঃ এই নবুয়তের দাবিদার নবুয়ত দাবির পথ সুগম করার উদ্দেশ্যে দুরভিসন্ধিমূলকভাবে এক অভিনব প্রকারের নবুয়ত আবিষ্কার করেছে—কোরআন-হাদীসে যার কোন অস্তিত্ব ও প্রমাণ নেই। অতপর বললো যে, এ ধরনের নবুয়ত কোরআনে বর্ণিত খতমে-নবুয়ত বিষয়ের পরিপন্থী নয়। যার সারকথা এই যে, সে নবুয়তের মর্মার্থ বিশ্লেষণে হিন্দু ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মাঝে প্রচলিত পথ অনুসরণ করেছে—তা এই যে, কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির জীবদ্দশাতেই পরবর্তী ব্যক্তির রূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। এ প্রসঙ্গে সে আরো বলে যে, যে ব্যক্তি নবীজীর পরিপূর্ণ অনুসরণের মাধ্যমে তাঁর (নবীজীর) রংগে রঞ্জিত হয়ে তাঁর রূপ পরিগ্রহ করেছে—তাঁর আগমন বস্তুত স্বয়ং নবীজী (সা)-র আগমন। প্রকৃত প্রস্তাবে সে তাঁরই ছায়া ও প্রতিভূ স্বরূপ। সুতরাং তার মতে তার এ দাবির কারণে খতমে-নবুয়তের আকীদা কোনভাবে প্রভাবান্বিত হয় না।

কিন্তু প্রথম কথা তো এই যে, ইসলামে নবাবিষ্কৃত এই নবুয়তের উদ্ভব কোথা থেকে হলো। এতদ্ভিন্ন যেহেতু খতমে-নবুয়তের মাস'আলা ইসলামী আকীদাসমূহের মধ্যে একটি মৌলিক বিষয়; তাই রসূলুল্লাহ্ (সা) বিভিন্ন সময়ে নানাভাবে এ মাস'আলা এমন স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করে দিয়েছেন, যাতে কোন বিকৃতি সাধনকারীর পক্ষে এর অর্থে বিকৃতি ও ভুল ব্যাখ্যার কোন অবকাশই না থাকে। এই উত্তরের বিস্তারিত বর্ণনা আমার 'খতমে নবুয়ত' নামক পুস্তকে দ্রষ্টব্য। এখানে বিশেষ প্রয়োজনীয় কয়েকটি বিষয় আলোচনা করেই প্রসঙ্গের সমাপ্তি টানা হলো।

বুখারী, মুসলিম প্রভৃতি সমস্ত হাদীসগ্রন্থে সম্পূর্ণ নির্ভুল সনদের মাধ্যমে হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবীজী (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ

ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنی بیتا فاحسنه واجمله الا موضع لبنة من زاویة فجعل الناس یطوفون به و یعجبون له و یقولون هلا وضعت هذه اللبنة و انا خاتم النبیین رواه احمد والنسائی والترمذی و فی بعض الفاظه فکنت انا سددت موضع اللبنة وختم بی البنیان

অর্থাৎ "আমার ও আমার পূর্ববর্তী নবীগণের উপমা ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে অত্যন্ত দৃঢ়, সুসংবদ্ধ ও সৌন্দর্য মণ্ডিত করে একটি ঘর তৈরী করলো। কিন্তু সে ঘরের এক কোণে দেয়ালের একটি ইটের সমপরিমাণ জায়গা খালি রেখে দিল। অতপর মানুষ তা দেখতে সর্বক্ষণ আনাগোনা করতে থাকলো এবং এর নির্মাণ কৌশল ও পারিপাট্য দেখে সবাই চমৎকৃত ও বিস্ময়াভিভূত হলো; কিন্তু সবাই বলতে লাগলো যে, ঘরের মালিক এ ইটটি বসিয়ে নির্মাণ কাজের পূর্ণতা কেন সাধন করলো না? রসূলুল্লাহ্ (সা) ফরমান যে, নবুয়তের এই সুরম্য অট্টালিকার সর্বশেষ ইট আমি। কোন কোন হাদীসের শব্দ এরূপ যে আমি সে শূন্য জায়গা পূরণ করে নবুয়তরূপী প্রাসাদের পূর্ণতা সাধন করেছি।"

এই তত্ত্বপূর্ণ---তাৎপর্যবহ উপমার সারকথা এই যে, নবুয়ত এক বিশাল অট্টালিকা ও সুরম্য প্রাসাদের ন্যায়---মহান নবীগণ (সা)-এর স্তম্ভ স্বরূপ। নবীজী (সা)-র আবির্ভাবের পূর্বেই একটি ইটের সমপরিমাণ জায়গা ব্যতীত উক্ত নবুয়তের গোটা অট্টালিকার নির্মাণ কাজই সম্পন্ন হয়েছিল। হযরত (সা) এই খালি অংশটুকু পূরণ করে উক্ত প্রাসাদের নির্মাণ কাজের পরিপূর্ণতা সাধন করেন। সুতরাং নবুয়ত বা রিসালতের আর কোন অবকাশ নেই। এখন যদি কোন প্রকারের নতুন নবুয়ত বা রিসালতের আবির্ভাব ঘটে তবে নবুয়তরূপ প্রাসাদে এর সঙ্কুলান হবে না।

বুখারী, মুসলিম, মুসনাদে-আহমদ প্রমুখ হাদীসগ্রন্থে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত অপর এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) ফরমান ঃ

كانت بنوا سرا ئيل تسو سهم الا نبياء كلما هلك نبى خلفه نبى و انه
لا نبى بعدى و سيكون خلفا ء فيكثرو ن الحديث

অর্থাৎ বনী ইসরাঈলের রাজদণ্ড ও শাসন ক্ষমতা স্বয়ং নবীগণের হাতে ছিল। এক নবীর তিরোধানের পর আরেক নবীর আবির্ভাব ঘটতো। আমার পরে কোন নবী আসবেন না, অবশ্যই আমার প্রতিনিধিগণ (খলীফা) আসবেন---যাদের সংখ্যা হবে অনেক।

হযরত যেহেতু সর্বশেষ নবী, তাঁর পর কোন নবী প্রেরিত হবেন না---সুতরাং উম্মতের হিদায়তের কাজ কিভাবে সমাধা হবে---উপরোক্ত হাদীস সে কথাও ব্যক্ত করে দিয়েছে। এ প্রসংগে বলা হয়েছে যে, তাঁর পরে উম্মতের হিদায়ত ও শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা তাঁর খলীফা (প্রতিনিধিগণের) মাধ্যমে করা হবে। তাঁরা নবীজী (সা)-র খলীফারূপে নবুয়তের উদ্দেশ্যাবলী সম্পন্ন করবেন। যদি কোন প্রকারের 'ছায়া নবী' বা উপনবীর অবকাশ থাকত, অথবা কোন শরীয়তবিহীন নবীপদ অবশিষ্ট থাকত, তবে অবশ্যই এখানে তার উল্লেখ এভাবে থাকত যে, অমুক ধরনের নবুয়ত বাকী রয়েছে, যদ্দ্বারা বিশ্বের শাসনকার্য ও ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন হবে।

এই হাদীসে স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাঁর (সা) পর কোন প্রকারের নবুয়ত বাকী নেই। বরং পূর্ববর্তী উম্মতসমূহের হিদায়তের দায়িত্ব যেরূপে নবীগণের মাধ্যমে পালন করা হতো অনুরূপভাবে এ উম্মতের হিদায়ত তাঁর (নবীজীর) খলীফাগণের সাহায্যে করা হবে।

মাসনাদে-আহমদ প্রমুখ হাদীসগ্রন্থে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা ও উম্মে কুর্য্ কাবিয়াহ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) ফরমান ঃ

لا يبقى بعدى من النبوة شئ الا المبشرات قالوا يا رسول الله
وما المبشرات قال الرؤيا الصالحة يراها المسلم او ترى له

অর্থাৎ "আমার পরে মোবাশ্বেরাত ব্যতীত নবুয়তের কিছুই বাকী নেই। সাহাবাগণ আরয করলেন, ইয়া রসূলুল্লাহ্ (সা), মোবাশ্বেরাত (مبشرات) কি বস্তু? বললেন, সত্য স্বপ্ন---যা মুসলমান স্বয়ং দেখবে অথবা এ সম্পর্কে অপর কেউ দেখবে"।---(তিবরানী হাদীসটিকে সহীহ্ বলে মত প্রকাশ করেছেন)।

এ হাদীস কত স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছে যে, শরীয়তবহ বা শরীয়তবিহীন অথবা মির্জা কাদিয়ানীর মন্তব্যানুসারে ছায়া বা আনুষঙ্গিক কোন প্রকারের নবুয়তই বাকী নেই ; কেবলমাত্র মোবাশ্বেরাত বা সত্য স্বপ্নসমূহ থাকবে, যার মাধ্যমে মানুষ কিছু অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারবে।

মাসনাদে আহমদ ও তিরমিযী শরীফে হযরত আনাস বিন্ মালেক (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) ফরমান ঃ

ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدى ولا نبى

অর্থাৎ "নিশ্চয়ই আমার মাধ্যমে রিসালত ও নবুয়ত পদের পরিসমাপ্তি ঘটেছে ---আমার পরে অপর কোন নবী বা রসূলের আবির্ভাব ঘটবে না।"

এ হাদীস স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে দিয়েছে যে, তাঁর পর শরীয়তবিহীন নবুয়ত পদও বিদ্যমান নেই। ছায়া বা উপ নবুয়ত পদ বলে ইসলামে এমন কিছুর অস্তিত্বই নেই।

এ স্থলে খতমে নবুয়ত সংশ্লিষ্ট হাদীসসমূহ উদ্ধৃত করা উদ্দেশ্য নয়---দু'শতাধিক হাদীস 'খতমে নবুয়ত' নামক পুস্তিকায় একত্রিত করা হয়েছে। উদ্দেশ্য---কয়েকটি হাদীস দ্বারা কেবল একথাই ব্যক্ত করা যে, কাদিয়ানীরা নবুয়ত পদ বিদ্যমান থাকার পক্ষে যুক্তির অবতারণা করতে গিয়ে যে ছায়া বা উপনবী পদ আবিষ্কার করেছে--- ইসলামে এর কোন মূল্য ও ভিত্তি নেই। এমনটি আছে বলে যদি ধরেও নেওয়া হয়, তবুও উপরোক্ত হাদীসসমূহের দ্বারা একথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, তাঁর (সা) পর কোন প্রকারের নবুয়তই বাকী নেই।

এজন্যই সাহাবায়ে-কিরাম থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত প্রত্যেক যুগ ও স্তরের মুসলমানগণ এ সম্পর্কে একমত যে, হযরতের পর কেউ কোন প্রকারের নবী বা রসূল হতে পারে না---যে এমন দাবি করবে সে মিথ্যাবাদী, কোরআন অস্বীকারকারী ও কাফির। সাহাবায়ে কিরামের সর্বপ্রথম ইজমা এই মাস'আলার উপরই সংঘটিত হয়। এই পরি-প্রেক্ষিতেই প্রথম খলীফা সিদ্দীকে আকবর (রা) ভণ্ড নবুয়তের দাবিদার মুসায়লামা প্রমুখের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করে তার সকল অনুসারীসহ তাকে হত্যা করেন।

এ সম্পর্কে প্রথম যুগের ইমাম ও খ্যাতনামা উলামায়ে কিরামের উক্তি এবং ব্যাখ্যা-সমূহ 'খতমে নবুয়ত' নামক পুস্তিকার ৩য় খণ্ডে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে তার কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করা হলো ঃ

প্রখ্যাত মুফাস্‌সির হযরত ইবনে কাসীর এ আয়াতের তফসীর প্রসংগে লিখেছেন ঃ

اخبر الله تعالى فى كتابه ورسول الله صلعم فى السنة المتواترة عنه انه
لا نبى بعده ليعلموا ان كل من ادعى هذا المقام بعده فهو كذاب افاك
دجال ضال مضل ولو تحرق وشعبذ واتى بانواع السحر والطلاسم والنير
نجيات فكلها محال وضلال عند اولى الالباب كما اجرى الله سبحانه على
يد الاسود العنسى باليمن ومسيلمة الكذاب باليمامة من الاحوال الفا-
سدة والاقوال الباردة ما علم كل ذى لب وفهم وحجى انهما كاذبان
ضالان لعنهما الله تعالى وكذلك كل مدع لذلك الى يوم القيمة حتى
يختموا بالمسيح الدجال (ابن كثير)

অর্থাৎ "আল্লাহ্ পাক স্বীয় গ্রন্থ এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বহু হাদীসের মাধ্যমে এ তথ্য প্রকাশ করেছেন যে, তাঁর (সা) পর কোন নবী বা রসূল নেই। যেন মানুষ এ কথা অনুধাবন করে যে, তাঁর (সা) পরে যে ব্যক্তি নবুয়তের দাবি করবে সে মিথ্যাবাদী, ভণ্ড, দজ্জাল, পথভ্রষ্ট, বিভ্রান্তকারী---সে যত চালবাজির আশ্রয় নিক না কেন এবং নানা প্রকারের যাদু, ঐন্দ্রজালিক কলাকৌশল ও ভেল্কিবাজি প্রদর্শন করুক না কেন, এগুলো সবই প্রজ্ঞাবান ও বিদগ্ধ সমাজের নিকট অসম্ভব ও ভ্রষ্টতাপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হবে। যেমন করে আল্লাহ্ পাক ইয়ামেন প্রদেশে আসওয়াদ উনাইসী (নবুয়তের) এবং ইয়ামামাহ্ প্রদেশে মুসায়লামা কাজ্জাবের মাধ্যমে এমন সব ভ্রান্তিকর ঘটনাবলী, অলীক ও অমূলক উক্তিসমূহের প্রকাশ ঘটিয়েছেন সেগুলো দেখে-শুনে প্রতিটি জ্ঞানী ও বিবেক-বান ব্যক্তি বুঝে নিয়েছেন যে, এরা উভয়ই মিথ্যাবাদী ও পথভ্রষ্ট। এদের প্রতি আল্লাহ্‌র অভিশাপ নিপতিত হোক। অনুরূপভাবে কিয়ামত পর্যন্ত যে কোন ব্যক্তি নবুয়তের দাবি করবে সে মিথ্যাবাদী ও কাফির। বস্তুত মসীহে-দাজ্জাল পর্যন্ত গিয়ে নবুয়তের ভণ্ড দাবি-দারদের এ ধারার পরিসমাপ্তি ঘটবে।"

ইমাম গাজ্জালী (র) তাঁর রচিত গ্রন্থ 'কিতাবুল ইকতিসাদ ফিল ইতিকাদে' (كتاب الاقتصاد فى الاعتقاد) উপরোল্লিখিত আয়াতের তফসীর ও খতমে-নবুয়তের আকীদা প্রসংগে লিখেছেন ঃ

وليس فيه تاويل ولا بتخصيص ومن اوله بتخصيص فكلامه من الهذيان لا يمنع الحكم بتكفيره لانه مكذب لهذا النص الذى اجمعت الامة على انه غير ماول ولا مخصوص

অর্থাৎ "এ আয়াতে অন্য কোন ব্যাখ্যা বা বিশেষীকরণের অবকাশ নেই এবং যে ব্যক্তি আয়াতের বিকল্প ব্যাখ্যা প্রদানের মাধ্যমে নবুয়ত পদ এখনো বিদ্যমান আছে বলে মত পোষণ করবে, তার এরূপ উক্তি সম্পূর্ণ অমূলক ও ভ্রান্তিপ্রসূত। এরূপ ব্যাখ্যা তাকে কাফিরদের দলভুক্ত হওয়া থেকে কোন অবস্থাতেই রেহাই দেবে না। কেননা সে এ আয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে প্রয়াস পাচ্ছে। যে আয়াত বিকল্প ব্যাখ্যাযোগ্য নয় বলে গোটা উম্মত একমত"।

কাজী আয়ায 'শেফা' নামক গ্রন্থে নবীজী (সা)-র পরে নবুয়তের দাবিদারদেরকে কাফির মিথ্যাবাদী রসূলুল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপকারী ও উল্লিখিত আয়াতের সত্যতা অস্বীকারকারী বলে আখ্যাদান পূর্বক নিম্নরূপ মন্তব্য করেন ঃ

واجمعت الامة على حمل هذا الكلام على ظاهره وان مفهومه المراد به دون تاويل ولا تخصيص فلا شك فى كفر هؤلاء الطوائف كلها قطعا اجماعا وسمعا

অর্থাৎ "গোটা উম্মত এ ব্যাপারে একমত। এ ক্ষেত্রে উল্লিখিত আয়াতের বাহ্যিক অর্থই গ্রহণ করতে হবে। বাহ্যত যেরূপ বোঝা যাচ্ছে প্রকৃত প্রস্তাবে এ আয়াতের মর্মও তা-ই। অধিকন্তু আয়াতে বিকল্প ব্যাখ্যার অবকাশই নেই। বস্তুত নবুয়তের দাবিদার-দের অনুসারী এসব উপদলের কুফরী সম্পর্কে কোন প্রকারের সন্দেহই থাকতে পারে না। বরং এদের কুফরী কোরআন হাদীস ও ইজমায়ে-উম্মত দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণিত।"

খতমে-নবুয়ত পুস্তিকার ৩য় খণ্ডে শরীয়তের ইমাম এবং সকল শ্রেণীর বিশিষ্ট উলামায়ে কিরামের বিপুল সংখ্যক বাণী সঙ্কলিত হয়েছে। আর এখানে যা বর্ণনা করা হয়েছে একজন মুসলমানের পক্ষে তা-ই যথেষ্ট।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿٤١﴾ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٤٢﴾ هُوَ ٱلَّذِى يُصَلِّى عَلَيْكُمْ وَمَلَٰٓئِكَتُهُۥ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ

الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۭ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا ۝ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهٗ سَلٰمٌ ۚ وَاَعَدَّ لَهُمْ اَجْرًا كَرِيْمًا ۝ يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ۝ وَّدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا ۝ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ فَضْلًا كَبِيْرًا ۝ وَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَدَعْ اَذٰىهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۭ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ۝

(৪১) মু'মিনগণ তোমরা আল্লাহ্কে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর। (৪২) এবং সকাল-বিকাল আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা কর। (৪৩) তিনিই তোমাদের প্রতি রহমত করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণও রহমতের দোয়া করেন---অন্ধকার থেকে তোমাদেরকে আলোকে বের করার জন্য। তিনি মু'মিনদের প্রতি পরম দয়ালু। (৪৪) যেদিন আল্লাহ্র সাথে মিলিত হবে, সেদিন তাদের অভিবাদন হবে সালাম। তিনি তাদের জন্য সম্মানজনক পুরস্কার প্রস্তুত রেখেছেন। (৪৫) হে নবী! আমি আপনাকে সাক্ষী, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি। (৪৬) এবং আল্লাহ্র আদেশক্রমে তাঁর দিকে আহবায়করূপে এবং উজ্জ্বল প্রদীপরূপে। (৪৭) আপনি মু'মিনদেরকে সুসংবাদ দিন যে, তাদের জন্য আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বিরাট অনুগ্রহ রয়েছে। (৪৮) আপনি কাফির ও মুনাফিকদের আনুগত্য করবেন না এবং তাদের উৎপীড়ন উপেক্ষা করুন ও আল্লাহ্র উপর ভরসা করুন। আল্লাহ্ কার্যনির্বাহীরূপে যথেষ্ট।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে মু'মিনগণ! তোমরা [সাধারণভাবে মহান আল্লাহ্র অনুগ্রহরাজি এবং বিশেষভাবে এরূপ পুণ্যতম রসূল (সা)-এর প্রেরণজনিত অনুগ্রহের কথা স্মরণ করে এর শুকরিয়া আদায় করতে গিয়ে] আল্লাহ্ পাককে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর (যাবতীয় ইবাদতই এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে) এবং (এ ইবাদত ও যিকিরে সর্বক্ষণ স্থায়ী থাক। সুতরাং) সকাল-সন্ধ্যায় (অর্থাৎ সর্বক্ষণ) তাঁর গুণ-কীর্তন করতে থাক (অর্থাৎ মনে মনে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাহায্যে এবং মৌখিকভাবে। সুতরাং প্রথম বাক্যে যাবতীয় আমল ও ইবাদত এবং দ্বিতীয় বাক্যে সকল সময় ও কাল অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অর্থাৎ কোন হুকুম পালন করবে আবার কোন হুকুম পালন করবে না এবং একদিন কোন কাজ করবে অপরদিন তা করবে না এমনটি যেন না হয়। আর যেহেতু তিনি তোমাদের প্রতি বহুবিধ অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছেন এবং ভবিষ্যতেও করবেন, সুতরাং অবশ্যম্ভাবীরূপে তিনি সর্বাবস্থায় কৃতজ্ঞতা লাভের অধিকারী ও যিকিরের যোগ্য। বস্তুত) তিনি এমন (দয়াশীল) যে তিনি

(স্বয়ংও) এবং (তাঁর হুকুমে) তাঁর ফেরেশতাগণ (ও) তোমাদের প্রতি রহমত ও করুণা প্রেরণ করতে থাকেন। (তাঁর রহমত প্রেরণ করা অর্থ রহমত বর্ষণ করা এবং তাঁর ফেরেশতাগণ কর্তৃক প্রেরণ করা অর্থ রহমতের জন্য দোয়া করা। যেমন মহান আল্লাহ্‌র বাণী اَلَّذِيْنَ يَحْمِلُوْنَ الْعَرْشَ — الى قوله — وَقِهِمُ السَّيِّاٰتِ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত। আর এরূপ রহমত প্রেরণ এজন্য) যেন আল্লাহ্‌ তা'আলা (এ রহমতের বদৌলতে) তোমাদিগকে (অজ্ঞানতা ও পথভ্রষ্টতার) আঁধার থেকে বিজ্ঞান ও হিদায়তের) জ্যোতিপানে নিয়ে আসেন (অর্থাৎ আল্লাহ্‌ পাকের অসীম অনুগ্রহ ও ফেরেশতাকুলের দোয়ার বদৌলতে তোমরা ইলম ও হিদায়তের তওফিক লাভ করেছ এবং এর উপর স্থির রয়েছ যা সর্বদা নতুন প্রাণ লাভ করে যাচ্ছে) এবং (এ দ্বারা প্রমাণিত হল যে,) আল্লাহ্‌ পাক মু'মিনদের প্রতি অত্যন্ত দয়াবান। (এবং মু'মিনদের অবস্থার প্রতি এ রহমত ইহকালেও রয়েছে এবং পরকালেও তাঁর করুণার বর্ষণ স্থলে পরিণত হবে)। বস্তুত যে দিন আল্লাহ্‌ পাকের সাথে তাঁদের সাক্ষাৎ ঘটবে সেদিন তাঁদের প্রতি যে সালাম প্রদত্ত হবে তা হবে। (আল্লাহ্‌ পাকের স্বয়ং ইরশাদকৃত) আসসালামু-আলায়কুম (প্রথমত এ সালামই সম্মান প্রদর্শনের লক্ষণ---বিশেষ করে যখন এ সালাম আল্লাহ্‌ পাকের পক্ষ থেকে প্রদত্ত হবে। যেমন আল্লাহ্‌ তা'আলা ইরশাদ করেছেন سَلاَمٌ قَوْلاً مِّنْ رَّبٍّ الرَّحِيْمِ ইবনে মাজাহ প্রমুখ হাদীসগ্রন্থসমূহে রয়েছে যে আল্লাহ্‌ পাক স্বয়ং জান্নাতবাসীদের প্রতি সম্বোধন করে ফরমান: اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ এ সালাম তো হলো আত্মিক পুরস্কার---যার সারমর্ম সম্মান প্রদর্শন করা) এবং (পরবর্তী পর্যায়ে বাহ্যিক ও দৈহিক পুরস্কারের সংবাদ সাধারণ শিরোনামায় প্রদত্ত হয়েছে যে) আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁদের (মু'মিনগণের) জন্য (জান্নাতে) উত্তর প্রতিদান তৈরী করে রেখেছেন। (অপেক্ষা কেবল তাঁদের পৌঁছবার, পৌঁছামাত্র তাঁরা এসব পূর্ব প্রস্তুত পুরস্কার ও প্রতিদান লাভ করবেন। পরে হুযূর (সা)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে) হে নবী! (সা) (আপনি গুটিকয়েক পরিহাসকারীদের কটাক্ষপাতে বিচলিত হবেন না। যদি এসব নির্বোধরা আপনাকে চিনতে সক্ষম না হয় তবে কি আসে যায়, মু'মিনদের জন্য বেহেশতে যে সব অনন্য ও অনির্বচনীয় অনুগ্রহ ধারা ও রহমতসমূহের কথা বিবৃত হয়েছে তা তো কেবল আপনার বক্তব্যই যথেষ্ট হবে। অন্য কোন প্রমাণাদির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা হবে না। সুতরাং এ দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, তিনি আল্লাহ্‌ পাকের মত প্রিয় ও নৈকট্যপ্রাপ্ত। বস্তুত) আমি নিঃসন্দেহে আপনাকে এমন বিশেষ মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী রসূলরূপে প্রেরণ করেছি যে, আপনি (কিয়ামতের দিন উম্মতের পক্ষে স্বয়ং রাজসাক্ষী) হবেন [ফলত আপনার বক্তব্যানুসারে তাদের (উম্মতের) ফয়সালা হবে। যেমন আল্লাহ্‌ তা'আলা ইরশাদ করেছেন: اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَيْكُمْ رَسُوْلاً شَاهِدًا عَلَيْكُمْ

এবং স্বয়ং মামলা বিজড়িত ব্যক্তিকে অপর পক্ষের মুকাবিলায় সাক্ষী মানা যে কত উন্নত মান মর্যাদার পরিচায়ক তা বলার অপেক্ষা রাখে না----যার প্রকাশ ঘটবে কিয়ামতের দিন] এবং (দুনিয়াতে তাঁর যে সব নিখুঁত ও পূর্ণ গুণাবলীর প্রকাশ ঘটেছে তা এই যে) তিনি (মু'মিনদের জন্য) সুসংবাদ প্রদানকারী ও (কাফিরদের জন্যে) ভীতি প্রদর্শনকারী এবং (সাধারণভাবে সবাইকে) আল্লাহ্ পাকের দিকে তাঁর অনুমতি সাপেক্ষে আহ্বানকারী (এবং এই সুসংবাদ প্রদান, ভীতি প্রদর্শন ও আল্লাহ্র দিকে আহ্বান নিছক তবলীগ ও প্রচার উপলক্ষে) এবং (নিজ সত্তা, বৈশিষ্ট্য, গুণাবলীর উপাসনা-আরাধনা, আচার-ব্যবহার, স্বভাব-চরিত্র প্রভৃতি সমষ্টিগত অবস্থা বিচারে) তিনি (আপাদমস্তক হিদায়তের আদর্শ হিসেবে) এক প্রদীপ্ত বাতির তুল্য। অর্থাৎ তাঁর প্রতিটি অবস্থা আলোর অনুসন্ধানকারীদের জন্য হিদায়তের মূল উৎস বিশেষ। বস্তুত কিয়ামত দিবসে এই মু'মিনগণের প্রতি যে সব রহমত বর্ষিত হবে তা তাঁর সুসংবাদ প্রদানকারী ভীতি প্রদর্শন-কারী, আহ্বানকারী ও প্রোজ্জ্বল দীপ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য গুণাবলীর কল্যাণেই। সতরাং আপনি এতদসংক্রান্ত উদ্বেগ দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনা পরিহার করুন) এবং নিজ পদোচিৎ দায়িত্ব ও কর্তব্যে মনোনিবেশ করুন। অর্থাৎ মু'মিনগণকে এ সুসংবাদ দিন যে, তাঁদের প্রতি আল্লাহ্ পাকের অসীম করুণা বর্ষিত হবে (অনুরূপভাবে কাফির ও কপট-বিশ্বাসী-দেরকে ভীতি প্রদর্শন করতে থাকুন। যা এক বিশেষ শিরোনামায় প্রকাশ করে বলেছেন যে,) ঐ কাফির ও মুনাফিকদের কথা মানবেন না [নবীজী (সা)-র পক্ষে তো এরূপ সম্ভাবনাই ছিল না যে, তিনি কাফির ও মুনাফিকদের কথায় প্রভাবান্বিত হয়ে দাওয়াত ও তবলীগের কাজ পরিত্যাগ করবেন। কিন্তু লোকের পরিহাস ও কটাক্ষপাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার লক্ষ্যে হযরত যয়নব (রা)-এর বিয়ের মাধ্যমে যে বাস্তব ভিত্তি ও কার্যকর তব-লীগ উদ্দেশ্য ছিল তাতে তাঁদের খানিকটা শৈথিল্য প্রদর্শনের সম্ভাবনা ছিল। এটাকেই কাফিরদের কথা মেনে নেওয়া বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।] এবং ওদের (এই কাফির ও মুনাফিকদের) পক্ষ থেকে যে যন্ত্রণা দেওয়া হবে (যেমনভাবে এ বিয়ে প্রসংগে মৌখিক যন্ত্রণা দেওয়া হয়েছিল আর তবলীগ ছিল বাস্তব আমল দ্বারা) সেগুলোর প্রতি ভ্রূক্ষেপও করবেন না (এবং কাজ কর্মের মাধ্যমে যন্ত্রণা পৌঁছানোর আশংকাও করবেন না। যদি এরূপ ধারণা মনে জাগে তবে) সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ্র উপর নির্ভর করুন। আর আল্লাহ্ পাকই কর্মকুশল ও অভিভাবকরূপে যথেষ্ট। (তিনি আপনাকে যাবতীয় দুঃখ-যন্ত্রণা থেকে রক্ষা করবেন। আর তবলীগ করতে গিয়ে যদি বাহ্যত কোন প্রকারের যন্ত্রণা পৌঁছে ---তা অভ্যন্তরীণভাবে মূলত কল্যাণ ও উপকারে পরিণত হয়---যা উকিল ও যথেষ্ট হওয়ার মর্মে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির পরিপন্থী নয়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ও সম্মান প্রদর্শন এবং তাঁর প্রতি দুঃখ-যন্ত্রণা পৌঁছানো থেকে বিরত থাকার মর্মে প্রদত্ত উপদেশাবলী প্রসংগে আনুষঙ্গিকভাবে হযরত যায়েদ ও যয়নব (রা)-এর ঘটনা এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-র

সর্বশেষ নবী হওয়ার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। পরবর্তী পর্যায়েও তাঁর অনন্য ও অনুপম গুণাবলী বিবৃত হয়েছে। আর তাঁর সত্তা ও গুণাবলী গোটা বিশ্বে মুসলমানদের জন্য সর্বশেষ নিয়ামত বলে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে উল্লিখিত আয়াতে অধিক পরিমাণে আল্লাহ্ পাকের যিকিরের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আল্লাহ্র যিকির এমন এক ইবাদত যা সর্বাবস্থায় ফরয এবং অধিক পরিমাণে করার নির্দেশ রয়েছেঃ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا—হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন যে, আল্লাহ্ পাক যিকির ব্যতীত এমন কোন ফরযই আরোপ করেন নাই যার পরিসীমা ও পরিমাণ নির্ধারিত নেই। নামায, দিনে পাঁচবার এবং প্রত্যেক নামাযের রাকাত নির্দিষ্ট, রমযানের রোযা নির্ধারিত কালের জন্য, হজ্জও বিশেষ স্থানে বিশেষ অনুষ্ঠানাদি ও সুনির্দিষ্ট কর্ম-ক্রিয়ার নাম। যাকাতও বছরে একবারই ফরয হয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ্র যিকির এমন ইবাদত যার কোন সীমা বা সংখ্যা নির্ধারিত নেই। বিশেষ সময়কালও নির্ধারিত নেই অথবা এর জন্য দাঁড়ান বা বসার কোন বিশেষ অবস্থাও নির্ধারিত নেই। এমনকি পবিত্র এবং ওযূসহ থাকারও কোন শর্ত আরোপ করা হয় নি। প্রতি মুহূর্তে সকল অবস্থায় আল্লাহ্র যিকির অধিক পরিমাণে করার নির্দেশ রয়েছে সফরে থাকুক বা বাড়িতে অবস্থান করুক, সুস্থ থাকুক বা অসুস্থ, স্থলভাগ হোক বা জলভাগ, রাত হোক বা দিন—সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র যিকিরের হুকুম রয়েছে।

এজন্যই ইহা বর্জন করলে বর্জনকারীর কোন কৈফিয়তই গ্রহণযোগ্য হবে না, যদি না সে অনুভূতিহীন ও বেহুশ হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে অন্যান্য ইবাদতের বেলায় অসুস্থতা ও অপারগতার পরিপ্রেক্ষিতে মানুষকে অক্ষম বিবেচনা করে ইবাদতের পরিমাণ হ্রাস বা উহা একেবারে মাফ হয়ে যাওয়ার অবকাশও রয়েছে। কিন্তু যিকরুল্লাহ্ সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক কোন শর্ত আরোপ করেন নি। তাই উহা বর্জনের পরিপ্রেক্ষিতে কোন অবস্থাতেই কোন ওযর গ্রহণযোগ্য হবে না। অধিকন্তু এর ফযিলত-বরকতও অগণিত।

ইমাম আহমদ (রা) হযরত আবুদ দারদা (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবায়ে-কিরামকে সম্বোধন করে ফরমান যে, আমি কি তোমাদেরকে এমন বস্তুর সন্ধান দেব না, যা তোমাদের যাবতীয় আমলের চাইতে উত্তম, তোমাদের প্রভুর নিকটে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য তোমাদের মর্যাদা বিশেষভাবে বর্ধনকারী, আল্লাহ্র রাস্তায় সোনা-রূপা দান করা এবং আল্লাহ্র পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হয়ে শত্রুদের মুকাবিলা করতে গিয়ে তাদেরকে হত্যা করা বা নিজে শাহাদৎ বরণ করার চাইতে উত্তম? সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেনঃ ইয়া রসূলুল্লাহ্ সেটা কি বস্তু; কোন আমল? রসূলুল্লাহ্ ফরমান—ذِكْرُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ "মহীয়ান গরীয়ান আল্লাহ্ পাকের যিকির।' —(ইবনে-কাসীর) ইমাম আহমদ ও ইমাম তিরমিযী আরও রেওয়ায়েত করেন যে, হযরত আবূ হুরায়রা (রা) ফরমানঃ আমি নবীজী (সা)-র নিকট থেকে এমন এক দোয়া শিক্ষালাভ করেছি, যা কখনো পরিত্যাগ করি না। তা এই

اللهم اجعلنى اعظم شكرك و اتبع نصيحتك و اكثر ذكرك و احفظ وصيتك (ابن كثير)

অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আমাকে অধিক পরিমাণে তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের, তোমার উপদেশের অনুসারী হওয়ার. অধিক পরিমাণে তোমার যিকির করার এবং তোমার অছিয়ত সংরক্ষণের যোগ্য করে দাও।---(ইবনে-কাসীর)

এতে রসূলুল্লাহ্ (সা) আল্লাহ্ পাকের নিকট অধিক পরিমাণে তাঁর যিকিরের তওফিক প্রদানের জন্য দোয়া করেছেন।

জনৈক বেদুঈন রসূলুল্লাহ্ (সা)-র খিদমতে আরয করলো যে, ইসলামের আমল-সমূহ, ফরয ও ওয়াজিবসমূহ তো অসংখ্য। আপনি আমাকে এমন একটি সংক্ষিপ্ত অথচ সবকিছু অন্তর্ভুক্তকারী কথা বলে দিন, যা সুদৃঢ়ভাবে উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করে নিতে সক্ষম হই। রসূলুল্লাহ্ (সা) ফরমান ঃ

لايزا ل لسانك رطبا بذ كر الله (مسند احمد، ابن كثير) অর্থাৎ "তোমার কণ্ঠ সর্বদা আল্লাহ্র যিকিরে সরব ও তরতাজা থাকা চাই।" মুসনদ আহমদ ও ইবনে-কাসীর। হযরত আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) ফরমান ঃ

اذ كروا الله تعالى حتى يقولوا مجنون (مسند احمد، ابن كثير)

অর্থাৎ "তুমি আল্লাহ্র যিকির এত অধিক পরিমাণে কর যেন লোকে তোমাকে পাগল বলে আখ্যায়িত করে।" (মুসনাদ-আহ্মদ, ইবনে-কাসীর)

হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ উমর (রা) থেকে আরো বর্ণিত আছে যে, নবীজী (সা) ফরমান---যে ব্যক্তি এমন কোন আসরে বসে যেখানে আল্লাহ্র যিকির নেই, তবে কিয়ামতের দিন এ আসর তার জন্য সন্তাপ ও অনুশোচনার কারণ হবে।---(আহমদ ইবনে-কাসীর)

وسبحوه بكرة و اصيلا অর্থাৎ সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা কর। সকাল-সন্ধ্যার দ্বারা সকল সময়কেই বোঝানো হয়েছে। সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ্র যিকিরে বিশেষ বরকত ও তাকীদ রয়েছে বলে আয়াতেও এ দু'সময়ের উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যথায় আল্লাহ্র যিকির কোন বিশেষ সময়ের জন্য সীমিত ও নির্দিষ্ট নয়।

هو الذى يصلى عليكم و ملئكته অর্থাৎ "যখন তুমি অধিক পরিমাণে আল্লাহ্র যিকিরে অভ্যস্ত হয়ে পড়বে এবং প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যায় যিকির করতে থাকবে, বিনিময়ে আল্লাহ্র নিকট এই প্রতিদান ও মর্যাদা লাভ করবে যে, আল্লাহ্ পাক তোমাদের

প্রতি অজস্র ধারায় রহমত ও অনুকম্পা বর্ষণ করতে থাকবেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণ তোমাদের জন্য দোয়া করতে থাকবেন।"

উল্লিখিত আয়াতে "صلوة" শব্দটি আল্লাহ্ পাকের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে এবং ফেরেশতাদের ক্ষেত্রেও। কিন্তু উভয় স্থলে উহার অর্থ এক নয়; বরং ভিন্ন ভিন্ন। আল্লাহ্র "صلوة" অর্থ তিনি রহমত নাযিল করেন। পক্ষান্তরে ফেরেশতাগণ তো নিজের তরফ থেকে কোন কাজ করতে সক্ষম নন। সুতরাং তাঁদের "صلوة" অর্থ এই যে, তাঁরা আল্লাহ্র দরবারে রহমত বর্ষণের জন্য দোয়া করবেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র পক্ষে صلوة অর্থ রহমত, ফেরেশতাদের পক্ষে মাগফেরাত কামনা করা এবং পরস্পর একে অপরের পক্ষে এর অর্থ দোয়া صلوة এ তিন অর্থেই ব্যবহৃত হয়। সুতরাং যারা عموم مشترك তথা সামগ্রিক অর্থে শব্দের ব্যবহার বৈধ মনে করেন তাঁদের মতে "صلوة" শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক। কিন্তু আরবী ব্যাকরণ বিধি অনুসারে عموم مشترك যাদের নিকট বৈধ নয় তাদের মতে عموم مجاز অর্থাৎ বিশেষ ব্যাপক অর্থবোধক হিসাবে আলোচ্য সকল অর্থেই ইহার ব্যবহার রীতিশুদ্ধ।

تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ ইহা এই صلوة এরই ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ—যা মু'মিনগণের প্রতি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হয়ে থাকে অর্থাৎ যেদিন আল্লাহ্ পাকের সাথে এদের সাক্ষাৎ ঘটবে---তখন তাঁর পক্ষ থেকে এদেরকে সালাম অর্থাৎ আস্‌সালামু আলায়-কুমের মাধ্যমে সাদর সম্ভাষণ জানানো হবে। ইমাম রাগেব প্রমুখের মতে আল্লাহ্ পাকের সংগে সাক্ষাতের দিন হলো কিয়ামতের দিন। আবার কোন কোন তফসীরকারের মতে এ সাক্ষাতের সময় হলো বেহেশতে প্রবেশকাল যেখানে তাদের প্রতি আল্লাহ্ ও ফেরেশতাগণের পক্ষ থেকে সালাম পৌঁছানো হবে। আবার কোন কোন মুফাস্‌সির মৃত্যু দিবসকে আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাতের দিন বলে মন্তব্য করেছেন। সেদিন সমগ্র বিশ্বের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করে আল্লাহ্র সমীপে উপস্থিত হওয়ার দিন। যেমন হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, মালাকুল-মউত যখন কোন মু'মিনের প্রাণ বিয়োগ ঘটাতে আসেন তখন তাঁর প্রতি এ সুসংবাদ পৌঁছানো হয় যে, আপনার পালনকর্তা আপনার জন্য সালাম প্রেরণ করেছেন। আর لقاء শব্দ এই তিন ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তাই এসব উক্তির মাঝে কোন বিরোধ ও অসামঞ্জস্য নেই। বস্তুত এ তিন অবস্থাতেই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সালাম পৌঁছানো হবে।---(রূহুল-মা'আনী)

মাস'আলা ঃ এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হলো যে, মুসলমানদের পারস্পরিক অভিবাদন ও সম্ভাষণ আস্‌সালামু আলায়কুম হওয়া উচিত, চাই বড়দের পক্ষ থেকে ছোটদের প্রতি হোক অথবা ছোটদের পক্ষ থেকে বড়দের প্রতি হোক।

রসূলুল্লাহ (সা)-র বিশেষ গুণাবলী ঃ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا এটা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বিশেষ গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যসমূহের পুনরুল্লেখ। এখানে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পাঁচটি গুণ বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ شاهد، مبشر، نذير، داعى الى الله — سراج منير অর্থ ঃ তিনি কিয়ামতের দিন উম্মতের জন্য সাক্ষ্য প্রদান করবেন। যেমন সহীহ্ বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী, তিরমিযী প্রভৃতি হাদীসগ্রন্থে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে এক সুদীর্ঘ হাদীস বর্ণিত আছে, যার কিয়দাংশ হলো এই ঃ কিয়ামতের দিন হযরত নূহ (আ) উপস্থিত হলে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হবে যে, আপনি আমার বাণী ও বার্তাসমূহ আপনার উম্মতের নিকটে পৌঁছিয়েছিলেন কি? তিনি আরয করবেন যে, আমি যথারীতি পেঁাছিয়ে দিয়েছি। অতপর তাঁর উম্মতগণ একথা অস্বীকার করবে যে, তিনি ওদের নিকট আল্লাহ্‌র বার্তা পেঁাছিয়েছেন। অতপর হযরত নূহ (আ)-কে জিজ্ঞেস করা হবে যে, আপনার এ দাবির স্বপক্ষে কোন সাক্ষী আছে কি? তিনি আরয করবেন যে, মুহাম্মদ (সা) এবং তাঁর উম্মত এর সাক্ষী। কোন কোন রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, তিনি সাক্ষী হিসেবে উম্মতে মুহাম্মদীকে পেশ করবেন এবং এ উম্মত তাঁর পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করবে। তখন হযরত নূহ (আ)-র উম্মত এই বলে জেরা করবে যে, তারা আমাদের ব্যাপারে কিভাবে সাক্ষ্য দিতে পারে---সে সময়ে, এদের তো জন্মই হয়নি। আমাদের সুদীর্ঘকাল পর এদের জন্ম। উম্মতে মুহাম্মদীর নিকটে এ জেরার উত্তর চাইলে পর তারা বলবে যে, সে সময়ে আমরা অবশ্য উপস্থিত ছিলাম না। কিন্তু আমরা এ সংবাদ আমাদের রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নিকটে শুনেছি, যাঁর উপর আমাদের পূর্ণ ঈমান ও অটুট বিশ্বাস রয়েছে। এ সময় রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নিকট থেকে তাঁর উম্মতের এ কথার সত্যতা যাচাইয়ের জন্য তাঁর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে।

সারকথা, রসূলুল্লাহ্ (সা) নিজ সাক্ষ্যের মাধ্যমে স্বীয় উম্মতের কথা এই বলে সমর্থন করবেন যে, নিঃসন্দেহে আমি তাদেরকে এ সংবাদ দিয়েছিলাম।

উম্মতের স্বপক্ষে সাক্ষ্য প্রদানের সাধারণ মর্ম এও হতে পারে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) স্বীয় উম্মতের প্রত্যেক ব্যক্তির ভাল-মন্দ আমলের সাক্ষ্য প্রদান করবেন এবং এ সাক্ষ্য এ ভিত্তিতে হবে যে, উম্মতের যাবতীয় আমল প্রত্যেক সকাল-সন্ধ্যায়---অপর রেওয়ায়েতে সপ্তাহে একদিন রসূলুল্লাহ্ (সা)-র খিদমতে পেশ করা হয়, আর তিনি উম্মতের প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার আমলের মাধ্যমে চিনতে পান। এজন্য কিয়ামতের দিন তাঁকে উম্মতের

সাক্ষী স্থির করা হবে (সাঈদ বিন মুসাইয়্যেব থেকে ইবনুল মোবারক রেওয়ায়েত করেছেন---মাযহারী)।

আর " مبشر " অর্থ সুসংবাদ প্রদানকারী, যার মর্মার্থ এই যে, তিনি স্বীয় উম্মতের মধ্য থেকে সৎ ও শরীয়তানুসারী ব্যক্তিবর্গকে বেহেশতের সুসংবাদ দেবেন এবং " نذير " অর্থ ভীতি প্রদর্শনকারী অর্থাৎ তিনি অবাধ্য ও নীতিচ্যুত ব্যক্তিবর্গকে আযাব ও শাস্তির ভয়ও প্রদর্শন করবেন।

داعي الى الله -এর অর্থ তিনি উম্মতকে আল্লাহ্ পাকের সত্তা ও অস্তিত্ব এবং তাঁর আনুগত্যের প্রতি আহবান করবেন। باذنه-কে داعيا الى الله এর সংগে সম্পর্কযুক্ত করায় একথাই বোঝা যায় যে, তিনি মানবমণ্ডলীকে আল্লাহ্ পাকের দিকে তাঁর অনুমতি সাপেক্ষেই আহবান করবেন। এ শর্তের সংযোজন এ ইংগিতই প্রদান করে যে, তবলীগ ও দাওয়াতের কাজ অত্যন্ত কঠিন ও দুঃসাধ্য---যা আল্লাহ্র অনুমতি ও সাহায্য ব্যতীত মানুষের সাধ্যের বাইরে। سراج অর্থ প্রদীপ منير জ্যোতিষ্মান---রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পঞ্চম গুণ ও বৈশিষ্ট্য এই বলা হয়েছে যে, তিনি জ্যোতিষ্মান প্রদীপ বিশেষ। আবার কতক মনীষী سراج منير এর মর্মার্থ কোরআনে পাক বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কোরআনে পাকের বর্ণনাধারা ও প্রকাশভংগী দ্বারা একথাই বোঝা যায় যে, ইহাও হযরত (সা)-এরই বৈশিষ্ট্য ও গুণ বিশেষ।

সমসাময়িক কালের বায়হাকী বলে খ্যাত প্রখ্যাত মুফাস্সির কাযী সানাউল্লাহ্ (র) তফসীরে-মাযহারীতে ফরমান যে, তিনি (সা) তো প্রকাশ্যভাবে ভাষার দিক দিয়ে داعي الى الله আল্লাহ্র দিকে আহবানকারী) এবং অভ্যন্তরীণভাবে হৃদয়ের দিক দিয়ে তিনি প্রদীপ্ত ও জ্যোতিষ্মান বাতি বিশেষ---অর্থাৎ যেমনিভাবে গোটা বিশ্ব সূর্য থেকে আলো সংগ্রহ করে, তেমনিভাবে সমগ্র মু'মিনের হৃদয় তাঁর অন্তর রশ্মি দ্বারা উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। এজন্যই সাহাবায়ে-কিরাম যারা ইহজগতে নবীজী (সা)-র সান্নিধ্য লাভে ধন্য হয়েছেন, তাঁরা গোটা উম্মতের মাঝে সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ বলে পরিগণিত। কেননা তাঁদের অন্তর নবীজীর অন্তর থেকে কোন মাধ্যম ব্যতীতই সরাসরি নূর ও ফয়েজ লাভ করার সুযোগ পেয়েছে। অবশিষ্ট উম্মত এ নূর সাহাবায়ে-কিরামের মাধ্যমে পরবর্তী পর্যায়ে মাধ্যমের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে লাভ করেছেন এবং একথাও বলা যায় যে, সমগ্র আম্বিয়ায়ে কিরাম বিশেষ করে রসূলে করীম (সা) এ ধরাধাম থেকে অন্তর্ধানের পরও নিজ নিজ কবরে জীবিত আছেন। তাঁদের কবরের জীবন সাধারণ লোকের কবরের জীবন থেকে বহু গুণে শ্রেষ্ঠ ও উন্নত, যার অন্তর্নিহিত তত্ত্ব ও মাহাত্ম্য আল্লাহ্ পাকই ভাল জানেন।

যাহোক, উল্লিখিত জীবনের বদৌলতে কিয়ামত পর্যন্ত মু'মিনগণের অন্তঃকরণ তাঁর পূত-পবিত্র অন্তর থেকে জ্যোতি লাভ করতে থাকবে। আর যে ব্যক্তি তাঁর মর্যাদা ও সম্মান রক্ষার প্রতি যত বেশি যত্নবান থাকবেন এবং যত বেশি বেশি দরূদ পাঠ করবেন, তিনি এ নূরের অংশ তত বেশি পরিমাণে লাভ করবেন। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র জ্যোতিকে বাতির সাথে তুলনা করা হয়েছে। অথচ তাঁর আধ্যাত্মিক ও আত্মিক আলো সূর্যের আলোর চাইতে ঢের বেশি। সূর্যকিরণে কেবল পৃথিবীর বাহ্যিক ও উপরিভাগই আলোকিত হয়। কিন্তু তাঁর (স) আত্মার জ্যোতিতে গোটা বিশ্বের অভ্যন্তরভাগ এবং মু'মিনদের অন্তর আলোকিত হয়। এই উপমার কারণ এই বলে মনে হয় যে, বাতির আলো থেকে নিজ ইচ্ছানুযায়ী উপকৃত হওয়া যায়। সর্বক্ষণ সে উপকার লাভ করা যায় ও বাতি পর্যন্ত পৌঁছনো সহজতর এবং তা অনায়াসেই লাভ করা যায়। পক্ষান্তরে সূর্য পর্যন্ত পৌঁছা একেবারে দুঃসাধ্য এবং সব সময় এর থেকে উপকার লাভ করা যায় না।

কোরআনে বর্ণিত রসূলুল্লাহ্ (সা)-র এই গুণাবলী কোরআনের ন্যায় তওরাতেও উল্লেখ রয়েছে। যেমন ইমাম বুখারী (র) নকল করেছেন যে, হযরত আতা বিন ইয়াসার (রা) ইরশাদ করেন যে, আমি একদিন হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আমর ইবনুল আসের (রা) সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁকে অনুরোধ করলাম যে, তওরাতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র যেসব গুণের উল্লেখ রয়েছে, মেহেরবানীপূর্বক আমাকে সেগুলো বলে দিন। তিনি ইরশাদ করলেন, আমি তা অবশ্যই বলবো। আল্লাহ্র শপথ। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র যেসব গুণের বর্ণনা কোরআনে রয়েছে, তা তওরাতেও রয়েছে। অতঃপর বললেন ঃ

انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للاميين انت عبدى ورسولى سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب فى الاسواق ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويغفر لن يقبضه الله تعالى حتى يقيم به الملة العوجاء بان يقولوا لا اله الا الله ويفتح به اعينا عمياء اذانا صما وقلوبا غلفا

অর্থাৎ হে নবী (সা)। নিশ্চয়ই আমি আপনাকে সাক্ষীরূপে, সুসংবাদ প্রদানকারী, ভীতি প্রদর্শনকারী এবং উম্মীদের (নিরক্ষরদের) আশ্রয়স্থল ও রক্ষাস্থলরূপে প্রেরণ করেছি। আপনি আমার বান্দা ও রসূল। আমি আপনার নাম متوكل (আল্লাহ্র উপর ভরসাকারী) রেখেছি। আপনি কঠোর ও রুক্ষ স্বভাববিশিষ্ট নন। বাজারে হৈ-হুল্লোড়কারীও নন। আর না আপনি অন্যায় দ্বারা অন্যায়ের প্রতিদানকারী। বরং আপনি ক্ষমা করে দেন। পথভ্রষ্ট ও বক্র উম্মতকে সঠিক পথে দাঁড় না করিয়ে এবং তারা লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্ না বলা পর্যন্ত আল্লাহ্ পাক আপনাকে দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নেবেন না। আপনার মাধ্যমে মহান আল্লাহ্ অন্ধচোখ, বধির কান ও রুদ্ধ হৃদয়সমূহ খুলে দেবেন।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن
قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ۖ
فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

(৪৯) মু'মিনগণ, তোমরা যখন মু'মিন নারীদেরকে বিবাহ কর, অতপর তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দিয়ে দাও, তখন তাদেরকে ইদ্দত পালনে বাধ্য করার অধিকার তোমাদের নেই। অতপর তোমরা তাদেরকে কিছু দেবে এবং উত্তম পন্থায় বিদায় দেবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে মু'মিনগণ! (তোমাদের বিয়ে সংশ্লিষ্ট হুকুমসমূহের মধ্যে এটাও এক হুকুম যে) যখন তোমরা মুসলিম মহিলাগণের সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হবে (এবং কোন কারণে যদি) তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বেই তালাক দিয়ে দাও তবে তাদের উপর ইদ্দত পালন (ওয়াজিব) নয়---যা তোমরা গণনা করতে থাকবে (যেন তাদেরকে ইদ্দতকালে দ্বিতীয় বিয়ে থেকে বারণ করতে পার। যেমন করে ইদ্দত পালন ওয়াজিব থাকা অবস্থায় দ্বিতীয় বিয়ে বারণ করা শরীয়ত মতেই জায়েয; বরং ওয়াজিব। যে ক্ষেত্রে ইদ্দত নেই) তখন তাদেরকে কিছু দ্রব্য-সামগ্রী বা টাকা-পয়সা দিয়ে দাও এবং পূর্ণ সৌজন্য ও শালীনতার মাধ্যমে তাদেরকে বিদায় কর। মুসলিম মহিলাদের ন্যায় আসমানী গ্রন্থে বিশ্বাসী মহিলাদেরও একই হুকুম। এখানে مؤمنات--এর উল্লেখ শর্ত হিসেবে নয়; বরং এটা একটা প্রেরণাদায়ক উপদেশ ---এই মর্মে যে, মু'মিনগণের পক্ষে বিয়ের ক্ষেত্রে মুসলিম মহিলা নির্বাচন করাই উত্তম।

হাতে স্পর্শ করা দ্বারা ইংগিতে স্ত্রীসহবাসকে বোঝানো হয়েছে। সে সহবাস চাই যথার্থভাবেই হোক বা শরীয়ত সহবাস বোঝায় এমন কোন অবস্থার পরই (صحبت حکمی) হোক। যথা তৃতীয় কারোর অবর্তমানে কেবল স্বামী-স্ত্রীর একান্তে নির্জনবাস হয়ে গেলে উহাও শরীয়ত অনুমোদিত সহবাসেরই অন্তর্গত। বস্তুত সহবাস প্রকৃতভাবেই হোক বা সেরূপ পরিবেশে স্বামী-স্ত্রীতে অবস্থানই হোক উভয় অবস্থাতেই ইদ্দত পালন ওয়াজিব (হিদায়া প্রভৃতি ফিকাহ্ গ্রন্থে এরূপ রয়েছে)। স্পর্শিত হওয়ার পূর্বেই তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর মোহরানা যদি নির্ধারিত হয়ে থাকে তবে অর্ধেক মোহরানা আদায় করলেই আয়াতে কথিত স্ত্রীকে দেয় মাতা, (متاع) আদায় হয়ে যাবে এবং سراح جمیل —সৌজন্যমূলক আচরণ অর্থ অনর্থক বাধা আরোপ করে না রাখা

এবং যে মাতা, (متاع) প্রদান ওয়াজিব তা পরিশোধ করে দেয়া আর প্রদত্ত মাতা (متاع) ফেরত না লওয়া, মৌখিকভাবেও কোন কটুবাক্য প্রয়োগ না করা।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র গুটি কয়েক অনন্য গুণাবলী এবং তাঁর বিশিষ্ট মর্যাদার বর্ণনা ছিল। সামনেও তাঁর সেসব বৈশিষ্ট্যাবলীর বর্ণনা রয়েছে, যা বিয়ে ও তালাক সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির ক্ষেত্রে তাঁর সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত ; সাধারণ উম্মতের তুলনায় এক্ষেত্রে তিনি স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী। ইতিপূর্বে ভূমিকা হিসেবে তালাক সম্পর্কে একটি সাধারণ হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে, যা সমস্ত মুসলমানদের বেলায় প্রযোজ্য।

উল্লিখিত আয়াতে এ সম্পর্কে তিনটি হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

প্রথম হুকুম ঃ কোন মহিলার সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার পর যথার্থ নির্জনবাস (خلوت صحيحه) সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই যদি কোন কারণে তাকে তালাক দেওয়া হয় ; তবে তালাক প্রদত্তা মহিলার উপর ইদ্দত পালন ওয়াজিব নয়। সে সংগে সংগেই দ্বিতীয় বিয়ে করতে পারে। উল্লিখিত আয়াতে হাতে স্পর্শ করার অর্থ (স্ত্রী) সহবাস। সহবাস হাকীকী কিংবা হুকমী হতে পারে এবং উভয়ের একই হুকুম যা তফসীরের সার-সংক্ষেপ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। শরীয়ত অনুমোদিত সহবাস (صحبت حكمى) যথার্থ নির্জন বাস (خلوت صحيحه) এর মাধ্যমে সংঘটিত হয়ে যায়।

দ্বিতীয় হুকুম ঃ তালাক প্রদত্তা স্ত্রীকে সৌজন্যমূলকভাবে শিষ্টাচারের মাধ্যমে কিছু উপঢৌকন প্রদান করে বিদায় করা উচিত। তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে কিছু উপঢৌকন প্রদানপূর্বক বিদায় করা মুস্তাহাব এবং কোন কোন অবস্থায় ওয়াজিব। যার বিস্তারিত বিবরণ তফসীরের সার-সংক্ষেপ অধ্যায়ে প্রদত্ত হয়েছে এবং সূরায়ে বাক্কারার আয়াত لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ সংশ্লিষ্ট বর্ণনা প্রসঙ্গে চলে গেছে। আর কোরআনের বাক্যে 'মাতা' (متاع) শব্দ গ্রহণ সম্ভবত এ হিকমত ও তাৎপর্যের পরিপ্রেক্ষিতে হয়েছে যে, 'মাতা' (متاع) শব্দটি অর্থগতভাবে অত্যন্ত ব্যাপক। মানবের জন্য উপকারী ও লাভজনক যে কোন বস্তু এর অন্তর্গত। নারীর অবশ্য প্রাপ্য (حقوق واجبه) মোহরানা প্রভৃতিও এর অন্তর্ভুক্ত। যদি অদ্যাবধি মোহরানা পরিশোধ না করে থাকে তবে তালাকের সময় সানন্দচিত্তে পরিশোধ করে দেবে এবং ওয়াজিব বহির্ভূত প্রাপ্য যথা—তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিদায়কালে এক জোড়া কাপড় প্রদানের যে বিধান রয়েছে তাও এর অন্তর্ভুক্ত। প্রত্যেক তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে যা দেওয়া মুসতাহাব। (মাবসূত, মুহীত, রূহ্) এ প্রেক্ষিতে متعوهن নির্দেশবাচক ক্রিয়া

(مبلغة امر) সাধারণ প্রেরণা দানের জন্য ওয়াজিব ও ওয়াজিব-বহির্ভূত উভয় শ্রেণীই এর অন্তর্গত।—(রূহ্)

প্রথিতযশা মুহাদ্দিস হযরত আবদ্ বিন হোমায়েদ হযরত হাসান (রা) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, প্রত্যেক তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে 'মাতা' (متاع) প্রদান করা (মুস্তাহাব। চাই তার সাথে যথার্থ নির্জন বাস) خلوت صحيحة হয়ে থাক বা না থাক; তার মোহরানা নির্ধারিত থাকুক বা না থাকুক।

তালাকের সময় দেয় পোশাকের বিবরণ : বাদায়ে (بدائع) গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, তালাকের পর দেয় মুত্য়া (متعة) অর্থ ঐ পোশাক যা স্ত্রীলোকগণ বাড়ি থেকে বের হওয়ারকালে পরিধান করে---পায়জামা, জামা, ওড়না এবং আপাদমস্তক সমগ্র শরীর আবৃত্ত করে ফেলে এমন একটি বড় চাদর এর অন্তর্ভুক্ত (আমাদের বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সম্ভবত এদেশে সাধারণভাবে পরিধেয় পোশাক---শাড়ী, জামা, বোরকা অথবা আপাদমস্তক আবৃত করে এমন একটি বড় চাদর অন্তর্ভুক্ত হবে---অনুবাদক।) যেহেতু পোশাক---উত্তম, মধ্যম ও নিম্ন সব শ্রেণীরই হয়, সুতরাং ফিকাহ শাস্ত্রবিদগণ এ সম্পর্কে এ মত ব্যক্ত করেছেন যে, স্বামী স্ত্রী উভয়ই যদি ধনাঢ্য পরিবারভুক্ত হয় তবে উত্তম শ্রেণীর পোশাক দিতে হবে। আর যদি উভয়ই দরিদ্র পরিবারের হয় তবে নিম্ন মানের---আর যদি একজন ধনী ও অপরজন গরীব হয় তবে মধ্যম মানের পোশাক দিতে হবে (নাফাকাত--- نفقات অধ্যায়ে মনীষী খাসসাফের (خصاف) উক্তি)।

ইসলামে সদাচারের নযীরবিহীন শিক্ষা : গোটা বিশ্বে প্রাপ্য ও অধিকার আদায়ের নীতি কেবল বন্ধু-বান্ধব ও আপনজনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। বড় জোর সাধারণ লোক পর্যন্ত সীমিত। সচ্চরিত্র ও সদাচার প্রদর্শন ও প্রয়োগের সীমা কেবল এটুকুই নয়। বিপক্ষীয় ব্যক্তিবর্গ ও শত্রুদের হক ও অধিকার আদায়ের তাকীদ বিধান কেবল ইসলামেই রয়েছে। বর্তমানকালে মানব অধিকার সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে বহুবিধ প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে এবং এর জন্য কিছু বিধি-বিধান ও নীতিমালাও প্রণীত হয়েছে। এতদুদ্দেশ্যে বিশ্বের জাতিসমূহ থেকে পুঁজি বাবত কোটি কোটি টাকাও সংগৃহীত হচ্ছে। কিন্তু প্রথমত, এই প্রতিষ্ঠানগুলো (বৃহৎ পরাশক্তিসমূহের) রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও স্বার্থসিদ্ধির খপ্পরে পড়ে আছে। দুর্গত মানুষের যতটুকু সাহায্য করা হয় তাও উদ্দেশ্য বিমুক্ত বা নিঃস্বার্থভাবে নয়। আবার সব জায়গায় বা সকল দেশও নয়; বরং যথায় স্বীয় উদ্দেশ্য ও স্বার্থসিদ্ধি হয়। যদি মেনে নেওয়া হয় যে, এসব প্রতিষ্ঠান যথারীতিই মানব সেবার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে; তবুও এসব সাহায্য কোন এলাকায় কেবল তখনই পৌঁছে যখন সে এলাকা কোন সর্বগ্রাসী দুর্যোগ, মহামারী, ব্যাপক রোগব্যাধি ইত্যাদিতে আক্রান্ত হয়। ব্যক্তি মানুষের বিপদাপদ দুঃখ-যন্ত্রণার কে খবর রাখে? ব্যক্তিগত সাহায্যের জন্য কে এগিয়ে আসে? ইসলামের প্রজ্ঞাময় ও দূরদর্শিতাপূর্ণ শিক্ষা দেখুন। তালাকের বিষয়টা একেবারে সুস্পষ্ট যে, নিছক পারস্পরিক বিরোধ, ক্রোধ ও অসন্তুষ্টি থেকেই এর

উৎপত্তি। সাধারণত যার ফলশ্রুতি এই হয়ে থাকে যে, যে সম্পর্ক একাত্মতা, প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল তা সম্পূর্ণ বিপরীত রূপ ধারণ করে পারস্পরিক ঘৃণা, বিদ্বেষ, শত্রুতা ও প্রতিশোধ গ্রহণ প্রবণতায় পরিণত হয়। কোরআনে করীমের উল্লিখিত আয়াত এবং অনুরূপ বহু সংখ্যক আয়াতের মাধ্যমে ঠিক তালাকের ক্ষেত্রে মুসলমানদের প্রতি যেসব নির্দেশাবলী প্রদান করা হয়েছে, তাতে সচ্চরিত্র ও সদাচরণের পুরোপুরি পরীক্ষা হয়ে যায়। মানব প্রবৃত্তি স্বভাবতই এটা চায় যে, যে নারী নানাবিধ দুঃখ-যাতনা ও জ্বালা-যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ করে তোলে পরিশেষে পুরোপুরি সম্পর্ক ছিন্ন করতে পর্যন্ত বাধ্য করেছে, তাকে চরম লাঞ্ছনা ও অবমাননাকর পরিবেশেই বের করে দেওয়া হোক এবং তা থেকে যতটুকু প্রতিশোধ গ্রহণ সম্ভব গ্রহণ করা হোক।

কিন্তু কোরআনে করীম তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীগণের প্রতি সাধারণভাবে ইদ্দত পালনের এক কঠিন ও অবশ্য পালনীয় বাধ্যবাধকতা আরোপ করেছে এবং স্বামী গৃহেই ইদ্দত পালনের শর্ত লাগিয়ে দিয়েছে। এ সময়ে স্ত্রীকে বাড়ি থেকে বের না করে দেওয়া তালাক দানকারীর প্রতি ফরয করে দেওয়া হয়েছে এবং তার প্রতিও তাকীদ রয়েছে যেন সে এ সময়ে বাড়ি থেকে বের না হয়ে যায়। দ্বিতীয়ত ইদ্দতকালীন সময়ে স্ত্রীর যাবতীয় খরচপত্র বহন স্বামীর উপর ফরয করে দেওয়া হয়েছে। তৃতীয়ত স্বামীর প্রতি বিশেষ তাকীদ রয়েছে যেন ইদ্দত পালনান্তে স্ত্রীকে যথারীতি পোশাক প্রদান পূর্বক সৌজন্যপূর্ণ-ভাবে স-সম্মানে বিদায় করে। যে সব নারীর সাথে কেবল বিয়ে বাক্য পাঠ করা হয়েছে, স্বামী গৃহে আগমন, সহবাস বা নির্জনবাসের সুযোগ হয়নি তাদেরকে ইদ্দত পালন পর্ব থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য স্ত্রীর তুলনায় তাকে পোশাক প্রদানের জন্য স্বামীর প্রতি অধিক তাকীদ রয়েছে। এরই সাথে তৃতীয় হুকুম এই যে : سَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا অর্থাৎ অত্যন্ত সৌজন্যপূর্ণ পরিবেশে তাদেরকে বিদায় কর—যাতে এরূপ বাধ্যতা আরোপ করা হয়েছে যেন—মৌখিকভাবে কোন কটুবাক্য প্রয়োগ না করে কোন প্রকারের কটাক্ষপাত বা নিন্দাবাদ না করে।

বিরোধ ও মনোমালিন্যের সময় প্রতিপক্ষের অধিকার কেবল সেই রক্ষা করতে পারে, যার স্বীয় ভাবাবেগের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ও আধিপত্য রয়েছে। ইসলামে যাবতীয় শিক্ষায় এর প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّآ أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَٰجَكَ ٱلَّٰتِيٓ ءَاتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّٰتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ

وَبَنٰتِ خٰلٰتِكَ الّٰتِىْ هَاجَرْنَ مَعَكَ ۫ وَامْرَاَةً مُّؤْمِنَةً اِنْ وَّهَبَتْ نَفْسَهَا

لِلنَّبِىِّ اِنْ اَرَادَ النَّبِىُّ اَنْ يَّسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ؕ

قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِىْٓ اَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا

يَكُوْنَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٥٠﴾ تُرْجِىْ مَنْ تَشَآءُ مِنْهُنَّ

وَتُــْٔوِىْٓ اِلَيْكَ مَنْ تَشَآءُ ؕ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ؕ

ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَنْ تَقَرَّ اَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَآ اٰتَيْتَهُنَّ

كُلُّهُنَّ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِىْ قُلُوْبِكُمْ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَلِيْمًا ﴿٥١﴾ لَا يَحِلُّ

لَكَ النِّسَآءُ مِنْۢ بَعْدُ وَلَآ اَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ اَزْوَاجٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكَ

حُسْنُهُنَّ اِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ رَّقِيْبًا ﴿٥٢﴾

(৫০) হে নবী! আপনার জন্য আপনার স্ত্রীগণকে হালাল করেছি, যাদেরকে আপনি মোহরানা প্রদান করেন। আর দাসীদেরকে হালাল করেছি, যাদেরকে আল্লাহ্ আপনার করায়ত্ত করে দেন এবং বিবাহের জন্য বৈধ করেছি আপনার চাচাতো ভগ্নি, ফুফাতো ভগ্নি, মামাতো ভগ্নি ও খালাতো ভগ্নিকে, যারা আপনার সাথে হিজরত করেছে। কোন মু'মিন নারী যদি নিজেকে নবীর কাছে সমর্পণ করে, নবী তাকে বিবাহ করতে চাইলে সে-ও হালাল। এটা বিশেষ করে আপনারই জন্য—অন্য মু'মিনদের জন্য নয়। আপনার অসুবিধা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে। মু'মিনগণের স্ত্রী ও দাসীদের ব্যাপারে যা নির্ধারিত করেছি, আমার জানা আছে। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু। (৫১) আপনি তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা দূরে রাখতে পারেন এবং যাকে ইচ্ছা কাছে রাখতে পারেন। আপনি যাকে দূরে রেখেছেন, তাকে কামনা করলে তাতে আপনার কোন দোষ নেই। এতে অধিক সম্ভাবনা আছে যে, তাদের চক্ষু শীতল থাকবে; তারা দুঃখ পাবে না এবং আপনি যা দেন, তাতে তারা সকলেই সন্তুষ্ট থাকবে। তোমাদের অন্তরে যা আছে, আল্লাহ্ জানেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সহনশীল। (৫২) এরপর আপনার জন্য কোন নারী হালাল নয় এবং তাদের পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করাও হালাল নয় যদিও তাদের

রূপলাবণ্য আপনাকে মুগ্ধ করে, তবে দাসীর ব্যাপার ভিন্ন। আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ের উপর সজাগ নজর রাখেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে নবী (সা)! (কিছু সংখ্যক হুকুম কেবল আপনার জন্যই নির্দিষ্ট ; যদ্দ্বারা আপনার স্বাতন্ত্র্য ও বিশেষ মর্যাদা প্রকাশ পায়। সেগুলোর মধ্যে কয়েকটি এই প্রথমত) আমি আপনার জন্য আপনার এই স্ত্রীগণকে (যারা বর্তমানে আপনার খিদমতে উপস্থিত আছেন এবং) আপনি যাঁদের মোহরানা আদায় করে দিয়েছেন (তাঁরা চার থেকে অধিক হওয়া সত্ত্বেও) হালাল করে দিয়েছি। (দ্বিতীয় হুকুম) আর সেসব নারীগণকেও (বিশেষভাবে হালাল করা হয়েছে) যারা আপনার মালিকানাধীন---যাদেরকে আল্লাহ্ পাক গনীমত হিসেবে প্রদান করেছেন (এই বিশেষ ধরনের বর্ণনা পরবর্তী আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় ও মাস'আলাসমূহ অধ্যায়ে আসছে। তৃতীয় হুকুম) আপনার চাচার কন্যাগণ ও আপনার ফুফুর কন্যাগণ (অর্থাৎ তাঁর পিতৃবংশীয় কন্যাগণ) এবং আপনার মামার কন্যাগণ ও খালার কন্যাগণ (অর্থাৎ মাতৃবংশীয়া কন্যাগণ; কিন্তু এসব বংশীয়া কন্যাগণ সবাই হালাল নয় বরং এদের মধ্যে কেবল তাঁরাই) যারা আপনার সংগে হিজরতও করেছেন (সংগে অর্থ যারা এই হিজরতের কাজে সহযোগিতা করেছেন এবং হিজরতও করেছেন। কিন্তু তা নবীজী (সা)-র সংগেই হতে হবে এমন কোন কথা নয়। এই শর্তানুসারে যারা একেবারে হিজরতই করেনি তারা বাদ পড়ে গেল। চতুর্থ হুকুম) সে মুসলিম নারীও (আপনার পক্ষে হালাল করা হয়েছে) যে কোন প্রকারের বিনিময় ব্যতীত (অর্থাৎ বিনা মোহরানায়) নিজেকে নবীর নিকট সমর্পণ করে দেয় (অর্থাৎ নবীর সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হতে চায়) অবশ্যই এই শর্তে যে, নবীও তাঁকে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ করতে রাযী হন। (মুসলিম শর্তের পরিপ্রেক্ষিতে অবিশ্বাসী কাফির নারী বাদ পড়ে গেল। এদের সাথে নবীজীর বিয়ে জায়েয নয় এবং পঞ্চম হুকুম এই যে) এসব হুকুম আপনার জন্য নির্দিষ্ট, অন্যান্য মু'মিনদের জন্য নয় (তাদের জন্য ভিন্ন হুকুম।) বস্তুত সেসব হুকুমও আমার জ্ঞাত (এবং কোরআনের আয়াত ও হাদীসসমূহের মাধ্যমে অন্যান্যদেরকেও এ সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে) যা আমি এদের সাধারণ মু'মিনদের উপর এদের স্ত্রীগণের ও দাসীদের জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছি (যা এসব হুকুম থেকে আলাদা, যেগুলোর মধ্যে নমুনা হিসেবে উপরে إِذَا نَكَحْتُمْ আয়াতেও একটির উল্লেখ রয়েছে। সেখানে تَمَسُّوهُنَّ শব্দের মাধ্যমে প্রত্যেক বিয়েতে মোহরানা অবশ্য দেয় বলে প্রমাণিত হয়। চাই তা হাকীকীভাবে হোক বা হুকুমীভাবে, চাই তা প্রস্তাব ও চুক্তিপত্রের মাধ্যমে হোক বা শরীয়তের হুকুম অনুসারে হোক। চতুর্থ হুকুম অনুসারে নবীজীর বিয়ে মোহরানা বিমুক্ত রইল। এরূপ বিশেষীকরণ এজন্য) যাতে আপনার উপর কোন প্রকারের অসুবিধা ও প্রতিকূলতা আরোপিত না হয় (সুতরাং যেসব বিশেষ

হুকুমের মধ্যে অন্যান্যগুলির চাইতে ব্যাপকতা ও নমনীয়তার অবকাশ রয়েছে যথা—প্রথম ও চতুর্থ হুকুম—এতে কোন প্রকারের অসুবিধা ও সংকীর্ণতা না থাকার কথা তো সুস্পষ্ট। যেগুলোতে বাহ্যত সীমাবদ্ধতা ও সংকীর্ণতা রয়েছে যথা—তৃতীয় ও পঞ্চম হুকুম। সেক্ষেত্রে অসুবিধা ও সীমাবদ্ধতা না থাকার অর্থ এই যে, আমি এ সীমাবদ্ধতা ও অসুবিধা কতকগুলো মঙ্গলের পরিপ্রেক্ষিতে আরোপ করেছি। যদি এ শর্ত ও সীমাবদ্ধতা না থাকত তবে সেসব কল্যাণ লোপ পেয়ে যেত। এমতাবস্থায় আপনি কি অসুবিধার সম্মুখীন হতেন তা আমার জানা। বস্তুত এসব কল্যাণ ও মঙ্গলসমূহের কথা চিন্তা করেও আপনার প্রতি কিছু শর্তাবলী ও সীমাবদ্ধতা আরোপ করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় হুকুম সংক্রান্ত আলোচনা 'আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় ও মাস'আলাসমূহ' অধ্যায়ে করা হয়েছে। এবং অসুবিধা দূরীকরণের বিবেচনা যে কেবল এসব বিশেষ হুকুমসমূহের বেলায়ই করা হয়েছে তা নয়। বরং যেসব হুকুম সাধারণ মু'মিনদের সম্পর্কিত সেগুলোর ক্ষেত্রেও এ বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়েছে। কেননা) আল্লাহ্ পাক—মহা ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। [সুতরাং দয়াপরবশ হয়ে যাবতীয় হুকুমের ক্ষেত্রে সহজ-সাধ্যতা ও অনায়াস লব্ধতার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রেখেছেন এবং এসব সহজ সরল হুকুমসমূহ পালনের ক্ষেত্রে কোন প্রকারের শিথিলতা ও নির্লিপ্ততা পরিদৃষ্ট হলে প্রায় সময়ই তা ক্ষমা করে দেন—যা তাঁর অন্যান্য দয়া অনুকম্পার দলীল—যা হুকুমসমূহ সহজীকরণ ও অসুবিধা দূরীকরণের মূল। এ পর্যন্ত তো সেসব নারীগণের শ্রেণী বিন্যাসের আলোচনা ছিল যাদেরকে তাঁর (সা) জন্য হালাল করে দেওয়া হয়েছে। এসব হালালকৃত নারীগণের মধ্য থেকে বিভিন্ন সময়ে যত সংখ্যক তাঁর খিদমতে উপস্থিত থাকবে তাদের কি কি হুকুম—পরবর্তী পর্যায়ে সেসব আলোচনা করা হয়েছে। অতঃপর ষষ্ঠ হুকুম প্রসঙ্গে ইরশাদ হয়েছে যে] এদের মধ্যে আপনি যাকে চান (এবং যতক্ষণ পর্যন্ত চান) নিজ থেকে দূরে রাখুন। (অর্থাৎ তাকে পালা প্রদান না করুন) এবং যাকে চান (যতক্ষণ ও যতদিন পর্যন্ত চান) নিজের সান্নিধ্যে রাখুন (অর্থাৎ তাকে পালা প্রদান করুন) এবং যাদেরকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন তাদের মধ্য থেকে পুনরায় যদি কাউকে আহবান করতে চান তবুও আপনার কোন দোষ হবে না। (এই কথার মর্মার্থ এই যে, মহীয়সী স্ত্রীগণের সাথে রাত্রি যাপনের ক্ষেত্রে পালার নীতি অনুসরণ করা আপনার উপর ওয়াজিব নয়। এতে এক বিশেষ প্রয়োজনীয় কল্যাণ নিহিত রয়েছে তা এই যে) এর ফলে এই (বিবিগণের) চোখ শীতল থাকবে বলে বিশেষভাবে আশা করা যায়। (অর্থাৎ প্রফুল্ল ও আনন্দিত থাকবে।) ভগ্ন হৃদয় ও ভারাক্রান্তচিত্ত হবে না এবং আপনি তাদেরকে যা কিছু প্রদান করবেন তাতেই তারা সন্তুষ্ট ও তৃপ্ত থাকবে। (কেননা অধিকার ও প্রাপ্যের দাবিই সাধারণত মনোকষ্টের কারণ হয়ে থাকে। যখন একথা জানা থাকবে যে, যতটুকু ধন-সম্পদ বা আকর্ষণ বিতরিত হয়েছে তা নিতান্তই দয়া ও অনুকম্পা—এটা আমাদের অবশ্য প্রাপ্য কোন অধিকার নয়, তবে কারো কোন প্রকারের আপত্তি বা অভিযোগ থাকবে না এবং দাসীদের পালার অধিকার না থাকার কথা সর্বজনজ্ঞাত) এবং (হে মুসলিমগণ! এই বিশেষ হুকুমের কথা শুনে মনে মনে এ প্রশ্ন যেন না জাগে যে, এসব হুকুম ব্যাপক তবে সকলের জন্য কেন হলো না, যদি এমনটি হয়

তবে) তোমাদের সকল কথার জন্যই আল্লাহ্ পাক শাস্তি প্রদান করবেন। কেননা ইহা আল্লাহ্ পাক সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রতি হিংসা পোষণের নামান্তর —তা শাস্তি প্রয়োগের কারণ) এবং আল্লাহ্ তা'আলা (কেবল এগুলো কেন) সবকিছু জ্ঞাত (এবং প্রশ্নের উত্থাপক ও তর্কের অবতারণাকারীদের প্রতি নগদ ও ত্বরিত শাস্তি না পৌঁছা থেকে এ কথা বোঝা যায় না যে, তিনি এ সম্পর্কে জ্ঞাত নন। বরং এর কারণ এই যে, তিনি) স্থির ও সহনশীলও বটে (তাই কখনো কখনো শাস্তি প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে অবকাশ দেন। পরবর্তী পর্যায়ে নবীজী (সা) সংশ্লিষ্ট অবশিষ্ট বিশেষ নির্দেশাদি সম্পর্কে ইরশাদ হচ্ছে। তন্মধ্যে কতক তো উপরোল্লিখিত নির্দেশাবলীরই ফলশ্রুতি আবার কতকগুলো নতুন। ইরশাদ হচ্ছে যে, উপরে তৃতীয় ও পঞ্চম হুকুমে বিবাহিত স্ত্রীগণ সম্পর্কে যে হিজরত ও ঈমানের শর্ত আরোপ করা হয়েছে—ফলে) এদের ছাড়া অপরাপর স্ত্রীলোকগণ (যাদের এ শর্ত ও বৈশিষ্ট্য পাওয়া যাবে না) আপনার জন্য হালাল নয়। (অর্থাৎ জ্ঞাতি ও নিকটবর্তীদের মাঝে হিজরতকারিণীগণ ভিন্ন কেউ হালাল নয় এবং অন্যান্য রমণীগণের মধ্যে মু'মিন ব্যতীত কেউ হালাল নয়। এটা তো উপরোক্ত হুকুমের উপসংহার) এবং (পরবর্তী পর্যায়ে সপ্তম—নতুন হুকুম তা এই যে,) আপনার পক্ষে বর্তমান স্ত্রীগণের স্থলে অপর স্ত্রীগণকে গ্রহণ করা বৈধ হবে না। (এরূপভাবে যে আপনি এদের কাউকে তালাক দিয়ে অপর কাউকে সে স্থলে গ্রহণ করে নেন। অবশ্য এদেরকে তালাক না দিয়ে যদি অপর কাউকে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করেন তবে কোন বাধা নেই। অনুরূপভাবে পরিবর্তনের ইচ্ছা ব্যতীতও যদি কাউকে তালাক দেন তবুও কোন আপত্তি নেই। تبدل শব্দ দ্বারা একথাই বোঝা যায় যে, কেবল পরিবর্তনের উদ্দেশ্যেই তালাক দেয়া নিষিদ্ধ) যদিও আপনাকে তাদের (অপর রমণীগণের) সৌন্দর্য মুগ্ধ ও বিমোহিত করে থাকে। কিন্তু যারা আপনার মালিকানাধীন দাসী (তারা পঞ্চম ও সপ্তম হুকুমের আওতা বহির্ভূত। অর্থাৎ তারা 'কিতাবীয়াহ্' কোরআন ব্যতীত অন্য কোন ঐশী গ্রন্থে বিশ্বাসী এবং অনুসারী হলেও হালাল এবং এক্ষেত্রে পরিবর্তনও জায়েয) এবং মহান আল্লাহ্ প্রত্যেক বস্তুর (মাহাত্ম্য, ফলাফল, প্রতিক্রিয়া ও গুণাগুণের) পরিপূর্ণ রক্ষক। (সুতরাং এ সব হুকুমের মাঝে অবশ্যই কল্যাণ ও মঙ্গল নিহিত রয়েছে, যদিও তা সাধারণ মানুষের বোধগম্যাতীত। তাই এ সম্পর্কে কারো প্রশ্ন উত্থাপনের অধিকার, অবকাশ বা যৌক্তিকতা নেই)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

উল্লিখিত আয়াতসমূহে বিয়ে ও তালাক সংশ্লিষ্ট এমন সাতটি হুকুমের আলোচনা রয়েছে যেগুলো কেবল রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্য নির্দিষ্ট এবং এরূপ বিশেষীকরণ রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর স্বতন্ত্র মর্যাদা ও বিশেষ সম্মানের পরিচায়ক। এগুলোর মধ্যে কতক হুকুম তো এমন যে রসূলুল্লাহ্র সাথে যেগুলোর বিশেষীকরণ একেবারে স্পষ্ট ও জাজ্বল্যমান। আবার কতক এমন সেগুলো যদিও সমগ্র মুসলমানের প্রতি প্রযোজ্য কিন্তু তাতে এমন কিছু

ছোট খাট শর্তাবলী রয়েছে, যা কেবল রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্য নির্দিষ্ট। এখন সেগুলোর বিস্তারিত বর্ণনা দেখুন।

প্রথম হুকুম ঃ— إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ

অর্থাৎ আমি আপনার জন্য আপনার বর্তমান স্ত্রীগণকে, যাদের মোহরানা আদায় করে দিয়েছেন, হালাল করে দিয়েছি। এ হুকুম বাহ্যত সমস্ত মুসলমানদের জন্য প্রযোজ্য। কিন্তু এতে বিশেষীকরণের কারণ এই যে, আয়াত অবতীর্ণ হওয়াকালে তাঁর (সা) সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ চারের অধিক স্ত্রী ছিলেন। কিন্তু সাধারণ মুসলমানের পক্ষে এক সঙ্গে চারের অধিক স্ত্রী রাখা হালাল নয়। সুতরাং তার জন্য এক সাথে চারের অধিক স্ত্রী হালাল করে দেওয়া কেবল তাঁরই বৈশিষ্ট্য ছিল।

আর এ আয়াতে যে اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ বলা হয়েছে, এটা হালাল হওয়ার শর্ত নয় বরং বাস্তব ঘটনার প্রকাশ মাত্র যে, যত মহিলা নবীজী (সা)-র সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়েছেন, নবীজী (সা) তাঁদের সবার মোহরানা নগদ আদায় করে দিয়েছেন, বাকি রাখেন নি। তাঁর (সা) স্বভাবই এরূপ ছিল যে, যে জিনিস আদায়ের দায়িত্ব তাঁর উপর আরোপিত ছিল তা কালবিলম্ব না করে তাৎক্ষণিকভাবে আদায় করে দায়মুক্ত হয়ে যেতেন, অনর্থক বিলম্ব করতেন না। এ ঘটনা প্রকাশের মাঝে সাধারণ মুসলমানদের জন্য তার অনুরূপ করার প্রেরণা রয়েছে।

দ্বিতীয় হুকুম ঃ— وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ অর্থাৎ তাঁর (সা) মালিকানাধীনে যেসব নারী রয়েছে তাঁর (সা) জন্য হালাল। এ আয়াতে أَفَا শব্দের উৎপত্তি হয়েছে فَيْئ ধাতু থেকে—পারিভাষিক অর্থে فَيْئ সে সব মালকে বোঝায় যা কাফিরদের থেকে বিনাযুদ্ধে বা সন্ধিসূত্রে লাভ করা হয়। আবার কখনো فَيْئ শব্দ সাধারণ গনীমতের মাল অর্থেও ব্যবহৃত হয়। বক্ষ্যমাণ আয়াতে এর উল্লেখ কোন শর্ত হিসেবে নয় যে আপনার জন্য কেবল সেসব দাসীই হালাল যা 'ফায়' (فَيْئ) বা গনীমতের মাল হিসেবে আপনার অংশে পড়েছে। বরং তিনি যাদেরকে মূল্যের বিনিময়ে খরিদ করেছেন তারাও এর অন্তর্গত।

কিন্তু এই হুকুমে বাহ্যিকভাবে রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কোন স্বাতন্ত্র্য বা বৈশিষ্ট্য নেই, এ হুকুম সমগ্র উম্মতের জন্য। যে দাসী গনীমতের মাল হিসেবে ভাগে পড়ে বা দাম দিয়ে খরিদ করা হয় তা তাদের জন্য হালাল। কিন্তু সমগ্র আয়াতের বর্ণনাভংগি এটাই চায় যে, উক্ত আয়াতসমূহে যেসব হুকুম রয়েছে তাতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে কিছু না কিছু বিশেষীকরণ অবশ্যই রয়েছে। এজন্যই রূহুল মা'আনীতে দাসীদের হালাল হওয়া

প্রসঙ্গেও রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এক বৈশিষ্ট্য এরূপ বর্ণনা করা হয়েছে যে, যেরূপভাবে আপনার পরে আপনার মহীয়সী স্ত্রীগণের বিয়ে কারো সাথে জায়েয নয়, অনুরূপভাবে যে দাসীকে আপনার জন্য হালাল করা হয়েছে আপনার পরে সেও অন্য কারো জন্য হালাল হবে না। যেমন হযরত মারিয়া কিবতিয়া (রা)-কে রোম সম্রাট মাকুক্কাস উপঢৌকন হিসেবে আপনার খিদমতে পাঠিয়েছিলেন। সুতরাং যেমন করে তাঁর (সা) পরে মহীয়সী স্ত্রীগণের কারো সাথে বিয়ে জায়েয ছিল না, এদের বিয়েও কারো সাথে জায়েয রাখা হয়নি।

হযরত হাকীমুল উম্মত (র) 'বয়ানুল কোরআনে'র মাঝে আরো দুটি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন, যা উল্লিখিত বৈশিষ্ট্য থেকে অধিক স্পষ্ট।

প্রথমত রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে হক তা'আলার পক্ষ থেকে এ বিশেষ ইখতিয়ার দেওয়া হয়েছিল যে, গনীমতের মাল বন্টনের পূর্বেই তিনি এগুলো থেকে কোন জিনিস নিজের জন্য পছন্দ করে রেখে দিতে পারতেন। যা তাঁর (সা) বিশেষ মালিকানা স্বত্বে পরিণত হতো। এই বিশেষ বস্তুকে পরিভাষায় صفى النبى (নবীজীর পছন্দ) বলে আখ্যায়িত করা হতো। যেমন খায়বার যুদ্ধের গনীমত থেকে হুযুর (সা) হযরত সাফিয়া (রা)-কে নিজের জন্য নির্দিষ্ট করে নিয়েছিলেন। সুতরাং দাসী সংশ্লিষ্ট মাস'আলার ক্ষেত্রে এটা কেবল হযরতেরই (সা) বৈশিষ্ট্য ছিল।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, 'দারুল হরবের' কোন অমুসলিমের পক্ষ থেকে যদি কোন হাদিয়া (উপঢৌকন) মুসলমানদের আমিরুল মু'মিনীনের নামে প্রেরণ করা হয় তবে তার মালিক আমিরুল মু'মিনীন হন না, বরং শরীয়ত অনুসারে তা বায়তুল মালের স্বত্বে পরিণত হয়। পক্ষান্তরে নবীজী (সা)-র জন্য এরূপ হাদিয়া হালাল করে দেওয়া হয়েছিল। যেমন মারিয়া কিবতিয়ার (রা) ঘটনা—যাঁকে সম্রাট মাকুক্কাস হাদিয়া রূপে তাঁর খিদমতে প্রেরণ করার পর তিনি তাঁর (সা) মালিকানা স্বত্বে পরিণত হয়েছিলেন।

তৃতীয় হুকুম : بَنٰتِ عَمِّكَ وَبَنٰتِ عَمّٰتِكَ الاية এ আয়াতে عم ও خال একবচন এবং عم ও عمات خالات বহুবচন রূপে গ্রহণের অনেক কারণ আছে বলে আলিমগণ বর্ণনা করেছেন। তফসীরে রূহুল মা'আনী, আবূ হাইয়্যান বর্ণিত এ কারণ গ্রহণ করেছেন যে, আরবী পরিভাষাই এরূপ—আরবী কবিতাই এর প্রমাণ—যাতে এর বহুবচন ব্যবহৃত হয় না, একবচনই ব্যবহৃত হয়।

আয়াতের মর্মার্থ এই যে, আপনার জন্য চাচা ও ফুফু এবং মামা ও খালার কন্যাগণকে হালাল করে দেওয়া হয়েছে। চাচা ও ফুফুর মাঝে পিতৃ বংশীয় মেয়ে এবং মামা ও খালার মাঝে মাতৃবংশীয়া সকল মেয়ে তাদেরকে বিবাহ করার বৈধতা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বিশেষত্ব নয়; বরং সকল মুসলমানের জন্য তাদেরকে বিবাহ করা হালাল। কিন্তু তাঁরা আপনার সাথে মক্কা থেকে হিজরত করেছে—এ কথাটি রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বৈশিষ্ট্য।

সারকথা এই যে, সাধারণ উম্মতের জন্য পিতৃ ও মাতৃকুলের এসব কন্যা কোন শর্ত ছাড়াই হালাল—হিজরত করুক অথবা না করুক; কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্য কেবল তাঁরাই হালাল, যারা তাঁর সাথে হিজরত করে। 'সাথে হিজরত' করার জন্য সফরে সঙ্গে থাকা অথবা একই সময়ে হিজরত করা জরুরী নয়, বরং যে কোন প্রকারে রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ন্যায় হিজরত করাই উদ্দেশ্য। ফলে এসব কন্যার মধ্যে যারা কোন কারণে হিজরত করেনি, তাদেরকে বিবাহ করা রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্য হালাল রাখা হয়নি। রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চাচা আবূ তালিবের কন্যা উম্মে হানী (রা) বলেন: আমি মক্কা থেকে হিজরত না করার কারণে আমাকে বিবাহ করা রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্য হালাল ছিল না। আমি তোলাকাদের মধ্যে গণ্য হতাম। মক্কা বিজয়ের সময় রসূলুল্লাহ্ (সা) যাদেরকে হত্যা অথবা বন্দী না করে মুক্ত করে দিয়েছিলেন, তাদেরকে 'তোলাকা' বলা হত। (রূহুল মা'আনী, জাসসাস)

রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে বিবাহের জন্য হিজরতের উপরোক্ত শর্ত কেবল মাতৃ ও পিতৃবংশীয় কন্যাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল; সাধারণ উম্মতের মহিলাদের ক্ষেত্রে হিজরতের শর্ত ছিল না; বরং তাদের শুধু মুসলমান হওয়াই যথেষ্ট ছিল। পরিবারের মেয়েদের ক্ষেত্রে হিজরতের শর্ত আরোপ করার রহস্য সম্ভবত এই যে, পরিবারের মেয়েদের মধ্যে সাধারণত বংশগত কৌলিন্যের গর্ব ও অহমিকা বিদ্যমান থাকে। রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহধর্মিণী হওয়ার জন্য এটা সমীচীন নয়। হিজরতের শর্ত আরোপ করে এই গর্ব ও অহমিকার প্রতিকার করা হয়েছে। কারণ হিজরত কেবল সেই নারীই করবে, যে আল্লাহ্ ও রসূলের ভালবাসাকে গোটা পরিবার, দেশ ও বিষয় সম্পত্তির ভালবাসার উপর প্রাধান্য দেবে। এছাড়া হিজরতের সময় মানুষ নানাবিধ দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হয় এবং আল্লাহ্র পথে সহ্য করা দুঃখকষ্ট সংশোধনে বিশেষ সহায়ক হয়ে থাকে।

মোটকথা এই যে, মাতৃ-পিতৃকুলের মেয়েদেরকে বিবাহ করার বেলায় রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্য একটি বিশেষ শর্ত ছিল। তা এই যে, সংশ্লিষ্ট মেয়েদের মক্কা থেকে হিজরত করতে হবে।

চতুর্থ বিধান :— وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِنْ وَّهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَّسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ

অর্থাৎ যদি কোন মুসলমান মহিলা নিজেকে আপনার কাছে নিবেদন করে, মানে দেনমোহর ব্যতিরেকেই আপনার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চায় এবং আপনিও তাকে বিবাহ করতে ইচ্ছুক হন, তবে আপনার জন্য দেনমোহর ব্যতীতও বিবাহ হালাল। এই বিধান বিশেষভাবে আপনার জন্য—অন্য মু'মিনদের জন্য নয়।

উপরোক্ত বিধান যে একান্তভাবে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বৈশিষ্ট্য, তা বর্ণনাসাপেক্ষ নয়। কেননা, সাধারণ লোকের জন্য বিবাহে দেনমোহর অপরিহার্য শর্ত। এমনকি, বিবাহের সময় যদি কোন নারী বলে, দেনমোহর নেব না কিংবা কোন পুরুষ বলে, দেন-মোহর দেব না---এই শর্তে বিবাহ করছি, তবে তাদের এসব উক্তি ও শর্ত শরীয়তের আইনে অসার হবে এবং 'মোহরে মিসল' ওয়াজিব হবে। একমাত্র রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিশেষ মর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতে দেনমোহর ব্যতিরেকেই বিবাহ হালাল করা হয়েছে, যদি নারী দেনমোহর ব্যতীত বিবাহ করতে আগ্রহী হয়।

জ্ঞাতব্য ঃ উপরোক্ত বিধান অনুযায়ী রসূলুল্লাহ্ (সা) দেনমোহর ব্যতিরেকে কোন বিবাহ করেছিলেন কি না, এ ব্যাপারে আলিমগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, এরূপ কোন ঘটনা সংঘটিত হওয়ার প্রমাণ নেই। এই উক্তির সারকথা এই যে, তিনি কোন মহিলাকে দেনমোহর ব্যতিরেকে বিবাহ করেন নি। পক্ষান্তরে কেউ কেউ এরূপ বিবাহ সপ্রমাণ করেছেন।---(রূহুল-মা'আনী)

এই বিধানের সাথে সম্পৃক্ত خَالِصَةً لَّكَ বাক্যটিকে কেউ কেউ কেবল চতুর্থ বিধানের সাথেই বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত বলেছেন। কিন্তু 'যমখশরী' প্রমুখ তফসীরবিদ একে উল্লিখিত সকল বিধানের সাথে জুড়ে দিয়েছেন অর্থাৎ সবগুলো বিধানই রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বৈশিষ্ট্য। পরিশেষে বলা হয়েছে ঃ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ---আপনার অসুবিধা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে আপনার জন্য এসব বিশেষ বিধান দেওয়া হল। উল্লিখিত বিশেষ বিধানসমূহের প্রথম বিধান হচ্ছে চারের অধিক পত্নী রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্য হালাল এবং চতুর্থ বিধান হচ্ছে দেনমোহর ব্যতিরেকে বিবাহ করা হালাল। এই বিধানদ্বয়ের মধ্যে অসুবিধা দূরীকরণ এবং অতিরিক্ত সুবিধা দানের বিষয়টি বর্ণনা সাপেক্ষ নয়। কিন্তু অবশিষ্ট দ্বিতীয়, তৃতীয় ও পঞ্চম বিধানে বাহ্যত তাঁর উপর অতিরিক্ত কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছে, যার ফলে অসুবিধা আরও বৃদ্ধি পাওয়ার কথা। কিন্তু এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যদিও বাহ্যত এসব কড়াকড়ি অসুবিধা বৃদ্ধি করে; কিন্তু এতে আপনার অনেক উপযোগিতার প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। এসব কড়াকড়ি না থাকলে আপনি অনেক প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতেন, যা মনোকষ্টের কারণ হত। তাই অতিরিক্ত কড়াকড়ির মধ্যেও আপনার অসুবিধা দূরীকরণই উদ্দেশ্য।

পঞ্চম বিধান ঃ আয়াতের مُؤْمِنَةً শব্দ থেকে বোঝা যায়---তা এই যে, সাধারণ মুসলমানদের জন্য ইহুদী ও খৃস্টান নারীদেরকে বিবাহ করা কোরআনের বর্ণনা অনু-যায়ী হালাল হলেও রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্য হালাল নয়; বরং এ ক্ষেত্রে নারীর ঈমান-দার হওয়া শর্ত।

রসূলে করীম (সা)-এর উপরোক্ত পাঁচটি বিশেষ বিধান বর্ণনা করার পর সাধারণ মুসলমানদের বিধান সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ অর্থাৎ সাধারণ মুসলমানদের বিবাহের জন্য আমি যা ফরয করেছি, তা আমি জানি---উদাহরণত সাধারণ মুসলমানদের বিবাহ দেনমোহর ব্যতিরেকে হতে পারে না এবং ইহুদী ও খৃস্টান নারীদের সাথে তাদের বিবাহ হতে পারে। এরূপভাবে পূর্বোক্ত বিধানসমূহে যেসব কড়াকড়ি ও শর্ত রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিবাহের জন্য জরুরী, সেগুলো অন্যদের বেলায় প্রযোজ্য নয়।

অবশেষে বলা হয়েছে لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ---অর্থাৎ বিবাহের ব্যাপারে আপনাকে এসব বিশেষ বিধান দেয়ার কারণ অসুবিধা দূর করা। যেসব কড়াকড়ি ও শর্ত অন্য মুসলমানদের তুলনায় আপনার প্রতি অতিরিক্ত আরোপ করা হয়েছে, সেগুলোতে বাহ্যত এক প্রকার অসুবিধা থাকলেও এগুলোর অন্তর্নিহিত উপযোগিতা ও রহস্যের প্রতি লক্ষ্য করলে এগুলোও আপনার আত্মিক পেরেশানি ও মনোকষ্ট দূর করার উদ্দেশ্যেই আরোপিত হয়েছে।

এ পর্যন্ত বিবাহ সম্পর্কিত রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পাঁচটি বিশেষ বিধান বর্ণিত হয়েছে। অতপর এগুলোর সাথে সম্পর্কযুক্ত আরও দুটি বিধান বির্ণিত হচ্ছে। উদাহরণত ষষ্ঠ বিধান تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ — تُرْجِي শব্দটি إِرْجَاء থেকে উদ্ভূত। অর্থ পেছনে রাখা এবং تُؤْوِي শব্দটি إِيوَاء থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ নিকটে আনা। আয়াতের অর্থ এই যে, আপনি বিবিগণের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা দূরে সরিয়ে রাখতে পারেন এবং যাকে ইচ্ছা কাছে রাখতে পারেন। এটা রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্য বিশেষ বিধান। সাধারণ উম্মতের মধ্যে কোন ব্যক্তির একাধিক পত্নী থাকলে সকলের মধ্যে সমতা বিধান জরুরী এবং বৈষম্যমূলক আচরণ করা হারাম। সমতার মানে ভরণ-পোষণে ও রাত্রি যাপনে সমতা করা অর্থাৎ প্রত্যেক স্ত্রীর সাথে সমান সংখ্যক রাত্রি যাপন করতে হবে---কম বেশি করা হারাম। কিন্তু এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে পূর্ণ ক্ষমতা দান করে পত্নীদের মধ্যে সমতা বিধান করা থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে এবং আয়াতের শেষে আরও ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যে, আপনি যে পত্নীকে একবার দূরে রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, ইচ্ছা করলে তাকে পুনরায় কাছে রাখতে পারেন। وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ বাক্যের অর্থ তা-ই।

আল্লাহ্ তা'আলা রসূলে করীম (সা)-এর সম্মানার্থে তাঁকে পত্নীদের মধ্যে সমতা বিধান করার হুকুম থেকে মুক্ত রেখেছেন। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা) এই ব্যতিক্রম ও অনুমতি সত্ত্বেও কার্যত সর্বদাই সমতা বজায় রেখেছেন। ইমাম আবূ বকর জাসসাস বলেন, হাদীস থেকে এ কথাই জানা যায় যে, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পরও রসূলুল্লাহ্ (সা) বিবিগণের মধ্যে সমতা রক্ষামূলক আচরণের প্রতি সর্বদা লক্ষ্য রাখতেন। অতপর ইমাম জাসসাস স্বীয় সনদ সহকারে মসনদে আহমদ, তিরমিযী, নাসায়ী, আবূ দাউদ ইত্যাদি কিতাবে বর্ণিত হযরত আয়েশা (রা) থেকে এই হাদীস উল্লেখ করেছেন ঃ

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل فيقول اللهم هذا قسمى فيما املك فلا تلمنى فيما لا املك قال ابو داؤد يعنى القلب

রসূলুল্লাহ্ (সা) সকল পত্নীর মধ্যে সমতা বিধান করতেন এবং এই দোয়া করতেন, ইয়া আল্লাহ্! যে বিষয়ে আমার ইখতিয়ার আছে, তাতে আমি সমতা বিধান করলাম, (অর্থাৎ ভরণ-পোষণ ও রাত্রি যাপন) কিন্তু যে ব্যাপারে আমার ইখতিয়ার নেই, সে ব্যাপারে আমাকে তিরস্কার করবেন না (অর্থাৎ আন্তরিক ভালবাসা কারও প্রতি বেশি এবং কারও প্রতি কম থাকার ব্যাপারে আমার ইখতিয়ার নেই)।

সহীহ্ বুখারীর রেওয়ায়েতে হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সা) পত্নীদের কাছে যাওয়ার ব্যাপারে পালা নির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন। সেই পালা অনুযায়ী কোন পত্নীর কাছে যাওয়ার ব্যাপারে কোন ওযর দেখা দিলে তিনি তার কাছ থেকে অনুমতি গ্রহণ করতেন। অথচ সে সময়ে تُؤْوِي إِلَيْكَ আয়াতখানি অবতীর্ণ হয়ে গিয়েছিল, যাতে পত্নীদের মধ্যে সমতা বিধানের দায়িত্ব থেকে তাঁকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল।

এ হাদীসটিও হাদীস গ্রন্থসমূহে সুবিদিত যে, ওফাতের পূর্বে রুগ্নাবস্থায় প্রত্যহ পত্নীগণের গৃহে গমন করা তাঁর পক্ষে কঠিন হয়ে গেলে তিনি সকলের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে হযরত আয়েশা (রা)-র গৃহে শয্যা গ্রহণ করেছিলেন।

পয়গম্বরগণ বিশেষত রসূলে করীম (সা)-এর অভ্যাস এটাই ছিল যে, যেসব কাজে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁকে তাঁরই সুবিধার্থে 'রুখসত' তথা অব্যাহতি দান করা হত, আল্লাহ্ তা'আলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশস্বরূপ তিনি সেসব কাজে 'আযীমত' পালন করে সুবিধা ভোগ করা থেকে বিরত থাকতেন এবং 'রুখসত' অর্থাৎ অব্যাহতিকে কেবল প্রয়োজনের মুহূর্তেই ব্যবহার করতেন।

ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ—এতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে পত্নীগণের মধ্যে সমতা বিধানের আদেশ থেকে অব্যাহতি দান এবং তাঁকে সর্বপ্রকার ক্ষমতাদানের কারণ ও রহস্য বর্ণিত হয়েছে। এর রহস্য এই যে, এতে সকল পত্নীর চক্ষু শীতল থাকবে এবং তাঁরা যা পাবেন, তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকবেন।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, এই বিধান তো বাহ্যত পত্নীগণের পছন্দ ও বাসনার বিপরীত হওয়ার কারণে তাদের মর্মবেদনার কারণ হতে পারে। একে পত্নীগণের সন্তুষ্টির কারণ কিরূপে আখ্যায়িত করা হল? এর জবাব তফসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে যে, প্রকৃতপক্ষে অধিকারই অসন্তুষ্টির আসল কারণ হয়ে থাকে। কারও কাছে কিছু পাওনা থাকলে সে যদি তা আদায় করতে ত্রুটি করে তবেই পাওনাদার ব্যক্তি দুঃখকষ্টের সম্মুখীন হয়। কিন্তু যার কাছে কারও কোন পাওনা নেই, সে যদি সামান্য দয়াও প্রদর্শন করে, তবে প্রতিপক্ষ খুবই আনন্দিত হয়। এখানেও যখন বলা হয়েছে যে, পত্নীগণের মধ্য সমতা বিধান করা রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্য জরুরী নয়; বরং তিনি এ ব্যাপারে স্বাধীন, তখন তিনি যে পত্নীকে যতটুকু মনোযোগ ও সঙ্গদান করবেন, তাকে সে এক অনুগ্রহ ও দান মনে করে সন্তুষ্ট হবে।

অবশেষে বলা হয়েছে : وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِىْ قُلُوْبِكُمْ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَلِيْمًا

---অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলা জানেন তোমাদের অন্তরে কি আছে। তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। উল্লিখিত আয়াতসমূহে এ পর্যন্ত রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিবাহের সাথে কোন না কোন দিক দিয়ে সম্পর্ক রাখে, এরূপ বিধানসমূহ বিধৃত হয়েছে। এরপরও এমনি ধরনের কতক বিধান বর্ণিত হবে। মধ্যস্থলে এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের অন্তরে যা আছে জানেন এবং তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। বাহ্যত পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বিষয়বস্তুর সাথে একথা কোন সম্পর্ক রাখে না। রূহুল মা'আনীতে বলা হয়েছে, বর্ণিত বিধানসমূহের মধ্যে রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্য চারের অধিক পত্নী গ্রহণের অনুমতি এবং দেনমোহর ব্যতিরেকে বিবাহের অনুমতি দেখে কারও মনে শয়তানী কুমন্ত্রণা সৃষ্টি হওয়ার আশংকা ছিল। তাই মধ্যস্থলে আলোচ্য আয়াত নির্দেশ দিয়েছে যে, মুসলমানরা যেন তাদের অন্তরকে এ ধরনের কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচিয়ে রাখে এবং দৃঢ় বিশ্বাস রাখে যে, এসব বিশেষত্ব আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে, যা অনেক রহস্য ও উপযোগিতার উপর ভিত্তিশীল। এখানে কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার অবকাশ নেই।

রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সংসারবিমুখ জীবন ও বহু বিবাহ : ইসলামের শত্রুরা সব সময় বহু বিবাহ বিশেষত রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বহু বিবাহকে সমালোচনার বিষয়-বস্তুতে পরিণত করে ইসলাম বিরোধিতার প্রয়াস পেয়েছে। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সমগ্র জীবনালেখ্য সামনে রাখা হলে শয়তানও তাঁর রিসালতের বিপক্ষে কথা বলার অবকাশ পায় না। তাঁর জীবনালেখ্যে প্রমাণিত আছে যে, তিনি সর্বপ্রথম বিবাহ করেন পঁচিশ বছর বয়সে হযরত খাদীজা (রা)-কে, যিনি ছিলেন বিধবা, চল্লিশ বছর বয়স্কা ও সন্তানের জননী। এর আগে দুই স্বামীর ঘর করার পর তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র স্ত্রীরূপে আগমন করেছিলেন। অতপর রসূলুল্লাহ্ (সা) পঞ্চাশ বছরের বয়ঃক্রম পর্যন্ত এই বয়স্কা মহিলার সাথে সমগ্র যৌবন অতিবাহিত করেন। পঞ্চাশ বছরের এই বয়ঃক্রম মক্কাবাসীদের চোখের সামনে অতিবাহিত হয়। চল্লিশ বছর বয়সে নবুয়তের ঘোষণা

প্রচারিত হওয়ার পর মক্কা নগরীতে তাঁর বিরোধিতার সূচনা হয়। বিরোধী পক্ষ তাঁর উপর নির্যাতনের এবং তাঁর ছিদ্রান্বেষণের চেষ্টার কোন ত্রুটি রাখে নি। তাঁকে যাদুকর বলেছে, উন্মাদ বলেছে, কিন্তু পরম শত্রুর মুখ থেকেও কোন সময় এমন কথা বের হয়নি, যা তাঁর আল্লাহ্‌ভীতি ও চারিত্রিক পবিত্রতাকে সন্দেহযুক্ত করে দিতে পারে।

পঞ্চাশোর্ধ বয়সে হযরত খাদীজা (রা)-র ওফাতের পর হযরত সওদা (রা) তাঁর স্ত্রীরূপে আসেন---তিনিও বিধবা ছিলেন।

মদীনায় হিজরত এবং বয়স চুয়ান্ন বছর হওয়ার পর দ্বিতীয় হিজরীতে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) নববধূ বেশে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র গৃহে আগমন করেন। এর এক বছর পর হযরত হাফসা (রা)-র সাথে এবং কিছুদিন পর যয়নব বিনতে খুযায়-মার সাথে তাঁর বিবাহ হয়। কয়েক মাস পর যয়নবের ইন্তেকাল হয়ে যায়। চতুর্থ হিজরীতে সন্তানের জননী ও বিধবা হযরত উম্মে সালমা (রা) তাঁর অন্তঃপুরে আসেন। পঞ্চম হিজরীতে হযরত যয়নব বিনতে জাহাশের সাথে আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশে তাঁর বিবাহ হয়। এ সম্পর্কে সূরা আহ্‌যাবের শুরুতে আলোচনা করা হয়েছে। তখন রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বয়ঃক্রম ছিল আটান্ন বছর। অবশিষ্ট পাঁচ বছরে অন্যান্য পত্নী তাঁর হেরেমে প্রবেশ করেন। পয়গম্বরের পারিবারিক জীবন ও আচার-আচরণের সাথে অনেক ধর্মীয় বিধান সম্পৃক্ত থাকে। এই নয়জন পত্নীর মাধ্যমে ইসলাম প্রচারের কাজ কতটুকু অগ্রসর হয়েছে, তা অনুমান করতে হলে এটাই যথেষ্ট যে, একমাত্র হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) থেকে দু'হাজার দু'শ দশটি হাদীস এবং হযরত উম্মে সালমা (রা) থেকে তিনশ আটষট্টিটি হাদীস নির্ভরযোগ্য হাদীস গ্রন্থসমূহে সন্নিবেশিত রয়েছে। হযরত উম্মে সালমা (রা) বর্ণিত বিধানসমূহ ও ফতোয়া সম্পর্কে হাফেয ইবনে কাইয়্যেম "এলামুল-মুকেয়ীন" গ্রন্থে লিখেন ঃ এগুলো একত্রিত করা হলে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থের আকার ধারণ করবে। দু'শতেরও অধিক সাহাবায়ে কিরাম হযরত আয়েশা সিদ্দীকার শিষ্য ছিলেন, যাঁরা তাঁর কাছ থেকে হাদীস, ফিকাহ ও ফতোয়া শিক্ষা করেছিলেন।

অনেক পত্নীকে নবী করীম (সা)-এর হেরেমে দাখিল করার পশ্চাতে তাদের পরিবারবর্গকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার রহস্য নিহিত ছিল। রসূলে করীম (সা)-এর জীবনের এই সংক্ষিপ্ত চিত্রটি সামনে রাখা হলে কারও পক্ষে একথা বলার অবকাশ থাকে কি যে, এই বহুবিবাহ কোন মানসিক ও যৌন বাসনা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে ছিল ? এরূপ হলে যৌবনের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ অবিবাহিত অবস্থায় এবং তারপর একজন বিধবার সাথে অতিবাহিত করার পর জীবনের শেষভাগকে এ কাজের জন্য কেন বেছে নেয়া হল ? এ বিষয়বস্তুর পূর্ণ বিবরণ এবং শরীয়তগত, বুদ্ধিগত, প্রকৃতিগত ও অর্থনীতিগত দৃষ্টিকোণ থেকে বহুবিবাহ সম্পর্কিত পূর্ণাঙ্গ আলোচনা দ্বিতীয় খণ্ডে সূরা নিসার তৃতীয় আয়াতের তফসীরে করা হয়েছে।

সপ্তম বিধান ঃ لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ

أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ অর্থাৎ অতঃপর আপনার জন্য অন্য মহিলাকে বিবাহ করা হালাল নয় এবং বর্তমান পত্নীগণের মধ্যে কাউকে তালাক দিয়ে তার স্থলে অন্যাকে বিবাহ করাও হালাল নয়।

এ আয়াতে مِنْ بَعْدُ শব্দের দু'রকম তফসীর হতে পারে--(১) সেই নারীগণের পরে যারা বর্তমানে আপনার বিবাহে আছে, অন্য কাউকে বিবাহ করা আপনার জন্য হালাল নয়। কতক সাহাবী ও তফসীরবিদ থেকেও এই তফসীর বর্ণিত আছে, যেমন হযরত আনাস (রা) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা নবী-পত্নীগণকে দু'টি বিষয়ের মধ্য থেকে যে কোন একটি বেছে নেওয়ার অধিকার দিয়েছিলেন---সাংসারিক ভোগবিলাস লাভের উদ্দেশ্যে রসূল (সা)-এর সঙ্গ ত্যাগ করা অথবা দুঃখ-কষ্ট ও সুখ যা-ই পাওয়া যায়, তাকে বরণ করে নিয়ে তাঁর স্ত্রী হিসাবে থাকা। সে মতে পুণ্যময়ী পত্নীগণ সকলেই অতিরিক্ত ভরণ-পোষণের দাবি পরিত্যাগ করে সর্বাবস্থায় রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পত্নীত্বে থাকাকেই বেছে নেন। এরই পুরস্কারস্বরূপ আল্লাহ্ তা'আলা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সত্তাকেও এই নয় পত্নীর জন্য সীমিত করে দেন। ফলে তাঁদের ব্যতীত অন্য কাউকে বিবাহ করা বৈধ রইল না।---(রূহুল মা'আনী)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা নবী-পত্নীগণকে একমাত্র তাঁর জন্যই নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। ফলে তাঁর ওফাতের পরও তাঁরা অন্য কাউকে বিবাহ করতে পারতেন না। অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা'আলা রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তাঁদের জন্যে নির্দিষ্ট করে দেন যে, তিনি তাঁদের ব্যতীত অন্য কোন নারীকে বিবাহ করতে পারবেন না। এক রেওয়ায়েতে হযরত ইকরামা (রা) থেকেও এই তফসীর বর্ণিত আছে।

(২) অপর এক রেওয়ায়েতে হযরত ইকরামা, ইবনে আব্বাস ও মুজাহিদ থেকে مِنْ بَعْدُ শব্দের দ্বিতীয় তফসীর مِنْ بَعْدِ الْأَصْنَافِ الْمَذْكُورَةِ বর্ণিত আছে। অর্থাৎ আয়াতের শুরুতে আপনার জন্য যত প্রকার নারী হালাল করা হয়েছে, তাঁদের ব্যতীত অন্য কোন প্রকার নারীকে বিবাহ করা আপনার জন্য হালাল নয়। উদাহরণত আয়াতের শুরুতে তাঁর পরিবারের নারীদের মধ্যে যারা মক্কা থেকে হিজরত করেছেন, কেবল তাঁদেরকেই হালাল করা হয়েছে এবং যাঁরা হিজরত করেন নি, তাঁদেরকে বিবাহ করা হালাল রাখা হয়নি। অনুরূপভাবে مُؤْمِنَةً তথা ঈমানদার হওয়ার শর্ত আরোপ করে কিতাবী নারীদেরকে বিবাহ করাও তাঁর জন্য অবৈধ সাব্যস্ত করা হয়েছে। সুতরাং مِنْ بَعْدُ শব্দের অর্থ এই যে, যে সব প্রকার নারী তাঁর জন্য হালাল করা হয়েছে,

কেবল তাঁদের মধ্যে আপনার বিবাহ হতে পারে। সাধারণত নারীদের মধ্যে মুসলমান হওয়াই শর্ত এবং পরিবারের নারীদের মধ্যে মুসলমান হওয়ার সাথে সাথে হিজরত করাও শর্ত। যাদের মধ্যে এই শর্তদ্বয় অনুপস্থিত, তাদেরকে বিবাহ করা হালাল নয়। এই তফসীর অনুযায়ী আলোচ্য বাক্যে কোন নতুন বিধান ব্যক্ত হয়নি, বরং পূর্বোক্ত বিধানেরই তাকীদ ও ব্যাখ্যা করা হয়েছে মাত্র। এ আয়াতের কারণে নয় জনের পর অন্য নারীকে বিবাহ করা হারাম হয়ে যায় নি ; বরং মু'মিন নয়, এমন নারীকে এবং হিজরত করেনি—পরিবারের এমন নারীকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ হয়েছে মাত্র। অবশিষ্ট নারীগণকে আরও বিবাহ করার ব্যাপারে তাঁর ইখতিয়ার বহাল রয়েছে। হযরত আয়েশা সিদ্দীকার এক রেওয়ায়েতও এই দ্বিতীয় তফসীর সমর্থন করে, যদ্দ্বারা বোঝা যায় যে, আরও বিবাহ করার অনুমতি ছিল।

وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ — আলোচ্য আয়াতের দ্বিতীয় তফসীর অনুযায়ী এ বাক্যের সুস্পষ্ট অর্থ এই যে, বর্তমান স্ত্রীগণ ব্যতীত অন্য নারীদেরকে বর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে বিবাহ করা যদিও জায়েয, কিন্তু এটা জায়েয নয় যে, একজনকে তালাক দিয়ে তার স্থলে অন্যজনকে বহাল করবেন অর্থাৎ নিছক পরিবর্তন মানসে কোন বিবাহ বৈধ নয়। পরিবর্তনের নিয়ম ব্যতীত যত ইচ্ছা বিবাহ করতে পারেন।

পক্ষান্তরে প্রথম তফসীর অনুযায়ী অর্থ এই হবে যে, বর্তমান পত্নী তালিকায় নতুন কোন মহিলার সংযোজনও করতে পারবেন না এবং কাউকে পরিবর্তনও করতে পারবেন না অর্থাৎ একজনকে তালাক দিয়ে তার স্থলে অন্যজনকে বিবাহ করতে পারবেন না।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ
طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَٰكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ
فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ ۚ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ
فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ ۖ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ ۚ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا
فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ۚ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ۚ
وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ

بَعْدِهٖۤ اَبَدًا ؕ اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمًا ۝٥٣ اِنْ تُبْدُوْا شَيْـًٔا اَوْ تُخْفُوْهُ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ۝٥٤ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِيْۤ اٰبَآئِهِنَّ وَلَاۤ اَبْنَآئِهِنَّ وَلَاۤ اِخْوَانِهِنَّ وَلَاۤ اَبْنَآءِ اِخْوَانِهِنَّ وَلَاۤ اَبْنَآءِ اَخَوٰتِهِنَّ وَلَا نِسَآئِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ ۚ وَاتَّقِيْنَ اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدًا ۝٥٥

(৫৩) হে মু'মিনগণ! তোমাদেরকে অনুমতি দেওয়া না হলে তোমরা খাওয়ার জন্য আহার্য রন্ধনের অপেক্ষা না করে নবীর গৃহে প্রবেশ করো না। তবে তোমরা আহূত হলে প্রবেশ করো, অতপর খাওয়া শেষে আপনা আপনি চলে যেয়ো, কথাবার্তায় মশগুল হয়ে যেয়ো না। নিশ্চয় এটা নবীর জন্য কষ্টদায়ক। তিনি তোমাদের কাছে সংকোচ বোধ করেন; কিন্তু আল্লাহ্ সত্য কথা বলতে সংকোচ করেন না। তোমরা তাঁর পত্নীগণের কাছে কিছু চাইলে পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। এটা তোমাদের অন্তরের জন্য এবং তাঁদের অন্তরের জন্য অধিকতর পবিত্রতার কারণ। আল্লাহ্র রসূলকে কষ্ট দেওয়া এবং তাঁর ওফাতের পর তাঁর পত্নীগণকে বিবাহ করা তোমাদের জন্য বৈধ নয়। আল্লাহ্র কাছে এটা গুরুতর অপরাধ। (৫৪) তোমরা খোলাখুলি কিছু বল অথবা গোপন রাখ, আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ। (৫৫) নবী-পত্নীগণের জন্য তাঁদের পিতা-পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, সমধর্মিণী নারী এবং অধিকারভুক্ত দাসদাসীগণের সামনে যাওয়ার ব্যাপারে গোনাহ্ নেই। নবী-পত্নীগণ, তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ব বিষয় প্রত্যক্ষ করেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে মু'মিনগণ! তোমরা নবীর গৃহে (অযাচিতভাবে) প্রবেশ করো না, তবে যখন তোমাদেরকে আহারের জন্যে (আসার) অনুমতি দেওয়া হয় (তখন যাওয়া দূষণীয় নয়। কিন্তু তখনও যাওয়া) এভাবে (হওয়া চাই) যে, তোমরা আহার্য রন্ধনের অপেক্ষা করবে (অর্থাৎ দাওয়াত ছাড়া তো যাবেই না; দাওয়াত হলেও অনেক আগে যাবে না।) কিন্তু তোমরা (আহার্য প্রস্তুতির পর) আহূত হলে প্রবেশ করবে, অতপর খাওয়া শেষে উঠে চলে যাবে এবং কথাবার্তায় মশগুল হয়ে বসে থাকবে না। (কেননা, এটা নবীর জন্যে পীড়াদায়ক। তিনি তোমাদের কাছে সংকোচ বোধ করেন (এবং মুখে চলে যেতে বলেন না) কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা সত্য কথা বলতে (কোনরূপ) সংকোচ বোধ করেন না। (তাই সাফ সাফ বলে দেওয়া হয়েছে। এখন থেকে এই বিধান হচ্ছে

যে, নবী-পত্নীগণ তোমাদের কাছে পর্দা করবেন। তাই এখন থেকে) তোমরা তাঁর পত্নীগণের কাছে কিছু চাইলে পর্দার আড়াল থেকে (অর্থাৎ পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে সেখান থেকে) চাইবে। (বিনা প্রয়োজনে পর্দার কাছে যাওয়া এবং কথা বলাও উচিত নয়। তবে প্রয়োজনে কথা বলতে দোষ নেই; কিন্তু সামনাসামনি দেখা না হওয়া চাই।) এটা (চিরতরে) তোমাদের অন্তর এবং তাঁদের অন্তর পবিত্র থাকার প্রকৃষ্ট উপায়। (অর্থাৎ এ পর্যন্ত যেমন উভয় পক্ষের অন্তর পবিত্র, ভবিষ্যতেও তেমনি অপবিত্র হওয়ার আশংকা দূর হয়ে গেছে। নিষ্পাপ না হওয়ার কারণে এরূপ অপ-বিত্রতার আশংকা ছিল। পয়গম্বরকে পীড়া দেওয়া হারাম—এটা কেবল বিনা প্রয়োজনে আসন গেড়ে বসে থাকার মধ্যেই সীমিত নয়; বরং সর্বাবস্থায় বিধান এই যে,) আল্লাহ্‌র রসূলকে (যে কোনভাবে) কষ্ট দেওয়া এবং তাঁর ওফাতের পর তাঁর পত্নীগণকে বিবাহ্ করা তোমাদের জন্য বৈধ নয়। এটা আল্লাহ্‌র কাছে গুরুতর (গোনাহের) ব্যাপার। (এ বিবাহ যেমন অবৈধ, অনুরূপভাবে মুখে এর আলোচনা করা অথবা অন্তরে ইচ্ছা করা সব গোনাহ্। অতএব) তোমরা (এ সম্পর্কে) খোলাখুলি কিছু বল অথবা (এরূপ ইচ্ছাকে) অন্তরে গোপন রাখ, আল্লাহ্ (উভয় বিষয় জানেন; কেননা, তিনি) সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ। (সুতরাং তোমাদের তজ্জন্য শাস্তি দেবেন। আমি উপরে যে পর্দার বিধান দিয়েছি, তাতে কেউ কেউ ব্যতিক্রমভুক্তও আছে, যাদের বর্ণনা এই ঃ) নবী-পত্নীগণের জন্য তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, (সমধর্মিণী) নারী এবং দাসীগণের (সামনে) যাওয়ার ব্যাপারে কোন গোনাহ্ নেই (অর্থাৎ তাদের সামনে যাওয়া জায়েয)। আর (হে নবী-পত্নীগণ! এসব বিধান পালনের ব্যাপারে) আল্লাহ্‌কে ভয় কর (কোন বিধান যেন অমান্য করা না হয়)। নিশ্চয় আল্লাহ্ সবকিছু প্রত্যক্ষ করেন (অর্থাৎ তাঁর কাছে কোন বিষয় গোপন নয়। যে বিপরীত করবে, তাকে শাস্তি দেবেন)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহে ইসলামী সামাজিকতার কতিপয় রীতিনীতি ও বিধান বিবৃত হয়েছে। পূর্বোক্ত আয়াতসমূহের সাথে এর সম্পর্ক এই যে, এসব আয়াতে বর্ণিত রীতিনীতিগুলো প্রথমে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র গৃহে ও তাঁর পত্নীগণের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে, যদিও এগুলো তাঁর ব্যক্তিসত্তার সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত নয় প্রথম বিধান খাওয়ার দাওয়াত ও মেহমানের কতিপয় রীতিনীতি।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ
طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَٰكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا
وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ ـ

এ আয়াতে দাওয়াত ও আপ্যায়ন সম্পর্কিত তিনটি রীতিনীতি বর্ণিত হয়েছে। এগুলো সকল মুসলমানের জন্য ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য; কিন্তু যে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে, তা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র গৃহে সংঘটিত হয়েছিল। তাই শিরোনামে بيوت النبى উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম রীতি এই যে, নবী (সা)-র গৃহে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করো না। বলা হয়েছে ঃ

لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ

দ্বিতীয় রীতি এই যে, প্রবেশের অনুমতি এমন কি, খাওয়ার দাওয়াত হলেও সময়ের পূর্বে উপস্থিত হয়ে আহার্য প্রস্তুতির অপেক্ষায় বসে থেকো না। غَيْرَ نَاظِرِيْنَ إِنَاهُ ناظر শব্দের অর্থ এখানে অপেক্ষাকারী এবং إنا শব্দের অর্থ খাদ্য রন্ধন করা। আয়াতে لَا تَدْخُلُوا নিষেধাজ্ঞা থেকে দু'টি ব্যতিক্রম প্রকাশ করা হয়েছে—একটি إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ এর إلا শব্দ দ্বারা এবং অপরটি غَيْرَ শব্দ দ্বারা। এর অর্থ এই যে, বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করো না এবং সময়ের পূর্বে এসে খাদ্য রন্ধনের অপেক্ষায় বসে থেকো না; বরং যথাসময়ে আহ্বান করা হলে গৃহে প্রবেশ কর। বলা হয়েছে ঃ وَلٰكِنْ إِذَا دُعِيْتُمْ فَادْخُلُوا -

তৃতীয় রীতি এই যে, খাওয়া শেষে নিজ নিজ কাজে ছড়িয়ে পড়। পরস্পরে কথাবার্তা বলার জন্য গৃহে অনড় হয়ে বসে থেকো না। বলা হয়েছে ঃ فَإِذَا طَعِمْتُمْ

فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِيْنَ لِحَدِيْثٍ

মাস'আলা ঃ এই রীতি সেই ক্ষেত্রে, যেখানে খাওয়ার পর দাওয়াতপ্রাপ্তদের বেশীক্ষণ বসে থাকা দাওয়াতকারীর জন্য কষ্টের কারণ হয়; যেমন সে একাজ সেরে অন্য কাজে মশগুল হতে চায় কিংবা তাদেরকে বিদায় দিয়ে অন্য মেহমানদেরকে খাওয়াতে চায়। উভয় অবস্থায় দাওয়াতপ্রাপ্তদের বসে থাকা তার জন্য কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু যেখানে সাধারণ অবস্থা ও নিয়মদৃষ্টে জানা যায় যে, আহারের পর দাওয়াতপ্রাপ্তদের বেশীক্ষণ বসে থাকা দাওয়াতকারীর জন্য কষ্টের কারণ হবে না, সেখানে এই রীতি প্রযোজ্য নয়। আজকালকার দাওয়াতসমূহে তাই প্রচলিত আছে।

আয়াতেও পরবর্তী বাক্য এর প্রমাণ, যাতে বলা হয়েছে ঃ

إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ

অর্থাৎ আহারের পর কথাবার্তায় মশগুল হতে নিষেধ করার কারণ এই যে, এতে রসূলুল্লাহ্ (সা) কষ্ট অনুভব করতেন। কারণ, মেহমানদের খানাপিনার ব্যবস্থা অন্দরমহলে করা হত। সেখানে মেহমানদের বেশীক্ষণ বসে থাকা যে কষ্টের কারণ, তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না।

আয়াতে আরো বলা হয়েছে যে, মেহমানদের এই আচরণে যদিও রসূলুল্লাহ্ (সা) কষ্ট পেতেন; কিন্তু নিজ গৃহের মেহমান হওয়ার কারণে তাদেরকে শিষ্টাচার শিক্ষা দিতে সংকোচ বোধ করতেন। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা সত্য প্রকাশে সংকোচ বোধ করেন না।

মাস'আলা ঃ এই বাক্য থেকে মেহমানদের আদর-আপ্যায়নের যথেষ্ট গুরুত্ব জানা গেল। দাওয়াতের শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়া যদিও রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল; কিন্তু নিজের মেহমান হওয়ার অবস্থায় তিনি তাও মুলতবি রাখেন। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং কোরআনে এই শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন।

দ্বিতীয় বিধান নারীদের পর্দা ঃ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ এতে শানে-নুযূলের বিশেষ ঘটনার ভিত্তিতে বর্ণনা এবং বিশেষভাবে নবী-পত্নীগণের উল্লেখ থাকলেও এ বিধান সমগ্র উম্মতের জন্য ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য। বিধানের সারমর্ম এই যে, নারীদের কাছ থেকে ভিন্ন পুরুষদের কোন ব্যবহারিক বস্তু, পাত্র, বস্ত্র ইত্যাদি নেওয়া জরুরী হলে সামনে এসে নেবে না; বরং পর্দার অন্তরাল থেকে চাইবে। আরও বলা হয়েছে যে, পর্দার এই বিধান পুরুষ ও নারী উভয়ের অন্তরকে মানসিক কুমন্ত্রণা থেকে পবিত্র রাখার উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়েছে।

পর্দার বিশেষ গুরুত্ব ঃ এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, এস্থলে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পুণ্যাত্মা পত্নীগণকে পর্দার বিধান দেওয়া হয়েছে, যাদের অন্তরকে পাক-সাফ রাখার দায়িত্ব আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং গ্রহণ করেছেন। পূর্বোল্লিখিত لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ আয়াতে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

অপরদিকে যে সব পুরুষকে সম্বোধন করে এই বিধান দেওয়া হয়েছে, তারা হলেন রসূলে করীম (সা)-এর সাহাবায়ে কিরাম, যাদের মধ্যে অনেকের মর্যাদা ফেরেশতাগণেরও ঊর্ধ্বে।

কিন্তু এসব বিষয় সত্ত্বেও তাঁদের আন্তরিক পবিত্রতা ও মানসিক কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচার জন্য পুরুষ ও নারীর মধ্যে পর্দার ব্যবস্থা করা জরুরী মনে করা হয়েছে। আজ এমন ব্যক্তি কে, যে তার মনকে সাহাবায়ে কিরামের পবিত্র মন অপেক্ষা এবং তার স্ত্রীর মনকে পুণ্যাত্মা নবী-পত্নীগণের মন অপেক্ষা অধিক পবিত্র হওয়ার দাবি করতে পারে। আর এটা মনে করতে পারে যে, নারীদের সাথে তাদের মেলামেশা কোন অনিষ্টের কারণ হবে না।

আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতরণের হেতু ঃ এসব আয়াতের শানে-নুযূলে কয়েকটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়। এগুলোর মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। ঘটনাবলীর সমষ্টি এ আয়াত অবতরণের হেতু হতে পারে। আয়াতের শুরুতে দাওয়াতের শিষ্টাচার বর্ণিত হয়েছে যে, ডাকা না হলে খাওয়ার জন্য যাবে না এবং খাওয়ার অপেক্ষায় পূর্ব থেকে বসে থাকবে না। ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনা অনুযায়ী এর শানে-নুযূল এই যে, এই আয়াত এমন ভারী ও পরভোজী লোকদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা দাওয়াত ছাড়াই কারও গৃহে যেয়ে খাওয়ার অপেক্ষায় বসে থাকে।

ইমাম আবদ ইবনে হোমায়েদ হযরত আনাস থেকে বর্ণনা করেন, এই আয়াত এমন কতিপয় লোকের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, যারা অপেক্ষায় থাকত এবং খাওয়ার সময় হওয়ার পূর্বে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র গৃহে যেয়ে কথাবার্তায় মশগুল থাকত। অতঃপর আহার্য প্রস্তুত হয়ে গেলে বিনাদ্বিধায় তাতে শরীক হয়ে যেত। আয়াতের শুরুতে উল্লিখিত নির্দেশ তাদের সম্পর্কে জারি করা হয়েছে। এসব বিধান পর্দার বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেকার। তখন সাধারণ পুরুষরা অন্দর মহলে আসা-যাওয়া করত।

পর্দা সম্পর্কিত দ্বিতীয় বিধানের শানে-নুযূল সম্পর্কে ইমাম বুখারী দু'টি রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন। হযরত আনাস (রা)-এর বর্ণিত এক রেওয়ায়েত এই যে, হযরত ওমর (রা) একবার রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে আরয করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্ (সা)! আপনার কাছে সৎ-অসৎ হরেক রকমের লোক আসা-যাওয়া করে, আপনি পত্নীগণকে পর্দা করার আদেশ দিলে খুবই ভাল হত। এর পরিপ্রেক্ষিতে পর্দার আয়াত নাযিল হয়।

বুখারী ও মুসলিমে হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর উক্তি বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ

وافقت ربى فى ثلاث قلت يا رسول الله لو اتخذت فى مقام ابراهيم مصلى فانزل الله تعالى واتخذوا مقام ابراهيم مصلى و قلت يا رسول الله ان نساءك يدخل عليهن البر والفاجر فلو حجبتهن فانزل الله اية

الحجاب و قلت لا زواج النبى صلى الله عليه وسلم لما تما لان عليه فى الغيرة عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن فنزلت كذلك

"আমি আমার পালনকর্তার সাথে তিনটি বিষয়ে একইরূপ মতে পৌঁছেছি—(১) আমি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে এই মর্মে বাসনা প্রকাশ করলাম যে, আপনি মকামে ইবরাহীমকে নামাযের জায়গা করে নিলে ভাল হত। এর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা আদেশ নাযিল করলেন, তোমরা মকামে ইবরাহীমকে নামাযের জায়গা করে নাও। (২) আমি আরয করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ্ (সা)! আপনার পত্নীগণের সামনে সৎ-অসৎ প্রত্যেক ব্যক্তি আসে। আপনি তাদেরকে পর্দার আদেশ দিলে ভাল হত। এর পরিপ্রেক্ষিতে পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হল। (৩) নবী-পত্নীগণের মধ্যে যখন পারস্পরিক আত্মমর্যাদাবোধ ও ঈর্ষা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল, তখন আমি বললাম, যদি রসূলুল্লাহ্ (সা) তোমাদেরকে তালাক দিয়ে দেন, তবে অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের অপেক্ষা উত্তম পত্নী তাকে দান করবেন। অতপর ঠিক এই ভাষায়ই কোরআনের আয়াত অবতীর্ণ হয়ে গেল।"

জ্ঞাতব্য ঃ হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর কথার শিষ্টাচার লক্ষণীয়। তিনি বাহ্যদৃষ্টিতে একথা বলতে চেয়েছিলেন, আমার প্রতিপালক তিনটি বিষয়ে আমার সাথে একই মতে পৌঁছেছেন।

সহীহ্ বুখারীতে হযরত আনাস (রা) বর্ণিত দ্বিতীয় ঘটনা এই যে, হযরত আনাস (রা) বলেন, পর্দার আয়াতের স্বরূপ সম্পর্কে আমি সর্বাধিক জ্ঞাত। কারণ, আমি ছিলাম এ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী। হযরত যয়নব বিনতে জাহাশ (রা) বিবাহের পর বধূবেশে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র গৃহে আগমন করেন এবং গৃহে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাথে উপস্থিত ছিলেন। রসূলুল্লাহ্ (সা) ওলীমার জন্য কিছু খাদ্য প্রস্তুত করান এবং সাহাবায়ে কিরামকে দাওয়াত করেন। খাওয়ার পর কিছু লোক পারস্পরিক কথাবার্তার জন্য সেখানেই অনড় হয়ে বসে রইল। তিরমিযীর রেওয়ায়েতে আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-ও সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং যয়নব (রা)-ও বিদ্যমান ছিলেন। তিনি সংকোচবশত প্রাচীরের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসেছিলেন। লোকজনের এভাবে দীর্ঘক্ষণ বসে থাকার কারণে রসূলুল্লাহ্ (সা) কষ্ট অনুভব করছিলেন। তিনি গৃহ থেকে বের হয়ে অন্য পত্নীদের সাথে সাক্ষাৎ ও সালামের জন্য চলে গেলেন। তিনি ফিরে এসে দেখলেন যে, লোকজন পূর্ববৎ বসে রয়েছে। তাঁকে ফিরে আসতে দেখে তাদের সম্বিৎ ফিরে এল এবং স্থান ত্যাগ করে চলে গেল। রসূলুল্লাহ্ (সা) গৃহে প্রবেশ করে অল্পক্ষণ পরেই পুনরায় বের হয়ে এলেন। আমি সেখানেই উপস্থিত ছিলাম। তিনি পর্দার আয়াত—يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا পাঠ করে শোনালেন, যা তখনই অবতীর্ণ হয়েছিল।

এ ঘটনা বর্ণনা করে হযরত আনাস (রা) বলেন, আমি এসব আয়াত অবতরণের সর্বাধিক নিকটতম ব্যক্তি ছিলাম। আমার সামনেই আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়েছিল।--- (তিরমিযী)

পর্দার আয়াতের শানে-নুযূল সম্পর্কে বর্ণিত উপরোক্ত ঘটনাত্রয়ের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। তিনটি ঘটনাই একত্রে আয়াতসমূহ অবতরণের কারণ হতে পারে।

তৃতীয় বিধান রসূলুল্লাহ্ (সা)-র ওফাতের পর কারও সাথে তাঁর পত্নীগণের বিবাহ বৈধ নয়: وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ -এর পূর্বের বাক্যে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কষ্ট হয়, এমন প্রত্যেক কথা ও কাজ হারাম করা হয়েছিল। অতপর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তাঁর ওফাতের পর তাঁর পত্নীগণের সাথে কারও বিবাহ হালাল নয়।

উপরে বর্ণিত সব বিধানে রসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর পত্নীগণকে সম্বোধন করা হলেও বিধানাবলী সকল উম্মতের জন্যও ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য ছিল। কিন্তু এই সর্বশেষ বিধানটি এরূপ নয়। কেননা, সাধারণ উম্মতের জন্য বিধান এই যে, স্বামীর মৃত্যুর পর ইদ্দত অতিবাহিত হলে স্ত্রী অপরকে বিবাহ করতে পারে। কিন্তু নবী-পত্নীগণের জন্য বিশেষ বিধান এই যে, তাঁরা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র ওফাতের পর কাউকে বিবাহ করতে পারবেন না।

এর কারণ এটাও হতে পারে যে, তাঁরা কোরআনের বর্ণনা অনুযায়ী মু'মিনগণের জননী। তবে তাঁদের জননী হওয়ার প্রভাব তাঁদের আত্মিক সন্তানদের উপর এভাবে প্রতিফলিত হয় না যে, তারা পরস্পর ভ্রাতা-ভগিনী হয়ে একে অপরকে বিবাহ করতে পারবে না। বরং বিবাহের অবৈধতা তাঁদের ব্যক্তিসত্তা পর্যন্ত সীমিত রাখা হয়েছে।

এ রূপ বলাও অবান্তর নয় যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর পবিত্র রওজা শরীফে জীবিত আছেন। তাঁর ওফাত কোন জীবিত স্বামীর আড়াল হয়ে যাওয়ার অনুরূপ। এ কারণেই তাঁর ত্যাজ্য সম্পত্তি বন্টন করা হয়নি এবং এর ভিত্তিতেই তাঁর পত্নীগণের অবস্থা অপরাপর বিধবা নারীদের মত হয়নি।

আরও একটি রহস্য এই যে, শরীয়তের নিয়মানুযায়ী জান্নাতে প্রত্যেক নারী তার সর্বশেষ স্বামীর সাথে অবস্থান করবে। হযরত হুযায়ফা (রা) তাঁর পত্নীকে অসিয়ত করেছিলেন, তুমি জান্নাতে আমার স্ত্রী থাকতে চাইলে আমার পর দ্বিতীয় বিবাহ করো না। কেননা জান্নাতে সর্বশেষ স্বামীই তোমাকে পাবে।---(কুরতুবী)

তাই আল্লাহ্ তা'আলা নবী-পত্নীগণকে পয়গম্বরের পত্নী হওয়ার যে গৌরব ও সম্মান দুনিয়াতে দান করেছেন, পরকালে তা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য তাঁদের বিবাহ অপরের সাথে হারাম করে দিয়েছেন।

এছাড়া কোন স্বামী স্বভাবগতভাবে এটা পছন্দ করে না যে, তার স্ত্রীকে অপরে বিবাহ করুক। কিন্তু এই স্বাভাবিক মনোবাসনা পূর্ণ করা সাধারণ মানুষের জন্য শরীয়তের আইনে জরুরী নয়। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র এই স্বাভাবিক বাসনার প্রতিও আল্লাহ্ তা'আলা সম্মান প্রদর্শন করেছেন। এটা তাঁর বিশেষ সম্মান।

রসূলুল্লাহ্ (সা)-র ইন্তেকাল পর্যন্ত যেসব পত্নী তাঁর অন্দর মহলে ছিলেন, উপরোক্ত বিধান তাঁদের সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এ ব্যাপারে সকল ফিকাহ্বিদ একমত। কিন্তু যাঁদেরকে তিনি তালাক দিয়েছিলেন অথবা অন্য কোন কারণে যারা আলাদা হয়ে গিয়েছিল, তাদের সম্পর্কে ফিকাহ্বিদগণের বিভিন্ন উক্তি আছে। কুরতুবী এসব উক্তি বিস্তারিত লিপিবদ্ধ করেছেন।

إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا —অর্থাৎ রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কোন প্রকার কষ্ট দেওয়া অথবা তাঁর ইন্তিকালের পর তাঁর পত্নীগণকে বিবাহ করা আল্লাহ্ তা'আলার কাছে গুরুতর পাপ।

إِنْ تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا —আয়াতের শেষে পুনরাবৃত্তি করে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা অন্তরের গোপন ইচ্ছা ও চিন্তাধারা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত। তোমরা কোন কিছু গোপন কর বা প্রকাশ কর সবই আল্লাহ্র সামনে প্রকাশমান। এতে জোর দেওয়া হয়েছে, উল্লিখিত বিধানাবলীর ব্যাপারে যেন কোন প্রকার সন্দেহ, সংশয় ও কুমন্ত্রণাকে অন্তরে স্থান না দেওয়া হয় এবং এগুলোর বিরোধিতা থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করা হয়।

আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত বিষয়ত্রয়ের মধ্যে নারীদের পর্দার বিষয়টি কয়েক কারণে বিশদ বর্ণনা সাপেক্ষ। তাই এ সম্পর্কে নিম্নে প্রয়োজনীয় আলোচনা করা হচ্ছে।

পর্দার বিধানাবলী, অশ্লীলতা দমনে ইসলামী ব্যবস্থাঃ অশ্লীলতা, অপকর্ম, ব্যভিচার ও তার প্রাথমিক কার্যাবলীর ধ্বংসাত্মক প্রভাব কেবল ব্যক্তিবর্গকেই নয়; বরং গোত্র, পরিবার এবং মাঝে মাঝে সুবিশাল সাম্রাজ্যকেও ছারখার করে দেয়। অধুনা পৃথিবীতে হত্যা ও লুণ্ঠনের যত সব ঘটনা পরিদৃষ্ট হয়, সঠিকভাবে খোঁজ নিলে দেখা যাবে যে, অধিকাংশ ঘটনার পটভূমিকায় কোন নারী ও যৌন বিকৃতির জাল বিস্তৃত রয়েছে। এ কারণেই পৃথিবীর সৃষ্টিলগ্ন থেকে এ পর্যন্ত সমস্ত জাতি, ধর্ম ও ভূ-খণ্ড এ বিষয়ে একমত যে, এটা একটা মারাত্মক দোষ ও অনিষ্ট।

দুনিয়ার এই শেষ যুগে ইউরোপীয়ান জাতিসমূহ তাদের ধর্মীয় সীমানা এবং প্রাচীন ও শক্তিশালী ঐতিহ্য ভেঙ্গে দিয়ে ব্যভিচারকে সত্তাগতভাবে কোন অপরাধই স্বীকার করে না। তারা সভ্যতা ও সমাজ জীবনকে এমনভাবে গড়ে নিয়েছে, যাতে প্রতি পদক্ষেপে যৌনবিকৃতি ও অশ্লীলতার প্রকাশ্য আবেদন বিদ্যমান আছে। কিন্তু

এর কুফল ও অশুভ পরিণতিকে তারাও অপরাধের তালিকা থেকে বাদ দিতে পারেনি। ফলে বেশ্যাবৃত্তি, বলপূর্বক ধর্ষণ এবং জনসমক্ষে অশালীন কর্মকাণ্ডকে দণ্ডনীয় অপরাধ সাব্যস্ত করতে হয়েছে। এর উদাহরণ এ ছাড়া কিছুই নয় যে, একব্যক্তি অগ্নি সংযোগ করার জন্য খড়ি স্তূপীকৃত করল, অতপর তাতে কেরোসিন ছিটিয়ে দিয়ে অগ্নি সংযোগ করল। এর লেলিহান শিখা যখন উপরে উত্থিত হতে লাগল, তখন এর উপর বিধি-নিষেধ আরোপ করতে ও একে নিবৃত্ত করতে তৎপর হয়ে উঠল।

এর বিপরীতে ইসলাম যে সব বিষয়কে দোষ এবং মানবতার জন্য ক্ষতিকর সাব্যস্ত করে শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য করেছে, সেগুলোর প্রাথমিক কার্যাবলীর উপরও বিধি-নিষেধ আরোপ করেছে এবং সেগুলোকে নিষিদ্ধ করেছেন। এ ব্যাপারে ব্যভিচার ও অপকর্ম থেকে রক্ষা করাই আসল উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু একে দৃষ্টি নত রাখার আইন দ্বারা শুরু করেছে। নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা নিষিদ্ধ করেছে। নারীদেরকে গৃহাভ্যন্তরে থাকার আদেশ দিয়েছে। প্রয়োজনে বাইরে যাওয়ার সময়ও বোরকা অথবা লম্বা চাদর দ্বারা দেহ আবৃত করে বের হওয়ার এবং সড়কের কিনারা ধরে চলার নির্দেশ দিয়েছে। সুগন্ধি লাগিয়ে অথবা শব্দ হয় এমন অলংকার পরিধান করে বের হতে নিষেধ করেছে। অতপর যে ব্যক্তি এসব সীমানা ও বাধা ডিঙ্গিয়ে বের হয়ে পড়ে, তার জন্য এমন কঠোর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করেছে, যা একবার কোন পাপিষ্ঠের উপর প্রয়োগ করা হলে সমগ্র জনগোষ্ঠীর জন্য সবক হয়ে যায়।

ইউরোপীয়ানরা এবং তাদের অনুসারীরা অশ্লীলতার বৈধতা সপ্রমাণ করার জন্য নারীদের পর্দাকে তাঁদের স্বাস্থ্যহানি ও অর্থনৈতিক ক্ষতির কারণরূপে অভিহিত করে। তারা বেপর্দা থাকার উপকারিতা নিয়ে নানা কূটতর্কের অবতারণা করেছে। তাদের বিস্তারিত জওয়াব আলিমগণ বড় বড় পুস্তকে লিপিবদ্ধ করেছেন। এ সম্পর্কে এখানে এতটুকু বুঝে নেওয়াও যথেষ্ট যে, উপকারিতা ও ফায়দা থেকে তো কোন অপরাধ ও পাপ কর্মই মুক্ত নয়। চুরি, ডাকাতি, প্রতারণা এক দিক দিয়ে খুবই লাভ-জনক কারবার। কিন্তু যখন এর মারাত্মক ফলাফল ও পরিণতির ধ্বংসকারিতা সামনে আসে, তখন কোন ব্যক্তি এগুলোকে লাভজনক কারবার বলার ধৃষ্টতা দেখায় না। বেপর্দা থাকার মধ্যে কিছু অর্থনৈতিক উপকারিতা থাকলেও যখন এটা সমগ্র দেশ ও জাতিকে হাজারো বিপর্যয়ের সম্মুখীন করে দেয়, তখন একে উপকারী বলা কোন জ্ঞানী লোকের কাজ হতে পারে না।

অপরাধ দমনের জন্য ইসলামে উৎসমুখ বন্ধ করার সুবর্ণনীতি এবং এতে সমতা বিধান ঃ তওহীদ, রিসালত ও পরকাল ইত্যাদি মৌলিক বিশ্বাস যেমন সকল পয়গম্বরের শরীয়তে অভিন্ন ও সর্বসম্মত ছিল, তেমনি সাধারণ পাপকর্ম, অশ্লীলতা ও গর্হিত কার্যাবলী প্রত্যেক শরীয়তে ও ধর্মে হারাম করা হয়েছিল। কিন্তু পূর্ববর্তী শরীয়তসমূহে এগুলোর কারণ ও উপায় উপকরণাদিকে সর্বাবস্থায় হারাম করা হয়নি। যে পর্যন্ত এগুলোর মাধ্যমে কোন অপরাধ বাস্তবরূপ লাভ না করত, সেই পর্যন্ত এগুলো হারাম ছিল না।

কিন্তু শরীয়তে মুহাম্মদী হচ্ছে কিয়ামত পর্যন্ত কার্যকরী শরীয়ত। তাই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এর হিফাযতের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা এই নেওয়া হয়েছে যে, অপরাধ ও পাপকর্ম তো হারাম আছেই; সেসব কারণ ও উপায়-উপকরণাদিকেও হারাম করে দেওয়া হয়েছে, যেগুলো স্বভাবসিদ্ধভাবে মানুষকে এসব অপরাধের দিকে পৌঁছিয়ে দেয়। উদাহরণত মদ্যপান হারাম করার সাথে সাথে মদ তৈরী করা, ক্রয়-বিক্রয় করা এবং কাউকে দেওয়াও হারাম করা হয়েছে। সুদ হারাম করার জন্য সুদের সাথে সামঞ্জস্যশীল লেনদেনও হারাম করা হয়েছে। এ কারণে ফিকাহ্‌বিদগণ অনুমোদিত কাজ-কারবার থেকে অর্জিত মুনাফাকেও সুদের ন্যায় অপকৃষ্ট সম্পদ আখ্যা দিয়েছেন। শিরক ও প্রতিমা পূজাকে কোরআন মহা অন্যায় ও ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ সাব্যস্ত করার সাথে সাথে এর কারণ ও উপকরণাদির উপরও কড়া বিধিনিষেধ আরোপ করেছে। সূর্যের উদয়, অস্ত ও মধ্যগগনে থাকার সময় মুশরিকরা সূর্যের পূজা করত। এসব সময়ে নামায পড়া হলেও সূর্যপূজারীদের সাথে এক প্রকার সাদৃশ্য হয়ে যেত। অতপর এই সাদৃশ্য কোন সময় নামাযী ব্যক্তির শিরকে লিপ্ত হওয়ার কারণ হতে পারত। তাই শরীয়ত এসব সময়ে নামায ও সিজদা হারাম ও নাজায়েয করে দিয়েছে। প্রতিমা, মূর্তি ও চিত্র মূর্তিপূজার নিকটবর্তী উপায়। তাই মূর্তি নির্মাণ ও চিত্র তৈরী হারাম এবং এগুলোর ব্যবহার নাজায়েয করে দেওয়া হয়েছে।

অনুরূপভাবে শরীয়ত ব্যভিচারকে হারাম করার সাথে সাথে তার সমস্ত নিকটবর্তী কারণ ও উপায়কেও হারামের তালিকাভুক্ত করে দিয়েছে। কোন বেগানা নারী অথবা শ্মশ্রুবিহীন কিশোর বালকের প্রতি কাম দৃষ্টিতে দেখাকে চোখের যিনা, তার কথা শুনাকে কানের যিনা, তাকে স্পর্শ করাকে হাতের যিনা এবং তার উদ্দেশ্যে পথ চলাকে পায়ের যিনা সাব্যস্ত করেছে। সহীহ্ হাদীসে তদ্রূপই বলা হয়েছে। এহেন অপরাধ থেকে রক্ষা করার জন্য নারীদের পর্দার বিধানাবলী অবতীর্ণ হয়েছে।

কিন্তু নিকটবর্তী ও দূরবর্তী কারণ ও উপকরণাদির এক দীর্ঘ পরম্পরা রয়েছে। অধিক দূর পর্যন্ত এই পরম্পরাকে নিষিদ্ধ করা হলে মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়বে এবং কাজকর্মে খুব অসুবিধা দেখা দেবে। এটা এই শরীয়তের মেযাজের বিপরীত। এ সম্পর্কে কোরআন পাকের খোলাখুলি নির্দেশ এই যে, مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ অর্থাৎ ধর্মের কাজে তোমাদের প্রতি কোন সংকীর্ণতা আরোপ করা হয়নি। তাই কারণ ও উপকরণাদির ক্ষেত্রে বিজ্ঞজনোচিত ফয়সালা এই যে, যে সব কাজকর্ম করলে মানুষ সাধারণ অভ্যাসের দিক দিয়ে অবশ্যই পাপকর্মে লিপ্ত হয়ে পড়ে, শরীয়ত সেসব নিকটবর্তী কারণকে আসল পাপকর্মের সাথে সংযুক্ত করে হারাম করে দিয়েছে। পক্ষান্তরে যেসব দূরবর্তী কারণ কার্যে পরিণত করলে মানুষের পাপকার্যে লিপ্ত হওয়া স্বভাবত অপরিহার্য ও জরুরী হয় না, কিন্তু পাপ কাজে সেগুলোর কিছু না কিছু দখল আছে, শরীয়ত এ ধরনের কারণ ও উপকরণাদিকে মকরূহ ও গর্হিত

সাব্যস্ত করেছে। আর যেসব কারণ আরও দূরবর্তী এবং পাপকর্মে যেগুলোর প্রভাব বিরল, শরীয়ত সেগুলোকে উপেক্ষা করেছে এবং মোবাহ্ তথা অনুমোদিত বিষয়াদির অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছে।

প্রথমোক্ত কারণের উদাহরণ মদ্য বিক্রয়। এটা মদ্যপানের নিকটবর্তী কারণ। ফলে শরীয়ত একেও মদ্যপানের অনুরূপ হারাম সাব্যস্ত করেছে। কোন বেগানা নারীকে কামভাব সহকারে স্পর্শ করা সাক্ষাৎ যিনা না হলেও যিনার নিকটবর্তী কারণ। তাই শরীয়ত একে যিনার ন্যায় হারাম করেছে।

দ্বিতীয় কারণের উদাহরণ এমন ব্যক্তির কাছে আঙ্গুর বিক্রয় করা, যার সম্পর্কে জানা আছে যে, সে আঙ্গুর দ্বারা মদ তৈরী করে এবং এটাই তার পেশা। অথবা সে পরিষ্কার বলে দিয়েছে যে, এই আঙ্গুর দ্বারা মদ তৈরী করা হবে। এটা মদ্য বিক্রয়ের অনুরূপ হারাম না হলে মকরূহ ও গর্হিত কাজ। সিনেমাগৃহ নির্মাণ অথবা সুদের ব্যাংক পরিচালনার জন্য জমি ও গৃহ ভাড়া দেওয়ার বিধানও তাই। লেনদেনের সময় যদি জানা যায় যে, গৃহটি নাজায়েয কাজের জন্য ভাড়া নেওয়া হচ্ছে, তবে এই ভাড়া দেওয়া মকরূহ তাহ্রীমী ও নাজায়েয।

তৃতীয় কারণের উদাহরণ সাধারণ ক্রেতাদের কাছে আঙ্গুর বিক্রয় করা। এক্ষেত্রে এটাও সম্ভবপর যে, কেউ এ আঙ্গুর দ্বারা মদ তৈরী করবে। কিন্তু সে তা প্রকাশ করেনি এবং বিক্রেতাও তা জানে না। শরীয়তের আইনে এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয় মোবাহ্ ও বৈধ।

এখানে স্মরণ রাখা জরুরী যে, শরীয়ত যেসব কাজকে পাপকর্মের নিকটবর্তী কারণ (প্রথম শ্রেণীর কারণ) সাব্যস্ত করে হারাম করেছে, অতপর সেগুলো সকলের জন্য সর্বাবস্থায় হারাম। পাপকর্মের কারণ বাস্তবে হোক বা না হোক। এখন তা শরীয়তের এমন স্বতন্ত্র বিধান, যার বিরুদ্ধাচরণ হারাম।

এই ভূমিকার পর এখন বুঝুন, নারীদের পর্দাও এই উপকরণাদি বন্ধ করার নীতির উপর ভিত্তিশীল। কারণ, পর্দা না করা পাপকর্মে লিপ্ত হওয়ার কারণ ও উপায়। এতেও কারণাদির পূর্ববর্ণিত প্রকারসমূহের বিধানাবলী প্রযোজ্য হবে। উদা-হরণত কোন যুবক পুরুষের সামনে যুবতী নারীর দেহ অনাবৃত রাখা পাপকর্মে লিপ্ত হওয়ার নিকটবর্তী কারণ। অধিকাংশ অভ্যাসের দিকে লক্ষ্য করলে এতে পাপকর্ম সংঘটিত হয়ে যাওয়া অপরিহার্যের মতই। তাই শরীয়তের আইনে এটা যিনার অনুরূপ হারাম। কারণ, শরীয়ত এ কাজকে অশ্লীল সাব্যস্ত করেছে। ফলে এখন তা সর্বাবস্থায় হারাম, যদিও তা কোন নিষ্পাপ ব্যক্তির সাথে হয় অথবা এমন ব্যক্তির সাথে, যে আত্ম-সংযমের মাধ্যমে পাপকর্ম থেকে বেঁচে থাকবে। চিকিৎসা ইত্যাদি প্রয়োজনের কারণে অঙ্গ খোলার বৈধতা আলাদা বিষয়। এর কারণে মূল অবৈধতার উপর কোন বিরূপ

প্রতিক্রিয়া হয় না। এ বিষয়টি সময় ও পরিস্থিতি দ্বারাও প্রভাবান্বিত হয় না। ইসলামের প্রাথমিক যুগেও এর বিধান তাই ছিল, যা আজ পাপাচার ও অনাচারের যুগে রয়েছে।

পর্দা বর্জনের দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে গৃহের চতুঃপ্রাচীরের বাইরে বোরকা অথবা লম্বা চাদর দ্বারা সমগ্র দেহ আবৃত করে বের হওয়া। এটা পাপ কর্মের দূরবর্তী কারণ, এর বিধান এই যে, এরূপ করা বাস্তবে অনর্থের কারণ হলে নাজায়েয এবং যে ক্ষেত্রে অনর্থের ভয় নেই; সেখানে জায়েয। এ কারণেই এর বিধান সময় ও পরিস্থিতির পরিবর্তনে পরিবর্তিত হতে পারে। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র যুগে নারীদের এভাবে বের হওয়া কোন অনর্থের কারণ ছিল না। তাই তিনি নারীদেরকে বোরকা ইত্যাদিতে আবৃত হয়ে মসজিদে আসার কতিপয় শর্ত সহকারে অনুমতি দিয়েছিলেন এবং তাদেরকে মসজিদে আগমনে বাধা দিতে নিষেধ করেছিলেন। তবে সে যুগেও নারীদেরকে গৃহে নামায পড়ার জন্য তিনি উৎসাহিত করতেন। কারণ, মসজিদে আসা অপেক্ষা গৃহে নামায পড়া তাদের জন্য অধিক সওয়াবের কাজ। অনর্থের ভয় না থাকার কারণে তখন তাদেরকে মসজিদে আসতে নিষেধ করা হত না। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র ওফাতের পর সাহাবায়ে কিরাম লক্ষ্য করলেন যে, এখন নারীদের মসজিদে আগমন অনর্থমুক্ত নয়; যদিও তারা বোরকা, চাদর ইত্যাদি পরিধান করে আসে। ফলে তারা সর্ব-সম্মতিক্রমে নারীদেরকে মসজিদের জামা'আতে আগমন করতে নিষেধ করেছেন। হযরত আয়েশা (রা) বলেন : রসূলুল্লাহ্ (সা) বর্তমান পরিস্থিতি দেখলে নারীদের অবশ্যই মসজিদে আসতে বারণ করতেন। এ থেকে জানা গেল যে, সাহাবায়ে কিরামের ফয়-সালা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র ফয়সালা থেকে ভিন্নতর নয়; বরং তিনি যে সব শর্তের অধীনে অনুমতি দিয়েছিলেন, সেগুলোর অনুপস্থিতির কারণেই বিধান পাল্টে গেছে।

কোরআন পাকের সাতটি আয়াতে নারীদের পর্দার বিষয় বর্ণিত হয়েছে। তিনটি আয়াত সূরা নূরে পূর্বেই বিবৃত হয়েছে। আলোচ্য সূরা আহযাবের চারটি আয়াতের মধ্যে একটি আগে উল্লিখিত হয়েছে, একটি আলোচনাধীন আছে এবং অবশিষ্ট দু'টি আয়াত পরে আসবে। এসব আয়াতে পর্দার স্তর নির্ধারণ, বিধি-বিধানের পূর্ণ বিবরণ এবং ব্যতিক্রম সমূহের বিশদ বর্ণনা রয়েছে। এমনিভাবে পর্দা সম্বন্ধে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র উক্তি ও কর্ম সম্বলিত সত্তরটিরও অধিক হাদীস বর্ণিত আছে।

পর্দার হুকুম প্রসঙ্গ : নারী ও পুরুষের অবাধ মেলামেশা পৃথিবীর সমগ্র ইতি-হাসে হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে শেষ নবী (সা) পর্যন্ত কোন যুগেই বৈধ মনে করা হয়নি। কেবল শরীয়ত অনুসারীরাই নয় পৃথিবীর সাধারণ অভিজাত পরিবার-সমূহেও এ ধরনের মেলামেশার সুযোগ দেওয়া হয় না।

হযরত মূসা (আ)-র কাহিনীতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাঁর মাদইয়ান সফরের সময় দু'জন যুবতী তাদের ছাগপালকে পানি পান করানোর জন্য দূরে দাঁড়িয়ে ছিল। এর কারণ এটাই বলা হয়েছে যে, তারা পুরুষদের ভিড়ে প্রবেশ করা পছন্দ করেনি এবং সকলের পর অবশিষ্ট পানি পান করাতেই সম্মত হয়েছে। হযরত যয়নব

বিন্‌তে জাহ্‌শের বিবাহের সময় পর্দার প্রথম আয়াত নাযিল হয়েছিল। আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বেও তিরমিযীর রেওয়ায়েতে তাঁর গৃহে বসার অবস্থা সম্পর্কে বলা হয়েছে وهى مولية وجهها الى الحائط অর্থাৎ তিনি প্রাচীরের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসেছিলেন।

এ থেকে জানা গেল যে, পর্দার হুকুম অবতরণের পূর্বেও নারীপুরুষের অবাধ মেলামেশা এবং যত্রতত্র সাক্ষাৎ ও কথাবার্তার প্রচলন অভিজাত ও সাধু লোকদের মধ্যে কোথাও ছিল না। কোরআন পাকে যে মূর্খতা যুগ (জাহিলিয়াতে উলা) এবং তাতে নারীদের খোলামেলা চলাফেরা (তাবাররুজ) বর্ণিত আছে, তা-ও আরবের অভিজাত পরিবারসমূহে নয়; বরং দাসী ও যাযাবর ধরনের নারীদের মধ্যে ছিল। আরবের সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোকেরা একে দূষণীয় মনে করত। আরবের ইতিহাসই এর সাক্ষী। ভারতবর্ষে হিন্দু, বৌদ্ধ ও অন্যান্য মুশরিক ধর্মাবলম্বীর মধ্যেও নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা পছন্দনীয় ছিল না। পুরুষদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করার দাবি, বাজার ও সড়কে প্যারেড করা, শিক্ষাক্ষেত্র থেকে শুরু করে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের দ্বিধাহীন মেলামেশা এবং নিমন্ত্রণে ঐ ক্লাবসমূহে দেখাসাক্ষাতের বর্তমান কার্যধারা কেবল ইউরোপীয় জাতিসমূহের বেহায়াপনা ও অশ্লীলতার ফসল। এতে এসব জাতিও তাদের অতীত ঐতিহ্যকে বিসর্জন দিয়ে জড়িয়ে পড়েছে। প্রাচীনকালে তাদের মধ্যেও এরূপ অবস্থা ছিল না। আল্লাহ্ তা'আলা নারীর দৈহিক গঠন প্রকৃতিকে যেমন পুরুষ থেকে স্বতন্ত্র করে সৃষ্টি করেছেন, তেমনি তার মন-মস্তিষ্কে স্বভাবগত লজ্জাও নিহিত রেখেছেন, যা তাকে স্বভাবগতভাবে পুরুষ থেকে আলাদা থাকতে এবং আবৃত হয়ে চলতে বাধ্য করে। এই স্বভাবসিদ্ধ ও মজ্জাগত লজ্জা-শরম সৃষ্টির শুরু থেকে নারী ও পুরুষের মধ্যে শালীনতার প্রাচীর হয়ে বিদ্যমান রয়েছে। ইসলামের প্রাথমিক যুগেও এই প্রকার পর্দাই প্রচলিত ছিল।

নারীদের স্থান গৃহের চতুঃপ্রাচীর এবং কোন শরীয়তসম্মত কারণে বাইরে গেলে সম্পূর্ণ দেহ আবৃত করে বাইরে যেতে হবে---নারীদের এই বিশেষ প্রকারের পর্দা হিজরতের পর পঞ্চম হিজরীতে প্রবর্তিত হয়েছে।

এর বিবরণ এই যে, আলিমগণের ঐকমত্যে পর্দা সম্পর্কে প্রথম আয়াত হচ্ছে لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ যা উপরে উল্লিখিত হয়েছে। এ আয়াত হযরত যয়নব বিন্‌তে জাহ্‌শের বিবাহ ও তার পতিগৃহে আগমনের সময় অবতীর্ণ হয়েছে। এই বিবাহের তারিখ সম্পর্কে হাফেজ ইবনে হাজার 'এসাবা' গ্রন্থে এবং ইবনে আবদুল বার 'এস্তিয়াব' গ্রন্থে তৃতীয় হিজরী অথবা পঞ্চম হিজরী উভয় প্রকার উক্তি বর্ণনা করেছেন। ইবনে কাসীরের মতে পঞ্চম হিজরীর উক্তি অগ্রগণ্য। ইবনে সা'দ হযরত আনাস (রা) থেকেও পঞ্চম হিজরী বর্ণনা করেছেন এবং হযরত আয়েশা (রা)-র কতক রেওয়ায়েত থেকেও তাই জানা যায়।

এ আয়াতে নারীদেরকে পর্দার অন্তরালে থাকার আদেশ দেওয়া হয়েছে এবং পুরুষকে বলা হয়েছে যে, তারা নারীদের কাছে কোন কিছু চাইলে পর্দার অন্তরাল থেকে চাইবে। এতে পর্দার গুরুত্ব জানা যায় যে, বিনা প্রয়োজনে পুরুষ ও নারী আলাদাই থাকবে এবং প্রয়োজনে পর্দার অন্তরাল থেকে কথা বলতে হবে।

কোরআন পাকে পর্দার বিবরণ সম্বলিত সাতটি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে---চারটি সূরা আহযাবে এবং তিনটি পূর্বে বর্ণিত সূরা নূরে। এ ব্যাপারে সকলেই একমত যে, لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ اِلَّا اَنْ يُّؤْذَنَ لَكُمْ আয়াতটিই পর্দা সম্পর্কিত সর্বপ্রথম আয়াত। সূরা নূরের তিন আয়াত এবং সূরা আহযাবে وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ আয়াত যদিও কোরআনের ক্রমিকে প্রথমে ; কিন্তু অবতরণের দিক দিয়ে পশ্চাতে। সূরা আহযাবের প্রথম আয়াতে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, এই আদেশ তখন দেওয়া হয়েছিল, যখন নবী-পত্নীগণকে দুনিয়ার ধনৈশ্বর্য অথবা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সংসর্গ---এ দু'য়ের যে কোন একটি বেছে নেওয়ার ইখতিয়ার দেওয়া হয়েছিল।

এ ঘটনায় আরও উল্লেখ আছে যে, যাদেরকে এই ইখতিয়ার দেওয়া হয়েছিল, তাদের মধ্যে হযরত যয়নব বিন্‌তে জাহ্‌শও ছিলেন। এ থেকে বোঝা গেল যে, তাঁর বিবাহ এই আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বেই হয়েছিল। এমনিভাবে সূরা নূরের আয়াত-সমূহও এরপর অপবাদ রটনার ঘটনা সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল, যা বনি মুস্তালিক অথবা মুরাইসী যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে সংঘটিত হয়েছিল। এ যুদ্ধ ষষ্ঠ হিজরীতে সংঘটিত হয়। অপর দিকে পর্দার বিধান হযরত যয়নব (রা)-এর বিবাহে আয়াত নাযিল হওয়ার সাথে সাথে কার্যকর হয়।

গুপ্তাঙ্গ আবৃত করার বিধান ও পর্দার মধ্যে পার্থক্য ঃ পুরুষ ও নারীদেহের সেই অংশ যাকে আরবীতে 'আওরাত' এবং উর্দুতে 'সতর' বলা হয়, তা সকলের কাছে গোপন করা শরীয়তগত, স্বভাবগত ও যুক্তিগতভাবে ফরয। ঈমানের পর সর্ব প্রথম করণীয় ফরয হচ্ছে এই গুপ্তাঙ্গ আবৃত করা। সৃষ্টির শুরু থেকেই এটা ফরয এবং সকল পয়গম্বরের শরীয়তে তা ফরয ছিল, বরং শরীয়তসমূহের অস্তিত্বের পূর্বেও জান্নাতে যখন নিষিদ্ধ বৃক্ষ ভক্ষণের কারণে হযরত আদম (আ)-এর জান্নাতী পোশাক খুলে যাওয়ায় গুপ্তাঙ্গ প্রকাশ হয়ে পড়ল, তখন সেখানেও আদম (আ) গুপ্তাঙ্গ খোলা রাখা বৈধ মনে করেন নি। তাই আদম ও হাওয়া উভয়ে জান্নাতের পাতা গুপ্তাঙ্গের উপর বেঁধে নেন। وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ আয়াতের অর্থও তাই। দুনিয়াতে আগমনের পর আদম (আ) থেকে শুরু করে শেষ নবী (সা) পর্যন্ত প্রত্যেক পয়গম্বরের শরীয়তে গুপ্তাঙ্গ আবৃত করা ফরয রয়েছে। গুপ্তাঙ্গ

নির্দিষ্টকরণে মতভেদ হতে পারে; কিন্তু আসল ফরয সকল শরীয়তে স্বীকৃত ছিল। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেক মানুষের উপর এটা ফরয, কেউ দেখুক অথবা না দেখুক। এ কারণে প্রয়োজনীয় বস্ত্র থাকা সত্ত্বেও যদি কেউ অন্ধকার রাত্রিতে উলঙ্গ হয়ে নামায পড়ে, তবে এ নামায সর্বসম্মতিক্রমে নাজায়েয; অথচ তাকে কেউ উলঙ্গ অবস্থায় দেখে না। (বাহরুর রায়েক) অনুরূপভাবে কেউ দেখে না, এরূপ নির্জন জায়গায় নামায পড়লে যদি গুপ্তাঙ্গ খুলে যায়, তবে নামায ফাসেদ হয়ে যাবে।

নামাযের বাইরে মানুষের সামনে গুপ্তাঙ্গ আবৃত করা যে ফরয, এ ব্যাপারে কারও দ্বিমত নেই; কিন্তু নির্জনতায়ও শরীয়ত সিদ্ধ অথবা স্বভাবসিদ্ধ প্রয়োজন ব্যতিরেকে গুপ্তাঙ্গ খুলে বসা জায়েয নয়। এটাই বিশুদ্ধ উক্তি।---(বাহ্‌র)

এ হচ্ছে গুপ্তাঙ্গ আবৃত করার বিধান, যা ইসলামের শুরু থেকে বরং সৃষ্টির প্রথম লগ্ন থেকে ফরয এবং এতে নারী-পুরুষ উভয়ই সমান। প্রকাশ্য ও নির্জনতায়ও সমান ফরয।

কিন্তু পর্দা এই যে, নারীরা বেগানা পুরুষের দৃষ্টির আড়ালে থাকবে। এ ব্যাপারেও এতটুকু বিষয় সকল পয়গম্বর, সজ্জন ও অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে সমভাবে স্বীকৃত ছিল যে, বেগানা পুরুষদের সাথে নারীদের অবাধ মেলামেশা হতে পারে না। কোরআনে উল্লিখিত হযরত শোয়াইব (আ)-এর কন্যাদ্বয়ের উপরে বর্ণিত ঘটনা থেকে জানা যায় যে, সে যুগে এবং তাঁর শরীয়তেও নারী-পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলা এবং অবাধ মেলামেশা পছন্দনীয় ছিল না। পুরুষদের সাথে মেলামেশা জরুরী হয়, এমন কোন কাজই নারীদেরকে সোপর্দ করা হত না। মোট কথা, এ থেকে জানা যায় যে, নারীদেরকে নিয়মিত পর্দায় থাকার আদেশ সে যুগে ছিল না। অনুরূপভাবে ইসলামের প্রাথমিক যুগেও এরূপ আদেশ ছিল না। তৃতীয় অথবা পঞ্চম হিজরীতে নারীদের উপর এই পর্দা ফরয করা হয়েছে।

এ থেকে জানা গেল যে, গুপ্তাঙ্গ আবৃত করা এবং পর্দা করা দু'টি আলাদা আলাদা বিষয়। গুপ্তাঙ্গ আবৃত করা চিরন্তন ফরয এবং পর্দা পঞ্চম হিজরীতে ফরয হয়েছে। গুপ্তাঙ্গ আবৃত করা নারী-পুরুষ উভয়ের উপর ফরয এবং পর্দা কেবল নারীদের উপর ফরয। গুপ্তাঙ্গ আবৃত করা প্রকাশ্যে ও নির্জনে সর্বাবস্থায় ফরয এবং পর্দা কেবল বেগানা পুরুষদের উপস্থিতিতে ফরয। এই বিবরণ লিপিবদ্ধ করার কারণ এই যে, উভয় বিষয়কে মিশ্রিত করে দেওয়ার কারণে কোরআনের বিধানাবলী বোঝার ক্ষেত্রে অনেক সন্দেহ দেখা দেয়। উদাহরণত নারীর মুখমণ্ডল ও হাতের তালু সকলের মতেই গুপ্তাঙ্গ বহির্ভূত। তাই নামাযে এগুলো খোলা থাকলে নামায সকলের মতেই জায়েয। এ দু'টি অঙ্গ কোরআন হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ীই ব্যতিক্রমভুক্ত। ফিকাহ্‌বিদগণ কিয়াসের মাধ্যমে পদযুগলকেও এগুলোর অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

কিন্তু বেগানা পুরুষের কাছে পর্দার ক্ষেত্রেও মুখমণ্ডল এবং হাতের তালু ব্যতিক্রমভুক্ত কি না, এ ব্যাপারে মতভেদ আছে। সূরা নূরের لَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا আয়াতে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

শরীয়তসম্মত পর্দার স্তর ও বিধানাবলীর বিবরণ ঃ পর্দা সম্পর্কে কোরআন পাকের সাতটি আয়াত ও সত্তরটি হাদীসের সারকথা এই যে, শরীয়তের আসল কাম্য ব্যক্তি-পর্দা অর্থাৎ নারী সত্তা ও তাদের গতিবিধি পুরুষের দৃষ্টি থেকে গোপন থাকা। এটা গৃহের চতুঃপ্রাচীর অথবা তাঁবু ও ঝুলন্ত পর্দার মাধ্যমে হতে পারে। এছাড়া পর্দার যত প্রকার বর্ণিত রয়েছে, সবগুলো প্রয়োজনের ভিত্তিতে এবং প্রয়োজনের সময় ও পরিমাণের সাথে শর্তযুক্ত।

এভাবে ব্যক্তি-পর্দা হচ্ছে পর্দার প্রথম স্তর; যা শরীয়তের আসল কাম্য এবং যার অর্থ নারীদের গৃহে অবস্থান করা। কিন্তু ইসলামী শরীয়ত একটি সর্বাঙ্গীন ও পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা বিধান এতে মানব প্রয়োজনের সকল দিকই বিবেচিত হয়েছে। বলাবাহুল্য, নারীদের গৃহ থেকে বের হওয়ার প্রয়োজন দেখা দেওয়া অবশ্যম্ভাবী। এর জন্য পর্দার দ্বিতীয় স্তর কোরআন ও সুন্নাহ্র দৃষ্টে এরূপ মনে হয় যে, নারীরা আপাদমস্তক বোরকা অথবা লম্বা চাদরে আবৃত করে বের হবে। পথ দেখার জন্য চাদরের ভিতর থেকে একটি চক্ষু খোলা রাখবে অথবা বোরকায় চোখের সামনে জালি ব্যবহার করবে। প্রয়োজনের ক্ষেত্রে পর্দার এই দ্বিতীয় স্তরের ব্যাপারেও আলিম ও ফিকাহ্বিদগণ একমত।

কতক রেওয়ায়েত থেকে পর্দার তৃতীয় একটি স্তরও জানা যায়, যাতে সাহাবী, তাবেয়ী ও ফিকাহ্বিদগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেন। তা এই যে, নারীরা যখন প্রয়োজনে গৃহ থেকে বের হবে, তখন মুখমণ্ডল এবং হাতের তালুও মানুষের সামনে খুলতে পারবে যদি দেহ আবৃত থাকে। পর্দার এই স্তরত্রয়ের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হল ঃ

প্রথম স্তর গৃহের মাধ্যমে ব্যক্তি-পর্দা ঃ কোরআন ও সুন্নাহর দৃষ্টিতে এ স্তরই আসল কাম্য। সূরা আহযাবের আলোচ্য وَاِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَاسْئَلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَاءِ حِجَابٍ আয়াত এর উজ্জ্বল প্রমাণ। আরও উজ্জ্বল প্রমাণ হচ্ছে এ সূরারই শুরুর আয়াত। وَقَرْنَ فِىْ بُيُوْتِكُنَّ এসব আয়াতের নির্দেশ রসূলুল্লাহ্ (সা) যেভাবে বাস্তবায়িত করেছেন, তাতে বিষয়টি আরও স্পষ্টরূপে সামনে এসে যায়।

উপরে বলা হয়েছে যে, পর্দা সম্পর্কে প্রথম আয়াত হযরত যয়নব (রা)-এর বিবাহের সময় অবতীর্ণ হয়েছে। হযরত আনাস (রা) বলেন, আমি তখন রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে উপস্থিত ছিলাম। ফলে পর্দার এই ঘটনা আমি সর্বাধিক জ্ঞাত আছি। আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রসূলুল্লাহ্ (সা) পুরুষদের সামনে একটি চাদর টাঙিয়ে হযরত যয়নব (রা)-কে তার ভেতরে আবৃত করে দেন---বোরকা অথবা চাদরে আবৃত করেন নি। শানে নুযূলের ঘটনায় হযরত উমর (রা)-এর যে উক্তি উপরে বর্ণিত হয়েছে, তা থেকেও জানা যায় যে, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল নবী-পত্নীগণ পুরুষদের দৃষ্টি থেকে দূরে অন্দর মহলে থাকুন। তাঁর يدخل عليك البر و الفاجر বাক্যের মর্ম তা-ই।

সহীহ্ বুখারীতে হযরত আয়েশা (রা)-র রেওয়ায়েত মুতা যুদ্ধ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে, হযরত যায়েদ ইবনে হারিসা, জাফর ও আবদুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহা (রা)-র শাহাদাতের সংবাদ যখন মদীনায় পেঁ ৗছে, তখন রসূলুল্লাহ্ (সা) মসজিদে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর চোখেমুখে তীব্র দুঃখ ও কষ্টের চিহ্ন পরিস্ফুট ছিল। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি গৃহের ভিতর থেকে দরজার এক ছিদ্র দিয়ে এই দৃশ্য অবলোকন করছিলাম।

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, হযরত আয়েশা (রা) এই বিপত্তির সময়ও বোরকা পরিধান করত বাইরে এসে সমাবেশে যোগদান করেন নি; বরং দরজার ছিদ্র দিয়ে সভাস্থল পরিদর্শন করেন।

'বুখারী কিতাবুল মাগাযী' 'ওমরাতুল কাযা' অধ্যায়ে হযরত আয়েশা (রা) ভগ্নীপুত্র ওরওয়া ইবনে যুবায়ের ও আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা মসজিদে নববীতে হযরত আয়েশা (রা)-র কক্ষের বাইরে নিকটবর্তী স্থানে উপস্থিত ছিলেন এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-র ওমরা সম্পর্কে পরস্পরে বাক্যালাপ করছিলেন। ইবনে উমর (রা) বললেন, ইতিমধ্যে আমরা হযরত আয়েশা (রা)-র মেসওয়াক করার ও গলা সাফ করার আওয়াজ কক্ষের ভিতর থেকে শুনতে পেলাম। এ রেওয়ায়েত থেকেও জানা যায় যে, পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর নবী-পত্নীগণ গৃহে থেকে পর্দা করার নীতি অবলম্বন করেছিলেন।

অনুরূপভাবে বুখারীর তায়েফ যুদ্ধ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) পানির এক পাত্রে কুলি করে আবূ মূসা আশআরী ও বেলাল (রা)-কে তা পান করতে ও মুখমণ্ডলে লাগাতে দিলেন। উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালমা (রা) পর্দার আড়াল থেকে এই দৃশ্য দেখছিলেন। তিনি ভিতর থেকে আওয়াজ দিয়ে সাহাবীদ্বয়কে বললেন, এই তাবাররুকের কিছু অংশ তোমাদের জননীর (অর্থাৎ আমার) জন্যও রেখে দিও।

এ হাদীসটিও সাক্ষ্য দেয় যে, পর্দা অবতরণের পর নবী-পত্নীগণ গৃহে এবং পর্দার অভ্যন্তরে থাকতেন।

জ্ঞাতব্য ঃ এ হাদীসে আরও একটি প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, নবী-পত্নীগণও অন্যান্য মুসলমানের ন্যায় রসূলুল্লাহ্ (সা)-র তাবাররুকের জন্য আগ্রহান্বিত ছিলেন। এটাও রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পবিত্র সত্তার বৈশিষ্ট্য ছিল। নতুবা স্ত্রীর সাথে স্বামীর যে অবাধ সম্পর্ক থাকে, তার পরিপ্রেক্ষিতে স্বামীর প্রতি এ ধরনের সম্মান ও ভক্তি প্রকাশ স্বভাবতই অসম্ভব।

বুখারীর কিতাবুল আদবে হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার তিনি ও আবূ তালহা (রা) রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাথে কোথাও গমনরত ছিলেন। রসূলুল্লাহ্ (সা) উটে সওয়ার ছিলেন এবং তাঁর সাথে ছিলেন উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাফিয়া (রা)। পথিমধ্যে হঠাৎ উট হোঁচট খেলে তাঁরা উভয়েই মাটিতে পড়ে গেলেন। আবূ তালহা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে যেয়ে বললেন, আমার জীবন আপনার জন্য উৎসর্গ হোক, আপনি কোন আঘাত পাননি তো? তিনি বললেন, না। তুমি সাফিয়া (রা)-র খবর নাও। আবূ তালহা (রা) প্রথমে বস্ত্র দ্বারা নিজের মুখমণ্ডল আবৃত করেছেন, অতপর হযরত সাফিয়া (রা)-র কাছে পৌঁছে তাঁর উপর কাপড় রেখে দিলেন। তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং আবূ তালহা (রা) তাঁকে পর্দাবৃত অবস্থায়ই উটে সওয়ার করিয়ে দিলেন।

এই আকস্মিক দুর্ঘটনার মধ্যেও সাহাবায়ে কিরাম এবং নবী-পত্নীগণের পর্দার সযত্ন প্রয়াস এর গুরুত্বের প্রতিই ইংগিত বহন করে।

তিরমিযী বর্ণিত হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা)-এর বাচনিক রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন اذا خرجت المرأة استشرفها الشيطان অর্থাৎ নারী যখন গৃহ থেকে বের হয়, তখন শয়তান তাকে তাক করে নেয় (অর্থাৎ তাকে অনিষ্ট সাধনের উপায় হিসাবে গ্রহণ করে)।

ইবনে খুযায়মা ও ইবনে হাব্বান এ হাদীসে আরও বর্ণনা করেন ঃ واقرب ما تكون من وجه ربها وهى فى قعر بيتها অর্থাৎ নারী তার পালনকর্তার সর্বাধিক নিকটে তখন থাকে, যখন সে তার গৃহের অভ্যন্তরে অবস্থান করে।

এ হাদীসেও সাক্ষ্য আছে যে, গৃহে অবস্থান করা এবং বাইরে না যাওয়াই নারীদের আসল কাজ। (প্রয়োজনের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম।)

অন্য এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ ليس للنساء نصيب فى الخروج الا مضطرة অর্থাৎ নিরুপায় হওয়া ছাড়া নারীদের বাইরে যাওয়ার বৈধতা নেই।

হযরত আলী (রা) বর্ণনা করেন, আমি একদিন যখন রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে উপস্থিত ছিলাম, তখন তিনি সাহাবায়ে কিরামকে প্রশ্ন করলেন, اى شيئ خير للمرأة অর্থাৎ নারীদের জন্য উত্তম কি? সাহাবায়ে কিরাম চুপ রইলেন—কোন জওয়াব

দলেন না। অতপর আমি গৃহে পৌঁছে ফাতেমা (রা)-কে এই প্রশ্ন করলে তিনি বললেন ঃ لا يرون الرجال ولا يرونهن অর্থাৎ নারীদের জন্য উত্তম এই যে, তারা পুরুষদেরকে দেখবে না এবং পুরুষরাও তাদেরকে দেখবে না। আমি তাঁর এই জওয়াব রসূলুল্লাহ্ (সা)-র গোচরীভূত করলে তিনি বললেন ঃ صدقت انها بضعة منى অর্থাৎ সে সত্য বলেছে। সে তো আমারই অংশ বিশেষ।

নবী-পত্নিগণ কেবল বোরকা চাদরের পর্দাই করতেন না—বরং তাঁরা সফরেও উটের পিঠে হাওদায় থাকতেন। হাওদায় উপবিষ্ট অবস্থায় তা উটের পিঠে তুলে দেওয়া হত এবং এমনিভাবে নামানো হত।

আরোহীর জন্য হাওদা গৃহের ন্যায় হয়ে থাকে। হাওদায় অবস্থানই অপবাদের ঘটনায় হযরত আয়েশা (রা)-র জঙ্গলে থেকে যাওয়ার কারণ হয়েছিল। কাফেলা রওয়ানা হওয়ার সময় হযরত আয়েশা (রা) হাওদায় আছেন—এই মনে করে খাদিমরা হাওদাটি উটের পিঠে তুলে দেয়। বাস্তবে তিনি তাতে ছিলেন না, বরং প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বাইরে গিয়েছিলেন। এই ভুল বোঝাবুঝির মধ্যে কাফেলা রওয়ানা হয়ে যায় এবং উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা) জঙ্গলে একাকিনী থেকে যান।

এ ঘটনাটিও এ বিষয়ের শক্তিশালী সাক্ষী যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) এবং তাঁর পত্নিগণ পর্দার অর্থ এটাই বুঝেছিলেন যে, নারীরা গৃহের অভ্যন্তরে থাকবে এবং সফরে গেলে হাওদার অভ্যন্তরে থাকবে। তাদের ব্যক্তিসত্তা পুরুষের সামনে পড়বে না। সফরে অবস্থানকালে পর্দার এই গুরুত্ব থেকে অনুমান করা যায় যে, বাড়িঘরে অবস্থানকালে কতটুকু গুরুত্ব হবে।

দ্বিতীয় স্তর বোরকার মাধ্যমে পর্দা ঃ প্রয়োজনের ক্ষেত্রে নারী গৃহ থেকে বের হলে কোন বোরকা অথবা লম্বা চাদর দ্বারা আপাদমস্তক আবৃত করে বের হওয়ার বিধান রয়েছে। এর প্রমাণ সূরা আহযাবের এই আয়াত ঃ

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ -

হে নবী! আপনি আপনার পত্নিগণকে, কন্যাগণকে এবং মুসলমানদের স্ত্রীদেরকে বলুন, তারা যেন 'জিলবাব' ব্যবহার করে। 'জিলবাব' সেই লম্বা চাদরকে বলা হয়, যদ্দ্বারা নারীর আপাদমস্তক আবৃত হয়ে যায়।

ইবনে জরীর হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে 'জিলবাব' ব্যবহারের প্রকৃতি এই বর্ণনা করেছেন যে, নারীর মুখমণ্ডল ও নাকসহ আপাদমস্তক এতে ঢাকা থাকবে

এবং পথ দেখার জন্য কেবল একটি চক্ষু খোলা রাখবে। এ আয়াতের পূর্ণ তফসীর যথাস্থানে বর্ণিত হবে। এখানে যা উদ্দেশ্য তা বর্ণিত হয়ে গেছে।

প্রয়োজনের ক্ষেত্রে এরূপ পর্দাও ফিকাহ্‌বিদগণের ঐকমত্যে জায়েয। কিন্তু সহীহ্ হাদীসসমূহে এই পন্থা অবলম্বন করার উপর কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে; যেমন সুগন্ধি ব্যবহার করে বের হবে না। শব্দ করে এমন অলংকার পরিধান করে বের হবে না, পথের কিনারা দিয়ে চলবে এবং পুরুষদের ভিড়ে প্রবেশ করবে না ইত্যাদি।

পর্দার তৃতীয় স্তর, যাতে ফিকাহ্‌বিদগণের মতভেদ রয়েছেঃ সেটা এই যে, সমস্ত দেহ আবৃত থাকবে; কিন্তু মুখমণ্ডল ও হাতের তালু খোলা থাকবে। যাঁরা মুখ-মণ্ডল ও হাতের তালু দ্বারা إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا বাক্যের তফসীর করেন, তাঁদের মতে এগুলো খোলা রাখা জায়েয। হযরত ইবনে আব্বাস থেকে তাই বর্ণিত আছে। পক্ষান্তরে যাঁরা বোরকা, চাদর ইত্যাদি দ্বারা তফসীর করেন, তাঁরা এগুলো খোলা নাজায়েয মনে করেন। হযরত ইবনে মসউদ (রা) থেকে তা-ই বর্ণিত আছে। যাঁরা জায়েয বলেছেন, তাঁদের মতেও অনর্থের আশংকা না থাকা শর্ত। নারী-রূপের কেন্দ্র তার মুখমণ্ডল। তাই একে খোলা রাখার মধ্যে অনর্থের আশংকা না থাকা খুবই বিরল ঘটনা হবে। তাই পরিণামে সাধারণ অবস্থায় তাঁদের কাছেও মুখমণ্ডল ইত্যাদি খোলা জায়েয নয়।

ইমাম চতুষ্টয়ের মধ্যে ইমাম শাফেয়ী, মালেক, আহমদ ইবনে হাম্বল---এই তিন জন প্রথম মযহাব অবলম্বন করে মুখমণ্ডল ও হাতের তালু খোলার কোন অবস্থাতেই অনুমতি দেন নি---অনর্থের আশংকা হোক বা না হোক। ইমাম আযম আবু হানীফা (র) অনর্থের আশংকা না থাকার শর্তে দ্বিতীয় মযহাব অবলম্বন করেছেন। তবে স্বভাবতই শর্তটি অনুপস্থিত বিধায় হানাফী ফিকাহ্‌বিদগণও বেগানা পুরুষের সামনে মুখমণ্ডল ও হাতের তালু খোলার অনুমতি দেন নি। এখানে অনর্থের আশংকায় নিষে-ধাজ্ঞার বিধান সম্বলিত হানাফী মযহাবের কয়েকটি রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করা হচ্ছেঃ

اعلم انه لا ملازمة بين كونه ليس عورة وجواز النظر اليه فحل النظر منوط لعدم خشية الشهوة مع انتفاء العورة ولذا حرم النظر الى وجهها ووجه الامرد اذا شك فى الشهوة ولا عورة -

কোন অঙ্গ গুপ্তাঙ্গের অন্তর্ভুক্ত না হলেই তার দিকে দৃষ্টিপাত করা জায়েয হয়ে যাবে না। কেননা, দৃষ্টিপাতের বৈধতা কামভাব না হওয়ার উপর নির্ভরশীল; যদিও সেই অঙ্গ গুপ্তাঙ্গের অন্তর্ভুক্ত নয়। এ কারণেই বেগানা নারীর মুখমণ্ডল অথবা কোন শ্মশ্রুবিহীন বালকের মুখমণ্ডলের দিকে দৃষ্টিপাত করা হারাম যদি কামভাব হওয়ার আশংকা থাকে; অথচ মুখমণ্ডল গুপ্তাঙ্গের অন্তর্ভুক্ত নয়।—(ফতহুল কাদীর)

এ উদ্ধৃতি থেকে কামভাবের আশংকার তফসীরও জানা গেল যে, কার্যত কাম-প্রবৃত্তি থাকা জরুরী নয়, বরং এরূপ ধারণা সৃষ্টি হওয়ার সন্দেহ থাকাই যথেষ্ট। এরূপ সন্দেহ থাকলে কেবল বেগানা নারীই নয়; বরং শ্মশ্রুবিহীন বালকের মুখমণ্ডলের দিকে দৃষ্টিপাত করাও হারাম। ধারণা সৃষ্টি হওয়ার ব্যাখ্যা 'জামেউর রুমূযে' এই করা হয়েছে যে, মনে তার নিকটবর্তী হওয়ার প্রবণতা সৃষ্টি হয়ে যাওয়া। বলা বাহুল্য মনে এতটুকু প্রবণতা সৃষ্টি হবে না—এটা পূর্ববর্তী মনীষীগণের সময়কালেও বিরল ছিল। হাদীসে আছে, একবার হযরত ফযলকে জনৈকা নারীর দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে রসূলুল্লাহ্ (সা) স্বহস্তে তার মুখমণ্ডল অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন। এটা উপরোক্ত বিষয়ের উজ্জ্বল প্রমাণ। সুতরাং বর্তমান অনর্থের যুগে কে এই আশংকা থেকে মুক্ত আছে?

শামসুল আয়েম্মা 'সুরখসী' এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনার পর লেখেন ঃ

وهذا كله اذا لم يكن النظر عن شهوة فان كان يعلم انه ان نظر اشتهى لم يحل له النظر الى شيئ منها

মুখমণ্ডল ও হাতের তালুর দিকে দৃষ্টিপাতের বৈধতা কেবল তখন—যখন কামভাব সহকারে দৃষ্টিপাত না হয়। পক্ষান্তরে যদি সে জানে যে, মুখমণ্ডল দেখলে কুধারণা সৃষ্টি হতে পারে, তবে তার জন্য নারীর কোন অঙ্গের দিকেই দৃষ্টিপাত করা জায়েয নয়।—(মবসূত)

আল্লামা শামী 'রদ্দুল মুহতার' কিতাবে লেখেন ঃ

فان خاف الشهوة او شك امتنع النظر الى وجهها فحل النظر مقيدة بعدم الشهوة والا فحرام وهذا فى زمانهم واما فى زماننا فمنع من الشابة الا النظر لحاجة كقاض وشاهد يحكم ويشهد وايضا قال فى شروط الصلوة وتمنع الشابة من كشف الوجه بين رجال لا لانه عورة بل لخوف الفتنة -

যদি কামভাবের আশংকা অথবা সন্দেহ হয়, তবে নারীর মুখমণ্ডলের দিকে দৃষ্টিপাত করা নিষিদ্ধ হবে। কেননা, কামভাব না হওয়ার শর্তে দৃষ্টিপাত করা হালাল। এ শর্তটি অনুপস্থিত হলে হারাম। এটা পূর্ববর্তীদের সময়কালে ছিল। কিন্তু আমাদের যুগে তো সর্বাবস্থায় নারীর দিকে দৃষ্টিপাত করা নিষিদ্ধ; তবে কোন পর্যায়ে দৃষ্টি-পাত করা ভিন্ন কথা, যেমন বিচারক অথবা সাক্ষী, যারা কোন ব্যাপারে নারী সম্পর্কে সাক্ষ্য অথবা ফয়সালা দিতে বাধ্য হয়। নামাযের শর্তাবলী অধ্যায়ে বলা হয়েছে ঃ যুবতী নারীদের বেগানা পুরুষদের সামনে মুখমণ্ডল খোলা নিষিদ্ধ। এটা এ কারণে নয় যে, মুখমণ্ডল গুপ্তাঙ্গের অন্তর্ভুক্ত; বরং অনর্থের আশংকার কারণে।

এই আলোচনা ও ফিকাহ্‌বিদগণের মতভেদের সার-সংক্ষেপ এই যে, ইমাম শাফেয়ী, মালেক ও আহমদ ইবনে হাম্বল যুবতী নারীদের দিকে দৃষ্টিপাতকে অনর্থের কারণ মনে করে সর্বাবস্থায় নিষিদ্ধ করেছেন—বাস্তবে অনর্থ হোক বা না হোক। শরীয়তের অনেক বিধানে এ নযীর পাওয়া যায়। উদাহরণত সফর স্বভাবত কষ্ট ও শ্রমের কারণ বিধায় সফরকেই কষ্টের স্থলাভিষিক্ত করে দেওয়া হয়েছে। ফলে এখন সফরের উপরই রুখসতের বিধান নির্ভরশীল। যদি কোন ব্যক্তি সফরে মোটেই কষ্টের সম্মুখীন না হয়, বরং নিজের বাড়ির চাইতেও আরামে থাকে তবুও নামাযের কসর ও রোযার রুখসত তাকে শামিল করবে। অনুরূপভাবে নিদ্রায় মানুষ বেখবর থাকে। ফলে স্বভাবতই বায়ু নিঃসরণ হয়ে যায়। এমন নিদ্রাকেই বায়ু নিঃসরণের স্থলাভিষিক্ত করে দেওয়া হয়েছে। এখন কেউ নিদ্রা গেলেই তার ওযু ভেঙ্গে যাবে—বাস্তবে বায়ু নিঃসরণ হোক বা না হোক।

কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র) নারীর মুখমণ্ডল ও হাতের তালু খোলাকে অনর্থের স্থলাভিষিক্ত করেন নি; বরং বিধান এর উপর নির্ভরশীল রেখেছেন যে, যে ক্ষেত্রে নারীর নিকটবর্তী হওয়ার প্রবণতার আশংকা অথবা সম্ভাবনা থাকবে, নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করা নিষিদ্ধ হবে এবং যেখানে এরূপ সম্ভাবনা নেই সেখানে জায়েয হবে। কিন্তু পূর্বেই বলা হয়েছে যে, বর্তমান যুগে এরূপ সম্ভাবনা না থাকা বিরল। তাই পরবর্তী হানাফী ফিকাহবিদগণও অবশেষে ইমামদ্বয়ের অনুরূপ বিধান দিয়েছেন; অর্থাৎ যুবতী নারীর মুখমণ্ডল ও হাতের তালুর দিকে দৃষ্টিপাত করা নিষিদ্ধ।

সারকথা এই দাঁড়াল যে, এখন ইমাম চতুষ্টয়ের ঐকমত্যে পর্দার তৃতীয় স্তর অর্থাৎ বোরকা, চাদর ইত্যাদি দ্বারা সমগ্র দেহ আবৃত করে কেবল মুখমণ্ডল ও হাত খোলা রেখে পুরুষের সামনে আসা নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। ফলে বর্তমানে পর্দার কেবল প্রথমোক্ত দুই স্তরই অবশিষ্ট আছে—এক. নারীদের গৃহের অভ্যন্তরে থাকা, বিনা প্রয়োজনে বাইরে বের না হওয়া। দুই. বোরকা ইত্যাদি পরিধান করে বের হওয়া—প্রয়োজনের সময়ে ও প্রয়োজন পরিমাণে।

মাস'আলা ঃ পর্দার উল্লিখিত বিধানাবলীতে কিছু ব্যতিক্রমও রয়েছে। উদাহরণত মাহ্‌রাম পুরুষ পর্দার আওতা বহির্ভূত এবং অনেক বৃদ্ধা নারীও পর্দার সাধারণ বিধান থেকে কিঞ্চিত বাইরে। এগুলোর বিবরণ কিছুটা সূরা নূরে বর্ণিত হয়েছে এবং কিছুটা সূরা আহযাবের ব্যতিক্রম সম্বলিত আয়াতে পরে বর্ণনা করা হবে।

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٥٦﴾

---

(৫৬) আল্লাহ্‌ ও তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর প্রতি রহমত প্রেরণ করেন। হে মু'মিন-গণ! তোমরা নবীর জন্য রহমতের তরে দোয়া কর এবং তাঁর প্রতি সালাম প্রেরণ কর।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নিশ্চয় আল্লাহ্ ও তাঁর ফেরেশতাগণ পয়গম্বর (সা)-এর প্রতি রহমত প্রেরণ করেন। হে মু'মিনগণ! তোমরাও তাঁর জন্য রহমতের দোয়া কর এবং খুব সালাম প্রেরণ কর (যাতে তোমাদের তাঁর প্রতি ভক্তি প্রদর্শনের কর্তব্য পালিত হয়)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এর পূর্ববর্তী আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কতিপয় বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য উল্লিখিত হয়েছিল এবং প্রসঙ্গক্রমে নবী-পত্নিগণের পর্দার বিষয় আলোচিত হয়েছিল। এর পরেও পর্দার কিছু বিধান বর্ণিত হবে। মাঝখানে সেই বিষয়ের আদেশ দেয়া হয়েছে, যার জন্য এসব বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য দান করা হয়েছে এবং তা হচ্ছে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মাহাত্ম্য প্রকাশ এবং তাঁর সম্মান, মহব্বত ও আনুগত্যের প্রতি উৎসাহ দান।

আয়াতের আসল উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদেরকে রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি দরূদ ও সালাম প্রেরণ করার আদেশ দান করা। কিন্তু তা এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, প্রথমে আল্লাহ্ স্বয়ং নিজের ও তাঁর ফেরেশতাগণের দরূদ পাঠানোর কথা উল্লেখ করেছেন। অতঃপর সাধারণ মু'মিনগণকে দরূদ প্রেরণ করার আদেশ দিয়েছেন। এতে তাঁর মাহাত্ম্য ও সম্মানকে এত উচ্চে তুলে ধরা হয়েছে যে, রসূল (সা)-এর শানে যে কাজের আদেশ মুসলমানদেরকে দেওয়া হয়, সে কাজ স্বয়ং আল্লাহ্ ও তাঁর ফেরেশতা-গণও করেন। অতএব যে মু'মিনগণের প্রতি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র অনুগ্রহের অন্ত নেই, তাদের তো এ কাজে খুব যত্নবান হওয়া উচিত। এ বর্ণনাভঙ্গীর আরও একটি উপকারিতা এই যে, এতে করে দরূদ ও সালাম প্রেরণকারী মুসলমানদের একটি বিরাট শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়েছে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে এমন এক কাজে শরীক করে নিয়েছেন, যা তিনি নিজেও করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণও।

সালাত ও সালামের অর্থ ঃ আরবী ভাষায় সালাত শব্দের অর্থ রহমত, দোয়া, প্রশংসাকীর্তন। আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি যে সালাত সম্পৃক্ত করা হয়েছে এর অর্থ তিনি রহমত নাযিল করেন। 'ফেরেশতাগণ সালাত প্রেরণ করেন' কথার অর্থ তাঁরা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র জন্য রহমতের দোয়া করেন। আর সাধারণ মু'মিনদের তরফ থেকে সালাতের অর্থ দোয়া ও প্রশংসাকীর্তনের সমষ্টি। তফসীরবিদগণ এ অর্থই লিখেছেন। ইমাম বুখারী আবুল আলিয়া থেকে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ্ তা'আলার সালাতের অর্থ রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সম্মান ও ফেরেশতাগণের সামনে প্রশংসাকীর্তন করা। আল্লাহ্র পক্ষ থেকে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সম্মান দুনিয়াতে এই যে, তিনি তাঁর নাম সমুন্নত করেছেন। ফলে আযান, ইকামত ইত্যাদিতে আল্লাহ্র নামের সাথে সাথে তাঁর নামও শামিল করে দিয়েছেন, তাঁর ধর্ম পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন, প্রবল করে-ছেন ; তাঁর শরীয়তের কাজ কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত রেখেছেন এবং তাঁর শরীয়তের

হিফাযতের দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করেছেন।---পক্ষান্তরে পরকালে তাঁর সম্মান এই যে, তাঁর স্থান সমগ্র সৃষ্টির উর্ধ্বে রেখেছেন এবং যে সময় কোন পয়গম্বর ও ফেরেশতার সুপারিশ করার ক্ষমতা থাকবে না, তখনও তাঁকে সুপারিশের ক্ষমতা দিয়েছেন, যাকে 'মাকামে-মাহমূদা' বলা হয়।

এই অর্থদৃষ্টে প্রশ্ন দেখা দিতে পারে যে, হাদীস অনুযায়ী দরূদ ও সালামে রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে তাঁর বংশধর ও সাহাবীগণকেও শামিল করা হয়। কাজেই আল্লাহ্র সম্মান ও প্রশংসাকীর্তনে তাঁর সাথে অন্যকে কিরূপে শরীক করা যায়? এর জওয়াব রূহুল মা'আনী ইত্যাদি কিতাবে এই দেওয়া হয়েছে যে, সম্মান ও প্রশংসা-কীর্তনের অনেক স্তর রয়েছে। তন্মধ্যে সর্বোচ্চ স্তর রসূলুল্লাহ্ (সা) লাভ করেছেন এবং এক স্তরে বংশধর, সাহাবী এবং সাধারণ মু'মিনগণও শামিল রয়েছেন।

একটি সন্দেহের জওয়াবঃ এক. সালাত শব্দ দ্বারা একই সময়ে একাধিক অর্থ রহমত, দোয়া ও প্রশংসা নেওয়াকে পরিভাষায় 'ওমূমে মুশতারিক' বলা হয়, যা কারও কারও মতে জায়েয নয়। কাজেই এ স্থলে 'সালাত' শব্দের এক অর্থ নেওয়াই সঙ্গত অর্থাৎ রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সম্মান, প্রশংসা ও শুভেচ্ছা। অতঃপর এটা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হলে এর সারমর্ম হবে রহমত, ফেরেশতাগণের পক্ষ থেকে হলে দোয়া ও ইস্তিগফার এবং সাধারণ মু'মিনগণের তরফ থেকে হলে দোয়া, প্রশংসা ও সম্মানের সমষ্টি অর্থ হবে।

'সালাম' শব্দটি ধাতু, এর অর্থ সালামত ও নিরাপত্তা। এর উদ্দেশ্য ত্রুটি, দোষ ও বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকা। 'আসসালামু আলায়কা' বাক্যের অর্থ এই যে, দোষত্রুটি বিপদাপদ থেকে নিরাপত্তা আপনার সঙ্গী হোক। আরবী ভাষার নিয়মানুযায়ী এটা على অব্যয় ব্যবহারের স্থান নয়। কিন্তু প্রশংসার অর্থ শামিল থাকার কারণে على অব্যয় যোগে عليك অথবা عليكم বলা হয়।

কেউ কেউ এখানে 'সালাম' শব্দের অর্থ নিয়েছেন আল্লাহ্র সত্তা। কেননা, এটা তাঁর সুন্দরতম নামসমূহের অন্যতম। অতএব 'আসসালামু আলায়কুম' বাক্যের অর্থ এই হবে যে, আল্লাহ্ আপনার হিফাযত ও দেখাশোনার যিম্মাদার।

দরূদ ও সালামের পদ্ধতিঃ হাদীসের সকল কিতাবে বর্ণিত এক হাদীসে হযরত কা'ব ইবনে আজরা (রা) বলেনঃ (আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হলে) এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলল, আয়াতে বর্ণিত দুটি বিষয়ের মধ্যে সালামের পদ্ধতি আমরা জানি এবং তা হচ্ছে السلام عليك ايها النبى বলা। কিন্তু সালাত তথা দরূদের নিয়ম আমরা জানি না। এটা বলে দিন। তিনি বললেনঃ দরূদের জন্য তোমরা এ কথাগুলো বলবেঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

অন্যান্য রেওয়ায়েতে আরও কিছু বাক্য বর্ণিত আছে।

সাহাবায়ে কিরামের প্রশ্ন করার কারণ সম্ভবত এই ছিল যে, সালাম করার পদ্ধতি তাদেরকে নামাযের তাশাহ্হুদে পূর্বেই শেখানো হয়েছিল এবং তা ছিল—— اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ বলা। তাই সালাতের ব্যাপারে তাঁরা নিজেরা বাক্য রচনা পছন্দ করেন নি; বরং স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করে এর ভাষা ঠিক করেছেন। এ কারণেই নামাযে এ ভাষায়ই দরূদ পাঠ করা হয়। কিন্তু এটা অপরিবর্তনীয় নয়। কেননা, স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে দরূদের বিভিন্ন ভাষা বর্ণিত আছে। দরূদ ও সালামের শব্দ সম্বলিত যে কোন ভাষায় এ আদেশ পালিত হতে পারে। সেই ভাষা হুবহু রসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে বর্ণিত হওয়াও জরুরী নয়। বরং যে কোন বাক্যে দরূদ ও সালাম ব্যক্ত করা হলে আদেশ প্রতি-পালিত ও দরূদের সওয়াব হাসিল হয়ে যায়। তবে রসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে বর্ণিত বাক্যে দরূদ পাঠ করা হলে যে অধিক বরকত ও সওয়াবের কারণ হবে, তা বলাই বাহুল্য। তাই সাহাবায়ে কিরাম তাঁর কাছেই দরূদের ভাষা জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

মাস'আলা ঃ নামাযের বৈঠকে উপরে বর্ণিত ভাষায় চিরকাল দরূদ ও সালাম পাঠ করা সুন্নত। নামাযের বাইরে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সম্বোধন করা হলে اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ বলা উচিত; যেমন তাঁর জীবদ্দশায় তাই বলা হত। তাঁর ওফাতের পর পবিত্র রওযার সামনে সালাম আরয করা হলেও اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ বলা সুন্নত। এতদ্ব্যতীত অনুপস্থিত ক্ষেত্রে দরূদ ও সালাম পাঠ করা হলে এ সম্পর্কে সাহাবী, তাবেয়ী ও ইমামগণ থেকে অনুপস্থিত পদবাচ্যের ব্যবহার বর্ণিত আছে; যথা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ——হাদীসবিদগণের কিতাবসমূহ এ বাক্যে পরিপূর্ণ দেখা যায়।

দরূদ ও সালামের এই পদ্ধতির রহস্য ঃ দরূদ ও সালামের যে পদ্ধতি রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উক্তি ও কর্ম দ্বারা প্রমাণিত আছে, তার সারকথা এই যে, আমরা সব

মুসলমান তাঁর জন্য আল্লাহ্‌র রহমত ও নিরাপত্তার দোয়া করব। এখানে প্রশ্ন হয় যে, আয়াতের উদ্দেশ্য ছিল আমরা স্বয়ং তাঁর প্রতি সম্মান ও সম্ভ্রম প্রদর্শন করব, কিন্তু এর পদ্ধতি এই বলা হয়েছে যে, আমরা আল্লাহ্ তা'আলার কাছে দোয়া করব। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পুরোপুরি সম্মান ও আনুগত্য করার সাধ্য আমাদের নেই। তাই দোয়া করাই আমাদের জন্য জরুরী করা হয়েছে।---(রূহুল মা'আনী)

দরূদ ও সালামের বিধানাবলী ঃ নামাযের শেষ বৈঠকে দরূদ পাঠ করা সকলের মতে সুন্নতে মোয়াক্কাদাহ্। ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ ইবনে হাম্বলের মতে ওয়াজিব।

মাস'আলা ঃ অধিকাংশ ইমাম এ বিষয়ে একমত যে, কেউ রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নাম উল্লেখ করলে অথবা শুনলে দরূদ পাঠ করা ওয়াজিব হয়ে যায়। কেননা, হাদীসে এরূপ ক্ষেত্রে দরূদ পাঠ না করার কারণে শাস্তিবাণী বর্ণিত আছে। তিরমিযীর এক রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ رغم انف رجل ذكرت عنده فلم يصل على অর্থাৎ সেই ব্যক্তি অপমানিত হোক, যার সামনে আমার নাম উচ্চারণ করা হলে দরূদ পাঠ করে না।

অন্য এক হাদীসে আছে ঃ البخيل من ذكرت عنده فلم يصل على ---সেই ব্যক্তি কৃপণ, যার কাছে আমার নাম উচ্চারণ করা হলে দরূদ পাঠ করে না।

o একই মজলিসে বারবার নাম উচ্চারিত হলে একবার দরূদ পাঠ করলেই ওয়াজিব আদায় হয়ে যায়। কিন্তু প্রত্যেক বার পাঠ করা মুস্তাহাব। মুহাদ্দিসগণই সর্বাধিক রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নাম উচ্চারণ করতে পারেন। কারণ, হাদীস চর্চাই তাঁদের সার্বক্ষণিক কাজ। এতে বারবার রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নাম আসে। তাঁরা প্রত্যেক বার দরূদ ও সালাম পাঠ করেন ও লেখেন। সমস্ত হাদীস গ্রন্থ এর সাক্ষ্য দেয়। বার বার দরূদ ও সালাম লিপিবদ্ধ করলে কিতাবের পৃষ্ঠা সংখ্যা বেড়ে যাবে---তাঁরা এ বিষয়েরও পরওয়া করেন নি। অধিকাংশ ছোটখাট হাদীসে দু'এক লাইনের পরে এবং কোথাও কোথাও এক লাইনেই একাধিক বার রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নাম আসে। কিন্তু হাদীসবিদগণ কোথাও দরূদ ও সালাম বাদ দেন নি।

o মুখে নাম উচ্চারণ করলে যেমন দরূদ ও সালাম ওয়াজিব, তেমনি কলমে লেখার সময়ও দরূদ ও সালাম লেখা ওয়াজিব। এ ক্ষেত্রে সংক্ষেপে 'সা' লেখাও যথেষ্ট নয়। সম্পূর্ণ দরূদ ও সালাম লেখা বিধেয়।

o দরূদ ও সালাম উভয়টি পাঠ করাই উত্তম ও মুস্তাহাব। কিন্তু কেউ উভয়ের মধ্য যে কোন একটি পাঠ করলে অধিকাংশ ফিকাহ্‌বিদের মতে তাতে কোন গোনাহ্ নেই। ইমাম নওভী একে মকরূহ্ বলেছেন। ইবনে হাজার হায়সমীর মতে এর অর্থ মকরূহ্ তানযিহী। আলিমগণ উভয়টিই পাঠ করেন এবং মাঝে মাঝে যে কোন একটিও পাঠ করেন।

০ পয়গম্বরগণ ব্যতীত কারও জন্য সালাত তথা দরূদ ব্যবহার করা অধিকাংশ আলিমের মতে বৈধ নয়। ইমাম বায়হাকী হযরত ইবনে আব্বাসের এই ফতোয়া বর্ণনা করেছেন ঃ

لا يصلى على احد الا على النبى صلى الله عليه وسلم لكن يدعى للمسلمين والمسلمات بالاستغفار

ইমাম শাফেয়ী বলেন, নবী ব্যতীত অপরের জন্য সালাত ব্যবহার করা মকরূহ্। ইমাম আযমের মযহাবও তাই। তবে রসূলুল্লাহ্ (সা) এবং সাথে তাঁর বংশধর সাহাবী অথবা মু'মিনগণকে শরীক করায় কোন দোষ নেই।

ইমাম জুওয়াইনী (র) বলেন, সালাতের ন্যায় সালামও নবী ব্যতীত অপরের জন্য ব্যবহার করা জায়েয নয়। তবে কাউকে সম্ভাষণের সময় السلام عليكم বলা জায়েয ও সুন্নত। কিন্তু নবী ব্যতীত কোন অনুপস্থিত ব্যক্তির নামের সাথে আলায়হিস্ সালাম বলা জায়েয নয়।—(খাসায়েসে-কুবরা)

কাজী আয়ায বলেন, অনুসন্ধানী আলিমগণের মতে এবং আমার মতেও এটাই ঠিক। ইমাম মালেক, সুফিয়ান প্রমুখ ফিকাহ্‌বিদ তা-ই অবলম্বন করেছেন। তাঁদের মতে দরূদ ও সালাম পয়গম্বরগণের বৈশিষ্ট্য—অপরের জন্য জায়েয নয়; যেমন সোবহানাহু তা'আলা ইত্যাদি শব্দ আল্লাহ্‌র বৈশিষ্ট্য। সাধারণ মুসলমানদের জন্য ক্ষমা ও সন্তুষ্টির দোয়া করা উচিত; যেমন কোরআনে সাহাবায়ে কিরাম সম্পর্কে رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ বলা হয়েছে।—(রূহুল-মা'আনী)

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿٥٧﴾ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنٰتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَّإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٥٨﴾

(৫৭) যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ্ তাদের প্রতি ইহকালে ও পরকালে অভিসম্পাত করেন এবং তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন অবমাননাকর শাস্তি। (৫৮) যারা বিনা অপরাধে মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদেরকে কষ্ট দেয়, তারা মিথ্যা অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপের বোঝা বহন করে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নিশ্চয় যারা আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রসূল (সা)-কে (ইচ্ছাপূর্বক) কষ্ট দেয়, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রতি ইহকালে ও পরকালে অভিসম্পাত করেন এবং তাদের জন্য অবমাননাকর শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন। (এমনিভাবে) যারা মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদেরকে কোন (শাস্তিযোগ্য) অপরাধ করা ব্যতীতই কষ্ট দেয়, তারা মিথ্যা অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপের বোঝা (নিজেদের পিঠে) বহন করে (অর্থাৎ কথার মাধ্যমে কষ্ট দিলে তা মিথ্যা অপবাদ এবং কর্মের মাধ্যমে কষ্ট দিলে তা প্রকাশ্য পাপ)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে মুসলমানদেরকে সেসব কাজকর্মের ব্যাপারে হুঁশিয়ার করা হয়েছিল, যেগুলো রসূলুল্লাহ্ (সা)-র জন্য কষ্টদায়ক। কিছু সংখ্যক মুসলমান অজ্ঞতা অথবা অনবধানতাবশত অনিচ্ছাকৃতভাবে এ ধরনের কাজকর্মে লিপ্ত হত; যেমন দাওয়াত ব্যতিরেকেই তাঁর গৃহে চলে যাওয়া অথবা দাওয়াতের নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগে এসে বসে থাকা অথবা খাওয়ার পর পারস্পরিক কথাবার্তায় মশগুল হয়ে বিলম্ব করা ইত্যাদি। এসব কাজের ব্যাপারে يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِىِّ আয়াতে হুঁশিয়ার করা হয়েছিল।

এসব কষ্ট অনিচ্ছায় ও অনবধানতাবশত হয়ে যেত। তাই এ ব্যাপারে কেবল হুঁশিয়ার করাকেই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য আয়াতসমূহে সেই কষ্টের উল্লেখ করা হয়েছে, যা ইসলামের শত্রু কাফির ও মুনাফিকদের পক্ষ থেকে ইচ্ছাপূর্বক রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেওয়া হত। এ কারণেই তফসীরের সার-সংক্ষেপে এ স্থলে 'ইচ্ছা-পূর্বক' শব্দটি বাড়ানো হয়েছে। এতে দৈহিক নির্যাতনও দাখিল আছে, যা বিভিন্ন সময়ে কাফিরদের হাতে তিনি ভোগ করতেন এবং আত্মিক কষ্টও দাখিল আছে, যা বিদ্রূপ, দোষারোপ ও নবী-পত্নিগণের প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে তাঁকে দেওয়া হত। এই ইচ্ছাপূর্বক কষ্টদানের কারণে অভিসম্পাত এবং কঠোর শাস্তিবাণীও আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে।

আয়াতের শুরুতে আল্লাহ্ তা'আলাকে কষ্টদানের কথা বলা হয়েছে। এর অর্থ এমন কাজকর্ম করা ও কথাবার্তা বলা, যা স্বভাবত মর্মপীড়ার কারণ হয়ে থাকে। আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্র সত্তা প্রভাব গ্রহণজনিত সকল ক্রিয়ার ঊর্ধ্বে। তাঁকে কষ্ট দেওয়ার সাধ্য কারও নেই। কিন্তু স্বভাবত পীড়াদায়ক কাজকর্মকে এখানে পীড়া ও কষ্ট বলে ব্যক্ত করা হয়েছে।

এখানে আল্লাহ্‌কে কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্য কি, এ ব্যাপারে তফসীরবিদগণের মধ্যে মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেন, এখানে কষ্ট দেওয়ার অর্থ এমন কাজকর্ম ও কথাবার্তা, যেগুলো সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (সা) মৌখিকভাবে ব্যক্ত করেছেন যে, এসব কাজ আল্লাহ্ তা'আলার কষ্টের কারণ হয়। উদাহরণত বিপদাপদের সময় মহাকালকে গালমন্দ দেওয়া। প্রকৃতপক্ষে সবকিছুর কর্তা আল্লাহ্ তা'আলা। কিন্তু কাফিররা মহা-কালকে কর্তা মনে করে গালি দিত। ফলে এই গালি আসল কর্তা পর্যন্তই পৌঁছত। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, প্রাণীদের চিত্র নির্মাণ করা আল্লাহ্ তা'আলার কষ্টের কারণ। সুতরাং আয়াতে আল্লাহ্‌কে কষ্ট দেওয়ার অর্থ এ ধরনের কথাবার্তা ও কাজ-কর্ম করা।

অন্য তফসীরবিদগণ বলেন, এখানে প্রকৃতপক্ষে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কষ্ট প্রতিরোধ করা এবং এর জন্য শাস্তিবাণী বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। কিন্তু আয়াতে রসূলের কষ্টকে আল্লাহ্‌র কষ্ট বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। কেননা রসূলকে কষ্ট দেওয়া প্রকৃত-পক্ষে আল্লাহ্‌কে কষ্ট দেওয়া। এ সম্পর্কিত একটি হাদীস পরে উল্লেখ করা হবে। কোরআন পাকের পূর্বাপর বর্ণনাদৃষ্টেও এই তফসীরটি অগ্রগণ্য মনে হয়। কারণ পূর্বেও রসূলের কষ্ট বর্ণিত আছে এবং পরেও তাই বর্ণিত হবে। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কষ্টই যে আল্লাহ্ তা'আলার কষ্ট, একথা আবদুর রহমান ইবনে মুগাফ্‌ফাল মুযানী (রা)-র নিম্নোক্ত রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত হয়ঃ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله فى اصحابى لا تتخذ وهم غرضا من بعدى فمن احبهم فبحبى احبهم ومن ابغضهم فببغضى ابغضهم ومن اذاهم فقد اذانى ومن اذانى فقد اذى الله ومن اذى الله يوشك ان يا خذ -

রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, আমার সাহাবীদের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর। আমার পরে তাদেরকে সমালোচনার লক্ষ্যস্থলে পরিণত করো না। কেননা, যে ব্যক্তি তাদেরকে ভালবাসে, সে আমার ভালবাসার কারণে তাদেরকে ভালবাসে আর যে তাদের সাথে শত্রুতা রাখে, সে আমার সাথে শত্রুতা রাখার কারণে শত্রুতা রাখে। যে তাদেরকে কষ্ট দেয়, সে আমাকে কষ্ট দেয়, যে আমাকে কষ্ট দেয়, সে আল্লাহ্‌কে কষ্ট দেয়, যে আল্লাহ্‌কে কষ্ট দেয়, আল্লাহ্ সত্বরই তাকে পাকড়াও করবেন।—(মাযহারী)

এই হাদীস থেকে জানা গেল যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কষ্টের কারণে আল্লাহ্ তা'আলার কষ্ট হয়। অনুরূপভাবে আরও জানা গেল যে, কোন সাহাবীকে কষ্ট দিলে অথবা তাঁর প্রতি ধৃষ্টতা প্রদর্শন করলে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কষ্ট হয়।

এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, আলোচ্য আয়াতটি হযরত আয়েশা (রা)-র প্রতি মিথ্যা কলংক আরোপের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস

(রা) বর্ণনা করেন, হযরত আয়েশা (রা)-র প্রতি মিথ্যা কলংক আরোপের দিন-গুলোতে আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই মুনাফিকের গৃহে কিছু লোক সমবেত হয়ে এই অপবাদ প্রচার ও প্রসারিত করার কথাবার্তা বলত। তখন রসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবায়ে কিরামের কাছে অভিযোগ পেশ করে বলেন : লোকটি আমাকে কষ্ট দেয়। ---(মাযহারী)

কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, হযরত সফিয়্যা (রা)-র সাথে বিবাহের সময় কিছুসংখ্যক মুনাফিক বিদ্রূপ করায় আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। সঠিক কথা এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র জন্য কষ্টদায়ক প্রত্যেকটি বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতটি নাযিল হয়েছে। এতে হযরত আয়েশা (রা)-র প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ এবং হযরত সফিয়্যা (রা)-র বিবাহের কারণে বিদ্রূপ ও দোষারোপ সবই দাখিল আছে। এ ছাড়া সাহাবায়ে-কিরামকে মন্দ বলাও এর অন্তর্ভুক্ত।

রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে যে কোন প্রকারে কষ্ট দেয়া কুফরী : যে ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কোন প্রকার কষ্ট দেয়, তাঁর সত্তা অথবা গুণাবলীতে প্রকাশ্য অথবা ইঙ্গিতে কোন দোষ বের করে, সে কাফির হয়ে যায়। আলোচ্য আয়াতদৃষ্টে তার প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার অভিসম্পাত ইহকালেও হবে এবং পরকালেও।---(মাযহারী)

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে যে, যে কোন একজন মুসলমানকে কষ্ট ও মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হারাম---যদি তারা আইনত এর যোগ্য না হয়। সাধারণ মুসলমান-দের ক্ষেত্রে এ কথাটি যুক্ত করার কারণ এই যে, তাদের মধ্যে কারও কোন অপকর্মে জড়িত হওয়ারও আশংকা আছে, যার প্রতিফলস্বরূপ তাকে কষ্ট দেওয়া শরীয়তের আইনে জায়েয। প্রথম আয়াতে আল্লাহ্ ও রসূলকে কষ্ট দেওয়ার ব্যাপার ছিল। তাই তাতে উপরোক্ত শর্ত যুক্ত করা হয়নি। কারণ সেখানে কষ্ট দান বৈধ হওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই।

কোন মুসলমানকে শরীয়তসম্মত কারণ ব্যতিরেকে কষ্ট দেওয়া হারাম : اَلَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الخ আয়াত দ্বারা কোন মুসলমানকে শরীয়ত-সম্মত কারণ ব্যতিরেকে কষ্টদানের বৈধতা প্রমাণিত হয়েছে। রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন :

المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن امنه الناس
على دمائهم واموالهم -

কেবল সে-ই মুসলমান, যার হাত ও মুখ থেকে অন্য মুসলমানগণ নিরাপদ থাকে, কেউ কষ্ট পায় না। কেবল সে-ই মু'মিন, যার কাছ থেকে মানুষ তাদের রক্ত ও ধনসম্পদের ব্যাপারে নিরুদ্বেগ থাকে।---(মাযহারী)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ قُل لِّأَزْوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥٩﴾ لَّئِن لَّمْ يَنتَهِ ٱلْمُنَٰفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْمُرْجِفُونَ فِى ٱلْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَآ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٦٠﴾ مَّلْعُونِينَ ۖ أَيْنَمَا ثُقِفُوٓا۟ أُخِذُوا۟ وَقُتِّلُوا۟ تَقْتِيلًا ﴿٦١﴾ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِى ٱلَّذِينَ خَلَوْا۟ مِن قَبْلُ ۖ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿٦٢﴾

(৫৯) হে নবী! আপনি আপনার পত্নিগণকে ও কন্যাগণকে এবং মু'মিনদের স্ত্রীগণকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের উপর টেনে নেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে। ফলে তাদেরকে উত্ত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু (৬০) মুনাফিকরা এবং যাদের অন্তরে রোগ আছে এবং মদীনায় গুজব রটনাকারীরা যদি বিরত না হয়, তবে আমি অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে আপনাকে উত্তেজিত করব। অতপর এই শহরে আপনার প্রতিবেশী অল্পই থাকবে। (৬১) অভিশপ্ত অবস্থায় তাদেরকে সেখানেই পাওয়া যাবে, ধরা হবে এবং প্রাণে বধ করা হবে। (৬২) যারা পূর্বে অতীত হয়ে গেছে, তাদের ব্যাপারে এটাই ছিল আল্লাহ্র রীতি। আপনি আল্লাহ্র রীতিতে কখনও পরিবর্তন পাবেন না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে পয়গম্বর! আপনি আপনার পত্নিগণকে, কন্যাগণকে এবং মুসলমানদের স্ত্রীগণকেও বলুন, তারা যেন তাদের (মুখমণ্ডলের) উপরে তাদের চাদরের কিয়দংশ টেনে নেয়। এতে তাদেরকে তাড়াতাড়ি চেনা যাবে। ফলে তাদেরকে উত্ত্যক্ত করা হবে না (অর্থাৎ কোন প্রয়োজনে বাইরে যেতে হলে তারা যেন চাদর দ্বারা মাথা ও মুখমণ্ডল আবৃত করে নেয়। সূরা নূরের শেষভাগে غَيْرَ مُتَبَرِّجَٰتٍۭ بِزِينَةٍ আয়াতে এর তফসীর রেওয়ায়েত দ্বারা করা হয়েছে। দাসীদের জন্য মাথা আদতে সতরের অন্তর্ভুক্ত নয় এবং মুখমণ্ডল খোলার ব্যাপারে তারা স্বাধীন নারীদের অপেক্ষা অধিক সুবিধা প্রাপ্তা। এর কারণ এই যে, তারা প্রভুর আদেশ পালনে নিয়োজিত থাকে। তাই কাজকর্মের জন্য তাদের বাইরে যাওয়ার এবং মুখমণ্ডল খোলার প্রয়োজন বেশি। সুতরাং নারীরা এরূপ বাইরে যেতে বাধ্য নয়। দুষ্ট লোকেরা স্বাধীন নারীদেরকে

তাদের পারিবারিক প্রতিপত্তি ও শক্তির কারণে উত্ত্যক্ত করার সাহস করত না। তারা কেবল দাসীদেরকেই উত্ত্যক্ত করত। মাঝে মাঝে দাসী ভ্রমে স্বাধীন নারীদেরকেও উত্ত্যক্ত করা হত। তাই আলোচ্য আয়াত স্বাধীন নারীদেরকে দাসীদের থেকে স্বতন্ত্র করার জন্য এবং তাদের মাথা ও ঘাড় সতরের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্যও নবী-পত্নী, কন্যা ও সাধারণ মুসলমানদের স্ত্রীদেরকে আদেশ দিয়েছে, তারা যেন লম্বা চাদরে আবৃত হয়ে বের হয়। চাদরটি মাথার কিছু নিচে মুখমণ্ডলের উপর লটকিয়ে নেবে; যাকে ঘোমটা দেওয়া বলা হয়। এই আদেশের কারণে শরীয়তসম্মত পর্দার আদেশও পালিত হয়ে যাবে এবং খুব সহজে দুষ্ট লোকদের কবল থেকে হিফাযতও হয়ে যাবে। অতপর দাসীদের হিফাযতের ব্যবস্থা পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত হবে। এই মুখমণ্ডল ও মস্তক আবৃত করার ব্যাপারে কোন কম বেশি অথবা অনিচ্ছাকৃত অসা-বধানতা হয়ে গেলে) আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (তিনি ক্ষমা করে দেবেন। অতপর যারা দাসীদেরকে উত্ত্যক্ত করত, তাদেরকে এবং যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে গুজব রটনা করত, তাদেরকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে। বলা হয়েছে, সাধারণ মুনাফিক-দের মধ্য থেকে) যাদের অন্তরে (প্রবৃত্তি পূজার) রোগ আছে (ফলে তারা দাসীদেরকে উত্ত্যক্ত করে) এবং (তাদেরই মধ্য থেকে) যারা মদীনায় (মিথ্যা ও অস্বস্তিকর) গুজব রটনা করে, তারা যদি (এসব কুকর্ম থেকে) বিরত না হয়, তবে অবশ্যই (কোন না কোন দিন) আমি আপনাকে তাদের উপর চড়াও করে দেব (অর্থাৎ তাদেরকে মদীনা থেকে বহিষ্কারের আদেশ দিয়ে দেব।) অতঃপর (এই আদেশের পর তারা আপনার কাছে খুব কমই থাকতে পারবে, তাও চতুর্দিক থেকে) লাঞ্ছিত হয়ে (অর্থাৎ মদীনা থেকে বের হয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য যে সামান্য সময় দেওয়া হবে, তাতেই তারা এখানে থাকতে পারবে। এ সময়ের মধ্যেও চতুর্দিক থেকে লাঞ্ছিত হবে। এরপর বহিষ্কৃত হবে। বহিষ্কারের পরও তারা কোথাও শান্তি পাবে না। বরং) যেখানেই পাওয়া যাবে, ধরা হবে এবং হত্যা করা হবে। (কারণ এই যে, বহিষ্কারই ছিল তাদের কুফরের দাবি। কিন্তু কপটতার আড়ালে তারা আশ্রয় পেয়েছে। যখন প্রকাশ্যে এরূপ বিরোধিতা শুরু করবে, তখন আড়ালও বাকি থাকবে না। ফলে তাদের সাথেও কুফরের আসল দাবি অনুযায়ী ব্যবহার করা হবে। অর্থাৎ তাদের বহিষ্কার, বন্দী, হত্যা সবই বৈধ হবে। বের হওয়ার জন্য কিছু সময় দেওয়া হলে সে সময়েই তারা নিরাপদ থাকবে। এরপর যেখানে যাবে, সেখানেই চুক্তি না থাকার কারণে তাদেরকে বন্দী ও হত্যা করার অনুমতি থাকবে। মুনাফিকদেরকে প্রদত্ত এই হুমকির মাধ্যমে দাসীদেরকে উত্ত্যক্ত করার বিষয়েও ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে এবং গুজব ছড়া-নোর পথও বন্ধ করা হয়েছে।

আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, তারা প্রকাশ্যে মুসলমানদের বিরুদ্ধাচরণ থেকে বিরত হলে তাদেরকে এই শাস্তি দেওয়া হবে না, যদিও কপটতায় লিপ্ত থাকে। অন্যথায় সাধারণ কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে শাস্তিযোগ্য হয়ে যাবে। বিপর্যয় সৃষ্টি ও চক্রান্তের এই শাস্তি কেবল তাদেরকেই নয়; বরং) পূর্বে যারা অর্থাৎ (দুষ্কৃতিকারী) অতীত

হয়ে গেছে, তাদের ক্ষেত্রেও আল্লাহ্‌র এই বিধান ছিল। (তাদেরকে নৈসর্গিক শাস্তি দেওয়া হয়েছে ; অথবা পয়গম্বরগণের হাতে জিহাদের মাধ্যমে শাস্তি দিয়েছেন। এরূপ ঘটনা ঘটে না থাকলে এ ধরনের শাস্তিকে অবান্তর মনে করা সম্ভবপর ছিল। এখন তো অবান্তর মনে করার কোন অবকাশই নেই।) আপনি আল্লাহ্ তা'আলার বিধানে (কোন ব্যক্তির পক্ষ থেকে) পরিবর্তন পাবেন না (অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার কোন বিধান জারি করতে চাইলে কেউ তা প্রতিরোধ করতে পারে না। سُنَّةَ اللهِ শব্দে প্রকাশ হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছার পূর্বে কেউ কোন কাজ করতে পারে না এবং وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبْدِيلًا বাক্যে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা কোন কাজের ইচ্ছা করলে কেউ তা প্রতিরোধ করতে পারে না)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, সাধারণ মুসলমান নারী ও পুরুষকে কষ্ট দেওয়া হারাম ও মহাপাপ এবং বিশেষ করে রসূলে করীম (সা)-কে পীড়া দেওয়া কুফর ও অভিসম্পাতের কারণ। মুনাফিকদের পক্ষ থেকে সব মুসলমান ও রসূলুল্লাহ্ (সা) দুই প্রকারে কষ্ট পেতেন। আলোচ্য আয়াতসমূহে এসব নির্যাতন বন্ধের ব্যবস্থা বর্ণিত হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে নারীদের পর্দা সংক্রান্ত কিছু অতিরিক্ত বিধান উল্লেখ করা হয়েছে। মুনাফিকদের দ্বিবিধ নির্যাতনের একটি ছিল এই যে, মুসলমানদের দাসীরা কাজকর্মের জন্য বাইরে গেলে দুষ্ট প্রকৃতির মুনাফিকরা তাদেরকে উত্যক্ত করত এবং মাঝে মাঝে দাসী সন্দেহে স্বাধীন নারীদেরকেও উত্যক্ত করত। ফলে সাধারণভাবে মুসলমানগণ এবং রসূলুল্লাহ্ (সা) কষ্ট পেতেন।

দ্বিতীয় নির্যাতন ছিল এই যে, তারা সদাসর্বদা মিথ্যা খবর রটনা করত। উদাহরণত এখন অমুক শত্রুপক্ষ মদীনা আক্রমণ করবে এবং সকলকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে। প্রথম প্রকার নির্যাতন থেকে স্বাধীন নারীদেরকে বাঁচানোর তাৎক্ষণিক ও সহজ ব্যবস্থা ছিল স্বাধীন নারীদের মধ্যে বিশেষ স্বাতন্ত্র্য ফুটিয়ে তোলা। কারণ মুনাফিকরা স্বাধীন নারীদের পারিবারিক প্রভাব-প্রতিপত্তি ও শক্তি-সামর্থ্যের কারণে তাদেরকে ইচ্ছাপূর্বক উত্যক্ত করার সাহস পেত না। পরিচয়ের অভাবেই এরূপ ঘটনা সংঘটিত হতো। তাই স্বাধীন নারীদের পরিচয় ফুটিয়ে তোলার প্রয়োজন ছিল, যাতে তারা অতি সহজে দুষ্টদের কবল থেকে নিরাপদ হয়ে যায়।

অপরদিকে শরীয়ত স্বাধীন নারী ও দাসীদের পর্দার মধ্যে প্রয়োজনবশত একটি পার্থক্যও রেখেছে। স্বাধীন নারীরা তাদের মাহরাম ব্যক্তির সামনে যতটুকু পর্দা করে, দাসীদের জন্য গৃহের বাইরেও ততটুকু পর্দা রাখা হয়েছে। কারণ প্রভুর কাজকর্ম করাই দাসীর কর্তব্য, এতে তাকে বারবার বাইরেও যেতে হয়। এমতাবস্থায় মুখমণ্ডল ও হাত আবৃত রাখা কঠিন ব্যাপার। স্বাধীন নারীরা কোন প্রয়োজনে বাইরে

গেলেও বারবার যাওয়ার প্রয়োজন হয় না। কাজেই পূর্ণ পর্দা পালন করা কঠিন কাজ নয়। তাই স্বাধীন নারীদেরকে আদেশ করা হয়েছে, তারা যেন লম্বা চাদর মাথার উপর থেকে মুখমণ্ডলের সামনে ঝুলিয়ে নেয়, যাতে বেগানা পুরুষের দৃষ্টিতে মুখমণ্ডল না পড়ে। ফলে তাদের পর্দাও পূর্ণাঙ্গ হয়ে গেল এবং দাসীদের থেকে স্বাতন্ত্র্যও ফুটে উঠল। অতপর মুনাফিকদেরকে শাস্তির সতর্কবাণী শুনিয়ে দাসীদের হিফাযতের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, তারা যদি বিরত না হয়, তবে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে ইহকালেও তাঁর নবী ও মুসলমানদের হাতে সাজা দেবেন।

উল্লিখিত আয়াতে স্বাধীন নারীর পর্দার জন্য এই আদেশ দেওয়া হয়েছে ঃ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ এতে يدنين শব্দটি ادناء থেকে উদ্ভূত। এর শাব্দিক অর্থ নিকটে আনা। جلابيب শব্দটি جلباب এর বহুবচন। অর্থ বিশেষ ধরনের লম্বা চাদর। এই চাদরের আকার-আকৃতি সম্পর্কে হযরত ইবনে মসউদ (রা) বলেন ঃ এই চাদর ওড়নার উপরে পরিধান করা হয়।—(ইবনে কাসীর) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ

امر الله نساء المؤمنين اذا خرجن من بيوتهن فى حاجة ان يغطين وجوههن من فوق رؤسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة ـ

আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের পত্নীগণকে আদেশ করেছেন, তারা যখন কোন প্রয়োজনে গৃহ থেকে বের হবে, তখন মস্তকের উপর দিক থেকে এই চাদর ঝুলিয়ে মুখমণ্ডল ঢেকে ফেলবে এবং পথ দেখার জন্য একটি চক্ষু খোলা রাখবে।—(ইবনে কাসীর)

ইমাম মুহম্মদ ইবনে সিরীন বলেন ঃ আমি হযরত ওবায়দা সালমানী (র)-কে এই আয়াতের উদ্দেশ্য এবং জিলবাবের আকার-আকৃতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি মস্তকের উপর দিক থেকে চাদর মুখমণ্ডলের উপর লটকিয়ে মুখমণ্ডল ঢেকে ফেললেন এবং কেবল বাম চক্ষু খোলা রেখে جلباب ও ادناء এর তফসীর কার্যত দেখিয়ে দিলেন।

মস্তকের উপর দিক থেকে মুখমণ্ডলের উপর চাদর লটকানো হচ্ছে عليهن শব্দের তফসীর—অর্থাৎ নিজের উপর চাদরকে নিকটবর্তী করার অর্থ চাদরকে মস্তকের উপর দিক থেকে লটকানো।

এ আয়াত পরিষ্কারভাবে মুখমণ্ডল আবৃত করার আদেশ ব্যক্ত করেছে। ফলে উপরে বর্ণিত পর্দার প্রথম আয়াতের বিষয়বস্তুর সমর্থন হয়ে গেছে। তাতে বলা হয়েছিল যে, মুখমণ্ডল ও হাতের তালু সতরের অন্তর্ভুক্ত না হলেও অনর্থের আশংকায় এগুলো আবৃত করা জরুরী। শুধুমাত্র অপারকতা এই হুকুম বহির্ভূত।

জরুরী জ্ঞাতব্য ঃ এ আয়াতে স্বাধীন নারীদেরকে এক বিশেষ ধরনের পর্দার আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, তারা মস্তকের উপর দিক থেকে চাদর লটকিয়ে মুখমণ্ডল ঢেকে ফেলবে, যাতে সাধারণ বাঁদীদের থেকে তাদের স্বাতন্ত্র্য ফুটে উটে এবং দুষ্টদের কবল থেকে নিরাপদ হয়ে যায়। উল্লিখিত বর্ণনায় এ কথাটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, এর অর্থ এরূপ কখনও নয় যে, ইসলাম সতীত্ব সংরক্ষণে স্বাধীন নারী ও বাঁদীদের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করেছে এবং স্বাধীন নারীদের সতীত্ব সংরক্ষণ করে বাঁদীদেরকে ছেড়ে দিয়েছে। বরং প্রকৃতপক্ষে এই পার্থক্য লম্পটরাই করে রেখেছিল। তারা স্বাধীন নারীদের উপর হস্তক্ষেপ করার দুঃসাহস করত না; কিন্তু বাঁদীদেরকে উত্ত্যক্ত করতে দ্বিধা করত না। শরীয়ত তাদের সৃষ্ট পার্থক্যকে এভাবে কাজে লাগিয়েছে যে, অধিকাংশ নারী তাদেরই স্বীকৃত নীতির মাধ্যমে আপনা-আপনি নিরাপদ হয়ে গেছে। এখন বাঁদীদের সতীত্ব সংরক্ষণের ব্যাপারটিও ইসলামে স্বাধীন নারীদের অনুরূপ ফরয ও জরুরী। কিন্তু এর জন্য আইনগত কঠোরতা অবলম্বন করা ব্যতীত গত্যন্তর নেই। তাই পরবর্তী আয়াতে এ আইনও ব্যক্ত করা হয়েছে যে, যারা এই কুকর্ম থেকে বিরত হবে না, তাদেরকে কিছুতেই ক্ষমা করা হবে না; বরং যেখানেই পাওয়া যাবে সেখানেই পাকড়াও করা হবে এবং হত্যা করা হবে। এ আইন বাঁদীদের সতীত্বও স্বাধীন নারীদের অনুরূপ সংরক্ষিত করে দিয়েছে।

উপরোক্ত সন্দেহ থেকে বাঁচার জন্য আল্লামা ইবনে হাযম প্রমুখ আলোচ্য আয়াতের তফসীর অধিকাংশ আলিমের তফসীর থেকে ভিন্নরূপ করার প্রয়াস পেয়েছেন। উপরোক্ত আলোচনা থেকে জানা গেল যে, এরূপ তফসীর করার প্রয়োজন নেই। বাঁদীদের হিফাযতের ব্যবস্থা না করা হলেই সন্দেহ হতে পারত।

মুসলমান হওয়ার পর ধর্ম ত্যাগের শাস্তি হত্যা ঃ আলোচ্য আয়াতে মুনাফিকদের দ্বিবিধ দুষ্কর্মের উল্লেখ করার পর তা থেকে বিরত না হলে এই শাস্তির বর্ণনা করা হয়েছে যে ঃ مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا —অর্থাৎ ওরা যেখানেই থাকবে অভিসম্পাত ও লাঞ্ছনা ওদের সঙ্গী হবে এবং যেখানেই পাওয়া যাবে, গ্রেফতার করত হত্যা করা হবে। এটা সাধারণ কাফিরদের শাস্তি নয়। কোরআন ও সুন্নাহর অসংখ্য বর্ণনা সাক্ষ্য দেয় যে, কাফিরদের জন্য শরীয়তে এরূপ আইন নেই; বরং তাদের জন্য আইন এই যে, প্রথমে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া হবে, তাদের সন্দেহ দূর করার চেষ্টা করা হবে। এর পরও ইসলাম গ্রহণ না করলে মুসলমানদের অনুগত যিম্মী হয়ে থাকার আদেশ দেওয়া হবে। তারা এটা মেনে নিলে তাদের জানমাল ও ইয্যত-আবরুর হিফাযত করা মুসলমানদের অনুরূপ ফরয হয়ে যাবে। তবে কেউ যদি এটাও না মানে এবং যুদ্ধ করতেই উদ্যত হয়, তবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আদেশ আছে।

আলোচ্য আয়াতে তাদেরকে সর্বাবস্থায় বন্দী ও হত্যার আদেশ শোনানো হয়েছে। এর কারণ এই যে, ব্যাপারটি ছিল মুনাফিকদের, তারা নিজেদেরকে মুসলমান বলত। কোন মুসলমান ইসলামের বিধানাবলীর প্রকাশ্য বিরোধিতা করলে শরীয়তের পরিভাষায় তাকে মুরতাদ বলা হয়। তার সাথে শরীয়তের কোন আপস নেই। তবে সে তওবা করে মুসলমান হয়ে গেলে ভিন্ন কথা। নতুবা তাকে হত্যা করা হবে। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সুস্পষ্ট উক্তি এবং সাহাবায়ে কিরামের কর্মপরম্পরা দ্বারা এটাই প্রমাণিত। মুসায়লামা কাযযাব ও তার দলের বিরুদ্ধে সাহবায়ে কিরামের ঐকমত্যে জিহাদ পরিচালনা এবং মুসায়লামার হত্যা এর যথেষ্ট সাক্ষী। আয়াতের শেষে একে আল্লাহ্ তা'আলার শাশ্বত রীতি বলা হয়েছে। এ থেকে জানা গেল যে, পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের শরীয়তেও মুরতাদের শাস্তি হত্যাই ছিল।

তফসীরের সার-সংক্ষেপে এসব শাস্তিকে সাধারণ কাফিরদের শাস্তির কাতারে আনার জন্য যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, উপরোক্ত বক্তব্যের পর এর প্রয়োজন থাকে না।

এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হল ঃ

(১) নারীরা প্রয়োজন বশত গৃহ থেকে বের হলে লম্বা চাদরে সর্বাঙ্গ আবৃত করে বের হবে এবং চাদরটি মাথার উপরদিক থেকে লটকিয়ে মুখমণ্ডলও আবৃত করবে। প্রচলিত বোরকাও এ চাদরের স্থলাভিষিক্ত হতে পারে।

(২) মুসলমানদের উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার কারণ হয়, এরূপ কোন গুজব ছড়ানো হারাম।

يَسْـَٔلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ ۖ قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُوْنُ قَرِيْبًا ﴿٦٣﴾ اِنَّ اللّٰهَ لَعَنَ الْكٰفِرِيْنَ وَاَعَدَّ لَهُمْ سَعِيْرًا ﴿٦٤﴾ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۚ لَا يَجِدُوْنَ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ﴿٦٥﴾ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوْهُهُمْ فِى النَّارِ يَقُوْلُوْنَ يٰلَيْتَنَآ اَطَعْنَا اللّٰهَ وَاَطَعْنَا الرَّسُوْلَا ﴿٦٦﴾ وَقَالُوْا رَبَّنَآ اِنَّآ اَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَاَضَلُّوْنَا السَّبِيْلَا ﴿٦٧﴾ رَبَّنَآ اٰتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيْرًا ﴿٦٨﴾

(৬৩) লোকেরা আপনাকে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলুন, এর জ্ঞান আল্লাহর কাছেই। আপনি কি করে জানবেন যে সম্ভবত কিয়ামত নিকটেই।

(৬৪) নিশ্চয় আল্লাহ্ কাফেরদেরকে অভিসম্পাত করেছেন এবং তাদের জন্য জ্বলন্ত অগ্নি প্রস্তুত রেখেছেন। (৬৫) তথায় তারা অনন্তকাল থাকবে এবং কোন অভিভাবক ও সাহায্য-কারী পাবে না। (৬৬) যেদিন অগ্নিতে তাদের মুখমণ্ডল ওলটপালট করা হবে; সেদিন তারা বলবে হায়! আমরা যদি আল্লাহ্র আনুগত্য করতাম ও রসূলের আনুগত্য করতাম (৬৭) তারা আরও বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা আমাদের নেতা ও বড়দের কথা মেনেছিলাম, অতপর তারা আমাদের পথভ্রষ্ট করেছিল। (৬৮) হে আমাদের পালনকর্তা! তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দিন এবং তাদেরকে মহা অভিসম্পাত করুন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(অবিশ্বাসী) লোকেরা আপনাকে কিয়ামত সম্পর্কে (অবিশ্বাসীসুলভ) প্রশ্ন করে (যে, কখন হবে?) আপনি (জওয়াবে) বলুন, এর (সময়ের) জ্ঞান আল্লাহ্র কাছেই, আর আপনি কি করে জানবেন (যে, কখন হবে, তবে সংক্ষেপে তাদের জেনে রাখা উচিত) সম্ভবত কিয়ামত নিকটেই। (কারণ, সময় যখন নির্দিষ্ট নেই; তখন নিকটপরিণামকে ভয় করা, এর প্রস্তুতি গ্রহণ করা এবং অবিশ্বাসীসুলভ জিজ্ঞাসাবাদ থেকে বেঁচে থাকা উচিত ছিল।

কিয়ামতকে আসন্ন বলার এক কারণ এটাও সম্ভবপর যে, কিয়ামত প্রত্যহ নিকটবর্তী হচ্ছে। যে বস্তু ক্রমশই সামনে থেকে আসছে, তাকে আসন্ন মনে করাই বুদ্ধিমত্তার কাজ। আরও একটি সম্ভাব্য কারণ এই যে, কিয়ামতের ভয়াবহ ঘটনাবলী ও কঠোরতা দৃষ্টে সারা বিশ্বের আয়ুষ্কালও সামান্য প্রতীয়মান হবে। হাজারো বছরের এই মেয়াদ কয়েকদিনের সমান অনুভূত হবে) নিশ্চয় আল্লাহ্ কাফিরদেরকে রহমত থেকে দূরে রেখেছেন এবং তাদের জন্য জ্বলন্ত অগ্নি প্রস্তুত রেখেছেন, তথায় তারা অনন্তকাল থাকবে এবং কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না। যেদিন তাদের মুখমণ্ডল অগ্নিতে ওলটপালট করা হবে, (অর্থাৎ মুখমণ্ডল অগ্নিতে ছেঁচড়ানো হবে— একবার এ পার্শ্ব ও একবার ওপার্শ্ব।) তখন তারা (আক্ষেপ করে) বলবে, হায়! আমরা যদি (দুনিয়াতে) আল্লাহ্র আনুগত্য করতাম এবং রসূলের আনুগত্য করতাম! (তবে আজ এ বিপদে পতিত হতাম না। আক্ষেপের সাথে সাথে পথভ্রষ্টকারীদের প্রতি রাগান্বিত হয়ে) তারা আরও বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা আমাদের নেতাদের (অর্থাৎ শাসকবর্গের) ও বড়দের (অর্থাৎ যাদের কথা মান্য করা অন্য কোন কারণে আমাদের জন্য জরুরী ছিল) কথা মেনেছিলাম, অতপর তারা আমাদেরকে (সরল পথ থেকে) পথভ্রষ্ট করেছিল। হে আমাদের পালনকর্তা! তাদেরকে দ্বিগুণ-শাস্তি দিন এবং তাদের প্রতি মহা অভিসম্পাত করুন। (এটা সূরা আ'রাফের নিম্নোক্ত আয়াতের বিষয়বস্তুর অনুরূপ— رَبَّنَا هَٰؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ -এর জওয়াব সেই আয়াতেই لِكُلٍّ ضِعْفٌ বলে দেওয়া হয়েছে।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্ ও রসূলের বিরুদ্ধাচরণকারীদেরকে ইহকাল ও পরকালে অভিসম্পাত ও শাস্তির সতর্কবাণী শোনানো হয়েছিল। কাফিরদের অনেকদল স্বয়ং কিয়ামত ও পরকালেই বিশ্বাসী ছিল না এবং অবিশ্বাস হেতু ঠাট্টা-বিদ্রূপছলে জিজ্ঞাসা করত, কিয়ামত কবে হবে? আলোচ্য আয়াতসমূহে তাদের জওয়াব দেওয়া হয়েছে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا ۚ وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا ﴿٦٩﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾

(৬৯) হে মু'মিনগণ! মূসাকে যারা কষ্ট দিয়েছে, তোমরা তাদের মত হয়ো না। তারা যা বলেছিল, আল্লাহ্ তা থেকে তাঁকে নির্দোষ প্রমাণ করেছিলেন। তিনি আল্লাহ্র কাছে ছিলেন মর্যাদাবান। (৭০) হে মু'মিনগণ! আল্লাহ্কে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল। (৭১) তিনি তোমাদের আমল-আচরণ সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপ-সমূহ ক্ষমা করবেন। যে কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

মু'মিনগণ, তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা (কিছু অপবাদ রটনা করে) মূসা (আ)-কে কষ্ট দিয়েছিল, অতপর তারা যা বলেছিল, তা থেকে আল্লাহ্ তাঁকে নির্দোষ প্রমাণ করেন। (অর্থাৎ তাঁর তো কোন ক্ষতি হয়নি—অপবাদ আরোপকারীরাই মিথ্যুক ও দণ্ডনীয় প্রতিপন্ন হয়েছে।) তিনি [অর্থাৎ মূসা (আ)] আল্লাহ্র কাছে খুব মর্যাদাবান (পয়গম্বর) ছিলেন। (তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নির্দোষ হওয়ার কথা প্রকাশ করে দিয়েছেন। অন্য পয়গম্বরগণের জন্যও এ ধরনের অপবাদ থেকে মুক্তি-দানের ঘটনা ব্যাপক। উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা রসূলের বিরোধিতা করে তাঁকে কষ্ট দিও না। কারণ, তাঁর বিরোধিতা প্রকারান্তরে আল্লাহ্রই বিরোধিতা। এই বিরোধিতার পরিণামে তোমরা নিজেদেরই ক্ষতি করবে। তাই প্রত্যেক কাজে আল্লাহ্ ও রসূলের আনুগত্য করো। অতপর এ নির্দেশই দেওয়া হয়েছেঃ) মু'মিনগণ, তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর। (অর্থাৎ প্রতি কাজে তাঁর আনুগত্য কর। বিশেষত কথাবার্তায় এদিকে

খুব লক্ষ্য রাখ। যখন কথা বলতে হয়,) সঠিক কথা বল, যাতে সততার সীমা-লঙ্ঘিত না হয়। আল্লাহ্ তা'আলা (এর প্রতিদান) তোমাদের আমল কবুল করবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন, (কিছু আমলের বরকতে এবং কিছু তওবার বরকতে, যা আল্লাহ্ভীতি ও সঠিক কথার অন্তর্ভুক্ত। এগুলো আনুগত্যের ফল। আনুগত্য এমন বিষয় যে,) যে কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে, সে মহাসাফল্য অর্জন করে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্বেকার আয়াতে বর্ণিত হয়েছিল যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলকে কষ্ট দেওয়া মারাত্মক বিপজ্জনক আচরণ। এ আয়াতে বিশেষভাবে মুসলমানদেরকে আল্লাহ্ ও রসূলের বিরোধিতা থেকে আত্মরক্ষার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কেননা এই বিরোধিতা তাঁদের কষ্টের কারণ।

মূসা (আ)-র সম্প্রদায় তাঁকে কষ্ট দিয়েছিল। প্রথম আয়াতে সেই ঘটনা উল্লেখ করে মুসলমানদেরকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, তোমরা তাদের মত হয়ো না। এর জন্য জরুরী নয় যে, মুসমলমানরা এরূপ কোন কাজ করেছিল; বরং কাজ করার পূর্বেই তাদেরকে এ কাহিনী শুনিয়ে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। হাদীসে কতক সাহাবীর যে ঘটনা বর্ণিত আছে, তার অর্থ এই যে, তারা কখনও এদিকে লক্ষ্য করেন নি যে, কথাটি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র জন্য কষ্টদায়ক হবে। কোন সাহাবী ইচ্ছাপূর্বক কষ্ট দিবেন এরূপ আশংকা ছিল না। ইচ্ছাপূর্বক কষ্ট দেওয়ার যত কাহিনী বর্ণিত আছে, সবগুলোর কর্তা মুনাফিক সম্প্রদায়। মূসা (আ)-র কাহিনী কি ছিল, তা স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সা) বর্ণনা করে এ আয়াতের তফসীর করেছেন। ইমাম বুখারী হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে রেওয়ায়েত করেন---হযরত মূসা (আ) অত্যন্ত লজ্জাশীল হওয়ার কারণে তাঁর দেহ ঢেকে রাখতেন। তাঁর শরীর কেউ দেখত না। তিনি পর্দার আড়ালে গোসল করতেন। তাঁর সম্প্রদায় বনী ইসরাঈলের মধ্যে সকলের সামনে উলঙ্গ হয়ে গোসল করার ব্যাপক প্রচলন ছিল। মূসা (আ) কারও সামনে গোসল করেন না দেখে কেউ কেউ বলাবলি করল---এর কারণ এই যে, তাঁর দেহে নিশ্চয় কোন খুঁত আছে---হয় তিনি ধবল কুষ্ঠরোগী, না হয় একশিরা রোগী। (অর্থাৎ তাঁর অণ্ডকোষ স্ফীত।) নতুবা তিনি অন্য কোন ব্যাধিগ্রস্ত। আল্লাহ্ তা'আলা এ ধরনের খুঁত থেকে মূসা (আ)-র নির্দোষিতা প্রকাশ করার ইচ্ছা করলেন। একদিন মূসা (আ) নির্জনে গোসল করার জন্য কাপড় খুলে একখণ্ড পাথরের উপর তা রেখে দিলেন। গোসল শেষে যখন হাত বাড়িয়ে কাপড় নিতে চাইলেন, তখন প্রস্তর খণ্ডটি (আল্লাহ্র আদেশে) নড়ে উঠল এবং তাঁর কাপড়সহ দৌড়াতে লাগল। মূসা (আ) তাঁর লাঠি নিয়ে প্রস্তরের পেছনে পেছনে "আমার কাপড়, আমার কাপড়" বল্তে বল্তে দৌড় দিলেন। কিন্তু প্রস্তরটি থামল না---যেতেই লাগল। অবশেষে প্রস্তরটি বনী ইসরাঈলের এক সমাবেশে পৌঁছে থেমে গেল। তখন সে সব লোক মূসা (আ)-কে আপাদমস্তক উলঙ্গ অবস্থায় দেখে নিল

এবং তাঁর দেহ নিখুঁত ও সুস্থ দেখতে পেল। (এতে তাদের বর্ণিত কোন খুঁত বিদ্যমান ছিল না।) এভাবে আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ)-র নির্দোষিতা সকলের সামনে প্রকাশ করে দিলেন। প্রস্তরখণ্ড থেমে যেতেই মূসা (আ) তাঁর কাপড় উঠিয়ে পরিধান করে নিলেন। অতপর তিনি লাঠি দ্বারা প্রস্তর খণ্ডকে মারতে লাগলেন। আল্লাহ্র কসম, মূসা (আ)-র আঘাতের কারণে পাথরের গায়ে তিন, চার অথবা পাঁচটি দাগ পড়ে গিয়েছিল।

এই ঘটনা বর্ণনা করে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ কোরআনের এই আয়াতের এটাই অর্থ। কোন কোন সাহাবী থেকে বর্ণিত আরও একটি কাহিনী খ্যাত আছে, যা এই আয়াতের তফসীরের সাথে সংযুক্ত। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রত্যক্ষ উক্তির মাধ্যমে যে তফসীর হয়, তাই অগ্রগণ্য।

وَكَانَ عِنْدَ اللّٰهِ وَجِيْهًا—অর্থাৎ মূসা (আ) আল্লাহ্র কাছে মর্যাদাবান ছিলেন। আল্লাহ্র কাছে কারও মর্যাদাবান হওয়ার অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তাঁর দোয়া কবূল করেন এবং তাঁর বাসনা অপূর্ণ রাখেন না। মূসা (আ) যে এরূপ ছিলেন, তার প্রমাণ কোরআনের অনেক ঘটনায় রয়েছে। এসব ঘটনায় তিনি যেভাবে আল্লাহ্র কাছে দোয়া করেছেন, সেভাবেই কবূল হয়েছে। এসব দোয়ার মধ্যে বিস্ময়কর দোয়া এই যে, তিনি হারূন (আ)-কে পয়গম্বর করার দোয়া করলে আল্লাহ্ তা'আলা তা কবূল করে তাঁকে তাঁর রিসালতে অংশীদার করে দেন। অথচ রিসালতের পদ কাউকে কারও সুপারিশের ভিত্তিতে দান করা হয় না।---(ইবনে কাসীর)

পয়গম্বরগণকে সব প্রকার দৈহিক দোষ থেকে মুক্ত রাখা আল্লাহ্র রীতি ঃ এ ঘটনায় সম্প্রদায়ের দোষারোপের জওয়াবে নির্দোষিতা প্রমাণের বিষয়টিকে আল্লাহ্ তা'আলা এত অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন যে, অলৌকিকভাবে প্রস্তর খণ্ড কাপড় নিয়ে দৌড়াতে শুরু করেছে এবং মূসা (আ) নিরুপায় অবস্থায় মানুষের সামনে উলঙ্গ হয়ে হাযির হয়েছেন। এই গুরুত্ব প্রদান এদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর পয়গম্বরগণের দেহকে ঘৃণাত্মক খুঁত থেকে সাধারণভাবে পবিত্র ও মুক্ত রেখেছিলেন। বুখারীর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, সকল পয়গম্বরকেই উচ্চবংশে জন্মদান করা হয়েছে। কেননা, সর্বসাধারণ যে বংশ ও পরিবারকে নিকৃষ্ট ও হীন মনে করে, সে পরিবারের কারও কথা শোনা ও মানা তাদের জন্য কঠিন হয়। অনুরূপভাবে পয়গম্বরগণের ইতিহাসে কোন পয়গম্বরের অন্ধ, কানা, মূক অথবা বিকলাঙ্গ হওয়ারও প্রমাণ নেই। হযরত আইয়ুব (আ)-এর ঘটনা দ্বারা এতে আপত্তি তোলা যায় না। কারণ সেটা আল্লাহ্র রহস্য অনুযায়ী একটা বিশেষ পরীক্ষার জন্য ক্ষণস্থায়ী ব্যাধি ছিল, যা পরে নিশ্চিহ্ন করা হয়েছিল।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ۙ يُّصْلِحْ لَكُمْ

قولا سديدا — اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم এর তফসীর কেউ কেউ সত্য কথা, কেউ সরল কথা, কেউ সঠিক কথা করেছেন। ইবনে কাসীর সবগুলো উদ্ধৃত করে বলেন, সবই ঠিক। কোরআন পাক এস্থলে مستقيم - صادق ইত্যাদি শব্দ বাদ দিয়ে سديد শব্দ ব্যবহার করেছে। কেননা এ শব্দের মধ্যে সব গুণাবলী বিদ্যমান রয়েছে। একারণেই কাশেমী রূহুল-বয়ানে বলেন, قول سديد এমন কথা যা সত্য তাতে মিথ্যার নামগন্ধও নেই, সঠিক যাতে ভুলের নামগন্ধ নেই, গাম্ভীর্যপূর্ণ যাতে ঠাট্টা ও রসিকতার নামগন্ধও নেই, কোমল যা হৃদয় বিদারক নয়।

মুখ সংশোধন সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও কর্ম সংশোধনের কার্যকর উপায়ঃ এ আয়াতে মুসলমানদের প্রতি মূল আদেশ হচ্ছে আল্লাহ্‌ভীতি অবলম্বন কর। এর স্বরূপ যাবতীয় আল্লাহ্‌র বিধানের পরিপূর্ণ আনুগত্য। অর্থাৎ যাবতীয় আদেশ পালন করা এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ ও মকরূহ কাজ থেকে বিরত থাকা। বলা বাহুল্য, এটা মানুষের জন্য সহজ কাজ নয়। তাই আল্লাহ্‌ভীতির আদেশের পর একটি বিশেষ কর্মের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ কথাবার্তা সংশোধন করা। এটাও আল্লাহ্‌ভীতিরই এক অংশ; কিন্তু এমন অংশ, যা করায়ত্ত হয়ে গেলে আল্লাহ্‌ভীতির অবশিষ্ট অংশগুলো আপনা-আপনি অর্জিত হতে থাকে; যেমন এ আয়াতেই সঠিক কথা অবলম্বনের ফলশ্রুতিতে يصلح لكم اعمالكم এর ওয়াদা করা হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা যদি মুখকে ভুল-ভ্রান্তি থেকে নিবৃত রাখ এবং সঠিক ও সরল কথা বলায় অভ্যস্ত হয়ে যাও, তবে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের সর্বকর্ম সংশোধন করে দেবেন। আয়াতের শেষে আরও ওয়াদা করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা এরূপ ব্যক্তির ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে দেবেন।

কোরআনী বিধানসমূহে সহজকরণের বিশেষ গুরুত্বঃ কোরআন পাকের সাধারণ পদ্ধতি সম্পর্কে চিন্তা করলে জানা যায় যে, যেখানেই কোন কঠিন ও দুরূহ আদেশ দেওয়া হয়, সেখানেই তা সহজ করার নিয়মও বলে দেওয়া হয়। আল্লাহ্‌ভীতি সমস্ত ধর্মকর্মের নির্যাস এবং এতে পুরোপুরি সাফল্য অর্জন করার ব্যাপার। তাই সাধারণভাবে যেখানে আল্লাহ্‌কে ভয় করার আদেশ দেওয়া হয়েছে, সেখানে এর পরেই এমন কর্ম বলে দেওয়া হয়েছে, যা অবলম্বন করলে আল্লাহ্‌ভীতির অন্যান্য স্তম্ভ পালন করা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সহজ করে দেওয়া হয়। আলোচ্য আয়াতে اتقوا الله আদেশের পর قولوا قولا سديدا শিক্ষা দেওয়া এরই একটি নযীর। এর পূর্বের

আয়াতে اتَّقُوا اللهَ আদেশের পর وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَىٰ বলে এ বিষয়ের প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে যে, আল্লাহ্র সৎ ও প্রিয় বান্দাদেরকে কষ্ট দেওয়া আল্লাহ্ভীতির পথে একটি বৃহৎ বাধা। এটা পরিত্যাগ করলে আল্লাহ্ভীতি সহজ হয়ে যাবে।

অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ — এতে আল্লাহ্ভীতিকে সহজ করার জন্য এমন লোকদের সংসর্গ অবলম্বন করতে বলা হয়েছে, যারা কথায় ও কাজে সাচ্চা। এর মানে যারা আল্লাহ্র ওলী। আরও এক আয়াতে اتَّقُوا اللهَ আদেশের সাথে وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ যোগ করা হয়েছে। এর অর্থ এই যে, প্রত্যেক মানুষের চিন্তা করা উচিত, সে আগামীকল্য অর্থাৎ কিয়ামতের দিনের জন্য কি পুঁজি প্রেরণ করেছে। এর সারমর্ম পরকাল চিন্তা। এটা আল্লাহ্ভীতির সকল স্তম্ভকেই সহজ করে দেয়।

মুখ ও কথার সংশোধন উভয় জাহানের কাজ ঠিক করে দেয়ঃ হযরত শাহ্ আবদুল কাদের দেহলভী (র) এ আয়াতের যে অনুবাদ করেছেন, তা থেকে জানা যায় যে, এ আয়াতে সোজা কথায় অভ্যস্ত হওয়ার কারণে কর্ম সংশোধনের ওয়াদা কেবল ধর্মীয় মর্মেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং দুনিয়ার সব কর্মও এতে দাখিল আছে। যে ব্যক্তি সঠিক কথায় অভ্যস্ত হয়, কখনও মিথ্যা বলে না, চিন্তাভাবনা করে দোষত্রুটি মুক্ত কথা বলে, প্রতারণা করে না এবং অন্যের মর্মপীড়ার কারণ হয় এমন কথা বলে না, তার পরকাল ও দুনিয়া উভয় জাহানের কর্ম সঠিক হয়ে যাবে। হযরত শাহ্ সাহেবের অনুবাদ এইঃ বল সোজা কথা, যাতে পরিপাটি করে দেন তোমার জন্যে তোমার কর্ম।

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ۖ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾ لِيُعَذِّبَ اللهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٧٣﴾

(৭২) আমি আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালার সামনে এই আমানত পেশ করেছিলাম, অতপর তারা একে বহন করতে অস্বীকার করল এবং এতে ভীত হল; কিন্তু মানুষ তা বহন করল। নিশ্চয় সে জালিম অজ্ঞ। (৭৩) যাতে আল্লাহ্ মুনাফিক পুরুষ, মুনাফিক নারী, মুশরিক পুরুষ, মুশরিক নারীদেরকে শাস্তি দেন এবং মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে ক্ষমা করেন। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি এই আমানত (অর্থাৎ আমানতরূপী বিধানাবলী) আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালার সামনে পেশ করেছিলাম। (অর্থাৎ তাদের মধ্যে কিছু চেতনা সৃষ্টি করে, যা এখনও আছে—আমার বিধানাবলী তাদের সামনে পেশ করেছিলাম। তাদের সামনে আরও পেশ করেছিলাম যে, এসব বিধান মেনে নিলে তোমাদেরকে পুরস্কার ও সম্মান দান করা হবে এবং না মানলে আযাব ও কষ্ট দেওয়া হবে। অতপর তাদেরকে এসব বিধান গ্রহণ করার ও গ্রহণ না করার এখতিয়ার দিয়ে বলেছিলাম, তোমরা যদি এগুলো গ্রহণ না কর, তবে আদিষ্ট সাব্যস্ত হবে না এবং সওয়াব ও আযাবের যোগ্য হবে না। উপরন্তু তোমাদেরকে অবাধ্যও বলা হবে না। তাদের মধ্যে যতটুকু চেতনা ছিল, তা সংক্ষেপে এই বিষয়বস্তু বুঝে নেওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল। তাদেরকে এখতিয়ার দেওয়ার কারণে) অতপর তারা (শাস্তির ভয়হেতু পুরস্কারের সম্ভাবনা থেকেও হাত গুটিয়ে নিল এবং) তার দায়িত্ব গ্রহণ করতে অস্বীকার করল এবং (এ দায়িত্বের ব্যাপারে) ভীত হল (যে, আল্লাহ্ জানেন এর পরিণাম কি হবে ! তারা যদি এটা গ্রহণ করত, তবে মানুষের মত তাদেরকেও জ্ঞানবুদ্ধি দান করা হত, যা বিধানাবলী, সওয়াব ও আযাব বোঝার জন্য জরুরী। তারা এটা গ্রহণ না করায় জ্ঞানবুদ্ধি দান করারও প্রয়োজন হয় নি। মোটকথা, তারা তো অস্বীকার করল) কিন্তু (যখন আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালার পর মানুষ সৃষ্টি করে তার সামনেও এ আমানত পেশ করা হল, তখন,) মানুষ (আল্লাহর জ্ঞানে তার প্রতিনিধিত্ব অবধারিত ছিল বিধায়) তা গ্রহণ করল। [সম্ভবত তখন পর্যন্ত তার মধ্যেও এতটুকুই প্রয়োজনীয় চেতনা বিদ্যমান ছিল এবং সম্ভবত অঙ্গীকার গ্রহণের পূর্বে এই আমানত পেশ করা হয়েছিল ও আমানত গ্রহণের ফলশ্রুতিতে অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছিল। অঙ্গীকার গ্রহণের সময় মানুষের মধ্যে জ্ঞানবুদ্ধির সঞ্চার করা হয়ে থাকবে। এটা কোন বিশেষ মানুষ যথা আদম (আ)-এর সামনে পেশ করা হয়নি বরং অঙ্গীকার গ্রহণের অনুরূপ এ পেশ করাও ব্যাপক ভিত্তিতে হয়ে থাকবে এবং মানুষের পক্ষ থেকে কবুল করাও ব্যাপকভাবে হয়ে থাকবে। সুতরাং আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালা আদিষ্ট হল না এবং মানুষ আদিষ্ট হয়ে গেল। আয়াতে এ ঘটনা স্মরণ করানোর রহস্য সম্ভবত তাই, যা অঙ্গীকার গ্রহণের ঘটনা স্মরণ করানোর মধ্যে ছিল। অর্থাৎ তোমরা স্বতঃ প্রণোদিত হয়ে এসব বিধান পালন করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছ। সুতরাং তা পালন করা

উচিত। জ্বিনজাতিও আদিষ্ট বিধায় সম্ভবত তারাও এই পেশ ও বহনের মধ্যে শরীক ছিল। কিন্তু এ স্থলে যেহেতু মানুষকে সম্বোধন করেই কথা বলা হয়েছে, তাই বিশেষভাবে মানুষই উল্লেখিত হয়েছে। এই দায়িত্ব গ্রহণের পর মানুষের আস্থা, সংখ্যাগরিষ্ঠের দিক দিয়ে এই হল যে,] নিশ্চয় সে (অর্থাৎ মানুষ করণীয় বিষয়াদিতে) জালিম (এবং জ্ঞাতব্য বিষয়াদিতে) অজ্ঞ (অর্থাৎ কর্ম ও বিশ্বাস উভয়ক্ষেত্রে বিরুদ্ধাচরণ করে। এ হচ্ছে সংখ্যাগরিষ্ঠের অবস্থা। সমষ্টিগতভাবে এই দায়িত্বের) পরিণাম এই হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী এবং মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারীদেরকে (কারণ তারাই বিধানাবলী বিনষ্ট করে) শাস্তি দেবেন এবং মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদের প্রতি মনোনিবেশ (ও দয়া) করবেন। (বিরুদ্ধাচরণের পরও যদি কেউ বিরত হয়, তাকেও মু'মিনদের শ্রেণীভুক্ত করে নেওয়া হবে। কেননা,) আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সমগ্র সূরায় রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সম্মান সম্ভ্রম ও আনুগত্যের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। সূরার উপসংহারে এই আনুগত্যের সুউচ্চ মর্যাদা ব্যক্ত করা হয়েছে। এতে আল্লাহ্ ও রসূলের আনুগত্য ও তাঁদের আদেশাবলী পালনকে 'আমানত' শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। এর কারণ পরে বর্ণিত হবে।

আমানতের উদ্দেশ্য কি ঃ এস্থলে আমানত শব্দের তফসীর প্রসঙ্গে সাহাবী তাবেয়ী প্রমুখ তফসীরবিদের অনেক উক্তি বর্ণিত আছে; যেমন শরীয়তের ফরয কর্মসমূহ, সতীত্বের হেফাযত, ধনসম্পদের আমানত, অপবিত্রতার গোসল, নামায, যাকাত, রোযা, হজ্জ ইত্যাদি। এ কারণেই অধিকাংশ তফসীরবিদ বলেন যে, ধর্মের যাবতীয় কর্তব্য ও কর্ম এই আমানতের মধ্যে দাখিল আছে।---(কুরতুবী)

তফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে, শরীয়তের যাবতীয় আদেশ-নিষেধের সমষ্টিই আমানত। আবূ হাইয়ান বাহরে-মুহীতে বলেন ঃ

الظاهر انها كل ما يؤتمن عليه من امر ونهى وشان ودين ودنيا والشرع كله امانة وهذا قول الجمهور

প্রত্যেক যে বিষয়ে মানুষের উপর আস্থা রাখা হয় অর্থাৎ আদেশ-নিষেধ এবং প্রত্যেক যে অবস্থা দীন-দুনিয়ার সাথে সম্পর্ক রাখে এবং সমগ্র শরীয়ত আমানত। এটাই অধিকাংশের উক্তি।

সারকথা এই যে, আমানতের উদ্দেশ্য হচ্ছে শরীয়তের বিধানাবলী দ্বারা আদিষ্ট হওয়া, যেগুলো পুরোপুরি পালন করলে জান্নাতের চিরস্থায়ী নিয়ামত এবং বিরোধিতা অথবা ত্রুটি করলে জাহান্নামের আযাব প্রতিশ্রুত। কেউ কেউ বলেন, আমানতের উদ্দেশ্য আল্লাহ্র বিধানাবলীর ভার বহনের যোগ্যতা ও প্রতিভা, যা বিশেষ স্তরের জ্ঞান-

বুদ্ধি ও চেতনার উপর নির্ভরশীল। উন্নতি এবং আল্লাহ্‌র প্রতিনিধিত্বের ক্ষমতা এই বিশেষ যোগ্যতার উপর নির্ভরশীল। যেসব সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে এই যোগ্যতা নেই, তারা স্বস্থানে যতই উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হোক না কেন, তারা তাদের স্থান থেকে উন্নতি করতে পারে না। এ কারণেই আকাশ, পৃথিবী এমনকি, ফেরেশতাগণের মধ্যেও উন্নতি নেই। তারা নৈকট্যের নিজ নিজ স্থানেই অনড় হয়ে আছে। তাদের অবস্থা এই—وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ—অর্থাৎ আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেরই একটি নির্দিষ্ট স্থান আছে।

আমানতের এই অর্থ অনুযায়ী আমানত সম্পর্কিত সকল হাদীস ও রেওয়ায়েত পরস্পর সামঞ্জস্যশীল হয়ে যায়। অধিকাংশ তফসীরবিদের উক্তিসমূহও এতে প্রায় একমত হয়ে যায়।

বুখারী, মুসলিম ও মসনদে আহমদের রেওয়ায়েতে হযরত হুযায়ফা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদেরকে দু'টি হাদীস শিক্ষা দিয়েছেন। তন্মধ্যে একটি আমরা চাক্ষুষ দেখে নিয়েছি এবং অপরটির অপেক্ষায় আছি।

প্রথম হাদীস এই যে, ধর্মের কৃতী সন্তানদের অন্তরে আমানত নাযিল করা হয়েছে, অতপর কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে ফলে মু'মিনরা কোরআন থেকে জ্ঞান অর্জন করেছে এবং সুন্নাহ থেকে কর্মের আদর্শ লাভ করেছে।

দ্বিতীয় হাদীস এই যে, (এক সময় আসবে যখন) মানুষ নিদ্রা থেকে জাগ্রত হতেই তার অন্তর থেকে আমানত ছিনিয়ে নেওয়া হবে এবং তার এমন কিছু চিহ্নমাত্র থেকে যাবে, যেমন কেউ আগুনের অঙ্গার পায়ে সরিয়ে দিল। (অঙ্গার তো দূরে সরে গেল কিন্তু) তার চিহ্ন ফোসকার আকারে পায়ে থেকে গেল। অথচ এতে অগ্নির কোন অংশ নেই .... মানুষ পরস্পরে লেনদেন ও চুক্তি করবে, কিন্তু আমানতের হক কেউ আদায় করবে না। (আমানতদার লোকের এমন অভাব দেখা দেবে যে,) মানুষ বলবে, অমুক গোত্রের মধ্যে একজন আমানতদার আছে।

এই হাদীসে মানুষের অন্তরের সাথে সম্পর্কশীল একটি বিষয়কে আমানত বলা হয়েছে। এ বিষয়টিই শরীয়তের আদেশ-নিষেধ দ্বারা আদিষ্ট হওয়ার যোগ্যতা রাখে।

মসনদে আহমদে বর্ণিত হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমরের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, চারটি বস্তু এমন যে, এগুলো অর্জিত হয়ে গেলে দুনিয়ার অন্য কোন বস্তু অর্জিত না হলেও পরিতাপের কিছু নেই। সেগুলো এই ঃ আমানতের হিফাযত, সত্যবাদিতা, নিষ্কলুষ চরিত্র, হালাল খাদ্য। (ইবনে-কাসীর)

আমানত কিরূপে পেশ করা হবে ঃ উল্লিখিত আয়াতে বলা হয়েছে যে, আমি আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালার সামনে আমানত পেশ করেছিলাম। তারা সকলেই

এর বোঝা বহন করতে অস্বীকার করল এবং এর যথার্থ হক আদায় করার ব্যাপারে ভীত হয়ে গেল। কিন্তু মানুষ এই বোঝা বহন করে নিল।

এখানে চিন্তাসাপেক্ষ বিষয় এই যে, আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালা বাহ্যত অপ্রাণীবাচক ও চেতনাহীন বস্তু। তাদের সামনে আমানত পেশ করা এবং তাদের প্রত্যুত্তর দেওয়া কি প্রকারে সম্ভব হল?

কেউ কেউ একে রূপক ও উপমা সাব্যস্ত করেছেন। যেমন কোরআন পাক এক জায়গায় উপমাস্বরূপ বলেছে ঃ

لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ অর্থাৎ আমি এই কোরআন পর্বতের উপর নাযিল করলে আপনি দেখতেন যে, পর্বতও এর ভারে নুয়ে পড়ত এবং আল্লাহ্র ভয়ে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। এখানে ধরে নেওয়ার পর্যায়ে এই উপমা বর্ণিত হয়েছে। আক্ষরিক অর্থে পর্বতের উপরে অবতীর্ণ করা উদ্দেশ্য নয়। اِنَّا عَرَضْنَا আয়াতও তাঁদের মতে তেমনি একটি উপমা।

কিন্তু অধিকাংশ আলিমের মতে এটা ঠিক নয়। কেননা, এর প্রমাণস্বরূপ যে আয়াত পেশ করা হয়েছে, তাতে কোরআন পাক لو শব্দ ব্যবহার করে ব্যাপারটি যে নিছক ধরে নেওয়ার পর্যায়ে, তা নিজেই প্রকাশ করে দিয়েছে। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। একে কোন প্রমাণ ব্যতিরেকে রূপক ও উপমা মেনে নেওয়া বৈধ হবে না। যদি প্রমাণ পেশ করা হয় যে, এসব বস্তু অচেতন ও জড়, এদের সাথে প্রশ্নোত্তর হতে পারে না, তবে তা কোরআনের অন্যান্য বর্ণনা দৃষ্টে প্রত্যাখ্যাত হবে। কারণ, কোরআন পাকের স্পষ্ট ইরশাদ এই ঃ وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তু আল্লাহ্র হামদ, পবিত্রতা ঘোষণা করে। বলা বাহুল্য, আল্লাহ্কে চেনা এবং তাকে স্রষ্টা, মালিক, সর্বোচ্চ ও সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান করে তাঁর স্তুতি পাঠ করা চেতন ও উপলব্ধি ব্যতীত সম্ভবপর নয়। তাই এ আয়াত দৃষ্টে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, উপলব্ধি ও চেতনা সকল সৃষ্টবস্তুর মধ্যে এমন কি, জড় পদার্থের মধ্যেও বিদ্যমান আছে। এই উপলব্ধি ও চেতনার ভিত্তিতেই তাদেরকে সম্বোধন করা যায় এবং তারা উত্তরও দিতে পারে। উত্তর শব্দ ও অক্ষরের মাধ্যমেও হতে পারে। এতে বুদ্ধিগত কোন অসম্ভাব্যতা নেই। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালাকে বাকশক্তি দিতে পারেন। তাই অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে আকাশ, পৃথিবী ও

পর্বতমালার সামনে আক্ষরিক অর্থেই আমানত পেশ করা হয়েছে এবং তারা আক্ষরিক অর্থেই এ বোঝা বহন করতে অক্ষমতা প্রকাশ করেছে। এতে কোন উপমা অথবা রূপকতা নেই।

আমানত ইচ্ছাধীন পেশ করা হয়েছিল, বাধ্যতামূলক নয়ঃ এখানে প্রশ্ন হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং যখন আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালার সামনে আমানত পেশ করলেন, তখন তাদের তা বহন করতে অস্বীকার করার শক্তি কিরূপে হল? আল্লাহ্র অবাধ্যতার কারণে তাদের তো নাস্তানাবুদ হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। এছাড়া আকাশ ও পৃথিবী যে আল্লাহ্র আজ্ঞাবহ ও অনুগত, তা কোরআনের আয়াত أَتَيْنَا طَائِعِيْنَ বাক্যটি দ্বারাও প্রমাণিত। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যখন তাদেরকে নির্দেশ দিলেন আমার আদেশ পালন করার জন্যে সানন্দে অথবা বাধ্যতামূলকভাবে উপস্থিত হও, তখন তারা উত্তরে বলল, আমরা সানন্দে উপস্থিত আছি।

এ প্রশ্নের জওয়াব এই যে, এ আয়াতে তাদেরকে এক শাসকসুলভ অনুবর্তিতার আদেশ দেওয়া হয়েছিল যাতে একথাও বলে দেওয়া হয়েছিল যে, তোমরা রাযী হও অথবা গররাযী, সর্বাবস্থায় এ আদেশ মানতে হবে। কিন্তু আমানত পেশ করার আয়াত এরূপ নয়। এতে আমানত পেশ করে তাদেরকে কবুল করা ও কবুল না করার এখতিয়ার দেওয়া হয়েছিল।

ইবনে-কাসীর ইবনে-আব্বাস, হাসান বসরী, মুজাহিদ প্রমুখ একাধিক সাহাবী ও তাবেয়ী থেকে আমানত পেশ করার এই বিবরণ উদ্ধৃত করেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা প্রথমে আকাশের সামনে অতপর পৃথিবীর সামনে এবং শেষে পর্বতমালার সামনে ইচ্ছাধীন আকারে এ বিষয় পেশ করেন যে, আমার আমানতের বোঝা নির্ধারিত প্রতিদানের বিনিময়ে তোমরা বহন কর। প্রত্যেকেই বিনিময় কি, তা জানতে চাইলে বলা হল, তোমরা পূর্ণরূপে আমানত বহন করলে অর্থাৎ বিধানাবলী পুরোপুরি পালন করলে পুরস্কার, সওয়াব এবং আল্লাহ্র কাছে বিশেষ সম্মান লাভ করবে। পক্ষান্তরে বিধানাবলী পালন না করলে অথবা ত্রুটি করলে আযাব ও শাস্তি দেওয়া হবে। একথা শুনে এসব বিশালকায় সৃষ্টি জওয়াব দিল, হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা এখনও আপনার আজ্ঞাবহ দাস; কিন্তু আমাদেরকে যখন এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে, তখন আমরা এ বোঝা বহন করতে নিজেদেরকে অক্ষম পাচ্ছি। আমরা সওয়াবও চাই না এবং আযাবও ভোগ করার শক্তি রাখি না।

তফসীরে-কুরতুবীতে উদ্ধৃত হযরত ইবনে-আব্বাস (রা)-এর বাচনিক রিওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, অতপর আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আদম (আ)-কে সম্বোধন করে বললেন, আমি আমার আমানত আকাশ ও পৃথিবীর সামনে পেশ করেছিলাম, তখন তারা এই বোঝা বহন করতে অক্ষমতা প্রকাশ করেছে। এখন তুমি কি এর নির্ধারিত প্রতিদানের বিনিময়ে এই আমানত বহন করতে সম্মত আছ? আদম (আ)

জিজ্ঞাসা করলেন, হে পালনকর্তা, এর বিনিময়ে কি প্রতিদান পাওয়া যাবে? উত্তর হল, পূর্ণাঙ্গ আনুগত্য করলে পুরস্কার পাবে (যা আল্লাহ্র নৈকট্য, সন্তুষ্টি ও জান্নাতের চিরস্থায়ী নিয়ামতের আকারে হবে)। পক্ষান্তরে যদি এই আমানত পণ্ড কর, তবে শাস্তি পাবে। আদম (আ) আল্লাহ্র নৈকট্য ও সন্তুষ্টিতে উন্নতি লাভের আগ্রহে এ বোঝা বহন করে নিলেন। বোঝা বহনের পর যোহর থেকে আসর পর্যন্ত যতটুকু সময়, ততটুকু সময়ও অতিবাহিত হতে পারেনি, ইতিমধ্যে শয়তান তাকে সুপ্রসিদ্ধ পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত করে দিল এবং তিনি জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত হলেন।

আমানত কখন পেশ করা হয়েছিল? উপরে বর্ণিত রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, আদম সৃষ্টির পূর্বেই আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালার সামনে আমানত পেশ করা হয়েছিল। আদম সৃষ্টির পর তাঁর কাছে এ কথাও প্রকাশ করা হয়েছিল যে, তোমার পূর্বে আকাশ ও পৃথিবীর সামনেও এই আমানত পেশ করা হয়েছে। তাদের শক্তি ছিল না বিধায় তারা অক্ষমতা প্রকাশ করেছে।

বাহ্যত বোঝা যায় যে, أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ অঙ্গীকার গ্রহণের পূর্বে এই আমানত পেশ করার ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। কেননা এই অঙ্গীকার আমানতের বোঝা বহন করার প্রথম দফা এবং পদের শপথ করার স্থলাভিষিক্ত।

পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য আমানত বহনের যোগ্যতা জরুরী ছিল ঃ আল্লাহ্ তা'আলা আদি তকদীরে স্থির করে নিয়েছিলেন যে, তিনি আদম (আ)-কে পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি নিযুক্ত করবেন। এ প্রতিনিধিত্ব তাকেই দান করা যেত, যে আল্লাহ্র বিধানাবলী মেনে চলার দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারত। কেননা এই প্রতিনিধিত্বের অর্থ এই যে, পৃথিবীতে আল্লাহ্র আইন প্রয়োগ করবে এবং মানব জাতিকে আল্লাহ্র বিধানাবলীর আনুগত্যে উদ্বুদ্ধ করবে। তাই সৃষ্টিগতভাবে হযরত আদম (আ) এই আমানত বহন করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন। অথচ তিনি জানতেন যে, বিশালকায় সৃষ্টবস্তু এ ব্যাপারে অক্ষমতা প্রকাশ করেছে।—(মাযহারী)

إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا—ظلوم অর্থ নিজের প্রতি জুলুমকারী এবং جهول এর মর্মার্থ পরিণামের ব্যাপারে অজ্ঞ। এ বাক্য থেকে বাহ্যত বোঝা যায় যে, এতে সর্বাবস্থায় মানুষের নিন্দা করা হয়েছে যে, এই অর্বাচীন সাধ্যাতীত বিরাট বোঝা বহন করে নিজের প্রতি জুলুম করেছে; কিন্তু কোরআনী বর্ণনাদৃষ্টে বাস্তবে তা নয়। কেননা মানুষ বলে হযরত আদম (আ) বোঝানো হলে তিনি তো নিষ্পাপ পয়গম্বর। তিনি নিজের উপর অর্পিত দায়িত্ব পুরোপুরি আদায় করেছেন। এরই ফলশ্রুতিতে তাঁকে আল্লাহ্র প্রতিনিধি করে পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়। তাঁকে ফেরেশতাদের দ্বারা সিজদা করানো হয়। পরকালে তাঁর মর্যাদা ফেরেশতাদেরও ঊর্ধ্বে রাখা হয়। পক্ষান্তরে মানুষ বলে সমগ্র মানবজাতি বোঝানো হলে তাদের মধ্যে লাখো পয়গম্বর রয়েছেন এবং কোটি

কোটি সৎকর্মপরায়ণ ওলী রয়েছেন, যাদের প্রতি ফেরেশতাগণও ঈর্ষা করেন। তাঁরা কর্মের মাধ্যমে প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, তাঁরা এই আল্লাহর আমানতের যথার্থই হকদার ছিলেন। তাঁদের কারণে কোরআন পাক মানব জাতিকে 'আশরাফুল মখলুকাত' আখ্যায়িত করেছে। বলা হয়েছে وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ এ থেকে প্রমাণিত হল যে, আদম (আ) ও সমগ্র মানব জাতি---কেউই নিন্দার পাত্র নয়। এ কারণেই তফসীরবিদগণ বলেন যে, উপরোক্ত বাক্যটি নিন্দার জন্য নয়; বরং অধিকাংশ ব্যক্তির বাস্তব অবস্থা বর্ণনা করার জন্য অবতারণা করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, মানব জাতির অধিকাংশ যালিম ও অজ্ঞ প্রমাণিত হয়েছে। তারা এই আমানতের হক আদায় করেনি এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অধিকাংশের অবস্থা বিধায় একে মানব জাতিরই অবস্থা বলে দেয়া হয়েছে।

সারকথা এই যে, আয়াতে বিশেষভাবে সেই ব্যক্তিবর্গকে যালিম ও অজ্ঞ বলা হয়েছে, যারা শরীয়তের আনুগত্যে সফলকাম হয়নি এবং আমানতের হক আদায় করেনি। কাফির, মুনাফিক ও পাপাচারী মুসলমান সকলেই এর অন্তর্ভুক্ত। হযরত ইবনে আব্বাস, ইবনে যুবায়ের হাসান বসরী (র) প্রমুখ থেকে একই তফসীর বর্ণিত আছে।---(কুরতুবী)

কেউ কেউ বলেন ظلوم ও جهول শব্দদ্বয় এ স্থলে সরল গোবেচারা অর্থে আদরের সুরে বলা হয়েছে। অর্থাৎ সে আল্লাহ্ তা'আলার মহব্বতে ও তাঁর নৈকট্যের আশায় পরিণামের কথা চিন্তা করেনি। এভাবে এ শব্দদ্বয় গোটা মানবজাতির জন্যও হতে পারে। তফসীরে মাযহারীতে হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানী (র) ও অন্যান্য সূফী বুযুর্গ থেকে এ ধরনের বিষয়বস্তু বর্ণিত আছে।

لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ—এখানে لام অব্যয়টি কারণ ও উদ্দেশ্য বর্ণনা অর্থে নয়; বরং ব্যাকরণের পরিভাষায় একে لام عاقبت বলা হয়। আয়াতের অর্থ এই যে, পরিণামে আল্লাহ্ তা'আলা মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীদেরকে এবং মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারীদেরকে শাস্তি দেবেন এবং মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদেরকে পুরস্কৃত করবেন। এক আরবী কবিতায় এই لام এভাবে ব্যবহৃত হয়েছে لدوا للموت وابنوا للخراب— অর্থাৎ জন্মগ্রহণ কর পরিণামে মৃত্যুর জন্য এবং নির্মাণ কর পরিণামে বিধ্বস্ত হওয়ার জন্য। উদ্দেশ্য এই যে, প্রত্যেক জন্মগ্রহণকারীর পরিণাম মৃত্যু এবং প্রত্যেক নির্মাণের পরিণাম ধ্বংস।

حَمَلَهَا الْإِنْسَانُ -এর সাথে এ বাক্যটি সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ মানুষ যে

আমানতের বোঝা বহন করেছে, এর পরিণামে মানুষ দু'দলে বিভক্ত হয়ে যাবে—এক. কাফির, মুনাফিক ইত্যাদি, যারা অবাধ্য হয়ে আমানত নষ্ট করে দেবে তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে। দুই. মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারী। যারা আনুগত্যের মাধ্যমে আমানতের হক আদায় করবে। তাদের সাথে অনুগ্রহ ও ক্ষমাসুন্দর ব্যবহার করা হবে।

পূর্বে ظلوم ও جهول শব্দদ্বয়ের এক তফসীরে বলা হয়েছে যে, এটা সমগ্র মানবজাতির জন্য নয়; বরং বিশেষ ধরনের লোকদের জন্য বলা হয়েছে, যারা আল্লাহ্‌র আমানতকে নষ্ট করে দেবে। উপরোক্ত সর্বশেষ বাক্যেও এ তফসীরের সমর্থন রয়েছে।

سورة السبا

সূরা সাবা

মক্কায় অবতীর্ণ, ৫৪ আয়াত, ৬ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِى الْاٰخِرَةِ ؕ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ۝ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِى الْاَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيْهَا ؕ وَهُوَ الرَّحِيْمُ الْغَفُوْرُ ۝

পরম করুণাময় ও অসীম দাতা আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি নভোমণ্ডলে যা আছে এবং ভূমণ্ডলে যা আছে সবকিছুর মালিক এবং তাঁরই প্রশংসা পরকালে। তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ। (২) তিনি জানেন যা ভূগর্ভে প্রবেশ করে, যা সেখান থেকে নির্গত হয়, যা আকাশ থেকে বর্ষিত হয় এবং যা আকাশে উত্থিত হয়। তিনি পরম দয়ালু, ক্ষমাশীল।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

সমস্ত প্রশংসা (ও গুণকীর্তন) আল্লাহ্‌র জন্য শোভনীয়, যিনি নভোমণ্ডলে যা আছে এবং ভূমণ্ডলে যা আছে সবকিছুর মালিক। (তিনি ইহকালে যেমন প্রশংসার হকদার, তেমনি) পরকালেও প্রশংসা (ও গুণকীর্তন) তাঁরই জন্য শোভনীয়। (এটা এভাবে প্রকাশ পাবে যে, জান্নাতীরা জান্নাতে প্রবেশ করার পর এ ভাষায় আল্লাহ্‌র প্রশংসা করবে ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ هَدَانَا لِهٰذَا ـ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ صَدَقَنَا وَعْدَهٗ

ইত্যাদি) তিনি প্রজ্ঞাময়, (আকাশ ও পৃথিবীর সমুদয় সৃষ্টিকে অসংখ্য উপযোগিতা ও উপকারিতা সম্বলিত করে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি) সর্ব বিষয়ে অবহিত। (এসব উপযোগিতা ও উপকারিতা সৃষ্টি করার পূর্বেই এ সম্পর্কে অবহিত। তিনি এমন খবরদার যে) তিনি জানেন যা ভূ-গর্ভে প্রবেশ করে (যথা বৃষ্টির পানি) এবং যা তা থেকে নির্গত হয় (যথা বৃক্ষ ও সাধারণ উদ্ভিদ) এবং যা আকাশ থেকে বর্ষিত হয় এবং যা আকাশে উত্থিত হয় (যেমন ফেরেশতাগণ আকাশে উঠানামা করেন, শরীয়তের বিধানাবলী আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয় এবং সৎকর্মসমূহ আকাশে উত্থিত হয়। এসব বিষয়ের মধ্যে দৈহিক ও আত্মিক উপকারিতা আছে। এসব উপকারিতার দাবি এই যে, সব মানুষ আল্লাহ্ তা'আলার পূর্ণ কৃতজ্ঞ হবে এবং কেউ ত্রুটি করলে সে শাস্তি পাবে। কিন্তু) তিনি (আল্লাহ্) পরম দয়ালু (এবং) ক্ষমাশীল (ও স্বীয় রহমতে সগীরা গোনাহ্ সৎকর্মের ফলে, কবীরা গোনাহ্ তওবার ফলে এবং উভয় প্রকার গোনাহ্ কেবল স্বীয় কৃপায় ক্ষমা করে দেন। কুফর ও শিরকের গোনাহ্ ঈমানের মাধ্যমে ক্ষমা করে দেন)।

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَأْتِيْنَا السَّاعَةُ ۖ قُلْ بَلٰى وَرَبِّيْ لَتَأْتِيَنَّكُمْ ۙ
عٰلِمِ الْغَيْبِ ۚ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ
وَلَآ اَصْغَرُ مِنْ ذٰلِكَ وَلَآ اَكْبَرُ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ﴿٣﴾ لِّيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۗ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ﴿٤﴾ وَالَّذِيْنَ سَعَوْ فِيْٓ
اٰيٰتِنَا مُعٰجِزِيْنَ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّنْ رِّجْزٍ اَلِيْمٌ ﴿٥﴾ وَيَرَى الَّذِيْنَ
اُوْتُوا الْعِلْمَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ هُوَ الْحَقَّ ۙ وَيَهْدِيْٓ اِلٰى
صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ﴿٦﴾ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلٰى
رَجُلٍ يُّنَبِّئُكُمْ اِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ۙ اِنَّكُمْ لَفِيْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ﴿٧﴾
اَفْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَمْ بِهٖ جِنَّةٌ ۗ بَلِ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ فِي
الْعَذَابِ وَالضَّلٰلِ الْبَعِيْدِ ﴿٨﴾ اَفَلَمْ يَرَوْا اِلٰى مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ

مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ۭ اِنْ نَّشَاْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْاَرْضَ اَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ السَّمَآءِ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيْبٍ ⑨

(৩) কাফিররা বলে, আমাদের উপর কিয়ামত আসবে না। বলুন, কেন আসবে না? আমার পালনকর্তার শপথ—অবশ্যই আসবে। তিনি অদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত। নভোমণ্ডলে ও ভূ-মণ্ডলে তাঁর অগোচরে নয় অণু পরিমাণ কিছু, না তদপেক্ষা ক্ষুদ্র এবং না বৃহৎ—সমস্তই আছে সুস্পষ্ট কিতাবে। (৪) তিনি পরিণামে যারা মু'মিন ও সৎকর্ম-পরায়ণ, তাদেরকে প্রতিদান দেবেন। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক রিযিক। (৫) আর যারা আমার আয়াতসমূহকে ব্যর্থ করার জন্যে উঠেপড়ে লেগে যায়, তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (৬) যারা জ্ঞানপ্রাপ্ত, তারা আপনার পালনকর্তার নিকট থেকে অবতীর্ণ কোরআনকে সত্য জ্ঞান করে এবং এটা মানুষকে পরাক্রমশালী, প্রশংসার্হ আল্লাহ্র পথপ্রদর্শন করে। (৭) কাফিররা বলে, আমরা কি তোমাদেরকে এমন ব্যক্তির সন্ধান দেব, যে তোমাদেরকে খবর দেয় যে; তোমরা সম্পূর্ণ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেও তোমরা নতুন সৃজিত হবে? (৮) সে আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা বলে, না হয় সে উন্মাদ এবং যারা পরকালে অবিশ্বাসী, তারা আযাবে ও ঘোর পথভ্রষ্টতায় পতিত আছে। (৯) তারা কি তাদের সামনের ও পশ্চাতের আকাশ ও পৃথিবীর প্রতি লক্ষ্য করে না? আমি ইচ্ছা করলে তাদের সহ ভূমি ধসিয়ে দেব অথবা আকাশের কোন খণ্ড তাদের উপর পতিত করব। আল্লাহ্ অভিমুখী প্রত্যেক বান্দার জন্য এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

কাফিররা বলে, আমাদের উপর কিয়ামত আসবে না। আপনি বলে দিন, কেন (আসবে না)? আমার অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাত পালনকর্তার শপথ, তা অবশ্যই তোমাদের উপর আসবে। (তাঁর জ্ঞান এমন সুবিস্তৃত ও সর্বব্যাপী যে,) তাঁর অগোচরে নয় অণু পরিমাণ কিছু, না আকাশে, না পৃথিবীতে (বরং সবই তাঁর জ্ঞানে উপস্থিত) এবং না তদপেক্ষা ক্ষুদ্র, না বৃহৎ—সমস্তই (আল্লাহ্র জ্ঞান সর্বব্যাপী হওয়ার কারণে) সুস্পষ্ট কিতাবে (লওহে মাহফুযে) আছে।

(কিয়ামত সম্পর্কে কাফিরদের একাধিক সন্দেহ ছিল। এক. কিয়ামত যদি আসেই, তবে কখন আসবে বলুন اَيَّانَ مُرْسٰهَا দুই. যেসব অংশ একত্র করে তাতে জীবন সঞ্চার করা হবে বলা হয় সেগুলোর তো নাম-নিশানাও থাকবে না। কাজেই একত্র করা হবে কিরূপে?

অদৃশ্য জ্ঞান সপ্রমাণ করার উপরোক্ত বিষয়বস্তুর দ্বারা প্রথমে সন্দেহের জওয়াব হয়ে গেছে। অর্থাৎ কিয়ামতের সময়জ্ঞান বিশেষভাবে আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্কযুক্ত। পয়গম্বরের এটা জানা না থাকলে জরুরী হয় না যে, কিয়ামত সংঘটিত হবে না। আল্লাহ্ বলেন, قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ পক্ষান্তরে সর্বব্যাপী জ্ঞান সপ্রমাণ করার দ্বারা দ্বিতীয় সন্দেহের জওয়াব হয়ে গেছে। অর্থাৎ মানবদেহের সমুদয় অংশ পৃথিবীতে বিক্ষিপ্ত ও বাতাসে ছড়িয়ে পড়া সত্ত্বেও আমার জ্ঞানের অগোচরে আসবে না। আমি যখন ইচ্ছা একত্র করে নেব। আল্লাহ্ বলেন اَفَلَمْ يَرَوْا الخ এখন কিয়ামতের উদ্দেশ্য বর্ণিত হচ্ছে।) যাতে মু'মিন ও সৎকর্মপরায়ণদেরকে (উত্তম) প্রতিদান দেন। (সুতরাং) তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও (জান্নাতে) সম্মানজনক রিযিক। আর যারা আমার আয়াতসমূহকে বানচাল করার চেষ্টা করে নবীকে পরাস্ত করার জন্য, (যদিও এ চেষ্টায় ব্যর্থও হয়) তাদের জন্য কঠোর মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে। (কোরআনের আয়াত বানচাল করার জন্য এ শাস্তি হওয়াই উচিত। কেননা কোরআন সত্য ও আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ এরূপ সত্যকে বানচাল করা স্বয়ং আল্লাহ্‌কে মিথ্যা বলার শামিল। দ্বিতীয়ত কোরআন সৎপথ প্রদর্শন করে। যে একে অমান্য করবে, সে ইচ্ছাপূর্বক সৎপথ থেকে দূরে থাকবে। সে বিশুদ্ধ বিশ্বাস ও সৎকর্মের সন্ধান পাবে না। এটাই ছিল মুক্তির পথ। সুতরাং ইচ্ছাপূর্বক মুক্তির পথ বর্জন করার কারণে শাস্তি হওয়া অন্যায় নয়। কোরআন সত্য ও পথপ্রদর্শক তা সপ্রমাণ করার এক সহজ পদ্ধতি এই যে) যারা (ঐশী গ্রন্থসমূহের) জ্ঞান প্রাপ্ত, তারা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আপনার প্রতি অবতীর্ণ কোরআনকে সত্য জ্ঞান করে এবং এটা পরাক্রমশালী, প্রশংসার্হ আল্লাহ্‌র (সন্তুষ্টির) পথপ্রদর্শন করে। (এ সম্পর্কে সূরা শোয়ারায়ে আলোচনা করা হয়েছে। কিয়ামতের খবর সম্বলিত হওয়ার কারণে কোরআনের সত্যতাকেই এ স্থলে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। নতুবা ঈমানের জন্য আরও অনেক জরুরী বিষয় রয়েছে। সুতরাং সার কথা হল এই যে, কিয়ামতের দিন এই কিয়ামতকে মিথ্যা বলার কারণেও শাস্তি হবে। অতপর আবার কিয়ামত সপ্রমাণ করা হয়েছে।) কাফিররা (পরস্পরে) বলে, আমরা তোমাদেরকে এমন ব্যক্তির সন্ধান দেব কি, যে তোমাদেরকে (বিস্ময়কর) খবর দেয় যে, তোমরা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেও (কিয়ামতের দিন) তোমরা নতুন সৃজিত হবে। সে আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে (ইচ্ছাপূর্বক) মিথ্যা বলে, না হয় সে উন্মাদ। (ফলে ইচ্ছা ছাড়াই মিথ্যা বলছে। কেননা, এটা অসম্ভব বিধায় এ সম্পর্কিত খবর মিথ্যা। আল্লাহ্ বলেন, আমার নবী মিথ্যাবাদী ও উন্মাদ কিছুই নয়) বরং যারা পরকালে অবিশ্বাসী তারাই আযাব ও ঘোর পথভ্রষ্টতায় পতিত। এই পথভ্রষ্টতার নগদ প্রতিক্রিয়াস্বরূপ সত্যবাদী মিথ্যাবাদী ও উন্মাদ দৃষ্টিগোচর হয় এবং ভবিষ্যৎ প্রভাব এই যে, শাস্তি ভোগ করতে হবে। মূর্খেরা বিক্ষিপ্ত জড় অংশসমূহ একত্র ও পুনরুজ্জীবিত করাকে অসম্ভব ও সাধ্যাতীত মনে করে। (জিজ্ঞাসা করি,) তারা কি (কুদরতের প্রমাণাদির

মধ্য থেকে) আকাশ ও পৃথিবীর প্রতি লক্ষ্য করে না, যা তাদের সামনে ও পশ্চাতে বিদ্যমান আছে (যে, তারা যেদিকেই তাকায়, সেদিকেই এগুলো দৃষ্টিগোচর হয়। এসব বিশালকায় বস্তু যিনি প্রথমে সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি ক্ষুদ্রকায় বস্তু পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম নন? আল্লাহ্ বলেন: لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ সত্যের প্রমাণাদি চোখের সামনে থাকা সত্ত্বেও অস্বীকার ও হঠকারিতার কারণে তারা তাৎক্ষণিক শাস্তি পাওয়ার যোগ্য। শাস্তিও এমন যে, আল্লাহ্‌র কুদরতের প্রমাণ এবং তাদের জন্য মহা নিয়ামত এই আকাশ ও পৃথিবীকেই তাদের শাস্তির হাতিয়ারে রূপান্তরিত করে দেওয়া। কারণ, যে নিয়ামত অস্বীকার করা হয়, তাকেই আযাবে রূপান্তরিত করে দিলে পরিতাপ বেশি হয়। আমি এ শাস্তি দিতেও সক্ষম। সেমতে) আমি ইচ্ছা করলে তাদেরকে ভূ-গর্ভে ধসিয়ে দেব অথবা তাদের উপর আকাশের কোন খণ্ড পতিত করব। (কিন্তু রহস্যের কারণে অবকাশ দিয়ে রেখেছি। মোটকথা তাদের উচিত আকাশ ও পৃথিবীর প্রতি লক্ষ্য করা। কেননা,) এতে (কুদরতের) পূর্ণ নিদর্শন রয়েছে (কিন্তু) সেই বান্দার জন্য, যে আল্লাহ্ অভিমুখী (এবং সত্যান্বেষী। অর্থাৎ প্রমাণ তো যথেষ্ট আছে, কিন্তু তাদের পক্ষ থেকে অন্বেষণ নেই। তাই তারা বঞ্চিত)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

عَالِمِ الْغَيْبِ—এটা رَبِّ শব্দের বিশেষণ, পূর্বে যার শপথ করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলার গুণাবলীর মধ্য থেকে এ স্থলে অদৃশ্য জ্ঞান ও সর্বব্যাপী জ্ঞানকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ সম্ভবত এই যে, এখানে কিয়ামত অস্বীকারকারীদের ব্যাপারে আলোচনা হচ্ছে। কাফিরদের কিয়ামত অস্বীকার করার বড় কারণ ছিল এই যে, সকল মানুষ মরে মৃত্তিকায় পরিণত হয়ে গেলে সেই মৃত্তিকার কণাসমূহও পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে। সুতরাং সারা পৃথিবীতে বিক্ষিপ্ত কণাসমূহকে একত্র করা, অতপর প্রত্যেক মানুষের কণাকে অন্য মানুষের কণা থেকে আলাদা করে তার অস্তিত্বে সংযুক্ত করা কিরূপে সম্ভবপর? একে অসম্ভব মনে করার ভিত্তি এটাই ছিল যে, তারা আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞান ও কুদরতকে নিজেদের জ্ঞান ও কুদরতের অনুরূপ মনে করে রেখেছিল। আল্লাহ্ তা'আলা বলে দিয়েছেন যে, তাঁর জ্ঞান সারা বিশ্বব্যাপী। আকাশ ও পৃথিবীতে অবস্থিত সব কিছু তিনি জানেন। কোন্ বস্তু কোথায় কি অবস্থায় আছে, তাও তিনি জানেন। সৃষ্টির কোন কণা তাঁর অজ্ঞাত নয়। এই সর্বব্যাপী জ্ঞান আল্লাহ্ তা'আলার বৈশিষ্ট্য। ফেরেশতা হোক কিংবা পয়গম্বর কারও এরূপ সর্বব্যাপী জ্ঞান অর্জিত হতে পারে না। এমন সর্বব্যাপী জ্ঞানসম্পন্ন সত্তার জন্য মানুষের কণা-সমূহকে আলাদাভাবে সারা বিশ্ব থেকে একত্র করা এবং সেগুলো দ্বারা পুনরায় দেহ গঠন করা মোটেই কঠিন ব্যাপার নয়।

لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا —এ বাক্যটি পূর্ববর্তী لَتَأْتِيَنَّكُمْ বাক্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ কিয়ামত অবশ্যই আগমন করবে এবং কিয়ামত আগমনের উদ্দেশ্য মু'মিনদেরকে প্রতিদান ও উত্তম রিযিক অর্থাৎ জান্নাত দান করা। তাদের বিপরীতে اَلَّذِيْنَ سَعَوْا فِيْ اٰيٰتِنَا —অর্থাৎ যারা আমার আয়াতসমূহে আপত্তি তুলেছে এবং মানুষকে তা থেকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেছে, তাদেরকে আযাব দেওয়া হবে।

مُعٰجِزِيْنَ —অর্থাৎ তারা যেন চেষ্টা করেছিল আমাকে অক্ষম করে দেওয়ার জন্য।

اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّنْ رِّجْزٍ اَلِيْمٌ —অর্থাৎ তাদের জন্য রয়েছে ভয়াবহ মর্মন্তুদ শাস্তি।

وَيَرَى الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ —এতে কিয়ামত অস্বীকারকারীদের বিপরীতে কিয়ামতে বিশ্বাসী মু'মিনদের আলোচনা করা হয়েছে। তারা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রতি অবতীর্ণ জ্ঞান দ্বারা উপকৃত হয়েছিল।

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ يُّنَبِّئُكُمْ اِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ الخ

এখানে কিয়ামতে অবিশ্বাসীদের উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে। তারা ঠাট্টা ও উপহাসের ছলে বলত, এস, আমরা তোমাদেরকে এমন এক অদ্ভুত ব্যক্তির সন্ধান দেই, যে বলে তোমরা পূর্ণরূপে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেও তোমাদেরকে পুনরায় নতুনভাবে সৃষ্টি করা হবে, অতপর তোমাদেরকে এই আকার-আকৃতিতেই জীবিত করা হবে।

বলা বাহুল্য ব্যক্তি বলে এখানে নবী করীম (সা)-কে বোঝানো হয়েছে, যিনি কিয়ামত ও তাতে মৃতদের জীবিত হওয়ার খবর দিতেন এবং সেসবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে বলতেন। কাফিররা সকলেই তাঁকে পূর্ণরূপে চিনত ও জানত। কিন্তু এখানে এভাবে উল্লেখ করেছে যেন তারা তাঁর সম্পর্কে আর কিছুই জানে না। উপহাস এবং তাচ্ছিল্য প্রকাশের জন্যই এরূপ ভঙ্গিতে কথা বলা হয়েছিল।

مُزِّقْتُمْ —শব্দটি مَزْقٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ চিরা ও খণ্ড-বিখণ্ড করা।

كُلَّ مُمَزَّقٍ -এর অর্থ মানবদেহ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে আলাদা হয়ে যাওয়া। অতপর কাফিররা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র খবর দেওয়া সম্পর্কে তাদের ধারণা এভাবে ব্যক্ত করেছে।

أَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ—উদ্দেশ্য এই যে, দেহ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পর সমস্ত কণা একত্রিত হয়ে মানবদেহে পরিণত হওয়া এবং জীবিত হওয়া একটি উদ্ভট কথা। একে মেনে নেওয়ার প্রশ্নই উঠে না। তাই তাঁর এই খবর হয় জেনেশুনে আল্লাহ্র বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা, না হয় সে উম্মাদ, যার কথার কোন সঠিক ভিত্তি থাকে না।

أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ—তফসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে যে, এ আয়াতে কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্ট বস্তুসমূহে চিন্তা করলে এবং আল্লাহ্র পূর্ণাঙ্গ কুদরত প্রত্যক্ষ করলে কাফিররা কিয়ামতকে অস্বীকার করতে পারবে না। সাথে সাথে আয়াতে অবিশ্বাসীদের জন্য শাস্তির সতর্কবাণীও রয়েছে। অর্থাৎ আকাশ ও পৃথিবীর বিশাল-কায় সৃষ্টবস্তু তোমাদের জন্য বিরাট নিয়ামত। এগুলো প্রত্যক্ষ করার পরও তোমরা অবিশ্বাস ও অস্বীকারে অটল থাকলে আল্লাহ্ এসব নিয়ামতকেই তোমাদের জন্য আযাবে রূপান্তরিত করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন। ফলে পৃথিবী তোমাদেরকে গ্রাস করে নেবে; আকাশ খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে তোমাদের উপর পতিত হবে।

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا ۖ يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ ۖ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ ⑩ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ ۖ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ۖ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ⑪ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ ۖ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ ۖ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۖ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ ⑫ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ ۚ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا ۚ وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ ⑬ فَلَمَّا

قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ ۖ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ ﴿١٤﴾

(১০) আমি দাউদের প্রতি অনুগ্রহ করেছিলাম এই আদেশ মর্মে যে, হে পর্বত-মালা, তোমরা দাউদের সাথে আমার পবিত্রতা ঘোষণা কর এবং হে পক্ষী সকল, তোমরাও। আমি তাঁর জন্য লৌহকে নরম করেছিলাম। (১১) এবং তাকে বলে-ছিলাম, প্রশস্ত বর্ম তৈরি কর, কড়াসমূহ যথাযথভাবে সংযুক্ত কর এবং সৎকর্ম সম্পা-দন কর। তোমরা যা কিছু কর, আমি তা দেখি। (১২) আর আমি সোলায়মানের অধীন করেছিলাম বায়ুকে, যা সকালে এক মাসের পথ এবং বিকালে এক মাসের পথ অতিক্রম করত। আমি তার জন্য গলিত তামার এক ঝরনা প্রবাহিত করেছিলাম। কতক জিন তার সামনে কাজ করত তার পালনকর্তার আদেশে। তাদের যে কেউ আমার আদেশ অমান্য করবে, আমি জ্বলন্ত অগ্নির-শাস্তি আস্বাদন করাব। (১৩) তারা সোলায়মানের ইচ্ছানুযায়ী দুর্গ, ভাস্কর্য, হাউযসদৃশ বৃহদাকার পাত্র এবং চুল্লির উপর স্থাপিত বিশাল ডেগ নির্মাণ করত। হে দাউদ পরিবার! কৃতজ্ঞতা সহকারে তোমরা কাজ করে যাও। আমার বান্দাদের মধ্যে অল্পসংখ্যকই কৃতজ্ঞ। (১৪) যখন আমি সোলায়মানের মৃত্যু ঘটালাম, তখন ঘুণ পোকাই জিনদেরকে তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে অবহিত করল। সোলায়মানের লাঠি খেয়ে যাচ্ছিল। যখন তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন, তখন জিনেরা বুঝতে পারল যে, অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান থাকলে তারা এই লাঞ্ছনাপূর্ণ শাস্তিতে আবদ্ধ থাকতো না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর আমি দাউদ (আ)-এর প্রতি অনুগ্রহ করেছিলাম। (সেমতে আমি পর্বত-মালাকে আদেশ দিয়েছিলাম,) হে পর্বতমালা! দাউদের সাথে বার বার পবিত্রতা ঘোষণা কর (অর্থাৎ সে যখন যিকিরে লিপ্ত হয়, তোমরাও তার সাথে যিকির কর) এবং (এমনিভাবে) পক্ষীকুলকেও (আদেশ দিয়েছিলাম। যেমন অন্য আয়াতে আছে ঃ

إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً

সম্ভবত এর রহস্য এই ছিল যে, তিনি যিকিরে স্ফূর্তি অনুভব করবেন অথবা তাঁর মু'জিযা ফুটে উঠবে। পক্ষীকুলের এই তসবীহ্ খুব সম্ভব শ্রোতাদের বোধগম্য ছিল। নতুবা অবোধগম্য তসবীহ তো তারা করেই থাকে। এতে দউদ (আ)-এর সাথে করার

কোন বিশেষত্ব নেই। আল্লাহ্ বলেন: وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ---আরেক নিয়ামত এই দিয়েছিলাম যে,) আমি তাঁর জন্য লৌহকে (মোমের মত) নরম করেছিলাম (এবং আদেশ দিয়েছিলাম যে,) তুমি এই লোহার প্রশস্ত বর্ম তৈরি কর এবং কড়াসমূহ যথাযথভাবে সংযুক্ত কর এবং (আমার দেওয়া এসব নিয়ামতের কৃতজ্ঞতাস্বরূপ) তোমরা সকলেই [অর্থাৎ দাউদ (আ) ও তাঁর লোকজন] সৎকর্ম সম্পাদন কর। তোমরা যা কিছু কর, আমি তা দেখি। (তাই পূর্ণ গুরুত্বসহকারে আদেশ পালন কর।) আর আমি বায়ুকে সোলায়মান (আ)-এর অধীন করেছিলাম, যে সকালে এক মাসের পথ এবং বিকালে এক মাসের পথ অতিক্রম করত। [অর্থাৎ বায়ু সোলায়মান (আ)-কে এতটুকু দূরত্বে নিয়ে যেত। আল্লাহ্ বলেন: وَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ ----আরেক নিয়ামত এই দিয়ে ছিলাম যে,] আমি তাঁর জন্য গলিত তামার ঝরনা প্রবাহিত করেছিলাম। (অর্থাৎ তামাকে খনিতে তরল করে দিয়েছিলাম, যাতে তদ্দ্বারা কোন যন্ত্রপাতির সাহায্য ছাড়াই দ্রব্য-সামগ্রী তৈরি করা সহজ হয়। দ্রব্য তৈরির পর সেই গলিত তামা জমাট হয়ে যেত। এটাও ছিল একটা মু'জিযা। আরেক নিয়ামত এই ছিল যে, আমি জিনদেরকে তাঁর অনুগত করে দিয়েছিলাম। সেমতে) কতক জিন তাঁর সামনে (নানা রকম) কাজকর্ম করত, তাঁর পালনকর্তার আদেশে (অর্থাৎ তিনি অধীন করে দিয়েছিলেন বলে। এর সাথে জিনদেরকে আইনগত আদেশও দিয়েছিলাম যে,) তাদের মধ্যে যে কেউ (সোলা-য়মানের আনুগত্য সম্পর্কিত) আমার আদেশ লংঘন করবে, [অধীন করে দেওয়ার কারণে সোলায়মান (আ) তাদেরকে বেগারদের ন্যায় বাধ্যতামূলক কাজে লাগাতে পারতেন]। আমি তাকে (পরকালে) জাহান্নামের শাস্তি আস্বাদন করাব। (এ থেকে একথাও জানা গেল যে, যে জিন ঈমান ও আনুগত্য অবলম্বন করবে, সে জাহান্নামের শাস্তি থেকে নিরাপদ থাকবে। অতপর জিনদের আদিষ্ট কাজ বর্ণনা করা হয়েছে:) জিনরা তাঁর ইচ্ছানুযায়ী প্রাসাদ, ভাস্কর্য, হাউয-সদৃশ বৃহদাকার পাত্র এবং চুল্লীর উপর স্থাপিত বিশাল ডেগ নির্মাণ করত। (আমি তাঁকে আদেশ দিয়েছিলাম, আমার দেওয়া এসব নিয়ামতের বিনিময়ে) হে দাউদ পরিবার, [অর্থাৎ সোলায়মান (আ) ও তাঁর লোকজন,] তোমরা সকলেই (এসব নিয়ামতের) কৃতজ্ঞতাস্বরূপ সৎকর্ম সম্পাদন কর। আমার বান্দাদের মধ্যে অল্প সংখ্যকই কৃতজ্ঞ। [তাই এই কৃতজ্ঞতার মাধ্যমে তোমরা বহু লোক থেকে স্বতন্ত্র হয়ে যাবে। সুতরাং এ বাক্যে কৃতজ্ঞতা ও সৎকর্মে প্রলুব্ধ করা হয়েছে। সারা জীবন সোলায়মান (আ)-এর সামনে জিনরা এভাবে কাজ করে গেল।] অতপর যখন আমি তাঁর মৃত্যু ঘটালাম (অর্থাৎ তিনি ইন্তিকাল

করলেন,) তখন [মৃত্যু এমনভাবে ঘটল যে, জিনরা টেরই পেল না। অর্থাৎ মৃত্যুর সময় সোলায়মান (আ) দু'হাতে লাঠি ধরে লাঠির মাথা নিজের চিবুকে লাগিয়ে সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। এ অবস্থায় তাঁর প্রাণবায়ু নির্গত হয়ে যায় এবং তিনি এমনিভাবে সারা বছর উপবিষ্ট রইলেন। জিনেরা তাঁকে উপবিষ্ট দেখে জীবিত মনে করতে থাকল। কাছে যেয়ে অথবা গভীরভাবে দেখার সাধ্য কারও ছিল না। সন্দেহেরও কোন কারণ ছিল না। জিনেরা তাঁকে জীবিত মনে করে যথারীতি কাজ করে গেল] এবং ঘুণপোকা ব্যতীত কেউ তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করল না। সে সোলায়মান (আ)-এর লাঠি খেয়ে যাচ্ছিল। [অবশেষে লাঠি ঘুণে খাওয়ার কারণে ভেঙে পড়ে গেল। লাঠি পড়ে যাওয়ায় সোলায়মান (আ)-এর অসার দেহও মাটিতে পড়ে গেল।] যখন তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন (এবং ঘুণে খাওয়ার হিসাব করে জানা গেল যে, এক বছর আগেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে) তখন জিনেরা (তাদের অদৃশ্য জ্ঞান দাবির স্বরূপ) জানতে পারল যে, যদি তারা অদৃশ্য বিষয় জানত, তবে (সারা বছর) এই লাঞ্ছনাপূর্ণ শাস্তিতে আবদ্ধ থাকত না (অর্থাৎ হাড়ভাঙ্গা খাটুনিতে। এতে গোলামির কারণে লাঞ্ছনাও ছিল এবং কষ্টের কারণে বিপদও ছিল)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

উপরে কাফিরদেরকে সম্বোধন করা হয়েছিল, যারা মৃত্যুর পর দেহের অংশসমূহ বিক্ষিপ্ত হয়ে যাওয়ার পর পুনরায় সেগুলোকে একত্র করে জীবিত করাকে অযৌক্তিক মনে করে অস্বীকার করত। আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের এই অসত্য ধারণা দূর করার জন্য হযরত দাউদ ও সোলায়মান (আ)-এর কাহিনী উল্লেখ করেছেন। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের হাতে ইহকালেই এমন কাজ সংঘটিত করিয়েছেন, যা তাদের কাছে অসম্ভব মনে হত; যেমন লোহাকে মোমে পরিণত করা, বায়ুকে আজ্ঞাবহ করা এবং তামাকে তরল পানির মত করে দেওয়া।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ مِنَّا فَضْلًا—অর্থাৎ দাউদকে আমি আমার অনুগ্রহ দান করেছিলাম। فضل--এর শাব্দিক অর্থ অতিরিক্ত। উদ্দেশ্য এমন বিশেষ গুণাবলী যা অন্যের চেয়ে অতিরিক্ত হিসাবে তাঁকে দান করা হয়েছিল। আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক পয়গম্বরকে কতক বিশেষ স্বাতন্ত্র্যমূলক গুণাবলী দান করেছেন। এগুলোকে তাঁদের বিশেষ শ্রেষ্ঠত্ব মনে করা হয়। হযরত দাউদ (আ)-এর বিশেষ গুণাবলী এই ছিল যে, তাঁকে রিসালতের সাথে সাথে সারা বিশ্বের রাজত্বও দান করা হয়েছিল। তিনি এমন সুমধুর কণ্ঠস্বর প্রাপ্ত হয়েছিলেন যে, আল্লাহ্‌র যিকির অথবা যবুর তিলাওয়াত করতে শুরু করলে পক্ষীকুলও শূন্যে উড়ন্ত অবস্থায় তা শোনার জন্য সমবেত হয়ে যেত। এমনিভাবে তাঁকে একাধিক বিশেষ মু'জিযা দান করা হয়েছিল, যা পরে বর্ণিত হবে।

اَوِّبِىْ—يٰجِبَالُ اَوِّبِىْ শব্দটি تَاْوِيْب থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ বারবার করা। আল্লাহ্ তা'আলা পর্বতমালাকে আদেশ দিয়েছিলেন, যখন দাউদ (আ) আল্লাহ্র যিকির ও তসবীহ্ পাঠ করেন, তখন তোমরাও সেই সব বাক্য বারবার আবৃত্তি কর। হযরত ইবনে-আব্বাস (রা) এ শব্দের তফসীর তাই করেছেন।—(ইবনে কাসীর)

হযরত দাউদ (আ)-এর সাথে পর্বতমালার এই তসবীহ্ পাঠ সেই সাধারণ তসবীহ্ থেকে ভিন্ন, যাতে সমগ্র সৃষ্টি অংশীদার এবং যা সর্বদা ও সর্বকালে অব্যাহত রয়েছে। কোরআনে বলা হয়েছে : وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ—অর্থাৎ জগতের সব কিছুই আল্লাহ্ তা'আলার সপ্রশংস তসবীহ্ পাঠ করে; কিন্তু তোমরা তাদের তসবীহ্ বুঝ না। আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত তসবীহ্ হযরত দাউদ (আ)-এর একটি মু'জিযার মর্যাদা রাখে। তাই এ তসবীহ্ সাধারণ শ্রোতারাও শুনত এবং বুঝত। নতুবা এটা মু'জিযা হত না।

এ থেকে আরও জানা গেল যে, দাউদ (আ)-এর কণ্ঠের সাথে পর্বতমালার কণ্ঠ মেলানো প্রতিধ্বনিরূপে ছিল না, যা সাধারণভাবে কোন গম্বুজে অথবা কূপে আওয়াজ দিলে সে আওয়াজ ফিরে আসার কারণে শোনা যায়। কেননা কোরআন পাক একে দাউদ (আ)-এর প্রতি বিশেষ কৃপা ও অনুগ্রহরূপে উল্লেখ করেছে। প্রতিধ্বনির সাথে কারও শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশেষত্বের কোন সম্পর্ক নেই। এটা তো প্রত্যেকেই এমন কি কাফিরও সৃষ্টি করতে পারে।

وَالطَّيْرَ—এ শব্দটি ব্যাকরণিক দিক দিয়ে উহ্য سَخَّرْنَا ক্রিয়াপদের مفعول হয়ে منصوب হয়েছে।—(রূহুল মা'আনী) অর্থ এই যে, আমি পক্ষীকুলকে দাউদ (আ)-এর অধীন করে দিয়েছিলাম। এই অধীন করার উদ্দেশ্য এই যে, ওরাও তাঁর আওয়াজ শুনে শূন্যে সমবেত হয়ে যেত এবং তাঁর সাথে পর্বতমালার অনুরূপ তসবীহ্ পাঠ করত। অন্য এক আয়াতে আছে :

اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهٗ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْاِشْرَاقِ وَالطَّيْرَ مَحْشُوْرَةً

—অর্থাৎ আমি পর্বতমালাকে দাউদ (আ)-এর অধীন করে দিয়েছিলাম যাতে সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর সাথে তসবীহ্ পাঠ করে এবং পক্ষীকুলকেও অধীন করে দিয়েছিলাম।

وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ—অর্থাৎ আমি তাঁর জন্য লোহাকে নরম করে দিয়েছিলাম। এটা ছিল তাঁর দ্বিতীয় মু'জিযা। হযরত হাসান বসরী, কাতাদাহ, আনাস প্রমুখ তফসীরবিদ বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা মু'জিযা-রূপে লোহাকে তাঁর জন্য মোমের মত নরম করে দিয়েছিলেন। লোহা দ্বারা কোন কিছু তৈরি করতে অগ্নির প্রয়োজন হত না। হাতুড়ি অথবা অন্য কোন হাতিয়ারেরও প্রয়োজন ছিল না। অতপর আয়াতে বলা হয়েছে যে, তিনি যাতে অনায়াসে লৌহবর্ম তৈরি করতে পারেন, সেজন্য লোহাকে তাঁর জন্য নরম করে দেওয়া হয়েছিল। অন্য এক আয়াতে আরও আছে ঃ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ—অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং তাঁকে বর্ম নির্মাণ শিক্ষা দিয়েছিলেন। এখানেও পরবর্তী قَدِّرْ فِي السَّرْدِ বাক্যটি এ শিক্ষাদানের পরিশিষ্ট। قدر শব্দটি تقدير থেকে উদ্ভূত। অর্থ একই জাতীয় ও একই প্রকার করে তৈরি করা। سرد--এর শাব্দিক অর্থ বয়ন করা। উদ্দেশ্য এই যে, বর্ম নির্মাণে তার কড়াসমূহকে যথাযথভাবে সংযুক্ত কর যাতে একটি ছোট ও একটি বড় না হয়। ফলে মজবুতও হবে এবং দেখতেও সুন্দর হবে। এ তফসীর হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে।—(ইবনে কাসীর)

এ থেকে আরও জানা গেল যে, শিল্পকর্মে বাহ্যিক সৌন্দর্যের প্রতি লক্ষ্য রাখাও পছন্দনীয়। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বিশেষভাবে এর নির্দেশ দিয়েছেন।

কেউ কেউ قَدِّرْ فِي السَّرْدِ—এর অর্থ এই দিয়েছেন যে, এই শিল্পকর্মের জন্য সময়ের পরিমাণ নির্দিষ্ট করে নেওয়া উচিত—সারাক্ষণ এতে মশগুল থাকা উচিত নয়, যাতে ইবাদত ও রাজকার্যে ব্যাঘাত না ঘটে। এ তফসীর থেকে জানা গেল যে, শিল্পী ও শ্রমিকদেরও উচিত ইবাদত ও জ্ঞান লাভের জন্য কিছু সময় বাঁচিয়ে নেওয়া এবং সময় বিধিবদ্ধ করা।

শিল্প ও কারিগরির ফযীলত ঃ আলোচ্য আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আবিষ্কার করা ও তৈরি করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং একে গুরুত্ব দিয়ে তাঁর মহান পয়গম্বরগণকে শিক্ষা দিয়েছেন। হযরত নূহ (আ)-কে জাহাজ নির্মাণ কৌশল এমনিভাবে শেখানো হয়েছিল। বলা হয়েছে ঃ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا —অর্থাৎ আমার সামনে জাহাজ নির্মাণ কর। অনুরূপ-ভাবে অন্য পয়গম্বরগণকেও বিভিন্ন শিল্পকর্ম শিক্ষা দেওয়া বিভিন্ন রেওয়ায়েতে প্রমাণিত আছে। হাফেজ শামসুদ্দীন যাহ্বী রচিত 'আত্তিব্বুন্নবভী' নামক কিতাবে বর্ণিত

আছে যে, গৃহনির্মাণ, বস্ত্রবয়ন, বৃক্ষরোপণ, খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুতকরণ, মালপত্র আনা-নেওয়ার জন্য চাকা বিশিষ্ট গাড়ি তৈরি করে চালানো ইত্যাদি মানব জীবনের সকল প্রয়োজনীয় শিল্পকাজ আল্লাহ্ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে পয়গম্বরগণকে শিক্ষা দিয়েছিলেন।

শিল্পজীবী মানুষকে হেয় মনে করা গোনাহ্ঃ আরবে বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন শিল্পকাজ অবলম্বন করত এবং কোন শিল্পকে হেয় ও নিকৃষ্ট মনে করা হত না। পেশা ও শিল্পের ভিত্তিতে কাউকে কম ও বেশি সম্মানী মনে করা হত না এবং এর ভিত্তিতে সমাজও গড়ে উঠত না। এগুলো কেবল ভারতীয় হিন্দুদের আবিষ্কার। তাদের সাথে বসবাস করার কারণে মুসলমানদের মধ্যেও এসব কুপ্রথা শিকড় গেড়ে বসেছে।

দাউদ (আ)-কে বর্ম নির্মাণ কৌশল শিক্ষা দেওয়ার রহস্যঃ তফসীরে ইবনে-কাসীরে বর্ণিত আছে---হযরত দাউদ (আ) তাঁর রাজত্বকালে ছদ্মবেশে বাজারে গমন করতেন এবং বিভিন্ন দিক থেকে আগত লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করতেন, দাউদ কেমন লোক? তাঁর রাজত্বে ইনসাফ ও সুবিচার প্রতিষ্ঠিত ছিল। সব মানুষ সুখে-শান্তিতে দিনাতিপাত করত। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কারও কোন অভিযোগ ছিল না। তাই যাকেই প্রশ্ন করা হত, সেই দাউদ (আ)-এর প্রশংসা, গুণকীর্তন ও ন্যায় বিচারের কারণে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করত।

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর শিক্ষার জন্য একজন ফেরেশতা মানববেশে প্রেরণ করেন। দাউদ (আ) যখন বাজারে যাওয়ার জন্য ছদ্মবেশে বের হলেন, তখন এই ফেরেশতার সাথে সাক্ষাৎ হল। অভ্যাস অনুযায়ী তাকেও তিনি সেই প্রশ্ন করলেন। মানবরূপী ফেরেশতা জওয়াব দিল, দাউদ খুব ভাল লোক। নিজের জন্য এবং উম্মত ও প্রজাদের জন্য তিনি সর্বোত্তম ব্যক্তি। তবে তাঁর মধ্যে এমন একটি অভ্যাস আছে, যা না থাকলে তিনি পুরোপুরি কামিল মানুষ হয়ে যেতেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, সেটা কি অভ্যাস? ফেরেশতা বলল, তিনি তাঁর ও তাঁর পরিবারের ভরণ-পোষণ বায়তুল মাল তথা সরকারী ধনাগার থেকে গ্রহণ করেন।

একথা শুনে হযরত দাউদ (আ) আল্লাহ্ তা'আলার কাছে কাকুতি-মিনতি ও দোয়া করতে থাকেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহ্! আমাকে এমন কোন হস্তশিল্প শিক্ষা দিন, যার পারিশ্রমিক দ্বারা আমি নিজের ও পরিবারের ভরণ-পোষণ চালাতে পারি এবং জনগণের সেবা ও রাজকার্য বিনা পারিশ্রমিকে আনজাম দিতে সক্ষম হই। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর দোয়া কবূল করলেন এবং তাঁকে বর্ম নির্মাণ কৌশল শিখিয়ে দিলেন। পয়গম্বরসুলভ সম্মানস্বরূপ তাঁর জন্য লোহাকে মোমের মত নরম করে দেওয়া হল, যাতে কাজটি সহজ হয় এবং অল্প সময়ে জীবিকা উপার্জন করে তিনি অবশিষ্ট সময় ইবাদত ও রাজকার্যে নিজেকে নিয়োজিত করতে পারেন।

মাস'আলাঃ খলীফা অথবা বাদশাহ তাঁর পূর্ণ সময় রাজকার্য সম্পাদনে ব্যয় করেন বিধায় তাঁর পক্ষে বায়তুল মাল থেকে ভরণ-পোষণের জন্য বেতন গ্রহণ করা

জায়েয। কিন্তু জীবিকার অন্য কোন উপায় সম্ভব হলে তা অধিক পছন্দনীয়। হযরত দাউদ (আ)-এর জন্য আল্লাহ্ তা'আলা সারা বিশ্বের ধনভাণ্ডার খুলে দিয়েছিলেন। ধনৈশ্বর্য, মণি-মাণিক্য ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর প্রাচুর্য ছিল ; আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁকে সরকারী ধনাগার ইচ্ছানুযায়ী ব্যয় করার অনুমতিও দান করা হয়েছিল। فَامْنُنْ اَوْ اَمْسِكْ عَلَيْكَ بِغَيْرِ حِسَابٍ আয়াতে নিশ্চয়তাও দেওয়া হয়েছিল যে, আপনি যেভাবে ইচ্ছা ব্যয় করুন। আপনার কাছে হিসাব চাওয়া হবে না। কিন্তু পয়গম্বরগণকে আল্লাহ্ তা'আলা যে সুউচ্চ মর্যাদায় রাখতে চান, তারই পরি-প্রেক্ষিতে এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। এরপর দাউদ (আ) এত বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও কায়িক শ্রমের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতেন এবং তাতেই সন্তুষ্ট থাকতেন।

আলিমগণ শিক্ষা ও প্রচারকার্য বিনা পারিশ্রমিকে আনজাম দিয়ে থাকেন। কাযী (বিচারক) ও মুফতি জনগণের কাজে তাঁদের সময় ব্যয় করেন। তাঁদের বেলায়ও একই বিধান। তাঁরা বায়তুল মাল থেকে ভরণ-পোষণের ব্যয় গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু জীবিকার অন্য কোন উপায় থাকলে এবং তা কর্তব্যকর্মে ব্যাঘাত সৃষ্টি না করলে তাই উত্তম।

ফায়েদা ঃ হযরত দাউদ (আ) নিজের এই কর্মনীতির ভিত্তিতে স্বীয় আমল ও অভ্যাস সম্পর্কে জনগণের অবাধ ও স্বাধীন মতামত জানার যে কর্মপন্থা গ্রহণ করে-ছিলেন, তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, মানুষ নিজের দোষ নিজে জানে না বিধায় অপরের কাছ থেকে জেনে নেওয়া উচিত। হযরত ইমাম মালিকও এ বিষয়ে বিশেষ যত্নবান ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ধারণা কি, তা তিনি জানতে চেষ্টা করতেন।

وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ—দাউদ (আ)-এর বিশেষ শ্রেষ্ঠত্ব ও অনুগ্রহ উল্লেখ করার পর হযরত সোলায়মান (আ)-এর আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে সেখানে হযরত দাউদ (আ)-এর জন্য আল্লাহ্ তা'আলা পর্বতমালা ও পক্ষীকুলকে বশীভূত করে দিয়েছিলেন। অনুরূপভাবে সোলায়মান (আ)-এর জন্য বায়ুকে অধীন করে দিয়েছিলেন। সোলায়মান (আ) তাঁর সিংহাসনে পরিবার-পরিজন ও বহু সংখ্যক সভাসদসহ আরোহণ করতেন। বায়ু তাঁর আজ্ঞাধীন হয়ে তিনি যেখানে ইচ্ছা করতেন সিংহাসনটি সেখানে নিয়ে যেত। হযরত হাসান বসরী (র) বলেন ঃ একটি কর্মের প্রতিদানে সোলায়মান (আ)-এর জন্য বায়ুকে অধীন করে দেওয়া হয়েছিল। একদিন তিনি অশ্ব পরিদর্শনে এতই মশগুল হয়ে পড়েন যে, আসরের নামায কাযা হয়ে গেল। এই অমনোযোগিতার কারণ ছিল অশ্ব। তাই, এ কারণ খতম করার জন্য অশ্বসমূহকে কুরবানী করে দিলেন। কেননা তাঁর শরীয়তে গরু-মহিষের ন্যায় অশ্ব কুরবানীও জায়েয ছিল। এসব অশ্ব তাঁর ব্যক্তিগত মালিকানাধীন

ছিল। তাই, সরকারী ক্ষতির প্রশ্নই উঠে না। কোরবানী করার কারণে নিজের ধনসম্পদ নষ্ট করার প্রশ্নই দেখা দেয় না। সূরা ছোয়াদে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। সুলায়মান (আ) তাঁর আরোহণের জন্য কোরবানী করেছিলেন। তাই, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে আরোহণের জন্য আরও উত্তম বস্তু দান করলেন। (কুরতুবী)

غدو শব্দের অর্থ সকাল বেলায় চলা এবং رواح শব্দের অর্থ বিকালে চলা। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত সোলায়মান (আ)-এর সিংহাসন বাতাসের কাঁধে সওয়ার হয়ে এক মাসের পথ অতিক্রম করত, অতপর বিকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত এক মাসের পথ অতিক্রম করত। এভাবে দু'মাসের দূরত্ব একদিনে অতিক্রম করত।

হযরত হাসান বসরী (র) বলেন, হযরত সোলায়মান (আ) সকালে বায়তুল মোকাদ্দাস থেকে রওয়ানা হয়ে দুপুরে ইস্তাখারে পৌঁছে আহার করতেন। অতপর সেখান থেকে যোহরের পর প্রত্যাবর্তন করে রাত্রিতে কাবুল পৌঁছতেন। বায়তুল মোকাদ্দাস থেকে ইস্তাখার পর্যন্ত পথ এক ব্যক্তি দ্রুতগামী সওয়ারীতে সওয়ার হয়ে এক মাসে অতিক্রম করতে পারে। অনুরূপভাবে ইস্তাখার থেকে কাবুল পর্যন্ত পথও এক মাসে অতিক্রম করা যায়।—(ইবনে কাসীর)

وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ—অর্থাৎ আমি সোলায়মান (আ)-এর জন্য তামার প্রস্রবণ প্রবাহিত করেছি। উদ্দেশ্য এই যে, তামার ন্যায় শক্ত ধাতুকে আল্লাহ্ তা'আলা সোলায়মান (আ)-এর জন্য পানির ন্যায় বহমান তরল পদার্থে পরিণত করে দেন, যা প্রস্রবণের ন্যায় প্রবাহিত হত এবং উত্তপ্তও ছিল না। অনায়াসেই এর পাত্র ইত্যাদি তৈরি করা যেত।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, ইয়ামানে অবস্থিত এই প্রস্রবণের দূরত্ব অতিক্রম করতে তিনদিন তিন রাত্রি লাগত। মুজাহিদ বলেন, ইয়ামানের সান'আ থেকে এই প্রস্রবণ শুরু হয়ে তিনদিন তিন রাত্রির পথ পর্যন্ত পানির ন্যায় প্রবাহিত ছিল। ব্যাকরণবিদ খলীল বলেন, আয়াতে ব্যবহৃত قطر শব্দের অর্থ গলিত তামা। —(কুরতুবী)

وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ—এ বাক্যটিও উহ্য سخرنا ক্রিয়া-পদের সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থ এই যে, আমি কতক জিনকে সোলায়মানের অধীন করে দিয়েছিলাম, যারা তাঁর সামনে তাঁর পালনকর্তার আদেশক্রমে কাজ করত। 'সামনে' বলার তাৎপর্য সম্ভবত এই যে, চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদিকে মানুষের অধীন করার

ন্যায় জিনকে সোলায়মান (আ)-এর অধীন করা ছিল না। বরং এর ধরন ছিল এই যে, তারা চাকর-নওকরের মত অর্পিত দায়িত্ব পালন করত।

জিন অধীন করা কিরূপ ঃ এ স্থলে উল্লিখিত জিন অধীন করার বিষয়টি আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশে কার্যকর হয়েছিল বিধায় এতে কোন প্রশ্নই দেখা দেয় না। কতক সাহাবায়ে কিরাম সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, জিন তাঁদের বশীভূত ও অধীন ছিল। এ বশীকরণও আল্লাহ্ তা'আলার অনুমতিক্রমে ছিল, যা কারামতরূপে তাঁদেরকে দান করা হয়েছিল। এতে আমল ও ওযীফার কোন প্রভাব ছিল না। আল্লামা শরবিনী 'সিরাজুল মুনীর' তফসীর গ্রন্থে এ আয়াতের অধীনে হযরত আবু হোরায়রা, উবাই ইবনে কা'ব, মুয়ায ইবনে জাবাল, উমর ইবনে খাত্তাব, আবু আইউব আন-সারী, যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) প্রমুখ সাহাবীর একাধিক ঘটনা উল্লেখ করেছেন। এসব ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, জিনরা তাঁদের আনুগত্য ও কাজকর্ম করত। কিন্তু এটা নিছক আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ ও কৃপা ছিল। আল্লাহ্ তা'আলা সোলায়-মান (আ)-এর অনুরূপ কতক জিনকে তাঁদেরও সেবাদাসে পরিণত করে দেন। কিন্তু আমলের মাধ্যমে জিন বশ করার যে নিয়ম আলিমগণের মধ্যে খ্যাত আছে, সেটা শরীয়তে জায়েয কি-না, তা চিন্তার বিষয় বটে। অষ্টম শতাব্দীর আলিম কাজী বদরুদ্দীন শিবলী হানাফী জিনদের বিধান সম্পর্কে "আ-কামুল মারজান ফী আহ-কামিল জান" নামক একটি স্বতন্ত্র পুস্তক রচনা করেছেন। এতে বর্ণিত আছে যে, জিনদের কাছ থেকে সেবা গ্রহণের কাজ সর্বপ্রথম হযরত সোলায়মান (আ) আল্লাহ্র আদেশক্রমে মু'জিযারূপে করেছেন। পারস্যবাসীরা জমশেদ সম্পর্কে বলে থাকে যে, তিনি জিনদের সেবা গ্রহণ করেছিলেন। এমনিভাবে সোলায়মান (আ)-এর সাথে সম্পর্কশীল 'আসিফ ইবনে বরখিয়া' প্রমুখ সম্পর্কেও জিনদের সেবা গ্রহণের ঘটনাবলী খ্যাত আছে। মুসলমানদের মধ্যে এ ব্যাপারে সর্বাধিক খ্যাতি আবু নসর আহমদ ইবনে বেলাল এবং হেলাল ইবনে ওসিফের রয়েছে। তাঁদের থেকে জিনদের সেবা গ্রহণের অত্যাশ্চর্য ঘটনাবলী বর্ণিত আছে। হেলাল ইবনে ওসিফ একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থে সোলায়মান (আ)-এর সামনে পেশকৃত জিনদের বাক্যাবলী এবং তাঁর সাথে জিনদের চুক্তি ও অঙ্গীকারনামা উল্লেখ করেছেন।

কাজী বদরুদ্দীন উক্ত গ্রন্থে আরও লেখেন, যারা জিন বশ করার আমল করে, তারা সাধারণত শয়তান রচিত কুফরী কলেমা ও যাদুকে কাজে লাগায়। কাফির জিন ও শয়তান এগুলো খুব পছন্দ করে। জিনদের অধীন ও অনুগত হওয়ার গূঢ়তত্ত্ব এত-টুকুই যে, তারা আলিমদের কুফরী ও শিরকী আমলে সন্তুষ্ট হয়ে ঘুষস্বরূপ তাদের কিছু কাজও করে দেয়। এ কারণেই এসব আমলে আলিমরা কোরআনের আয়াত নাপাকী, রক্ত ইত্যাদি দিয়ে লিখে থাকে। এতে কাফির জিন ও শয়তান খুশি হয়ে তাদের কাজ করে দেয়। তবে খলীফা মু'তাযিদ বিল্লাহ্র আমলে ইবনুল ইমাম নামক ব্যক্তি সম্পর্কে কাজী বদরুদ্দীন লেখেন যে, তিনি আল্লাহ্ তা'আলার নামসমূহের মাধ্যমে জিন বশ করেছিলেন। এতে কোন শরীয়ত বিরোধী কথা ছিল না।

সার কথা এই যে, যদি কোন ইচ্ছা ও আমল ব্যতিরেকে শুধু আল্লাহ্‌র মেহের-বাণীতে জিন কারো অধীন হয়ে যায়, যেমন সোলায়মান (আ) ও কতক সাহাবী সম্পর্কে এরূপ প্রমাণিত আছে, তবে এটা মু'যিজা ও কারামতের অন্তর্ভুক্ত। পক্ষান্তরে আমলের মাধ্যমে জিন বশ করা হলে তাতে যদি কুফরী বাক্য অথবা কুফরী কর্ম থাকে, তবে এরূপ বশীকরণ কুফর হবে। কেবল গোনাহ্‌ সম্বলিত আমল হলে কবীরা গোনাহ্‌ হবে। যেসব আমলে এমন শব্দ ব্যবহৃত হয়, যার অর্থ জানা নেই সেগুলোকেও ফিকাহ্‌বিদগণ নাজায়েয বলেছেন। কারণ, এগুলোতে কুফর, শিরক অথবা গোনাহ্‌ থাকা বিচিত্র নয়। কাজী বদরুদ্দীন আ-কামুল মারজানে অবোধগম্য বাক্যাবলীর ব্যবহারকেও নাজায়েয লেখেছেন।

বশীকরণের আমল যদি আল্লাহ্‌র নামসমূহ অথবা কেরাআনী আয়াতের মাধ্যমে হয় এবং তাতে অপবিত্র বস্তু ব্যবহারের মত গোনাহ্‌ না থাকে, তবে এই শর্তে জায়েয যে, এর উদ্দেশ্য জিনদের উৎপীড়ন থেকে নিজেকে ও অন্য মুসলমানদেরকে রক্ষা করা হতে হবে। অর্থাৎ ক্ষতি দূর করা উদ্দেশ্য হওয়া চাই—উপকার লাভ করা উদ্দেশ্য না হওয়া চাই। ধনোপার্জনের উপায় হিসাবে এরূপ আমল করা নাজায়েয। কারণ, এতে استرقاق حر অর্থাৎ স্বাধীনকে গোলামে পরিণত করা এবং শরীয়তসম্মত কারণ ব্যতীত তাকে বেগার খাটানো জরুরী হয়ে পড়ে, যা হারাম।

وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ—অর্থাৎ কোন জিন যদি সোলায়মান (আ)-এর আনুগত্য না করে, তবে তাকে আগুন দ্বারা শাস্তি দেওয়া হবে। অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে এখানে পরকালের জাহান্নামের আযাব বোঝানো হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, দুনিয়াতেও আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের উপর একজন ফেরেশতা নিয়োজিত রেখেছিলেন। সে অবাধ্য জিনকে আগুনের চাবুক মেরে মেরে কাজ করতে বাধ্য করত। (কুরতুবী) এখানে প্রশ্ন হয় যে, জিন জাতি আগুন দ্বারা সৃজিত। কাজেই আগুন তাদের মধ্যে কি ক্রিয়া করবে? এর জওয়াব এই যে, আগুন দ্বারা জিন সজিত হওয়ার অর্থ তাই, যা মাটির দ্বারা মানব সৃজিত হওয়ার অর্থ। অর্থাৎ মানব অস্তিত্বের প্রধান উপাদান মৃত্তিকা। কিন্তু তাকে মৃত্তিকা ও পাথর দ্বারা আঘাত করা হলে সে কষ্ট পায়। এমনিভাবে জিন জাতির প্রধান উপাদান অগ্নি। কিন্তু নির্ভেজাল ও তেজস্ক্রিয় অগ্নিতে তারাও জ্বলে-পুড়ে ছারখার হয়ে যায়।

يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ

وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ—এ আয়াতে সে সব কাজের কিছু বিবরণ দেওয়া হয়েছে, যা

সোলায়মান (আ) জিনদের দ্বারা করাতেন। محاريب শব্দটি محراب-এর বহুবচন। অর্থ গৃহের শ্রেষ্ঠ ও উচ্চ অংশ। বাদশাহ অথবা বড় লোকেরা নিজেদের জন্য যে সরকারী বাসভবন নির্মাণ করে, তাকেও محراب বলা হয়। এ শব্দটি حرب থেকে উদ্ভূত। অর্থ যুদ্ধ। এধরনের বাসভবনকে সাধারণত অপরের নাগাল থেকে সংরক্ষিত রাখা হয় এবং এর জন্য প্রয়োজন হলে যুদ্ধ করা হয়। এর সাথে মিল রেখে গৃহের বিশেষ অংশকে محراب বলা হয়। মসজিদে ইমামের দাঁড়াবার জায়গাকেও এই স্বাতন্ত্র্যের কারণেই محراب বলা হয়। কখনও মসজিদ অর্থেই محاريب শব্দ ব্যবহৃত হয়। প্রাচীন কালে محاريب بنى اسرائيل এবং ইসলাম যুগে محاريب صحابة বলে তাঁদের মসজিদ বোঝানো হত।

মসজিদসমূহে মেহরাবের জন্য স্বতন্ত্র স্থান নির্মাণের বিধান ঃ রসূলুল্লাহ্ (সা) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের আমল পর্যন্ত ইমামের দাঁড়াবার স্থানকে আলাদারূপে নির্মাণ করার প্রচলন ছিল না। প্রথম শতাব্দীর পর সুলতানগণ নিজেদের নিরাপত্তার স্বার্থে এর প্রবর্তন করেন। আরও একটি উপযোগিতার কারণে বিষয়টি সাধারণ মুসলমানদের মধ্যেও প্রচলিত হয়ে যায়। উপযোগিতাটি এই যে, ইমাম যে জায়গায় দাঁড়ান, সে কাতারটি সম্পূর্ণই খালি থেকে যায়। নামাযীদের প্রাচুর্য এবং মসজিদসমূহের সংকীর্ণতার পরিপ্রেক্ষিতে কেবল ইমামের দাঁড়াবার স্থান কিবলার দিকস্থ প্রাচীর কিছু বাড়িয়ে দিয়ে নির্মাণ করা হয়, যাতে এর পেছনে সবকাতার নামাযীদের দ্বারা পূর্ণ হয়ে যায়। প্রথম শতাব্দীতে এই পদ্ধতি না থাকায় কেউ কেউ একে বিদ'আত আখ্যা দিয়েছেন। শায়খ জালালুদ্দীন সুয়ূতী এ প্রশ্নে 'এলামুল আরানিব ফী বিদ'আতিল মাহারিব' নামক একখানি পুস্তিকা রচনা করেছেন। সত্য এই যে, নামাযীদের সুবিধা এবং মসজিদের উপকারিতার পরিপ্রেক্ষিতে এধরনের মেহরাব নির্মাণ করলে এবং একে উদ্দিষ্ট সুন্নত মনে করা না হলে একে বিদ'আত আখ্যা দেওয়ার কোন কারণ নেই। তবে একে উদ্দিষ্ট সুন্নত মনে করে নেওয়া হলে এবং যারা এর খিলাফ করে তাদের বিরূপ সমালোচনা করা হলে এই বাড়াবাড়ির কারণে একে বিদ'আত বলা যেতে পারে।

মাস'আলা ঃ যেসব মসজিদে ইমামের মেহরাব স্বতন্ত্র স্থানের আকারে তৈরি করা হয়, সেখানে মেহরাবের কিছুটা বাইরে নামাযীদের দিকে দণ্ডায়মান হওয়া ইমামের জন্য অপরিহার্য, যাতে ইমাম ও মুক্তাদীদের স্থান এক গণ্য হতে পারে। ইমাম সম্পূর্ণরূপে মেহরাবের ভেতরে দণ্ডায়মান হলে তা মকরূহ ও নাজায়েয। কোন কোন মসজিদের মেহরাব এত বড় আকারে নির্মাণ করা হয় যে, মুক্তাদীদেরও একটি ছোট কাতার তাতে দাঁড়াতে পারে। এরূপ মেহরাবে মুক্তাদীদেরও একটি কাতার দণ্ডায়মান হলে এবং ইমাম তাদের সামনে সম্পূর্ণরূপে মেহরাবে দণ্ডায়মান হলে তা মকরূহ হবে না। কারণ, এতে ইমাম ও মুক্তাদীদের স্থান অভিন্ন গণ্য হবে।

تماثيل শব্দটি تمثال-এর বহুবচন। অর্থ চিত্র। ইবনে আরাবী আহ্‌কামুল কোরআনে বলেন, চিত্র দু'প্রকার হয়ে থাকে---প্রাণীদের চিত্র ও অপ্রাণীদের চিত্র। অপ্রাণীও দু'প্রকার---এক. জড়পদার্থ, যাতে হ্রাসবৃদ্ধি হয় না ; যেমন পাথর, মৃত্তিকা ইত্যাদি। দুই. হ্রাসবৃদ্ধি হয় এমন পদার্থ; যেমন বৃক্ষ, ফসল ইত্যাদি। জিনরা হযরত সোলায়মান (আ)-এর জন্য উপরোক্ত সর্বপ্রকার বস্তুর চিত্র নির্মাণ করত। প্রথমত تماثيل শব্দের ব্যাপক ব্যবহার থেকে একথা জানা যায়। দ্বিতীয়ত ঐতিহাসিক বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, সোলায়মান (আ)-এর সিংহাসনের উপর পাখীদের চিত্র অংকিত ছিল।

ইসলামে প্রাণীদের চিত্র নির্মাণ ও ব্যবহার নিষিদ্ধ : আলোচ্য আয়াত থেকে জানা গেল যে, সোলায়মান (আ)-এর শরীয়তে প্রাণীদের চিত্র নির্মাণ ও ব্যবহার হারাম ছিল না। পূর্ববর্তী উম্মতসমূহের মধ্যে প্রত্যক্ষ করা হয়েছে যে, তারা পুণ্যবান ব্যক্তিদের স্মৃতি রক্ষার্থে তাঁদের চিত্র নির্মাণ করে উপাসনালয়ে রাখত, যাতে তাঁদের উপাসনার কথা স্মরণ করে তারাও উপাসনায় উদ্বুদ্ধ হয়। কিন্তু আস্তে আস্তে তারা এসব চিত্রকেই উপাস্য স্থির করে নিয়েছে এবং প্রতিমা পূজা শুরু হয়ে গেছে। এভাবে পূর্ববর্তী উম্মতসমূহের মধ্যে প্রাণীদের চিত্র মূর্তিপূজা প্রচলনে সহায়ক হয়েছে।

ইসলাম কিয়ামত পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত থাকবে এটা আল্লাহ্‌র অমোঘ বিধান। তাই এতে এ বিষয়ের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে যে, মূল হারাম বস্তু যেমন নিষিদ্ধ করা হয়েছে, তেমনি তার উপায় ও নিকটবর্তী সহায়ক কারণসমূহকেও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মূল মহা অপরাধ হচ্ছে শিরক ও মূর্তিপূজা। একে নিষিদ্ধ করার সাথে সাথে যেসব ছিদ্রপথে মূর্তিপূজার আগমন হতে পারে, সেসব পথেও পাহারা বসিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং মূর্তিপূজার উপায় ও নিকটবর্তী কারণসমূহকেও হারাম করে দেওয়া হয়েছে। এই নীতির ভিত্তিতেই প্রাণীদের চিত্র নির্মাণ ও ব্যবহার হারাম করা হয়েছে। অনেক সহীহ্ ও মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা এই নিষেধাজ্ঞা প্রমাণিত আছে।

এমনিভাবে মদ হারাম করা হলে এর ক্রয়-বিক্রয়, বহনের মজুরি ও তৈরি সবই হারাম করা হয়েছে। চুরি হারাম করা হলে কারও গৃহে বিনানুমতিতে প্রবেশ এমন কি, বাইরে থেকে উঁকি দিয়ে দেখাও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। জিনা হারাম করা হলে মাহরাম নয় এরূপ কারও দিকে ইচ্ছাপূর্বক দৃষ্টিপাতও হারাম করা হয়েছে। মোটকথা শরীয়তে এর অসংখ্য নযীর বিদ্যমান রয়েছে।

একটি সাধারণ প্রশ্ন ও তার জওয়াব : বলা যেতে পারে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আমলে প্রচলিত চিত্রের ব্যবহার মূর্তিপূজার উপায় হতে পারত। কিন্তু আজকাল অপরাধী সনাক্তকরণ, ব্যবসায়ের ট্রেডমার্ক, বন্ধু ও প্রিয়জনদের সাথে সাক্ষাত, ঘটনাবলীর তদন্তে সহায়তাদান ইত্যাদি কাজে চিত্র ব্যবহার করা হয়। ফলে আজকাল চিত্রকে জীবন ধারণে প্রয়োজনীয় বিষয়াবলীর অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়েছে। এতে

মূর্তিপূজা ও উপাসনার কোন ধারণা-কল্পনাও পর্যন্ত নেই। কাজেই বর্তমানে এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হওয়া উচিত।

জওয়াব এই যে, প্রথমত এ কথা বলাই ঠিক নয় যে, আজকাল চিত্র মূর্তিপূজার উপায় নয়। বর্তমানেও এমন অনেক সম্প্রদায় রয়েছে যারা তাদের মহাপুরুষদের চিত্রের পূজা পাঠ করে। কোন বিধান কোন কারণের উপর নির্ভরশীল হলে সে কারণ প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে বিদ্যমান থাকা জরুরী নয়। এছাড়া চিত্র নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ কেবল একটিই নয় যে, এটা মূর্তিপূজার উপায়; বরং সহীহ্ হাদীসসমূহে এর নিষেধাজ্ঞার অন্যান্য আরও কারণ বর্ণিত আছে। উদাহরণত চিত্র নির্মাণে আল্লাহ্ তা'আলার একটি বিশেষ গুণের অনুকরণ করা হয়। مصور (চিত্রনির্মাতা) আল্লাহ্ তা'আলার সুন্দরতম নামসমূহের অন্যতম এবং এটা প্রকৃতপক্ষে তাঁর জন্যই শোভনীয়। সৃষ্টিবৈচিত্র্য তাঁরই ক্ষমতাধীন। সৃষ্টবস্তুর হাজারো প্রকার এবং প্রত্যেক প্রকারের কোটি কোটি ব্যক্তিসত্তা রয়েছে। একজনের আকার-আকৃতি অন্যজনের সাথে মিলে না। মানুষের কথাই ধরুন, পুরুষের আকৃতি নারীর আকৃতি থেকে সুস্পষ্ট ভিন্ন। এরপর নারী ও পুরুষের কোটি কোটি ব্যক্তিসত্তার মধ্যে দু'ব্যক্তি পুরোপুরি একই রূপ নয়। দর্শক মাত্র কোনরূপ চিন্তাভাবনা ব্যতিরেকেই তাদের পার্থক্য ধরতে পারে। এই আকার নির্মাণ আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জত ব্যতীত কার সাধ্যে আছে? যে ব্যক্তি কোন প্রাণীমূর্তি অথবা রঙ ও তুলির সাহায্যে কোন প্রাণীর চিত্র নির্মাণ করে, সে যেন কার্যত দাবি করে যে, সে-ও আকার নির্মাণে সক্ষম। এ কারণেই বুখারী প্রমুখের হাদীসে বলা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন চিত্র নির্মাতাদেরকে বলা হবে, তোমরা যখন আমার অনুকরণ করেছ, তখন একে পূর্ণাঙ্গ করে দেখাও। আমি কেবল আকারই নির্মাণ করিনি, তাতে আত্মাও সঞ্চারিত করেছি। তোমাদের সাধ্য থাকলে তোমাদের নির্মিত আকারসমূহে আত্মা সঞ্চার করে দেখাও।

সহীহ্ হাদীসসমূহে চিত্র নির্মাণ নিষিদ্ধ হওয়ার এক কারণ এই বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলার ফেরেশতাগণ চিত্র ও কুকুরকে ঘৃণা করে। যে ঘরে এগুলো থাকে সেখানে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না। ফলে সে গৃহের বরকত ও রওনক মিটে যায়। গৃহে বসবাসকারীদের ইবাদত ও আনুগত্য করার শক্তি হ্রাস পায়। এছাড়া এ প্রবাদ বাক্যটিও মিথ্যা নয় যে, خانۂ خالی را دیو می گیرد অর্থাৎ খালি গৃহ ভূতপ্রেতের দখলে চলে যায়। কোন গৃহে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ না করলে সেখানে শয়তানের আড্ডা জমবে এবং গৃহের লোকদের মনে পাপের কুমন্ত্রণা থাকবে, এটাতো স্বাভাবিক।

কোন কোন হাদীসে আরও একটি কারণ এই উল্লিখিত হয়েছে যে, চিত্র দুনিয়ার প্রয়োজনাতিরিক্ত সাজসজ্জা। বর্তমান যুগে চিত্র দ্বারা যেমন অনেক উপকারিতা অর্জিত হয়, তেমনি হাজারো অপরাধ ও অশ্লীলতা এসব চিত্র থেকেই জন্মগ্রহণ করে। মোটকথা,

শরীয়ত কেবল এক কারণে নয়—অনেক কারণের দিকে লক্ষ্য করে প্রাণীচিত্র নির্মাণ ও ব্যবহার হারাম সাব্যস্ত করেছে। এখন যদি কোন বিশেষ ক্ষেত্রে ঘটনাক্রমে সেসব কারণ বিদ্যমান না থাকে, তবে তাতে শরীয়তের আইন পরিবর্তিত হতে পারে না।

বুখারী ও মুসলিমে আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ বর্ণিত রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, اشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون - অর্থাৎ কিয়ামতের দিন চিত্র নির্মাতারা সবচেয়ে কঠিন আযাব ভোগ করবে।

কোন কোন হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) চিত্র নির্মাতাদের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস বর্ণিত রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, كل مصور فى النار অর্থাৎ প্রত্যেক চিত্রকর জাহান্নামে যাবে।—(বুখারী, মুসলিম)

ফটো ও চিত্র ঃ কারও কারও এরূপ বলা নিশ্চিতই ভ্রান্ত যে, ফটো চিত্র নয়; বরং এটা প্রতিবিম্ব, যা আয়না, পানি ইত্যাদিতে ভেসে উঠে। সুতরাং আয়নায় নিজের মুখ দেখা যেমন জায়েয, তেমনি ফটোর চিত্রও জায়েয। এর সুস্পষ্ট জওয়াব এই যে, প্রতিবিম্ব ততক্ষণ পর্যন্তই প্রতিবিম্ব থাকে, যতক্ষণ তাকে কোন উপায়ে বদ্ধমূল ও স্থায়ী করে নেয়া না হয়। যেমন, পানি ও আয়নাতে আপনার প্রতিবিম্ব স্থায়ী নয়। আপনি সামনে থেকে সরে গেলেই প্রতিবিম্বও শেষ হয়ে যায়। যদি আয়নার উপরে কোন মসলা অথবা যন্ত্রের সাহায্যে প্রতিবিম্বকে স্থায়ী করে নেওয়া হয়, তবে একেই চিত্র বলা হবে, যার নিষেধাজ্ঞা সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

جِفَانٍ—শব্দটি جَفْنَةٌ-এর বহুবচন। অর্থ বড় পাত্র। যেমন তসলা, টব ইত্যাদি। جَوَابٍ শব্দটি جَابِيَةٌ-এর বহুবচন। অর্থ ছোট চৌবাচ্চা। উদ্দেশ্য এই যে, ছোট চৌবাচ্চার সমান পানি ধরে, এমন বড় পাত্র নির্মাণ করত। قدور শব্দটি قدر-এর বহুবচন। অর্থ ডেগ।

راسيات স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ এমন বড় ও ভারী ডেগ নির্মাণ করত যা নাড়ানো যেত না। সম্ভবত এগুলো পাথর খোদাই করে পাথরের চুল্লির উপরেই নির্মাণ করা হত, যা স্থানান্তর করার যোগ্য ছিল না। তফসীরবিদ যাহ্হাক এ তফসীরই করেছেন। اِعْمَلُوْٓا اٰلَ دَاوٗدَ شُكْرًا ۭ وَقَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُوْرُ — হযরত দাউদ ও সোলায়মান (আ)-এর প্রতি বিশেষ কৃপা ও অনুগ্রহ বর্ণনা করার পর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদেরকে ও তাঁদের পরিবারবর্গকে এই আয়াতে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করার আদেশ দিয়েছেন।

কৃতজ্ঞতার স্বরূপ ও তার বিধান ঃ কুরতুবী বলেন, কৃতজ্ঞতার স্বরূপ হচ্ছে নিয়ামত দাতার নিয়ামত স্বীকার করা ও তাঁকে তাঁর ইচ্ছানুযায়ী ব্যবহার করা। কারও দেওয়া নিয়ামতকে তার ইচ্ছার বিপরীতে ব্যবহার করা অকৃতজ্ঞতা। এ থেকে জানা গেল যে, কৃতজ্ঞতা কেবল মুখেই নয়, কর্মের মাধ্যমেও হয়ে থাকে। কর্মগত কৃতজ্ঞতা হচ্ছে নিয়ামতদাতার নিয়ামতকে তাঁর পছন্দ অনুযায়ী ব্যবহার করা। আবূ আবদুর রহমান সুলামী বলেন, নামায কৃতজ্ঞতা, রোযা কৃতজ্ঞতা এবং প্রত্যেক সৎকর্ম কৃতজ্ঞতা। মুহাম্মদ ইবনে কা'ব কুরাযী বলেন, আল্লাহ্‌ভীতি ও সৎকর্মের নাম কৃতজ্ঞতা।—(ইবনে কাসীর)

আলোচ্য আয়াতে কোরআন পাক কৃতজ্ঞতার আদেশ করার জন্য اشكروني সংক্ষিপ্ত শব্দ না বলে اعملوا شكرا বাক্য ব্যবহার করে সম্ভবত ইঙ্গিত করেছে যে, দাউদ-পরিবারের কাছ থেকে কর্মগত কৃতজ্ঞতা কাম্য। সেমতে হযরত দাউদ ও সোলায়মান (আ) এবং তাঁদের পরিবারবর্গ মৌখিকভাবে ও কর্মের মাধ্যমে এই আদেশ পালন করেছেন। তাঁদের গৃহে এমন কোন মুহূর্ত যেত না, যাতে ঘরের কেউ না কেউ ইবাদতে মশগুল না থাকত। পরিবারের লোকজনকে সময় ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল। ফলে দাউদ (আ)-এর জায়নামায কোন সময় নামাযী থেকে খালি থাকত না। (ইবনে-কাসীর)

বুখারী ও মুসলিমের এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলার কাছে হযরত দাউদ (আ)-এর নামায অধিক প্রিয়। তিনি অর্ধ রাত্রি ঘুমাতেন অতপর রাতের এক-তৃতীয়াংশ ইবাদতে দণ্ডায়মান থাকতেন এবং শেষের এক-ষষ্ঠাংশে ঘুমাতেন। আল্লাহ্ তা'আলার কাছে হযরত দাউদ (আ)-এর রোযাই অধিক প্রিয়। তিনি একদিন অন্তর অন্তর রোযা রাখতেন।—(ইবনে কাসীর)

হযরত ফুযায়েল (র) থেকে বর্ণিত আছে, হযরত দাউদ (আ)-এর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের এই আদেশ অবতীর্ণ হলে তিনি আরয করলেন, হে আমার পালনকর্তা! আমি আপনার শোকর কিভাবে আদায় করব? আমার উক্তিগত অথবা কর্মগত শোকর তো আপনারই দান। এর জন্যও তো শোকর আদায় করা ওয়াজিব। আল্লাহ্ তা'আলা বললেন, الان شكرتني يا داود অর্থাৎ হে দাউদ! এখন তুমি আমার শোকর আদায় করেছ। কেননা, যথাযথ শোকর আদায়ে তুমি তোমার অক্ষমতা উপলব্ধি করতে পেরেছ এবং মুখে তা স্বীকার করেছ।

হাকীম তিরমিযী ও ইমাম জাস্‌সাস্ হযরত আতা ইবনে ইয়াসার (রা) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন اعملوا ال داود شكرا আয়াতখানি অবতীর্ণ হলে রসূলুল্লাহ্ (সা) মিম্বরে দাঁড়িয়ে আয়াতখানি তেলাওয়াত করলেন এবং বললেন, তিনটি কাজ

যে ব্যক্তি সম্পন্ন করবে সে দাউদ পরিবারের বৈশিষ্ট্য লাভ করতে সক্ষম হবে। সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন, সে তিনটি কাজ কি ? তিনি বললেন, ১. সন্তুষ্টি ও ক্রোধ উভয় অবস্থায় ন্যায় বিচারে কায়েম থাকা ২. সাচ্ছল্য ও দারিদ্র্য উভয় অবস্থায় মিতাচার অবলম্বন করা এবং (৩) গোপনে ও প্রকাশ্যে সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌কে ভয় করা। (কুরতুবী, আহকামুল-কোরআন---জাস্‌সাস্‌)

وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ---শোকরের আদেশ দানের পর এ বাস্তব সত্যও তুলে ধরা হয়েছে যে, কৃতজ্ঞ বান্দাদের সংখ্যা অল্পই হবে। এতেও মু'মিনগণকে শোকরে উৎসাহিত করা হয়েছে।

فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ---আয়াতে مِنسَأَةٌ শব্দের অর্থ লাঠি। কেউ কেউ বলেন, এটা আবিসিনীয় ভাষার শব্দ এবং কারও মতে আরবী শব্দ। نسأ শব্দের অর্থ সরানো, পেছনে নেয়া। লাঠির সাহায্যে মানুষ ক্ষতিকর বস্তু সরিয়ে থাকে। তাই লাঠিকে مِنسَأَةٌ অর্থাৎ সরানোর হাতিয়ার বলা হয়। এ আয়াতে হযরত সোলায়মান (আ)-এর মৃত্যুর বিস্ময়কর ঘটনা বর্ণনা করে অনেক শিক্ষা ও পথ নির্দেশের দরজা খুলে দেওয়া হয়েছে।

সোলায়মান (আ)-এর মৃত্যুর বিস্মকর ঘটনা : এ ঘটনায় অনেক পথনির্দেশ রয়েছে। উদাহরণত হযরত সোলায়মান (আ) অদ্বিতীয় ও অনুপম সাম্রাজের অধিকারী ছিলেন। কেবল সমগ্র বিশ্বের উপরেই নয় বরং জিন জাতি, বিহঙ্গকুল ও বায়ুর উপরও তাঁর আদেশ কার্যকর ছিল। কিন্তু এতসব উপায়-উপকরণ থাকা সত্ত্বেও তিনি মৃত্যুর কবল থেকে রেহাই পেলেন না। নির্দিষ্ট সময়ে তাঁর মৃত্যু আগমন করেছে। বায়তুল মোকাদ্দাসের নির্মাণ কাজ দাউদ (আ) শুরু করেছিলেন এবং সোলায়মান (আ) তা শেষ করেন। তাঁর মৃত্যুর পূর্বে কিছু নির্মাণ কাজ অবশিষ্ট ছিল। কাজটি অবাধ্যতাপ্রবণ জিনদের দায়িত্বে ন্যস্ত ছিল। তারা হযরত সোলায়মান (আ)-এর ভয়ে কাজ করত। তারা তাঁর মৃত্যু সংবাদ অবগত হতে পারলে তৎক্ষণাৎ কাজ ছেড়ে দিত। ফলে নির্মাণ অসমাপ্ত থেকে যেত। সোলায়মান (আ) আল্লাহ্‌র নির্দেশে এর ব্যবস্থা এই করলেন যে, মৃত্যুর পূর্বক্ষণে তিনি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে তাঁর মেহরাবে প্রবেশ করলেন। মেহরাবটি স্বচ্ছ কাঁচের নিমিত ছিল। বাইরে থেকে ভেতরের সবকিছু দেখা যেত। তিনি নিয়মানুযায়ী ইবাদতের উদ্দেশ্যে লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন যাতে আত্মা বের হয়ে যাওয়ার পরও দেহ লাঠির সাহায্যে স্বস্থানে অনড় থাকে। যথাসময়ে তাঁর আত্মা দেহপিঞ্জর ছেড়ে গেল। কিন্তু লাঠির উপর ভর করে তাঁর দেহ অনড় থাকায় বাইরে থেকে মনে হত তিনি ইবাদতে মশগুল রয়েছেন। কাছে গিয়ে দেখার সাধ্য জিনদের ছিল না। তারা তাঁকে জীবিত মনে করে দিনের পর দিন কাজ করতে লাগল। অবশেষে এক বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলে বায়তুল মোকাদ্দাসের নির্মাণ

কাজও সমাপ্ত হয়ে গেল। আল্লাহ্ সোলায়মান (আ)-এর লাঠিতে উইপোকা লাগিয়ে দিয়েছিলেন। একে ফারসীতে দেওক উর্দুতে দীমক বলা হয়। কোরআন পাকে একে 'দাব্বাতুল আরদ' বলা হয়েছে। উইপোকা ভেতরে ভেতরে লাঠি খেয়ে ফেলল। লাঠির ভর খতম হয়ে গেলে সোলায়মান (আ)-এর অসাড় দেহ মাটিতে পড়ে গেল। তখন জিনরা জানতে পারল তাঁর মৃত্যু হয়ে গেছে।

জিনদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা দূর-দূরান্তের পথ কয়েক মুহূর্তে অতিক্রম করার শক্তি দান করেছেন। তারা এমন পরিস্থিতি ও ঘটনা জানত, যা মানুষের জানা ছিল না। তারা যখন এসব ঘটনা মানুষের কাছে বর্ণনা করত, তখন মানুষ এগুলোকে গায়েবের খবর মনে করত এবং বিশ্বাস করত যে, জিনরাও গায়েবের খবর জানে। স্বয়ং জিনরাও সম্ভবত অদৃশ্য জ্ঞানের দাবি করত। মৃত্যুর এই অভূতপূর্ব ঘটনা এ বিষয়ের স্বরূপ খুলে দিল। স্বয়ং জিনরাও টের পেল এবং সব মানুষও বুঝে নিল যে, জিনরা আলেমুল গায়ব (অদৃশ্য জ্ঞানী) নয়। কারণ, তারা অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাত হলে সোলায়মান (আ)-এর মৃত্যু সম্পর্কে এক বছর পূর্বেই জ্ঞাত হয়ে যেত এবং সারা বছরের হাড়ভাঙ্গা খাটুনি থেকে নিষ্কৃতি পেত। আয়াতের শেষ বাক্য فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ- আয়াতে তাই বর্ণিত হয়েছে। একে عذاب مهين বলে সে হাড়ভাঙ্গা খাটুনিকে বোঝানো হয়েছে যাতে বায়তুল মোকাদ্দাসের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করার জন্য সোলায়মান (আ) জিনদেরকে নিয়োজিত করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর এই বিস্ময়কর ঘটনা আংশিক কোরআন পাকের আলোচ্য আয়াতে এবং আংশিক হযরত ইবনে আব্বাস (রা) প্রমুখ থেকে বর্ণিত রয়েছে।—(ইবনে কাসীর)

এ অত্যাশ্চর্য ঘটনা থেকে এ শিক্ষাও অর্জিত হয় যে, মৃত্যুর কবল থেকে কারও নিষ্কৃতি নেই। আরও বোঝা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা যে কাজ করতে চান তার ব্যবস্থা যেভাবে ইচ্ছা করতে পারেন। এ ঘটনায় তাই হয়েছে। মারা যাওয়া সত্ত্বেও সোলায়মান (আ)-কে পূর্ণ এক বছর স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত রেখে জিনদের দ্বারা কাজ সমাপ্ত করিয়ে নেয়া হয়েছে। আরও জানা যায় যে, দুনিয়ার সমস্ত আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি ততক্ষণ পর্যন্তই নিজেদের কাজ করে যায়, যতক্ষণ আল্লাহ্ তা'আলা চান। তিনি না চাইলে সবকিছু নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে; যেমন এ ঘটনায় লাঠির ভর উইপোকার মাধ্যমে খতম করে দেওয়া হয়েছে। জিনদের বিস্ময়কর কাজকর্ম, কীর্তিও বাহ্যত গায়েবী বিষয় সম্পর্কে অবগত হওয়ার ঘটনাবলী দেখে এ বিষয়ের আশংকা ছিল যে, মানুষ তাদেরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে নেবে। মৃত্যুর এই অভাবিত ঘটনা এ আশংকার মূলেও কুঠারাঘাত করেছে। সবাই জিনদের অজ্ঞতা ও অসহায়তা সম্পর্কে চাক্ষুষ জ্ঞান লাভ করেছে।

উপরোক্ত বক্তব্য থেকে আরও জানা গেল যে, মৃত্যুকালে সোলায়মান (আ) দু'টি কারণে এই বিশেষ পন্থা অবলম্বন করেছিলেন। এক. বায়তুল মোকাদ্দাস নির্মাণের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করা এবং দুই. মানুষের সামনে জিনদের অজ্ঞতা ও অসহায়তা ফুটিয়ে তোলা, যাতে তাদের ইবাদতের আশংকা না থাকে।---(কুরতুবী)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর বর্ণিত রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, সোলায়মান (আ) বায়তুল মোকাদ্দাস নির্মাণের কাজ সমাপনান্তে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে কয়েকটি দোয়া করেন, যা কবূল হয়। তন্মধ্যে একটি দোয়া এই যে, যে ব্যক্তি নামাযের নিয়তে এ মসজিদে প্রবেশ করবে (অন্য কোন পার্থিব উদ্দেশ্য থাকবে না) মসজিদ থেকে বের হওয়ার পূর্বে তাকে গোনাহ্ থেকে এমন পবিত্র করে দিন, যেমন সে মায়ের গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণের সময় ছিল।

সুদ্দীর রেওয়ায়েতে আরও আছে, বায়তুল মোকাদ্দাসের নির্মাণ কাজ সমাপনান্তে সোলায়মান (আ) কৃতজ্ঞতাস্বরূপ বার হাজার গরু ও বিশ হাজার ছাগল কোরবানী করে মানুষকে ভোজে আপ্যায়িত করেন এবং আনন্দ উদ্যাপন করেন। অতপর 'ছখরার' উপর দণ্ডায়মান হয়ে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে এসব দোয়া করেন--- হে আল্লাহ্, আপনিই আমাকে শক্তি ও সম্পদ দান করেছেন। ফলে বায়তুল মোকাদ্দাসের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। হে আল্লাহ্! আমাকে এই নিয়ামতের শোকর আদায় করার তওফীক দিন এবং আমাকে আপনার দীনের উপর ওফাত দিন। হিদায়তপ্রাপ্তির পর আর আমার অন্তরে কোন বক্রতা সৃষ্টি করবেন না। হে আমার পালনকর্তা! যে ব্যক্তি এই মসজিদে প্রবেশ করবে, আমি তার জন্য আপনার কাছে পাঁচটি বিষয় প্রার্থনা করছি---১. গোনাহ্গার ব্যক্তি তওবা করার জন্য এ মসজিদে প্রবেশ করলে আপনি তার তওবা কবূল করুন এবং তার গোনাহ্ মাফ করুন। ২. যে ব্যক্তি কোন ভয় ও আশংকা থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে এ মসজিদে প্রবেশ করবে, আপনি তাকে অভয় দিন এবং আশংকা থেকে মুক্তি দিন। ৩. রুগ্ন ব্যক্তি এ মসজিদে প্রবেশ করলে তাকে আরোগ্য দান করুন। ৪. নিঃস্ব ব্যক্তি এ মসজিদে প্রবেশ করলে তাকে ধনাঢ্য করুন। ৫. এ মসজিদে প্রবেশকারী যতক্ষণ এখানে থাকে, ততক্ষণ আপনি তার প্রতি কৃপাদৃষ্টি রাখুন। তবে কেউ কোন অন্যায় ও অধর্মের কাজে লিপ্ত হলে তার প্রতি নয়।---(কুরতুবী)

এ হাদীস থেকে জানা গেল যে, বায়তুল মোকাদ্দাস নির্মাণের কাজ সোলায়মান (আ)-এর জীবদ্দশায় সমাপ্ত হয়ে গিয়েছিল। পূর্ববর্ণিত ঘটনাও এর পরিপন্থী নয়। কারণ, বড়বড় নির্মাণ কাজে মূল নির্মাণ সমাপ্ত হয়ে গেলেও কিছু কিছু কাজ অবশিষ্ট থাকে। এখানেও সে ধরনের কাজ বাকি ছিল। এর জন্য সোলায়মান (আ) উপরোক্ত কৌশল অবলম্বন করেছিলেন।

হযরত ইবনে আব্বাস থেকে আরও বর্ণিত আছে যে, মৃত্যুর পর সোলায়মান (আ) লাঠিতে ভর দিয়ে এক বছর দণ্ডায়মান থাকেন। (কুরতুবী) কতক রেওয়ায়েতে আছে, জিনরা যখন জানতে পারল যে, সোলায়মান (আ) অনেক পূর্বেই মারা গেছেন কিন্তু তারা টের পায়নি, তখন তাঁর মৃত্যুর সময়কাল জানার জন্য একটি কাঠে উইপোকা ছেড়ে দিল। একদিন এক রাত্রিতে যতটুকু কাঠ উইপোকায় খেল, সেটি হিসাব করে তারা আবিষ্কার করল যে, সোলায়মান (আ)-এর লাঠি উইয়ে খেতে এক বছর সময় লেগেছে।

বগভী ইতিহাসবিদদের বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন যে, সোলায়মান (আ)-এর মোট বয়স তেপ্পান্ন বছর হয়েছিল। তিনি চল্লিশ বছরকাল রাজত্ব করেন। তের বছর বয়সে তিনি রাজকার্য হাতে নেন এবং চতুর্থ বছরে বায়তুল-মোকাদ্দাসের নির্মাণ কাজ শুরু করেন।----(মাযহারী, কুরতুবী)

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ ۖ جَنَّتَانِ عَن يَمِينٍ وَشِمَالٍ ۖ كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ ۚ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ ﴿١٥﴾ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ ﴿١٦﴾ ذَٰلِكَ جَزَيْنَاهُم بِمَا كَفَرُوا ۖ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ ﴿١٧﴾ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ ۖ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ ﴿١٨﴾ فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿١٩﴾

(১৫) সাবার অধিবাসীদের জন্য তাদের বাসভূমিতে ছিল এক নিদর্শন---দুটি উদ্যান একটি ডানদিকে, একটি বামদিকে। তোমরা তোমাদের পালনকর্তার রিযিক খাও এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। স্বাস্থ্যকর শহর এবং ক্ষমাশীল পালনকর্তা (১৬) অতপর তারা অবাধ্যতা করল ফলে আমি তাদের উপর প্রেরণ করলাম প্রবল বন্যা! আর তাদের উদ্যানদ্বয়কে পরিবর্তন করে দিলাম এমন দুই উদ্যানে, যাতে উদগত হয় বিস্বাদ ফল-মূল, ঝাউ গাছ এবং সামান্য কুলবৃক্ষ। (১৭) এটা ছিল কুফরের কারণে তাদের প্রতি আমার শাস্তি। আমি অকৃতজ্ঞ ব্যতীত কাউকে শাস্তি দেই না। (১৮) তাদের এবং

যেসব জনপদের লোকদের প্রতি আমি অনুগ্রহ করেছিলাম সেগুলোর মধ্যবর্তী স্থানে অনেক দৃশ্যমান জনপদ স্থাপন করেছিলাম এবং সেগুলোতে ভ্রমণ নির্ধারিত করেছিলাম। তোমরা এসব জনপদে রাতে ও দিনে নিরাপদে ভ্রমণ কর। (১৯) অতপর তারা বলল, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের ভ্রমণের পরিসর বাড়িয়ে দাও। তারা নিজে-দের প্রতি জুলুম করেছিল। ফলে আমি তাদেরকে উপাখ্যানে পরিণত করলাম এবং সম্পূর্ণরূপে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দিলাম। নিশ্চয় এতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

সাবা অধিবাসীদের জন্য (স্বয়ং) তাদের বাসভূমিতে (অর্থাৎ বাসভূমির মোটামুটি অবস্থার মধ্যে আল্লাহ্‌র আনুগত্য জরুরী হওয়ার) নিদর্শন ছিল। তন্মধ্যে এক নিদর্শন দু'সারি উদ্যান---একটি (তাদের সড়কের) ডানদিকে আর একটি বাম-দিকে (অর্থাৎ তাদের সমগ্র এলাকার দু'সারি সংলগ্ন উদ্যান বিস্তৃত ছিল। এতে উৎপাদনও ছিল প্রচুর এবং অফুরন্ত ফলমূলও ছিল। এ ছাড়া ছিল সুশীতল ছায়া ও মনোরম পরিবেশ। আমি পয়গম্বরগণের মাধ্যমে তাদেরকে আদেশ দিলাম,) তোমাদের পালনকর্তার (প্রদত্ত) রিযিক খাও এবং (খেয়ে) তাঁর শোকর আদায় কর। (অর্থাৎ আনুগত্য কর। কারণ, দু'প্রকার নিয়ামত আনুগত্যকে অপরিহার্য করে দেয়, এক. পার্থিব অর্থাৎ বসবাসের জন্য স্বাস্থ্যকর শহর এবং (দুই. পারলৌকিক অর্থাৎ ঈমান ও আনুগত্যের ক্ষেত্রে ত্রুটি হয়ে গেলে ক্ষমা করার জন্য) ক্ষমাশীল পালনকর্তা। (সুতরাং এমতাবস্থায় অবশ্যই ঈমান ও আনুগত্য করা উচিত।) অতপর (এতেও) তারা (এ আদেশ থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিল। (সম্ভবত তারা সূর্য পূজারীও ছিল, যেমন সূরা নমলে তাদের কতক সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ -) ফলে আমি তাদের উপর (আমার ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ হিসাবে) প্রেরণ করলাম বাঁধের বন্যা। (অর্থাৎ বাঁধ দিয়ে যে বন্যা আটকিয়ে রাখা হয়েছিল, বাঁধ ভেঙ্গে সে বন্যার পানি তাদের উপর চড়াও হল। ফলে তাদের দু'সারি উদ্যান ধ্বংস হয়ে গেল।) আর তাদের দু'সারি উদ্যানকে পরিবর্তিত করে দিলাম এমন দুই উদ্যানে, যাতে উৎপন্ন হয় বিস্বাদ ফলমূল, ঝাউগাছ এবং সামান্য কুল (তাও জংলী স্বউদ্‌গত, যাতে কাঁটা অনেক এবং ফল স্বাদহীন।) এটা ছিল তাদের কুফরের কারণে তাদেরকে প্রদত্ত আমার শাস্তি। আমি অকৃতজ্ঞ ব্যতীত কাউকে এরূপ শাস্তি দেই না। (মামুলী ভুলত্রুটি তো আমি মার্জনাই করে দেই। কুফরের চেয়ে অধিক অকৃতজ্ঞতা আর কি হবে। তারা এতেই লিপ্ত ছিল। উল্লিখিত বাসভূমি সংক্রান্ত নিয়ামত ছাড়া ভ্রমণ সংক্রান্ত আরও একটি নিয়ামত তাদেরকে দিয়েছিলাম। তা এই যে,) আমি তাদের এবং যেসব জনপদের প্রতি (ফসল ইত্যাদি ব্যাপারে) বরকত

দিয়েছিলাম, সেগুলোর মধ্যবর্তী স্থানে অনেক জনপদ আবাদ করে রেখেছিলাম, যেগুলো (সড়ক থেকে) দৃশ্যমান ছিল (যাতে ভ্রমণকারীদের ভ্রমণে আতংক না হয় এবং কোথাও অবস্থান করতে চাইলে সেখানে যেতে ইতস্তত না করে,) এবং সেগুলোতে ভ্রমণের এক বিশেষ ভারসাম্য রেখেছিলাম। অর্থাৎ এক জনপদ থেকে অন্য জনপদ পর্যন্ত চলার মধ্যে এমন উপযুক্ত দূরত্ব রেখেছিলাম, যাতে ভ্রমণকালে অভ্যাস অনুযায়ী বিশ্রাম করতে পারে। যথাসময়ে কোন না কোন জনপদ পাওয়া যেত পানাহার ও বিশ্রামের জন্য। তোমরা এসব জনপদে (ইচ্ছা করলে) রাত্রিতে এবং (ইচ্ছা করলে দিনে) নিরাপদে ভ্রমণ কর। (অর্থাৎ কাছে কাছে জনপদ থাকার কারণে রাহাজানীর ভয় ছিল না এবং সর্বত্র সবকিছু সহজলভ্য হওয়ার কারণে পানি, খাদ্য ও পাথেয় না পাওয়ারও আশংকা ছিল না।) অতপর (তারা এসব নিয়ামতের প্রকৃত শোকর অর্থাৎ আল্লাহ্র আনুগত্য করল না এবং বাহ্যিক শোকর অর্থাৎ এগুলোকে মূল্যও দিল না। সেমতে) তারা বলল ঃ হে আমাদের পালনকর্তা, (এমন কাছে কাছে জনপদ থাকার কারণে ভ্রমণে আনন্দ নেই। পাথেয় ফুরিয়ে যাওয়া, পিপাসায় পানি না পাওয়া, অধীর অপেক্ষায় থাকা, চোরের ভয় থাকা এবং সশস্ত্র পাহারা দেওয়া---এসব না হলে ভ্রমণের আনন্দ কি? বনী ইসরাঈল যেমন মান্না ও সালওয়া খেতে খেতে অতিষ্ঠ হয়ে তরিতরকারি, শশা, ক্ষীরা ইত্যাদির জন্য আবেদন করেছিল,তেমনি তারাও করল। তারা আরও বলল, বর্তমান অবস্থায় ধনী-দরিদ্র সকলেই একইরূপ ভ্রমণ করে। এতে আমাদের ধনাঢ্যতা ফুটিয়ে তোলার অবকাশ নেই। তাই মন চায় যে,) আমাদের ভ্রমণের ব্যবধান (ও দূরত্ব) বর্ধিত করে দিন। (অর্থাৎ মধ্যবর্তী জনপদগুলো উৎখাত করে দিন, যাতে এক মনযিল থেকে অন্য মনযিলের দূরত্ব বেড়ে যায়। এই অকৃতজ্ঞতা ছাড়া) তারা নিজেদের প্রতি (আরও নাফরমানী করে) জুলুম করেছিল। ফলে আমি তাদেরকে উপাখ্যানে পরিণত করেছি এবং সম্পূর্ণরূপে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দিয়েছি। (তাদের কতককে ধ্বংস করে দিয়েছি। ফলে তাদের কাহিনীই রয়ে গেছে এবং কতককে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দিয়েছি। অথবা স্বাচ্ছন্দ্যের দিক দিয়ে সকলেই কাহিনী হয়ে গেছে অর্থাৎ তাদের স্বাচ্ছন্দ্যের আসবাবপত্র ধ্বংস হয়ে গেছে। অথবা তাদের অবস্থাকে শিক্ষায় পরিণত করেছি। মানুষ এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। মোটকথা, তাদের বাসভূমি, উদ্যান এবং সংলগ্ন জনপদসমূহ সবই ছারখার হয়ে গেছে।) নিশ্চয় এতে (অর্থাৎ এ কাহিনীতে) প্রত্যেক ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞের (মু'মিনের) জন্য বিপুল শিক্ষা রয়েছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

রিসালত ও কিয়ামতে অবিশ্বাসী কাফিরদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার সর্বময় ক্ষমতা সম্পর্কে হুঁশিয়ার করার উদ্দেশ্যে পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের হাতে সংঘটিত বিস্ময়কর ঘটনা ও মু'জিযা বর্ণিত হচ্ছিল। এ প্রসঙ্গে প্রথমে হযরত দাউদ ও সোলায়মান (আ)-এর ঘটনাবলী উল্লেখ করা হয়েছে। এখন এ প্রসঙ্গেই সাবা সম্প্রদায়ের উপর

আল্লাহ্ তা'আলার অগণিত নিয়ামত বর্ষণ, অতপর অকৃতজ্ঞতার কারণে তাদের প্রতি আযাব অবতরণের আলোচনা আলোচ্য আয়াতসমূহে করা হয়েছে।

সাবা সম্প্রদায় ও তাদের প্রতি আল্লাহ্‌র বিশেষ নিয়ামতরাজি ঃ ইবনে কাসীর বলেন, ইয়ামানের সম্রাট ও সে দেশের অধিবাসীদের উপাধি হচ্ছে সাবা। তাবাবেয়া সম্প্রদায়ও সাবা সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তারা ছিল সে দেশের ধর্মীয় নেতা। সূরা নমলে সোলায়মান (আ)-এর সাথে নারী বিলকিসের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তিনিও এ সম্প্রদায়েরই একজন ছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সামনে জীবনোপকরণের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন এবং পয়গম্বরগণের মাধ্যমে এসব নিয়ামতের শোকর আদায় করার আদেশ দান করেছিলেন। দীর্ঘকাল পর্যন্ত তারা এ অবস্থার উপর কায়েম থাকে এবং সর্বপ্রকার সুখ ও শান্তি ভোগ করতে থাকে। অবশেষে ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে তারা আল্লাহ্ তা'আলা থেকে গাফিল হয়ে পড়ে, এমন কি আল্লাহ্ তা'আলাকে অস্বীকার করতে থাকে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে হুঁশিয়ার করার জন্য তেরজন পয়গম্বর প্রেরণ করেন। তাঁরা তাদেরকে সৎপথে আনার জন্য সর্ব-প্রযত্নে চেষ্টা করেন। কিন্তু তাদের চৈতন্যোদয় হয়নি। অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উপর বন্যার আযাব প্রেরণ করেন। ফলে তাদের শহর ও বাগ-বাগিচা ছারখার হয়ে যায়।---(ইবনে কাসীর)

ইমাম আহমদ হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন, জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞেস করল ঃ কোরআনে উল্লিখিত 'সাবা' কোন পুরুষের নাম না নারীর, না কোন ভূ-খণ্ডের নাম ? রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, সাবা একজন পুরুষের নাম। তার দশটি পুত্র সন্তান ছিল। তন্মধ্যে ছয়জন ইয়ামানে এবং চারজন শামদেশে বসতি স্থাপন করে। ইয়ামানে বসবাসকারী ছয় পুত্রের নাম মাদজাজ, কেন্দা, ইযদ, আশআরী, আনমার, হিমইয়ার, (তাদের থেকে ছয়টি গোত্র জন্মলাভ করে) এবং শামদেশে বসবাসকারীদের নাম লখম, জুযাম, আমেলা, গাস্সান (তাদের গোত্রসমূহ এ নামেই সুবিদিত)। এ রিওয়ায়েতটি হাফেজ ইবনে আবদুল বারও তার "আলকাসদু ওয়াল উমামু বেমারেফতে আস্ সাবিল আরবে ওয়াল আজম" গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন।

বংশতালিকা বিশেষজ্ঞ আলিমগণের বরাত দিয়ে ইবনে কাসীর বলেন, এরা দশজন সাবার ঔরসজাত ও প্রত্যক্ষ পুত্র ছিল না। বরং তার দ্বিতীয়, তৃতীয় অথবা চতুর্থ পুরুষে এরা জন্মগ্রহণ করেছিল। অতপর তাদের গোত্রসমূহ শাম ও ইয়ামানে বিস্তার লাভ করে এবং তাদেরই নামে পরিচিত হয়।

সাবার আসল নাম ছিল আবদে শাম্স। সাবা আবদে শাম্স ইবনে ইয়াশহাব ইবনে কাহতান থেকে তার বংশতালিকা বোঝা যায়। ইতিহাসবিদগণ লিখেন, সাবা আবদে শামস তার আমলে শেষ নবী মুহাম্মদ (সা)-এর আগমনের সুসংবাদ মানুষকে শুনিয়েছিল। সম্ভবত তওরাত ও ইনজীল থেকে সে এ বিষয়ে জ্ঞানলাভ করেছিল অথবা জ্যোতিষী ও অতিন্দ্রীয়বাদীদের মাধ্যমে অবগত হয়েছিল। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র

শানে সে কয়েক লাইন আরবী কবিতাও বলেছিল। এ সব কবিতায় তাঁর আবির্ভাবের উল্লেখ করে বাসনা প্রকাশ করেছিল যে, আমি তাঁর আমলে থাকলে তাঁকে সাহায্য করতাম এবং আমার সম্প্রদায়কে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে বলতাম।

সাবার সন্তানদের ইয়ামানে ও শামে বসতি স্থাপন করার ঘটনাটি তাদের উপর বন্যার আযাব আসার পরবর্তী ঘটনা। বন্যার পর তারা বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েছিল।——(ইবনে কাসীর) কুরতুবী সাবা সম্প্রদায়ের সময়কাল হযরত ঈসা (আ)-র পরে এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পূর্বে উল্লেখ করেছেন। فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ

আরবী অভিধানে عرم শব্দের একাধিক অর্থ সুবিদিত। তফসীরকারকগণ প্রত্যেক অর্থের দিক দিয়ে এ আয়াতের তফসীর করেছেন। কিন্তু কামুস, সেহাহ্, জওহরী ইত্যাদি অভিধানে বর্ণিত অর্থ কোরআনের পূর্বাপর বর্ণনার সাথে সামঞ্জস্যশীল। এসব অভিধানে عرم এর অর্থ লেখা হয়েছে বাঁধ, যা পানি আটকানোর জন্যে নির্মাণ করা হয়। হযরত ইবনে আব্বাসও عرم এর অর্থ বাঁধ বর্ণনা করেছেন।——(কুরতুবী)

ইবনে কাসীরের বর্ণনা অনুযায়ী এই বাঁধের ইতিহাস এই ঃ ইয়ামানের রাজধানী সানআ থেকে তিন মনযিল দূরে মাআরেব শহর অবস্থিত ছিল। এখানে সাবা সম্প্রদায়ের বসতি ছিল। দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী উপত্যকায় শহর অবস্থিত ছিল বিধায় উভয় পাহাড়ের উপর থেকে বৃষ্টির পানি বন্যার আকারে নেমে আসত। ফলে শহরের জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে যেত। দেশের সম্রাটগণ (তাদের মধ্যে রাণী বিলকিসের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়।) উভয় পাহাড়ের মাঝখানে একটি শক্ত ও মজবুত বাঁধ নির্মাণ করলেন। এ বাঁধ পাহাড় থেকে আগত বন্যার পানি রোধ করে পানির একটি বিরাট ভাণ্ডার তৈরী করে দিল। পাহাড়ের বৃষ্টির পানিও এতে সঞ্চিত হতে লাগল। বাঁধের উপরে-নিচে ও মাঝখানে পানি বের করার তিনটি দরজা নির্মাণ করা হল যাতে সঞ্চিত পানি সুশৃংখলভাবে শহরের লোকজনের মধ্যে এবং তাদের ক্ষেতে ও বাগানে পৌঁছানো যায়। প্রথমে উপরের দরজা খুলে পানি ছাড়া হত। উপরের পানি শেষ হয়ে গেলে মাঝখানের এবং সর্বশেষে নিচের তৃতীয় দরজা খুলে দেওয়া হত। পরবর্তী বছর বৃষ্টির মওসুমে বাঁধের তিনটি স্তরই আবার পানিতে পূর্ণ হয়ে যেত। বাঁধের নিচে একটি সুবৃহৎ পুকুর নির্মাণ করা হয়েছিল। এতে পানির বারটি খাল তৈরী করে শহরের বিভিন্ন দিকে পৌঁছানো হয়েছিল। সব খালে একই গতিতে পানি প্রবাহিত হত এবং নাগরিকদের প্রয়োজন মেটাত।

শহরের ডানে ও বামে অবস্থিত পাহাড়দ্বয়ের কিনারায় ফলমূলের বাগান নির্মাণ করা হয়েছিল। এসব বাগানে খালের পানি প্রবাহিত হত। এসব বাগান পরস্পর সংলগ্ন অবস্থায় পাহাড়ের কিনারায় দু'সারিতে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এগুলো সংখ্যায় অনেক হলেও কোরআন পাক جَنَّتَانِ অর্থাৎ দুই বাগান বলে ব্যক্ত করেছে।

কারণ, এক সারির সমস্ত বাগানকে পরস্পর সংলগ্ন হওয়ার কারণে এক বাগান এবং অপর সারির সমস্ত বাগানকে একই কারণে দ্বিতীয় বাগান সাব্যস্ত করা হয়েছে।

এসব বাগানে সকল প্রকার বৃক্ষ ও ফলমূল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হত। কাতাদাহ্ প্রমুখের বর্ণনা অনুযায়ী একজন নারী মাথায় খালি ঝুড়ি নিয়ে গমন করলে গাছ থেকে পতিত ফলমূল দ্বারা তা আপনা-আপনি ভরে যেত। হাত লাগানোরও প্রয়োজন হত না।---(ইবনে কাসীর)

كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ—আল্লাহ্ তা'আলা পয়গম্বরগণের মাধ্যমে তাদেরকে আদেশ দিয়েছিলেন, তোমরা আল্লাহ্ প্রদত্ত এই অফুরন্ত জীবনোপকরণ ব্যবহার কর এবং কৃতজ্ঞতা স্বরূপ সৎকর্ম ও আল্লাহ্র আনুগত্য করতে থাক! আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের এ শহরকে পরিচ্ছন্ন স্বাস্থ্যকর শহর করেছেন। শহরটি নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে অবস্থিত ছিল এবং আবহাওয়া স্বাস্থ্যকর ও বিশুদ্ধ ছিল। সমগ্র শহরে মশা-মাছি, ছারপোকা ও সাপ-বিচ্ছুর মত ইতর প্রাণীর নামগন্ধ ছিল না। বাইরে থেকে কোন ব্যক্তি শরীরে ও কাপড়-চোপড়ে উকুন ইত্যাদি নিয়ে এ শহরে পেঁছালে সেগুলো আপনা-আপনি মরে সাফ হয়ে যেত।---(ইবনে কাসীর)

بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ—এর সাথে رَبٌّ غَفُورٌ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এসব নিয়ামত ও ভোগ-বিলাস কেবল পার্থিব জীবন পর্যন্তই সীমিত নয়, বরং শোকর আদায় করতে থাকলে পরকালে আরও বৃহৎ ও স্থায়ী নিয়ামতের ওয়াদা আছে। কারণ, এসব নিয়ামতের স্রষ্টা ও তোমাদের পালনকর্তা ক্ষমাশীল। শোকর আদায়ে ঘটনাক্রমে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে গেলে তিনি ক্ষমা করবেন।

فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ—অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার সুবিস্তৃত নিয়ামত ও পয়গম্বরগণের হুঁশিয়ারি সত্ত্বেও যখন সাবা সম্প্রদায় আল্লাহ্র আদেশ পালনে বিমুখ হল, তখন আমি তাদের উপর বাঁধভাংগা বন্যা ছেড়ে ছিলাম। বন্যাকে বাঁধের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করার কারণ এই যে, যে বাঁধ তাদের হেফাযত ও স্বাচ্ছন্দ্যের উপায় ছিল, আল্লাহ্ তা'আলা তাকেই তাঁদের বিপর্যয় ও মুসিবতের কারণ করে দিলেন। তফসীরবিদগণ বর্ণনা করেন, আল্লাহ্ তা'আলা যখন এ সম্প্রদায়কে বাঁধভাংগা বন্যা দ্বারা ধ্বংস করার ইচ্ছা করলেন, তখন এই সুবৃহৎ বাঁধের গোড়ায় অন্ধ ইঁদুর নিয়োজিত করে দিলেন। তারা এর ভিত্তি দুর্বল করে দিল। বৃষ্টির মওসুমে পানির চাপে দুর্বল ভিত্তিতে ফাটল সৃষ্টি হয়ে গেল। অবশেষে বাঁধের পেছনে সঞ্চিত পানি সমগ্র উপত্যকায় ছড়িয়ে পড়ল। শহরের সমস্ত গৃহ বিধ্বস্ত হল এবং বৃক্ষ উজাড় হয়ে গেল। পাহাড়ের কিনারায় দু'সারি উদ্যানের পানি শুকিয়ে গেল।

ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ্ বর্ণনা করেন, তাদের কিতাবে লিখিত ছিল যে, এ বাঁধটি ইঁদুরের মাধ্যমে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। সেমতে বাঁধের কাছে ইদুঁর দেখে তারা বিপদ সংকেত বুঝতে পারল। ইঁদুর নিধনের উদ্দেশ্যে তারা বাঁধের নিচে অনেক বিড়াল লালন-পালন করল, যাতে ইঁদুররা বাঁধের কাছে আসতে না পারে। কিন্তু আল্লাহ্র তকদীর প্রতিরোধ করার সাধ্য কার? বিড়ালরা ইঁদুরের কাছে হার মানল এবং ইঁদুররা বাঁধের ভিত্তিতে প্রবিষ্ট হয়ে গেল।—(ইবনে কাসীর)

ঐতিহাসিক বর্ণনায় আরও বলা হয়েছে যে, কিছুসংখ্যক বিচক্ষণ ও দূরদর্শী লোক ইঁদুর দেখা মাত্রই সেস্থান পরিত্যাগ করে আস্তে আস্তে অন্যত্র সরে গেল। অবশিষ্টরা সেখানেই রয়ে গেল; কিন্তু বন্যা শুরু হলে তারাও স্থানান্তরিত হয়ে গেল এবং অনেকেই বন্যায় প্রাণ হারাল। মোটকথা, সমস্ত শহর জনশূন্য হয়ে গেল। যেসব অধিবাসী অন্য দেশে চলে গিয়েছিল, তাদের কিছু বিবরণ উপরে মসনদে আহমদ বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। ছয়টি গোত্র ইয়ামানে এবং চারটি গোত্র শাম দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। মদীনার বসতিও তাদের কতক গোত্র থেকে শুরু হয়। ইতিহাস গ্রন্থসমূহে এর বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে। বন্যার ফলে শহর ধ্বংস হওয়ার পর তাদের দু'সারি উদ্যানের অবস্থা পরবর্তী আয়াতে এভাবে বিধৃত হয়েছে ঃ

وَبَدَّلْنَاهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ

مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ—অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মূল্যবান ফলমূলের বৃক্ষের পরিবর্তে তাতে এমন বৃক্ষ উৎপন্ন করলেন, যার ফল ছিল বিস্বাদ। অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে خمط এর অর্থ এরাফ বৃক্ষ। জওহরী লিখেন, এক প্রকার এরাফ বৃক্ষে কিছু ফল ধরে এবং তা খাওয়াও হয়। কিন্তু এই বৃক্ষের ফলও বিস্বাদ ছিল। আবু ওবায়দা বলেন, তিক্ত ও কাঁটা বিশিষ্ট বৃক্ষকে خمط বলা হয়। اثل শব্দের অর্থ ঝাউ গাছ, যার কোন ফল খাওয়ার যোগ্য হয় না। কেউ কেউ বলেন, اثل এর অর্থ বাবলা গাছ যা কাঁটা বিশিষ্ট হয় এবং যার ফল ছাগলকে খাওয়ানো হয়।

سدر-এর অর্থ কুলগাছ। এর এক প্রকার বাগানে যত্ন সহকারে লাগানো হয় এবং ফল হয় সুস্পষ্ট সুস্বাদু। এরূপ গাছে কাঁটা কম এবং ফল বেশী হয়। অপর প্রকার জংলী কুলগাছ। এটা জঙ্গলে স্বউদগত ও কাঁটা বিশিষ্ট ঝাড় হয়ে থাকে এবং কাঁটা বেশী ও ফল কম হয়ে থাকে। আয়াতে سدر শব্দের সাথে قليل যুক্ত করে সম্ভবত ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সেই বাগানে কুলগাছও জংলী কিংবা স্বউদগত ছিল, যাতে ফল কম ও টক হয়ে থাকে।

ذٰلِكَ جَزَيْنٰهُمْ بِمَا كَفَرُوْا---অর্থাৎ আমি এ শাস্তি তাদেরকে কুফরের কারণে দিয়েছিলাম। كفر শব্দের অর্থ অকৃতজ্ঞতাও হয়ে থাকে এবং সত্য ধর্ম অস্বীকার করাও হয়ে থাকে। এখানে উভয় অর্থ সম্ভবপর। কেননা তারা অকৃতজ্ঞতাও করেছিল এবং প্রেরিত তেরজন পয়গম্বরকে মিথ্যারোপও করেছিল।

জ্ঞাতব্য ঃ এ ঘটনায় বলা হয়েছে যে, সাবা সম্প্রদায়ের কাছে আল্লাহ্ তা'আলা তেরজন পয়গম্বর প্রেরণ করেছিলেন। অথচ পূর্বে একথাও বর্ণিত হয়েছে যে, সাবা সম্প্রদায় ও বাঁধভাঙ্গা বন্যার ঘটনা হযরত ঈসা (আ)-র পর ও রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পূর্বে অন্তর্বর্তীকালে সংঘটিত হয়েছিল। একে فترت--এর কাল বলা হয়। অধিকাংশ আলিমের মতে এ সময়ে কোন নবী-রসূল প্রেরিত হয়নি। অতএব এই তেরজন পয়গম্বর প্রেরণ কিরূপে শুদ্ধ হতে পারে? এর জওয়াবে রূহুল মা'আনীতে বলা হয়েছে ঃ বাঁধভাংগা বন্যার ঘটনা অন্তর্বর্তীকালে সংঘটিত হলে একথা জরুরী হয় না যে, এই পয়গম্বরগণও সে সময়েই আগমন করেছিলেন। এটা সম্ভবপর যে, তাঁরা অন্তর্বর্তীকালের পূর্বেই আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং তাদের কুফর ও অবাধ্যতা অন্তর্বর্তীকালে তাদের উপর নাযিল করা হয়েছিল।

كفور---وَهَلْ نُجٰزِىْٓ اِلَّا الْكَفُوْرَ শব্দের অর্থ অতিশয় কুফরকারী। আয়াতের অর্থ এই যে, আমি অতিশয় কুফরকারী ব্যতীত কাউকে শাস্তি দেই না। এটা বাহ্যত সেসব আয়াত ও সহীহ্ হাদীসের পরিপন্থী, যেগুলো দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, মুসলমান গোনাহ্গারকেও তাদের কর্ম অনুযায়ী জাহান্নামের শাস্তি দেওয়া হবে যদিও পরিণামে শাস্তি ভোগ করার পর তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে দাখিল করা হবে। এই খটকার জওয়াবে কেউ কেউ বলেন, এখানে যে কোন শাস্তি উদ্দেশ্য নয়, বরং সাবা সম্প্রদায়ের অনুরূপ ব্যাপক আযাব বোঝানো হয়েছে। এরূপ আযাব বিশেষভাবে কাফিরদের জন্য নির্দিষ্ট। মুসলমানদের উপর এরূপ আযাব আসে না।---(রূহুল মা'আনী)

এর সমর্থন সাহাবী ইবনে খায়রাহ্‌র উক্তিতেও পাওয়া যায়। তিনি বলেন ঃ

جزاء المعصية الوهن فى العبادة و الضيق فى المعيشة و التعسر فى اللذة قال لا يصادف لذة حلالا الا جاءه من ينغصه -

অর্থাৎ গোনাহের শাস্তি হচ্ছে ইবাদতে শৈথিল্য সৃষ্টি হওয়া, জীবিকায় সংকীর্ণতা দেখা দেওয়া এবং উপভোগ দুরূহ হয়ে যাওয়া। তিনি এর অর্থ এই বর্ণনা করেন

যে, যখন সে কোন হালাল ভোগ্যবস্তু পায়, তখন কোন-না-কোন কারণ সৃষ্টি হয়ে যায়, যা তার উপভোগকে মলিন করে দেয়।---(ইবনে কাসীর) এতে জানা গেল যে, মুসলমান গোনাহ্গারের শাস্তি দুনিয়াতে এ ধরনের হয়ে থাকে। তার উপর আকাশ থেকে অথবা ভূ-গর্ভ থেকে কোন খোলাখুলি আযাব আসে না। এটা কাফিরদের জন্যই নির্দিষ্ট।

হযরত হাসান বসরী (রা) বলেন ঃ صدق الله العظيم لا يعاقب بمثل فعله الا الكفور। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা সত্য বলেছেন যে, মন্দ কাজের যথাযোগ্য শাস্তি কাফির ব্যতীত কাউকে দেওয়া হয় না।---(ইবনে কাসীর) মু'মিনকে তার গোনাহের মধ্যেও কিছুটা অবকাশ দেওয়া হয়।

রূহুল মা'আনীত বলা হয়েছে, এ আয়াতের আক্ষরিক অর্থই উদ্দেশ্য। শাস্তি হিসাবে শাস্তি---কেবল কাফিরকেই দেওয়া যায়। মুসলমান পাপীকে যে শাস্তি দেওয়া হয়, তা কেবল দৃশ্যত শাস্তি হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে উদ্দেশ্য থাকে তাকে গোনাহ্ থেকে পবিত্র করা। উদাহরণত স্বর্ণকে আগুনে পোড়ার উদ্দেশ্য তার ময়লা দূর করা। এমনিভাবে কোন মু'মিনকে পাপের কারণে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হলে তার উদ্দেশ্য হবে তার দেহের সেই অংশ জ্বালিয়ে দেওয়া, যা হারাম দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে। এটা হয়ে গেলে সে জান্নাতে যাওয়ার যোগ্য হয়ে যায়। তখন তাকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে দাখিল করা হয়।

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً

وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ এ আয়াতে সাবাবাসীদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার আরও একটি নিয়ামত ও তাদের অকৃতজ্ঞতা এবং মূর্খতার আলোচনা রয়েছে। তারা স্বয়ং এই নিয়ামতের পরিবর্তন করে কঠোরতার দোয়া ও বাসনা প্রকাশ করেছিল। الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا বলে শাম দেশের গ্রামাঞ্চল বোঝানো হয়েছে। কেননা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে রহমত নাযিল হওয়ার কথা একাধিক আয়াতে শাম দেশের জন্য বর্ণিত আছে। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, যেসব জনপদকে আল্লাহ্ তা'আলা বরকত দান করেছিলেন তাদেরকে প্রায়ই ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে শামে সফর করতে হত। মাআরেব শহর থেকে শামের দূরত্ব ছিল অনেক। রাস্তাও সহজ ছিল না। আল্লাহ্ তা'আলা সাবাবাসীদের প্রতি অনুগ্রহ করে তাদের শহর মাআরেব থেকে শাম পর্যন্ত অল্প অল্প দূরত্বে জনবসতি প্রতিষ্ঠিত করে দেন। এসব জনবসতি সড়কের কিনারায় অবস্থিত ছিল। তাই আয়াতে قُرًى ظَاهِرَةً দৃশ্যমান জনপদ বলা

হয়েছে। এসব জনবসতির ফলে কোন মুসাফির গৃহ থেকে বেরিয়ে দুপুরে বিশ্রাম অথবা খাদ্য গ্রহণ করতে চাইলে অনায়াসেই কোন জনপদে পেঁাছে নিয়মিত খাদ্য-গ্রহণ করে বিশ্রাম করতে পারত। অতপর যোহরের পর রওয়ানা হয়ে সূর্যাস্ত পর্যন্ত অন্য বস্তিতে পেঁাছে রাত্রি অতিবাহিত করতে পারত। قَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ বাক্যের অর্থ এই যে, জনবসতিগুলো এমন সুষম ও সমান দূরত্বে গড়ে উঠেছিল যে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এক বস্তি থেকে অন্য বস্তিতে পেঁাছা যেত।

سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ—এটা সাবা সম্প্রদায়ের প্রতি তৃতীয় নিয়ামত। অর্থাৎ বস্তিসমূহের সমান দূরত্বের কারণে সমতালে পথ প্রতিক্রম করা হত। পথও সবটুকু নিরাপদ ছিল। চোর-ডাকাতের উপদ্রব ছিল না। দিবারাত্রি সর্বক্ষণ নিশ্চিন্ত মনে সফর করা যেত।

فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ- অর্থাৎ জালিমরা আল্লাহ্ তা'আলার উপরোক্ত নিয়ামতের মূল্য বুঝল না। তারা না-শোকরী করে নিজেরাই দোয়া করল, হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের জন্য ভ্রমণের দূরত্ব সৃষ্টি করে দিন। নিকটবর্তী গ্রাম যেন না থাকে। মাঝখানে জঙ্গল ও জনহীন প্রান্তর থাকুক, যাতে কিছু কষ্টও সহ্য করতে হয়। তাদের অবস্থা ছিল বনী ইসরাঈলের অনুরূপ, যারা কোনরূপ কষ্ট ও শ্রমের ব্যতিরেকেই মান্না ও সালওয়া রিযিক হিসাবে পেত। এতে অতিষ্ঠ হয়ে তারা আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিল, হে আল্লাহ্, এর পরিবর্তে আমাদেরকে সবজি ও তরকারী দান করুন। আল্লাহ্ তা'আলা সাবাবাসীদের না-শোকরীর কারণে তাদেরকে উপরে বর্ণিত বাঁধভাঙ্গা বন্যার শাস্তি দেন। এরই সর্বশেষ পরিণতি এ আয়াতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, তাদেরকে সম্পূর্ণ বরবাদ ও সর্বস্বহারা করে দেওয়া হয়। ফলে দুনিয়াতে তাদের ভোগবিলাস ও ধনৈশ্বর্যের কাহিনীই রয়ে গেছে এবং তারা উপাখ্যানে পরিণত হয়েছে।

مَزَّقْنَاهُمْ শব্দটি تَمْزِيق থেকে উদ্ভূত। অর্থ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করা। অর্থাৎ মা'আরেব শহরের কিছু অধিবাসী ধ্বংস হয়ে গেল এবং কিছু বিচ্ছিন্ন হয়ে বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে পড়ল। আরবে তাদের ধ্বংস ও বিচ্ছিন্নতার ঘটনাটি প্রবাদ বাক্যে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। এরূপ ক্ষেত্রে আরবরা বলতঃ تَفَرَّقُوا أَيَادِي سَبَا অর্থাৎ তারা সাবা সম্প্রদায়ের ঐশ্বর্যে পালিত লোকদের ন্যায় বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

ইবনে কাসীর প্রমুখ তফসীরবিদ এ স্থলে জনৈক অতীন্দ্রিয়বাদীর নাতিদীর্ঘ কাহিনী উল্লেখ করেছেন। বন্যার আযাব আসার কিছু পূর্বে সে এ সম্পর্কে জানতে পেরেছিল। সে এক আশ্চর্য কৌশলের মাধ্যমে প্রথমে তার ধনসম্পত্তি, গৃহ ইত্যাদি সব বিক্রয় করে দিল। বিক্রয়লব্ধ অর্থ তার করায়ত্ত হয়ে গেলে সে তার সম্প্রদায়কে ভবিষ্যৎ বন্যা ও আযাব সম্পর্কে অবহিত করে বলল, কেউ প্রাণে বাঁচতে চাইলে অবিলম্বে এখান থেকে সরে যাও। সে আরও বলল, তোমাদের মধ্যে যারা দূরবর্তী সফর অবলম্বন করে নিরাপদ স্থানে চলে যাওয়ার ইচ্ছা কর, তারা আম্মানে চলে যাও, যারা মদ, খামীর করা রুটি, ফল-মূল ইত্যাদি চাও, তারা শাম দেশের বুসরা নামক স্থানে গিয়ে বসবাস কর এবং যারা এমন সওয়ারী চাও, যা কাদার মধ্যেও টিকে থাকে, দুর্ভিক্ষের সময় কাজে আসে এবং সফরের সময়ও সাথে থাকে, তারা ইয়াসরিবে অর্থাৎ মদীনায় স্থানান্তরিত হও। সেখানে প্রচুর খেজুর পাওয়া যায়। তার সম্প্রদায় তার পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করল। ইযদ গোত্র আম্মানে, গাসসান গোত্র বুসরায় এবং আউস, খাযরাজ ও বনূ উসমান মদীনায় স্থানান্তরিত হয়ে গেল। বাতনেমুর নামক স্থানে পৌঁছে বনূ উসমান সেখানেই থেকে যায়। এই বিচ্ছিন্নতার কারণে তাদের উপাধি হয়ে যায় খুযায়া। আউস ও খাযরাজ মদীনায় পৌঁছে সেখানে বসতি স্থাপন করল। ইবনে কাসীর এই বিবরণ সনদ সহকারে উল্লেখ করে বলেন, এভাবে সাবা সম্প্রদায় ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, যা مَزَّقْنَاهُمْ বাক্যে বিধৃত হয়েছে।

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ---অর্থাৎ সাবা সম্প্রদায়ের উত্থান-পতন ও অবস্থার পরিবর্তনের মধ্যে অনেক নিদর্শন ও শিক্ষা রয়েছে। শিক্ষা রয়েছে সেই ব্যক্তির জন্য, যে অত্যন্ত ধৈর্যশীল ও অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন বিপদ ও কষ্টে পতিত হয়ে সবর করে এবং কোন নিয়ামত ও সুখ অর্জিত হলে আল্লাহ্র শোকর আদায় করে। এ ভাবে সে জীবনের প্রত্যেক অবস্থায় উপকারই উপকার লাভ করে। বুখারী ও মুসলিমে উদ্ধৃত হযরত আবূ হোরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, মু'মিনের অবস্থা বিস্ময়কর, তার সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা যে আদেশই জারী করেন, সব মঙ্গলই মঙ্গল এবং উপকারই উপকার হয়ে থাকে। যে কোন নিয়ামত, সুখ ও আনন্দের বিষয় লাভ করলে আল্লাহ্ তা'আলার শোকর আদায় করে। ফলে সেটা তার পরকালের জন্য মঙ্গলজনক হয়ে যায়। পক্ষান্তরে যদি সে কোন কষ্ট ও বিপদাপদের সম্মুখীন হয়, তবে সবর করে, যার বিরাট পুরস্কার ও সওয়াব সে পায়। ফলে বিপদও তার জন্য উপকারী হয়ে যায়।---(ইবনে কাসীর)

কোন কোন তফসীরবিদ صَبَّارٍ শব্দটিকে সবরের সাধারণ অর্থে নিয়েছেন, যাতে ইবাদতে দৃঢ় থাকা এবং গোনাহ থেকে বেঁচে থাকাও অন্তর্ভুক্ত। এ তফসীর অনুযায়ী মু'মিন সর্বাবস্থায় সবর ও শোকরের প্রতীক হয়ে থাকে।

وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ ۗ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ۝

(২০) আর তাদের উপর ইবলীস তার অনুমান সত্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করল। ফলে তাদের মধ্যে মু'মিনদের একটি দল ব্যতীত সকলেই তার পথ অনুসরণ করল। (২১) তাদের উপর শয়তানের কোন ক্ষমতা ছিল না, তবে কে পরকালে বিশ্বাস করে এবং কে তাতে সন্দেহ করে, তা প্রকাশ করাই ছিল আমার উদ্দেশ্য। আপনার পালন-কর্তা সববিষয়ে তত্ত্বাবধায়ক।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

বাস্তবিক তাদের (অর্থাৎ মানবজাতি) সম্পর্কে ইবলীস তার ধারণা সত্যে পরিণত করল (অর্থাৎ তার বিশ্বাস ছিল যে, সে অধিকাংশ মানুষকে পথভ্রষ্ট করে ছাড়বে, কেননা তারা মাটির তৈরি এবং সে আগুনের তৈরি। তার এ বিশ্বাস যথার্থ প্রমাণিত হল।) ফলে সবাই তার অনুসরণ করল মু'মিনদের একটি দল ব্যতীত। (তাদের মধ্যে যারা পূর্ণাঙ্গ মু'মিন ছিল, তারা সম্পূর্ণই নিরাপদ রইল) এবং যারা দুর্বল মু'মিন ছিল, তারা গোনাহে লিপ্ত হলেও শিরক ও কুফর থেকে বেঁচে রইল। তাদের উপর ইবলীসের কোন ক্ষমতা ছিল না; তবে কে পরকালে বিশ্বাস করে এবং কে সন্দেহ পোষণ করে, তা (বাহ্যত) জানাই ছিল আমার উদ্দেশ্য (অর্থাৎ মু'মিন ও কাফিরকে আলাদাভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্য পরীক্ষা উদ্দেশ্য ছিল। যাতে ন্যায়-বিচারের স্বার্থে সওয়াব ও আযাব দেওয়া যায়)। আপনার পালনকর্তা (যেহেতু) সর্ববিষয়ে তত্ত্বাবধক (যাতে ঈমান এবং কুফরও অন্তর্ভুক্ত তাই তিনি প্রত্যেককে উপযুক্ত প্রতিদান ও শাস্তি দেবেন)।

قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ ۖ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ ۝ وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ ۚ حَتَّىٰ إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ۖ قَالُوا الْحَقَّ ۖ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ۝ قُلْ

مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ قُلِ اللّٰهُ ۙ وَاِنَّآ اَوْ اِيَّاكُمْ لَعَلٰى هُدًى

اَوْ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿۲۴﴾ قُلْ لَّا تُسْـَٔلُوْنَ عَمَّآ اَجْرَمْنَا وَلَا نُسْـَٔلُ عَمَّا

تَعْمَلُوْنَ ﴿۲۵﴾ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ ۭ وَهُوَ الْفَتَّاحُ

الْعَلِيْمُ ﴿۲۶﴾ قُلْ اَرُوْنِيَ الَّذِيْنَ اَلْحَقْتُمْ بِهٖ شُرَكَاۗءَ كَلَّا ۭ بَلْ هُوَ اللّٰهُ

الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿۲۷﴾

(২২) বলুন, তোমরা তাদেরকে আহবান কর, যাদেরকে উপাস্য মনে করতে আল্লাহ্ ব্যতীত। তারা নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে অণু পরিমাণ কোন কিছুর মালিক নয়, এতে তাদের কোন অংশও নেই এবং তাদের কেউ আল্লাহর সহায়কও নয়। (২৩) যার জন্য অনুমতি দেওয়া হয়, তার জন্য ব্যতীত আল্লাহর কাছে কারও সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না। যখন তাদের মন থেকে ভয়-ভীতি দূর হয়ে যাবে, তখন তারা পরস্পরে বলবে, তিনি সত্য বলেছেন এবং তিনিই সবার উপরে মহান। (২৪) বলুন, নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল থেকে কে তোমাদেরকে রিযিক দেয়। বলুন, আল্লাহ্। আমরা অথবা তোমরা সৎপথে অথবা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছি ও আছ ? (২৫) বলুন, আমাদের অপরাধের জন্য তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে না এবং তোমরা যা কিছু কর, সে সম্পর্কে আমরা জিজ্ঞাসিত হব না। (২৬) বলুন, আমাদের পালনকর্তা আমাদেরকে সমবেত করবেন, অতপর তিনি আমাদের মধ্যে সঠিকভাবে ফয়সালা করবেন। তিনি ফয়সালাকারী, সর্বজ্ঞ। (২৭) বলুন, তোমরা যাদেরকে আল্লাহর সাথে অংশীদাররূপে সংযুক্ত করেছ, তাদেরকে এনে আমাকে দেখাও। বরং তিনিই আল্লাহ্, পরাক্রমশীল, প্রজ্ঞাময়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি (তাদেরকে) বলুন, তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত যাদেরকে উপাস্য মনে কর, তাদেরকে নিজেদের অভাব-অনটনে) ডাক (এতে তাদের ইখতিয়ার ও ক্ষমতা জানা যাবে। তাদের বাস্তব অবস্থা এই যে,) তারা নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে অণু পরিমাণ কোন কিছুর ক্ষমতা রাখে না, এতে (অর্থাৎ এতদুভয়ের সৃষ্টি কর্মে) তাদের কোন অংশীদারিত্ব নেই এবং তাদের কেউ (কোন কাজে) আল্লাহ্র সহায়ক নয়। আল্লাহ্র সামনে (কারও) সুপারিশ ফলপ্রসূ হয় না (বরং সুপারিশই হতে পারে না) কিন্তু তার জন্য যার সম্পর্কে তিনি (কোন সুপারিশকারীকে) অনুমতি দেন। (কাফির ও মুশরিকদের কিছুসংখ্যক মূর্খ স্বহস্ত নির্মিত পাথরের বিগ্রহকেই অভাব পূরণকারী

কার্যনির্বাহী ও আল্লাহ্‌র অংশীদার মনে করত। তাদের খণ্ডন করার জন্য আয়াতের প্রথম বাক্য لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ — বলা হয়েছে। কিছু মূর্খ মূর্তিকে এত ক্ষমতাবান মনে করত না, কিন্তু তারা বিশ্বাস করত যে, মূর্তিগুলো আল্লাহ্‌র কাজে সহায়ক। তাদের খণ্ডন করার জন্য مَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ বলা হয়েছে। কিছুসংখ্যক এরূপও মনে করত না; কিন্তু তাদের বিশ্বাস ছিল যে, মূর্তিগুলো আল্লাহর প্রিয় বটে। এরা যার সুপারিশ করবে, তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়ে যাবে। সেমতে তারা বলতঃ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللهِ — তাদের খণ্ডনের জন্য وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ বলা হয়েছে। অর্থাৎ তোমাদের এ ধারণা ভিত্তিহীন। এরা আল্লাহ্‌র প্রিয় নয়। অতপর বলা হয়েছে যারা যোগ্য ও আল্লাহ্‌র প্রিয় যেমন ফেরেশতা, তারা পর্যন্ত কারও সুপারিশ করার ব্যাপারে স্বাধীন নয়; তাদের সুপারিশ করার রীতি এই যে যার জন্য সুপারিশ করার অনুমতি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে দেওয়া হয় তারা কেবল তার জন্যই সুপারিশ করতে পারে; তাও সহজে নয়। কেননা, তারা নিজেই আল্লাহ্‌র ভয়ে হিমসিম খেতে থাকে। তাদেরকে কোন আদেশ দেওয়া হলে অথবা কারও জন্য সুপারিশ করতে বলা হলে তারা আদেশ শোনার সময় ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। অতপর ভয়ের অবস্থা দূর হয়ে গেলে আদেশ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে একে অন্যকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জেনে নেয় যে কি আদেশ হয়েছে। এরপর তারা আদেশ পালনে রত হয় এবং কারও জন্য সুপারিশ করে।

সারকথা, আল্লাহ্‌র যোগ্য ও প্রিয় ফেরেশতাগণও স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে বিনানুমতিতে কারও জন্য সুপারিশ করতে পারে না। সুপারিশের অনুমতি দেওয়া হলেও ভয়ে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলে। এরপর সংজ্ঞা ফিরে এলে সুপারিশ করে। এমতাবস্থায় স্বহস্ত নির্মিত পাথুরে মূর্তি---যাদের না আছে যোগ্যতা এবং না তারা আল্লাহ্‌র প্রিয়--- তারা কেমন করে কারও জন্যে সুপারিশ করতে পারে? পরবর্তী আয়াতে ফেরেশতাগণের সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলার বিষয় এভাবে বিবৃত হয়েছে :) যখন তাদের মন থেকে ভয়-ভীতি (যা আদেশ শোনার সময় দেখা দেয়,) দূর হয়ে যায়, তখন পরস্পরে জিজ্ঞাসাবাদ করে, তোমাদের পালনকর্তা কি আদেশ করেছেন? তারা বলে, (অমুক) সত্য আদেশ দিয়েছেন। (যেমন ছাত্র পড়ার সময় শিক্ষকের বক্তৃতা বিশুদ্ধভাবে মুখস্থ করার জন্য পরস্পরে পুনরাবৃত্তি করে নেয়, ফেরেশতাগণও তদ্রূপ আদেশ সম্পর্কে একে অপরকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নেয়, অতপর আদেশ পালন করে। আল্লাহ্‌র সামনে ফেরেশতাগণের এরূপ হওয়া বিচিত্র নয়, কেননা) তিনি সবার উপরে, সুমহান।

আপনি (তাদেরকে তওহীদ প্রমাণ করার জন্য আরও) বলুন, নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল থেকে কে তোমাদেরকে (বৃষ্টি বর্ষণ করে ও উদ্ভিদ উৎপন্ন করে) রিযিক দান করে? (এর জওয়াব তাদের কাছেও নির্দিষ্ট; তাই) আপনি (-ই) বলে দিন, আল্লাহ্ (রিযিক দেন, আরও বলুন, এই তওহীদের বিষয়ে) নিশ্চয় আমরা অথবা তোমরা সৎপথে অথবা প্রকাশ্য বিভ্রান্তিতে আছি ও আছ (অর্থাৎ এটা সম্ভবপর নয় যে, তওহীদ ও শিরক পরস্পর বিরোধী দু'টি-ই শুদ্ধ ও সত্য হবে এবং উভয় প্রকার বিশ্বাস পোষণকারীই সত্যধর্মী হবে; বরং এতদুভয়ের মধ্যে একটি সঠিক ও অপরটি অঠিক হওয়া জরুরী। যারা শুদ্ধ বিশ্বাসী, তারা সৎপথে এবং যারা ভ্রান্ত বিশ্বাসী, তারা পথভ্রষ্টতায় থাকবে। এখন তোমরা চিন্তা করে দেখ, এতদুভয়ের মধ্যে কোন বিশ্বাস সত্য এবং কে সত্য ও সত্যপন্থী এবং কে পথভ্রষ্ট।) আপনি (তাদেরকে এই বিতর্কে আরও) বলে দিন, (আমি সত্য ও মিথ্যা সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেছি, এখন তোমরা ও আমরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ কাজের জন্য দায়ী) তোমরা আমাদের অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে না এবং আমরা তোমাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হব না। আপনি (তাদেরকে আরও) বলে দিন, (এক সময় অবশ্যই আসবে, যখন) আমাদের পালনকর্তা সকলকে (এক স্থানে) সমবেত করবেন, অতপর আমাদের মধ্যে সঠিকভাবে ফয়সালা করবেন। তিনি ফয়সালাকারী, সর্বজ্ঞ। আপনি (আরও) বলুন, (তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার মহিমা ও সর্বময় ক্ষমতার কথা শুনলে এবং তোমাদের মূর্তিগুলোর অসহায়ত্ব দেখলে) আমাকে একটু তাদেরকে দেখাও, যাদেরকে তোমরা শরীক স্থির করে (ইবাদতের যোগ্য হওয়ার ব্যাপারে) আল্লাহর সাথে সংযুক্ত করে রেখেছ। (তাঁর কোন শরীক নেই;) বরং (বাস্তবে) তিনিই আল্লাহ্ (অর্থাৎ সত্য উপাস্য) পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্র আদেশ অবতীর্ণ হওয়ার সময় ফেরেশতাগণ সংজ্ঞাহীন হয়ে যায়, অতপর তারা একে অপরকে আদেশ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করে। সহীহ্ বুখারীতে হযরত আবূ হোরায়রার উদ্ধৃত রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে যে, যখন আল্লাহ্ তা'আলা আকাশে কোন আদেশ জারী করেন, তখন সমস্ত ফেরেশতা বিনয় ও নম্রতা সহকারে পাখা নাড়তে থাকে (এবং সংজ্ঞাহীনের মত হয়ে যায়।) অতপর তাদের মন থেকে অস্থিরতা ও ভয়ভীতির প্রভাব দূর হয়ে গেলে তারা বলে তোমাদের পালনকর্তা কি বলেছেন? অন্যরা বলে, অমুক সত্য আদেশ জারী করেছেন।

মুসলিম উদ্ধৃত হযরত ইবনে আব্বাস বর্ণিত রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ্ যখন কোন আদেশ দেন তখন আরশ বহনকারী ফেরেশ-তাগণ তসবীহ পাঠ করতে থাকে। তাদের তসবীহ শুনে তাদের নিকটবর্তী আকাশের ফেরেশতাগণও তসবীহ্ পাঠ করে। অতপর তাদের তসবীহ্ শুনে তাদের নিচের আকাশের ফেরেশতাগণ তসবীহ্ পাঠ করে। এভাবে দুনিয়ার আকাশ তথা সর্বনিম্ন

আকাশের ফেরেশতাগণও তসবীহ্ পাঠে রত হয়ে যায়। অতপর তারা আরশ বহন-কারী ফেরেশতাগণের নিকটবর্তী ফেরেশতাগণকে জিজ্ঞেস করে, আপনাদের পালনকর্তা কি আদেশ দিয়েছেন? তারা তা বলে দেয়। এভাবে তাদের নিচের আকাশের ফেরেশতারা উপরের ফেরেশতাগণকে একই প্রশ্ন করে। এভাবে দুনিয়ার আকাশ পর্যন্ত সওয়াল ও জওয়াব পেঁৗছে যায়।----(মাযহারী)

বিতর্কে প্রতিপক্ষের মানসিকতার প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং উত্তেজনা থেকে বিরত থাকা : وَاِنَّا اَوْ اِيَّاكُمْ لَعَلٰى هُدًى اَوْ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ—এতে মুশরিক ও কাফিরদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। সুস্পষ্ট প্রমাণাদির মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলাই স্রষ্টা, মালিক ও সর্বশক্তিমান। এতে মূর্তিদের অক্ষমতা ও দুর্বলতা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখানো হয়েছে। এসব বিষয়ের পর মুশরিকদেরকে সম্বোধন করে একথা বলাই সঙ্গত ছিল যে, তোমরাই মূর্খ ও পথভ্রষ্ট। তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে মূর্তি ও শয়তানদের পূজা কর। কিন্তু কোরআন পাক এক্ষেত্রে যে বিজ্ঞজনোচিত বর্ণনাভঙ্গি অবলম্বন করেছে, তা দাওয়াত, তবলীগ ও ইসলাম বিরোধীদের সাথে বিতর্ককারীদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পথনির্দেশ। এ আয়াতে তাদেরকে কাফির বা পথভ্রষ্ট বলার পরিবর্তে বলা হয়েছে যে, এসব সুস্পষ্ট প্রমাণাদির আলোকে কোন সমঝদার ব্যক্তি তওহীদ ও শিরক উভয়টিকে সত্য বলে মানতে পারে না এবং তওহীদ-পন্থী ও শিরকপন্থী উভয়কে সত্যপন্থী আখ্যা দিতে পারে না। বরং এটা নিশ্চিত যে, এতদুভয়ের মধ্যে একদল সত্য পথে ও অপর দল ভ্রান্ত পথে আছে। এখন তোমরা নিজেরাই চিন্তা কর এবং ফয়সালা কর যে, আমরা সৎপথে আছি, না তোমরা। প্রতিপক্ষকে কাফির ও পথভ্রষ্ট বললে সে উত্তেজিত হয়ে যেত। তাই তা বলা হয়নি এবং সহানুভূতিমূলক বর্ণনাভঙ্গি অবলম্বন করা হয়েছে, যাতে কঠোর প্রাণ প্রতিপক্ষও চিন্তা করতে বাধ্য হয়।----(কুরতুবী, বয়ানুল কোরআন)

আলিমগণের উচিত এই পয়গম্বরসুলভ দাওয়াত, উপদেশ ও বিতর্কের পন্থাটি সদাসর্বদা সামনে রাখা। এর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনের ফলেই দাওয়াত, প্রচার ও বিতর্ক নিষ্ফল বরং ক্ষতিকর হয়ে যায়। প্রতিপক্ষ জেদের বশবর্তী হয়ে যায় এবং তাদের পথভ্রষ্টতা আরও পাকাপোক্ত হয়ে যায়।

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

---

(২৮) আমি আপনাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে পাঠিয়েছি; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি আপনাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য (অর্থাৎ জিন, ইন্‌সান, আরব, আজম উপস্থিত কিংবা ভবিষ্যতে আগমনকারী সবার জন্য) পয়গম্বর করে (বিশ্বাস স্থাপন করলে তাদেরকে আমার সন্তুষ্টি ও সওয়াবের) সুসংবাদদাতারূপে এবং (বিশ্বাস স্থাপন না করলে তাদেরকে আমার ক্রোধ ও আযাবের ব্যাপারে) সতর্ককারীরূপে পাঠিয়েছি, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না (মূর্খতা ও হঠকারিতার বশবর্তী হয়ে অস্বীকার ও মিথ্যারোপে মেতে উঠে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে তওহীদের এবং আল্লাহ্ যে সর্বশক্তিমান তার বর্ণনা ছিল। আলোচ্য আয়াতে রিসালতের বিষয় বর্ণিত হয়েছে এবং বিশেষভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আমাদের রসূলে করীম (সা) বিশ্বের সমগ্র বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জাতিসমূহের প্রতি প্রেরিত হয়েছেন।

كافة — كَافَّةً لِّلنَّاسِ শব্দটি আরবী বাকপদ্ধতিতে সবকিছুকে শামিল করার অর্থে ব্যবহৃত হয়। এতে কোন ব্যতিক্রম থাকে না। বাক্য প্রকরণে শব্দটি حال বিধায় للناس كافة বলাই সঙ্গত ছিল। কিন্তু রিসালতের ব্যাপকতা বর্ণনার লক্ষ্যে শব্দটিকে আগে রাখা হয়েছে।

রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পূর্বে প্রেরিত পয়গম্বরগণের রিসালত ও নবুয়ত বিশেষ সম্প্রদায় ও বিশেষ ভূ-খণ্ডের জন্য সীমিত ছিল। এটা শেষ নবী (সা)-রই বিশেষ বৈশিষ্ট্য যে, তাঁর নবুয়ত সমগ্র বিশ্বের জন্য ব্যাপক। কেবল মানবজাতিই নয়, জিনদেরও তিনি রসূল। তাঁর রিসালত শুধু সমকালীন লোকদের জন্যই নয়, কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী ভবিষ্যত বংশধরদের জন্যও ব্যাপক। তাঁর রিসালত কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী ও অব্যাহত থাকাই এ বিষয়ের দলীল যে, তিনি সর্বশেষ নবী, তাঁর পরে অন্য কোন নবী প্রেরিত হবেন না। কেননা পূর্ববর্তী নবীর শরীয়ত ও শিক্ষা বিকৃত হয়ে গেলেই মানবজাতির পথপ্রদর্শনের লক্ষ্যে পরবর্তী নবী প্রেরিত হন। আল্লাহ্ তা'আলা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র শরীয়ত ও স্বীয় কিতাব কোরআনকে কিয়ামত পর্যন্ত হিফাযত করার দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করেছেন। তাই এগুলো কিয়ামত পর্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় থাকবে এবং অন্য কোন নবী প্রেরণের আবশ্যকতা নেই।

বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হযরত জাবেরের রিওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, আমাকে এমন পাঁচটি বিষয় দান করা হয়েছে, যা আমার পূর্ববর্তী কোন পয়গম্বরকে দান করা হয়নি। এক---আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে ভক্তিপ্রযুক্ত ভয় দান করার মাধ্যমে সাহায্য করেছেন। ফলে এক মাসের দূরত্ব পর্যন্ত লোকজনকে আমার ভক্তিপ্রযুক্ত

ভয় আচ্ছন্ন করে রাখে। দুই—আমার জন্য সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠকে মসজিদ ও পবিত্র করে দেওয়া হয়েছে। (পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের শরীয়তে ইবাদত নির্ধারিত ইবাদতগাহ তথা উপাসনালয়েই হত; ইবাদতগাহের বাইরে ময়দানে অথবা গৃহে ইবাদত হত না। আল্লাহ্ তা'আলা উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠকে এ অর্থে মসজিদ করে দিয়েছেন যে, তারা সর্বত্রই নামায আদায় করতে পারবে। পানি না পাওয়া গেলে কিংবা পানির ব্যবহার ক্ষতিকর হলে ভূ-পৃষ্ঠের মাটিকে পবিত্র করে দেওয়া হয়েছে। ফলে মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করলে তা ওযূর স্থলাভিষিক্ত হয়ে যায়।) তিন—আমার জন্য যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হালাল করা হয়েছে। আমার পূর্বে কোন উম্মতের জন্য এরূপ সম্পদ হালাল ছিল না। (তাদের প্রতি নির্দেশ ছিল যে, যুদ্ধে কাফিরদের যে সম্পদ হস্তগত হবে, তা একত্রিত করে একটি আলাদা স্থানে রেখে দেবে। সেখানে আকাশ থেকে অগ্নি-বিদ্যুৎ ইত্যাদি এসে তা জ্বালিয়ে দেবে এবং জ্বালিয়ে দেওয়াই এ বিষয়ের আলামত হবে যে, এ জিহাদ আল্লাহ্ তা'আলা কবূল করেছেন। উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য যুদ্ধলব্ধ সম্পদ কোরআন বর্ণিত নীতি অনুযায়ী বন্টন করা ও নিজেদের প্রয়োজনে ব্যয় করা জায়েয করা হয়েছে।) চার—আমাকে মহাসুপারিশের মর্যাদা দান করা হয়েছে (অর্থাৎ হাশরের ময়দানে যখন কোন পয়গম্বর সুপারিশ করার সাহস করবেন না, তখন আমাকে সুপারিশ করার সুযোগ দেওয়া হবে)। পাঁচ—আমার পূর্বে প্রত্যেক পয়গম্বর তাঁর বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হতেন। আমাকে বিশ্বের সকল সম্প্রদায়ের প্রতি পয়গম্বর করে প্রেরণ করা হয়েছে।—(ইবনে কাসীর)

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٩﴾ قُل لَّكُم مِّيعَادُ
يَوْمٍ لَّا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ ﴿٣٠﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا
لَن نُّؤْمِنَ بِهَٰذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ۗ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ
مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ
الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ﴿٣١﴾
قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ
الْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُم ۖ بَلْ كُنتُم مُّجْرِمِينَ ﴿٣٢﴾ وَقَالَ الَّذِينَ
اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَن

تَّكْفُرَ بِاللّٰهِ وَنَجْعَلَ لَهٗۤ اَنْدَادًا ؕ وَ اَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ ؕ وَجَعَلْنَا الْاَغْلٰلَ فِیْۤ اَعْنَاقِ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا ؕ هَلْ یُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كَانُوْا یَعْمَلُوْنَ ۝۳۳

(২৯) তারা বলে, তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে বল, এ ওয়াদা কখন বাস্তবায়িত হবে? (৩০) বলুন, তোমাদের জন্য একটি দিনের ওয়াদা রয়েছে যাকে তোমরা এক মুহূর্তও বিলম্বিত করতে পারবে না এবং ত্বরান্বিতও করতে পারবে না। (৩১) কাফিররা বলে, আমরা কখনও এ কোরআনে বিশ্বাস করব না এবং এর পূর্ববর্তী কিতাবেও নয়। আপনি যদি পাপিষ্ঠদেরকে দেখতেন, যখন তাদেরকে তাদের পালনকর্তার সামনে দাঁড় করানো হবে, তখন তারা পরস্পর কথা কাটাকাটি করবে। যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত, তারা অহংকারীদেরকে বলবে, তোমরা না থাকলে আমরা অবশ্যই মু'মিন হতাম। (৩২) অহংকারীরা দুর্বলকে বলবে, তোমাদের কাছে হিদায়ত আসার পর আমরা কি তোমাদেরকে বাধা দিয়েছিলাম? বরং তোমরাই তো ছিলে অপরাধী। (৩৩) দুর্বলরা অহংকারীদেরকে বলবে, বরং তোমরাই তো দিবারাত্রি চক্রান্ত করে আমাদেরকে নির্দেশ দিতে যেন আমরা আল্লাহকে না মানি এবং তাঁর অংশীদার সাব্যস্ত করি। তারা যখন শাস্তি দেখবে, তখন মনের অনুতাপ মনেই রাখবে। বস্তুত আমি কাফিরদের গলায় বেড়ি পরাব। তারা সে প্রতিফলই পেয়ে থাকে যা তারা করত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তারা (কিয়ামত সম্পর্কে یَجْمَعُ بَیْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ یَفْتَحُ الخ---শুনে) বলে (বল,) এ ওয়াদা কবে (বাস্তবায়িত) হবে যদি তোমরা (অর্থাৎ নবী ও তাঁর অনুসারিগণ) সত্যবাদী হও। আপনি বলুন, তোমাদের জন্য একটি বিশেষ দিবসের ওয়াদা (নির্ধারিত) রয়েছে, যাকে তোমরা এক মুহূর্তও বিলম্বিত করতে পারবে না এবং ত্বরান্বিতও করতে পারবে না। অর্থাৎ তোমাদের জিজ্ঞাসার জওয়াবে সঠিক সময় বলা না হলেও তার আগমন নিশ্চিত। তোমাদের জিজ্ঞাসার উদ্দেশ্য তো অস্বীকার করা।) কাফিররা (দুনিয়াতে তো খুব কথার বাহাদুরী দেখায় এবং) বলে, আমরা কখনও এ কোরআনে বিশ্বাস স্থাপন করব না এবং এর পূর্ববর্তী কিতাবেও নয়। (কিয়ামতের দিন এসব বাগাড়ম্বর খতম হয়ে যাবে। সেমতে) আপনি যদি তাদের (তখনকার অবস্থা) দেখতেন, (তবে এক ভয়াবহ দৃশ্যই দেখতে পেতেন,) যখন পাপিষ্ঠদেরকে তাদের পালনকর্তার সামনে দাঁড় করানো হবে। তারা পরস্পর কথা কাটাকাটি করবে। (কোন কাজ নষ্ট হয়ে গেলে স্বভাবত যেমনটি করা হয়। সেমতে)

নিম্নশ্রেণীর লোকেরা (অর্থাৎ অনুসারীরা) বড়দেরকে (অর্থাৎ অনুসৃতদেরকে) বলবে, আমরা তো তোমাদের কারণেই বরবাদ হয়েছি। তোমরা না থাকলে আমরা অবশ্যই মু'মিন হতাম। (তখন) বড়রা নীচদেরকে বলবে, তোমাদের কাছে হিদায়তে আসার পর (তা পালন করতে) আমরা কি তোমাদেরকে (জবরদস্তি) নিবৃত্ত করে-ছিলাম? বরং তোমরাই তো ছিলে অপরাধী---(সত্য প্রকাশিত হওয়ার পরও) তোমরা তা কবূল করনি; এখন আমাদেরকে দোষারোপ করছ। (এর জওয়াবে) নীচরা বড়দেরকে বলবে, তোমরা জবরদস্তি করেছিলে, আমরা একথা বলিনি) বরং তোমাদের দিবা-রাত্রির চক্রান্ত আমাদেরকে বাধা দান করেছিল, যখন তোমরা আমাদেরকে আদেশ দিতে যেন আমরা আল্লাহ্কে না মানি এবং তাঁর শরীক সাব্যস্ত করি (চক্রান্তের অর্থ উৎসাহ ও ভীতি প্রদর্শন। অর্থাৎ দিবারাত্রির এসব শিক্ষা চক্রান্তের ফলেই আমরা বরবাদ হয়েছি। কাজেই তোমরা আমাদেরকে ধ্বংস করেছ।) এবং (এ কথাবার্তায় একে অপরকে দোষারোপ করলেও মনে মনে নিজের দোষও বুঝবে। গোমরাহকারীরাও তাদের তৎপরতা অন্তরে স্বীকার করবে এবং পথভ্রষ্টরাও চিন্তা করবে যে, বেশি দোষ তাদেরই। তারা নিজেদের ভাল-মন্দ বুঝল না কেন? কিন্তু) তারা তখন মনের অনুতাপ মনেই রাখবে (অপরের কাছে প্রকাশ করবে না) যখন নিজ নিজ কর্মের শাস্তি (হতে) দেখবে (যাতে নিজেদের ক্ষতির সাথে সাথে অপরেও না হাসে। কিন্তু পরিশেষে কঠোর আযাবের কারণে এ ধৈর্য অবশিষ্ট থাকবে না)। এবং (সবাইকে অভিন্ন শাস্তি দেওয়া হবে যে,) আমি কাফিরদের গলায় বেড়ি পরিয়ে দেব (এবং শিকল দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব)। তারা যা করত, তারই প্রতিফল পাবে।

وَمَآ أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَآ إِنَّا بِمَآ أُرْسِلْتُم بِهِ
كَٰفِرُونَ ۝ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَٰلًا وَأَوْلَٰدًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ۝ قُلْ
إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ
وَمَآ أَمْوَٰلُكُمْ وَلَآ أَوْلَٰدُكُم بِٱلَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰٓ إِلَّا مَنْ ءَامَنَ
وَعَمِلَ صَٰلِحًا فَأُولَٰٓئِكَ لَهُمْ جَزَآءُ ٱلضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَٰتِ
ءَامِنُونَ ۝ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِيٓ ءَايَٰتِنَا مُعَٰجِزِينَ أُولَٰٓئِكَ فِي ٱلْعَذَابِ
مُحْضَرُونَ ۝

(৩৪) কোন জনপদে সতর্ককারী প্রেরণ করা হলেই তার বিত্তশালী অধিবাসীরা বলতে শুরু করেছে, তোমরা যে বিষয়সহ প্রেরিত হয়েছ, আমরা তা মানি না। (৩৫) তারা আরও বলেছে, আমরা ধনে-জনে সমৃদ্ধ, সুতরাং আমরা শাস্তিপ্রাপ্ত হব না। (৩৬) বলুন, আমার পালনকর্তা যাকে ইচ্ছা রিযিক বাড়িয়ে দেন এবং পরিমিত দেন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা বোঝে না। (৩৭) তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাদেরকে আমার নিকটবর্তী করবে না। তবে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, তারা তাদের কর্মের বহুগুণ প্রতিদান পাবে এবং তারা সুউচ্চ প্রাসাদে নিরাপদে থাকবে। (৩৮) আর যারা আমার আয়াতসমূহকে ব্যর্থ করার অপপ্রয়াসে লিপ্ত হয়, তাদেরকে আযাবে উপস্থিত করা হবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর (হে পয়গম্বর, আপনি তাদের মূর্খজনোচিত কথাবার্তা শুনে দুঃখিত হবেন না। কেননা, এ আচরণ আপনার সাথেই নতুন নয়, বরং) কোন জনপদেই আমি এমন কোন ভীতি প্রদর্শনকারী (পয়গম্বর) প্রেরণ করিনি, যেখানকার বিত্তশালী অধিবাসীরা (সমকালীন কাফিরদের ন্যায়) একথা বলতে শুরু করেছে যে, যেসব বিধানসহ তোমরা প্রেরিত হয়েছ, আমরা সেগুলো মানি না। তারা আরও বলেছে, আমরা ধনে-জনে তোমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। (সূরা কাহ্‌ফে বলা হয়েছে : أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا—কাজেই আমরা যে আল্লাহ্‌র প্রিয় ও সম্মানিত, এটাই তার দলীল।) আমরা কখনও শাস্তিপ্রাপ্ত হব না। (মক্কার কাফিররাও তাই বলে। আল্লাহ্ বলেন :

—قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا

সুতরাং দুঃখিত হবেন না। তবে তাদের উক্তি খণ্ডন করুন এবং এভাবে) বলুন, (রিযিকের আধিক্য আল্লাহ্‌র প্রিয় হওয়ার উপর নির্ভরশীল নয়; বরং এটা নিছক আল্লাহ্‌র ইচ্ছা। সেমতে) আমার পালনকর্তা যাকে ইচ্ছা রিযিক বাড়িয়ে দেন এবং যাকে ইচ্ছা কম দেন (এতে অনেক রহস্য থাকে)। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ (তা) জানে না (যে, এটা অন্যান্য কারণের উপর নির্ভরশীল—আল্লাহ্‌র প্রিয় হওয়ার উপর নয়। হে কাফির সম্প্রদায়, আরও শুন, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেমন আল্লাহ্‌র প্রিয় হওয়ার দলীল নয় তেমনি) তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাদেরকে মর্যাদার ক্ষেত্রে আমার নিকটবর্তী করবে না, অর্থাৎ (এগুলো নৈকট্যের কার্যকর কারণ নয়। সুতরাং ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেমন নৈকট্যের উপায় নয়, তেমনি ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির ভিত্তিতেও নৈকট্য লাভ হয় না।) তবে যে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে (এ দু'টি বিষয় অবশ্যই নৈকট্যের

কারণ)। সুতরাং এমন লোকদের জন্য তোমাদের সৎকর্মের দ্বিগুণ প্রতিদান রয়েছে। (অর্থাৎ কর্মের তুলনায় তা বেশি—দ্বিগুণেরও বেশি হতে পারে। আল্লাহ্ বলেন ঃ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا—) এবং তারা (জান্নাতের) সুউচ্চ প্রাসাদে নিরাপদে (আসীন) থাকবে। আর যারা (তাদের বিপরীতে কেবল ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি নিয়ে গর্ব করে এবং ঈমান ও সৎকর্ম অবলম্বন করে না বরং তারা) আমার আয়াতসমূহকে ব্যর্থ করার অপপ্রয়াসে লিপ্ত হয় (নবীকে) পরাভূত করার জন্য, তাদেরকে আযাবে নিক্ষিপ্ত করা হবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পার্থিব ধন-সম্পদ ও সম্মানকে আল্লাহ্র প্রিয়পাত্র হওয়ার দলীল মনে করা ধোঁকা ঃ পৃথিবীর জন্মলগ্ন থেকে পার্থিব ধন-সম্পদ ও ভোগ-বিলাসের নেশায় লোকেরা সর্বদাই সত্যের বিরোধিতা এবং পয়গম্বর ও সৎ লোকদের সাথে শত্রুতার পথ অবলম্বন করেছে। শুধু তাই নয়, তারা সত্যপন্থীদের মুকাবিলায় নিজেদের অবস্থার উপর নিশ্চিন্ত ও সন্তুষ্ট থাকার এই দলীলও উপস্থাপিত করেছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা যদি আমাদের কার্যকলাপ ও অভ্যাস আচরণ পছন্দ না করবেন, তবে আমাদেরকে পার্থিব ধন-সম্পদ, মান-সম্মান ও শাসনক্ষমতায় কেন সমৃদ্ধ করবেন। কোরআন পাক এর জওয়াব বিভিন্ন আয়াতে বিভিন্ন ভঙ্গিতে দিয়েছে। এমনি ধরনের এক ঘটনা সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে এবং এতে এই অসার দলীলের জওয়াব দান করা হয়েছে।

হাদীসে বর্ণিত আছে, জাহেলিয়াত আমলে দু'ব্যক্তি এক শরীকী ব্যবসা করত। কিছুদিন পর এক ব্যক্তি সেস্থান পরিত্যাগ করে কোন সমুদ্রোপকূলবর্তী এলাকায় চলে যায়। যখন রসূলুল্লাহ্ (সা) প্রেরিত হলেন এবং তাঁর নবুয়ত সম্পর্কে জানা-জানি হল, তখন উপকূলবর্তী সঙ্গী মক্কার সঙ্গীর কাছে চিঠি লিখে নবুয়ত দাবির ব্যাপারে তার প্রতিক্রিয়া জানতে চাইল। জওয়াবে মক্কার সঙ্গী লিখল, কুরাইশ গোত্রের কেউ তাঁর অনুসরণ করেনা। কেবল নিঃস্ব, দরিদ্র ও নিম্নস্তরের লোকজনই তার সাথে রয়েছে। উপকূলবর্তী সঙ্গী তার ব্যবসা-বাণিজ্য ত্যাগ করে মক্কায় আগমন করল এবং সঙ্গীকে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র ঠিকানা জিজ্ঞেস করল। সে তওরাত, ইনজীল ইত্যাদি প্রাচীন গ্রন্থ কিছু কিছু অধ্যয়ন করত। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে উপস্থিত হয়ে সে জিজ্ঞেস করল, আপনি কিসের দাওয়াত দেন? রসূলুল্লাহ্ (সা) দাওয়াতের প্রধান প্রধান বিষয়গুলো বিবৃত করলেন। তাঁর মুখে ইসলামের দাওয়াত শুনা মাত্রই আগন্তুক বলে উঠলঃ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ—(আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি নিশ্চিতই আল্লাহ্র রসূল)। রসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি আমার দাওয়াতের সত্যতা কিরূপে জানতে পারলে? সে আরয করল, (জ্ঞান বুদ্ধির মাধ্যমে আপনার দাওয়াতের সত্যতা জানতে পেরেছি এবং এর লক্ষণ এই দেখেছি

যে) পূর্বে যত পয়গম্বর আগমন করেছেন, শুরুতে তাঁদের সকলের অনুসারী দরিদ্র, নিঃস্ব ও নিম্নস্তরের লোকই ছিল। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে আলোচ্য مَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا আয়াত অবতীর্ণ হয়।—(ইবনে কাসীর, মাযহারী) مُتْرَف শব্দটি تَرَف থেকে উদ্ভূত। অর্থ ভোগ-বিলাসের প্রাচুর্য। مُتْرَفِين বলে বিত্তশালী ও সরদারকে বোঝানো হয়েছে। প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে, যখনই আমি কোন রসূল প্রেরণ করেছি, তখনই ধনৈশ্বর্য্য ও ভোগ-বিলাসে লালিত-পালিত লোকেরা কুফর ও অস্বীকারের মাধ্যমে তাঁর মুকাবিলা করেছে।

দ্বিতীয় আয়াতে তাদের উক্তি বর্ণিত হয়েছে ঃ

نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَّأَوْلَادًا وَّمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ—অর্থাৎ আমরা ধনেজনে সব দিক দিয়েই তোমাদের অপেক্ষা বেশি সমৃদ্ধ। সুতরাং আমরা আযাবে পতিত হব না। (বাহ্যত তাদের উক্তির উদ্দেশ্য ছিল এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার কাছে আমরা শাস্তিযোগ্য হলে আমাদেরকে এই বিপুল ধনৈশ্বর্য্য কেন দিতেন?) তৃতীয় ও চতুর্থ আয়াতে তাদের জওয়াব দেওয়া হয়েছে ঃ

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ এবং مَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُم الاية জওয়াবের সারমর্ম এই যে, দুনিয়াতে ধন-সম্পদ, মান-সম্মান ও প্রভাব-প্রতিপত্তির হ্রাস-বৃদ্ধি আল্লাহ্‌র কাছে প্রিয়-অপ্রিয় হওয়ার দলীল নয়, বরং সৃষ্টিগত সুবিবেচনার ভিত্তিতে দুনিয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা যাকে ইচ্ছা অগাধ ধন-সম্পদ দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা কম দেন। এর রহস্য তিনিই জানেন। ধন-সম্পদের প্রাচুর্যকে আল্লাহ্‌র প্রিয় হওয়ার দলীল মনে করা মূর্খতা। আল্লাহ্‌র প্রিয় হওয়া একমাত্র ঈমান ও সৎকর্মের উপর নির্ভরশীল। যে ব্যক্তি এগুলো অর্জন করে না, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির প্রাচুর্য তাকে আল্লাহ্‌র প্রিয়পাত্র করতে পারে না।

এ বিষয়বস্তুটি কোরআন পাক বিভিন্ন আয়াতে ব্যক্ত করেছে। এক আয়াতে আছে ঃ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ —অর্থাৎ তারা কি মনে করে যে, আমি ধন-সম্পদ ও

সন্তানসন্ততি দ্বারা তাদেরকে যে সাহায্য করি, তা তাদের জন্য পরিণাম ও পরকালের দিক দিয়েও মঙ্গলজনক! (কখনই নয়।) বরং তারা আসল সত্য সম্পর্কে বেখবর। (অর্থাৎ যে ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি মানুষকে আল্লাহ্ থেকে গাফিল করে দেয়, তা তার জন্য শাস্তিস্বরূপ)

অন্য এক আয়াতে আছেঃ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ

অর্থাৎ কাফিরদের ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি যেন আপনাকে বিস্ময়াবিষ্ট না করে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা এই যে, তাদেরকে এই ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততির মাধ্যমে দুনিয়াতে আযাব দেবেন এবং অবশেষে তাদের প্রাণ কাফির অবস্থায়ই বের হয়ে যাবে, যার ফল হবে পরকালের চিরস্থায়ী আযাব। ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততির মাধ্যমে দুনিয়াতে আযাব দেওয়ার অর্থ এই যে, তারা দুনিয়ার ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততির মহব্বতে এমনভাবে মত্ত হয়ে পড়ে যে নিজেদের পরিণাম এবং আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করে না, যার পরিণতি হবে চিরস্থায়ী আযাব। অনেক ধন ও জনের অধিকারী ব্যক্তিকে এ দুনিয়াতে ধন ও জনের কারণেই বরং তাদেরই মাধ্যমে হাজারো বিপদাপদ ও কষ্ট ভোগ করতে হয়, তাদের শাস্তি ও আযাব তো এ জগৎ থেকেই শুরু হয়ে যায়।

হযরত আবূ হোরায়রা (রা)-র রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের রূপ ও ধনসম্পদ দেখেন না, তিনি তোমাদের অন্তর ও কাজকর্ম দেখেন। (আহমাদ, ইবনে কাসীর)

أُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ

এতে ঈমানদার ও সৎকর্মশীলদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। তারাই আল্লাহ্র প্রিয়জন। দুনিয়াতে কেউ তাদের মূল্য বুঝুক বা না বুঝুক, পরকালে তারা দ্বিগুণ প্রতিদান পাবে। ضعف অর্থ এক বস্তুর দ্বিগুণ অথবা বহুগুণ হওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, দুনিয়াতে বিত্তশালীরা যেমন তাদের বিত্ত বাড়ানোর কাজে ব্যাপৃত থাকে, তেমনি আল্লাহ্ তা'আলা পরকালে মু'মিন ও সৎকর্মীদের কর্মের প্রতিদান বাড়িয়ে দেবেন। এক কর্মের প্রতিদান তার দশগুণ হবে এবং এতেই সীমিত থাকবে না, আন্তরিকতা ও অন্যান্য কারণে এক কর্মের প্রতিদান সাত শ গুণ পর্যন্ত পাওয়া যাবে বলে সহীহ্ হাদীসসমূহে প্রমাণিত রয়েছে বরং তার বেশিও হতে পারে। তারা জান্নাতের সুউচ্চ প্রাসাদসমূহে চিরকালের

জন্য দুঃখ ও কষ্ট থেকে নিরাপদে থাকবে। ঘরের যে অংশ অন্য অংশ থেকে উঁচু ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হয় তাঁকে غرفة বলে। এরই বহুবচন غرفات—(মাযহারী)

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ۚ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ۝

---

(৩৯) বলুন, আমার পালনকর্তা তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা রিযিক বাড়িয়ে দেন এবং সীমিত পরিমাণে দেন। তোমরা যা কিছু ব্যয় কর, তিনি তার বিনিময় দেন। তিনি উত্তম রিযিক দাতা।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি (মু'মিনগণকে) বলে দিন, আমার পালনকর্তা তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা অগাধ রিযিক দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা সীমিত রিযিক দেন। (ব্যয়ে কৃপণতা করলে রিযিক বাড়তে পারে না এবং শরীয়ত অনুযায়ী ব্যয় করলে হ্রাস পেতে পারে না। তাই তোমরা ধনসম্পদকে মহব্বত করো না; বরং আল্লাহ্র হক, পরিবার পরিজনের হক, ফকির-মিসকীন ইত্যাদি যে যে খাতে ব্যয় করার নির্দেশ রয়েছে তাতে অকাতরে ব্যয় করতে থাক। এতে বন্টনকৃত ও অবধারিত রিযিকে কোন ক্ষতি দেখা দেবে না এবং পরকালে উপকার পাওয়া যাবে। কেননা) তোমরা (আল্লাহ্র নির্ধারিত খাতে) যা কিছু ব্যয় করবে আল্লাহ্ (পরকালে অবশ্যই এবং দুনিয়াতেও) এর প্রতিদান দেবেন। তিনি সর্বোত্তম রিযিকদাতা।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এ আয়াতটি প্রায় অনুরূপ শব্দেই পূর্বেও উল্লিখিত হয়েছে। এখানে বাহ্যত এ বিষয়বস্তুরই পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। তবে এতে সামান্য পার্থক্য রয়েছে। তা এই যে, এখানে مَنْ يَشَاءُ শব্দের পরে مِنْ عِبَادِهِ এবং يَقْدِرُ শব্দের পরে لَهُ অতিরিক্ত সংযুক্ত হয়েছে। مِنْ عِبَادِهِ শব্দ থেকে বোঝা যায় যে, এ বিধানটি বিশেষ বান্দা অর্থাৎ মু'মিনদের জন্য ব্যক্ত করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, মু'মিনগণ যেন ধনসম্পদের মহব্বতে এমন ডুবে না যায় যে, আল্লাহ্ প্রদর্শিত হক ও খাতে ব্যয় করতে কার্পণ্য করতে থাকে। পূর্ববর্তী আয়াতে সেসব কাফির ও মুশরিকদেরকে সম্বোধন করা হয়েছিল, যারা পার্থিব ধন-সম্পদ ও সন্তানসন্ততি নিয়ে গর্ব করত এবং

এগুলোকে পরকালীন সাফল্যের দলীল বলে বর্ণনা করত। ফলে সম্বোধিত ব্যক্তি ও উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে এটা নিছক পুনরাবৃত্তি হয়নি। তফসীরের সার-সংক্ষেপে 'মু'মিনগণকে' শব্দ যোগ করে এ বিষয়ের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

কেউ কেউ আয়াতদ্বয়ের এই পার্থক্য বর্ণনা করেছেন যে, প্রথম আয়াতে বিভিন্ন মানুষের মধ্যে রিযিক বন্টনের উল্লেখ ছিল। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় রহস্য ও পার্থিব কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রেখে কাউকে অধিক এবং কাউকে অল্প রিযিক দেন। আর এ আয়াতে একই ব্যক্তির বিভিন্ন অবস্থার উল্লেখ রয়েছে। অর্থাৎ একই ব্যক্তি কখনও আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করে, কখনও দারিদ্র্য ও রিক্ততার সম্মুখীন হয়। এ আয়াতে يقدر শব্দের পরে বর্ণিত له সর্বনামে এদিকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এই ভাষ্য অনুযায়ীও নিছক পুনরাবৃত্তি রইল না ; বরং প্রথম আয়াত বিভিন্ন ব্যক্তি সম্পর্কে এবং এ আয়াত একই ব্যক্তির বিভিন্ন অবস্থা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে।

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ---এর শাব্দিক অর্থ এই যে, তোমরা যা কিছু ব্যয় কর, আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় অদৃশ্য ভাণ্ডার থেকে তোমাদেরকে তারা বিনিময় দিয়ে দেন। এই বিনিময় কখনও দুনিয়াতে, কখনও পরকালে এবং কখনও উভয় জাহানে দান করা হয়। জগতে প্রতিটি বস্তুর মধ্যে আমরা প্রত্যক্ষ করি যে, আকাশ থেকে পানি বর্ষিত হয়। মানুষ ও জীবজন্তু অকাতরে তা ব্যয় করে, শস্যক্ষেত্র ও বৃক্ষাদি সিক্ত করে। এক পানি নিঃশেষ না হতেই তৎস্থলে অন্য পানি বর্ষিত হয়। অনুরূপভাবে ভূগর্ভে কূপ খনন করে যে পানি বের করে নেওয়া হয়, তা যতই ব্যয় করা হয়, তার স্থলে অন্য পানি প্রকৃতির পক্ষ থেকে এসে সঞ্চিত হয়ে যায়। মানুষ বাহ্যত খাদ্য-খাবার খেয়ে নিঃশেষ করে দেয়, কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তৎস্থলে অন্য খাদ্য সরবরাহ করে দেন। চলাফেরা, কাজকর্ম ও পরিশ্রমের কারণে দেহের যে উপাদান ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তার স্থলে অন্য উপাদান এসে তার ক্ষতিপূরণ করে দেয়। মোট কথা, মানুষ দুনিয়াতে যা কিছু ব্যয় করে, আল্লাহ্ তা'আলা প্রকৃতিগতভাবে অন্য বস্তুকে তার স্থলাভিষিক্ত করে দেন। অবশ্য কখনও কাউকে শাস্তি দেওয়ার জন্য অথবা অন্য কোন কল্যাণ বিবেচনায় তার কারণে এর অন্যথা হওয়া এই আল্লাহ্র নীতির পরিপন্থী নয়।

সহীহ্ মুসলিমে হযরত আবূ হোরায়রা বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, প্রত্যহ সকাল বেলায় দু'জন ফেরেশতা আকাশ থেকে নেমে এই দোয়া করে اللهم اعط منفقا خلفا و اعط ممسكا تلفا ---অর্থাৎ হে আল্লাহ্, যে ব্যয় করে, তাকে তার বিনিময় দান কর এবং যে কৃপণতা করে, তার সম্পদ বিনষ্ট কর। অন্য এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে বলেছেন ঃ আপনি মানুষের জন্য ব্যয় করুন, আমি আপনার জন্য ব্যয় করব।

যে ব্যয় শরীয়তসম্মত নয়, তার বিনিময়ের ওয়াদা নেইঃ হযরত জাবেরের হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, সৎকাজ সদকা। মানুষ নিজের ও পরিবার-পরিজনের জন্য যা ব্যয় করে, তাও সদকার পর্যায়ে পড়ে। সম্মান ও আবরু রক্ষার্থে যা ব্যয় করা হয়, তাও সদকা। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ অনুযায়ী ব্যয় করে তাকে বিনিময় দান আল্লাহ্ নিজ দায়িত্বে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু যে ব্যয় অযথা, প্রয়োজনাতিরিক্ত নির্মাণ কাজে অথবা পাপ কাজে করা হয়, তার বিনিময়ের ওয়াদা নেই।

হযরত জাবেরের শিষ্য ইবনুল মুনকাদির এই হাদীস শুনে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আবরু রক্ষার্থে ব্যয় করার অর্থ কি? তিনি বললেন, এর অর্থ, যে ব্যক্তিকে দান না করলে দোষ বের করবে, নিন্দাবাদ করে ফিরবে অথবা গালমন্দ করবে বলে মনে হয়, সম্মান রক্ষার্থে তাকে দান করা।—(কুরতুবী)

যে বস্তুর ব্যয় হ্রাস পায় তার উৎপাদনও হ্রাস পায়ঃ এ আয়াতের ইঙ্গিত থেকে আরও জানা গেল যে, আল্লাহ্ তা'আলা মানুষ ও জীবজন্তুর জন্য যে সমস্ত ব্যবহার্য বস্তু সৃষ্টি করেছেন, সেগুলো যে পর্যন্ত ব্যয়িত হতে থাকে, সে পর্যন্ত আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সেগুলোর পরিপূরকও হতে থাকে। যে বস্তু বেশি ব্যয়িত হয়, আল্লাহ্ তা'আলা তার উৎপাদনও বাড়িয়ে দেন। জীব-জানোয়ারের মধ্যে ছাগল ও গরু সর্বাধিক ব্যয়িত হয়। এগুলো যবেহ্ করে গোশত খাওয়া হয়। কোরবানী, কাফফারা, মান্নত ইত্যা-দিতে যবেহ্ করা হয়। এগুলো যত বেশি কাজে লাগে, আল্লাহ্ তা'আলা সে অনুপাতে এগুলোর উৎপাদনও বৃদ্ধি করেন। আমরা সর্বত্রই এটা প্রত্যক্ষ করি। সর্বদা ছুরির নিচে থাকা সত্ত্বেও দুনিয়াতে ছাগলের সংখ্যা বেশি। কুকুর ও বিড়ালের সংখ্যা এত নয়, অথচ এগুলোর সংখ্যা বেশিই হওয়া উচিত। কারণ, এরা একই গর্ভ থেকে চার পাঁচটি পর্যন্ত বাচ্চা প্রসব করে। গরু-ছাগল বেশির চেয়ে বেশি দুটি বাচ্চা প্রসব করে। তদুপরি এগুলোকে সর্বদাই যবেহ্ করা হয়। পক্ষান্তরে কুকুর-বিড়ালকে কেউ হাতও লাগায় না। এতদসত্ত্বেও এটা অনস্বীকার্য যে, দুনিয়াতে গরু-ছাগলের সংখ্যা কুকুর-বিড়ালের তুলনায় অনেক বেশি। প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতে যেদিন থেকে গো-হত্যা নিষিদ্ধ হয়েছে, সেদিন থেকে সেখানে গরুর উৎপাদনও অপেক্ষাকৃত হ্রাস পেয়েছে। নতুবা যবেহ্ না হওয়ার কারণে প্রতিটি বস্তী ও বাড়ি গরুতে ভরপুর থাকা উচিত ছিল।

আরবরা যখন থেকে সওয়ারী ও মালপত্র পরিবহনের কাজে উটের ব্যবহার কমিয়ে দিয়েছে, তখন থেকে সেখানে উটের উৎপাদনও হ্রাস পেয়েছে। কোরবানীর মুকাবিলায় অর্থনৈতিক মন্দা সৃষ্টির আশংকা ব্যক্ত করে আজকাল যে, বিধর্মীসুলভ আলোচনার অবতারণা করা হয়, উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে তার অসারতা প্রমাণিত হয়েছে।

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ أَهَٰٓؤُلَآءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا۟ يَعْبُدُونَ ﴿٤٠﴾

قَالُوا۟ سُبْحَٰنَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِم ۖ بَلْ كَانُوا۟ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ ۖ

أَكْثَرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ ۝٤١ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَّفْعًا وَلَا ضَرًّا
وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ۝٤٢

(৪০) যেদিন তিনি তাদের সবাইকে একত্র করবেন এবং ফেরেশতাদেরকে বলবেন, এরা কি তোমাদেরই পূজা করত? (৪১) ফেরেশতারা বলবে, আপনি পবিত্র, আমরা আপনার পক্ষে, তাদের পক্ষে নই; বরং তারা জিনদের পূজা করত। তাদের অধিকাংশই শয়তানে বিশ্বাসী। (৪২) অতএব আজকের দিনে তোমরা একে অপরের কোন উপকার ও অপকার করার অধিকারী হবে না। আর আমি জালিমদেরকে বলব, তোমরা আগুনের যে শাস্তিকে মিথ্যা বলতে তা আস্বাদন কর।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর (সেদিনটি স্মরণীয়) যেদিন আল্লাহ্ তাদের সবাইকে (কিয়ামতের ময়দানে) সমবেত করবেন এবং ফেরেশতাগণকে বলবেন, এরা কি তোমাদেরই পূজা করত? [মুশরিকদেরকে জব্দ করার জন্য ফেরেশতাগণকে এই প্রশ্ন করা হবে। তারা এ ধারণার বশবর্তী হয়ে ফেরেশতা ও অন্যদের পূজা করত যে, তারা সন্তুষ্ট হয়ে তাদের জন্য আল্লাহ্র কাছে সুপারিশ করবে। অন্য এক আয়াতে এ ধরনের প্রশ্ন হযরত ঈসা (আ)-কে أَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ বলে করা হয়েছে। প্রশ্নের উদ্দেশ্য এই যে, তারা কি তোমাদের সন্তুষ্টিক্রমে তোমাদের পূজা করত? তাছাড়া এর জওয়াব থেকেও এটা জানা যায়।] ফেরেশতারা (প্রথমে আল্লাহ্ যে শরীকের ঊর্ধ্বে ও পবিত্র, একথা প্রকাশ করার জন্য) আরয করবে, আপনি (শরীক থেকেও) পবিত্র (শরীক হওয়ার যে সম্পর্ক তাদের সাথে করা হয়েছে, তাতে ভীত হয়ে জওয়াবের পূর্বে তারা এ বাক্য উচ্চারণ করবে, অতপর প্রশ্নের জওয়াব দেবে যে,) আমাদের সম্পর্ক (কেবল) আপনার সাথে, তাদের সাথে নয়। (এতে সন্তুষ্টি ও আদেশ উভয়টিই অবর্তমান বলে বোঝা গেল। অর্থাৎ আমরা তাদেরকে পূজা করারও আদেশ দেইনি এবং তাদের একাজে সন্তুষ্টও নই। বরং আমরা আপনারই অনুগত। আপনি যা অপছন্দ করেন, যেমন শিরক ইত্যাদি, আমরাও তা অপছন্দ করি। এতে যেমন আমাদের আদেশ ও সন্তুষ্টি কিছুই নেই, যেমন বাস্তবে) তারা (আমাদের পূজা করত না;) বরং শয়তানদের পূজা করত। (কেননা শয়তান তাদেরকে এ কাজে উৎসাহ দিত এবং এতে সন্তুষ্ট থাকত। সুতরাং তারাই তাদের উপাস্য। কেননা, আনুগত্য ছাড়া ইবাদত হয় না এবং ইবাদত ছাড়া আনুগত্য হয় না। সুতরাং আমাদের পক্ষ থেকে যখন আদেশ ও সন্তুষ্টি কিছুই হয়নি, তখন আমাদের আনুগত্য হয়নি। শয়তানদের যখন আনুগত্য

হয়েছে তখন ইবাদতও তাদেরই হয়েছে। তারা একে ফেরেশতাদের ইবাদত বলুক অথবা প্রতিমাদের ইবাদত বলুক, আসলে তা শয়তানেরই ইবাদত। এতে যেমন তাদের শয়তানের ইবাদতকারী হওয়া জরুরী হয়েছে, তেমনি) তাদের অধিকাংশই (জরুরী হওয়া হিসেবেও) শয়তানের ভক্ত ছিল। (অর্থাৎ ইচ্ছাপূর্বকও অনেকে শয়তানের পূজা করত। সূরা জিনের আয়াতে আছে—وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ) অতএব (কাফিরদেরকে বলা হবে, যাদের তরফ থেকে তোমরা আশাবাদী ছিলে) অদ্য (স্বয়ং তাদের সম্পর্কহীনতা দ্বারাও এবং তাদের অক্ষমতা দ্বারাও তোমাদের ধারণার বিপরীতে এই অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে,) তোমরা একে অপরের কোন উপকার ও অপকার করার অধিকারী হবে না। (উদ্দেশ্য এই যে, উপাস্যরা তোমাদের কোন উপকার করতে পারবে না, কিন্তু এতে উভয়ের অবস্থা যে সমান, একথা প্রমাণ করার জন্য بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ বলা হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা যেমন অক্ষম, তেমনি তারাও অক্ষম। অক্ষমতার ব্যাপকতা বোঝানোর জন্য অপকারের উল্লেখ করা হয়েছে। এতে বাক্যটি আরও জোরদার হয়ে গেছে।) আর (তখন) আমি জালিমদেরকে (অর্থাৎ কাফিরদেরকে) বলব, জাহান্নামের যে শাস্তিকে তোমরা মিথ্যা বলতে, (এখন) তা আস্বাদন কর।

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ ۚ وَقَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا إِفْكٌ مُّفْتَرًى ۚ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٤٣﴾ وَمَا آتَيْنَاهُم مِّن كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا ۖ وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَّذِيرٍ ﴿٤٤﴾ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي ۖ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿٤٥﴾ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ ۖ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا ۚ مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُم بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴿٤٦﴾ قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ ۖ إِنْ

أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ۝ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ۝ قُلْ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِي ۖ وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي ۚ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ۝

(৪৩) যখন তাদের কাছে আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হয়, তখন তারা বলে, তোমাদের বাপদাদারা যার ইবাদত করত এ লোকটি যে তা থেকে তোমাদেরকে বাধা দিতে চায়। তারা আরও বলে, এটা মনগড়া মিথ্যা বৈ নয়। আর কাফিরদের কাছে যখন সত্য আগমন করে, তখন তারা বলে, এতো এক সুস্পষ্ট যাদু। (৪৪) আমি তাদেরকে কোন কিতাব দেইনি, যা তারা অধ্যয়ন করবে এবং আপনার পূর্বে তাদের কাছে কোন সতর্ককারী প্রেরণ করিনি। (৪৫) তাদের পূর্ববর্তীরাও মিথ্যা আরোপ করেছে। আমি তাদেরকে যা দিয়েছিলাম, এরা তার এক দশমাংশও পায়নি। এরপরও তারা আমার রসূলগণকে মিথ্যা বলেছে। অতএব কেমন হয়েছে আমার শাস্তি! (৪৬) বলুন, আমি তোমাদেরকে একটি বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছি ঃ তোমরা আল্লাহ্র নামে এক একজন করে ও দু'দুজন করে দাঁড়াও, অতপর চিন্তাভাবনা কর— তোমাদের সঙ্গীর মধ্যে কোন উন্মাদনা নেই। তিনি তো আসন্ন কঠোর শাস্তি সম্পর্কে তোমাদেরকে সতর্ক করেন মাত্র। (৪৭) বলুন, আমি তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না বরং তা তোমরাই রাখ। আমার পুরস্কার তো আল্লাহ্র কাছে রয়েছে। প্রত্যেক বস্তুই তাঁর সামনে। (৪৮) বলুন, আমার পালনকর্তা সত্য দীন অবতরণ করেছেন। তিনি আলিমুল গায়েব। (৪৯) বলুন, সত্যধর্ম আগমন করেছে এবং মিথ্যা ধর্ম নিঃশেষিত হয়ে গেছে। (৫০) বলুন, আমি পথভ্রষ্ট হলে নিজের ক্ষতির জন্যই পথভ্রষ্ট হব; আর যদি আমি সৎপথপ্রাপ্ত হই, তবে তা এ জন্য যে, আমার পালনকর্তা আমার প্রতি ওহী প্রেরণ করেন। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, নিকটবর্তী।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যখন তাদের কাছে আমার সুস্পষ্ট (সত্য ও হিদায়েতকারী) আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হয়, তখন তারা [তিলাওয়াতকারী রসূল (সা) সম্পর্কে] বলে, (নাউযুবিল্লাহ,) এ ব্যক্তি তো তোমাদের বাপদাদারা (প্রাচীনকাল থেকে) যার ইবাদত করত, তা (অর্থাৎ তার ইবাদত) থেকে তোমাদেরকে বাধা দিতে চায়। (এবং বাধা দিয়ে নিজের অনুসারী করতে চায়। একথা বলে হতভাগাদের উদ্দেশে একথা

বোঝানো যে, তিনি নবী নন এবং তাঁর দাওয়াতও আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নয়; বরং এতে নেতৃত্ব লাভের ব্যক্তিগত স্বার্থ নিহিত।) তারা (কোরআন সম্পর্কে) আরও বলে, (নাউযুবিল্লাহ্,) এটা মনগড়া মিথ্যা বৈ নয়। (অর্থাৎ আল্লাহ্র সাথে এর সম্পর্ক মনগড়া।) আর কাফিরদের কাছে সত্য (অর্থাৎ কোরআন) আগমন করার পর তারা (এই প্রশ্নের উত্তর দানের জন্য যে, কোরআন মনগড়া মিথ্যা হলে অনেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি এর অনুসরণ করে কেন এবং এর এত প্রভাবই বা কেন?) বলে, এ তো এক সুস্পষ্ট যাদু। (এটি শুনে মানুষ মুগ্ধ হয়ে যায়। কোরআন ও নবীর প্রতি তাদের সম্মান প্রদর্শন করা উচিত ছিল। কারণ, তাদের জন্য উভয়টিই অপ্রত্যাশিত নিয়ামত ছিল এ কারণে যে,) আমি (কোরআনের পূর্বে) তাদেরকে (কখনও) কোন (ঐশী) কিতাব দেইনি, যা তারা অধ্যয়ন করবে। (যেমন, বনী ইসরাঈলের কাছে ঐশী গ্রন্থ ছিল। সুতরাং তাদের জন্য তো কোরআন ছিল এক অভিনব বস্তু। তাই এর সম্মান করা কর্তব্য ছিল।) এবং (এমনিভাবে) আপনার পূর্বে আমি তাদের কাছে কোন সতর্ককারী (পয়গম্বর) প্রেরণ করিনি। (সুতরাং তাদের জন্য পয়গম্বরও ছিল এক নতুন রত্ন। তাই তাঁরও সম্মান করা কর্তব্য ছিল। অথচ ইতিপূর্বে তাদের বাসনাও এই ছিল যে, কোন নবী আগমন করলে তারা তাঁর অনুসরণ করবে। এক আয়াতে আছে ঃ

وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيْرٌ لَّيَكُوْنُنَّ اَهْدٰى

مِنْ اِحْدَى الْاُمَمِ কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা সম্মান করেনি। আল্লাহ্ বলেন,

فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيْرٌ مَّا زَادَهُمْ اِلَّا نُفُوْرًا বরং তারা মিথ্যারোপ করেছে। তারা

যেন মিথ্যারোপ করে নিশ্চিন্ত না হয়ে যায়। কেননা মিথ্যারোপের শাস্তি অত্যন্ত ভয়াবহ। সেমতে) তাদের পূর্ববর্তী কাফিররাও (পয়গম্বর ও ওহীর প্রতি) মিথ্যারোপ করেছিল। আমি তাদেরকে যে সাজসরঞ্জাম দিয়েছিলাম, তারা (অর্থাৎ আরবের মুশরিকরা) তো তার এক দশমাংশও পায়নি। (অর্থাৎ তাদের মত শক্তি, বয়স ও ঐশ্বর্য আরবের মুশরিকরা পায়নি, যা অহংকারের কারণ হয়ে থাকে। আল্লাহ্ বলেন, كَانُوْا اَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَّاَكْثَرَ اَمْوَالًا وَّاَوْلَادًا) এরপরও তারা

আমার রসূলগণকে মিথ্যা বলেছে। অতএব (দেখ) কেমন ভয়ংকর হয়েছে আমার শাস্তি। (এরা কোন্ ছার, এদের তো তেমন সাজসরঞ্জামও নেই। বিপুল পরিমাণ ধনসম্পদই যখন কাজে আসেনি, তখন তারা কোন্ ধোঁকায় পড়ে রয়েছে? তাদের কাছে সাজসরঞ্জাম কম বিধায় তাদের অপরাধও গুরুতর। এমতাবস্থায় তারা কেমন করে বাঁচতে পারবে? এ পর্যন্ত নবুয়তের প্রতি অস্বীকৃতির দরুন কাফিরদেরকে

শাসানোর পর পরবর্তী আয়াতে তাদেরকে নবুয়ত মেনে নেওয়ার একটি পন্থা বলে দেওয়া হয়েছে। হে নবী,) আপনি (তাদেরকে) বলুন, আমি তোমাদেরকে একটি (ছোট খাট) বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছি, (তা পালন কর,) তোমরা (কেবল) আল্লাহ্র উদ্দেশে (বিদ্বেষমুক্ত হয়ে কোন স্থানে) এক-একজন করে এবং (কোন স্থানে) দু' দু'জন করে দাঁড়াও (অর্থাৎ তৎপর হয়ে যাও; উদ্দেশ্য চিন্তাভাবনা কর। চিন্তাভাবনার নিয়ম রয়েছে যে, কোন কোন সময়ে কোন কোন স্বভাবের দিক দিয়ে দু'জন মিলে চিন্তা করলে প্রত্যেকেই অপরের কাছ থেকে শক্তি পায় এবং কোন কোন সময়ে কোন কোন লোকের ক্ষেত্রে একাকীত্বে চিন্তাভাবনায় প্রচুর সফলতা আসে। বড় সমাবেশে প্রায়ই চিন্তাধারা বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। তাই আয়াতে এক-একজন ও দু' দু'জন বলা হয়েছে। মোটকথা, এভাবে তৎপর হয়ে যাও।) অতপর (খুব) অনুধাবন কর। (কোরআনের তুলনা নেই বলে আমি যে দাবি করি, দু'ব্যক্তিই এরূপ দাবি করতে পারে ঃ—(১) যার মস্তিষ্ক ত্রুটিপূর্ণ—পরিণামের খবর রাখে না এবং (২) যে নবী এবং এ দাবির সত্যতায় পূর্ণমাত্রায় আস্থাশীল। নবী না হয়ে বুদ্ধিমান হলেও এরূপ দাবি করার সময় পরিণামে লাঞ্ছিত হওয়ার আশংকা করবে যে, যদি কেউ এর বিকল্প তৈরি করে নিয়ে আসে, তবে কি অবস্থা হবে! এরপর আমার সমষ্টিগত অবস্থা বিবেচনা করে চিন্তা কর যে, আমি বিকৃতমস্তিষ্ক উন্মাদ কি না। তাহলে প্রত্যক্ষভাবে জানা যাবে,) তোমাদের সংগীর মধ্যে (যে সর্বদা তোমাদের সঙ্গে থাকে এবং যার প্রতিটি অবস্থা তোমরা প্রত্যক্ষ কর অর্থাৎ আমার মধ্যে) কোন উন্মাদনা নেই। (অতএব আমি যে নবী, এটাই নির্দিষ্ট হয়ে যায়।) তিনি (তোমাদের সঙ্গী পয়গম্বর। এ কারণে) তোমাদেরকে এক কঠোর আযাব আসার পূর্বে সতর্ক করেন। (সুতরাং এ পন্থায় নবুয়ত মেনে নেওয়া খুবই সহজ। অন্যত্রও প্রায় এর অনুরূপ বিষয় বর্ণিত হয়েছে। যেমন ঃ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ

কাফিররা আরও সন্দেহ করত যে, ইনি রসূল নন, বরং নেতৃত্বের অভিলাষী। অতপর এই সন্দেহের জওয়াব দেওয়া হয়েছে ঃ) আপনি আরও বলুন, আমি তোমাদের কাছে (প্রচারকার্যের) কোন পারিশ্রমিক চাইলে তা তোমরাই রাখ। (বাকপদ্ধতিতে পারিশ্রমিক চাই না, অর্থে এরূপ বলা হয়।) আমার পুরস্কার তো কেবল আল্লাহ্র কাছেই রয়েছে। তিনি যাবতীয় বিষয়ের খবর রাখেন। (সুতরাং তিনি নিজেই আমাকে উপযুক্ত পুরস্কার দিয়ে দেবেন। পুরস্কারের মধ্যে ধনসম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তি সবই অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। কেননা এগুলোর মধ্যেও পুরস্কার হওয়ার যোগ্যতা রয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, আমি তোমাদের কাছে কোন স্বার্থ কামনা করি না যে, নেতৃত্বের সন্দেহ করবে। এখন আমি যে মানুষের আচার-আচরণ ও অবস্থার সংশোধন করি, অপরাধীকে শাস্তি দেই এবং পারস্পরিক কলহ-বিবাদ মীমাংসা করি, বস্তুত এসব কারণে সন্দেহ করা যায় না। কারণ, এতে আমার কোন স্বার্থ নেই। সেমতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র

জীবনপদ্ধতি ও আর্থিক অবস্থা দৃষ্টে একথা সুস্পষ্ট যে, তিনি এসব দায়িত্ব পালন করে কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ লাভ করেন নি। বরং এতে স্বয়ং জাতিরই উপকার ছিল। তাদের জান-মাল ও ইয্যত-আবরু নিরাপদ থাকত। পিতা তার শিশু সন্তানের হিফাযত ও শিক্ষাদান শুধুমাত্র শুভেচ্ছার বশবর্তী হয়েই করেন, স্বার্থসিদ্ধি ও নেতৃত্ব কামনার সাথে তার কোন সম্পর্ক থাকে না। নবুয়ত প্রমাণিত হওয়ার পর বলা হয়েছে ঃ হে মুহাম্মদ (সা)! আপনি বলুন, আমার পালনকর্তা সত্য বিষয়কে (অর্থাৎ ঈমান ও ঈমানী বিষয়সমূহের প্রমাণকে মিথ্যা অর্থাৎ কুফর ও ঈমানী বিষয়সমূহের অস্বীকৃতির উপর বিতর্কের মাধ্যমেও) বিজয়ী করেছেন (যেমন, এই মাত্র যুক্তিতর্ক ও কথোপকথনের মাধ্যমে করা হল এবং ভবিষ্যতে যুদ্ধ ও সংঘর্ষের মাধ্যমেও বিজয়ের ব্যবস্থা হবে। মোটকথা সত্য সর্বতোভাবে প্রবল এবং) তিনি গায়েব বিষয়ে জ্ঞানী। তিনি পূর্বেই জানতেন যে, সত্য বিজয়ী হবে। অন্যরা তো এখন জানতে পেরেছে। অনুরূপভাবে তিনি জানেন যে, ভবিষ্যতে আরও বিজয়ী হবে। সেমতে মক্কা বিজয়ের দিন রসূলুল্লাহ্ (সা) পরবর্তী আয়াতখানি পাঠ করেছিলেন। এতে বোঝা যায় যে, তরবারির মাধ্যমে বিজয়ও এই বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত। অতপর এ বিষয়টি আরো ফুটিয়ে তোলার জন্য বলা হয়েছে, হে মুহাম্মদ (সা)! আপনি বলুন, সত্য (ধর্ম) আগমন করেছে এবং মিথ্যা (ধর্ম) কিছু করার ধরার ক্ষমতা হারিয়েছে। [অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এর অর্থ এই নয় যে, মিথ্যাপন্থীরা কখনও জাঁকজমক অর্জন করবে না ; বরং উদ্দেশ্য এই যে, এই সত্য ধর্ম আগমনের পূর্বে যেমন কোন কোন সময় মিথ্যাকেই সত্য বলে সন্দেহ হত এখন তা আর হবে না। এদিক দিয়ে মিথ্যা বিলুপ্ত হয়ে গেছে এবং সত্য পূর্ণরূপে প্রকাশমান হয়ে গেছে। কিয়ামত পর্যন্ত এরূপ প্রকাশমানই থাকবে। অতপর বর্ণনা করা হয়েছে যে, সত্য ফুটে ওঠার পর এর অনুসরণেই মুক্তি নিহিত। হে মুহাম্মদ (সা),] আপনি (আরও) বলুন, (যখন প্রমাণিত হল যে, এ ধর্ম সত্য, তখন এ বিষয়টি অবশ্যম্ভাবী হয়ে গেছে যে,) যদি আমি (ধরে নেওয়ার পর্যায়ে সত্যকে পরিত্যাগ করে) পথভ্রষ্ট হয়ে যাই, তবে আমার পথভ্রষ্টতা আমারই শাস্তির কারণ হবে (এতে অপরের কোন ক্ষতি হবে না)। আর যদি আমি (সত্য অনুসরণ করে সত্য পথ প্রাপ্ত হই, তবে তা এই কোরআন ও ধর্মের কারণে, যা আমার পালনকর্তা আমার প্রতি প্রত্যাদেশ করেন। আসল উদ্দেশ্য অপরকে শোনানো যে, সত্য ফুটে ওঠার পরও তোমরা তার অনুসারী না হলে তোমরাই শাস্তি ভোগ করবে ; আমার কিছু হবে না। আর যদি সত্য পথে আস, তবে তা এই সত্য ধর্ম অনুসরণের কারণেই হবে। কাজেই সত্য পথ পাওয়ার জন্য এই ধর্ম অবলম্বন করাই তোমাদের কর্তব্য। কারও পথভ্রষ্ট হওয়া অথবা সৎপথ প্রাপ্ত হওয়া নিষ্ফল হবে না। কাজেই নিশ্চিন্ত থাকার অবকাশ নেই।) আল্লাহ্ সবার অবস্থা জানেন। (কেননা) তিনি সর্বশ্রোতা (ও) সন্নিকটবর্তী (প্রত্যেককে উপযুক্ত প্রতিদান দেবেন)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ—কারও মতে معشار শব্দের অর্থ عشر অর্থাৎ দশ ভাগের এক ভাগ। কারও মতে عشر العشر অর্থাৎ একশ' ভাগের এক ভাগ এবং কারও মতে عشر العشير অর্থাৎ এক হাজার ভাগের এক ভাগ। বলা বাহুল্য, শব্দটিতে عشر এর তুলনায় অতিশয়তা আছে। সুতরাং আয়াতের অর্থ হবে এই যে, পূর্ববর্তী উম্মতকে পার্থিব ধনৈশ্বর্য, শাসনক্ষমতা, সুদীর্ঘ বয়স, স্বাস্থ্য ও শক্তি-সামর্থ্য ইত্যাদি যে পরিমাণে দান করা হয়েছিল, মক্কাবাসীরা তার দশ ভাগের এক বরং হাজার ভাগের এক ভাগও পায়নি। তাই পূর্ববর্তীদের অবস্থা ও অশুভ পরিণাম থেকে তাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। তারা পয়গম্বরগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে আযাবে পতিত হয়েছিল এবং সেই আযাব যখন এসে যায়, তখন তাদের শক্তি, সামর্থ্য, বীরত্ব, ধনৈশ্বর্য ও সুরক্ষিত দুর্গ কোন কাজেই আসেনি।

মক্কার কাফিরদের প্রতি দাওয়াত ঃ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ—এতে মক্কা-বাসীদের উপর প্রমাণ চূড়ান্ত করার উদ্দেশে সত্যানুসন্ধানের একটি সংক্ষিপ্ত পথ বলে দেওয়া হয়েছে। তা এই যে, তোমরা শুধুমাত্র একটি কাজ কর—আল্লাহ্‌র উদ্দেশে দু-দু'জন ও এক-একজন করে দাঁড়িয়ে যাও। এখানে "আল্লাহ্‌র উদ্দেশে দাঁড়ানোর অর্থ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দাঁড়ানো নয় যে, বসা অথবা শোয়া থেকে সটান দাঁড়াতে হবে; বরং বাকপদ্ধতিতে এর অর্থ হয় কোন কাজের জন্য তৎপর হওয়া। এখানে لله (আল্লাহ্‌র উদ্দেশে) শব্দটি যোগ করার উদ্দেশ্য একথা বলা যে, একান্তভাবে আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করার জন্য বিগত ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাস থেকে মুক্ত হয়ে সত্যান্বেষণে প্রবৃত্ত হও, যাতে অতীত ধারণা ও কর্ম সত্য গ্রহণের পথে প্রতিবন্ধক না হয়। দু' দু'জন ও এক একজন বলার মধ্যে কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা উদ্দেশ্য নয়; বরং অর্থ এই যে, দু'টি পন্থায় চিন্তাভাবনা করা যায়, এক. একান্তে ও নির্জনতায় নিজে নিজে চিন্তাভাবনা করা এবং দুই. বন্ধুবর্গ ও মুরুব্বীদের সাথে পরামর্শ-ক্রমে পারস্পরিক পর্যালোচনার পর কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। তোমরা এই উভয় পন্থা অথবা এতদুভয়ের মধ্যে পছন্দমত যে কোন একটি পন্থা অবলম্বন কর।

ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا—এটা أَن تَقُومُوا বাক্যের সাথে সংযুক্ত। এতে দাঁড়ানোর লক্ষ্য ব্যক্ত হয়েছে যে, সব পুরাতন ধ্যান-ধারণা থেকে মুক্ত হয়ে একান্তভাবে আল্লাহ্‌র উদ্দেশে মুহাম্মদ (সা)-এর দাওয়াত সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করার জন্য তৎপর হয়ে যাও। এ দাওয়াত সত্য না মিথ্যা তা ভেবে দেখ। তা একাই কর অথবা অন্যান্যের সাথে পরামর্শক্রমেই কর।

অতপর এই চিন্তাভাবনার একটি সুস্পষ্ট পন্থা বলে দেওয়া হয়েছে যে, দলবল ও অর্থকড়ির প্রাচুর্যহীন, একা এক ব্যক্তি যদি তার স্বজাতি বরং সমগ্র বিশ্বের বিরুদ্ধে তাদের যুগ যুগ ব্যাপী বদ্ধমূল বিশ্বাসের বিপরীতে যাতে তারা একমতও বটে কোন ঘোষণা দেয়, তবে তা দু'উপায়েই সম্ভব। এক. হয় ঘোষণাকারী বদ্ধপাগল ও উম্মাদ হবে। ফলে নিজের হিতাহিত চিন্তা না করে সমগ্র জাতিকে শত্রুতে পরিণত করে বিপদ ডেকে আনবে। দুই. তাঁর ঘোষণা অমোঘ সত্য। কারণ, তিনি আল্লাহ্র প্রেরিত রসূল। তাই আল্লাহ্ আদেশ পালনে কারও পরওয়া করেন না।

এখন তোমরা মুক্তমনে চিন্তা কর, এতদুভয়ের মধ্যে বাস্তব ঘটনা কোন্টি? এভাবে চিন্তা করলে তোমাদের পক্ষে নিশ্চিতভাবে এ বিশ্বাস করা ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না যে, মুহাম্মদ (সা) উন্মাদ ও পাগল হতে পারেন না। তাঁর জ্ঞানবুদ্ধি, বিবেচনা ও আচার-আচরণ সম্পর্কে সমগ্র মক্কা ও গোটা কুরাইশ সম্যক অবগত। তাঁর জীবনের চল্লিশটি বছর স্বজাতির মাঝেই অতিবাহিত হয়েছে। শৈশব থেকে যৌবন পর্যন্ত কার্যকলাপ তাদের সামনে সংঘটিত হয়েছে। কখনও কেউ তাঁর কথা ও কর্মকে জ্ঞানবুদ্ধি, গাম্ভীর্য্য ও শালীনতার পরিপন্থী পায়নি। কেবল এক কলেমা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" ব্যতীত আজও কেউ তাঁর কোন কথা ও কর্ম সম্পর্কে জ্ঞান-বুদ্ধির বিপরীত হওয়ার ধারণা করতে পারে না। সুতরাং এটা সুস্পষ্ট যে, তিনি উন্মাদ হতে পারেন না। আয়াতের পরবর্তী وَمَا بِصَاحِبِكُم الخ বাক্যে তাই প্রকাশ করা হয়েছে।

صَاحِبِكُم (তোমাদের সঙ্গী) শব্দে ইঙ্গিত রয়েছে যে, কোন বহিরাগত অজ্ঞাত পরিচয় মুসাফির ব্যক্তির মুখ থেকে স্বজাতির বিরুদ্ধে কোন কথা শুনলে কেউ হয়তো তাকে উন্মাদ বলতে পারে। কিন্তু তিনি তো তোমাদের শহরের বাসিন্দা, তোমাদের গোত্রেরই একজন এবং তোমাদের দিবারাত্রির সঙ্গী। তাঁর কোন অবস্থা তোমাদের অগোচরে নয়। ইতিপূর্বে তোমরা কখনও তাঁর সম্পর্কে এ ধরনের সন্দেহ করনি।

যখন পরিষ্কার হয়ে গেল যে, তিনি উন্মাদ নন, তখন শেষোক্ত বিষয়ই নির্দিষ্ট হয়ে গেল যে, তিনি আল্লাহ্র নির্ভীক রসূল। আয়াতে বিষয়টি এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে: —اِنْ هُوَ اِلَّا نَذِيرٌ لَّكُم بَيْنَ يَدَىْ عَذَابٍ شَدِيدٍ— অর্থাৎ তিনি তো কেবল কিয়ামতের ভয়াবহ আযাব থেকে মানুষকে সতর্ক করেন। اِنَّ رَبِّى يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ অর্থাৎ আমার আলিমুল-গায়েব পালনকর্তা সত্যকে মিথ্যার

উপর ছুড়ে মারেন। ফলে মিথ্যা চুরমার হয়ে যায়। অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ বলেনঃ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ—قذف—শব্দের আভিধানিক অর্থ ছুঁড়ে মারা। এখানে উদ্দেশ্য হল মিথ্যার মুকাবিলায় সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা। বিষয়টি قذف শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করার তাৎপর্য সম্ভবত এই যে, মিথ্যার উপর সত্যের আঘাতের গুরুতর প্রভাব সৃষ্টি হয়। এটা একটা উপমা। কোন ভারী বস্তুকে হালকা বস্তুর উপর নিক্ষেপ করলে যেমন তা চুরমার হয়ে যায়, তেমনিভাবে সত্যের মুকাবিলায় মিথ্যাও চুরমার হয়ে যায়। তাই অতঃপর বলা হয়েছেঃ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ—অর্থাৎ সত্যের মুকাবিলায় মিথ্যা এমন পর্যুদস্ত হয়ে যায় যে, তা কোন বিষয়ের সূচনা বা পুনরাবৃত্তির যোগ্য থাকে না।

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ ﴿٥١﴾ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴿٥٢﴾ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ ۖ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴿٥٣﴾ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِّن قَبْلُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّرِيبٍ ﴿٥٤﴾

---

(৫১) যদি আপনি দেখতেন, যখন তারা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে, অতপর পালিয়েও বাঁচতে পারবে না এবং নিকটবর্তী স্থান থেকে ধরা পড়বে। (৫২) তারা বলবে, আমরা সত্যে বিশ্বাস স্থাপন করলাম। কিন্তু তারা এত দূর থেকে তার নাগাল পাবে কেমন করে? (৫৩) অথচ তারা পূর্ব থেকে সত্যকে অস্বীকার করছিল। আর তারা সত্য হতে দূরে থেকে অজ্ঞাত বিষয়ের উপর মন্তব্য করত। (৫৪) তাদের ও তাদের বাসনার মধ্যে অন্তরাল হয়ে গেছে যেমন, তাদের সতীর্থদের সাথেও এরূপ করা হয়েছে, যারা তাদের পূর্বে ছিল। তারা ছিল বিভ্রান্তিকর সন্দেহে পতিত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

[হে মুহাম্মদ (সা)], যদি আপনি সে সময়টি দেখতেন, (তবে বিস্ময় বোধ করতেন,) যখন কাফিররা (কিয়ামতের ভয়াবহতা দেখে) ভীত-বিহ্বল হয়ে ফিরবে, অতপর পালাবারও উপায় থাকবে না এবং নিকটবর্তী জায়গা থেকে (তৎক্ষণাৎ)

ধরা পড়বে। (তখন) তারা বলবে, আমরা সত্যে বিশ্বাস স্থাপন করলাম (এবং এতে বর্ণিত যাবতীয় বিষয় মেনে নিলাম। কাজেই আমাদের তওবা কবূল করুন পুনরায় দুনিয়াতে পাঠিয়ে অথবা না পাঠিয়েই।) কিন্তু এত দূরবর্তী জায়গা থেকে তারা তার (অর্থাৎ ঈমানের) নাগাল পাবে কেমন করে? (অর্থাৎ বিশ্বাস স্থাপনের জায়গা ছিল দুনিয়া, যা এখন অনেক দূরে অবস্থিত। এখন পরজগৎ, যা কর্ম জগৎ নয়—প্রতিদান জগৎ। এখানে ঈমান গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, এখানকার বিশ্বাস অদৃশ্যে বিশ্বাস নয় বরং দেখে বিশ্বাস। দেখার পর কোন কিছু মেনে নেওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার। এতে আদেশ পালনের কোন দিকই নেই।) অথচ পূর্ব থেকে (দুনিয়াতে) তারা সত্যকে অস্বীকার করেছিল। তাদের সে অস্বীকারের সঠিক কোন উদ্দেশ্যও ছিল না, (বরং) বহু দূর থেকে যাচাইহীন উক্তি করত। (দূরের অর্থ সত্যাসত্য যাচাই থেকে দূরে ছিল। অর্থাৎ দুনিয়াতে তো কুফর করত, এখন ঈমানের সন্ধান পেয়েছে এবং তা কবূল হওয়ার বাসনা চেপেছে।) আর (যেহেতু পরকাল কর্মজগৎ নয়, তাই) তাদের ও তাদের (ঈমান কবূল হওয়ার) বাসনার মধ্যে অন্তরাল করে দেওয়া হবে (অর্থাৎ তাদের বাসনা পূর্ণ হবে না)। যেমন, তাদের সতীর্থদের সাথেও এমনি আচরণ করা হয়েছে, যারা তাদের পূর্বে (কুফর করে) ছিল। তারা সবাই ছিল বিভ্রান্তিকর সন্দেহে পতিত।

وَاُخِذُوْا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيْبٍ - অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে এটা হাশর দিবসের অবস্থা। তখন কাফির ও পাপাচারীরা ভীত-বিহ্বল হয়ে পালাতে চাইবে। কিন্তু পরিত্রাণ পাবে না। দুনিয়াতে কোন অপরাধী পলায়ন করলে তাকে খোঁজ করতে হয়; সেখানে তাও হবে না; বরং সবাই স্ব-স্থানে গ্রেফতার হবে, কেউ পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাবে না। কেউ কেউ একে অন্তিম কষ্ট ও মুমূর্ষু অবস্থা বলে সাব্যস্ত করেছেন। যখন মৃত্যুর সময় হবে এবং তাদের উপর ভীতি উপস্থিত হবে, তখন ফেরেশতাদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে না; বরং স্ব-স্থানেই আত্মা বের হয়ে যাবে।

تَنَاوُش - وَقَالُوْا اٰمَنَّا بِهٖ وَاَنّٰى لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ - অর্থ হাত বাড়িয়ে কোন কিছু উঠানো। বলা বাহুল্য, যে বস্তু বেশী দূরে নয়, হাতের নাগালের মধ্যে, তাই হাত বাড়িয়ে উঠানো যায়। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, কাফির ও মুশরিকরা কিয়ামতের দিন সত্যাসত্য সামনে এসে যাওয়ার পর বলবে, আমরা কোরআনের প্রতি অথবা রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম। কিন্তু তারা জানে না যে, ঈমানের স্থান তাদের থেকে অনেক দূরে চলে গেছে। কেননা, কেবল পার্থিব জীবনের ঈমানই গ্রহণীয়। পরকালে কর্মজগৎ নয়। সেখানকার কোন কর্ম হিসাবে ধরা যাবে না। তাই এটা কেমন করে সম্ভব যে, তারা ঈমানরূপী ধন হাত বাড়িয়ে তুলে নেবে?

قذف—وَقَدْ كَفَرُوْا بِهٖ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُوْنَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ

অর্থ কোন বস্তু নিক্ষেপ করা। আরবী বাকপদ্ধতিতে প্রমাণ ব্যতিরেকে নিছক কাল্পনিক কথাবার্তা বলাকে رجم بالغيب অথবা قذف بالغيب বলে ব্যক্ত করা হয়। অর্থাৎ সে অন্ধকারে তীর চালায়, যার কোন লক্ষ্যস্থল নেই। এখানে مِنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ -এর উদ্দেশ্য এই যে, তারা যা কিছু বলে, তা তাদের মন থেকে দূরে থাকে—মনে তার বিশ্বাস রাখে না।

وَحِيْلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُوْنَ—অর্থাৎ তাদের ও তাদের প্রিয় ও উদ্দিষ্ট বস্তুর মাঝখানে পর্দার অন্তরাল করে তাদেরকে তা থেকে বঞ্চিত করে দেওয়া হয়েছে। কিয়ামতের অবস্থায়ও এ বিষয়টি প্রযোজ্য। কিয়ামতে তারা মুক্তি ও জান্নাতের আকাঙ্ক্ষী হবে; কিন্তু তা লাভ করতে পারবে না। দুনিয়াতে মৃত্যুর বেলায়ও এটা প্রযোজ্য। দুনিয়াতে তাদের লক্ষ্য ছিল পার্থিব ধন-সম্পদ। মৃত্যু তাদের ও তাদের এই উদ্দেশ্যের মাঝখানে অন্তরায় হয়ে তাদেরকে তা থেকে বঞ্চিত করে দিয়েছে।

كَمَا فُعِلَ بِاَشْيَاعِهِمْ—اشياع শব্দটি شيعة-এর বহুবচন। অর্থ অনুসারী ও সতীর্থ। উদ্দেশ্য এই যে, তাদেরকে যে শাস্তি দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ তাদের অভীষ্ট ও ঈপ্সিত বস্তু থেকে বঞ্চিত করে দেওয়া হয়েছে তা ইতিপূর্বে তাদের মতই কুফরী কর্মে প্রবৃত্ত ব্যক্তিদেরকে দেওয়া হয়েছে। কেননা, তারা সবাই সন্দেহে নিপতিত ছিল। অর্থাৎ রসূলুল্লাহ্ (স)-র রিসালত এবং কোরআনের আল্লাহ্র কালাম হওয়ার বিষয়ে তাদের বিশ্বাস ও ঈমান ছিল না।

سورة فاطر

সূরা ফাতির

মক্কায় অবতীর্ণ, ৪৫ আয়াত, ৫ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَاعِلِ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا اُولِيْٓ اَجْنِحَةٍ مَّثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۭ يَزِيْدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاۗءُ ۭ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ① مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۚ وَمَا يُمْسِكْ ۙ فَلَا مُرْسِلَ لَهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖ ۭ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ② يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ ۭ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللّٰهِ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاۗءِ وَالْاَرْضِ ۭ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ڮ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ③

পরম করুণাময় ও অসীম দাতা আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আসমান ও জমীনের স্রষ্টা এবং ফেরেশতা-গণকে করেছেন বার্তাবাহক---তারা দুই দুই, তিন তিন ও চার চার পাখাবিশিষ্ট। তিনি সৃষ্টির মধ্যে যা ইচ্ছা যোগ করেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সক্ষম। (২) আল্লাহ্ মানুষের জন্য অনুগ্রহের মধ্য থেকে যা খুলে দেন, তা ফেরাবার কেউ নেই এবং তিনি যা বারণ করেন তা কেউ প্রেরণ করতে পারে না তিনি ব্যতীত। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (৩) হে মানুষ! তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ স্মরণ কর। আল্লাহ্ ব্যতীত এমন কোন স্রষ্টা আছে কি, যে তোমাদেরকে আসমান ও জমীন থেকে রিযিক দান করে? তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। অতএব তোমরা কোথায় ফিরে যাচ্ছ?

তফসীরের সার সংক্ষেপ

সমস্ত প্রশংসা (ও সাধুবাদ) আল্লাহ্‌র জন্য শোভনীয়, যিনি আসমান ও জমীনের স্রষ্টা এবং ফেরেশতাগণকে বার্তাবাহক বানিয়েছেন----যারা দুই দুই, তিন তিন

ও চার চার পাখা বিশিষ্ট। (বার্তার অর্থ পয়গম্বরগণের কাছে ওহী পৌঁছানো— বিধানাবলী সম্পর্কিত ওহী হোক অথবা কেবল সুসংবাদ ইত্যাদি হোক। পাখার সংখ্যা চার চারের মধ্যেই সীমিত নয়; বরং) তিনি সৃষ্টির মধ্যে যা ইচ্ছা যোগ করেন। (এমন কি কোন কোন ফেরেশতার ছয় শ' পাখা সৃষ্টি করেছেন। যেমন, হাদীসে হযরত জিবরাঈল (আ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে।) নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা সর্ববিষয়ে সক্ষম। (এমন সক্ষম যে, তাঁর কোন প্রতিবন্ধক নেই।) আল্লাহ্ মানুষের জন্য যে অনুগ্রহ খুলে দেন (যেমন, বৃষ্টি, উদ্ভিদ ও সাধারণ রুযী), তার বারণকারী কেউ নেই এবং তিনি যা বারণ করেন, তার (বারণ করার) পরে তা কেউ জারী করতে পারে না। তবে তিনি বন্ধ ও মুক্ত সবকিছু করতে পারেন। তিনি পরাক্রমশালী (অর্থাৎ সক্ষম) প্রজ্ঞাময়। (অর্থাৎ বন্ধ ও মুক্ত করণে প্রজ্ঞাসহকারে করেন।) হে মানুষ, (যেমন আল্লাহ্র ক্ষমতা পরিপূর্ণ, তেমনি তাঁর নিয়ামতও পরিপূর্ণ, অগণিত, তাই) তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র নিয়ামত স্মরণ কর (এবং শোকর আদায় কর। অর্থাৎ তওহীদ অবলম্বন কর ও শিরক পরিত্যাগ কর। অন্তত তার দুটি নিয়ামত সম্পর্কে চিন্তা কর যেগুলো সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দিতে ও কায়েম রাখতে সহায়তা করে।) আল্লাহ্ ব্যতীত কোন স্রষ্টা আছে কি, যে তোমাদেরকে আসমান ও জমীন থেকে রিযিক দান করবে ? (অর্থাৎ তিনি ব্যতীত কেউ সৃষ্টিও করতে পারে না এবং সৃষ্টির পর তাকে কায়েম রাখার জন্য রুযীও দিতে পারে না। এতে জানা গেল যে, তিনি সর্বতোভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ। সুতরাং নিশ্চিতই) তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। কাজেই তোমরা (শিরক করে) কোথায় উল্টোদিকে যাচ্ছ ?

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا— ফেরেশতাগণকে রসূল অর্থাৎ বার্তাবাহক করার বাহ্যিক অর্থ এই যে, তাদেরকে আল্লাহ্র দূত নিযুক্ত করে পয়গম্বরগণের কাছে পাঠানো হয়। তারা আল্লাহ্র ওহী ও হুকুম আহকাম পৌঁছে দেয়। রসূল অর্থ এখানে মাধ্যমও হতে পারে। অর্থাৎ তারা সাধারণ সৃষ্টি ও আল্লাহ্ তা'আলার মাঝখানে মাধ্যম হয়ে থাকে। সৃষ্টির মধ্যে পয়গম্বরগণ সর্বশ্রেষ্ঠ। তাদের ও আল্লাহ্ তা'আলার মধ্যেও ফেরেশতারা ওহীর মাধ্যম হয় এবং সাধারণ সৃষ্টি পর্যন্ত আল্লাহ্র রহমত অথবা আযাব পৌঁছানোর কাজেও ফেরেশতারাই মাধ্যম হয়ে থাকে।

أُولِي أَجْنِحَةٍ مَّثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ—অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাগণকে পালকবিশিষ্ট ডানা দান করেছেন যদ্দ্বারা তারা উড়তে পারে। এর কারণ

সুস্পষ্ট যে, তারা আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত দূরত্ব বারবার অতিক্রম করে। এটা দ্রুতগতিসম্পন্ন হওয়ার মাধ্যমেই সম্ভবপর। উড়ার মাধ্যমে দ্রুতগতি হয়ে থাকে।

ফেরেশতাগণের পাখার সংখ্যা বিভিন্ন। কারও দুই দুই, কারও তিনি তিন এবং কারও চার চার পাখা রয়েছে। এখানেই শেষ নয়। মুসলিমের হাদীসে হযরত জিবরাঈল (আ)-এর ছয়শ পাখা রয়েছে বলে প্রমাণিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ চার পর্যন্ত উল্লিখিত হয়েছে।---(কুরতুবী, ইবনে কাসীর)

আয়াতের এমন অর্থও হতে পারে যে, যেসব ফেরেশতা আল্লাহ্ তা'আলার বার্তা বহন করে দুনিয়াতে পেঁছায়, তারা কখনও দুই দুই, কখনও তিন তিন এবং কখনও চার চার করে আগমন করে। এমতাবস্থায়ও চার সংখ্যাটি সীমাবদ্ধতা বোঝায় না; বরং একটা উদাহরণ মাত্র। কেননা, কোরআনেই প্রমাণিত আছে যে, আরও বেশীসংখ্যক ফেরেশতা দুনিয়াতে আগমন করে থাকে----(বাহরে মুহীত)

يَزِيدُ فِى الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ -অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় সৃষ্টির মধ্যে যত বেশী ইচ্ছা যোগ করতে সক্ষম। বাহ্যত এটা পাখার সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ ফেরেশতাগণের পাখা দু'চারের মধ্যেই সীমিত নয়। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তা আরও অনেক বেশীও হতে পারে। অধিকাংশ তফসীরবিদের মতও তাই। যুহরী, কাতাদাহ প্রমুখ তফসীরবিদ বলেন, এখানে অধিক সৃষ্টি সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যাতে ফেরেশতাদের পাখার আধিক্যও অন্তর্ভুক্ত। দৈহিক সৌন্দর্য, চরিত্র মাধুর্য, সুললিত কণ্ঠ এবং বিভিন্ন মানুষের সৃষ্টিতে বিশেষ বিশেষ গুণাবলীর সংযোজনও এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। আবূ হাইয়ান বাহ্‌রে মুহীতে এ মতের আলোকেই তফসীর করেছেন। এ তফসীর থেকে প্রমাণিত হয় যে, মানুষ যে সৌন্দর্য ও পরাকাষ্ঠা অর্জন করে, তা আল্লাহ্ তা'আলার দান ও নিয়ামত। এজন্য কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।

مَا يَفْتَحِ اللهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا -এখানে রহমত বলে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয় প্রকার নিয়ামত বোঝানো হয়েছে। যেমন---ঈমান, জ্ঞান, সৎকর্ম, নবুয়ত ইত্যাদি এবং রিযিক, সাজ-সরঞ্জাম, সুখ-শান্তি, স্বাস্থ্য, ধনসম্পদ, ইযযত-আবরু ইত্যাদি। আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা যার জন্য স্বীয় অনুগ্রহের দরজা খুলে দেওয়ার ইচ্ছা করেন, তাকে কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারে না।

এমনিভাবে দ্বিতীয় বাক্যের অর্থও ব্যাপক। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যা বারণ করেন, তা কেউ খুলতে পারে না। সেমতে আল্লাহ্ তা'আলা কোন বান্দা থেকে দুনিয়ার বিপদাপদ ফিরিয়ে রাখতে চাইলে তাকে কষ্ট দেওয়ার সাধ্য কারও নেই। এমনিভাবে আল্লাহ্ তা'আলা কোন কারণবশত কোন বান্দাকে রহমত থেকে বঞ্চিত করতে চাইলে, তাকে তা দেওয়ার সাধ্য কারও নেই।---(আবু হাইয়্যান)

এ বিষয়বস্তু সম্পর্কে একটি হাদীসও বর্ণিত আছে। একবার হযরত মোয়াবিয়া (রা) কুফার গভর্নর মুগীরা ইবনে শোবা (রা)-কে এই মর্মে চিঠি লিখলেন যে, তুমি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছ থেকে শুনেছ, এরূপ কোন হাদীস আমাকে লিখে পাঠাও। হযরত মুগীরা তাঁর সচিবকে ডেকে লিখালেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে নামায আদায়ের পর নিম্নোক্ত বাক্যগুলো পাঠ করতে শুনেছি : اللهم لامانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد অর্থাৎ হে আল্লাহ্, যে বস্তু আপনি কাউকে দান করেন, তা কেউ ঠেকাতে পারে না এবং আপনি যা ফিরিয়ে রাখেন, তা কেউ দিতে পারে না। আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কারও কোন চেষ্টা কার্যকর হতে পারে না।---(মসনাদে আহমদ)

মুসলিমে বর্ণিত আবু সায়ীদ খুদরী (রা)-র রেওয়ায়েতে আছে যে, উপরোক্ত বাক্যগুলো তিনি রুকূ থেকে মাথা তোলার সময় বলেছিলেন এবং এর আগে বলেছিলেন : أحق ما قال العبد وكلنا لك অর্থাৎ বান্দা যেসব বাক্য বলতে পারে, তন্মধ্যে এগুলো সর্বাধিক উপযুক্ত ও অগ্রগণ্য।

আল্লাহ্র উপর ভরসা করলে যাবতীয় বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়া যায় : উল্লিখিত আয়াত মানুষকে শিক্ষা দেয় যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কারও তরফ থেকে উপকার ও ক্ষতির আশা ও ভয় রাখা উচিত নয়। কেবল আল্লাহ্র প্রতিই লক্ষ্য রাখা উচিত। এটাই ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সংশোধন এবং চিরস্থায়ী সুখের অব্যর্থ ব্যবস্থাপত্র। এর মাধ্যমেই মানুষ হাজারো দুঃখ ও চিন্তার কবল থেকে মুক্তি পেতে পারে। --(রূহুল-মা'আনী)

হযরত আমের ইবনে আবদে কায়েস (রা) বলেন, আমি যখন ভোরবেলা কোরআন পাকের চারটি আয়াত পাঠ করে নেই, তখন সকালে ও সন্ধ্যায় কি হবে, সে বিষয়ে আমার কোন চিন্তা থাকে না। তন্মধ্যে এক আয়াত এই : مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهٗ مِنْ بَعْدِهٖ। দ্বিতীয় আয়াত এরই সমর্থবোধক :

وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗۤ اِلَّا هُوَ وَاِنْ يُّرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهٖ۔

তৃতীয় আয়াত سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُّسْرًا এবং চতুর্থ আয়াত -- وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا ---(রূহুল-মা'আনী)

হযরত আবু হোরায়রা (রা) বৃষ্টি হতে দেখলে বলতেন ঃ مطرنا بنوء الفتح অতপর ما يفتح الله من رحمة আয়াত পাঠ করতেন। এতে আরবদের ভ্রান্ত ধারণার খণ্ডন রয়েছে। তারা বৃষ্টিকে বিশেষ বিশেষ গ্রহের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে বলত, অমুক গ্রহের প্রভাবে আমরা বৃষ্টি পেয়েছি। হযরত আবু হোরায়রা বলেন, আমরা ما يفتح الله আয়াতের কারণে বৃষ্টি পেয়েছি। তিনি বৃষ্টির সময় এই আয়াতটি তেলাওয়াত করতেন।—(মুয়াত্তা মালেক)

وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ ۚ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ۝ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۖ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ۖ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ ۝ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ۚ إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ۝ الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۖ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ۝ أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا ۖ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۖ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۝

(৪) তারা যদি আপনাকে মিথ্যাবাদী বলে তবে আপনার পূর্ববর্তী পয়গম্বর-গণকেও তো মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল। আল্লাহ্‌র প্রতিই যাবতীয় বিষয় প্রত্যাবর্তিত হয়। (৫) হে মানুষ, নিশ্চয় আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য। সুতরাং পার্থিব জীবন যেন তোমা-দেরকে কিছুতেই ধোঁকা না দেয় এবং প্রবঞ্চক শয়তান যেন আল্লাহ্‌র নামে তোমা-দেরকে প্রতারণা না করে। (৬) শয়তান তোমাদের শত্রু ; অতএব তাকে শত্রু রূপে গ্রহণ কর। সে তার দলবলকে আহবান করে যেন তারা জাহান্নামী হয়। (৭) যারা কুফর করে তাদের জন্য রয়েছে কঠোর আযাব। আর যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহা পুরস্কার। (৮) যাকে মন্দকর্ম শোভনীয় করে দেখানো হয়, সে তাকে উত্তম মনে করে, সে কি সমান যে মন্দকে মন্দ মনে করে। নিশ্চয় আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথ প্রদর্শন করেন।

সুতরাং আপনি তাদের জন্য অনুতাপ করে নিজেকে ধ্বংস করবেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ জানেন তারা যা করে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

[হে পয়গম্বর (সা)], তারা যদি আপনাকে (তওহীদ, রিসালত প্রভৃতি ব্যাপারে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তবে (আপনি সেজন্য দুঃখিত হবেন না। কেননা) আপনার পূর্বেও বহু পয়গম্বরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়েছে। (এক সান্ত্বনা তো এই, দ্বিতীয় এই যে,) আল্লাহ্র দিকেই যাবতীয় বিষয় প্রত্যাবর্তিত হবে। (তিনি নিজেই সব বুঝে নেবেন। আপনি চিন্তা করবেন কেন! অতপর সাধারণ মানুষকে বলা হয়েছে,) হে মানুষ. (اِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ — বাক্যে কিয়ামতের খবর শুনে বিস্ময়বোধ করো না।) আল্লাহ্ তা'আলার (এ) ওয়াদা সত্য। সুতরাং পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে ধোঁকা না দেয়। (এতে মগ্ন হয়ে প্রতিশ্রুত সেদিন সম্পর্কে গাফিল হয়ে যেয়ো না) এবং প্রবঞ্চক শয়তান যেন তোমাদেরকে আল্লাহ্ সম্পর্কে প্রতারণায় না ফেলে। তোমরা তার এই প্ররোচণায় বিশ্বাস করো না যে, আল্লাহ্ আযাব দেবেন না ; যেমন সে বলত, وَلَئِنْ رُّجِعْتُ اِلٰى رَبِّىْۤ اِنَّ لِىْ عِنْدَهٗ لَلْحُسْنٰى এবং শয়তান (যার কথা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, সে) নিশ্চিতই তোমাদের শত্রু। অতএব তাকে শত্রুই মনে কর। সে তার দলবলকে (অর্থাৎ অনুসারীদেরকে মিথ্যার প্রতি শুধু এ কারণেই) আহবান করে যেন তারা জাহান্নামী হয়ে যায়। (সুতরাং) যারা কাফির হয়ে গেছে (এবং শয়তানের প্রতারণায় ফেঁসে গেছে) তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। আর যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে (এবং শয়তানের জালে আবদ্ধ হয় না) তাদের জন্য রয়েছে (গোনাহ্ থেকে) ক্ষমা এবং (সৎকর্মের কারণে) মহা পুরস্কার। (অতএব এমন দু'জন কি সমান হতে পারে ? অর্থাৎ) যাকে তার মন্দকর্ম শোভনীয় করে দেখানো হয়েছে, অতপর সে তাকে উত্তম মনে করে এবং যে ব্যক্তি মন্দকে মন্দ মনে করে, তারা কি সমান হতে পারে ? (প্রথমোক্ত ব্যক্তি কাফির, যে শয়তানের প্ররোচনায় সত্যকে মিথ্যা এবং ক্ষতিকরকে উপকারী মনে করে এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি মু'মিন, যে পয়গম্বরগণের অনুসরণ এবং শয়তানের বিরোধিতার কারণে সত্যকে সত্য, মিথ্যাকে মিথ্যা, ক্ষতিকরকে ক্ষতিকর এবং উপকারীকে উপকারী মনে করে। অর্থাৎ উভয়ে সমান হতে পারে না ; বরং একজন জাহান্নামী, অপরজন জান্নাতী। সুতরাং তাদের মধ্যে তফাৎ আছে। যদি অবাক হও যে, বুদ্ধিমান মানুষ অসৎকে সৎ কিরূপে মনে করতে পারে, তবে এর কারণ এই যে,) আল্লাহ্ তা'আলা যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন (তার জ্ঞানবুদ্ধি পাল্টে যায়) এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথ প্রদর্শন করেন। (ফলে তার উপলব্ধি ঠিক থাকে। আল্লাহ্র ইচ্ছা অনুযায়ীই যখন এমন হয়,

তখন) আপনি তাদের জন্য আক্ষেপ করে নিজেকে ধ্বংস করবেন না। (অর্থাৎ মোটেই আক্ষেপ করবেন না---সবর করে বসে থাকুন) আল্লাহ্ তা'আলা তাদের কাজকর্ম জানেন। (সময় এলে বুঝে নেবেন।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

غرور—لَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ শব্দটি আধিক্যবোধক। অর্থাৎ অতি প্রবঞ্চক। এতে শয়তানকে বোঝানো হয়েছে। তার কাজই মানুষকে প্রতারিত করে কুফর ও গোনাহে লিপ্ত করা। 'শয়তান যেন তোমাদেরকে আল্লাহ্ সম্পর্কে ধোঁকা না দেয়'---এর অর্থ শয়তান যেন মন্দ কর্মকে শোভনীয় করে তোমাদেরকে তাতে লিপ্ত করে না দেয়। তখন তোমাদের অবস্থা হবে যে, তোমরা গোনাহ্ করার সাথে সাথে মনে করতে থাকবে যে, তোমরা আল্লাহ্র প্রিয় এবং তোমাদের শাস্তি হবে না। ---(কুরতুবী)

فَإِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَّشَاءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ— ইমাম বগভী হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) দোয়া করেছিলেন ঃ হে আল্লাহ্ উমর ইবনে খাত্তাব অথবা আবূ জাহলের মাধ্যমে ইসলামকে শক্তি ও সামর্থ্য দান কর। আল্লাহ্ তা'আলা উমর ইবনে খাত্তাবকে সৎপথ প্রদর্শন করে ইসলামের শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত করে দেন এবং আবূ জাহ্ল তার পথভ্রষ্টতার মধ্যেই ডুবে থাকে। তখনই আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।---(মাযহারী)

وَاللّٰهُ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ الرِّيٰحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَسُقْنٰهُ اِلٰى بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَاَحْيَيْنَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۭ كَذٰلِكَ النُّشُوْرُ ۝ مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعِزَّةَ فَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ جَمِيْعًا ۭ اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهٗ ۭ وَالَّذِيْنَ يَمْكُرُوْنَ السَّيِّاٰتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۭ وَمَكْرُ اُولٰۗىِٕكَ هُوَ يَبُوْرُ ۝ وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ اَزْوَاجًا ۭ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْثٰى وَلَا تَضَعُ اِلَّا بِعِلْمِهٖ ۭ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ وَّلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهٖٓ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ ۭ اِنَّ ذٰلِكَ

عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ﴿١١﴾ وَمَا يَسْتَوِى الْبَحْرٰنِ ۖ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَآئِغٌ
شَرَابُهٗ وَهٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ ۗ وَمِنْ كُلٍّ تَاْكُلُوْنَ لَحْمًا طَرِيًّا وَّتَسْتَخْرِجُوْنَ
حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا ۚ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيْهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿١٢﴾ يُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ ۙ
وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ كُلٌّ يَّجْرِىْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ
لَهُ الْمُلْكُ ۚ وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ مَا يَمْلِكُوْنَ مِنْ
قِطْمِيْرٍ ﴿١٣﴾ اِنْ تَدْعُوْهُمْ لَا يَسْمَعُوْا دُعَآءَكُمْ ۚ وَلَوْ سَمِعُوْا مَا اسْتَجَابُوْا لَكُمْ ۗ
وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكْفُرُوْنَ بِشِرْكِكُمْ ۗ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيْرٍ ﴿١٤﴾

(৯) আল্লাহ্ই বায়ু প্রেরণ করেন, অতপর সে বায়ু মেঘমালা সঞ্চারিত করে; অতপর আমি তা মৃত ভূ-খণ্ডের দিকে পরিচালিত করি, অতপর তদ্দ্বারা সে ভূ-খণ্ডকে তার মৃত্যুর পর সঞ্জীবিত করে দেই। এমনিভাবে হবে পুনরুত্থান। (১০) কেউ সম্মান চাইলে জেনে রাখুক সমস্ত সম্মান আল্লাহ্রই জন্য। তাঁরই দিকে আরোহণ করে সৎবাক্য এবং সৎকর্ম তাকে তুলে নেয়। যারা মন্দ কার্যের চক্রান্তে লেগে থাকে, তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। তাদের চক্রান্ত ব্যর্থ হবে। (১১) আল্লাহ্ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, অতপর বীর্য থেকে, তারপর করেছেন তোমাদেরকে যুগল। কোন নারী গর্ভধারণ করে না এবং সন্তান প্রসব করে না; কিন্তু তাঁর জ্ঞাতসারে। কোন বয়স্ক ব্যক্তি বয়স পায় না এবং তার বয়স হ্রাস পায় না; কিন্তু তা লিখিত আছে কিতাবে। নিশ্চয় এটা আল্লাহ্র পক্ষে সহজ। (১২) দু'টি সমুদ্র সমান হয় না---একটি মিঠা ও তৃষ্ণানিবারক এবং অপরটি লোনা। উভয়টি থেকেই তোমরা তাজা গোশ্ত (মৎস্য) আহার কর এবং পরিধানে ব্যবহার্য গয়নাগাটি আহরণ কর। তুমি তাতে তার বুক চিরে জাহাজ চলতে দেখ, যাতে তোমরা তার অনুগ্রহ অন্বেষণ কর এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (১৩) তিনি রাত্রিকে দিবসে প্রবিষ্ট করেন এবং দিবসকে রাত্রিতে প্রবিষ্ট করেন। তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে কাজে নিয়োজিত করেছেন। প্রত্যেকটি আবর্তন করে এক নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত। ইনি আল্লাহ্; তোমাদের পালনকর্তা, সাম্রাজ্য তাঁরই। তাঁর পরিবর্তে তোমরা যাদেরকে ডাক, তারা তুচ্ছ খেজুর আঁটিরও অধিকারী নয়। (১৪) তোমরা তাদেরকে ডাকলে তারা তোমাদের

সে ডাক শুনে না। শুনলেও তোমাদের ডাকে সাড়া দেয় না। কিয়ামতের দিন তারা তোমাদের শিরক অস্বীকার করবে। বস্তুত আল্লাহ্র ন্যায় তোমাকে কেউ অবহিত করতে পারবে না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আল্লাহ্ (এমন সক্ষম যে, তিনিই বৃষ্টির পূর্বে) বায়ু প্রেরণ করেন, অতপর বায়ু মেঘমালাকে চালিয়ে নিয়ে যায়। (সূরা রূমে এর অবস্থা বর্ণিত হয়েছে)। অতপর আমি মেঘমালাকে শুষ্ক ভূ-খণ্ডের দিকে পরিচালিত করি (ফলে সেখানে বৃষ্টিপাত হয়)। অতপর আমি তদ্দ্বারা (অর্থাৎ বৃষ্টির পানি দ্বারা) ভূ-খণ্ডকে (উদ্ভিদ দ্বারা) সঞ্জীবিত করি। (ভূ-খণ্ডকে যেমন তার উপযুক্ত জীবন দান করি) তেমনি-ভাবে (কিয়ামতে মানুষের) পুনরুত্থান হবে। (অর্থাৎ তাদের উপযুক্ত জীবন তাদেরকে দান করা হবে। এখানে তুলনার অভিন্ন বিষয় হচ্ছে, উভয়ের মধ্যে একটি লয়প্রাপ্ত বৈশিষ্ট্য ফিরিয়ে আনা। ভূ-খণ্ডের মধ্যে উদ্ভিদের ক্রমবিকাশ ফিরিয়ে আনা হয়, আর মানব দেহে ফিরিয়ে আনা হয় আত্মা। তওহীদের প্রমাণ প্রসঙ্গে হাশর ও নশরের এই বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে। এই পুনরুত্থানের সাথে সঙ্গতিসম্পন্ন আরেকটি বিষয় এই যে, কিয়ামতে যখন জীবিত হতে হবে, তখন সেখানকার লান্ছনা ও অব-মাননা থেকে আত্মরক্ষার চিন্তা করা প্রয়োজন। এ ব্যাপারে মুশরিকরা শয়তানের ধোঁকায় পড়ে স্বহস্ত নির্মিত মূর্তিকে সম্মান লাভের উপায় স্থির করে রেখেছিল। তারা বলত, هٰؤُلَاءِ شُفَعَاءُنَا عِنْدَ اللّٰهِ—অর্থাৎ এরা সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র নিকট আমাদের সুপারিশকারী—জাগতিক প্রয়োজনেও এবং কিয়ামতে কিছু হলে পরকালীন মুক্তির জন্যেও। সূরা মরিয়মে আল্লাহ্ বলেন, وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اٰلِهَةً لِّيَكُوْنُوْا لَهُمْ عِزًّا— এ সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে।) যে ব্যক্তি (পরকালে) সম্মান কামনা করে (পরকাল নিশ্চিত বিধায় এমন কামনা করা আবশ্যকও বটে---তার উচিত আল্লাহ্র কাছে সম্মান প্রার্থনা করা। কেননা) সমস্ত সম্মান (সত্তাগতভাবে) আল্লাহ্রই। (অন্যদের সম্মান অসত্তাগতভাবে হয়ে থাকে। অসত্তাগত বিষয় সর্বদা সত্তাগত বিষয়ের মুখাপেক্ষী হয়। সুতরাং সম্মানের ব্যাপারে সবাই আল্লাহ্র মুখাপেক্ষী। বস্তুত আল্লাহ্র কাছ থেকে সম্মান লাভের পন্থা হল কথায় ও কাজে তাঁর আনুগত্য করা। আল্লাহ্ তাই পছন্দ করেন। সেমতে) সৎবাক্য তাঁর কাছে পৌঁছে (অর্থাৎ তিনি তা কবূল করেন) এবং সৎকর্ম তাকে পৌঁছায়। (সৎবাক্য বলে কলেমায়ে তওহীদ ও আল্লাহ্র যিকির-আযকার এবং সৎকর্ম বলে আন্তরিক বিশ্বাস এবং প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য যাবতীয় সাধুকর্মকে বোঝানো হয়েছে। সুতরাং মর্মার্থ দাঁড়াল এই যে, কলেমায়ে তওহীদ ও যিকির-আযকারকে আল্লাহ্র কাছে গ্রহণীয় করার উপায় হচ্ছে

সৎকর্ম। এখানে মূলত গ্রহণীয় হওয়া ও পূর্ণরূপে গ্রহণীয় হওয়া উভয়টি বোঝানো হয়েছে। সেমতে যাবতীয় সৎবাক্য গ্রহণীয় হওয়ার জন্য মূলত আন্তরিক বিশ্বাস ও ঈমান অপরিহার্য শর্ত ; এছাড়া কোন যিকির গ্রহণীয় নয়। পক্ষান্তরে সৎবাক্য পূর্ণ-রূপে গ্রহণীয় হওয়ার জন্য অন্যান্য সৎকর্ম শর্ত ; সাধারণভাবে হওয়ার জন্য শর্ত নয়। কেননা ফাসিক ব্যক্তি সৎবাক্য বললে তাও গ্রহণীয় হয় ; কিন্তু পূর্ণরূপে গ্রহণীয় হয় না। সুতরাং এগুলো যখন আল্লাহ্‌র পছন্দনীয়, তখন যে ব্যক্তি এগুলো অবলম্বন করবে, সে সম্মান লাভ করবে।) আর যারা (এর বিপরীত পন্থা অবলম্বন করে আপনার বিরোধিতা করছে, যা আল্লাহ্ তা'আলারই বিরোধিতা এবং আপনার বিরুদ্ধে) মন্দ-কার্যের চক্রান্তে লেগে আছে, তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। (এ শাস্তি তাদের লাঞ্ছনার কারণ হবে।, তাদের স্বনির্মিত মূর্তি তাদেরকে মোটেই সম্মান দিতে পারবে না। বরং উল্টো তাদের বিরুদ্ধে চলে যাবে। আল্লাহ্ তা'আলা সূরা মরিয়মে বলেন, سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا এটা হবে তাদের পরকালের ক্ষতি। দুনিয়ার ক্ষতি এই হবে যে,) তাদের চক্রান্ত ব্যর্থ হবেই। (অর্থাৎ তারা এতে সফল হবে না! বস্তুত তাই হয়েছে। তারা ইসলামকে মিটিয়ে দিতে চেয়েছিল কিন্তু নিজেরাই মিটে গেছে। এটা ছিল মধ্যবর্তী বাক্য। অতপর আবার তওহীদের বিষয় বর্ণিত হচ্ছে। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কুদরতের বহিঃপ্রকাশ, একতো اللهُ الَّذِىْ اَرْسَلَ আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে। তওহীদ জ্ঞাপনকারী দ্বিতীয় বহিঃপ্রকাশ এই যে,) আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে (অর্থাৎ তোমাদের মূল আদমকে) মৃত্তিকা থেকে, অতপর (পুরোপুরিভাবে) বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছেন। অতপর তোমাদেরকে যুগল (অর্থাৎ কিছু পুরুষ ও কিছু স্ত্রী) সৃষ্টি করেছেন। (এ হচ্ছে তাঁর কুদরত। এখন জ্ঞান দেখ----) কোন নারী গর্ভধারণ করে না এবং সন্তান প্রসব করে না ; কিন্তু সবই তাঁর জ্ঞাতসারে হয়। (অর্থাৎ তিনি পূর্ব থেকে সব জ্ঞাত থাকেন। অনুরূপভাবে) কারও বয়স বেশি (নির্ধারণ) করা হয় না এবং কারও বয়স কম (নির্ধারণ) করা হয় না, কিন্তু সবই লওহে মাহ্‌ফুযে লিখিত থাকে। (আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় আদি জ্ঞান অনুযায়ী তা লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন। এজন্য আশ্চর্যবোধ করো না যে, সংঘটিত হওয়ার পূর্বে সব ঘটনা কিরূপে নির্ধারণ করা সম্ভবপর হল ? কেননা) এটা আল্লা-হ্‌র জন্য সহজ। (কারণ, তাঁর সত্তাগত জ্ঞানের আওতায় অতীত ও ভবিষ্যত যাবতীয় ঘটনা একইরূপে বিদ্যমান রয়েছে। অতপর কুদরতের আরও দলীল শোন ঃ পানি একই উপাদান সত্ত্বেও তাতে বিভিন্ন দু'টি প্রকার সৃষ্টি করা হয়েছে।) দুটি সমুদ্র সমান নয় ; (বরং) একটি মিঠা তৃষ্ণা নিবারক, (হৃদয়গ্রাহী হওয়ার কারণে) সুপেয় এবং অপরটি লোনা, খর। (এটিও কুদরতের অভিনব বস্তু। আরও কতক দলীল কুদরত জ্ঞাপনকারী হওয়ার সাথে সাথে নিয়ামতও জ্ঞাপন করে। উদাহরণত

তোমরা প্রত্যেক দরিয়া থেকে (মৎস্য শিকার করে, তার) তাজা গোশত আহার কর এবং গয়না (অর্থাৎ মোতি) বের কর, যা তোমরা পরিধান কর। (হে সম্বোধিত ব্যক্তি,) তুমি দেখ যে, জাহাজগুলো পানির বুক চিরে তাতে চলাফেরা করে, যাতে তোমরা (এদের সাহায্যে সফর করে) আল্লাহ্‌র রিযিক অন্বেষণ কর এবং (রিযিক অন্বেষণ করে আল্লাহ্‌র) কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (এছাড়া আরও বহু নিয়ামত রয়েছে। যেমন,) তিনি রাত্রিকে (অর্থাৎ তার অংশকে) দিবসের মাঝে (অর্থাৎ তার অংশের মাঝে) ঢুকিয়ে দেন এবং দিবসকে রাত্রির মধ্যে ঢোকান। (এতে দিবারাত্রির হ্রাস-বৃদ্ধি সম্পর্কিত উপকারিতা অর্জিত হয়। আরও নিয়ামত এই যে,) তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে কাজে নিয়োজিত করেছেন। প্রত্যেকটি নির্দিষ্ট মেয়াদ (কিয়ামত) পর্যন্ত আবর্তন করে। তিনিই আল্লাহ্ (যার এই অবস্থা) তোমাদের পালনকর্তা। সাম্রাজ্য তাঁরই তাঁর পরিবর্তে তোমরা যাদেরকে ডাক, তারা তুচ্ছ খেজুর আঁটি পরিমাণ ক্ষমতাও রাখে না। (জড় উপাস্যদের মধ্যে ব্যাপারটি সুস্পষ্ট। যেসব উপাস্য প্রাণী তারাও সরাসরি ও সত্তাগতভাবে ক্ষমতার অধিকারী নয়। তাদের অবস্থা এই যে,) তোমরা তাদেরকে আহবান করলে (একতো) তারা শোনে না। (জড় উপাস্যদের মধ্যে শোনার যোগ্যতাই নেই। প্রাণীরা মারা গেলে তাদের শ্রবণ জরুরী ও স্থায়ী নয়--আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে শুনিয়ে দেন, ইচ্ছা না করলে শোনান না।) যদি শুনেও নেয়, তবে তোমাদের ডাকে সাড়া দেয় না। কিয়ামতের দিন তারা তোমাদের শিরক অস্বীকার করবে। (যেমন, এক আয়াতে আছে--مَا كَانُوا اِيَّانَا يَعْبُدُوْنَ আমি যা বলেছি, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। কেননা আমি সত্যাসত্যের পূর্ণ খবর রাখি। অতএব) খবরদার আল্লাহ্‌র ন্যায় তোমাকে কেউ অবহিত করতে পারবে না। (সুতরাং আমার বক্তব্য সর্বাধিক নির্ভুল)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهٗ পূর্বের আয়াতে বলা হয়েছে যে, কেউ সম্মান ও ক্ষমতা কামনা করলে তার জেনে রাখা উচিত যে, তা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারও সাধ্যে নেই। তারা যাদেরকে উপাস্য সাব্যস্ত করেছে অথবা সম্মান পাওয়ার আশায় যাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে রেখেছে, তারা কাউকে সম্মান দিতে পারে না। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট থেকে সম্মান ও ক্ষমতা লাভের পন্থা বর্ণিত হয়েছে। এই পন্থার দু'টি অংশের প্রথমটি হচ্ছে সৎবাক্য অর্থাৎ কলেমায়ে তাওহীদ এবং আল্লাহ্‌র সত্তা ও গুণাবলীর জ্ঞান। আর দ্বিতীয় অংশ সৎকর্ম। অর্থাৎ অন্তরে বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তদনুযায়ী শরীয়তের অনুসরণে কর্ম সম্পাদন করা। হযরত শাহ্ আবদুল কাদির (র) 'মুযেহুল কোরআনে' বলেন, সম্মান লাভের এই ব্যবস্থাপত্র সম্পূর্ণ নির্ভুল ও পরীক্ষিত। তবে শর্ত এই যে, আল্লাহ্‌র

যিকির ও সৎকর্ম যথারীতি স্থায়ী হতে হবে। নির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত স্থায়ীভাবে এই যিকির ও সৎকর্ম করলে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ইহ ও পরকালে অক্ষয় ও অতুলনীয় সম্মান দান করেন।

আলোচ্য আয়াতে এই দু'টি অংশ ব্যক্ত করার জন্য বলা হয়েছে : সৎবাক্য আল্লাহ্র দিকে আরোহণ করে এবং সৎকর্ম তাঁকে পৌঁছায়। الْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ বাক্যের ব্যাকরণিক প্রকরণে কয়েকটি সম্ভাব্যতা বিদ্যমান রয়েছে এবং প্রত্যেক সম্ভাব্যতার দিক দিয়ে বাক্যের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ হয়ে থাকে। তফসীরবিদগণ এসব সম্ভাব্যতার প্রেক্ষাপটে এর ভিন্ন ভিন্ন তফসীর করেছেন। তফসীরের সার-সংক্ষেপে প্রথম সম্ভাবনা অনুযায়ী তরজমা করা হয়েছে যে, সৎবাক্য আল্লাহ্র দিকে আরোহণ করে, কিন্তু তার উপায় হয় সৎকর্ম। হযরত ইবনে আব্বাস, হাসান বসরী, ইবনে জুবায়ের, মুজাহিদ, যাহহাক শহ্র ইবনে হাওশব প্রমুখ অধিকাংশ তফসীরবিদও এ অর্থই গ্রহণ করেছেন। তাঁরা বলেন, আল্লাহ্র দিকে আরোহণ করা ও করানোর অর্থ আল্লাহ্র কাছে কবূল হওয়া। তাই এ বাক্যের সারমর্ম এই যে, কলেমায়ে তওহীদ হোক অথবা অন্য কোন যিকির-তসবীহ্ই হোক---কোনটিই সৎকর্ম ব্যতিরেকে আল্লাহ্র দরবারে কবূল হয় না। সৎকর্মের প্রধান অংশ হচ্ছে আত্মিক বিশ্বাস। অর্থাৎ আল্লাহ্ ও তাঁর তওহীদে বিশ্বাস স্থাপন করা। এটি ব্যতীত কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' কিংবা অন্য কোন যিকির মকবুল নয়।

সৎকর্মের অন্যান্য অংশ হচ্ছে নামায, রোযা ইত্যাদি সম্পাদন এবং হারাম ও মকরূহ কর্ম বর্জন। এসব কর্মও পূর্ণরূপে কবূল হওয়া শর্ত। অতএব, যে ব্যক্তি অন্তরে ঈমান ও বিশ্বাস রাখে না, সে মুখে যতই কলেমায়ে তওহীদ উচ্চারণ করুক---আল্লাহ্ তা'আলার কাছে কিছুই কবূল হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অন্তরে ঈমান ও বিশ্বাস রাখে ; কিন্তু অন্যান্য সৎকর্ম সম্পাদন করে না অথবা তাতে ত্রুটি করে, তার যিকির ও কালেমায়ে তওহীদ সম্পূর্ণ বিনষ্ট হবে না, বরং সে চিরকালীন আযাব থেকে মুক্তি পাবে এবং সে পরিপূর্ণ কবুলিয়ত লাভ করতে পারবে না। ফলে সৎকর্ম বর্জন ও ত্রুটি পরিমাণে আযাব ভোগ করবে।

এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা কোন কথাকে কাজ ছাড়া এবং কোন কথা ও কাজকে নিয়ত ছাড়া এবং কোন কথা, কাজ ও নিয়তকে সুন্নত অনুযায়ী না হওয়া পর্যন্ত কবূল করেন না----(কুরতুবী)

সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে, যে কোন কাজ সুন্নত অনুযায়ী হওয়া তা পূর্ণরূপে কবুল হওয়ার শর্ত। কথা, কর্ম ও নিয়ত প্রভৃতি ঠিক হওয়ার পর যদি কর্মপন্থা সুন্নত মুতাবিক না হয়, তবে সেগুলো পূর্ণরূপে কবূল হবে না।

কোন কোন তফসীরকার উপরোক্ত বাক্যের ব্যাকরণিক প্রকরণ এই বলেছেন যে, يرفعه শব্দের ضمير فاعل হচ্ছে كلم طيب এবং ضمير مفعول হচ্ছে عمل صالح

অতএব অর্থ এই যে, সৎবাক্য সৎকর্মকে আরোহণ করায় ও পৌঁছায়। অর্থাৎ কবুল-যোগ্য করে। এটা প্রথম অর্থের সম্পূর্ণ বিপরীত। এর সারমর্ম এই হবে যে, যে ব্যক্তি সৎকর্মের সাথে বেশি পরিমাণে আল্লাহ্‌র যিকিরও করে, তার এই যিকির তার কর্মকে সুশোভিত সুন্দর ও কবুলযোগ্য করে তোলে।

বাস্তব সত্য এই যে, কলেমায়ে তাওহীদ ও তাসবীহ্ যেমন সৎকর্ম ব্যতীত যথেষ্ট নয়, তেমনি সৎকর্ম এবং আল্লাহ্‌র হুকুম-আহকাম ও নিষেধাজ্ঞাসমূহ মেনে চলাও যিকির ব্যতীত ফুটে উঠে না; প্রচুর যিকিরই সৎকর্মকে শোভনীয় ও গ্রহণযোগ্য করে থাকে।

وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ وَّلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهٖٓ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ—অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে এ আয়াতের মর্ম এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা যাকে দীর্ঘ জীবন দান করেন, তা পূর্বেই লওহে মাহফুযে লিখিত রয়েছে। অনুরূপভাবে স্বল্প জীবনও পূর্ব থেকে লওহে মাহফুযে লিপিবদ্ধ থাকে। যার সারমর্ম দাঁড়াল এই যে, এখানে ব্যক্তিবিশেষের জীবনের দীর্ঘতা বা হ্রস্বতা বোঝানো উদ্দেশ্য নয়। বরং গোটা মানব-জাতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে যে, তাদের কাউকে দীর্ঘ জীবন দান করা হয় এবং কাউকে তার চেয়ে কম। ইবনে কাসীর হযরত ইবনে আব্বাস থেকে এই তফসীর বর্ণনা করেছেন। জাসসাস, হাসান বসরী ও যাহ্হাক প্রমুখের মতও তাই। কেউ কেউ বলেন, যদি আয়াতের অর্থ একই ব্যক্তির বয়সের হ্রাসবৃদ্ধি ধরে নেওয়া যায়, তবে বয়স হ্রাস করার উদ্দেশ্য এই যে, প্রত্যেক ব্যক্তির বয়স আল্লাহ্ তা'আলা যা লিখে দিয়েছেন, তা নিশ্চিত কিন্তু এই নির্দিষ্ট বয়ক্রম থেকে একদিন অতিবাহিত হলে একদিন হ্রাস পায়, দু'দিন অতিবাহিত হলে দু'দিন হ্রাস পায়। এমনিভাবে প্রতিটি দিন ও প্রতিটি নিঃশ্বাস তার জীবনকে হ্রাস করতে থাকে। এই তফসীর শা'বী, ইবনে জুবায়র, আবু মালিক, ইবনে আতিয়্যা ও সুদ্দী থেকে বর্ণিত আছে। —(রূহুল মা'আনী) এ বিষয়বস্তুটি নিম্নোক্ত কবিতায় ব্যক্ত করা হয়েছে:

حياتك انفاس تعد فكلما . مضى نفس منها انتقصت به جزء

অর্থাৎ তোমার জীবন গুণাগুনতি কয়েকটি নিঃশ্বাসের নাম। কাজেই যখনই একটি শ্বাস বিগত হয়ে যায়, জীবনের একটি অংশ হ্রাস পায়।

এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে ইমাম নাসাঈ বর্ণিত হযরত আনাস ইবনে মালিকের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, من سره ان يبسط له فى رزقه وينسأ فى اثره فليصل رحمه "যে ব্যক্তি চায় যে তার রিযিক প্রশস্ত ও জীবন দীর্ঘ হোক তার উচিত আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সদ্ব্যবহার করা।" বুখারী, মুসলিম ও আবু দাউদেও এই হাদীস বর্ণিত আছে। এই হাদীস থেকে বাহ্যত জানা যায় যে,

আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহারের ফলে জীবন দীর্ঘ হয়। কিন্তু অপর এক হাদীস এর উদ্দেশ্য পরিষ্কার করে দিয়েছে। হাদীসটি এই ঃ

ঃ ইবনে আবী হাতেমের রেওয়ায়েতে হযরত আবুদ্দারদা (রা) বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাথে এ বিষয়ে আলোচনা করলে তিনি বলেন, (বয়স তো আল্লাহ্ তা'আলার কাছে একই বলে নির্দিষ্ট ও অবধারিত) নির্দিষ্ট সে মেয়াদ পূর্ণ হয়ে গেলে কাউকে এক মুহূর্তও অবকাশ দেওয়া হয় না। তবে জীবন দীর্ঘ হওয়ার অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে সৎকর্মপরায়ণ সন্তান-সন্ততি দান করেন। তারা সে ব্যক্তির জন্য দোয়া করতে থাকে। সে না থাকলেও কবরে তাদের দোয়া পেতে থাকে। (অর্থাৎ মৃত্যুর পরও সে জীবিতাবস্থার ন্যায় ফায়দা লাভ করতে থাকে। ফলে তার বয়স যেন বেড়ে গেল। ইবনে কাসীর উভয় রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন।) সারকথা, যে সব হাদীসে কোন কোন কর্ম সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এগুলো সম্পাদন করলে বয়স বেড়ে যায়, সেগুলোর অর্থ বয়সের বরকত ও কল্যাণ বৃদ্ধি পাওয়া।

—وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُوْنَ لَحْمًا طَرِيًّا وَّتَسْتَخْرِجُوْنَ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا

অর্থাৎ লোনা ও মিঠা উভয় দরিয়া থেকে তোমরা তাজা গোশত অর্থাৎ মৎস্য খাওয়ার জন্য পাও। আয়াতে মৎস্যকে গোশত বলে অভিহিত করার মধ্যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, মৎস্য আপনা-আপনি হালাল গোশত—একে যবেহ্ করার প্রয়োজন হয় না। স্থল-ভাগের অন্যান্য জন্তু এর বিপরীত। সেগুলো যবেহ্ না করা পর্যন্ত হালাল হয় না। মাছের বেলায় এটা শর্ত নয় বিধায় তা যেন তৈরি গোশত। শব্দের অর্থ গয়না। এখানে মোতি বোঝানো হয়েছে। আয়াত থেকে জানা গেল যে, মোতি যেমন লোনা দরিয়ায় পাওয়া যায় তেমনি মিঠা দরিয়াতেও পাওয়া যায়। অথচ প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত মত এই যে, মোতি লোনা দরিয়াতেই উৎপন্ন হয়। সত্য এই যে, উভয় প্রকার দরিয়াতে মোতি উৎপন্ন হয়। কোরআনের ভাষা থেকে তাই জানা যায়। তবে মিঠা দরিয়াতে কম এবং লোনা দরিয়াতে অনেক বেশি উৎপন্ন হয়। এতেই খ্যাত হয়ে গেছে যে, মোতি কেবল লোনা দরিয়াতেই পাওয়া যায়।

تَلْبَسُوْنَهَا শব্দে পুংলিঙ্গ ব্যবহৃত হওয়ায় ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, মোতি ব্যব-হার করা পুরুষদের জন্যও জায়েয। কিন্তু স্বর্ণ-রৌপ্য অলংকাররূপে ব্যবহার করা পুরুষ-দের জন্য জায়েয নয়।—(রূহুল মা'আনী)

—اِنْ تَدْعُوْهُمْ لَا يَسْمَعُوْا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوْا مَا اسْتَجَابُوْا لَكُمْ

অর্থাৎ তোমরা যে সমস্ত মূর্তি, কতক নবী ও ফেরেশতার পূজা কর; বিপদ মুহূর্তে

তাদেরকে আহবান করলে প্রথমত তারা শুনতেই পারবে না। কেননা মূর্তির মধ্যে শ্রবণের যোগ্যতাই নেই। নবী ও ফেরেশতাগণের মধ্যে যোগ্যতা থাকলেও তারা সর্বত্র বিদ্য-মান নয় এবং প্রত্যেকের কথা শুনে না। অতপর বলা হয়েছে, ফেরেশতা ও নবী যদি ধরে নেওয়ার পর্যায়ে শুনেও, তবে তারা তোমাদের আবেদন পূর্ণ করার ক্ষমতা রাখে না। আল্লাহ্ তা'আলার অনুমতি ব্যতিরেকে তারা তাঁর কাছে কারও জন্য সুপারিশও করতে পারে না।

মৃতদের শ্রবণ সম্পর্কিত আলোচনা পূর্বে হয়ে গেছে। আলোচ্য আয়াত তার পক্ষেও নয়---বিপক্ষেও নয়। সূরা রূমে এই আলোচনার বিস্তারিত প্রমাণাদি বর্ণিত হয়েছে।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِىُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿١٥﴾
إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿١٦﴾ وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزٍ ﴿١٧﴾
وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا
يُحْمَلْ مِنْهُ شَىْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰٓ ۗ إِنَّمَا تُنذِرُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ
رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ ۚ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِۦ ۚ
وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿١٨﴾ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ﴿١٩﴾ وَلَا
ٱلظُّلُمَٰتُ وَلَا ٱلنُّورُ ﴿٢٠﴾ وَلَا ٱلظِّلُّ وَلَا ٱلْحَرُورُ ﴿٢١﴾ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَحْيَآءُ
وَلَا ٱلْأَمْوَٰتُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَآءُ ۖ وَمَآ أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِى
ٱلْقُبُورِ ﴿٢٢﴾ إِنْ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ ﴿٢٣﴾ إِنَّآ أَرْسَلْنَٰكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۚ
وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴿٢٤﴾ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ
ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَٰتِ وَبِٱلزُّبُرِ وَبِٱلْكِتَٰبِ ٱلْمُنِيرِ ﴿٢٥﴾
ثُمَّ أَخَذْتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿٢٦﴾

(১৫) হে মানুষ, তোমরা আল্লাহ্র গলগ্রহ। আর আল্লাহ্; তিনি অভাবমুক্ত, প্রশংসিত। (১৬) তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে বিলুপ্ত করে এক নতুন সৃষ্টির উদ্ভব করবেন। (১৭) এটা আল্লাহ্র পক্ষে কঠিন নয়। (১৮) কেউ অপরের বোঝা বহন করবে না। কেউ যদি তার গুরুভার বহন করতে অন্যকে আহবান করে কেউ তা বহন করবে না---যদি সে নিকটবর্তী আত্মীয়ও হয়। আপনি কেবল তাদেরকে সতর্ক করেন, যারা তাদের পালনকর্তাকে না দেখেও ভয় করে এবং নামায কায়েম করে। যে কেউ নিজের সংশোধন করে, সে সংশোধন করে, কল্যাণের জন্য। আল্লাহ্র নিকটই সকলের প্রত্যাবর্তন। (১৯) দৃষ্টিমান ও দৃষ্টিহীন সমান নয়। (২০) সমান নয় অন্ধকার ও আলো। (২১) সমান নয় ছায়া ও তপ্তরোদ। (২২) আরও সমান নয় জীবিত ও মৃত। আল্লাহ্ শ্রবণ করান যাকে ইচ্ছা। আপনি কবরে শায়িতদেরকে শুনাতে সক্ষম নন। (২৩) আপনি তো কেবল একজন সতর্ককারী। (২৪) আমি আপনাকে সত্যধর্মসহ পাঠিয়েছি সংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে। এমন কোন সম্প্রদায় নেই যাতে সতর্ককারী আসেনি। (২৫) তারা যদি আপনার প্রতি মিথ্যারোপ করে, তাদের পূর্ববর্তীরাও মিথ্যারোপ করেছিল। তাদের কাছে তাদের রসূলগণ স্পষ্ট নিদর্শন, সহীফা এবং উজ্জ্বল কিতাবসহ এসেছিলেন। (২৬) অতপর আমি কাফিরদেরকে ধৃত করেছিলাম। কেমন ছিল আমার আযাব।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে মানুষ, তোমরা আল্লাহ্র গলগ্রহ। আর আল্লাহ্, তিনি (যে) অভাবমুক্ত, (এবং স্বয়ং) যাবতীয় সৌন্দর্যমণ্ডিত। (সুতরাং তোমাদের মুখাপেক্ষিতা দেখে তোমাদেরকে তওহীদ ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। তোমরা তা না মানলে নিজেদেরই ক্ষতি করবে। আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় সত্তার দিক দিয়ে অভাবমুক্ত ও স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার কারণে তোমাদের অথবা তোমাদের কর্মের মুখাপেক্ষী নন। কাজেই তাঁর কোন ক্ষতির আশংকা নেই। কুফরের কারণে যে ক্ষতি হওয়ার আশংকা রয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলা এ মুহূর্তেই তাও দূর করতে সক্ষম। সেমতে) তিনি ইচ্ছা করলে (কুফরের শাস্তিস্বরূপ) তোমাদেরকে বিলুপ্ত করে দেবেন এবং এক নতুন সৃষ্টির উদ্ভব করবেন, (যারা তোমাদের মত কুফর করবে না)। এটা আল্লাহ্র জন্য কঠিন নয়। (কিন্তু বিশেষ কল্যাণের লক্ষ্যে অবকাশ দিয়ে রেখেছেন। মোটকথা, এখানকার অকল্যাণ কেবল সম্ভাবনারই পর্যায়ভুক্ত। কিন্তু কিয়ামতে তা অবশ্যই সংঘটিত হবে। তখন অবস্থা দাঁড়াবে এই যে, কেউ অপরের (পাপের) বোঝা বহন করবে না। (নিজে তো কেউ কারও প্রতি লক্ষ্য করবেই না, এমন কি) যদি কেউ তার (পাপের) গুরুভার বহন করতে অন্যকে আহবানও করে তবুও কেউ তা বহন করবে না যদিও সে (অর্থাৎ আহূত ব্যক্তি আহবানকারীর) নিকটাত্মীয় হয়। [তখন কুফর ও মন্দকর্মের পূর্ণ ক্ষতি নিজেকেই ভোগ করতে হবে। এই তো গেল অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারীদের প্রতি ভীতি প্রদর্শন। অতপর রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, আপনি তাদের অস্বীকৃতি

দেখে দুঃখ ও পরিতাপ করবেন না। তারা একদিন এর শাস্তি অবশ্যই ভোগ করবে।] আপনি কেবল তাদেরকে (ফলপ্রসূ) সতর্ক করেন, যারা তাদের পালনকর্তাকে না দেখে ভয় করে এবং নামায কায়েম করে। (অর্থাৎ মু'মিনগণ। আপনার সতর্কীকরণে তারাই উপকৃত হয় উপস্থিত ক্ষেত্রে অথবা ভবিষ্যতের দিক দিয়ে। উদ্দেশ্য এই যে, সত্যান্বেষী ব্যক্তিই লাভবান হয়। যারা সত্যান্বেষী নয়, তাদের কাছ থেকে উপকার আশা করবেন না। আপনি তাদের কুফরের কারণে এত দুঃখ করেন কেন,) যে ব্যক্তি (বিশ্বাস স্থাপন করে শিরক ও কুফর থেকে) নিজেকে সংশোধন করে, সে নিজের (উপকারের) জন্যই সংশোধন করে। (আর যে বিশ্বাস স্থাপন করে না, সে পরকালে দুর্দশা ভোগ করবে। কেননা) আল্লাহ্র নিকটই সকলের প্রত্যাবর্তন। (সুতরাং উপকার হলে তাদেরই হবে। আপনি কেন দুঃখ করেন ? কাফিরদের জ্ঞান ও উপলব্ধি মু'মিনদের মত হোক, মু'মিনদের মত তারাও সত্য গ্রহণ করুক এবং সত্য গ্রহণের পারলৌকিক ফলাফলে তারাও শরীক হোক---তাদের কাছ থেকে এমন আশা করা বৃথা। কেননা সত্য দর্শনে মু'মিনগণের দৃষ্টান্ত চক্ষুষ্মানদের ন্যায়, আর সত্য উপলব্ধি না করার ব্যাপারে কাফিরদের উদাহরণ অন্ধের ন্যায়। অনুরূপভাবে মু'মিনের অবলম্বিত পথের দৃষ্টান্ত আলোর ন্যায়; আর কাফিরের অবলম্বিত পথের দৃষ্টান্ত অন্ধকারের ন্যায়। যেমন, আল্লাহ্ বলেন : وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا মনিভাবে ঈমানের ফলস্বরূপ অর্জিত জান্নাত ইত্যাদির উদাহরণ সুশীতল ছায়ার মত এবং কুফরের ফলস্বরূপ অর্জিত জাহান্নাম প্রভৃতির উদাহরণ প্রখর রৌদ্রের ন্যায়; যেমন আল্লাহ্ বলেন, ظِلٌّ مَمْدُودٌ -- فِي سَمُومٍ বলা বাহুল্য,) অন্ধ ও চক্ষুষ্মান সমান নয়, অন্ধকার ও আলো সমান নয় এবং ছায়া ও রৌদ্র সমান নয়। (কাজেই তাদের ও মু'মিনদের জ্ঞান ও উপলব্ধি সমান হবে না। এবং তাদের পথ ও ফলাফলও সমান হবে না। মু'মিন ও কাফিরের মধ্যে তফাৎ জীবিত ও মৃতের ন্যায়। সুতরাং তারা সমান নয় কথাটি এভাবেও ব্যক্ত করা যায় যে,) জীবিত ও মৃত সমান নয়। (তারা যখন মৃত, তখন মৃতকে জীবিত করা আল্লাহ্র কাজ; বান্দার কাজ নয়। অতএব, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে হিদায়ত করলে তা ভিন্ন কথা। কেননা) আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা শ্রবণ করান। (আপনার চেষ্টায় তারা সত্য গ্রহণ করবে না। কেননা তারা মৃতের মত। আর) আপনি কবরস্থদেরকে শোনাতে সক্ষম নন। (কিন্তু তারা না মানলে) আপনি দুঃখ করবেন না। কেননা আপনি তো (কাফিরদের জন্য) কেবল সতর্ককারী। (তারা মেনেও নিক, এটা আপনার দায়িত্ব নয়। আপনার সতর্ক করা নিজের পক্ষ থেকে নয়, যেমন কাফিররা বলত; বরং আমার পক্ষ থেকে। কেননা) আমিই আপনাকে সত্যধর্মসহ

(মুসলমানদের জন্য) সুসংবাদ দাতা এবং (কাফিরদের জন্য) সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি। (এ প্রেরণও কোন অভিনব বিষয় নয়, যেমন কাফিররা বলত। বরং) এমন কোন সম্প্রদায় নেই, যাদের মধ্যে কোন সতর্ককারী হয়নি। তারা যদি আপনার প্রতি মিথ্যারোপ করে, তবে (আপনি কাফিরদের সাথে অতীত পয়গম্বরগণের ব্যাপার স্মরণ করে মনকে সান্ত্বনা দিন। কেননা) তাদের পূর্ববর্তীরাও (সমসাময়িক পয়গম্বরগণের প্রতি) মিথ্যারোপ করেছিল। তাদের কাছেও তাদের রসূলগণ স্পষ্ট মু'জিযা, সহীফা ও উজ্জ্বল কিতাবসহ আগমন করেছিল। (অর্থাৎ কেউ সহীফা, কেউ বড় গ্রন্থ এবং কেউ শুধু নবুয়ত সত্যায়নের জন্য মু'জিযাসহ আগমন করেছিল। বিধিবিধান পূর্বেই পয়গম্বরগণ এনেছিলেন।) অতপর (তারা যখন মিথ্যারোপ করল, তখন) আমি কাফিরদেরকে ধৃত করেছি। (দেখ,) কিরূপ ছিল আমার আযাব ! (এমনিভাবে সময় এলে তাদেরকে শাস্তি দেব।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ أُخْرَىٰ — অর্থাৎ কিয়ামতের দিন কোন মানুষ অন্য মানুষের পাপভার বহন করতে পারবে না। প্রত্যেককে নিজের বোঝা নিজেই বহন করতে হবে। সূরা আনকাবুতে বলা হয়েছে ঃ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ——অর্থাৎ যারা পথভ্রষ্ট করে, তারা নিজেদের পথভ্রষ্টতার বোঝাও বহন করবে এবং তৎসহ তাদের বোঝাও বহন করবে, যাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল। এর অর্থ এমন নয় যে, যাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল, তাদের বোঝা তারা কিছুটা হালকা করে দেবে; বরং তাদের বোঝা তাদের উপর পুরোপুরিই থাকবে। কিন্তু পথভ্রষ্টকারীদের অপরাধ দ্বিগুণ হওয়ার কারণে তাদের বোঝাও দ্বিগুণ হয়ে যাবে——একটি পথভ্রষ্ট হওয়ার ও অপরটি পথভ্রষ্ট করার। অতএব উভয় আয়াতে কোন বৈপরীত্য নেই।

হযরত ইকরিমা উল্লিখিত আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে বলেন, সেদিন এক পিতা তার পুত্রকে বলবে, তুমি জান যে, আমি তোমার প্রতি কেমন স্নেহশীল ও সদয় পিতা ছিলাম। পুত্র স্বীকার করে বলবে, নিশ্চয় আপনার ঋণ অসংখ্য। আমার জন্য পৃথিবীতে অনেক কষ্ট সহ্য করেছেন। অতপর পিতা বলবে, বৎস আজ আমি তোমার মুখাপেক্ষী। তোমার পুণ্যসমূহের মধ্য থেকে আমাকে যৎসামান্য দিয়ে দাও এতে আমার মুক্তি হয়ে যাবে। পুত্র বলবে, পিতা আপনি সামান্য বস্তুই চেয়েছেন——কিন্তু আমি কি করব, যদি আমি তা আপনাকে দিয়ে দেই, তবে আমারও যে সে অবস্থা হবে। অতএব আমি অক্ষম। অতপর সে তার সহধর্মিনীকেও এই কথা বলবে যে, দুনিয়াতে আমি

তোমার জন্য সবকিছু বিসর্জন দিয়েছি। আজ তোমার সামান্য পুণ্য আমি চাই। তা দিয়ে দাও। সহধর্মিনীও পুত্রের অনুরূপ জওয়াব দেবে।

হযরত ইকরিমা বলেন, لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ বাক্যের অর্থ তাই। কোরআন পাক একাধিক আয়াতে এ বিষয়টি বর্ণনা করেছে। এক আয়াতে বলা হয়েছে : لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا—অর্থাৎ সেদিন কোন পিতা তার পুত্রকে আযাব থেকে রক্ষা করতে পারবে না এবং কোন পুত্র পিতাকে বাঁচাতে পারবে না। উদ্দেশ্য এই যে, কেউ অপরের পাপভার নিজে বহন করে তাকে বাঁচাতে পারবে না। তবে সুপারিশের ব্যাপারটি এ থেকে ভিন্ন। অনুরূপভাবে অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে : يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ—অর্থাৎ সেদিন মানুষ তার ভ্রাতা, মাতা, পিতা, পত্নী ও সন্তান-সন্ততির কাছ থেকে পালাতে থাকবে। পালানো অর্থ এই যে, সে আশংকা করবে, না জানি কোথাও তারা তাদের পাপভার তার উপর চাপিয়ে দেয় অথবা কোন পুণ্য চেয়ে বসে। ---(ইবনে কাসীর)

وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ—এ আয়াতের শুরুতে কাফিরদেরকে মৃতদের সাথে এবং মু'মিনগণকে জীবিতদের সাথে তুলনা করা হয়েছে। এরই সাথে সামঞ্জস্য রেখে مَّن فِي الْقُبُورِ (কবরস্থ লোক)-এর অর্থ হবে কাফির। উদ্দেশ্য এই যে, আপনি যেমন মৃতদেরকে শোনাতে পারেন না, তেমনি এই জীবিত কাফিরদেরও বোঝাতে পারবেন না।

এ আয়াত পরিষ্কার করে দিয়েছে যে, এখানে শ্রবণ করানোর অর্থ উপকারী ও কার্যকররূপে শোনানো। নতুবা সাধারণভাবে কাফিরদেরকে সর্বদাই শোনানো হত। রসূলুল্লাহ্ (সা) যা প্রচার করতেন, তা তারা শুনত। তাই আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আপনি মৃতদেরকে হক কথা শুনিয়ে যেমন সৎপথে আনতে পারেন না। কারণ, তারা পরকালে চলে গেছে, সেখানে ঈমানের স্বীকারোক্তি ধর্তব্য নয়---তেমনি কাফিরদেরকেও সৎপথে আনা সম্ভবপর নয়। এতে প্রমাণিত হল যে, আয়াতে "মৃতদেরকে শোনাতে পারবেন না" বলে ফলপ্রসূ শোনানো বোঝানো হয়েছে, যার কারণে শ্রোতা মিথ্যাপথ ত্যাগ করে সৎপথ অবলম্বন করে। এতে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, মৃতদেরকে শোনানো সম্পর্কিত আলোচনার সাথে এই আয়াতের কোন সম্পর্ক নেই। মৃতরা জীবিতদের কথা

শুনে কিনা, তা পৃথক বিষয় এবং এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সূরা রূম ও সূরা নমলে করা হয়েছে।

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا ۚ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ﴿٢٧﴾ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَٰلِكَ ۗ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴿٢٨﴾

---

(২৭) তুমি কি দেখনি আল্লাহ্ আকাশ থেকে বৃষ্টিবর্ষণ করেন, অতপর তদ্দ্বারা আমি বিভিন্ন বর্ণের ফলমূল উদগত করি। পর্বতসমূহের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন বর্ণের গিরিপথ—সাদা, লাল ও নিকষ কালো কৃষ্ণ; (২৮) অনুরূপভাবে বিভিন্ন বর্ণের মানুষ, জন্তু চতুষ্পদ প্রাণী রয়েছে। আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে জ্ঞানীরাই কেবল তাঁকে ভয় করে। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরাক্রমশীল ক্ষমাময়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(হে সম্বোধিত ব্যক্তি)। তুমি কি লক্ষ্য করনি, আল্লাহ্ আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন, অতপর আমি পানি দ্বারা বিভিন্ন বর্ণের ফলমূল উদ্গত করেছি (তা একই রকম হোক অথবা বিভিন্ন প্রকারের ফল বিভিন্ন বর্ণের।) পাহাড়সমূহেরও বিভিন্ন বর্ণের অংশ রয়েছে, তন্মধ্যে কিছু সাদা, কিছু লাল (অতপর শুভ্র ও লোহিতেরও) বিভিন্ন বর্ণ রয়েছে (কতক খুব শুভ্র ও খুব লাল, কতক হালকা শুভ্র ও হালকা লাল) এবং (কতক না শুভ্র না লাল ; বরং) গভীর কাল। এমনিভাবে কতক মানুষ জীবজন্তু ও বিচিত্র বর্ণের চতুষ্পদ প্রাণীও রয়েছে। কখনও বিভিন্ন প্রকারে বিভিন্ন বর্ণ হয় এবং কোন সময় একই প্রকারে বিভিন্ন বর্ণ হয়। যারা কুদরতের দলীলাদি সম্পর্কে চিন্তা করে, তারা আল্লাহ্র মহিমা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে এবং) আল্লাহ্ তা'আলাকে সে সব বান্দাই ভয় করে, যারা (তাঁর মহিমা সম্পর্কে) জ্ঞান রাখে। (জ্ঞান যদি কেবল বিশ্বাসগত ও বুদ্ধিপ্রসূত হয়, তবে ভয়ও বিশ্বাসগত ও বুদ্ধিপ্রসূত থাকবে। আর যদি জ্ঞান হালের স্তরে উন্নত হয়, তবে ভয়ও হালের থাকবে। ফলে এর অন্যথা দেখলে স্বভাবগত ঘৃণা ও কষ্ট হবে।) বাস্তবিকই আল্লাহ্ (-কে ভয় করা জরুরী। কেননা তিনি) পরাক্রমশালী (সবকিছু করতে সক্ষম এবং নিজের স্বার্থেই ভয় করা জরুরী। কেননা যারা তাঁকে ভয় করে তিনি তাদের গোনাহ্) ক্ষমাকারী।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আয়াতসমূহের পূর্বাপর সম্পর্কঃ কেউ কেউ বলেন, এসব আয়াতে তওহীদের বিষয়বস্তুর দিকে প্রত্যাবর্তন করা হয়েছে এবং তা প্রাকৃতিক প্রমাণাদি দ্বারা প্রমাণ করা হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেন, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে মানুষের বিভিন্ন অবস্থা ও তার উপমা বর্ণনা প্রসঙ্গে---وما يستوى الاعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور---উদ্ধৃত করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহ সে বিষয়েরই বিশদ বিশ্লেষণ যে, সৃষ্ট বস্তুর পারস্পরিক পার্থক্য একটি সৃষ্টিগত ও স্বভাবগত ব্যাপার। এ পার্থক্য উদ্ভিদ ও জড়পদার্থের মধ্যেও বিদ্যমান এবং তা কেবল আকার ও বর্ণের মধ্যেই সীমিত নয়; বরং মন-মানসিকতার মধ্যেও রয়েছে।

ثَمَرٰتٍ مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُهَا ফলমূলের اختلاف الوان---তথা বর্ণ বৈচিত্র্যকে ব্যাকরণিক প্রকরণের দিক দিয়ে অবস্থাজ্ঞাপক বানিয়ে مختلفا শব্দটিকে منصوب উল্লেখ করা হয়েছে। অতপর পাহাড়, মানুষ, চতুষ্পদ প্রাণী ইত্যাদির اختلاف---তথা বর্ণ-বৈচিত্র্যকে صفت--এর আকারে مختلف অর্থাৎ, مرفوع বলা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত থাকতে পারে যে, ফলমূলের বর্ণ-বৈচিত্র্য এক অবস্থায় স্থির থাকে না---প্রতিনিয়তই পরিবর্তিত হতে থাকে। কিন্তু পাহাড়, মানুষ ও জীবজন্তুর বর্ণ সাধারণত অপরিবর্তিত থাকে।

আর পর্বতের ক্ষেত্রে جُدَدٌ বলা হয়েছে। جُدَدٌ শব্দটি جُدَّةٌ এর বহুবচন। এর প্রসিদ্ধ অর্থ ছোট গিরিপথ, যাকে جادة ও বলা হয়। কেউ কেউ جُدَّةٌ এর অর্থ নিয়েছেন অংশ বা খণ্ড। উভয় অবস্থার উদ্দেশ্য পাহাড়ের বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন বর্ণবিশিষ্ট হওয়া। এতে সর্বপ্রথম সাদা ও সর্বশেষে কাল রঙ উল্লেখ করা হয়েছে। মাঝখানে লাল উল্লেখ করে مُخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ বলা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত থাকতে পারে যে, দুনিয়াতে আসল বর্ণ দু'টি---সাদা ও কাল। অবশিষ্ট সব বর্ণ এ দুটির বিভিন্ন স্তরের সংমিশ্রণে গঠিত হয়।

كَذٰلِكَ اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে এখানে كَذٰلِكَ শব্দের পর বিরতি রয়েছে যা এ বিষয়ের আলামত যে, এটা পূর্ববর্তী বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ সৃষ্টবস্তুসমূহকে বিভিন্ন প্রকারে

ও বর্ণে প্রজ্ঞাসহকারে সৃষ্টি করা আল্লাহ্ তা'আলার অসীম শক্তি ও প্রজ্ঞার উজ্জ্বল নিদর্শন।

কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে বোঝা যায় যে, كَذَٰلِكَ শব্দের সম্পর্ক পরবর্তী বাক্যের সাথে। অর্থাৎ ফলমূল, পাহাড়, মানুষ ও জীবজন্তু সর্বদা বিভিন্ন রকম। কেউ এর সর্বোচ্চ মর্যাদা অর্জন করে এবং কেউ কম। এটা জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। যার জ্ঞান যে পর্যায়ের তার আল্লাহ্-ভীতিও সে পর্যায়ের হয়ে থাকে।---(রূহুল-মা'আনী)

পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ এতে নবী করীম (সা)-কে সান্ত্বনা দেওয়ার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছিল যে, আপনার সতর্কীকরণ ও প্রচারের উপকার তারাই লাভ করে, যারা না দেখে আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করে। এর সাথে সংগতি রেখে আলোচ্য إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ আয়াতে তাদের উল্লেখ করা হয়েছে, যারা আল্লাহ্ভীতি অর্জন করেছে। পূর্বে যেমন কাফির ও তাদের অবস্থা আলোচিত হয়েছে, তেমনি এখানে ওলী-আল্লাহ্গণের প্রসঙ্গ আলোচনা করা হয়েছে। انما শব্দটি আরবীতে সীমাবদ্ধতা বর্ণনা করার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। তাই এ বাক্যের বাহ্যিক অর্থ এই যে, কেবল আলিম ও জ্ঞানিগণই আল্লাহ্কে ভয় করে। কিন্তু ইবনে আতিয়্যা প্রমুখ তফসীরবিদ বলেন, انما শব্দটি যেমন সীমাবদ্ধতার অর্থ প্রকাশ করে তেমনি কারও বৈশিষ্ট্য বর্ণনায়ও এটি ব্যবহৃত হয়। এখানে তাই বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ্ভীতি আলিমগণের বিশেষ ও অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। সুতরাং যে আলিম নয় তার মধ্যে আল্লাহ্ভীতি না থাকা জরুরী হয় না।---(বাহরে-মুহীত, আবু হাইয়ান)

আয়াতে علماء বলে এমন লোক বোঝানো হয়েছে, যারা আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে সম্যক অবগত এবং পৃথিবীর সৃষ্টবস্তু সামগ্রী, তার পরিবর্তন-পরিবর্ধন ও আল্লাহ্র দয়া-করুণা নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করেন। কেবল আরবী ভাষা, ব্যাকরণ-অলংকারাদি সম্পর্কে জ্ঞানী ব্যক্তিকেই কোরআনের পরিভাষায় আলিম বলা হয় না, যে পর্যন্ত সে আল্লাহ্র মারেফত উপরোক্তরূপে অর্জন না করে।

এ আয়াতে তফসীর প্রসঙ্গে হাসান বসরী (র) বলেন, সে ব্যক্তিই আলিম যে একান্তে ও জনসমক্ষে আল্লাহ্কে ভয় করে, আল্লাহ্ যা পছন্দ করেন, তা কামনা করে এবং আল্লাহ্ যা অপছন্দ করেন, সে তাকে ঘৃণা করে।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা) বলেন,

ليس العلم بكثرة الحديث و لكن العلم بكثرة الخشية — অর্থাৎ অনেক হাদীস মুখস্থ করে নেওয়া অথবা অনেক কথা বলা ইল্ম নয় বরং সে জ্ঞানই ইল্ম যা আল্লাহ্র ভয়সমৃদ্ধ।

সারকথা, যার মধ্যে যে পরিমাণ আল্লাহ্‌ভীতি হবে, সে সেই পরিমাণ আলিম হবে। আহমদ ইবনে সালেহ্ মিসরী বলেন, অধিক রেওয়ায়েত ও অধিক জ্ঞান দ্বারা আল্লাহ্‌ভীতির পরিচয় পাওয়া যায় না ; বরং কোরআন ও সুন্নাহ্‌র অনুসরণ দ্বারা এর পরিচয় পাওয়া যায়।---(ইবনে-কাসীর)

শায়খ শিহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দি (র) বলেন---এ আয়াতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, যার মধ্যে আল্লাহ্‌ভীতি নেই, সে আলিম নয়।---(মাযহারী)

প্রাচীন মনীষিগণের উক্তির মধ্যেও এর সমর্থন পাওয়া যায়।

হযরত রবী' ইবনে আনাস (রা) বলেন : من لم يخش فليس بعا لم অর্থাৎ যে আল্লাহ্‌কে ভয় করে না, সে আলিম নয়। মুজাহিদ (র) বলেন : انما العا لم من خشى الله ---অর্থাৎ কেবল সে-ই আলিম, যে আল্লাহ্‌কে ভয় করে।

সাদ ইবনে ইবরাহীমকে কেউ জিজ্ঞাসা করল, মদীনায় সর্বাধিক আলিম কে? তিনি বললেন, اتقا هم لربه. অর্থাৎ যে তার পালনকর্তাকে সর্বাধিক ভয় করে।

হযরত আলী মুর্তযা (রা) ফকীহ্ ও আলিমের সংজ্ঞা নিম্নরূপ নির্ধারণ করেছেন :

ان الفقيه حق الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله ولم يرخص لهم فى معاصى الله تعالى ولم يؤمنهم من عذاب الله تعالى ولم يدع القران رغبة عنه الى غيره انه لاخير فى عبادة لا علم فيها ولا علم لافقه فيه ولا قراءة لا تدبر فيها -

অর্থাৎ পূর্ণ ফকীহ্ সে ব্যক্তি, যে মানুষকে আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ করে না, তাদেরকে গোনাহ্ করার অনুমতি দেয় না, আল্লাহ্‌র আযাব থেকে নিশ্চিন্ত করে না এবং কোরআন পরিত্যাগ করে অন্য কোন বিষয়ের প্রতি উৎসাহিতও করে না। তিনি আরও বলেন, ইলম ব্যতীত ইবাদতে কোন কল্যাণ নেই, ফেকাহ্ ব্যতীত ইলমের কোন কল্যাণ নেই এবং নিবিষ্টতা ব্যতিরেকে কোরআন পাঠ করার মধ্যেও কোন কল্যাণ নেই। ---(কুরতুবী)

আল্লাহ্‌র ভয় নেই ; এমনও তো অনেক আলিম দেখা যায়---উপরোক্ত বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে এরূপ বলার আর অবকাশ নেই। কেননা উপরের বর্ণনা থেকে জানা গেল যে, আল্লাহ্‌র কাছে কেবল আরবী জানার নাম ইলম এবং যে তা জানে তার নাম আলিম নয়। যার মধ্যে আল্লাহ্‌র ভয় নেই, কোরআনের পরিভাষায় সে আলিমই নয়। তবে এই ভয় কোন সময় কেবল বিশ্বাসগত ও যৌক্তিক হয়ে থাকে। এর কারণে মানুষ নিজের উপর জোর দিয়ে শরীয়তের বিধিনিষেধ পালন করে। আবার কখনও এই ভয় বদ্ধমূল অভ্যাসের পর্যায়ে পৌঁছে যায়। এ পর্যায়ে শরীয়তের অনুসরণ মজ্জাগত

ব্যাপার হয়ে যায়। এই দুই স্তরের ভয়ের মধ্যে প্রথমটি অবলম্বন করার আদেশ দেওয়া হয়েছে এবং এটা আলিমের জন্য জরুরী। দ্বিতীয়টি অবলম্বন করা উত্তম—জরুরী নয়। —(বয়ানুল-কোরআন)

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَٰبَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَٰرَةً لَّن تَبُورَ ﴿٢٩﴾ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِۦٓ ۚ إِنَّهُۥ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٣٠﴾ وَالَّذِىٓ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَٰبِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِۦ لَخَبِيرٌۢ بَصِيرٌ ﴿٣١﴾ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَٰبَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۖ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِۦ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌۢ بِالْخَيْرَٰتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴿٣٢﴾ جَنَّٰتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا ۖ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿٣٣﴾ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِىٓ أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ ۖ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٣٤﴾ الَّذِىٓ أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِۦ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ ﴿٣٥﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِى كُلَّ كَفُورٍ ﴿٣٦﴾ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَٰلِحًا غَيْرَ الَّذِى كُنَّا نَعْمَلُ ۚ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَآءَكُمُ النَّذِيرُ ۖ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِن نَّصِيرٍ ﴿٣٧﴾

---

(২৯) যারা আল্লাহ্‌র কিতাব পাঠ করে, নামায কায়েম করে এবং আমি যা দিয়েছি, তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারা এমন ব্যবসা আশা করে,

যাতে কখনও লোকসান হবে না। (৩০) পরিণামে তাদেরকে আল্লাহ্ তাদের সওয়াব পুরোপুরি দেবেন এবং নিজ অনুগ্রহে আরও বেশী দেবেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী। (৩১) আমি আপনার প্রতি যে কিতাব প্রত্যাদেশ করেছি, তা সত্য---পূর্ববর্তী কিতাবের সত্যায়নকারী। নিশ্চয় আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের ব্যাপারে সব জানেন, দেখেন। (৩২) অতপর আমি কিতাবের অধিকারী করেছি তাদেরকে যাদেরকে আমি আমার বান্দাদের মধ্য থেকে মনোনীত করেছি। তাদের কেউ কেউ নিজের প্রতি অত্যাচারী, কেউ মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহ্র নির্দেশক্রমে কল্যাণের পথে এগিয়ে গেছে। এটাই মহা অনুগ্রহ। (৩৩) তারা প্রবেশ করবে বসবাসের জান্নাতে। তথায় তারা স্বর্ণনির্মিত, মোতি খচিত কংকন দ্বারা অলংকৃত হবে। সেখানে তাদের পোশাক হবে রেশমের। (৩৪) আর তারা বলবে---সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র, যিনি আমাদের দুঃখ দূর করেছেন। নিশ্চয় আমাদের পালনকর্তা ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী। (৩৫) যিনি স্বীয় অনুগ্রহে আমাদেরকে বসবাসের গৃহে স্থান দিয়েছেন, তথায় কষ্ট আমাদেরকে স্পর্শ করে না এবং স্পর্শ করে না ক্লান্তি। (৩৬) আর যারা কাফির হয়েছে, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন। তাদেরকে মৃত্যুর আদেশও দেয়া হবে না যে, তারা মরে যাবে এবং তাদের থেকে তার শাস্তিও লাঘব করা হবে না। আমি প্রত্যেক অকৃতজ্ঞকে এ ভাবেই শাস্তি দিয়ে থাকি। (৩৭) সেখানে তারা আর্তচীৎকার করে বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা, বের করুন আমাদেরকে, আমরা সৎকাজ করব, পূর্বে যা করতাম, তা করব না। (আল্লাহ্ বলবেন,) আমি কি তোমাদেরকে এতটা বয়স দেইনি, যাতে যা চিন্তা করার বিষয় চিন্তা করতে পারতে? অথচ তাদের কাছে সতর্ককারীও আগমন করেছিল। অতএব আস্বাদন কর। জালিমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যারা আল্লাহ্র কিতাব (অর্থাৎ কোরআন কার্যকরভাবে) পাঠ করে এবং (বৈশিষ্ট্য ও নিয়মের সাথে) নামায কায়েম করে এবং আমি যা দিয়েছি, তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে (যথাসম্ভব) ব্যয় করে, তারা (আল্লাহ্র ওয়াদার কারণে) এমন (চির লাভজনক) ব্যবসার আশা করে, যাতে কখনও মন্দা দেখা দেবে না। (কেননা, এ ব্যবসায়ের ক্রেতা কোন সৃষ্টজীব নয়; যারা এক সময় সওদার মূল্য দেয় এবং এক সময় দেয় না; বরং এর খরিদ্দার স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা। তিনি অবশ্যই ওয়াদা অনুযায়ী আত্মস্বার্থের প্রেক্ষিতে নয়, বরং তাদের উপকারার্থেই এর মূল্য দেবেন।) পরিণামে তাদেরকে তাদের (কর্মের) সওয়াবও পুরোপুরি দেবেন (যা অতপর جَنّٰتُ عَدْنٍ ---আয়াতে বর্ণিত হবে) এবং (সওয়াব ব্যতীত) স্বীয় অনুগ্রহে আরও বেশী দেবেন। (উদাহরণত এক পুণ্যের দশগুণ বেশী সওয়াব দেবেন। যেমন

আল্লাহ্ বলেন---(مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا) নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল গুণগ্রাহী। (ফলে তাদের কর্মে ত্রুটি থাকলেও প্রতিদানের অতিরিক্ত পুরস্কারও দেবেন। কোরআন পাকের আদেশ মেনে চলার কারণে তারা এই সওয়াব ও অনুগ্রহ পাবে। কেন-না,) আমি আপনার প্রতি যে কিতাব (কোরআন) প্রত্যাদেশ করেছি, তা সম্পূর্ণ সত্য (এবং এ অর্থে) পূর্ববর্তী কিতাবের সত্যায়নকারী, (যে, সেগুলো মূলত আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই অবতীর্ণ, যদিও পরে বিকৃত হয়ে গেছে। মোটকথা, কোরআন সর্বতোভাবে পূর্ণ। যেহেতু) আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদের (অবস্থার) পূর্ণ খবর রাখেন (ও তাদের কল্যাণের প্রতি) নযর রাখেন। (তাই এ সময়ে এরূপ কিতাব নাযিল করাই প্রজ্ঞার পরিচায়ক ছিল। পূর্ণ কিতাব পালনকারী পূর্ণ প্রতিদানেরই যোগ্য। আসল সওয়াব ও অতিরিক্ত অনুগ্রহ হচ্ছে এই পূর্ণ প্রতিদান। সুতরাং এই সওয়াব ও অনুগ্রহ পৌঁছানোর জন্য আমি এ কিতাব প্রথমে আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি) অতপর সে কিতাব এমন সব লোকের হাতে পৌঁছে দিচ্ছি যাদেরকে আমি আমার (সারা জাহানের) বান্দা-দের মধ্য থেকে (ঈমানের দিক দিয়ে) মনোনীত করেছি। (এর অর্থ মুসলিম সম্প্রদায়। তারা ঈমানের দিক দিয়ে সারা বিশ্বে আল্লাহ্ তা'আলার পছন্দনীয় যদিও তাদের কেউ কেউ কুকর্মের কারণে তিরস্কারযোগ্যও বটে। অর্থাৎ আমি মুসলমান-দেরকে কিতাবের অধিকারী করেছি।) অতপর (এই মনোনীত ব্যক্তিবর্গ তিনভাগে বিভক্ত---) তাদের কেউ তো (গোনাহ্ করে) নিজের প্রতি জুলুম করেছে, কেউ (গোনাহ্ও করে না এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত ইবাদতও করে না) মধ্যপন্থী এবং কেউ আল্লাহ্র তওফীকে কল্যাণকর কাজে এগিয়ে যায়। (অর্থাৎ গোনাহ্ থেকেও বেঁচে থাকে এবং ফরযের বাইরেও আমল করার হিম্মৎ করে। মোটকথা, আমি এই তিন রকম মুসলমানকে কিতাবের অধিকারী করেছি।) এটা (অর্থাৎ এমন পূর্ণ কিতাবের অধিকারী করা আল্লাহ্র) মহা অনুগ্রহ। (কারণ, এই কিতাব আমল করার দৌলতে তারা অত্যধিক পুরস্কার ও সওয়াবের যোগ্য হবে। অতপর এই পুরস্কার ও সওয়াব বর্ণিত হচ্ছে যে,) তা (অর্থাৎ পুরস্কার ও সওয়াব) বসবাসের জান্নাত, যাতে তারা প্রবেশ করবে। তথায় তারা স্বর্ণ নির্মিত ও মুক্তা খচিত কংকন দ্বারা অলংকৃত হবে। সেখানে তাদের পোশাক হবে রেশমের। তারা (সেখানে প্রবেশ করে) বলবে, আল্লাহ্র লাখ লাখ শোকর, যিনি (চিরতরে) আমাদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করেছেন। নিশ্চয় আমাদের পালনকর্তা অত্যন্ত ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী, যিনি স্বীয় অনুগ্রহে আমাদেরকে চিরকাল বসবাসের গৃহে স্থান দিয়েছেন, তথায় আমাদেরকে কোন কষ্ট স্পর্শ করবে না এবং ক্লান্তিও স্পর্শ করবে না। (এ হচ্ছে তাদের অবস্থা, যারা কিতাব মেনে চলে।) আর যারা (এর বিপরীতে) কাফির, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন। না তাদেরকে মৃত্যুর ফয়সালা দেওয়া হবে যাতে তারা মরে যাবে (এবং মরে মুক্তি পেয়ে যাবে) আর না তাদের থেকে জাহান্নামের শাস্তি লাঘব করা হবে। আমি প্রত্যেক কাফিরকে এমনি

শাস্তি দিয়ে থাকি। তারা সেখানে (অর্থাৎ জাহান্নামে পতিত অবস্থায়) আর্ত চিৎকার করে বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা আমাদেরকে (এখান থেকে) বের করুন। (এখন) আমরা ভাল (ভাল) কাজ করব, পূর্বে যা করতাম, তা করব না। (ইর-শাদ হবে,) আমি কি তোমাদেরকে এমন বয়স দেইনি, যাতে যার বোঝার, সে বোঝাতে পারতো? (কেবল বয়স দিয়েই শেষ করিনি ; বরং) তোমাদের কাছে (আমার পক্ষ থেকে) সতর্ককারী (পয়গম্বর) ও পৌঁছেছিল (প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে; কিন্তু তোমরা কোন কথা শুননি) অতএব (এখন সেই না শোনার) স্বাদ আস্বাদন কর, (এমন) জালিমদের (এখানে) কোন সাহায্যকারী নেই। (আমি তো অসন্তুষ্টির কারণে সাহায্য করব না। অন্যরা অক্ষমতার কারণে সাহায্য করবে না।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী এক আয়াতে আল্লাহ্ তত্ত্ব-জ্ঞানী হক্কানী আলিমগণের একটি বৈশিষ্ট্য —আল্লাহ্র প্রতি ভয় সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছিল। বিষয়টির সম্পর্ক অন্তরের সাথে। আলোচ্য প্রথম আয়াতে তাদেরই এমন কতিপয় গুণ-বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হচ্ছে, যেগুলোর সম্পর্ক দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে। অর্থাৎ এগুলো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে আদায় করা হয়। তন্মধ্যে প্রথম গুণ হচ্ছে তিলাওয়াতে-কোরআন। আয়াতে এমন লোকদেরকে বোঝানো হয়েছে, যারা নিয়মিতভাবে সর্বদা কোরআন তিলাওয়াত করে। مضارع পদবাচ্যে يَتْلُوْن ক্রিয়াপদটি এদিকেই ইঙ্গিত করে। কেউ কেউ এর আভিধানিক অর্থও নিয়েছেন। অর্থাৎ তারা ক্রিয়াকর্মে কোরআনের অনুসরণ করে। কিন্তু প্রথম অর্থই অগ্রগণ্য। তবে পূর্বাপর উদ্দেশ্য দৃষ্টে এটাও নির্দিষ্ট যে, সে তিলাওয়াত ধর্তব্য, যা কোরআন অনুসারে কর্ম সহকারে হয়। কিন্তু তিলাওয়াত শব্দটি প্রসিদ্ধ অর্থেই ধর্তব্য হবে। হযরত মুতাররিফ ইবনে আবদুল্লাহ্ (র) বলেন,—هٰذِهٖ اٰيَةُ الْقُرَّاءِ অর্থাৎ এ আয়াতটি ক্বারীগণের জন্য যারা কোরআন তেলাওয়াতকে জীবনের বৃত্তি হিসেবে গ্রহণ করে।

দ্বিতীয় গুণ নামায কায়েম করা এবং তৃতীয় গুণ আল্লাহ্র পথে অর্থ ব্যয় করা। এর সাথে 'গোপনে ও প্রকাশ্যে' বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, রিয়া থেকে আত্মরক্ষার জন্য অধিকাংশ ইবাদত গোপনে করাই উত্তম। কিন্তু ধর্মীয় উপযোগিতার কারণে মাঝে মাঝে প্রকাশ্যে করাও জরুরী হয়ে যায়। যেমন, মিনারে আযান দিয়ে অধিকতর লোক সমাগমের ব্যবস্থা করে জমাআতে নামায আদায় করার বিধান রয়েছে। এমনিভাবে অপরকে উৎসাহিত করার জন্য মাঝে মাঝে আল্লাহ্র পথে প্রকাশ্যে দান করা জরুরী হয়ে যায়। নামায ও আল্লাহ্র পথে ব্যয়ের ক্ষেত্রে ফিকাহ্‌বিদগণ বলেন, ফরয, ওয়া-জিব ও সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ হলে প্রকাশ্যে করা উত্তম। এছাড়া নফল নামায ও নফল ব্যয় গোপনে করাই বাঞ্ছনীয়।

যারা উপরোক্ত তিনটি গুণের অধিকারী, তাদের সম্পর্কে অতঃপর বলা হয়েছেঃ

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ — تَبُورَ শব্দটি بَوَارٌ থেকে উদ্ভূত। অর্থ বিনষ্ট হওয়া। আয়াতে অর্থ হচ্ছে যে, তারা এমন এক ব্যবসায়ের প্রার্থী, যাতে লোকসানের আশংকা নেই। প্রার্থী বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে দুনিয়াতে মু'মিনের জন্য কোন সৎকাজে সওয়াব সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার অবকাশ নেই। কেননা, পূর্ণ ক্ষমা ও বখশিশ কেবল মানুষের কর্মের বিনিময়েই সম্ভবপর নয়। মানুষ যত কর্মই করুক আল্লাহ্‌র মহিমা ও প্রাপ্য ইবাদতের পক্ষে তা যথেষ্ট হতে পারে না। কাজেই আল্লাহ্‌র কৃপা ও অনুগ্রহ ব্যতিরেকে কারও মাগফিরাত হবে না। এক হাদীসে তাই বলা হয়েছে। এছাড়া অনেক সৎকর্মে গোপন শয়তানী অথবা রিপুগত চক্রান্তও শামিল হয়ে যায়। ফলে সে সৎকর্ম কবুল হয় না। মাঝে মাঝে সৎকর্মের পাশাপাশি কোন মন্দ কর্মও হয়ে যায় যা সৎকর্ম কবুল হওয়ার পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। তাই আয়াতে يَرْجُونَ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যাবতীয় সৎকর্ম সম্পাদন করার পরও মুক্তি ও উচ্চ মর্যাদা লাভে বিশ্বাসী হওয়ার অধিকার কারও নেই---বেশীর চেয়ে বেশী আশাই করতে পারে।---(রূহুল-মা'আনী)

সৎকর্মের তুলনা ব্যবসায়ের সাথেঃ এ আয়াতে বর্ণিত সৎকর্মসমূহকে রূপক অর্থে ও উদাহরণস্বরূপ ব্যবসা বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। যেমন, অন্য এক আয়াতে ঈমান ও আল্লাহ্‌র পথে জিহাদকে ব্যবসা বলা হয়েছে। আয়াতটি এইঃ

هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ

সৎকর্মের তুলনা ব্যবসায়ের সাথে এ অর্থে যে, ব্যবসায়ী এ আশায় পুঁজি বিনিয়োগ করে যে, এতে তার পুঁজি বৃদ্ধি পাবে এবং মুনাফা অর্জিত হবে। কিন্তু দুনিয়ার প্রতিটি ব্যবসায়ে মুনাফার সাথে সাথে লোকসানেরও আশংকা থাকে। আলোচ্য আয়াতে ব্যবসায়ের সাথে لَّن تَبُورَ শব্দ যোগ করে ইশারা করা হয়েছে যে, পরকালের এই ব্যবসায়ে লোকসান ও ক্ষতির কোন আশংকা নেই। আল্লাহ্‌র সৎকর্মপরায়ণ বান্দাগণ সৎকর্মে কষ্ট ও শ্রম স্বীকার করে দুনিয়ার সাধারণ ব্যবসায়ের মত কোন ব্যবসা করে না, বরং তারা এমন এক ব্যবসায়ের প্রার্থী, যাতে কখনও লোকসান হয় না। 'তারা প্রার্থী'---একথা বলে সূক্ষ্ম ইঙ্গিত করা হয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলা সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা। তিনি প্রার্থীদেরকে নিরাশ করবেন না; বরং তাদের প্রার্থনা পূর্ণ করবেন। পরবর্তী বাক্যে আরও বলা হয়েছে যে, তাদের আশা তো কেবল কর্মের পূর্ণ প্রতিদান পাওয়া পর্যন্ত

সীমিত; কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় কৃপায় তাদের আশা অপেক্ষাও বেশি দান করবেন। বলা হয়েছে ঃ

لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ —এখানে لِيُوَفِّيَهُمْ শব্দটি لَنْ تَبُورَ শব্দের সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ তাদের ব্যবসায়ে লোকসান তো হবেই না, উপরন্তু আল্লাহ্ তাদের প্রতিদান ও সওয়াব পুরোপুরি দেওয়ার পরেও স্বীয় অনুগ্রহে তাদের ধারণাতীত অনেক বেশি দেবেন।

এই বেশির মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার সে ওয়াদাও অন্তর্ভুক্ত, যাতে বলা হয়েছে, মু'মিনের পুরস্কার আল্লাহ্ তা'আলা বহুগুণ বেশি দান করেন, যা কমপক্ষে কৃতকর্মের দশগুণ এবং বেশির পক্ষে সাতশ গুণ বরং যা তার চেয়েও বেশি। অন্যান্য পাপীর জন্য মু'মিনের সুপারিশ কবূল করাও এ অতিরিক্ত অনুগ্রহের শামিল। এ অনুগ্রহের তফসীর প্রসঙ্গে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা) রসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে বর্ণনা করেন যে, মু'মিনের প্রতি দুনিয়াতে যে ব্যক্তি অনুগ্রহ করেছিল, পরকালে মু'মিন তার জন্য সুপারিশ করবে। ফলে জাহান্নামের যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও মু'মিনের সুপারিশে সে মুক্তি পাবে।---(মাযহারী)

বলাবাহুল্য, সুপারিশ কেবল ঈমানদারের জন্য হতে পারবে, কাফিরের জন্য সুপারিশ করার অনুমতি কাউকে দেওয়া হবে না। এমনিভাবে জান্নাতে আল্লাহ্ তা'আলার দীদারও এ অতিরিক্ত অনুগ্রহের প্রধান অংশ।

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا —ثُمَّ অব্যয়টি পূর্বাপর সংযোগ স্থাপনের জন্য ব্যবহৃত হয়। ফলে বোঝা যায় পূর্বাপর উভয় বাক্য অভিন্নগুণ বিশিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও ধারাবাহিকতা রক্ষা করে। পূর্ববর্তী বাক্যের বিষয়বস্তু আগে এবং পরবর্তী বাক্যের বিষয়বস্তু পরে বোঝায়। অতপর এই আগপাছ কখনও কালের দিক দিয়ে এবং কখনও মর্যাদা ও স্তরের দিক দিয়েও হয়ে থাকে। এ আয়াতে ثُمَّ অব্যয় দ্বারা পূর্বের আয়াতে বর্ণিত أَوْحَيْنَا বাক্যের উপর عطف করা হয়েছে। অর্থ এই যে, আমি এই সত্য ও পূর্ববর্তী ঐশী কিতাবসমূহের সমর্থক কোরআন প্রথমে আপনার কাছে প্রত্যাদেশ করেছি। এরপর আমি আমার মনোনীত বান্দাদেরকেও এর অধিকারী করেছি। এখন এটা সুস্পষ্ট যে, কোরআন ওহীর মাধ্যমে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে প্রেরণ করা মর্যাদা ও স্তরের দিক দিয়ে অগ্রে এবং উম্মতে মুহাম্মদীকে দান করা পশ্চাতে হয়েছে। উম্মতকে কোরআনের অধিকারী করার অর্থ এও হতে পারে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) উম্মতের জন্য অর্থ-কড়ি ও বিষয়-সম্পত্তির উত্তরাধিকার রেখে যাওয়ার পরিবর্তে আল্লাহ্‌র কিতাব রেখে গেছেন। এক হাদীসেও সাক্ষ্য পাওয়া যায় যে, পয়গম্বর-

গণ দিরহাম ও দীনার উত্তরাধিকার রেখে যান না। তাঁরা উত্তরাধিকার স্বরূপ ইলম বা জ্ঞান রেখে যান। অন্য এক হাদীসে আলিম ও জ্ঞানীগণকে পয়গম্বরগণের উত্তরাধিকারী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এরূপ অর্থ নেওয়া হলে উপরোক্ত অগ্র-পশ্চাৎ কালের দিক দিয়েও হতে পারে। অর্থাৎ আমি এ কিতাব আপনাকে দান করেছি। অতপর আপনি তা উম্মতের জন্য উত্তরাধিকার স্বরূপ রেখেছেন। আয়াতে উত্তরাধিকারী করার অর্থ দান করা বোঝানো হয়েছে। একে উত্তরাধিকার শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, উত্তরাধিকারী ব্যক্তি যেমন কোন কর্ম ও চেষ্টা ব্যতিরেকেই উত্তরাধিকার স্বত্ব লাভ করে তেমনি কোরআন পাকের এই ধনও মনোনীত বান্দাদেরকে কোন কর্ম ও চেষ্টা ব্যতিরেকেই দান করা হয়েছে।

উম্মতে মুহাম্মদী বিশেষত আলিমগণের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ঃ اَلَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا অর্থাৎ আমার বান্দাদের মধ্য থেকে যাদেরকে আমি মনোনীত করেছি। অধিকাংশ তফসীরবিদ এর অর্থ নিয়েছেন উম্মতে মুহাম্মদী। এতে আলিমগণ প্রত্যক্ষভাবে এবং অন্যান্য মুসলমান আলিমগণের মধ্যস্থতায় এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে اَلَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا বলে উম্মতে মুহাম্মদীকে বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে তাঁর প্রত্যেকটি অবতীর্ণ কিতাবের উত্তরাধিকারী করেছেন। (অর্থাৎ কোরআন পূর্ববর্তী সমস্ত কিতাবের সমর্থক ও সংরক্ষক বিধায় সমস্ত ঐশীগ্রন্থের বিষয়বস্তুর সমষ্টি। এর উত্তরাধিকারী হওয়া যেন সমস্ত আসমানী কিতাবেরই উত্তরাধিকারী হওয়া।) অতপর হযরত ইবনে আব্বাস বলেন ঃ

فظالمهم يغفر له و مقتصد هم يحاسب حسابا يسيرا و سابقهم يدخل الجنة بغير حساب -

অর্থাৎ এ উম্মতের জালিমদেরকেও শেষ পর্যন্ত ক্ষমা করা হবে মধ্যপন্থীদের হিসাব সহজভাবে নেওয়া হবে, আর যারা সৎকর্মে অগ্রগামী তাদেরকে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে।----(ইবনে কাসীর)

আয়াতের اصْطَفَيْنَا শব্দ দ্বারা উম্মতে মুহাম্মদীর সর্ববৃহৎ শ্রেষ্ঠত্ব পরিস্ফুট হয়েছে। কেননা এ শব্দটি কোরআন পাকে পয়গম্বরগণের ক্ষেত্রে বেশির ভাগ ব্যবহৃত হয়েছে। এক আয়াতে আছে ঃ— اَللّٰهُ يَصْطَفِىْ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا وَّمِنَ النَّاسِ

অন্য এক আয়াতে আছে ঃ

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা উম্মতে মুহাম্মদীকে اصطفاء অর্থাৎ মনোনয়নে পয়গম্বরগণের সাথে শরীক করে দিয়েছেন। তবে মনোনয়নের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। পয়গম্বর ও ফেরেশতাগণের মনোনয়ন উচ্চস্তরে এবং উম্মতে মুহাম্মদীর মনোনয়ন এর পরের স্তরে হয়েছে।

উম্মতে মুহাম্মদী তিন প্রকার ঃ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ এই বাক্যটি প্রথমোক্ত বাক্যের ব্যাখ্যা। অর্থাৎ আমি যাদেরকে মনোনীত করে কোরআনের অধিকারী করেছি, তারা তিন প্রকার। জালিম, মধ্যপন্থী ও সৎকর্মে অগ্রগামী।

ইবনে কাসীর এই প্রকারত্রয়ের তফসীর এভাবে করেছেন ঃ জালিম সে ব্যক্তি যে কোন কোন ফরয ও ওয়াজিব কাজে ত্রুটি করে এবং কোন কোন নিষিদ্ধ কাজেও জড়িত হয়ে পড়ে। মধ্যপন্থী সে ব্যক্তি যে সমস্ত ফরয ও ওয়াজিব কর্ম সম্পাদন করে এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ কার্য থেকে বেঁচে থাকে ; কিন্তু মাঝে মাঝে কোন কোন মোস্তাহাব কাজ ছেড়ে দেয় এবং কোন কোন মকরূহ কাজে জড়িত হয়ে পড়ে। সৎকর্মে অগ্রগামী সে ব্যক্তি, যে যাবতীয় ফরয, ওয়াজিব ও মোস্তাহাব কর্ম সম্পাদন করে এবং যাবতীয় হারাম ও মকরূহ কর্ম থেকে বেঁচে থাকে ; কিন্তু কোন কোন মোবাহ্ বিষয় ইবাদতে ব্যাপৃত থাকার কারণে অথবা হারাম সন্দেহে ছেড়ে দেয়।---(ইবনে কাসীর)

অন্যান্য তফসীরবিদ এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন উক্তি বর্ণনা করেছেন। রূহুল মা'আনীতে তেতাল্লিশটি উক্তি উল্লিখিত রয়েছে। কিন্তু চিন্তা করলে দেখা যায়, অধিকাংশ উক্তির সারমর্ম তাই, যা উপরে ইবনে কাসীর থেকে বর্ণিত হয়েছে।

একটি সন্দেহ ও তার জওয়াব ঃ উল্লিখিত তফসীর থেকে প্রতীয়মান হয়ে গেল যে, জালিমও আল্লাহ্ তা'আলার মনোনীত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত। একে বাহ্যত অবাস্তব মনে করে কেউ কেউ বলেছেন যে, জালিম উম্মতে মুহাম্মদী ও মনোনীতদের অন্তর্ভুক্ত নয়। অথচ অনেক সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এ তিন প্রকার লোকই উম্মতে মুহাম্মদীর অন্তর্ভুক্ত এবং اصطفينا গুণের বাইরে নয়। এটি হল উম্মতে মুহাম্মদীর মু'মিন বান্দাদের চূড়ান্ত বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব। তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কার্যত ত্রুটিযুক্ত, সেও এই মর্যাদার অন্তর্ভুক্ত। ইবনে কাসীর এ প্রসঙ্গে এ সম্পর্কিত সমুদয় হাদীস সমাবেশ করেছেন। তন্মধ্যে কয়েকটি নিম্নে উদ্ধৃত করা হল।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) এ আয়াতের الذين اصطفينا —তে বর্ণিত তিনটি প্রকার সম্পর্কে বলেছেন যে, তারা সমস্ত একই স্তরভুক্ত এবং জান্নাতী।—(ইমাম আহমদ, ইবনে কাসীর)

অর্থাৎ মাগফিরাত সবারই হবে এবং সবাই জান্নাতে প্রবেশ করবে। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, মর্যাদার দিক দিয়ে একজন অপরজন থেকে শ্রেষ্ঠ হবে না।

ইবনে জরীর আবূ সাবেত থেকে বর্ণনা করেন যে, একদিন তিনি (আবূ সাবেত) মসজিদে পৌঁছে হযরত আবুদ্দারদাকে পূর্ব থেকে সেখানে অবস্থানরত দেখতে পান। তিনি তাঁর বরাবরে গিয়ে বসে যান এবং এই দোয়া করতে থাকেনঃ اللهم انس وحشتى وارحم غربتى ويسرلى جليسا صالحا —অর্থাৎ হে আল্লাহ্, আমার আন্তরিক পেরেশানী দূর করুন, আমার প্রবাসী অবস্থার প্রতি দয়া করুন এবং আমাকে একজন সৎকর্মপরায়ণ সহচর দান করুন। (এখানে লক্ষণীয় যে, পূর্ববর্তী বুযুর্গ-গণের মধ্যে সৎসঙ্গীর অন্বেষণ খুবই দরকারী বিষয় বলে গণ্য হত। তারা সৎসঙ্গীকে প্রধান লক্ষ্য ও যাবতীয় পেরেশানীর প্রতিকার মনে করে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে এর জন্য দোয়া করতেন।) আবুদ্দারদা (রা) এই দোয়া শুনে বললেন, আপনি এ দোয়া ও অন্বেষণে সাচ্চা হলে আমি এ ব্যাপারে আপনার চেয়ে অধিক ভাগ্যবান। (অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে আপনার মত সৎসঙ্গী চাওয়া ছাড়াই দান করেছেন।) তিনি আরও বললেন, আমি আপনাকে একটি হাদীস শুনাচ্ছি। যা আমি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মুখ থেকে শুনেছি। এ পর্যন্ত কারও কাছে বর্ণনা করার সুযোগ হয়নি। হাদীসটি এইঃ রসূলে করীম (সা) ثُمَّ اَوْرَثْنَا الْكِتٰبَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا আয়াতখানি তিলাওয়াত করে বলেছেন, এই তিন রকম লোকের মধ্যে সৎকর্মে অগ্রগামীরা বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে, মধ্যপন্থীদের কাছ থেকে হালকা হিসাব নেওয়া হবে এবং জালিম এস্থলে খুব দুঃখিত ও বিষণ্ণ হবে। অবশেষে সে-ও জান্নাতে প্রবেশাধিকার পেয়ে যাবে। ফলে তার দুঃখকষ্ট দূর হয়ে যাবে। তাই পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছেঃ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْٓ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ —অর্থাৎ তারা বলবে, আল্লাহ্র শোকর, যিনি আমাদের সমস্ত দুঃখ দূর করে দিয়েছেন।

তিবরানী বর্ণিত হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসঊদ (রা)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, وكلهم من هذه الامة অর্থাৎ এই তিন প্রকার লোকই হবে উম্মতে মুহাম্মদী থেকে।

আবূ দাউদ ওকবা ইবনে সাহবান হেনায়ী থেকে বর্ণনা করেন, তিনি হযরত আয়েশা (রা)-কে এই আয়াতের তফসীর জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন—বৎস! এ

তিন প্রকার লোকই জান্নাতী। তাদের মধ্যে অগ্রগামী তারা, যারা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র যমানায় প্রয়াত হয়ে গেছেন। তাদের জান্নাতী হওয়ার সাক্ষ্য স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সা) দিয়েছেন। মিতাচারী বা মধ্যপন্থী তারা, যারা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে পূর্ববর্তী-দের অনুসরণ করতে থাকবেন ও তাদের সাথে মিলিত হয়েছেন। অতপর আমাদের ও তোমাদের মত লোকেরা জালিমদের পর্যায়ে রয়ে গেছি।

বিনয়বশত হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) নিজেকে তৃতীয় স্তর অর্থাৎ জালিমের পর্যায়ে গণ্য করেছেন। নতুবা সহীহ্ হাদীসসমূহের বর্ণনা অনুযায়ী তিনি অগ্রগামীদের প্রথম সারির একজন।

ইবনে জরীর মুহাম্মদ ইবনে হানফিয়া (র) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন এ উম্মত রহমতপ্রাপ্ত উম্মত। এর জালিমও ক্ষমাপ্রাপ্ত। মিতাচারী জান্নাতী এবং সৎকাজে অগ্রগামী দল আল্লাহ্র কাছে উচ্চমর্যাদার অধিকারী।

মুহাম্মদ ইবনে আলী বাকের (রা) জালিমের তফসীরে বলেন: الذى خلط عملا صالحا و اخر سيئا ---অর্থাৎ যে ব্যক্তি সৎ-অসৎ উভয় কর্মে সংমিশ্রণ ঘটায় সে জালিম পর্যায়ভুক্ত।

উম্মতে মুহাম্মদীর আলিম সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠত্ব: আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, আমি আমার মনোনীত বান্দাদেরকে আমার কিতাবের উত্তরাধিকারী করেছি। বলাবাহুল্য, আল্লাহ্র কিতাব ও রসূল (সা)-এর শিক্ষার প্রত্যক্ষ উত্তরাধিকারী হচ্ছেন ওলামায়ে কিরাম। হাদীসেও বলা হয়েছে العلماء ورثة الانبياء-এর সারমর্ম এই যে, যারা কোরআন ও হাদীসের শিক্ষা প্রচারকে জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছেন এবং নিষ্ঠাসহকারে এ কর্তব্য পালন করে যাচ্ছেন, তারা আল্লাহ্ মনোনীত বান্দা ও ওলী। হযরত সা'লাবা ইবনে হাকাম (রা) বর্ণিত রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা আলিমগণকে সম্বোধন করে বলবেন, আমি তোমাদের বক্ষে আমার জ্ঞান ও প্রজ্ঞা শুধু এজন্য রেখেছিলাম যে, তোমরা যে কর্মই করনা কেন তোমাদেরকে ক্ষমা করাই ছিল আমার উদ্দেশ্য। উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, যার মধ্যে আল্লাহ্র ভয় নেই, সে আলিমগণের তালিকাভুক্ত নয়; তাই আল্লাহ্ ভীতির রঙে রঞ্জিত আলিমগণকেই এই সম্বোধন করা হবে। তাঁদের পক্ষে নিশ্চিন্ত হয়ে পাপ কর্মে লেগে থাকা কিছুতেই সম্ভবপর নয়। তবে মানুষ হিসাবে তারাও মাঝে-মাঝে ভুলত্রুটি করেন। হাদীসে তাই বলা হয়েছে যে, তোমাদের কর্ম যেমনই হোক, মাগফিরাত তোমাদের জন্য অবধারিত।---(ইবনে কাসীর)

হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা) বর্ণিত রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, হাশরে আল্লাহ্ তা'আলা সবাইকে একত্র করবেন, অতপর আলিমগণকে এক বিশেষ জায়গায় সমবেত করে বলবেন:

انى لم اضع علمى فيكم الا لعلى بكم و لم اضع علمى فيكم لاعذ بكم انطلقوا قد غفرت لكم

অর্থাৎ আমি তোমাদের অন্তরে আমার ইলম এ জন্য রেখেছিলাম যে, আমি জানতাম (ও যে, তোমরা এই আমানতের হক আদায় করবে।) তোমাদেরকে আযাব দেওয়ার জন্য তোমাদের বক্ষে আমি আমার ইলম রাখিনি। যাও; আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম।---(মাযহারী)

জ্ঞাতব্যঃ আয়াতে সর্বপ্রথম জালিম, অতপর মিতাচারী বা মধ্যপন্থী ও সর্বশেষে সৎকর্মে অগ্রগামী উল্লিখিত হয়েছে। এই ধারাবাহিকতার কারণ সম্ভবত এই যে, জালিমের সংখ্যা সর্বাধিক, তাদের চেয়ে কম মিতাচারী-মধ্যপন্থী এবং আরও কম সৎকর্মে অগ্রগামী। যাদের সংখ্যা বেশি, তাদেরকে প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে।

ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيْرُ جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّلُؤْلُؤًا وَّلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ

অর্থাৎ শুরুতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর মনোনীত বান্দাগণের মধ্যে তিন প্রকারের কথা উল্লেখ করেছেন। তারপর বলেছেনঃ ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيْرُ অর্থাৎ এদেরকে মনোনীতদের মধ্যে গণ্য করা আল্লাহ্ তা'আলার মহা অনুগ্রহ। প্রতিদান স্বরূপ তারা জান্নাতে যাবে, তাদেরকে স্বর্ণের কংকন এবং মুক্তার অলংকার পরানো হবে। তাদের পোশাক হবে রেশমের।

দুনিয়াতে পুরুষদের জন্য স্বর্ণের অলংকার ও রেশমী পোশাক উভয়টি পরিধান করা হারাম। এর বিনিময়ে জান্নাতে তাদেরকে এসব বস্তু দেওয়া হবে। এরূপ বলা ঠিক হবে না যে, অলংকার নারীর ভূষণ, পুরুষদের জন্য শোভনীয় নয়। কেননা দুনিয়ার অবস্থার সাথে জান্নাত ও পরকালের অবস্থার তুলনা করা একান্ত নির্বুদ্ধিতা।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা)-র বর্ণিত রেওয়ায়েতে আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, জান্নাতীদের মস্তকে মুক্তা খচিত মুকুট থাকবে। এর নিম্নস্তরের মুক্তার আলোকে সমগ্র পূর্ব ও পশ্চিম দিগন্ত উদ্ভাসিত হবে।---(মাযহারী)

তফসীরবিদগণ বলেন, প্রত্যেক জান্নাতীর হাতে একটি স্বর্ণ নির্মিত ও একটি রৌপ্যনির্মিত কংকন থাকবে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে কোরআনের এক আয়াতে স্বর্ণ নির্মিত এবং এক আয়াতে রৌপ্য নির্মিত কংকনের কথা উল্লেখ রয়েছে। এ তফসীর দৃষ্টে উভয় আয়াতে কোন বৈপরীত্য নেই।---(কুরতুবী)

দুনিয়াতে যে ব্যক্তি সোনা-রূপার পাত্র ও রেশমী পোশাক ব্যবহার করবে, সে জান্নাতে এগুলো থেকে বঞ্চিত থাকবে। হযরত হুযায়ফা (রা)-র রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, রেশমী পোশাক পরিধান করো না; সোনা-রূপার পাত্রে পানি পান করো না এবং এসবের দ্বারা তৈরি বরতনে আহার করো না। কারণ, এগুলো দুনিয়াতে কাফিরদের জন্য এবং তোমাদের জন্য পরকালে।---(বুখারী, মুসলিম)

হযরত উমর (রা)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, যে পুরুষ দুনিয়াতে রেশমী পোশাক পরিধান করবে; সে পরকালে তা পরিধান করতে পারবে না। ---(বুখারী, মুসলিম)

হযরত আবু সাঈদ খুদরীর এক রেওয়ায়েতে আছে যে, দুনিয়াতে রেশমী পোশাক পরিধানকারী পুরুষ পরকালে তা থেকে বঞ্চিত থাকবে যদিও সে জান্নাতে প্রবেশ করে। ---(মাযহারী)

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ---অর্থাৎ জান্নাতীরা জান্নাতে প্রবেশ করার সময় বলবে, আল্লাহ্র শোকর, যিনি আমাদের দুঃখ দূর করে-ছেন। এই দুঃখ কি? এ সম্পর্কে তফসীরবিদগণের বিভিন্ন উক্তি আছে। প্রকৃত পক্ষে সকল প্রকার দুঃখই এর অন্তর্ভুক্ত। দুনিয়াতে মানুষ যত রাজাধিরাজ অথবা নবী ও ওলী হোক না কেন, দুঃখকষ্টের কবল থেকে কারও নিষ্কৃতি নেই।

در ين دنيا كسے بے غم نباشد
وگر باشد بنى آدم نباشد

এ দুনিয়াতে দুঃখ-দুর্দশা ও চিন্তা-ভাবনা থেকে কোন সৎ ও অসৎ ব্যক্তিরই নিস্তার নেই। একারণেই সুধীবর্গ দুনিয়াকে 'দারুল-আহযান' দুঃখ-কষ্টের আলয় বলেন। আয়াতে উল্লিখিত দুঃখের মধ্যে প্রথমত দুনিয়ার যাবতীয় দুঃখ, দ্বিতীয়ত কিয়ামত ও হাশর-নশরের দুঃখ-কষ্ট, তৃতীয়ত হিসাব-নিকাশের দুঃখ-কষ্ট এবং চতুর্থত জাহান্নামের শাস্তি ও দুঃখ-কষ্ট অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতীদের এসব দুঃখ-কষ্টই দূর করে দেবেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, যারা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ কলেমায় বিশ্বাসী, তারা মৃত্যুর সময়, কবরে ও হাশরে কোথাও উৎকণ্ঠা বোধ করে না। আমি যেন দেখতে পাচ্ছি তারা কবর থেকে ওঠার সময় اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ বলতে বলতে উঠছে।---(তিবরানী, মাযহারী)

উপরে বর্ণিত আবুদ্দারদার হাদীসে বলা হয়েছে যে, উল্লিখিত জালিম শ্রেণী-ভুক্ত ব্যক্তিরা এ উক্তি করবে। কেননা, হাশরে সে প্রথমে দুঃখ-কষ্ট ও উদ্বেগের সম্মুখীন হবে। অবশেষে জান্নাতে প্রবেশের আদেশ পাওয়ার কারণে তার এসব দুঃখ-কষ্ট দূর হয়ে যাবে। এ হাদীসটি ইবনে ওমরের হাদীসের পরিপন্থী নয়। কেননা, জালিম ব্যক্তি অন্যদের তুলনায় হাশরেও একটি অতিরিক্ত দুঃখের সম্মুখীন হবে, যা জান্নাতে প্রবেশ করার সময় দূর হয়ে যাবে। সারকথা, সৎকর্মে অগ্রগামী, মিতাচারী ও জালিম সকল শ্রেণীর জান্নাতীই এ উক্তি করবে; কিন্তু প্রত্যেকের দুঃখের তালিকা আলাদা আলাদ হওয়া অবান্তর নয়।

ইমাম জাস্‌সাস বলেন, পার্থিব জীবনে চিন্তা-ভাবনা ও দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্ত না থাকাই মু'মিনের শান। রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, দুনিয়া মু'মিনের জন্য কয়েদখানা। একারণেই রসূলুল্লাহ্ (সা) ও প্রধান প্রধান সাহাবীগণের জীবনালেখ্যে দেখা যায়, তাঁদের-কে প্রায়ই চিন্তিত ও বিমর্ষ দেখা যেত।

الَّذِىٓ اَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهٖ لَا يَمَسُّنَا فِيْهَا نَصَبٌ وَّ لَا يَمَسُّنَا فِيْهَا لُغُوْبٌ

আয়াতে জান্নাতের কতিপয় বৈশিষ্ট্য বিবৃত হয়েছে। এক. জান্নাতে বসবাসের জায়গা। এর বিলুপ্তি অথবা সেখান থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার কোনও আশংকা নেই। দুই. সেখানে কেউ কোন দুঃখের সম্মুখীন হবে না। তিন. সেখান কেউ ক্লান্তিও বোধ করবে না। দুনিয়াতে মানুষ ক্লান্ত হয় এবং কাজকর্ম পরিহার করে নিদ্রার প্রয়োজন অনুভব করে। জান্নাত এ থেকে পবিত্র হবে। কোন কোন হাদীসেও এ বিষয়বস্তু বর্ণিত রয়েছে। —(মাযহারী)

اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيْهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَآءَكُمُ النَّذِيْرُ—অর্থাৎ জাহান্নামে যখন কাফিররা ফরিয়াদ করবে যে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে এ আযাব থেকে মুক্ত করুন, আমরা সৎকর্ম করব এবং অতীত কুকর্ম ছেড়ে দেব, তখন জওয়াব দেওয়া হবে যে, আমি কি তোমাদেরকে এমন বয়স দেইনি যাতে চিন্তাশীল ব্যক্তি চিন্তা করে বিশুদ্ধ পথে আসতে পারে? হযরত আলী ইবনে হুসাইন ইবনে জয়নুল আবেদীন (রা) বলেন, এর অর্থ সতের বছর বয়স। হযরত কাতাদাহ্ আঠার বছর বয়স বলেছেন। আসল অর্থ সাবালক হওয়ার বয়স। এতে সতের বা আঠারোর পার্থক্য হতে পারে। কেউ সতের বছরে এবং কেউ আঠার বছরে সাবালক হতে পারে। শরীয়তে এ বয়সটি প্রথম সীমা, যাতে প্রবেশ করার পর মানুষকে নিজের ভালমন্দ বোঝার জ্ঞান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে দান করা হয়। তাই সাধারণ কাফিরদেরকে উপরোক্ত কথাটি বলা হবে তারা বয়োবৃদ্ধ হোক অথবা অল্পবয়স্ক। তবে যে ব্যক্তি সুদীর্ঘকাল বেঁচে থাকার পরও

সতর্ক হয়নি এবং প্রকৃতির প্রমাণাদি দেখে ও পয়গম্বরগণের কথাবার্তা শুনে সত্যের পরিচয় গ্রহণ করেনি সে অধিক ধিক্কারযোগ্য হবে।

সারকথা এই যে, যে ব্যক্তি কেবল সাবালক হওয়ার বয়স পায়, তাকেও আল্লাহ্ তা'আলা সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য বোঝার ক্ষমতা দান করেন। সে তা না বুঝলে তিরস্কার ও আযাবের যোগ্য হবে। কিন্তু যে ব্যক্তি দীর্ঘ বয়স পায়, তার সামনে আল্লাহ্র প্রমাণাদি আরও পূর্ণ হয়ে যায়। সে কুফর ও গোনাহ্ থেকে বিরত না হলে অধিকতর শাস্তি ও তিরস্কারের যোগ্য হবে।

হযরত আলী মুর্তযা (রা) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা যে বয়সে গোনাহ্গার বান্দা-দেরকে লজ্জা দেন, তা হচ্ছে ষাট বছর। হযরত ইবনে আব্বাসও এক রেওয়ায়েতে চল্লিশ ও অন্য রেওয়ায়েতে ষাট বছর বলেছেন। এ বয়সে মানুষের উপর আল্লাহ্র প্রমাণ পূর্ণ হয়ে যায় এবং মানুষের জন্য কোন ওযর-আপত্তি পেশ করার অবকাশ থাকে না। ইবনে কাসীর হযরত ইবনে আব্বাসের দ্বিতীয় রেওয়ায়েতকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, সতের আঠার বছর সংক্রান্ত রেও-য়ায়েতও ষাট বছরের রেওয়ায়েতের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। সতের আঠার বছর বয়সে মানুষ চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য বুঝতে পারে। এ কারণেই এ বয়স থেকে সে শরীয়তের বিধানাবলী পালনে আদিষ্ট হয়। কিন্তু ষাট বছর এমন সুদীর্ঘ বয়স যে, এতেও কেউ সত্যের পরিচয় লাভ না করলে তার ওযর আপত্তি করার কোন অবকাশ থাকে না। এ কারণেই উম্মতে মুহাম্মদীর বয়সের গড় ষাট থেকে সত্তর বছর পর্যন্ত নির্ধারিত রয়েছে। এক হাদীসে আছে ঃ

اعمار امتى ما بين الستين الى السبعين و اقلهم من يجوز ذلك

---অর্থাৎ আমার উম্মতের বয়সঅষাট থেকে সত্তর পর্যন্ত হবে। খুব কম লোকই এই সীমা অতিক্রম করবে।---(ইবনে কাসীর)

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে, وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ ---এতে ইশারা করা হয়েছে যে, মানুষকে সাবালকত্বের বয়স থেকে কমপক্ষে তার স্রষ্টা ও মালিককে চিনা ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনকে জীবনের লক্ষ্য স্থির করার মত জ্ঞানবুদ্ধি প্রদান করা হয়। এ কাজের জন্য মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধিই যথেষ্ট ছিল ; কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা শুধু তা দিয়েই ক্ষান্ত থাকেননি, বরং তার বুদ্ধিকে সাহায্য করার জন্য ভীতি-প্রদর্শনকারীও প্রেরণ করেছেন। 'নযীর' শব্দের অর্থ ভীতি-প্রদর্শনকারী। প্রকৃতপক্ষে সে ব্যক্তিই নযীর তথা ভীতি প্রদর্শনকারী যে স্বীয় কৃপাগুণে আপন লোকদেরকে ধ্বংসাত্মক ও ক্ষতিকর বিষয়াদি থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দেয়। কোরআন পাকে এ শব্দের দ্বারা পয়গম্বরগণ

ও তাঁদের নায়েব আলিমগণকে বোঝানো হয়। আয়াতের সারমর্ম এই যে, সত্য মিথ্যার পরিচয় লাভ করার জন্য আমি জ্ঞানবুদ্ধি দিয়েছি, পয়গম্বরও প্রেরণ করেছি।

হযরত ইবনে আব্বাস, হযরত ইকরিমা ও ইমাম জাফর বাকের থেকে বর্ণিত আছে যে, আয়াতে উল্লিখিত نذير (সতর্ককারীর) অর্থ বার্ধক্যের সাদা চুল। এটা প্রকাশ হওয়ার পর মানুষকে নির্দেশ করে যে, বিদায়ের দিন ঘনিয়ে এসেছে। বলা-বাহুল্য, পয়গম্বর ও আলিমগণের সাথে সাদাচুলও সতর্ককারী হতে পারে। এতে কোন বিরোধ নেই।

সত্য এই যে, বালেগ হওয়ার পর থেকে মানুষ যত অবস্থার সম্মুখীন হয়, তার নিজ সত্তায় ও চারপাশে যত পরিবর্তন ও বিপ্লব দেখা দেয়, সবই আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে সতর্ককারীর ভূমিকা পালন করে।

إِنَّ اللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٣٨﴾ هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ ۚ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ۖ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا ۖ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ﴿٣٩﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَٰوَٰتِ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَىٰ بَيِّنَتٍ مِّنْهُ ۚ بَلْ إِن يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ﴿٤٠﴾ إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَا ۚ وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ ۚ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿٤١﴾

(৩৮) আল্লাহ্ আসমান ও যমীনের অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত। তিনি অন্তরের বিষয় সম্পর্কেও সবিশেষ অবহিত। (৩৯) তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে স্বীয় প্রতিনিধি করেছেন। অতএব যে কুফরী করবে তার কুফরী তার উপরই বর্তাবে। কাফিরদের কুফর কেবল তাদের পালনকর্তার ক্রোধই বৃদ্ধি করে এবং কাফিরদের কুফর কেবল তাদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে। (৪০) বলুন, তোমরা কি তোমাদের সে শরীকদের কথা ভেবে দেখেছ, যাদেরকে আল্লাহ্র পরিবর্তে তোমরা ডাক? তারা পৃথিবীতে কিছু সৃষ্টি করে থাকলে আমাকে দেখাও। না আসমান সৃষ্টিতে তাদের কোন অংশ আছে, না আমি

তাদেরকে কোন কিতাব দিয়েছি যে, তারা তার দলীলের উপর কায়েম রয়েছে, বরং জালিমরা একে অপরকে কেবল প্রতারণামূলক ওয়াদা দিয়ে থাকে। (৪১) নিশ্চয় আল্লাহ্ আসমান ও যমীনকে স্থির রাখেন, যাতে টলে না যায়। যদি এগুলো টলে যায় তবে তিনি ব্যতীত কে এগুলোকে স্থির রাখবে? তিনি সহনশীল, ক্ষমাশালী।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নিশ্চয় আল্লাহ্ আসমান ও যমীনের অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে পরিজ্ঞাত। নিশ্চয় তিনি অন্তরের বিষয় সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত। (এ হচ্ছে তাঁর জ্ঞানগত পরাকাষ্ঠা। কুদরত ও নিয়ামত উভয় বিষয় জ্ঞাপনকারী কর্মগত পরাকাষ্ঠা এই যে,) তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে আবাদ করেছেন। (এসব অনুগ্রহের প্রেক্ষিতে তোমাদের উচিত ছিল তওহীদ ও আনুগত্য স্বীকার করা। কিন্তু কেউ কেউ এর বিপরীতে কুফর ও শত্রুতায় মেতে উঠেছে।) অতএব (এতে অন্যের কি ক্ষতি হবে, বরং) যে কুফর করবে, তার কুফরের শাস্তি তার উপরই পতিত হবে। (শাস্তি এই যে,) কাফিরদের কুফর কেবল তাদের পালনকর্তার ক্রোধই বৃদ্ধি করে (যা দুনিয়াতেই বাস্তবরূপ লাভ করে) এবং কাফিরদের কুফর (পরকালে) তাদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে। (এ ক্ষতি হচ্ছে জান্নাত থেকে বঞ্চিত হওয়া এবং জাহান্নামের ইন্ধনে পরিণত হওয়া। তারা যে কুফর ও শিরক করে যাচ্ছে,) আপনি (তাদেরকে) বলুন, তোমরা কি তোমাদের সে শরীকদের কথা ভেবে দেখেছ, যাদেরকে আল্লাহ্র পরিবর্তে তোমরা পূজা কর? তারা পৃথিবীর কোন অংশ সৃষ্টি করেছে আমাকে দেখাও; না আকাশ সৃষ্টিতে তাদের কোন অংশীদারিত্ব আছে? (যাতে যুক্তির নিরীখে তাদের পূজার যোগ্যতা প্রমাণিত হয়) না আমি কাফিরদেরকে কোন কিতাব দিয়েছি? (যাতে শিরক বৈধ বলে লিখিত আছে) যে, তারা তার দলীলের উপর কায়েম আছে? (বস্তুত যুক্তিগত ও বর্ণনাগত কোন দলীলই নেই;) বরং জালিমরা একে অপরকে কেবল প্রতারণা-মূলক প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসছে। (অর্থাৎ তাদের বড়রা ভিত্তিহীন মিথ্যা বলেছে هٰٓؤُلَاۤءِ شُفَعَاۤؤُنَا عِنْدَ اللّٰهِ অথচ বাস্তবে তারা ক্ষমতাহীন। সুতরাং পূজার যোগ্য হতে পারে না। তবে আল্লাহ্ তা'আলা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী বিধায় তিনিই ইবাদতের যোগ্য। আল্লাহ্ যে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, তার প্রমাণাদির মধ্য থেকে একটি সংক্ষিপ্ত বিষয় এই যে,) নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা আসমান ও যমীনকে (স্বীয় কুদরতের দ্বারা) স্থির রাখেন, যাতে টলে না যায়। যদি (ধরে নেয়ার পর্যায়ে) এগুলো টলে যায়, তবে আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ এগুলোকে স্থির রাখতে পারে না। (সৃজিত বিশ্বের হেফাযতও যখন তাদের দ্বারা হয় না, তখন বিশ্বকে সৃষ্টি করার আশা কিরূপে করা যায় এবং ইবাদতের যোগ্যই বা তারা কেমন করে হতে পারে? এতদসত্ত্বেও শিরক করার কারণে এ মুহূর্তেই শাস্তি দেওয়া উচিত ছিল; কিন্তু যেহেতু) তিনি সহনশীল,

(তাই অবকাশ দিয়ে রেখেছেন। এই সুযোগে যদি তারা সৎপথে এসে যায়, তবে যেহেতু তিনি) ক্ষমাশীল (তাই অতীত সব গোনাহ মাফ করে দেওয়া হবে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

هُوَ الَّذِىْ جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِى الْاَرْضِ — خَلَائِف শব্দটি خَلِيْفَة-এর বহুবচন। অর্থ স্থলাভিষিক্ত। উদ্দেশ্য এই যে, আমি মানুষকে একের পর এক ভূমি, বাসগৃহ ইত্যাদির মালিক করেছি। একজন চলে গেলে অন্যজন তার স্থলাভিষিক্ত হয়। এতে আল্লাহ্ তা'আলার দিকে রুজু করার জন্য শিক্ষা রয়েছে। আয়াতে উম্মতে মহাম্মদীকেও বলা হতে পারে যে, আমি বিগত জাতিসমূহের পরে তাদের স্থলাভিষিক্তরূপে তোমাদেরকে মালিক ও ক্ষমতাশালী করেছি। সুতরাং পূর্ববর্তীদের অবস্থা থেকে তোমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা অবশ্য কর্তব্য। জীবনের সুবর্ণ সুযোগকে হেলায় হারিও না।

اِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ—আকাশসমূহকে স্থির রাখার অর্থ এরূপ নয় যে, তাদের গতিশীলতা রহিত করে দেওয়া হয়েছে; বরং এর অর্থ স্বস্থান থেকে বিচ্যুত হওয়া ও টলে যাওয়া।—اَنْ تَزُوْلَا শব্দটি এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। সুতরাং এ আয়াতে আকাশ স্থিতিশীল অথবা গতিশীল—এ বিষয়ের কোন প্রমাণ নেই।

وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَآءَهُمْ نَذِيْرٌ لَّيَكُوْنُنَّ اَهْدٰى مِنْ اِحْدَى الْاُمَمِ ۚ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيْرٌ مَّا زَادَهُمْ اِلَّا نُفُوْرًا ۝ اسْتِكْبَارًا فِى الْاَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ ؕ وَلَا يَحِيْقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ اِلَّا بِاَهْلِهٖ ؕ فَهَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا سُنَّتَ الْاَوَّلِيْنَ ۚ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا ۚ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَحْوِيْلًا ۝ اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوْٓا اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً ؕ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعْجِزَهٗ مِنْ شَيْءٍ فِى السَّمٰوٰتِ وَلَا فِى الْاَرْضِ ؕ اِنَّهٗ كَانَ عَلِيْمًا قَدِيْرًا ۝ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوْا مَا تَرَكَ عَلٰى ظَهْرِهَا

مِنْ دَآبَّةٍ وَّلٰكِنْ يُّؤَخِّرُهُمْ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ فَاِذَا جَآءَ
اَجَلُهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِعِبَادِهٖ بَصِيْرًا ﴿٤٥﴾

(৪২) তারা জোর শপথ করে বলত, তাদের কাছে কোন সতর্ককারী আগমন করলে তারা অন্য যে কোন সম্প্রদায় অপেক্ষা অধিকতর সৎপথে চলবে। অতপর যখন তাদের কাছে সতর্ককারী আগমন করল, তখন তাদের ঘৃণাই কেবল বেড়ে গেল। (৪৩) পৃথিবীতে ঔদ্ধত্যের কারণে এবং কুচক্রের কারণে। কুচক্র কুচক্রীদেরকেই ঘিরে ধরে। তারা কেবল পূর্ববর্তীদের দশারই অপেক্ষা করছে। অতএব আপনি আল্লাহ্‌র বিধানে পরিবর্তন পাবেন না এবং আল্লাহ্‌র রীতি-নীতিতে কোন রকম বিচ্যুতিও পাবেন না। (৪৪) তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না? করলেও দেখত তাদের পূর্ববর্তীদের কি পরিণাম হয়েছে। অথচ তারা তাদের অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী ছিল। আকাশ ও পৃথিবীতে কোন কিছুই আল্লাহ্‌কে অপারক করতে পারে না। নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান। (৪৫) যদি আল্লাহ্ মানুষকে তাদের কৃতকর্মের কারণে পাকড়াও করতেন, তবে ভূপৃষ্ঠে চলমান কাউকে ছেড়ে দিতেন না। কিন্তু তিনি এক নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দেন। অতপর যখন সে নির্দিষ্ট মেয়াদ এসে যাবে তখন আল্লাহ্‌র সব বান্দা তাঁর দৃষ্টিতে থাকবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তারা [অর্থাৎ, কোরায়শ কাফিররা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আবির্ভাবের পূর্বে] জোর শপথ করে বলত যে, তাদের কাছে কোন সতর্ককারী (পয়গম্বর) আগমন করলে তারা যে কোন সম্প্রদায় অপেক্ষা অধিকতর হিদায়ত কবূল করবে (অর্থাৎ ইহুদী, খৃস্টান ইত্যাদি সম্প্রদায়ের ন্যায় তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে না)। অতপর যখন তাদের কাছে একজন সতর্ককারী [অর্থাৎ রসূলুল্লাহ্ (সা)] আগমন করলেন, তখন তাদের ঘৃণাই কেবল বেড়ে গেল, পৃথিবীতে ঔদ্ধত্যের কারণে এবং (ঘৃণাই শুধু বেড়ে যায়নি ; বরং তাদের) কুচক্রও (বেড়ে গেল। অর্থাৎ ঔদ্ধত্যের কারণে তাঁর অনুসরণে লজ্জাবোধ তো করতই ; উপরন্তু তাঁকে উৎপীড়নের চেষ্টায় লেগে গেল। তারা আমার রসূলের বিরুদ্ধে কুচক্র করে নিজেদেরই ক্ষতি সাধন করেছে। কেন না), কুচক্রের (আসল) শাস্তি কুচক্রীদেরকেই ঘিরে ধরে। (বাহ্যত প্রতিপক্ষেরও ক্ষতি হয়ে গেলে সে ক্ষতি হয় পার্থিব। কিন্তু ক্ষতি সাধনকারী পারলৌকিক শাস্তি অবশ্যই ভোগ করবে। পারলৌকিক শাস্তির সামনে পার্থিব ক্ষতি তুচ্ছ বিষয়। সুতরাং, এদিক দিয়ে 'কুচক্রীদেরকেই ঘিরে ধরে' কথাটি সম্পূর্ণ বাস্তব সত্য)। তারা (আপনার শত্রুতা ও উৎপীড়নে লেগে থেকে) কেবল পূর্ববর্তী (কাফির)-দের রীতিরই অপেক্ষা করছে (অর্থাৎ আযাব

ও ধ্বংসের অপেক্ষায় রয়েছে।) অতএব (তাদের জন্যও তাই হবে। কেননা), আপনি আল্লাহ্‌র রীতিতে পরিবর্তন পাবেন না। (যে, তারা আযাবের পরিবর্তে কৃপা লাভ করতে থাকবে।) এবং---(এমনিভাবে) আল্লাহ্‌র রীতিতে কোন নড়বড়ও পাবেন না (যে, তাদের পরিবর্তে অন্য ভাল লোকদের আযাব হতে থাকবে। অর্থাৎ এটা আল্লাহ্‌র ওয়াদা যে, কাফিরদের আযাব হবে---দুনিয়াতে অথবা কেবল আখিরাতে। আল্লাহ্‌র ওয়াদা সর্বদা সত্য হয়ে থাকে। সুতরাং আযাব না হওয়ার কিংবা তাদের স্থলে অন্য নিরপরাধদের আযাব হওয়ার আশংকা নেই। কুফর আযাবকে অনিবার্য করে না---তাদের এ ধারণা ভ্রান্ত।) তারা কি পৃথিবীতে (অর্থাৎ শাম ও ইয়ামেনের সফরে আদ, সামূদ ও কওমে লূতের জনপদসমূহে) ভ্রমণ করেনি? করলে দেখত, তাদের পূর্ববর্তী কাফিরদের (সর্বশেষ পরিণাম এই মিথ্যারোপের কারণে) কি হয়েছে। (তারা শাস্তিপ্রাপ্ত হয়েছে) অথচ তারা তাদের অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী ছিল। (যে যত শক্তিশালীই হোক না কেন, কিন্তু) আকাশ ও পৃথিবীতে কোন (শক্তিশালী) বস্তুই আল্লাহ্‌কে পরাজিত করতে পারে না। (কেননা,) তিনি সর্বজ্ঞ (ও) সর্বশক্তিমান। (সুতরাং ইহাকে কিভাবে কার্যকর করতে হবে, জ্ঞানের মাধ্যমে তা তিনি জানেন; অতপর শক্তির মাধ্যমে তা কার্যকর করতে পারেন। অন্য কেউ এমন নয়। সুতরাং তাঁকে কে পরাজিত করতে পারে? আযাব আসে না দেখে যদি তারা তাদের শিরক ও কুফরকে সঠিক বলে মনে করে, তবে এটাও তাদের ভুল। কেননা, বিশেষ রহস্যবশত তাদের জন্য তাৎক্ষণিক আযাব ধার্য করা হয়নি। নতুবা) যদি আল্লাহ্ মানুষকে তাদের কৃত (কুফরী) কর্মের কারণে (তৎক্ষণাৎ) পাকড়াও করতেন তবে ভূ-পৃষ্ঠে একটি প্রাণীকেও ছাড়তেন না। (কারণ কাফিররা কুফরের কারণে ধ্বংস হয়ে যেত এবং স্বল্পতার কারণে মু'মিনগণকে দুনিয়া থেকে প্রত্যাহার করে নেওয়া হত। কারণ বিশ্বব্যবস্থা বিশেষ তাৎপর্যের ভিত্তিতে সমষ্টির সাথে জড়িত। অন্যান্য সৃষ্ট বস্তুকে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে মানব জাতির উপকার লাভ। মানবজাতি না থাকলে তারাও থাকত না।) কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে এক নির্দিষ্ট মেয়াদ (অর্থাৎ কিয়ামত) পর্যন্ত অবকাশ দেন। অতপর যখন তাদের সে মেয়াদ এসে যাবে তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে নিজেই দেখে নেবেন। (অর্থাৎ তাদের মধ্যে যারা কাফির, তাদেরকে শাস্তি দেবেন।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

لَايُصِيْبُ কিংবা لَا يُحِيْطُ অর্থ لَا يَحِيْقُ—وَلَا يَحِيْقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ اِلَّا بِاَهْلِهٖ

---অর্থাৎ কুচক্রের শাস্তি অন্য কারও উপর পতিত হয় না---কুচক্রীর উপরই পতিত হয়। যে ব্যক্তি অপরের অনিষ্ট কামনা করে, সে নিজেই অনিষ্টের শিকার হয়ে যায়।

এতে প্রশ্ন দেখা দিতে পারে যে, দুনিয়াতে অনেক সময় কুচক্রীদের চক্রান্ত সফল হতে দেখা যায় এবং যার ক্ষতি করার উদ্দেশ্য থাকে, তার ক্ষতি হয়ে যায়। তফসীরের সার-সংক্ষেপে এর জওয়াব দেওয়া হয়েছে যে, এটা ধর্মীয় ক্ষতি। আর কুচক্রীর ক্ষতি হচ্ছে পারলৌকিক আযাব, যা যেমন গুরুতর, তেমনি চিরস্থায়ী। এর বিপরীতে পার্থিব ক্ষতি তুচ্ছ ব্যাপার।

কেউ কেউ এর জওয়াবে বলেন, কোন নিরপরাধ ব্যক্তির বিরুদ্ধে চক্রান্ত করা ও তার উপর জুলুম করার প্রতিফল জালিমের উপর প্রায়ই দুনিয়াতেও পতিত হয়। মুহাম্মদ ইবনে কা'ব কোরাযী বলেন : তিনটি কাজ যারা করে, তারা দুনিয়াতেও প্রতিফল ও শাস্তির কবল থেকে রেহাই পাবে না। এক---কোন নিরপরাধ ব্যক্তির বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে তাকে কষ্ট দেওয়া, দুই---জুলুম করা এবং তিন---অঙ্গীকার ভঙ্গ করা।---(ইবনে কাসীর)

বিশেষত যে ব্যক্তি অসহায় এবং প্রতিশোধ গ্রহণের শক্তি রাখে না অথবা প্রতিশোধ গ্রহণের শক্তি থাকা সত্ত্বেও সবর করে, তার উপর জুলুমের শাস্তি থেকে দুনিয়াতেও কাউকে বাঁচতে দেখা যায়নি।

بس تجربه کردیم درین دیر مکافات
با درد کشاں ہر کہ درافتاد برافتاد

সুতরাং আয়াতে সামগ্রিক নীতি বর্ণনা করা হয়নি; বরং অধিকাংশ ঘটনার দিকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে।

سورة يس

সূরা ইয়াসীন

মক্কায় অবতীর্ণ, ৮৩ আয়াত, ৫ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰسٓ ۝١ وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ ۝٢ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۝٣ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝٤

تَنْزِيْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ۝٥ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ اُنْذِرَ اٰبَآؤُهُمْ فَهُمْ غٰفِلُوْنَ ۝٦

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰٓى اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝٧ اِنَّا جَعَلْنَا فِيْٓ اَعْنَاقِهِمْ

اَغْلٰلًا فَهِيَ اِلَى الْاَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُوْنَ ۝٨ وَجَعَلْنَا مِنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ

سَدًّا وَّمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَاَغْشَيْنٰهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ ۝٩ وَسَوَآءٌ عَلَيْهِمْ

ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝١٠ اِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ

الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ ۚ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَّاَجْرٍ كَرِيْمٍ ۝١١ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتٰى

وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوْا وَاٰثَارَهُمْ ۗ وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنٰهُ فِيْٓ اِمَامٍ مُّبِيْنٍ ۝١٢

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) ইয়া-সীন, (২) প্রজ্ঞাময় কোরআনের কসম (৩) নিশ্চয় আপনি প্রেরিত রসূলগণের একজন, (৪) সরল পথে প্রতিষ্ঠিত। (৫) কোরআন পরাক্রমশালী পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র তরফ থেকে অবতীর্ণ, (৬) যাতে আপনি এমন এক জাতিকে সতর্ক করেন, যাদের পূর্ব পুরুষগণকেও সতর্ক করা হয়নি। ফলে তারা গাফিল। (৭) তাদের অধিকাংশের জন্য শাস্তির বিষয় অবধারিত হয়েছে। সুতরাং তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না। (৮) আমি তাদের গর্দানে চিবুক পর্যন্ত বেড়ি পরিয়েছি ফলে তাদের মস্তক উর্দ্ধমুখী হয়ে গেছে। (৯) আমি তাদের সামনে ও পিছনে প্রাচীর স্থাপন করেছি, অতপর তাদেরকে আবৃত করে দিয়েছি, ফলে তারা দেখে না। (১০) আপনি তাদেরকে সতর্ক

করুন বা না করুন, তাদের পক্ষে দু'য়েই সমান ; তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না। (১১) আপনি কেবল তাদেরকেই সতর্ক করতে পারেন, যারা উপদেশ অনুসরণ করে এবং দয়াময় আল্লাহ্‌কে না দেখে ভয় করে। অতএব আপনি তাদেরকে সুসংবাদ দিয়ে দিন ক্ষমা ও সম্মানজনক পুরস্কারের। (১২) আমিই মৃতদেরকে জীবিত করি এবং তাদের কর্ম ও কীর্তিসমূহ লিপিবদ্ধ করি। আমি প্রত্যেক বস্তু স্পষ্ট কিতাবে সংরক্ষিত রেখেছি।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

ইয়াসীন---(এর উদ্দেশ্য আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন।) কসম প্রজ্ঞাময় কোরআনের, নিশ্চয় আপনি পয়গম্বরগণের একজন (এবং) সরলপথে প্রতিষ্ঠিত। [এ পথে যে আপনাকে অনুসরণ করে, সে আল্লাহ্ পর্যন্ত পেঁৗছে যায়। কাফিররা বলে, لَسْتَ مُرْسَلًا (আপনি রসূল নন।) অথবা বলতো بَلِ افْتَرٰىهُ (অর্থাৎ আপনি মনগড়া কথা বলেন)---এটা সত্য নয়। এর জন্য পথভ্রষ্ট হওয়া অপরিহার্য। কোরআন পরিপূর্ণ হিদায়েতকারী হওয়ার সাথে সাথে আপনার রিসালতের দলীলও বটে। কেননা] এ কোরআন পরাক্রমশালী পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ (এবং আপনাকে এজন্য পয়গম্বর করা হয়েছে,) যাতে আপনি (প্রথমে) এমন সব লোকদেরকে (আযাব সম্পর্কে) সতর্ক করেন, যাদের পিতৃপুরুষদেরকেও (নিকটবর্তী কোন রসূলের মাধ্যমে) সতর্ক করা হয়নি। ফলে তারা বেখবর রয়ে গেছে। (পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের শরীয়তের কিছু বিষয় আরবে বর্ণিত ছিল। যেমন, اَمْ جَاءَهُمْ مَّا لَمْ يَاْتِ اٰبَاءَهُمُ الْاَوَّلِيْنَ ---আয়াতে বলা হয়েছে। অর্থাৎ কোরআন কি তাদের কাছে এমন বিষয় নিয়ে আগমন করেছে, যা তাদের পূর্ব পুরুষদের শ্রুতিগোচর হয়নি ? অর্থাৎ তওহীদের দাওয়াত অভিনব নয়। এটা সর্বদা তাদের পিতৃপুরুষদের মধ্যেও প্রচলিত ছিল। কিন্তু এতদ-সত্ত্বেও কোন পয়গম্বরের আগমনে যতটুকু সাড়া জাগে, শুধু কোন কোন সংবাদ বর্ণিত হলেই ততটুকু সাড়া জাগে না; বিশেষত সে সংবাদ যদি অসম্পূর্ণ ও বিকৃত হয়। রসূলুল্লাহ্ (সা) প্রথমে কোরায়শ গোত্রকে সতর্ক করেছিলেন। তাই এখানে তাদের কথাই বলা হয়েছে। অতপর সমগ্র মানব জাতিকে দাওয়াত দিয়েছেন। কারণ, তিনি সকলের জন্যই প্রেরিত হয়েছিলেন। আপনার বিশুদ্ধ রিসালত ও কোরআনের সত্যতা সত্ত্বেও যে আপনাকে মানে না, সেজন্য আপনি মোটেও দুঃখিত হবেন না। কেননা,) তাদের অধিকাংশের জন্য শাস্তির বাণী অবধারিত হয়ে গেছে। (সে বাণী এই যে, তারা সৎপথে আসবে না।) সুতরাং তারা কখনও বিশ্বাস স্থাপন করবে না। (তাদের অধিকাংশের অবস্থাই ছিল এমন। অবশ্য কারো কারো ভাগ্যে ঈমানও ছিল। ফলে তারা ঈমান গ্রহণ করেছিল। ঈমান থেকে দূরে থাকার ব্যাপারে তাদের

অধিকাংশের অবস্থা যেন এরূপ যে,) আমি তাদের গর্দানে চিবুক পর্যন্ত (ভারী-ভারী) বেড়ি পরিয়ে দিয়েছি। ফলে তাদের সমস্ত ঊর্ধ্বমুখী হয়ে গেছে। (কাজেই মস্তক নিচে নামিয়ে পথ দেখতে পারে না। তাদের অবস্থা আরও যেন এরূপ যে,) আমি তাদের সামনে এক প্রাচীর এবং পেছনে এক প্রাচীর স্থাপন করেছি, অতপর (চতুর্দিক থেকে) তাদেরকে (পর্দায়) আবৃত করে দিয়েছি। ফলে তারা (কোন কিছু) দেখতে পারে না। (উভয় উপমার সারমর্ম এই যে,) আপনি তাদেরকে সতর্ক করুন বা না করুন, তাদের পক্ষে সমান। তারা (কোন অবস্থাতেই) বিশ্বাস স্থাপন করবে না। (তাই আপনি তাদের পক্ষ থেকে নিরাশ হয়ে স্বস্তি লাভ করুন।) আপনি তো কেবল তাদেরকেই (কল্যাণকরভাবে) সতর্ক করতে পারেন, যারা উপদেশ মেনে চলে এবং আল্লাহ্‌কে না দেখে ভয় করে। (ভয় থেকেই সত্যান্বেষার সৃষ্টি হয় এবং সত্যান্বেষণের মাধ্যমে আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছা যায়। অথচ তারা ভয় করে না।) অতএব (এমন লোককে) আপনি ক্ষমা ও (আনুগত্যের) মহা পুরস্কারের সুসংবাদ দিন। (এ থেকেই জানা গেল যে, পথভ্রষ্ট ও বিমুখ ব্যক্তি ক্ষমা ও পুরস্কার থেকে বঞ্চিত ও আযাবের যোগ্য হবে। অবশ্য দুনিয়াতে এই শাস্তি ও প্রতিদানের প্রকাশ জরুরী নয়; কিন্তু) আমিই (একদিন) মৃতদেরকে জীবিত করব। (তখন সব প্রকাশ হয়ে পড়বে।) এবং (যেসব কর্মের কারণে শাস্তি ও প্রতিদান হবে।) আমি (সেগুলো সর্বদা) লিপিবদ্ধ করি—সেকর্মও যা তারা সামনে প্রেরণ করে এবং সে কর্মও যা তারা পেছনে রেখে যায়। (مَا قَدَّمُوا বলে সে কাজই বোঝানো হয়েছে, যা তারা নিজেরা করে এবং آثَارَهُمْ বলে প্রতিক্রিয়া বোঝানো হয়েছে, যা সে কাজের কারণে সৃষ্ট হয় এবং মৃত্যুর পরও অব্যাহত থাকে। উদাহরণত এক ব্যক্তি একটি সৎকাজ করল, যা অপরের হিদায়েতেরও কারণ হয়ে গেল অথবা কেউ কোন মন্দ-কাজ করল, যা অপরেরও পথ ভ্রষ্টতার কারণ হয়ে গেল। মোটকথা, এগুলো সব লিখিত হয় এবং পরকালে এসবের শাস্তি ও প্রতিদান দেওয়া হবে।) আর (আমার জ্ঞান এত বিস্তৃত যে, এভাবে লিপিবদ্ধ করারও প্রয়োজন নেই, যা কাজটি সংঘটিত হওয়ার পর করা হয়। কেননা) আমি প্রত্যেক বস্তু (যা কিয়ামত পর্যন্ত হবে তা হওয়ার আগেই) এক স্পষ্ট কিতাবে (অর্থাৎ লওহে মাহফূযে) সংরক্ষিত রেখেছি। তবে কোন কোন বিশেষ রহস্যবশত সংঘটিত ক্রিয়াকর্ম লিপিবদ্ধ করা হয়। তাই কোন কর্ম অস্বীকার করার অথবা গোপন রাখার অবকাশ নেই। শাস্তি অবশ্যই হবে। বিস্তারিত বিবরণের দিক দিয়ে লওহে মাহ্‌ফূযকে 'স্পষ্ট' বলা হয়েছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা ইয়াসীনের ফযীলত ঃ হযরত মা'কাল ইবনে ইয়াসার (রা)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, يس قلب القرآن অর্থাৎ সূরা ইয়াসীন কোরআনের

হৃৎপিণ্ড। এ হাদীসে আরও আছে যে, যে ব্যক্তি সূরা ইয়াসীন আল্লাহ্ ও পরকালের কল্যাণ লাভের নিয়তে পাঠ করে, তার মাগফিরাত হয়ে যায়। তোমরা তোমাদের মৃতদের উপর এ সূরা পাঠ কর।---(রূহুল মা'আনী, মাযহারী)

ইমাম গাযযালী (র) বলেন, সূরা ইয়াসীনকে কোরআনের হৃৎপিণ্ড বলার কারণ এমনও হতে পারে যে, এ সূরায় কিয়ামত ও হাশর-নশরের বিষয় বিশদ ব্যাখ্যা ও অলংকার সহকারে বর্ণিত হয়েছে। পরকাল বিশ্বাস ঈমানের এমন একটি মূলনীতি, যার উপর মানুষের সকল আমল ও আচরণের বিশুদ্ধতা নির্ভরশীল। পরকালভীতিই মানুষকে সৎকর্মে উদ্বুদ্ধ করে এবং অবৈধ বাসনা ও হারাম কাজ থেকে বিরত রাখে। অতএব দেহের সুস্থতা যেমন অন্তরের সুস্থতার উপর নির্ভরশীল তেমনি ঈমানের সুস্থতা পরকাল চিন্তার উপর নির্ভরশীল। (রূহুল মা'আনী) এ সূরার নাম যেমন সূরা-ইয়াসীন প্রসিদ্ধ, তেমন এক হাদীসে এর নাম 'আযীমা' ও বর্ণিত আছে। অপর এক হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, তওরাতে এ সূরার নাম 'মুয়িম্মাহ্' বলে উল্লিখিত আছে। অর্থাৎ এ সূরা তার পাঠকের জন্য ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ ও বরকত ব্যাপক করে দেয়। এ সূরার পাঠকের নাম 'শরীফ' বর্ণিত আছে। আরও বলা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন এর সুপারিশ 'রবীয়া' গোত্র অপেক্ষা অধিকসংখ্যক লোকের জন্য কবুল হবে। কতক রেওয়ায়েতে এর নাম 'মুদাফিয়াও' বর্ণিত আছে ; অর্থাৎ এ সূরা তার পাঠকদের থেকে বালা-মুসিবত দূর করে। কতক রেওয়ায়েতে এর নাম 'কাযিয়া'-ও উল্লিখিত হয়েছে অর্থাৎ এ সূরা পাঠকের প্রয়োজন মিটায়---(রূহুল মা'আনী)

হযরত আবূ যর (রা) বর্ণনা করেন, মরণোন্মুখ ব্যক্তির কাছে সূরা ইয়াসীন পাঠ করা হলে তার মৃত্যু সহজ হয়।---(মাযহারী)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা) বলেন, যদি কোন ব্যক্তি সূরা ইয়াসীন তার অভাব-অনটনের বেলায় পাঠ করে তবে তার অভাব পূরণ হয়ে যায়। ---(মাযহারী)

ইয়াহ্ইয়া ইবনে কাসীর বলেন, যে ব্যক্তি সকালে সূরা ইয়াসীন পাঠ করবে, সে সন্ধ্যা পর্যন্ত সুখে স্বস্তিতে থাকবে এবং যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় পাঠ করবে, সে সকাল পর্যন্ত শান্তিতে থাকবে। তিনি আরও বলেন, আমাকে এ বিষয়টি এমন এক ব্যক্তি বলেছেন, যিনি এর বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন।---(মাযহারী)

يس ।

يس---শব্দ সম্পর্কে প্রসিদ্ধ উক্তি এই যে, এটা খণ্ড বাক্য। এর অর্থ আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ জানে না। তফসীরের সার-সংক্ষেপে এ কথাই বলা হয়েছে। আহকামুল-কোরআনে বর্ণিত ইমাম মালিকের উক্তি এই যে, এটা আল্লাহ্ তা'আলার অন্যতম নাম। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও এক রেওয়ায়েতে তাই বর্ণিত রয়েছে। অপর এক রেওয়ায়েতে আছে যে, এটা আবিসিনীয় শব্দ। এর অর্থ 'হে মানুষ' আর এখানে মানুষ বলে নবী করীম (সা)-কে বোঝানো হয়েছে। হযরত ইবনে জুবায়ের (রা)-এর বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, 'ইয়াসীন' রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নাম। রূহুল

মা'আনীতে আছে, ইয়া ও সীন—এ দু'টি অক্ষর দ্বারা নবী করীম (সা)-এর নাম রাখার মধ্যে বিরাট রহস্য নিহিত।

ইয়াসীন কারও নাম রাখা কিরূপ? ইমাম মালিক এটা পছন্দ করেন নি। কারণ, তাঁর মতে এটা আল্লাহ্ তা'আলার অন্যতম নাম এবং এর সঠিক অর্থ জানা নেই। কাজেই এর অর্থ رازق ও خالق এর ন্যায় আল্লাহ্ তা'আলার বৈশিষ্ট্যমূলক কোন নাম হওয়াও সম্ভব। তবে শব্দটি يا سين বর্ণমালার মাধ্যমে লেখা হলে তা কারও নাম রাখা জায়েয। কারণ, কোরআনে سَلَامٌ عَلَى اٰلِ يَاسِيْنَ উল্লিখিত আছে।—(ইবনে আরাবী) এর প্রসিদ্ধ কিরা'ত اٰلِ يَاسِيْنَ -

لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا اُنْذِرَ اٰبَاؤُهُمْ—অর্থাৎ আরবদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে দীর্ঘকাল যাবত কোন সতর্ককারী পয়গম্বর আগমন করেন নি। পিতৃপুরুষ অর্থ নিকটবর্তী পিতৃপুরুষ। আরবদের ঊর্ধ্বতন পুরুষ হযরত ইবরাহীম (আ) ও তাঁর সাথে হযরত ইসমাঈল (আ)-এর পর বহু শতাব্দী ধরে আরবদের মধ্যে কোন পয়গম্বর আবির্ভূত হন নি। তবে দীনের প্রচারকার্য সব সময়ই অব্যাহত ছিল, যার উল্লেখ কোরআন পাকের এক আয়াতেও আছে। এছাড়া اِنْ مِّنْ اُمَّةٍ اِلَّا خَلَا فِيْهَا نَذِيْرٌ আয়াত দৃষ্টেও জানা যায় যে, আল্লাহ্র রহমত কোন জাতিকে কোন সময়ই দাওয়াতও সতর্কীকরণ থেকে বঞ্চিত রাখেনি। এতদ্সত্ত্বেও প্রতিনিধিদের মাধ্যমে দাওয়াত ততটুকু কার্যকর হয় না, যতটুকু স্বয়ং পয়গম্বরের দাওয়াত ও শিক্ষার মাধ্যমে হয়। তাই আয়াতে আরবদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তাদের মধ্যে কোন সতর্ককারী আগমন করেনি। এরই ফল-স্বরূপ তাদের মধ্যে সাধারণভাবে শিক্ষা-দীক্ষার কোন সুদৃঢ় ব্যবস্থা ছিল না। আর একারণেই তাদের উপাধি ছিল 'উম্মী' অর্থাৎ নিরক্ষর। لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰى اَكْثَرِهِمْ

فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ- اِنَّا جَعَلْنَا فِىْ اَعْنَاقِهِمْ اَغْلٰلًا—الاية আল্লাহ্ তা'আলা কুফর ও ঈমান এবং জান্নাত ও জাহান্নামের উভয় রাস্তা মানুষের সামনে তুলে ধরেছেন। ঈমানের দাওয়াতের জন্য পয়গম্বর ও কিতাব প্রেরণ করেছেন। মানুষকে ভাল-মন্দ বিবেচনা করে যে কোন রাস্তা অবলম্বন করার ক্ষমতাও দান করেছেন। কিন্তু যে হতভাগা কুদরতের নিদর্শনাবলীতে চিন্তা-ভাবনা করে না, পয়গম্বরগণের দাওয়াতের প্রতি কর্ণপাত করে না এবং আল্লাহ্র কিতাব সম্পর্কেও চিন্তা-ভাবনা করে না, সে স্বেচ্ছায়

যে পথ অবলম্বন করে নেয়, আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য সে পথেরই উপকরণ সংগ্রহ করে দেন। যে কুফর অবলম্বন করে, তার জন্য কুফরে উন্নতি লাভেরই ব্যবস্থা হতে থাকে। এ বিষয়টিই لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰى اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ তাদের অধিকাংশ লোকের জন্য তাদের ভ্রান্তিপূর্ণ নির্বাচনের কারণে এ উক্তি অবধারিত হয়ে গেছে যে, তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না।

অতপর তাদের অবস্থার একটি উদাহরণ বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ তাদের অবস্থা এমন যার গলদেশে বেড়ি পরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে মুখমণ্ডল ও চক্ষুদ্বয় ঊর্ধ্বমুখী হয়ে গেছে---নিচের দিকে তাকাতেই পারে না। অতএব তারা নিজেদেরকে কোন গর্তে পতিত হওয়া থেকে বাঁচাতে পারে না।

দ্বিতীয় উদাহরণ এমন---যেন কারও চারদিকে দেয়াল দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে। তারা এই চার দেয়ালের অভ্যন্তরে আবদ্ধ হয়ে বাইরের বিষয়াদি সম্পর্কে বেখবর হয়ে গেছে। ফলে এভাবে বাইরের সে কাফিরদের চারদিকেও যেন তাদের বিদ্বেষ ও হঠকারিতা অবরোধ সৃষ্টি করে দিয়েছে। সেই সত্য বিষয়াদি যেন তাদের কানে পৌঁছতেই পারে না।

ইমাম রাযী বলেন, দৃষ্টির বাধা দু'রকম হয়ে থাকে। একটি বাধা এমন যার কারণে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি আপন সত্তাও দেখতে সক্ষম হয় না। দ্বিতীয় বাধা এমন যার ফলে নিজের আশেপাশে কিছুই দেখে না। কাফিরদের জন্য সত্য দর্শনের পথে উভয় প্রকার বাধাই বিদ্যমান ছিল। তাই প্রথম উদাহরণে প্রথমোক্ত বাধা বর্ণিত হয়েছে। যার গলা নিচের দিকে নোয়াতে পারে না, যে নিজের অস্তিত্বও দেখতে পারে না। দ্বিতীয় উদাহরণ শেষোক্ত বাধা বিধৃত হয়েছে। এতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি আশেপাশের কোন কিছুই দেখতে পায় না।---(রূহুল মা'আনী)

অধিকাংশ তফসীরবিদ আলোচ্য আয়াতকে তাদের কুফর ও হঠকারিতার উদাহরণ বলেই সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু কোন কোন তফসীরবিদ একে কোন কোন রেওয়ায়েতের উপর ভিত্তি করে একটি বাস্তব ঘটনার বিবরণ বলে সাব্যস্ত করেছেন। আবূ জহল এবং আরও কতিপয় কাফির রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে হত্যা অথবা উৎপীড়ন করার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে তাঁর দিকে এগুতে থাকলে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের চোখে আবরণ ফেলে দেন। ফলে তারা ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায়। এমনি ধরনের একাধিক ঘটনা তফসীরের কিতাবে বর্ণিত আছে। কিন্তু এসব রেওয়ায়েতের অধিকাংশই অগ্রাহ্য বিধায় তফসীরের ভিত্তি হতে পারে না।

وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوْا وَاٰثَارَهُمْ---অর্থাৎ আমি তাদের সেসব কর্ম লিপিবদ্ধ করব, যা তারা পূর্বাহ্নে প্রেরণ করে। কর্ম সম্পাদনকে 'পূর্বাহ্নে প্রেরণ করা' বলে ব্যক্ত করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তোমরা যেসব ভাল-মন্দ কর্ম দুনিয়াতে কর, সেগুলো

এখানেই খতম হয়ে যায় না; বরং এগুলো তোমাদের ভবিষ্যৎ জীবনের সম্বল হয়ে তোমাদের মৃত্যুর পূর্বেই পৌঁছে যায়, যার সাথে পর-জীবনে সাক্ষাৎ ঘটবে। তা সৎকর্ম হলে জান্নাতের কুসুমাস্তীর্ণ উদ্যানে পরিণত হবে এবং অসৎকর্ম হলে জাহান্নামের অঙ্গারের আকার ধারণ করবে। লিপিবদ্ধ করার আসল উদ্দেশ্য সংরক্ষিত করা। লিপিবদ্ধ করাও এর এক উপায়, যাতে ভুলভ্রান্তির ও কমবেশি হওয়ার আশংকা না থাকে।

কর্মের মত তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াও লেখা হয়ঃ وآثارهم—অর্থ তাদের সম্পাদিত কর্মসমূহের ন্যায়, কর্মসমূহের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াও লিপিবদ্ধ করা হয়। آثار এর অর্থ কর্মের ক্রিয়া তথা ফলাফল, যা পরবর্তীকালে প্রকাশ পায় ও টিকে থাকে উদাহরণত কেউ মানুষকে দীনী শিক্ষা দিল, বিধি-বিধান বর্ণনা করল অথবা কোন পুস্তক রচনা করল, যদ্দ্বারা মানুষের দীনী ফায়দা হয় অথবা ওয়াকফ ইত্যাদি ধরনের কোন জনহিতকর কাজ করল---তার এই সৎকর্মের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া যতদূর পৌঁছবে এবং যতদিন পর্যন্ত পৌঁছতে থাকবে, সবই তার আমলনামায় লিখিত হতে থাকবে। অনুরূপভাবে কোন রকম মন্দকর্ম যার মন্দ ফলাফল ও ক্রিয়া পৃথিবীতে থেকে যায়----কেউ যদি নিপীড়নমূলক আইন-কানূন প্রবর্তন করে কিংবা এমন কোন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে যা মানুষের আমল-আখলাককে ধ্বংস করে দেয় কিংবা মানুষকে কোন মন্দ পথে পরিচালিত করে, তবে তার এ মন্দকর্মের ফলাফল ও প্রভাব যে পর্যন্ত থাকবে এবং যতদিন পর্যন্ত তা দুনিয়াতে কায়েম থাকবে, ততদিন তার আমলনামায় সব লিখিত হতে থাকবে। যেমন, এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

من سن سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها من بعده من غير ان ينقص من اجورهم شئ - ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده لا ينقص من اوزارهم شئا ثم تلا ونكتب ما قدموا واثارهم -

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন উত্তম প্রথা প্রবর্তন করে, তার জন্য রয়েছে এর সওয়াব এবং যত মানুষ এই প্রথার উপর আমল করবে, তাদের সওয়াব---অথচ পালনকারীদের সওয়াব মোটেও হ্রাস করা হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কোন কুপ্রথা প্রবর্তন করে, সে তার গোনাহ্ ভোগ করবে এবং যত মানুষ এই কুপ্রথা পালন করতে থাকবে, তাদের গোনাহ্ও তার আমলনামায় লিখিত হবে---অথচ পালনকারীদের গোনাহ্ হ্রাস করা হবে না।---(ইবনে কাসীর)

آثار শব্দের অর্থ পদাংকও হয়ে থাকে। হাদীসে আছে; কেউ নামাযের জন্য মসজিদে গমন করলে তার প্রতি পদক্ষেপে সওয়াব লেখা হয়। কোন কোন

রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, আয়াতে آثار বলে এই পদাংকই বোঝানো হয়েছে। নামাযের সওয়াব যেমন লেখা হয়, তেমনি নামাযে যাওয়ার সময় যত পদক্ষেপ হতে থাকে তাও প্রতি পদক্ষেপে একটি করে পুণ্য লিখিত হয়। মদীনা তাইয়্যেবায় যাদের বাসগৃহ মসজিদে নববী থেকে দূরে অবস্থিত ছিল, তাঁরা মসজিদের কাছাকাছি বাসগৃহ নির্মাণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে রসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁদেরকে তা থেকে বারণ করে বললেন, তোমরা যেখানে আছ, সেখানেই থাক। দূর থেকে হেঁটে মসজিদে এলে সময় বিনষ্ট হয় না। পদক্ষেপ যত বেশি হবে, তোমাদের সওয়াবও তত বেশি হবে। ইবনে কাসীর এ সম্পর্কিত রেওয়ায়েতসমূহ একত্র করে দিয়েছেন।

এতে এমন প্রশ্ন দেখা দেয় যে, সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ। আর হাদীসসমূহে উল্লিখিত ঘটনা মদীনা তাইয়্যেবার, এটা কিরূপে সম্ভবপর? জওয়াব এই যে, আয়াতের অর্থ এই মর্মে ব্যাপক যে, প্রত্যেক কর্মের ফলাফলও লেখা হয়। এ আয়াতটি মক্কাতেই অবতীর্ণ হয়ে থাকবে। কিন্তু পরবর্তীকালে মদীনায় উপরোক্ত ঘটনা সংঘটিত হলে রসূলুল্লাহ্ (সা) প্রমাণ হিসাবে আয়াতটি উল্লেখ করেন এবং পদাংককেও কর্মের ফলাফল হিসাবে গণ্য করেন, যেগুলো লিখিত হওয়ার কথা আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। এভাবে বর্ণিত উভয় তফসীরের বাহ্যিক বৈপরীত্যও দূর হয়ে যায়। ---(ইবনে কাসীর)

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا اَصْحٰبَ الْقَرْيَةِ ۘ اِذْ جَآءَهَا الْمُرْسَلُوْنَ ﴿١٣﴾ اِذْ
اَرْسَلْنَآ اِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوْهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوْٓا اِنَّآ اِلَيْكُمْ
مُّرْسَلُوْنَ ﴿١٤﴾ قَالُوْا مَآ اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ۙ وَمَآ اَنْزَلَ الرَّحْمٰنُ مِنْ
شَيْءٍ ۙ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا تَكْذِبُوْنَ ﴿١٥﴾ قَالُوْا رَبُّنَا يَعْلَمُ اِنَّآ اِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُوْنَ ﴿١٦﴾
وَمَا عَلَيْنَآ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ﴿١٧﴾ قَالُوْٓا اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ ۚ لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهُوْا
لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِّنَّا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١٨﴾ قَالُوْا طَآئِرُكُمْ مَّعَكُمْ ۭ
اَئِنْ ذُكِّرْتُمْ ۭ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ ﴿١٩﴾ وَجَآءَ مِنْ اَقْصَا الْمَدِيْنَةِ
رَجُلٌ يَّسْعٰى قَالَ يٰقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٢٠﴾ اتَّبِعُوْا مَنْ لَّا يَسْـَٔلُكُمْ اَجْرًا
وَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ﴿٢١﴾ وَمَا لِيَ لَآ اَعْبُدُ الَّذِيْ فَطَرَنِيْ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٢٢﴾
ءَاَتَّخِذُ مِنْ دُوْنِهٖٓ اٰلِهَةً اِنْ يُّرِدْنِ الرَّحْمٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّيْ

شَفَاعَتُهُمْ شَيْـًٔا وَّلَا يُنْقِذُوْنِ ﴿۲۳﴾ اِنِّیْۤ اِذًا لَّفِیْ ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ ﴿۲۴﴾ اِنِّیْۤ اٰمَنْتُ

بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُوْنِ ﴿۲۵﴾ قِیْلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ ؕ قَالَ یٰلَیْتَ قَوْمِیْ یَعْلَمُوْنَ ﴿۲۶﴾

بِمَا غَفَرَ لِیْ رَبِّیْ وَجَعَلَنِیْ مِنَ الْمُكْرَمِیْنَ ﴿۲۷﴾ وَمَاۤ اَنْزَلْنَا عَلٰی قَوْمِهٖ

مِنْۢ بَعْدِهٖ مِنْ جُنْدٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِیْنَ ﴿۲۸﴾ اِنْ كَانَتْ اِلَّا

صَیْحَةً وَّاحِدَةً فَاِذَا هُمْ خٰمِدُوْنَ ﴿۲۹﴾ یٰحَسْرَةً عَلَی الْعِبَادِ ۚ مَا

یَاْتِیْهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ یَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿۳۰﴾ اَلَمْ یَرَوْا كَمْ اَهْلَكْنَا

قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ اَنَّهُمْ اِلَیْهِمْ لَا یَرْجِعُوْنَ ﴿۳۱﴾ وَاِنْ كُلٌّ لَّمَّا جَمِیْعٌ

لَّدَیْنَا مُحْضَرُوْنَ ﴿۳۲﴾

(১৩) আপনি তাদের কাছে সে জনপদের অধিবাসীদের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করুন, যখন সেখানে রসূলগণ আগমন করেছিলেন। (১৪) আমি তাদের নিকট দু'জন রসূল প্রেরণ করেছিলাম, অতপর ওরা তাঁদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। তখন আমি তাদেরকে শক্তিশালী করলাম তৃতীয় একজনের মাধ্যমে। তারা সবাই বলল, আমরা তোমাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছি। (১৫) তারা বলল, তোমরা তো আমাদের মতই মানুষ, রহমান আল্লাহ্ কিছুই নাযিল করেন নি। তোমরা কেবল মিথ্যাই বলে যাচ্ছ। (১৬) রসূলগণ বলল, আমাদের পরওয়ারদিগার জানেন, আমরা অবশ্যই তোমাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছি। (১৭) পরিষ্কারভাবে আল্লাহ্র বাণী পেঁাছে দেওয়াই আমাদের দায়িত্ব। (১৮) তারা বলল, আমরা তোমাদেরকে অশুভ-অকল্যাণকর দেখছি। যদি তোমরা বিরত না হও, তবে অবশ্যই তোমাদেরকে প্রস্তর বর্ষণে হত্যা করব এবং আমাদের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি স্পর্শ করবে। (১৯) রসূলগণ বলল, তোমাদের অকল্যাণ তোমাদের সাথেই! এটা কি এজন্য যে, আমরা তোমাদেরকে সদুপদেশ দিয়েছি? বস্তুত তোমরা সীমালংঘনকারী সম্প্রদায় বৈ নও। (২০) অতপর শহরের প্রান্তভাগ থেকে এক ব্যক্তি দৌড়ে এল। সে বলল, হে আমার সম্প্রদায় তোমরা রসূলগণের অনুসরণ কর। (২১) অনুসরণ কর তাদের, যারা তোমাদের কাছে কোন বিনিময় কামনা করে না, অথচ তারা সুপথ প্রাপ্ত। (২২) আমার কি হল যে, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং যার কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে, আমি তাঁর ইবাদত করব না? (২৩) আমি কি তাঁর পরিবর্তে অন্যদেরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করব?

করুণাময় যদি আমাকে কষ্টে নিপতিত করতে চান, তবে তাদের সুপারিশ আমার কোনই কাজে আসবে না এবং তারা আমাকে রক্ষাও করতে পারবে না। (২৪) এরূপ করলে আমি প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় পতিত হব। (২৫) আমি নিশ্চিতভাবে তোমাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম। অতএব আমার কাছ থেকে শুনে নাও। (২৬) তাকে বলা হল, জান্নাতে প্রবেশ কর। সে বলল হায়, আমার সম্প্রদায় যদি কোনক্রমে জানতে পারত---(২৭) যে আমার পরওয়ারদিগার আমাকে ক্ষমা করেছেন এবং আমাকে সম্মানিতদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন! (২৮) তারপরে আমি তার সম্প্রদায়ের উপর আকাশ থেকে কোন বাহিনী অবতীর্ণ করিনি এবং আমি (বাহিনী) অবতরণকারীও না। (২৯) বস্তুত এ ছিল এক মহানাদ। অতপর সঙ্গে সঙ্গে সবাই স্তব্ধ হয়ে গেল। (৩০) বান্দাদের জন্য আক্ষেপ যে, তাদের কাছে এমন কোন রসূলই আগমন করেনি যাদের প্রতি তারা বিদ্রূপ করে না। (৩১) তারা কি প্রত্যক্ষ করে না, তাদের পূর্বে আমি কত সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি যে, তারা তাদের মধ্যে আর ফিরে আসবে না। (৩২) ওদের সবাইকে সমবেত অবস্থায় আমার দরবারে উপস্থিত হতেই হবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং আপনি তাদের (কাফিরদের) কাছে (রিসালতের সমর্থন এবং তওহীদ ও রিসালত অস্বীকারের কারণে ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে) এক জনপদের অধিবাসী-দের কাহিনী বর্ণনা করুন, যখন তাদের কাছে রসূলগণ আগমন করেছিলেন। (অর্থাৎ) আমি (প্রথমে) তাদের কাছে দু'জন রসূল প্রেরণ করেছিলাম। অতপর ওরা উভয়কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। তখন আমি তাঁদের উভয়কে শক্তিশালী করলাম তৃতীয় একজন (রসূলের) মাধ্যমে। অতপর তাঁরা তিনজনই (জনপদবাসীদেরকে) বলল ঃ আমরা তোমাদের কাছে-- (আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে) প্রেরিত হয়েছি (যাতে তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র একত্ববাদে বিশ্বাস এবং মূর্তিপূজা পরিহার করার জন্য হিদায়ত করি। বলা বাহুল্য, তারা ছিল মূর্তিপূজক; যেমন ءَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً আয়াত থেকে তা জানা যায়।) তারা (অর্থাৎ জনপদবাসীরা) বলল, তোমরা তো আমাদের মতই সাধারণ মানুষ। (রসূল হওয়ার বৈশিষ্ট্য তোমাদের নেই।) আর (তোমাদের বৈশিষ্ট্যই বা কি থাকবে, রিসালত বিষয়টি ভিত্তিহীন।) রহমান আল্লাহ্ (তো কিতাব বা বিধান জাতীয়) কোন কিছু অবতীর্ণই করেনি। তোমরা কেবল মিথ্যাই বলে যাচ্ছ। রসূলগণ বললেন, আমাদের পালনকর্তা জানেন, আমরা অবশ্যই তোমাদের কাছে (রসূলরূপে) প্রেরিত হয়েছি। (বিভিন্ন প্রমাণ বর্ণনা করার পরও) যখন তারা মানেনি তখন শেষ জওয়াবরূপে বাধ্য হয়ে তাঁরা কসম খেয়েছেন। যেমন পরবর্তী স্বয়ং তাঁদের বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, (খোলাখুলি বিধান) প্রচার করাই আমাদের একমাত্র দায়িত্ব ছিল। (প্রমাণাদি দ্বারা দাবি প্রতিষ্ঠিত করা ছাড়া যেহেতু

কোন বিষয় খোলাসা হয় না তাই বোঝা গেল যে, প্রথমে তারা প্রমাণাদি পেশ করে-ছিলেন এবং সবশেষে কসম করেছেন। মোটকথা, আমরা আমাদের কাজ করেছি। এখন তোমরা না মানলে আমরা কি করব।) তারা বলতে লাগল, আমরা তোমা-দেরকে অলক্ষুণে মনে করি। (হয় তারা দুর্ভিক্ষে পতিত ছিল বিধায় না হয় নতুন বিষয় প্রচারের ফলে তাদের মধ্যে কলহ-বিবাদ ও মতানৈক্য মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার কারণে একথা বলেছিল। তোমরা জনসাধারণের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি করেছ। যার ফলে অকল্যাণ হচ্ছে এবং এটাই অলক্ষণ। আর এর কারণ (তোমরা) যদি এ দাবি ও আহবান থেকে বিরত না হও, তবে (মনে রেখ) আমরা তোমাদেরকে প্রস্তর বর্ষণে হত্যা করব এবং (এর আগেও) আমাদের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি স্পর্শ করবে। রসূলগণ বললেন, তোমাদের অমংগল তোমাদের সাথেই লেগে আছে। (অর্থাৎ অমংগলের কারণ হল সত্য গ্রহণ না করা। আর তা হল তোমাদেরই কাজ)। আমরা তোমাদেরকে সদুপদেশ দিয়েছি; তোমরা কি তাকে অমঙ্গল বলে মনে কর? কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা অমঙ্গল নয়;) বরং তোমরা (স্বয়ং) সীমালংঘন-কারী সম্প্রদায়। (সুতরাং শরীয়তের বিরুদ্ধাচরণের কারণে তোমাদের অমঙ্গল হয়েছে এ যুক্তি-বুদ্ধির বিরুদ্ধাচরণের দরুন তোমরা এর কারণ বুঝেছ। এই সংলাপের খবর প্রচারিত হলে) শহরের প্রান্ত থেকে এক (মুসলমান) ব্যক্তি (আপন সম্প্র-দায়ের হিতাকাঙক্ষার কারণে অথবা রসূলগণের হিতাকাঙক্ষার কারণে) ছুটে আসল (এবং তাদেরকে) বলল, হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা রসূলগণের অনুসরণ কর। অনুসরণ কর তাঁদের, যাঁরা তোমাদের কাছে কোন বিনিময় কামনা করেন না এবং তাঁরা স্বয়ং সুপথপ্রাপ্তও বটে (অর্থাৎ স্বার্থপরতা যা অনুসরণের পথে অন্তরায়বিশেষ তাও তাঁদের মাঝে অবর্তমান এবং সুপথে থাকা যা অনুসরণে উদ্বুদ্ধ করে তা তাঁদের মাঝে বিদ্যমান। সুতরাং এঁদের অনুসরণ করা হবে না কেন? এছাড়া (আমার এমন কি ওযর-আপত্তি রয়েছে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, কেন! (যা ইবাদতের যোগ্য হও-য়ার প্রমাণ) তাঁর ইবাদত করব না (আর বিষয়টি নিজের উপর আরোপ করে আগন্তুক বলেছে এজন্য যাতে উদ্দিষ্টরা উত্তেজিত হয়ে চিন্তা-ভাবনা ত্যাগ না করে। আসল উদ্দেশ্য এই যে, এক আল্লাহ্‌র ইবাদত করতে তোমাদের কি ওযর আছে?) তোমাদের সবাইকে তাঁরই দিকে ফিরে যেতে হবে। (কাজেই তাঁর রসূলগণের অনু-সরণ করাই বুদ্ধিমত্তার কাজ। অতপর বলা হয়েছে যে, মিথ্যা উপাস্যরা ইবাদত পাওয়ার যোগ্য নয়।) আমি কি আল্লাহ্‌কে ছেড়ে অন্য দেবদেবীকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করব? (অথচ তারা এমন অসহায় যে,) করুণাময় (আল্লাহ্) আমাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে চাইলে সে উপাস্যদের সুপারিশ আমার কোন কাজেই আসবে না এবং তারা আমাকে (শক্তির জোরে এই কষ্ট থেকে) রক্ষাও করতে পারবে না। অর্থাৎ না তারা নিজেরা ক্ষমতার অধিকারী এবং না ক্ষমতার অধিকারীর কাছে সুপারিশের মাধ্যমও হতে পারে। কারণ প্রথমত জড় পদার্থের মধ্যে সুপারিশের যোগ্যতাই নেই; দ্বিতীয়ত আল্লাহ্‌র অনুমতি ছাড়া কেউ সুপারিশ করতে পারে না।) এমন করলে আমি প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় নিপতিত হব। (এতেও বিষয়টি নিজের উপর আরোপ করে অপরকে

শুনানো হয়েছে)। আমি তোমাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম। অতএব তোমরা (ও) আমার কথা শুন। (এবং বিশ্বাস স্থাপন কর। কিন্তু এসব কথায় তারা কর্ণপাত করল না।) বরং প্রস্তর বর্ষণ করে অথবা অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে অথবা গলা টিপে তাকে শহীদ করল। শহীদ হওয়ার সাথে সাথে তাকে (আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে) বলা হল, জান্নাতে প্রবেশ কর। (তখনও সে আপন সম্প্রদায়ের কথা চিন্তা করল---) বলতে লাগল, হায় আমার সম্প্রদায় যদি জানত আমার পালনকর্তা (ঈমান ও রসূলের অনুসরণের বরকতে) আমাকে ক্ষমা করেছেন। (এ অবস্থা জানলে তারাও বিশ্বাস স্থাপন করত এবং ক্ষমাপ্রাপ্ত ও সম্মানিত হতে পারত।) আর (জনপদবাসীরা যখন রসূলগণের সাথে এবং তাঁদের অনুসারীর সাথে এ আচরণ করল, তখন আমি তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিলাম। বস্তুত) এ জন্য আমি তার (শহীদ ব্যক্তির) মৃত্যুর পর তার সম্প্রদায়ের উপর আকাশ থেকে (ফেরেশতাদের) কোন বাহিনী অবতীর্ণ করিনি এবং এর প্রয়োজনও ছিল না। (কারণ তাদেরকে নিপাত করা এর উপর নির্ভরশীল ছিল না, যে জন্য কোন বিরাট বাহিনীর প্রয়োজন হতো বরং) সে শাস্তি ছিল এক বিকট আওয়াজ। [যা জিবরাঈল (আ) করেছিলেন অথবা অন্য কোন ফেরেশতা। صيحة বলে অন্য যে কোন আযাবও বুঝানো হয়ে থাকবে। যেমন, সূরা মু'মিনে فاخذتهم الصيحة আয়াতের তফসীরে বলা হয়েছে।] ফলে তারা তৎক্ষণাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল। (অর্থাৎ মরে গেল। অতপর কাহিনীর পরিণতি বলার জন্য মিথ্যারোপকারীদের নিন্দা করা হয়েছে যে,) আক্ষেপ (এমন) বান্দাদের জন্য, তাদের কাছে যখনই কোন রসূল আগমন করেছেন, তখনই তারা তাঁকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছে। তারা কি দেখেনি যে, আমি তাদের পূর্বে অনেক সম্প্রদায়কে (এই মিথ্যারোপ ও ঠাট্টা-বিদ্রূপের কারণে) ধ্বংস করে দিয়েছি তারা তাদের মধ্যে (দুনিয়াতে আর) ফিরে আসে না। (এ বিষয়ে চিন্তা করলে তারা মিথ্যারোপ ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ থেকে বিরত থাকত। এ শাস্তি তো দুনিয়াতে দেওয়া হয়েছে আর পরকালে) তাদের সবাইকে সমবেতভাবে অবশ্যই আমার দরবারে উপস্থিত করা হবে। (সেখানে আবার শাস্তি হবে এবং সে শাস্তি হবে চিরস্থায়ী।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا اَصْحَابَ الْقَرْيَةِ — কোন বিষয় প্রমাণ করার জন্য অনুরূপ ঘটনার দৃষ্টান্ত বর্ণনা করাকে ضرب مثل বলা হয়। পূর্বোল্লিখিত কাফিরদেরকে হুঁশিয়ার করার উদ্দেশ্যে কোরআন পাক দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রাচীনকালের একটি কাহিনী বর্ণনা করেছেন যা এক জনপদে সংঘটিত হয়েছিল।

কাহিনীতে উল্লিখিত জনপদ কোনটি? কোরআন পাক এই জনপদের নাম উল্লেখ করেনি। ঐতিহাসিক বর্ণনায় মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক হযরত ইবনে আব্বাস, কাবে

আহবার ও ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বেহ্ প্রমুখের উদ্ধৃতিক্রমে জনপদের নাম ইন্তাকিয়া উল্লেখ করেছেন। আবূ হাইয়ান ও ইবনে কাসীর বলেন, তফসীরবিদগণ থেকে এর বিপরীতে কোন উক্তি বর্ণিত নেই। মু'জামুল-বুলদানের বর্ণনা অনুযায়ী ইন্তাকিয়া শামদেশের একটি প্রখ্যাত ও বিরাট নগরী। যা তার সমৃদ্ধি ও স্থাপত্যের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। এ নগরীর দুর্গ ও নগর-প্রাচীর দর্শনীয় বস্তু ছিল। এতে খৃস্টানদের বড় বড় স্বর্ণ-রৌপ্যের কারুকার্য খচিত সুশোভিত গির্জা অবস্থিত রয়েছে। এটি একটি উপকূলীয় নগরী। ইসলামী আমলে শামবিজয়ী হযরত আবূ ওবায়দা ইবনুলজাররাহ্ (রা) এ শহরটি জয় করেছিলেন। মুজামুল-বুলদানে আরও উল্লেখ আছে যে, এ কাহিনীতে বর্ণিত হাবীব নাজ্জারের সমাধি এ শহরেই অবস্থিত। দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ এর যিয়ারত করতে আসে। যার বিবরণ পরে বর্ণনা করা হবে। এই বর্ণনা থেকে আরও জানা যায় যে, আয়াতে উল্লিখিত জনপদ হচ্ছে এই ইন্তাকিয়া নগরী।

ইবনে কাসীর লেখেন, ইন্তাকিয়া ছিল খৃস্ট ধর্ম ও খৃস্টবাদের কেন্দ্ররূপে পরিগণিত চারটি শহরের অন্যতম। এ চারটি শহর হচ্ছে কুদ্স্, রোমীয়া, আলেকজান্দ্রিয়া ও ইন্তাকিয়া। তিনি আরও লিখেছেন, খৃস্ট ধর্ম গ্রহণকারী প্রথম শহর হচ্ছে ইন্তাকিয়া। এর ভিত্তিতেই, আয়াতে উল্লিখিত জনপদটি ইন্তাকিয়া কি না সে ব্যাপারে ইবনে কাসীর (র) দ্বিধান্বিত হয়ে পড়েছেন। কেননা কোরআনের বর্ণনা অনুযায়ী এ জনপদটি ছিল রিসালত অস্বীকারকারীদের বসতি। ঐতিহাসিক বর্ণনা মতে তারা ছিল মূর্তিপূজারী মুশরিক। অতএব খৃস্ট ধর্ম গ্রহণে অগ্রগামী ইন্তাকিয়া কেমন করে এই জনপদ হতে পারে!

এ ছাড়া কোরআনে উল্লিখিত আয়াতসমূহ থেকে একথাও প্রতীয়মান হয় যে, এই ঘটনায় সমগ্র জনপদের উপর সর্বনাশা আযাব নেমে আসে, যার ফলে সেখানকার কেউ রক্ষা পায়নি। অথচ ইন্তাকিয়া সম্পর্কে ইতিহাসে এরূপ কোন ঘটনা বর্ণিত নেই। তাই ইবনে কাসীরের মতে হয় আয়াতে উল্লিখিত জনপদ ইন্তাকিয়া নয়, অন্য কোন বসতি, না হয় ইন্তাকিয়া নামেই অন্য কোন বসতি হবে যা প্রসিদ্ধ ইন্তাকিয়া শহর নয়।

ফতহুল মান্নানের গ্রন্থকার ইবনে কাসীরের এসব প্রশ্নের জওয়াব দিয়েছেন। কিন্তু এ সম্পর্কে মওলানা আশরাফ আলী থানভী (র) বয়ানুল কোরআনে যে বক্তব্য রেখেছেন, তাই নির্ভেজাল বলে মনে হল। তিনি বলেন, আয়াতের বিষয় বোঝার জন্য এই জনপদ নির্দিষ্ট করা জরুরী নয়। কোরআন পাক যখন একে অস্পষ্ট রেখেছে, তখন জবরদস্তি একে নির্দিষ্ট করার প্রয়োজনই বা কি? পূর্ববর্তী মনীষিগণও বলেন, ابهموا ما ابهمه الله অর্থাৎ আল্লাহ্ যে বিষয় অস্পষ্ট রেখেছেন, তোমরাও তাকে অস্পষ্ট থাকতে দাও।

إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ

فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ — বর্ণিত জনপদে তিনজন রসূল প্রেরিত হয়েছিলেন। এ আয়াতে তারই বিবরণ দিয়ে বলা হয়েছে যে, প্রথমে দু'জন রসূল প্রেরিত হলে জনপদের অধিবাসীরা তাঁদেরকে মিথ্যাবাদী বলে আখ্যায়িত করতে শুরু করে এবং অমান্য করে। অতপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের শক্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তৃতীয় একজন রসূল প্রেরণ করলেন। অতপর রসূলত্রয় সম্মিলিতভাবে জনপদবাসীদেরকে বললেন, إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ আমরা অবশ্যই তোমাদের হিদায়তের জন্য প্রেরিত হয়েছি।

এখানে রসূলের অর্থ কি এবং এ রসূল কারা ছিলেন? রসূল ও মুরসাল শব্দ দু'টি কোরআন পাকে সাধারণত নবী ও পয়গম্বর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এ আয়াতে আল্লাহ্ প্রেরণ করাকে নিজের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। এটাও এ বিষয়ের ইঙ্গিত যে, এখানে রসূল অর্থ নবী ও পয়গম্বর। ইবনে ইসহাক, হযরত ইবনে আব্বাস, কা'বে আহ্বার ও ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বেহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এই জনপদে প্রেরিত তিনজনই আল্লাহ্ তা'আলার পয়গম্বর ছিলেন। তাঁদের নাম সাদেক, সদুক ও শালুম বলে বর্ণিত রয়েছে। এক রেওয়ায়েতে তৃতীয় জনের নাম শামউনও উল্লেখ করা হয়েছে।---(ইবনে-কাসীর)

হযরত কাতাদাহ বলেন, এখানে مُرْسَلُونَ শব্দটি পারিভাষিক অর্থে নয়, বরং আভিধানিক 'দূত' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রেরিত তিনজন স্বয়ং পয়গম্বর ছিলেন না; বরং হযরত ঈসা (আ)-র সহচরগণের মধ্য থেকে তাঁরই নির্দেশে জনপদে প্রেরিত হয়েছিলেন।---(ইবনে কাসীর) প্রেরক ঈসা (আ) আল্লাহ্র রসূল ছিলেন বিধায় তাঁর প্রেরণও পরোক্ষভাবে আল্লাহ্ তা'আলারই প্রেরণ ছিল। তাই আয়াতে 'আল্লাহ্ প্রেরণ করেছেন' বলা হয়েছে। ইবনে কাসীর প্রথম উক্তি এবং কুরতুবী প্রমুখ দ্বিতীয় উক্তি গ্রহণ করেছেন। আয়াতের বাহ্যিক ভাষা থেকেও বোঝা যায় যে, তাঁরা আল্লাহ্র নবী ও পয়গম্বর ছিলেন।

قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ — تطير শব্দের অর্থ অশুভ ও অলক্ষুণে মনে করা। উদ্দেশ্য এই যে, শহরবাসীরা প্রেরিত লোকদের কথা অমান্য করল এবং বলতে লাগল, তোমরা অলক্ষুণে। কোন কোন রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, তাদের অবাধ্যতা এবং রসূলগণের কথা অমান্য করার কারণে জনপদে দুর্ভিক্ষ শুরু হয়ে যায়। ফলে তারা তাঁদেরকে অলক্ষুণে বলল। অথবা অন্য কোন কষ্ট-দুর্ভোগ হয়ে থাকবে। কাফিরদের সাধারণ অভ্যাস এই যে, কোন বিপদাপদ দেখলে তার কারণ হিদায়তকারী ব্যক্তিবর্গকে সাব্যস্ত করে। যেমন মূসা (আ)-র সম্প্রদায় সম্পর্কে কোরআনে আছে ঃ

فَاِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوْا لَنَا هٰذِهٖ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَّطَّيَّرُوْا بِمُوْسٰى

وَمَنْ مَّعَهٗ — এমনিভাবে সালেহ (আ)-এর সম্প্রদায় তাঁকে বলেছিল : تَطَيَّرْنَا بِكَ

وَبِمَنْ مَّعَكَ — আলোচ্য ঘটনায়ও তাই হয়েছে।

قَالُوْا طَائِرُكُمْ مَّعَكُمْ — অর্থাৎ তোমাদের অমঙ্গল তোমাদের সাথেই। অর্থাৎ এ অমঙ্গল তোমাদেরই কুকর্মের ফল। طَائِر শব্দটি প্রকৃতপক্ষে অমঙ্গল অর্থে বলা হয়। কিন্তু কখনও অমঙ্গলের প্রতিদান অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এখানে দ্বিতীয় অর্থই উদ্দেশ্য।——(ইবনে কাসীর, কুরতুবী)

وَجَاءَ مِنْ اَقْصَى الْمَدِيْنَةِ رَجُلٌ يَّسْعٰى — প্রথম আয়াতে ঘটনাস্থলকে قَرْيَةٌ শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে, যার অর্থ সাধারণ জনপদ ; তা—ছোট বস্তিই হোক অথবা বড় কোন শহর। আর এ আয়াতে সে জায়গাটিকে مَدِيْنَةٌ শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে, যা কেবল বড় শহর অর্থেই ব্যবহৃত হয়। এতে জানা গেল যে, ঘটনাস্থলটি কোন বড় শহরই ছিল। সুতরাং এতে সে উক্তিরই সমর্থন হয়, যাতে একে ইন্তাকিয়া বলা হয়েছে। আয়াতে বর্ণিত اَقْصَى الْمَدِيْنَةِ অর্থ এই যে, শহরের কোন একপ্রান্ত থেকে এক ব্যক্তি ছুটে এল। رَجُلٌ يَّسْعٰى — এতে يَسْعٰى শব্দটি سَعْى থেকে উদ্ভূত। এর আভিধানিক অর্থ দৌড়ানো। কাজেই অর্থ দাঁড়াল যে, নগরীর দূরবর্তী কোন এক প্রান্ত থেকে এক ব্যক্তি দৌড়ে এল। কোন কোন সময় سَعْى সযত্নে চলা অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন, সূরা জুম'আয় فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ বাক্যে এ অর্থই উদ্দেশ্য।

শহরের প্রান্ত থেকে আগন্তুক ব্যক্তির ঘটনা : কোরআন পাক তাঁর নাম ও অবস্থা উল্লেখ করেনি। ইবনে ইস্‌হাক হযরত ইবনে আব্বাস, কা'ব আহবার ও ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বেহ থেকে বর্ণনা করেন যে, তাঁর নাম ছিল হাবীব। তাঁর পেশা সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। প্রসিদ্ধ উক্তি এই যে, তিনি 'নাজ্জার' অর্থাৎ, ছুতার ছিলেন। ঐতিহাসিক বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, তিনিও প্রথমে মূর্তি পূজারী ছিলেন। পূর্বে প্রেরিত রসূলদ্বয়ের সাথে সাক্ষাতের পর তাঁদের শিক্ষায় অথবা তাঁদের মু'জিযা দেখে তিনি মুসলমান হয়ে যান এবং কোন এক গুহায় ইবাদতে মশগুল হন। তিনি যখন

সংবাদ পেলেন যে, শহরবাসীরা রসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলে তাঁদেরকে হত্যা করার প্রস্তুতি নিচ্ছে, তখন তিনি আপন সম্প্রদায়ের শুভেচ্ছা ও রসূলগণের প্রতি সহানুভূতির মনোভাব নিয়ে দ্রুত সম্প্রদায়ের মধ্যে উপস্থিত হলেন এবং তাদেরকে রসূলগণের অনুসরণ করার উপদেশ দিলেন। অবশেষে তিনি নিজের ঈমান ঘোষণা করে বললেনঃ

إِنِّي آمَنتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ — অর্থাৎ আমি তোমাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম—তোমরা শুনে রাখ। এ ঘোষণাটি সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যেও হতে পারে এবং এতে "তোমাদের পালনকর্তা" বলে বাস্তব ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, যদিও তারা তা স্বীকার করত না। ঘোষণাটি রসূলগণের উদ্দেশ্যেও হতে পারে এবং فَاسْمَعُونِ বলার উদ্দেশ্য এই যে, আপনারা শুনুন এবং আল্লাহ্‌র সামনে আমার ঈমানের সাক্ষ্য দিন।

قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ — অর্থাৎ উপদেশদানের উদ্দেশ্যে শহরের প্রান্ত থেকে আগত ব্যক্তিকে বলা হল; জান্নাতে প্রবেশ কর। বাহ্যত কোন ফেরেশতার মাধ্যমে তা বলা হয়েছে। জান্নাতে প্রবেশ করার অর্থ এ সুসংবাদ দেওয়া যে, জান্নাত তোমার জন্য অবধারিত হয়ে গেছে। সময় এলে অর্থাৎ হাশর-নশরের পর তুমি তা লাভ করবে।—(কুরতুবী)

এছাড়া এমন হওয়াও অসম্ভব নয় যে, তাঁকে তাঁর জান্নাতের স্থান তখন দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া বরযখ অর্থাৎ কবর জগতেও জান্নাতীদেরকে জান্নাতের ফল-ফুল ও আরাম-আয়েসের উপকরণ পৌঁছানো হয়। তাই তার বরযখে পৌঁছা একদিক দিয়ে জান্নাতেই প্রবেশ করার শামিল।

কোরআন পাকের উপরোক্ত বাক্যের দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, লোকটিকে শহীদ করে দেওয়া হয়েছিল। কেননা কেবল জান্নাতে প্রবেশ অথবা জান্নাতের বিষয়াদি দেখা মৃত্যুর পরই সম্ভবপর।

ঐতিহাসিক বর্ণনায় হযরত ইবনে-আব্বাস, মুকাতিল, মুজাহিদ প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে যে, হাবীব ইবনে ইসমাইল নাজ্জার নামক এ ব্যক্তি সেই ব্যক্তিত্রয়ের অন্যতম, যাঁরা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আবির্ভাবের দশ বছর পূর্বে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি তুব্বা আকবর সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আগমনের সংবাদ পাঠ করে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন। তৃতীয় ব্যক্তি ওয়ারাকা ইবনে নওফেলও রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বেই তাঁর প্রতি বিশ্বাসী হয়েছিলেন।—(বুখারী)

এটা একমাত্র তাঁরই বৈশিষ্ট্য যে, জন্ম ও নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বেই তিন ব্যক্তি তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেন। অন্য কোন পয়গম্বরের বেলায় এমন হয়নি।

ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বেহ বর্ণনা করেন, হাবীব নাজ্জার কুষ্ঠ রোগগ্রস্থ ছিলেন। তাঁর বাসগৃহ শহরের সর্বশেষ প্রান্তে অবস্থিত ছিল। কাল্পনিক উপাস্যদের কাছে আরোগ্য লাভের দোয়া করতে করতে তার সত্তর বছর অতিবাহিত হয়ে যায়। প্রেরিত রসূলগণ ঘটনাক্রমে সে প্রান্তবর্তী দ্বার দিয়ে ইন্তাকিয়া শহরে প্রবেশ করলে সর্বপ্রথম তার সাথেই তাঁদের দেখা হয়। তাঁরা তাকে মূর্তিপূজা পরিত্যাগ করার এবং এক আল্লাহ্‌র উপাসনা করার দাওয়াত দিলেন। তিনি বললেন, আপনাদের দাবি যে সত্য, তার কোন প্রমাণ বা নিদর্শন আছে কি? তাঁরা হ্যাঁ' বললে তিনি স্বীয় কুষ্ঠরোগের কথা উল্লেখ করে জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা এ ব্যাধি দূর করতে পারেন কি? রসূলগণ বললেন, হ্যাঁ; আমরা আমাদের পরওয়ারদিগারের কাছে দোয়া করব। তিনি তোমাকে রোগমুক্ত করবেন। তিনি বললেন, আশ্চর্যের কথা, আমি সত্তর বছর ধরে দেবদেবীদের কাছে দোয়া করছি; কিন্তু কোনই উপকার পাইনি। আপনাদের পরওয়ারদিগার একদিনে কিরূপে আমার অবস্থা পাল্টে দেবেন? রসূলগণ বললেন, হ্যাঁ আমাদের রব সর্বশক্তিমান। তুমি যাদেরকে উপাস্য স্থির করেছ, তাদের কোন গুরুত্বই নেই। তারা কারও উপকার বা অপকার করতে পারে না। একথা শুনে হাবীব আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলেন। রসূলগণ তাঁর জন্য দোয়া করলে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে সম্পূর্ণরূপে নিরাময় করে দিলেন। ফলে তাঁর ঈমান আরও দৃঢ়তর হয়ে গেল। তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন, সারাদিনে যা উপার্জন করব, তার অর্ধেক আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে দেব। সুতরাং যখন রসূলগণের বিরুদ্ধে শহরবাসীদের বিক্ষোভের সংবাদ পেলেন, তখন তিনি ছুটে এলেন এবং সম্প্রদায়কে বুঝিয়ে স্বীয় ঈমান ঘোষণা করে দিলেন। ফলে গোটা সম্প্রদায় তাঁর শত্রু হয়ে গেল এবং সবাই তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। হযরত ইবনে মসউদ (রা) বর্ণনা করেন, লাথি মেরে মেরে সবাই তাঁকে শহীদ করে দিল। কতক রেওয়ায়েতে প্রস্তর বর্ষণের কথা আছে। বেদম প্রহারের সময়ও তিনি رب اهد قومى (হে আমার পালনকর্তা, আমার সম্প্রদায়কে হিদায়ত দান করুন) বলে যাচ্ছিলেন।

কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, তারা রসূলত্রয়কেও শহীদ করে দেয়। কিন্তু কোন সহীহ্ রেওয়ায়েতে তাঁদের পরবর্তী অবস্থা বর্ণিত হয়নি। দৃশ্যত মনে হয় যে, তাঁরা নিহত হন নি। —(কুরতুবী)

يَالَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ —

—হাবীব নাজ্জার বীরত্বের সাথে আল্লাহ্‌র পথে শহীদ হয়েছিলেন। তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সাথে বিশেষ সম্মান ও অনুগ্রহমূলক ব্যবহার করে জান্নাতে প্রবেশের আদেশ দেন। তিনি যখন এই সম্মান, অনুগ্রহ ও জান্নাতের নিয়ামতসমূহ প্রত্যক্ষ করলেন, তখন সম্প্রদায়ের কথা স্মরণ করে বাসনা প্রকাশ করলেন যে, হায় আমার সম্প্রদায় যদি আমার অবস্থা সম্পর্কে অবগত হত যে, রসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের প্রতিদানে

আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে কেমন অনুগ্রহ, সম্মান ও চিরস্থায়ী নিয়ামত দান করেছেন, তবে সম্ভবত তারাও বিশ্বাস স্থাপন করত। আলোচ্য আয়াতে এই বাসনাই ব্যক্ত হয়েছে।

পয়গম্বরসুলভ দাওয়াত ও সংস্কারঃ প্রেরিত রসূলত্রয় মুশরিক ও কাফিরদের সাথে যেভাবে কথা বলেছেন, তাদের কঠোর ও তিক্ত কথার যেভাবে জওয়াব দিয়েছেন, অনুরূপভাবে তাঁদের দাওয়াতে ইসলাম গ্রহণকারী হাবীব নাজ্জার স্বীয় সম্প্রদায়ের সামনে যেভাবে বক্তব্য রেখেছেন, সেসব বিষয় পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, এতে ধর্ম প্রচারক ও সংস্কারকার্যে ব্রতী লোকদের জন্য চমৎকার পথনির্দেশ রয়েছে।

রসূলগণের উপদেশমূলক প্রচার ও শিক্ষার জওয়াবে মুশরিকরা তিনটি কথা বলেছে ঃ

(১) তোমরা তো আমাদের মতই মানুষ, আমরা তোমাদের কথা মানব কেন?

(২) করুণাময় আল্লাহ্ কারও প্রতি কোন পয়গাম ও কিতাব নাযিল করেন নি।

(৩) তোমরা নির্জলা মিথ্যা কথা বলছ।

চিন্তা করুন, নিঃস্বার্থ উপদেশমূলক আলাপ-আলোচনার জওয়াবে এরূপ উত্তেজনাপূর্ণ কথাবার্তার কি জওয়াব হতে পারত? কিন্তু রসূলগণ কি জওয়াব দিলেন। তাঁরা শুধু বললেন رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ— অর্থাৎ আমাদের পালনকর্তা জানেন, আমরা তোমাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছি। আরও বললেন ঃ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ- অর্থাৎ আমাদের কর্তব্য আমরা পালন করেছি এবং আল্লাহ্র পয়গাম সুস্পষ্টভাবে তোমাদের কাছে পেঁীছে দিয়েছি। এখন মানা না মানা তোমাদের ইচ্ছা। লক্ষ্য করুন, তাঁদের ভাষায় প্রতিপক্ষের উস্কানিমূলক কথাবার্তার কোন প্রতিক্রিয়া আছে কি? কেমন স্নেহপূর্ণ জওয়াব দিয়েছেন।

এরপর মুশরিকরা আরও বলল, তোমরা অলক্ষুণে, তোমাদের কারণেই আমরা বিপদাপদে পড়েছি। এর নির্দিষ্ট জওয়াব ছিল এই ঃ অলক্ষুণে তোমরা নিজেরাই। তোমাদের কুকর্মের কুফল তোমাদের গলার হার হয়েছে। কিন্তু রসূলগণ এ বিষয়টি অস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন, যাতে তারাই যে অলক্ষুণে, তা পরিষ্কার হয়নি। তাঁরা বললেন, طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ— অর্থাৎ তোমাদের অমঙ্গল তোমাদের সাথেই রয়েছে।

অতপর আবার স্নেহের ভঙ্গিতে বললেন, أَئِنْ ذُكِّرْتُمْ— অর্থাৎ তোমরা চিন্তা কর আমরা তোমাদের কি ক্ষতি করলাম। আমরা তো কেবল তোমাদেরকে শুভেচ্ছামূলক উপদেশই দিয়েছি। হ্যাঁ, তাঁদের সর্বাপেক্ষা কঠোর বাক্য ছিল এই ঃ

بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ- অর্থাৎ তোমরাই সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়। তোমরা তিলকে তালে পরিণত কর।

এ হচ্ছে রসূলগণের সংলাপ। এখন তাঁদের দাওয়াতে সাড়াদানকারী নও-মুসলিমের সংলাপের প্রতিও লক্ষ্য করুন। তিনি প্রথমে দু'টি কথা বলে সম্প্রদায়কে রসূলগণের কথা মেনে নেওয়ার আহবান জানালেন। প্রথম এই যে, চিন্তা কর, এরা দূরদূরান্ত থেকে তোমাদেরকে উপদেশ দেওয়ার জন্য এসেছেন। সফরের কষ্ট সহ্য করেছেন, তদুপরি তোমাদের কাছে কোনরকম বিনিময়ও কামনা করেন না। এরূপ নিঃস্বার্থ লোকদের কথা চিন্তা-ভাবনার দাবি রাখে। দ্বিতীয় এই যে, তাঁরা যা বলেছেন, তা একান্ত, জ্ঞান-বুদ্ধি, ন্যায়-নীতি ও হিদায়েতের কথা। এরপর সম্প্রদায়কে তাদের ভ্রান্তি ও পথভ্রষ্টতা সম্পর্কে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে বললেন, তোমরা তোমাদের সৃষ্টিকর্তা ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র ইবাদত পরিত্যাগ করে স্বহস্ত-নির্মিত মূর্তিকে ত্রাণকর্তা মনে করে বসেছ। অথচ তারা তোমাদের এতটুকু উপকার করার শক্তি রাখে না এবং আল্লাহ্র কাছেও তাদের কোন মর্যাদা নেই যে, সুপারিশ করে তোমাদেরকে বিপদমুক্ত করবে।

কিন্তু হাবীব নাজ্জার কথাগুলো তাদেরকে সরাসরি না বলে নিজের সাথে সংযুক্ত করার পন্থা অবলম্বন করলেন।

وَمَا لِىَ لَآ اَعْبُدُ الَّذِىْ فَطَرَنِىْ— অর্থাৎ এভাবে তিনি প্রতিপক্ষের জন্য উত্তেজিত না হয়ে ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করার সুযোগ সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু তাঁর সম্প্রদায় যখন তাঁর নম্রতা ও সৌজন্যবোধের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করল না এবং তাঁকে হত্যা করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ল, তখনও তিনি বদদোয়ার পরিবর্তে رب اهد قومى বলতে বলতে আল্লাহ্র কাছে প্রাণ সঁপে দিলেন। অর্থাৎ হে আমার পালনকর্তা, আমার সম্প্রদায়কে সুমতি দান করুন। আরও আশ্চর্যের বিষয় যে, সম্প্রদায়ের নির্যাতনে শহীদ হাবীব নাজ্জার যখন আল্লাহ্র অনুগ্রহ, সম্মান ও জান্নাতের নিয়ামত প্রত্যক্ষ করলেন, তখনও পাপিষ্ঠ সম্প্রদায়ের কথা স্মরণ করে শুভেচ্ছা ও কল্যাণাকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করলেন যে, হায়! আমার সম্প্রদায় আমার এই সম্মান সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হলে তারাও এতে আমার প্রাপ্ত নিয়ামতসমূহের অংশীদার হয়ে যেত। সোবহানাল্লাহ্, মানুষের অত্যাচার-উৎপীড়ন সত্ত্বেও তাদের হিতাকাঙ্ক্ষা এ ধরনের মহাপুরুষদের শিরা-উপশিরায় কিভাবে গ্রথিত হয়ে থাকে। পরোপকারের এই মহান প্রেরণার ফলেই জাতিসমূহের কায়া পাল্টে যায় এবং তারা এমন মর্যাদার আসন লাভ করে, যা ফেরেশতাদের জন্যও ঈর্ষার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

বর্তমান যুগের প্রচারক ও সংস্কারকগণ সাধারণভাবে এই পয়গম্বরসুলভ আদর্শ পরিত্যাগ করেছেন। ফলে মানুষের মধ্যে তাদের দাওয়াত ও প্রচার নিষ্ফল হয়ে যায়। বক্তৃতা-বিবৃতিতে মনের ঝাল মেটানো এবং প্রতিপক্ষের প্রতি বিদ্রূপাত্মক বাক্য বর্ষণ করাকে আজকাল বাহাদুরী জ্ঞান করা হয়, যা প্রতিপক্ষকে আরও বেশি জেদ ও হঠকারিতার আবর্তে নিক্ষেপ করে।

وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ — এতে মিথ্যারোপকারী ও হাবীব নাজ্জারকে শহীদকারী সম্প্রদায়ের উপর আসমানী আযাবের বিষয় বর্ণিত হয়েছে। এর ভূমিকায় বলা হয়েছে যে, এ সম্প্রদায়কে আযাব দেওয়ার জন্য আমাকে আকাশ থেকে ফেরেশতাদের কোন বাহিনী পাঠাতে হয়নি এবং এরূপ বাহিনী পাঠানো আমার রীতিও নয়। কারণ আল্লাহ্র একজন ফেরেশতাই বড় বড় শক্তিশালী বীর সম্প্রদায়কে মুহূর্তের মধ্যে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। কাজেই তাঁর জন্য ফেরেশতার বাহিনী প্রেরণ করার কি প্রয়োজন! এরপর তাদের উপর আগত আযাবের বিষয় বর্ণনা করে বলা হয়েছে, একজন ফেরেশতার বিকট চীৎকারের ফলে তারা সবাই নিথর-নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

বর্ণিত আছে যে, জিবরাঈল আমীন ফেরেশতা শহরের দরজার দুই বাহু ধরে এমন কঠোর ও বিকট আওয়াজ দিলেন, যার ফলে সবারই প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেল। তাদের মৃত্যুকে কোরআন خَامِدُونَ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছে। خامد এর অর্থ আগুনের নিভে যাওয়া। প্রত্যেক প্রাণীর প্রাণ সহজাত তাপের উপর নির্ভরশীল। এই তাপ খতম হওয়ার নামই মৃত্যু। কাজেই خامدون অর্থ হল সহজাত তাপ খতম হওয়ার কারণে তারা ছিল শীতল ও নিথর।

وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ۝ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ۝ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ۝ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ۝ وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا

هُمْ مُّظْلِمُونَ ﴿٣٧﴾ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ
الْعَلِيمِ ﴿٣٨﴾ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ﴿٣٩﴾
لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۚ وَكُلٌّ
فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٤٠﴾ وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ
الْمَشْحُونِ ﴿٤١﴾ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ ﴿٤٢﴾ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ
فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ ﴿٤٣﴾ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ ﴿٤٤﴾

(৩৩) তাদের জন্য একটি নিদর্শন মৃত পৃথিবী। আমি একে সঞ্জীবিত করি এবং তা থেকে উৎপন্ন করি শস্য, তারা তা থেকে ভক্ষণ করে। (৩৪) আমি তাতে সৃষ্টি করি খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান এবং প্রবাহিত করি তাতে নির্ঝরিণী। (৩৫) যাতে তারা তার ফল খায়। তাদের হাত একে সৃষ্টি করে না। অতপর তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না কেন? (৩৬) পবিত্র তিনি, যিনি যমীন থেকে উৎপন্ন উদ্ভিদকে, তাদেরই মানুষকে এবং যা তারা জানেনা, তার প্রত্যেককে জোড়া জোড়া করে সৃষ্টি করেছেন। (৩৭) তাদের জন্য এক নিদর্শন রাত্রি, আমি তা থেকে দিনকে অপসারিত করি, তখনই তারা অন্ধকারে থেকে যায়। (৩৮) সূর্য তার নির্দিষ্ট অবস্থানে আবর্তন করে। এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহ্‌র নিয়ন্ত্রণ। (৩৯) চন্দ্রের জন্য আমি বিভিন্ন মনযিল নির্ধারিত করেছি। অবশেষে সে পুরাতন খর্জুর শাখার অনুরূপ হয়ে যায়। (৪০) সূর্য নাগাল পেতে পারে না চন্দ্রের এবং রাত্রি অগ্রে চলে না দিনের। প্রত্যেকেই আপন আপন কক্ষপথে সন্তরণ করে। (৪১) তাদের জন্য একটি নিদর্শন এই যে, আমি তাদের সন্তান-সন্ততিকে বোঝাই নৌকায় আরোহণ করিয়েছি। (৪২) এবং তাদের জন্য নৌকার অনুরূপ যানবাহণ সৃষ্টি করেছি, যাতে তারা আরোহণ করে। (৪৩) আমি ইচ্ছা করলে তাদেরকে নিমজ্জিত করতে পারি, তখন তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই এবং তারা পরিত্রাণও পাবে না। (৪৪) কিন্তু আমারই পক্ষ থেকে কৃপা এবং তাদেরকে কিছুকাল জীবনোপভোগ করার সুযোগ দেওয়ার কারণে তা করি না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(তওহীদের নিদর্শনাবলীর মধ্য থেকে) তাদের জন্য একটি নিদর্শন মৃত পৃথিবী (এতে নিদর্শনের বিষয় এই যে,) আমি একে (বৃষ্টির দ্বারা) সঞ্জীবিত করি এবং তা থেকে (বিভিন্ন) শস্য উৎপন্ন করি। তারা তা থেকে ভক্ষণ করে। আমি তাতে

সৃষ্টি করি খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান এবং (বাগানে জল সেচের জন্য) তাতে প্রবাহিত করি নির্ঝরিণী, যাতে (শস্যের ন্যায়) তারা তার (অর্থাৎ, বাগানের) ফলমূল খায়। একে (অর্থাৎ, ফল ও শস্যকে) তাদের হাত সৃষ্টি করে না। (বীজ বপন ও জল সেচন বাহ্যত তাদের হাতে হলেও বীজ থেকে বৃক্ষ এবং বৃক্ষ থেকে ফল উদ্গত করার মধ্যে তাদের কোন হাত নেই। এটা আল্লাহ্ তা'আলারই কাজ।) অতপর (এমন প্রমাণাদি দেখেও) তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না কেন? (কৃতজ্ঞতার প্রথম ধাপ হচ্ছে আল্লাহর অস্তিত্ব ও একত্ব স্বীকার করে নেওয়া।) পবিত্র তিনি, যিনি যমীন থেকে উৎপন্ন উদ্ভিদকে, মানুষকে এবং যা তারা জানে না, তার প্রত্যেককে জোড়া জোড়া করে সৃষ্টি করেছেন; (উদ্ভিদের মধ্যে পরস্পরবিরোধী জোড়া যেমন গম-যব, মিষ্ট ফল ও টক ফল, মানুষের মধ্যে যেমন নর ও নারী এবং অজানা বস্তুসমূহের মধ্যেও কোন বস্তু বিপরীত জোড়া থেকে মুক্ত নয়। এ থেকে জানা গেল যে, আল্লাহ্ তা'আলার কোন বিপরীত নেই।) তাদের জন্য এক নিদর্শন রাত্রি। (অন্ধকার আসল বিধায় রাত্রিই আসল সময় ছিল। সূর্যের আলো এসে একে আবৃত করে নিয়েছিল; যেমন ছাগলের গোশ্তকে তার চামড়া আবৃত করে নেয়।) অতপর আমি (সূর্যের আলো দূর করে যেন) তা থেকে (অর্থাৎ রাত্রি থেকে) দিনকে অপসারিত করি। তখনই (আবার রাত্রি এসে যায় এবং) তারা অন্ধকারে থেকে যায়। (আরও একটি নিদর্শন) সূর্য (সে) তার অবস্থানের দিকে আবর্তন করে। (এখানে অবস্থানের এক অর্থ সেই কেন্দ্রবিন্দু, যেখান থেকে রওয়ানা হয়ে বার্ষিক গতি পূর্ণ করে আবার সেখানে পৌঁছে যায়। দ্বিতীয় অর্থ সেই দিগন্তস্থিত বিন্দু, দৈনিক গতি পূর্ণ করে যেখানে পৌঁছে অস্ত যায়।) এটা সেই আল্লাহ্ কর্তৃক সুনির্দিষ্ট, যিনি পরাক্রমশালী (অর্থাৎ, শক্তিমান) সর্বজ্ঞ (এসব ব্যবস্থাপনার রহস্য ও উপযোগিতা জানেন এবং শক্তি বলে এগুলো প্রয়োগ করেন। আরও এক নিদর্শন) চন্দ্র, তার (চলার) জন্য আমি বিভিন্ন মনযিল নির্ধারিত করেছি। (সে প্রত্যহ এক মনযিল অতিক্রম করে) অবশেষে (চিকন হতে হতে) পুরাতন খর্জুর শাখার অনুরূপ হয়ে যায়, (যা সরু ও বাঁকা হয়ে থাকে। নিস্তেজ আলোর কারণে হলুদ বর্ণের সাথেও তুলনা হতে পারে। সূর্য ও চন্দ্রের আবর্তন এবং রাত্রি ও দিনের আগমন নির্গমন এমন সুশৃঙ্খলভাবে রাখা হয়েছে যে,) সূর্যের সাধ্য নেই যে, চন্দ্রের (আলোদানের সময় অর্থাৎ রাত্রিতে তার) নাগাল পায়। (অর্থাৎ সূর্য সময়ের আগেই উদিত হয়ে চন্দ্রকে এবং তার সময় অর্থাৎ, রাত্রিকে সরিয়ে দিন করতে পারে না। এমনিভাবে চন্দ্র ও সূর্যের আলো দানের সময় তার নাগাল পায় না। এমনি-ভাবে) রাত্রি দিনের অগ্রে চলতে পারে না। (অর্থাৎ দিনের নির্দিষ্ট সময় শেষ হওয়ার পূর্বে রাত্রি আসতে পারে না, যেমন দিনও তা পারে না।) প্রত্যেকেই (অর্থাৎ, সূর্য ও চন্দ্র) আপন আপন কক্ষপথে (এমনভাবে চলছে যেন) সন্তরণ করে। তারা হিসাবের বাইরে যেতে পারে না, গেলে দিবা-রাত্রির হিসাব ত্রুটিযুক্ত হয়ে যেত।) তাদের জন্য এক নিদর্শন এই যে, আমি তাদের সন্তান-সন্ততিকে বোঝাই নৌকায় আরোহণ করিয়েছি। (অধিকাংশ মানুষ তাদের সন্তান-সন্ততিকে বাণিজ্য ব্যপদেশে সফরে প্রেরণ করত।

সুতরাং এতে তিনটি নিয়ামতের দিকে ইঙ্গিত হয়েছে---এক, বোঝাই নৌকাকে পানির উপর চলমান করা, অথচ ভারী হওয়ার কারণে এর ডুবে যাওয়া উচিত ছিল। দুই, তাদেরকে সন্তান-সন্ততি দান করা। তিন, রিযিক ও তার উপকরণ দেওয়া। ফলে তারা নিজেরা গৃহে বসে থাকে এবং সন্তানসন্ততিকে রিযিক সংগ্রহে প্রেরণ করে।) এবং (স্থলভাগে সফরের জন্য) আমি তাদের জন্য নৌকার অনুরূপ যানবাহন সৃষ্টি করেছি, যেগুলোতে তারা আরোহণ করে। (অর্থাৎ, উট ইত্যাদি। নৌকার সাথে তুলনা এদিক দিয়ে যে, এগুলোতেও আরোহণ ও মাল পরিবহন করা যায় এবং দূরত্ব অতিক্রম করা যায়। আরবদেশে উটকে سَفِيْنَةُ الْبَر অর্থাৎ স্থলের জাহাজ বলা হত। এর ফলে তুলনাটি আরও অলংকারপূর্ণ হয়েছে। অতপর নৌকার সাথে মিল রেখে কাফিরদের জন্য একটি শাস্তিবাণী উল্লেখ করা হয়েছে ঃ) আমি ইচ্ছা করলে তাদেরকে নিমজ্জিত করতে পারি। তখন (তাদের উপাস্যদের মধ্য থেকে) তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী হবে না। (যে তাদেরকে নিমজ্জিত হওয়া থেকে বাঁচিয়ে রাখে) এবং তারা (নিমজ্জিত হওয়ার পর মৃত্যু থেকে) পরিত্রাণও পাবে না। কিন্তু আমারই কৃপা এবং তাদেরকে কিছুকাল (পার্থিব জীবন) ভোগ করার সুযোগ দান করার কারণে (অবকাশ দিয়ে রেখেছি)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা ইয়াসীনের অধিকতর বিষয়বস্তু হচ্ছে কুদরতের নিদর্শনাবলী এবং আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামত ও অনুগ্রহরাজি বর্ণনা করে পরকাল সপ্রমাণ করা এবং হাশর-নশরের বিশ্বাসে মানুষকে পাকাপোক্ত করা। উল্লিখিত আয়াতসমূহে কুদরতের এমনি ধরনের নির্দেশাবলী বর্ণিত হয়েছে। এগুলো একদিকে আল্লাহ্ তা'আলার পূর্ণ শক্তির প্রকৃষ্ট প্রমাণ এবং অপরদিকে মানুষ ও সাধারণ সৃষ্টির প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ নিয়ামত ও অনুগ্রহরাজি এবং সেগুলোর অভাবনীয় রহস্যের সাক্ষী।

প্রথম আয়াতে ধরিত্রীর দৃষ্টান্ত বর্ণিত হয়েছে, যা সব সময় সব মানুষের সামনে রয়েছে। শুষ্ক ধরিত্রীর উপর আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হয়। ফলে তাতে এক প্রকার জীবন সঞ্চারিত হয় এবং উদ্ভিদ, বৃক্ষ ও ফলমূল প্রকাশ পায়। অতপর এসব বৃক্ষকে বৃদ্ধি করা ও অব্যাহত রাখার জন্য ভূগর্ভে ও ভূপৃষ্ঠে প্রস্রবণ প্রবাহিত করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। لِيَأْكُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖ—অর্থাৎ বায়ু, মেঘমালা এবং ধরিত্রীর সমস্ত শক্তিকে কাজে লাগানোর উদ্দেশ্য মানুষ যাতে সেসব বৃক্ষের ফলমূল ভক্ষণ করে। এগুলো তো প্রত্যক্ষ বিষয়, অতপর মানুষকে এমন এক বিষয়ে হুঁশিয়ার করা হয়েছে, যার জন্য সমগ্র কারখানা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

উদ্ভিদ উৎপন্ন করার কাজে মানুষের কোন হাত নেই ঃ বলা হয়েছে وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ অধিকাংশ তফসীরবিদ এর অনুবাদ করেছেন, তাদের হাত এসব ফল তৈরি করেনি। এ বাক্যটি অনবধান মানুষকে আহবান জানিয়েছে যে, একটু চিন্তা কর এই শস্য-শ্যামল ধরিত্রীতে এ ছাড়া তোমার কাজ কি যে তুমি মাটিতে বীজ বপন করেছ, তাকে সিক্ত করেছ, নরম করেছ যাতে অংকুরোদগমে অসুবিধা না হয়। কিন্তু বীজ থেকে বৃক্ষ উৎপন্ন করা, বৃক্ষকে পত্র-পল্লবে সজ্জিত করা এবং তাকে ফলে ও ফুলে সমৃদ্ধ করা---এসব কাজে তোমার কি হাত আছে? এগুলো তো একান্তভাবে সর্বশক্তিমান ও প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্ তা'আলারই কাজ। তাই এসব বস্তু দ্বারা উপকার লাভ করায় সেই স্রষ্টা ও মালিককে বিস্মৃত না হওয়া তোমার অবশ্য কর্তব্য। সূরা ওয়াকেয়ার এ আয়াতটি এরই অনুরূপ, أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ءَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ অর্থাৎ তোমরা যা বপন কর, তাকে সমৃদ্ধ করে বৃক্ষে পরিণত করার কাজটি তোমরা কর, না আমি করি? সারকথা এই যে, এসব ফলমূল তৈরিতে মানুষের কোন হাত না থাকলেও আমি এগুলো সৃষ্টি করে মানুষকে মালিক বানিয়ে দিয়েছি। তৎসঙ্গে এগুলো ভক্ষণ করার ও কাজে লাগাবার নৈপুণ্যও শিক্ষা দিয়েছি।

মানুষের খাদ্য ও জীবজন্তুর খাদ্যের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য রয়েছে ঃ ইবনে জরীর প্রমুখ তফসীরবিদ وَمَا عَمِلَتْهُ বাক্যের مَا-কে مَوْصُول -এর অর্থে ধরে অনুবাদ করেছেন এসব বস্তু সৃষ্টি করেছি, যাতে মানুষ এগুলোর ফলমূল ভক্ষণ করে এবং সেই বস্তুও ভক্ষণ করে, যা এসব উদ্ভিদ ও ফলমূল দিয়ে মানুষ স্বহস্তে তৈরি করে। উদাহরণত ফলমূল দিয়ে নানারকম হালুয়া, আচার, চাটনী ইত্যাদি তৈরি করা হয়। কতক ফল থেকে তৈল বের করা হয়। সারকথা এই যে, ফলমূল মানুষের কর্ম ছাড়াও খাওয়ার যোগ্য করে সৃজিত হয়েছে এবং এক এক ফল দিয়ে বিভিন্ন প্রকার সুস্বাদু ও উপাদেয় বস্তু তৈরি করার নৈপুণ্যও আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন।

এমতাবস্থায় ফল সৃষ্টি করা যেমন একটি নিয়ামত, তেমনি ফল দিয়ে হরেক রকমের সুস্বাদু ও উপাদেয় খাদ্য তৈরির নৈপুণ্য শিক্ষা দেওয়াও একটি নিয়ামত। এই তফসীর উদ্ধৃত করে ইবনে কাসীর বলেন, হযরত ইবনে মসঊদের এক কেরাত দ্বারাও এই তফসীরটি সমর্থিত হয়। তাঁর কেরাতে مَا শব্দের পরিবর্তে مِمَّا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ রয়েছে।

এর বিশদ বর্ণনা এই যে, দুনিয়ার সকল জীব-জন্তু, উদ্ভিদ ও ফল ভক্ষণ করে। কতক জানোয়ার মাংস এবং কতক জানোয়ার মাটি ভক্ষণ করে। কিন্তু তাদের খোরাক একক বস্তুই হয়ে থাকে। তৃণভোজী জন্তু খাঁটি তৃণ এবং মাংসভোজী জন্তু খাঁটি মাংস ভক্ষণ করে। কয়েক প্রকারের বস্তুকে একত্রে মিলিয়ে নানারকম খাদ্য প্রস্তুত করা লবণ, মরিচ, চিনি, টক ইত্যাদি মিশ্রিত করে একই খাদ্যের দশ প্রকার তৈরি করা---এক প্রকার মিশ্র খোরাক একমাত্র মানুষেরই বৈশিষ্ট্য। চর্ব্য-চুষ্য-লেহ্য-পেয় খাদ্য তৈরি করার নৈপুণ্য মানুষকেই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলার এসব নিয়ামত উল্লেখ করার পর উপসংহারে বলা হয়েছে أَفَلَا يَشْكُرُونَ—বুদ্ধিমানরা এসব বস্তু দেখার পরও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনা কেন? অতপর মানুষ ও জীবজন্তুকে শামিল করে সর্বময় ক্ষমতার আরও একটি নিদর্শন প্রকাশ করা হয়েছে سُبْحَانَ

الَّذِىْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

এতে أَزْوَاج শব্দটি زوج -এর বহুবচন। অর্থ জোড়া। জোড়ার মধ্যে পরস্পর-বিরোধী দুই বস্তু থাকে, যেমন নর ও নারীর মধ্যে নরকে নারীর এবং নারীকে নরের জোড়া বলা হয়। এমনিভাবে জীবজন্তুর নর ও মাদা পরস্পরে জোড়া। অনেক উদ্ভিদের মধ্যেও নর ও মাদার অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে। খেজুর ও পেঁপে গাছের মধ্যে তো এটা সুবিদিতই। অন্যান্য বস্তুর মধ্যেও এটা অবান্তর নয়। আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণায় জানা গেছে যে, সমস্ত ফলবিশিষ্ট ও ফুলবিশিষ্ট বৃক্ষের মধ্যে নর ও মাদা হয়ে থাকে এবং এগুলোতে প্রজনন প্রক্রিয়াও চালু আছে। এমনি ধরনের গোপন প্রক্রিয়া যদি জড়পদার্থ ও অন্যান্য সৃষ্টবস্তুর মধ্যেও থেকে থাকে, তবে তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। مِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ বাক্যে এদিকেই ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সাধারণভাবে তফসীরবিদগণ أَزْوَاج শব্দের অর্থ নিয়েছেন প্রকার ও শ্রেণী। কেননা, দু'টি বিপরীত বস্তুকেও জোড়া বলা হয়; যেমন শৈত্য---উত্তাপ, জল-স্থল, দুঃখ-আনন্দ, রোগ-সুস্থতা ইত্যাদি। এগুলোর প্রত্যেকটির মধ্যে সর্বোচ্চ, সর্বনিম্ন ও মাঝারি হওয়ার দিক দিয়ে অনেক স্তর ও শ্রেণী হয়ে যায়। অনুরূপভাবে মানুষ ও জন্তু-জানোয়ারের মধ্যে বর্ণ, আকার, ভাষা ও চালচলনের দিক দিয়ে অনেক শ্রেণী ও প্রকার রয়েছে। أَزْوَاج শব্দের মধ্যে এগুলো সব দাখিল আছে। আয়াতের প্রথমে مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ বলে উদ্ভিদের বিভিন্ন প্রকার বর্ণনা করা হয়েছে। অতপর مِنْ اَنْفُسِهِمْ বলে মানুষের

শ্রেণী ও প্রকার উল্লেখ করা হয়েছে। সর্বশেষে وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ বলে অনাবিষ্কৃত হাজারো সৃষ্টির দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। ভূ-গর্ভে, সমুদ্রে এবং পর্বতসমূহে জীবজন্তু, উদ্ভিদ ও জড় পদার্থের কি পরিমাণ প্রকার রয়েছে, তা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন।

وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ — এখানে আকাশে ও দিগন্তে বিস্তৃত সৃষ্ট বস্তুসমূহের মধ্যে কুদরতের নিদর্শনাবলী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। سلخ — এর শাব্দিক অর্থ চামড়া বের করা। কোন জন্তুর দেহ থেকে চামড়া অথবা অন্য কোন বস্তুর উপর থেকে আবরণ সরিয়ে দিলে ভিতরের বস্তু জাহির হয়ে যায়। এ দৃষ্টান্তে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, দুনিয়াতে অন্ধকারই আসল; আলোক বৈপত্তিক বিষয়। এটা গ্রহ ও তারকার মাধ্যমে পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করে নেয়। আল্লাহ্ তা'আলার ব্যবস্থাধীনে নির্দিষ্ট সময়ে আলোকে উপর থেকে সরিয়ে নিলে অন্ধকারই থেকে যায়। একেই রাত্রি বলা হয়।

وَالشَّمْسُ تَجْرِىْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ — অর্থাৎ সূর্য তার অবস্থানস্থলের দিকে চলতে থাকে। এই অবস্থানস্থল স্থানগত ও কালগত উভয় প্রকার হতে পারে। مستقر শব্দটি কখনও ভ্রমণের শেষ সীমার অর্থেও ব্যবহৃত হয় যদিও সাথে সাথে বিরতি না দিয়ে দ্বিতীয় ভ্রমণ শুরু হয়ে যায়।---(ইবনে-কাসীর)

কোন কোন তফসীরবিদ এখানে কালগত অবস্থানস্থল অর্থ নিয়েছেন; অর্থাৎ, সেই সময়, যখন সূর্য তার নির্দিষ্ট গতি সমাপ্ত করবে। সে সময়টি কিয়ামতের দিন। এ তফসীর অনুযায়ী আয়াতের অর্থ এই যে, সূর্য তার কক্ষপথে মজবুত ও অটল ব্যবস্থাধীনে পরিভ্রমণ করছে। এতে কখনও এক মিনিট ও এক সেকেণ্ডের পার্থক্য হয় না। সূর্যের এই গতি চিরস্থায়ী নয়। তার একটি বিশেষ অবস্থানস্থল আছে; যেখানে পৌঁছে তার গতি স্তব্ধ হয়ে যাবে। সেটা হচ্ছে কিয়ামতের দিন। এই তফসীর হযরত কাতাদাহ্ থেকে বর্ণিত আছে।---(ইবনে কাসীর)

সূরা যুমারের এক আয়াতেও এর সমর্থন পাওয়া যায় যে, مستقر--এর অর্থ কিয়ামতের দিন। আয়াতটি এই:

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ الَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى الَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَّجْرِىْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى -

এতেও সূরা ইয়াসীনের আলোচ্য আয়াতের অনুরূপ বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে। দিবা-রাত্রির পরিবর্তনকে সাধারণের দৃষ্টি অনুযায়ী রূপক আকারে বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা রাত্রি দ্বারা দিবসকে এবং দিবস দ্বারা রাত্রিকে আচ্ছন্ন করে দেন। রাত্রিও দিবস যেন, দু'টি আবরণ। রাত্রির আবরণ দিনের উপর ফেলে দিলে রাত্রি হয়ে যায় এবং দিনের আবরণ রাত্রির উপর ফেলে দিলে দিন হয়ে যায়। এরপর বলা হয়েছে সূর্য ও চন্দ্র উভয়ই আল্লাহ্ তা'আলার আজ্ঞাবহ। প্রত্যেকেই বিশেষ মেয়াদের দিকে ধাবিত হচ্ছে। এখানে اجل مسمى শব্দের অর্থ নির্দিষ্ট মেয়াদ। অর্থাৎ সূর্য ও চন্দ্র উভয়ের গতি নির্দিষ্ট মেয়াদে অর্থাৎ কিয়ামতে পৌঁছে খতম হয়ে যাবে। আলোচ্য আয়াতেও বাহ্যত مستقر শব্দ দ্বারা এই নির্দিষ্ট মেয়াদই বোঝানো হয়েছে। এ তফসীরের অর্থেও কোন খটকা নেই এবং সৌর বিজ্ঞানের আলোকেও কোন আপত্তি নেই।

কতক তফসীরবিদ কয়েকজন সাহাবী থেকে বর্ণিত বুখারী ও মুসলিমের একটি হাদীসের ভিত্তিতে আয়াতে স্থানগত অবস্থানস্থল অর্থ নিয়েছেন।

আবূ যর গিফারী (রা) একদিন রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাথে সূর্যাস্তের সময় মসজিদে উপস্থিত ছিলেন। রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, আবূ যর, সূর্য কোথায় অস্ত যায় জান? আবূ যর বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলই ভাল জানেন। তখন রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, সূর্য চলতে চলতে আরশের নিচে পৌঁছে সিজদা করে। অতপর বললেন, وَالشَّمْسُ تَجْرِىْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا আয়াতে مستقر বলে তাই বোঝানো হয়েছে।

হযরত আবূ যরেরই এক রেওয়ায়েতে আরও আছে, আমি রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে উপরোক্ত আয়াতের তফসীর জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, مستقرها تحت العرش ইমাম বুখারী একাধিক জায়গায় রেওয়ায়েতটি উল্লেখ করেছেন।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর থেকেও এই বিষয়বস্তুর হাদীস বর্ণিত আছে। এতে অতিরিক্ত আরও আছে যে, প্রত্যহ সূর্য আরশের নিচে পৌঁছে সিজদা করে এবং নতুন পরিভ্রমণের অনুমতি প্রার্থনা করে। অনুমতি লাভ করে নতুন পরিভ্রমণ শুরু করে। অবশেষে এমন একদিন আসবে, যখন তাকে নতুন পরিভ্রণের অনুমতি দেওয়া হবে না, বরং পশ্চিমে অস্ত যেয়ে পশ্চিম থেকে উদিত হওয়ার আদেশ দেওয়া হবে। এটা হবে কিয়ামত সন্নিকটবর্তী হওয়ার একটি আলামত। তখন তওবা ও ঈমানের দরজা বন্ধ হয়ে যাবে এবং কোন গোনাহ্গার, কাফির ও মুশরিকের তওবা কবূল করা হবে না।
---(ইবনে কাসীর)

আরশের নিচে সূর্যের সিজদা : এসব হাদীস থেকে জানা যায় যে, আয়াতে স্থানগত অবস্থানস্থল অর্থাৎ সেই জায়গা বোঝানো হয়েছে, যেখানে সূর্যের গতি শেষ

হয়ে যায়। আরও জানা গেল যে, এই গতি আরশের নিচে পৌঁছার পর শেষ হয়। অতএব আয়াতের অর্থ এই যে, সূর্য প্রত্যহ বিশেষ অবস্থানস্থলের দিকে ধাবিত হয় এবং সেখানে পৌঁছে আল্লাহ্ তা'আলার সামনে সিজদা পরবর্তী পরিভ্রমণের অনুমতি প্রার্থনা করে। অনুমতি পাওয়ার পর দ্বিতীয় পরিভ্রমণ শুরু করে।

কিন্তু ঘটনাবলী, চাক্ষুষ প্রমাণ এবং সৌর বিজ্ঞানের বর্ণিত নীতির ভিত্তিতে এতে একাধিক শক্তিশালী খট্‌কা দেখা দেয়।

প্রথম, কোরআন ও হাদীস থেকে আরশের অবস্থা এই জানা যায় যে, আরশ সমগ্র ভূ-মণ্ডল ও নভোমণ্ডলকে ঘিরে রেখেছে। ভূমণ্ডল এবং গ্রহ-নক্ষত্রসহ সমগ্র নভোমণ্ডল আরশের অভ্যন্তরে আবদ্ধ রয়েছে। কাজেই সূর্য তো সর্বদা ও সর্বাবস্থায় আরশের নিচেই রয়েছে। অস্ত যাওয়ার পর আরশের নিচে যাওয়ার মানে কি?

দ্বিতীয়, সাধারণভাবে প্রত্যক্ষ করা হয় যে, সূর্য যখন এক জায়গায় অস্ত যায়, তখনই অন্য জায়গায় উদিত হয়। তাই তার উদয় ও অস্ত সর্বদা ও সর্বাবস্থায় অব্যাহত রয়েছে। সুতরাং অস্তের পর আরশের নিচে যাওয়া ও সিজদা করার অর্থ কি?

তৃতীয়, উপরোক্ত হাদীস থেকে বাহ্যত জানা যায় যে, সূর্য তার অবস্থানস্থলে পৌঁছে বিরতি করে এবং এতে সে আল্লাহ্ তা'আলার সামনে সিজদা করত পরবর্তী পরিভ্রমণের অনুমতি গ্রহণ করে। অথচ চাক্ষুষ দেখা যায় যে, সূর্যের গতিতে কোন বিরতি নেই। অতপর সূর্যের উদয় ও অস্ত বিভিন্ন জায়গার দিক দিয়ে যেহেতু সর্বদাই অব্যাহত থাকে, তাই তার বিরতিও সর্বদা ও সর্বক্ষণ হওয়া চাই, যার ফলে সূর্য কোন সময় গতিশীলই হবে না।

এগুলো কেবল সৌর বিজ্ঞানেরই খটকা নয়, ঘটনাবলী এবং চাক্ষুষ অভিজ্ঞতার আলোকেও এসব খটকা দেখা দেয় যা উপেক্ষণীয় নয়। দার্শনিক বাৎলীমূসের মতবাদ ছিল এই যে, সূর্য সর্বোচ্চ আকাশের অনুগামী হয়ে স্বীয় কক্ষপথে প্রাত্যহিক বিচরণ করে এবং সূর্য চতুর্থ আকাশে কেন্দ্রীভূত রয়েছে। কিন্তু দার্শনিক পিথাগোরাস এই মতবাদের বিরোধিতা করেন। আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা এটা প্রায় নিশ্চিত করে দিয়েছে যে, বাৎলীমূসের মতবাদ ভ্রান্ত এবং পিথাগোরাসের মতবাদ নির্ভুল। সাম্প্রতিক-কালের মহাশূণ্য ভ্রমণ এবং চন্দ্রপৃষ্ঠে মানুষের পদচারণার ঘটনাবলী প্রমাণ করেছে যে, সমস্ত গ্রহ-উপগ্রহ আকাশের নিচে শূন্য পরিমণ্ডলে অবস্থিত; আকাশ গাত্রে প্রোথিত নয়। কোরআন পাকের وَكُلٌّ فِىْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ আয়াত দ্বারাও এ মতবাদ সমর্থিত হয়। এতে আরও আছে যে, দৈনন্দিন উদয় ও অস্ত সূর্যের গতির কারণে নয়, বরং পৃথিবীর গতির কারণে হয়ে থাকে। এ মতবাদের দিক দিয়ে উপরোক্ত হাদীসে আরও একটি খট্‌কা দেখা দেয়।

এর জওয়াব অনুধাবন করার পূর্বে মনে রাখা দরকার যে, উল্লিখিত আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে পূর্বোক্ত কোরআনের বিরুদ্ধে কোন খট্‌কাই দেখা দেয় না। আলোচ্য আয়াত থেকে কেবল এতটুকু জানা যায় যে, সূর্যকে আল্লাহ্ তা'আলা এক সুশৃঙ্খল ও অটল গতি দান করেছেন। ফলে সে সর্বদাই তার অবস্থানস্থলের দিকে বিচরণ করতে থাকে। এখন এই অবস্থানস্থলের অর্থ কাতাদাহর তফসীর অনুযায়ী 'কিয়ামতের দিন' নেওয়া হলে আয়াতের অর্থ হবে এই যে, সূর্যের গতি কিয়ামত পর্যন্ত সব সময় একই অবস্থায় অব্যাহত থাকবে এবং কিয়ামতের দিন তা খতম হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে স্থানগত অবস্থানস্থল অর্থ নেওয়া হলেও সৌরকক্ষের সেই বিন্দুকে সূর্যের অবস্থানস্থল বলা যায়, যেখান থেকে জন্মলগ্ন থেকে সূর্য তার ভ্রমণ শুরু করেছিল, এখানে পৌঁছেই তার দিবা-রাত্রির এক পরিভ্রমণ পূর্ণতা লাভ করে। কেননা এই বিন্দুটিই তার পরিভ্রমণের চূড়ান্ত সীমা। এই বিন্দুতে পৌঁছে তার নতুন পরিভ্রমণ শুরু হয়। এখন এই মহাগোলকের বিন্দু কোথায় এবং কোনটি, যেখান থেকে সৃষ্টির শুরুতে তার পরিভ্রমণের সূচনা হয়েছিল, কোরআন পাক এ ধরনের অনর্থক আলোচনার সাথে মানুষকে জড়িত করে না, যা তার ইহলৌকিক অথবা পারলৌকিক মঙ্গলামঙ্গলের সাথে সম্পর্ক রাখে না। এটিও এমনি ধরনের আলেচনা। তাই একে বাদ দিয়ে কোরআন পাক আসল উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং তা হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার পূর্ণ শক্তি ও প্রজ্ঞার বহিঃপ্রকাশ বর্ণনা করা। অর্থাৎ পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ও সর্বাধিক উজ্জ্বল গোলক সূর্যও আপনা আপনি অস্তিত্ব লাভ করেনি এবং তার কোন গতিবিধি আপনা আপনি হতে পারে না কিংবা অব্যাহত থাকতে পারে না। বরং সে তার দিবা-রাত্রির বিচরণে সর্বক্ষণ আল্লাহ্ তা'আলার অনুমতি ও ইচ্ছার অধীন হয়ে চলে।

উপরে যতগুলো খট্‌কা বর্ণিত হয়েছে, তার কোনটিই আয়াতের বর্ণনায় দেখা দেয় না। তবে যে হাদীসে আরশের নিচে পৌঁছে সিজদা করা ও পরবর্তী পরিভ্রমণের অনুমতি নেওয়ার কথা বলা হয়েছে, সবগুলো খটকা সে হাদীসের সাথেই সম্পৃক্ত। হাদীসে যেহেতু আলোচ্য আয়াতের বরাতও দেওয়া হয়েছিল, তাই আয়াত প্রসঙ্গে এখানে এ আলোচনার অবতারণা করা হল। হাদীসবিদ ও তফসীরবিদগণ এর বিভিন্ন জওয়াব দিয়েছেন। বাহ্যিক ভাষা থেকে বোঝা যায় যে, সূর্যের সিজদা দিবারাত্রির মধ্যে মাত্র একবার অস্ত যাওয়ার পর হয়ে থাকে। যারা হাদীসের এই বাহ্যিক অর্থ নিয়েছেন, তারা অস্ত যাওয়া সম্পর্কে তিনটি সম্ভাবনা উল্লেখ করেছেন। এক, যে স্থানে সূর্য অস্ত গেলে দুনিয়ার অধিকাংশ জনবসতিতে অস্ত হয়ে যায়, সে স্থানের অস্ত বোঝানো হয়েছে। দুই. বিষুব রেখার অস্ত বোঝানো হয়েছে এবং তিন, মদীনার দিগন্তে অস্ত বোঝানো হয়েছে। এভাবে এ খট্‌কা থাকে না যে, সূর্যের উদয় ও অস্ত সর্বদা ও সর্বক্ষণ হতেই থাকে। হাদীসে একটি বিশেষ দিগন্তে অস্ত যাওয়া সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু আল্লামা শাব্বির আহমদ উসমানী (র)-র জওয়াবই পরিষ্কার ও নির্মল। কয়েকজন তফসীর-বিদের উক্তি দ্বারাও তা সমর্থিত হয়।

'সুজুদুশ্ শামস' নামক এক প্রবন্ধে প্রদত্ত তাঁর এই জওয়াব হৃদয়ঙ্গম করার পূর্বে পয়গম্বরগণের শিক্ষা ও বর্ণনা সম্পর্কে এ মৌলিক বিষয়টি বুঝে নেওয়া জরুরী যে, আসমানী কিতাব ও পয়গম্বরগণ মানুষকে আকাশ ও পৃথিবী সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা করার অবিরাম দাওয়াত দেন এবং এগুলোকে আল্লাহ্র অস্তিত্ব, তওহীদ, সর্বব্যাপী জ্ঞান ও কুদরতের প্রমাণস্বরূপ পেশ করেন। কিন্তু প্রথম বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা ততটুকুই কাম্য, যতটুকু মানুষের পার্থিব ও সামাজিক প্রয়োজনের সাথে অথবা ইহলৌকিক ও পারলৌকিক প্রয়োজনের সাথে সম্পর্ক রাখে। এর অতিরিক্ত নিরেট দার্শনিক সুলভ চুলচেরা বিশ্লেষণ ও বিষয়বস্তুর স্বরূপ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটিতে সাধারণ মানুষকে জড়িত করা হয় না। কেননা এগুলোর পরিপূর্ণ ও যথার্থ জ্ঞান দার্শনিকরাও সারা জীবন ব্যয় করা সত্ত্বেও অর্জন করতে সক্ষম হননি—সাধারণ মানুষ কি অর্জন করতে পারে? আর যদি তা অর্জিত হয়ে যায়, তবে এর মাধ্যমে তাদের কোন ধর্মীয় প্রয়োজন পূর্ণ হয় না এবং কোন বিশুদ্ধ পার্থিব লক্ষ্যও হাসিল হয় না। এমতাবস্থায় এই অনর্থক ও বাজে আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া জীবন ও অর্থের অপচয় বৈ নয়।

আকাশ, পৃথিবী ও এতদুভয়ের পরিবর্তন ও স্থানান্তরের ততটুকু অংশই কোরআন ও পয়গম্বরগণ প্রমাণস্বরূপ পেশ করেন, যতটুকু মানুষ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করে এবং সামান্য চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে অর্জন করতে পারে। দার্শনিক ও জ্যামিতিক চুলচেরা বিশ্লেষণ একমাত্র দার্শনিক ও আলিমগণই করতে পারেন। এরূপ বিশ্লেষণের উপর প্রমাণ নির্ভরশীল থাকে না এবং এগুলো নিয়ে চিন্তা-ভাবনারও উৎসাহ দেওয়া হয় না। কেননা জ্ঞানী হোক কিংবা মূর্খ, নর হোক কিংবা নারী, শহরবাসী হোক কিংবা গ্রামবাসী, পাহাড় ও দ্বীপে বাস করুক অথবা উন্নত শহরে বাস করুক প্রত্যেকের জন্য আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ও তার আদেশ-নিষেধ পালন করা ফরয। তাই, পয়গম্বরগণের শিক্ষা জনসাধারণের চিন্তা ও বিবেকবুদ্ধির সাথে সামঞ্জস্যশীল হয়ে থাকে। এসব শিক্ষা বোঝার জন্য কোনরূপ কারিগরি পারদর্শিতার প্রয়োজন হয় না।

নামাযের ওয়াক্তসমূহের পরিচয়, কিবলার দিক নির্ধারণ, বছর, মাস ও দিন-তারিখের সঠিক ধারণা, প্রভৃতি বিষয়ের জ্ঞান অঙ্কশাস্ত্রের হিসাবাদির মাধ্যমেও অর্জন করা যায়। কিন্তু শরীয়ত এগুলোর ভিত্তি অঙ্কশাস্ত্রের খুঁটিনাটি বিশ্লেষণের উপর রাখার পরিবর্তে সাধারণের প্রত্যক্ষকরণের উপর রেখেছে। চাঁদের হিসাবে বছর, মাস ও দিন-তারিখ নির্ধারিত হয়; কিন্তু চাঁদ হল কি হল না, তার ভিত্তি কেবল চাঁদ দেখা ও প্রত্যক্ষ করার উপর রাখা হয়েছে। এর ভিত্তিতেই হজ্জ ও রোযার তারিখ নির্ধারিত হয়। চাঁদের ক্রমবৃদ্ধি, আত্মগোপন ও উদয়ের রহস্য সম্পর্কে কতিপয় সাহাবী রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে প্রশ্ন করলে কোরআন তার জওয়াবে বলে قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ অর্থাৎ আপনি উত্তরে বলুন, চাঁদের এসব পরিবর্তনের উদ্দেশ্য মাসের শুরু, শেষ ও দিন-তারিখ জেনে হজ্জের দিন নির্দিষ্ট করা। এ জওয়াব ব্যক্ত করেছে যে, তোমাদের প্রশ্ন অনর্থক। এ রহস্য জানার উপর তোমাদের কোন ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কাজ

নির্ভরশীল নয়। তাই তোমাদের ধর্মীয় ও পার্থিব প্রয়োজনের সাথে সম্পর্ক রাখে, এমন প্রশ্ন করাই দরকার।

এ ভূমিকার পর আসল ব্যাপারের প্রতি লক্ষ্য করুন। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় কুদরত ও প্রজ্ঞার কতিপয় বহিঃপ্রকাশ বর্ণনা করার পর মানুষকে তওহীদ ও সর্বব্যাপী কুদরতে বিশ্বাস স্থাপনের দাওয়াত দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে সর্ব প্রথম পৃথিবীর কথা উল্লেখ করেছেন, যা আমাদের দৃষ্টির সামনে রয়েছে। বলেছেন, وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ অতপর পানি বর্ষণ করে বৃক্ষ ও উদ্ভিদ উৎপন্ন করার কথা বলেছেন أَحْيَيْنَا ﴿٩﴾ الآية এ বিষয়টি সব মানুষই দেখে ও জানে। এরপর আকাশ ও আকাশ সম্পর্কিত বিষয়াদি আলোচনা শুরু করে প্রথমে দিবা ও রাত্রির দৈনন্দিন পরিবর্তনের উল্লেখ করেছেন। বলেছেন, ..وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ এরপর সর্ববৃহৎ গ্রহ, সূর্য ও চন্দ্রের আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমে সূর্য সম্পর্কে বলেছেন, وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ চিন্তা করুন, এর উদ্দেশ্য এ কথা ব্যক্ত করা যে, সূর্য আপনা-আপনি, নিজ ইচ্ছায় ও শক্তি বলে বিচরণ করে না। সে একজন পরাক্রমশালী ও বিচক্ষণ সত্তার নির্ধারিত নিয়ম-শৃঙ্খলা অনুসরণ করে যাচ্ছে। রসূলুল্লাহ্ (সা) সূর্যাস্তের সময় এক প্রশ্নের জওয়াবে হযরত আবূযর গিফারীকে এ সত্যটি জেনে নেওয়ারই নির্দেশ দেন। এতে তিনি বলেন, সূর্য অস্ত যাওয়ার পর আরশের নিচে আল্লাহ্‌কে সিজদা করে এবং পরবর্তী পরিভ্রমণ শুরু করার অনুমতি প্রার্থনা করে। অনুমতি পাওয়ার পর যথারীতি সামনের দিকে এগিয়ে যায় এবং প্রত্যূষে পূর্ব গগনে উদিত হয়। এর সারমর্ম এর বেশি নয় যে, সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় বিশ্ব চরাচরে এক নতুন বিপ্লব দেখা দেয়। সূর্যকে কেন্দ্র করেই এটা হয়। রসূলুল্লাহ্ (সা) মানুষকে হুঁশিয়ার করার জন্য এই বৈপ্লবিক সময়টিকে উপযুক্ত বিবেচনা করে শিক্ষা দিয়েছেন যে সূর্যকে, স্বাধীন ও স্বীয় শক্তি বলে বিচরণকারী মনে করো না। সে কেবল আল্লাহ্‌র অনুমতি ও ইচ্ছার অনুসারী হয়ে বিচরণ করে। তার প্রত্যেক উদয় ও অস্ত আল্লাহ্ তা'আলার অনুমতিক্রমে হয়। আদেশ অনুসারে বিচরণ করাকেই সিজদা বলে অভিহিত করা হয়েছে। কারণ, প্রত্যেক বস্তুর সিজদা তার অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যশীল হয়ে থাকে। কোরআন বলে, كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ অর্থাৎ প্রত্যেক সৃষ্টি আল্লাহ্‌র ইবাদত ও তসবীহ্ করে এবং প্রত্যেককে তার ইবাদত ও তসবীহ্‌র পদ্ধতি শিখিয়ে দেওয়া হয়েছে, যেমন মানুষকে তার নামায

ও তসবীহ্‌র পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। কাজেই সূর্যের সিজদা করার অর্থ এরূপ বুঝে নেওয়া ভ্রান্ত যে, সে মানুষের ন্যায় মাটিতে মস্তক রেখে সিজদা করে।

কোরআন ও হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী আরশ সমস্ত আকাশ, গ্রহ-উপগ্রহ ও পৃথিবীকে উপর দিক থেকে বেষ্টন করে রয়েছে। অতএব সূর্য সর্বদা ও সর্বত্র আরশের নিচেই থাকে। অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, সূর্য যখন এক জায়গায় অস্ত যেতে থাকে, তখনই অন্য জায়গায় উদিত হতে থাকে। তাই সূর্য প্রতিনিয়তই উদিত হচ্ছে ও অস্ত যাচ্ছে। সুতরাং সূর্য সর্বক্ষণ ও সর্বাবস্থায় আরশেরও নিচেই থাকে এবং উদিত ও অস্তমিত হতে থাকে। তাই হাদীসের সারমর্ম এই যে, সূর্য তার সমগ্র পরিভ্রমণে আরশের নিচে আল্লাহ্‌র সামনে সিজদারত থাকে। অর্থাৎ, তাঁর অনুমতি ও আদেশ অনুসারে পরিভ্রমণ করে। কিয়ামতের নিকটবর্তী সময় পর্যন্ত তা এমনিভাবে অব্যাহত থাকবে। অতপর যখন কিয়ামত আসন্ন হওয়ার আলামত প্রকাশ করার সময় হবে, তখন সূর্যকে তার কক্ষপথে পরবর্তী পরিভ্রমণ শুরু করার পরিবর্তে পেছনে ফিরে যাওয়ার আদেশ দেওয়া হবে এবং তখন সে পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে। এ সময় তওবার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে এবং কারও ঈমান ও তওবা কবূল করা হবে না।

মোটকথা, বিশেষভাবে সূর্যাস্ত, অতপর আরশের নিচে যাওয়া ও সিজদা করা এবং পরবর্তী পরিভ্রমণের অনুমতি চাওয়ার যেসব ঘটনা উপরোক্ত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো পয়গম্বরসুলভ কার্যকর শিক্ষার একান্ত উপযোগী এবং জনসাধারণের দৃষ্টিতে পৌঁছে পুরোপুরি একটি উপমা মাত্র; এতে জরুরী হয় না যে, সূর্য মানুষের মত মাটিতে মাথা রেখে সিজদা করে এবং সিজদা করার সময় সূর্যের গতিতে বিরতি হওয়াও অনিবার্য হয় না। এটাও উদ্দেশ্য নয় যে, সূর্য দিবারাত্রিতে মাত্র একবার কোন বিশেষ জায়গায় পৌঁছে সিজদা করে এবং শুধু অস্তমিত হওয়ার পর আরশের নিচে যায়। কিন্তু এই বৈপ্লবিক সময়ে সমস্ত মানুষই প্রত্যক্ষ করে যে, সূর্য তাদের দৃষ্টি থেকে উধাও হয়ে যাচ্ছে, তখন উপমাস্বরূপ তাদেরকে অবহিত করা হয়েছে যে, এসব প্রকৃতপক্ষে আরশের নিচে সূর্যের আজ্ঞাধীন হয়ে চলার কারণেই হচ্ছে। সূর্য স্বয়ং কোন শক্তি ও ক্ষমতা রাখে না। তখন মদীনাবাসীরা যেমন স্বস্থানে অনুভব করছিল যে, এখন সূর্য সিজদা করে পরবর্তী পরিভ্রমণের অনুমতি নেবে, তেমনি যে যে জায়গায় অস্ত হতে থাকবে, সকলের জন্যই একই শিক্ষা হয়ে যাবে। আসল কথা এই জানা গেল যে, সূর্য তার কক্ষপথে বিচরণকালে প্রতি মুহূর্তে আল্লাহ্‌কে সিজদাও করে এবং সামনের দিক এগিয়ে যাওয়ারও প্রার্থনা করে। এর জন্য তাঁর কোন বিরতির প্রয়োজন হয় না।

এই ব্যাখ্যার পর পূর্বোক্ত হাদীসের বিষয়বস্তুতে চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা সৌর ও অঙ্ক বিজ্ঞানের নীতি বাৎলীমুসীয় অথবা পিথাগোরাসীয় মতবাদ ইত্যাদি কোন দিক দিয়েই কোন আপত্তি ও খটকা অবশিষ্ট থাকে না।

তথাপি আরও একটি প্রশ্ন থেকে যায়। তা এই যে, পূর্বোক্ত হাদীসে সূর্যের সিজদা করা এবং পরবর্তী পরিভ্রমণের অনুমতি প্রার্থনা করার কথা বলা হয়েছে। এটা ব্যক্তি ও

জ্ঞানবুদ্ধিশীলের কাজ। সূর্য ও চন্দ্র নির্জীব ও চেতনাহীন। তারা এ কাজ কিরূপে সম্পাদন করতে পারে? কোরআন পাকের وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ আয়াতটি এ প্রশ্নের জওয়াব। অর্থাৎ আমরা যেসব বস্তুকে নির্জীব, নির্বোধ ও চেতনাহীন মনে করি, তারাও প্রকৃতপক্ষে এক বিশেষ প্রকার প্রাণ, জ্ঞানবুদ্ধি ও চেতনার অধিকারী। তবে তাদের প্রাণ, জ্ঞান ও চেতনা মানুষ ও জীবজন্তুর তুলনায় এত কম যে, সাধারণ-ভাবে অনুভূত হতে পারে না। কিন্তু তাদের যে এগুলো নেই, এর পক্ষে কোন শরীয়তগত অথবা বিবেকপ্রসূত দলীল নেই। কোরআন পাক এ আয়াতে প্রমাণ করেছে যে, তারাও প্রাণী এবং বোধ ও চেতনাসম্পন্ন। আধুনিক গবেষণাও এটা স্বীকার করেছে। والله سبحانه اعلم

জ্ঞাতব্য ঃ কোরআন ও হাদীসের উপরোক্ত বর্ণনার দ্বারা সুস্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন হয় যে, সূর্য ও চন্দ্র উভয়টিই গতিশীল এবং এক মেয়াদের জন্য পরিভ্রমণরত। এতে সে মতবাদ ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়, যাতে সূর্যের গতিশীলতা স্বীকার করা হয়নি। সর্বাধুনিক গবেষণাও এ মতবাদকে ভ্রান্ত সাব্যস্ত করেছে।

عرجون — وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ

অর্থ শুষ্ক খর্জুর শাখা, যা বেঁকে ধনুকের মত হয়ে যায়। منازل শব্দটি منزل -এর বহুবচন। অর্থ অবতরণ স্থল। আল্লাহ্ তা'আলা চন্দ্র ও সূর্য উভয়ের চলার জন্য বিশেষ সীমা নির্ধারিত করে দিয়েছেন। এই সীমাকেই 'মনযিল' বলা হয়।

চন্দ্রের মনযিল ঃ চন্দ্র এক মাসে তার পরিভ্রমণ সমাপ্ত করে। তাই তার মনযিল ত্রিশ অথবা ঊনত্রিশটি হয়ে থাকে। প্রত্যেক মাসে চন্দ্র কমপক্ষে একদিন উধাও হয়ে থাকে। ফলে সাধারণভাবে তার মনযিল আটাশটিই বলা হয়। সৌরবিজ্ঞানীরা এসব মনযিলের বিপরীতে অবস্থিত নক্ষত্রসমূহের সাথে মিল রেখে এগুলোর বিশেষ বিশেষ নাম রেখেছেন। জাহিলিয়াত যুগের আরবেও এসব নামেই মনযিলসমূহ চিহ্নিত হত। কোরআন পাক এসব পারিভাষিক নামের উর্ধ্বে। চন্দ্র বিশেষ বিশেষ দিনে যে দূরত্ব অতিক্রম করে, কোরআন মনযিল বলে শুধু সে দূরত্বকেই বুঝিয়ে থাকে।

সূরা ইউনুসে এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। সূরা ইউনুসের আয়াত এই ঃ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ এতে সূর্য ও চন্দ্র উভয়ের মনযিল উল্লেখ করা হয়েছে। পার্থক্য এই যে, চন্দ্রের মনযিলসমূহ চাক্ষুষ চোখে চেনা যায় এবং সূর্যের মনযিলসমূহ অঙ্ক শাস্ত্রের হিসাবের মাধ্যমে জানা যায়। حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ বাক্যে মাসের শেষে চাঁদের অবস্থা বর্ণনা করা

হয়েছে। চাঁদ ষোল কলায় পরিপূর্ণ হওয়ার পর হ্রাস পেতে পেতে মাসের শেষে ধনুকের আকার ধারণ করে। আরবদের পরিবেশ উপযোগী 'শুষ্ক খর্জুর শাখার মত' বলে এর দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে।

وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ---অর্থাৎ সূর্য ও চন্দ্র উভয়ই আপন আপন কক্ষপথে সন্তরণ করে। فلك- এর শাব্দিক অর্থ আকাশ নয়, বরং সেই বৃত্ত যাতে কোন গ্রহ বিচরণ করে। সূরা আম্বিয়ায় এ আয়াত সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এর দ্বারা বোঝা যায়, চন্দ্র আকাশ গাত্রে প্রোথিত নয়। বাৎলীমূসীয় মতবাদ প্রমাণ করে যে, চন্দ্র আকাশ গাত্রে প্রোথিত। কোরআনের আয়াত থেকে জানা যায় যে, চন্দ্র আকাশের নিচে এক বিশেষ কক্ষ পথে বিচরণ করে। আধুনিক গবেষণা এবং চন্দ্রপৃষ্ঠে মানুষের অবতরণের ঘটনাবলী এ বিষয়টিকে নিশ্চিত সত্যে পরিণত করেছে।

وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ---এতে সমুদ্র ও তৎসংশ্লিষ্ট বস্তুসমূহের মধ্যে কুদরতের বহিঃপ্রকাশ আলোচিত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা নৌকাসমূহকে স্বয়ং ভারী বস্তু দ্বারা বোঝাই হওয়া সত্ত্বেও পানির উপর চলার যোগ্য করে দিয়েছেন। পানি এগুলোকে নিমজ্জিত করার পরিবর্তে দূর-দূরান্তের দেশে পৌঁছে দেয়। আয়াতে বলা হয়েছে, আমি তাদের সন্তানসন্ততিকে নৌকায় আরোহণ করিয়েছি। এখানে সন্তানসন্ততির কথা বলার কারণ সম্ভবত এই যে, সন্তানসন্ততি মানুষের বড় বোঝা। বিশেষত যখন তারা চলাফেরার যোগ্য না থাকে। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, তোমরাই কেবল নৌকাসমূহে আরোহণ কর না, বরং সন্তান-সন্ততি ও তাদের সমস্ত আসবাবপত্রই এসব নৌকা বহন করে। خَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ বাক্যের অর্থ এই যে, মানুষের আরোহণ ও বোঝা বহনের জন্য কেবল নৌকাই নয়, নৌকার অনুরূপ আরও যানবহন সৃষ্টি করেছি। আরবরা তাদের প্রথা অনুযায়ী এর অর্থ নিয়েছে উটের সওয়ারী। কারণ, বোঝা বহনে উট সমস্ত জন্তুর সেরা। বড় বড় বোঝার স্তূপ নিয়ে দেশ-বিদেশ সফর করে। তাই আরবরা উটকে سفينة البر অর্থাৎ স্থলের জাহাজ বলে থাকে।

কোরআনে উড়োজাহাজের উল্লেখ ঃ কিন্তু কোরআন এখানে উট অথবা অন্য কোন বিশেষ যানবাহনের উল্লেখ করেনি, বরং অস্পষ্ট রেখে দিয়েছে। ফলে এতে এমন সব যানবাহন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা অধিকতর মানুষ ও তাদের আসবাবপত্র বহন করে মনযিলে মকসুদে পৌঁছে দেয়। এটা সুস্পষ্ট যে, বর্তমান যুগে যেসব যানবাহন প্রচলিত আছে তন্মধ্যে আয়াতে প্রধানত উড়োজাহাজই বোঝানো হয়েছে। নৌকার

সাথে এর উপমাও এর সমর্থক। পানির জাহাজ যেমন পানীর উপর সন্তরণ করে পানি তাকে নিমজ্জিত করে না, তেমনি উড়োজাহাজ বাতাসে সন্তরণ করে। বাতাস তাকে নিচে ফেলে দেয় না। কোরআন পাক আলোচ্য বাক্যটি অস্পষ্ট রেখেছে, যাতে কিয়ামত পর্যন্ত যত যানবাহন আবিষ্কৃত হবে, সবই এতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٤٥﴾ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٤٦﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٤٧﴾

---

(৪৫) আর যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা সামনের আযাব ও পেছনের আযাবকে ভয় কর, যাতে তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করা হয়, তখন তারা তা অগ্রাহ্য করে। (৪৬) যখনই তাদের পালনকর্তার নির্দেশাবলীর মধ্য থেকে কোন নির্দেশ তাদের কাছে আসে, তখনই তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। (৪৭) যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ্ তোমাদেরকে যা দিয়েছেন, তা থেকে ব্যয় কর। তখন কাফিররা মু'মিনগণকে বলে, ইচ্ছা করলেই আল্লাহ্ যাকে খাওয়াতে পারতেন, আমরা তাকে কেন খাওয়াব? তোমরা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে পতিত রয়েছ।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যখন তাদেরকে (তওহীদের প্রমাণাদি এবং তা অমান্য করার কারণে শাস্তিদাতার সতর্কবাণী শুনিয়ে) বলা হয়, তোমরা সে আযাবকে ভয় কর, যা তোমাদের সামনে রয়েছে (অর্থাৎ দুনিয়াতে। যেমন, উপরে وَإِنْ نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ আয়াতে ইচ্ছা করলে নৌকা নিমজ্জিত করার কথা বলা হয়েছে।) এবং যা তোমাদের (মৃত্যুর) পেছনে (অর্থাৎ পরকালে) রয়েছে, (উদ্দেশ্য এই যে, তওহীদ অমান্য করার কারণে কেবল দুনিয়াতে অথবা পরকালে যে আযাব তোমাদেরকে স্পর্শ করবে, তাকে ভয় এবং বিশ্বাস স্থাপন কর) যাতে তোমাদের প্রতি অনুকম্পা করা হয়, তখন তারা (এই ভীতি প্রদর্শনের) পরওয়া করে না। (তারা তো এমন কঠোরপ্রাণ যে,) যখনই তাদের পালনকর্তার আয়াত-সমূহের মধ্য থেকে কোন আয়াত তাদের কাছে আসে, তখনই তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়। (ভীতি প্রদর্শন যেমন তাদের জন্য উপকারী নয়, তেমনি সওয়াব ও জান্নাতের সুসংবাদও তাদের জন্য উপকারী হয় না। সেমতে) যখন তাদেরকে আল্লাহ্র নিয়ামত স্মরণ

করিয়ে) বলা হয়, আল্লাহ্ তোমাদেরকে যা দিয়েছেন, তা থেকে (আল্লাহ্র পথে ফকির-মিসকীনদের জন্য) ব্যয় কর, তখন (হঠকারিতা ও উপহাস করলে কাফিররা) মুসলমানদেরকে (যারা ব্যয় করতে বলেছিল) বলে, আমরা কি এমন লোকদের খাওয়াব, যাদেরকে আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে (অনেক কিছু) খাওয়াতে পারতেন? তোমরা প্রকাশ্য ভ্রান্তিতে (পতিত) রয়েছ।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে পৃথিবী, আকাশ ইত্যাদিতে আল্লাহ্ তা'আলার শক্তি ও প্রজ্ঞার বহিঃপ্রকাশ বর্ণনা করে আল্লাহ্র পরিচয় লাভ ও তওহীদের দাওয়াত দেওয়া হয়েছিল। এছাড়া এ দাওয়াত কবূলের ফলস্বরূপ জান্নাতের চিরস্থায়ী নিয়ামত ও সুখের ওয়াদা এবং কবূল না করার কঠোর শাস্তির সতর্কবাণীও বর্ণিত হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে ও পরবর্তী আয়াতসমূহে মক্কার কাফিরদের বক্রতা বিবৃত হয়েছে যে, তাদের উপর সওয়াবের ওয়াদা শাস্তির ভীতি প্রদর্শন কোন প্রভাবই বিস্তার করতে পারে না।

এ প্রসঙ্গে কাফিরদের সাথে মুসলমানদের দু'টি সংলাপ উল্লেখ করা হয়েছে। মুসলমানরা যখন তাদেরকে বলে, তোমরা আল্লাহ্র শাস্তিকে ভয় কর, যা দুনিয়াতেই তোমাদের সামনেও আসতে পারে এবং পরকালে আসা তো নিশ্চিতই তোমরা শাস্তিকে ভয় করে বিশ্বাস স্থাপন করলে তা তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক হবে। কিন্তু তারা একথা শুনেও মুখ ফরিয়ে নেয়। আয়াতে তাদের মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার বিষয়টি পরিষ্কার উল্লেখ করা হয়নি। কারণ, পরবর্তী আয়াতে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার উল্লেখ থেকে এখানেও মুখ ফিরিয়ে নেওয়া প্রমাণিত হয়। এছাড়া ব্যাকরণিক নিয়মে إِذَا قِيلَ শর্ত। এর جزاء হিসাবে أعرضوا শব্দটি উহ্য রয়েছে। এর প্রমাণ পরবর্তী আয়াতের مُعْرِضِيْنَ শব্দটি। এতে বলা হয়েছে, তাদের কাছে তাদের পালনকর্তার যে কোন আয়াত আসে, তারা তা থেকে কেবল মুখই ফিরিয়ে নেয়।

পরোক্ষভাবে রিযিক প্রাপ্তির রহস্য: দ্বিতীয় সংলাপ এই যে, মুসলমানরা গরীব-মিসকীনকে সাহায্য করার জন্য এবং ক্ষুধার্তকে খাদ্য দানের জন্য কাফিরদেরকে বলত, আল্লাহ্ তোমাদেরকে যা দিয়েছেন, তা থেকে কিছু অভাবগ্রস্তদেরকে দান কর। এর জওয়াবে তারা ঠাট্টা করে বলত, তোমরাই বল যে, সকলের রিযিকদাতা আল্লাহ্। তিনিই তাদেরকে দেননি; অতএব আমরা কেন দেব? তোমাদের এই উপদেশ প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতা। কেননা তোমরা আমাদেরকে রিযিকদাতা বানাতে চাও। বলা বাহুল্য, কাফিররাও আল্লাহ্ তা'আলাকে রিযিকদাতা বলে স্বীকার করত। এ সম্পর্কে কোরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ —অর্থাৎ আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, কে আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেছে, অতপর পৃথিবীতে উদ্ভিদের জীবন সঞ্চারিত হয়েছে এবং নানা রকম ফলমূল উদ্‌গত হয়েছে, তবে তারা স্বীকার করবে, আল্লাহ্ তা'আলাই বর্ষণ করেছেন।

এ থেকে জানা গেল যে, তারা আল্লাহ্ তা'আলাকেই রিযিকদাতা বলে বিশ্বাস করত। কিন্তু মুসলমানদের জওয়াবে ঠাট্টার ছলে উপরোক্ত কথা বলেছে। এ বোকারা যেন আল্লাহ্র পথে ব্যয় এবং গরীবদের সাহায্য করাকে আল্লাহ্র রিযিকদাতা হওয়ার পরিপন্থী মনে করত। রিযিকদাতা আল্লাহ্র প্রজ্ঞাময় আইন এই যে, তিনি একজনকে দান করে অন্য জনকে দেওয়ার মাধ্যম করেন এবং এই মাধ্যমে পরোক্ষভাবে অন্যদেরকে দেন। তিনি সবাইকে নিজে প্রত্যক্ষভাবে রিযিক দিতেও সক্ষম। জীবজন্তু, কীট-পতঙ্গ ও পশু-পক্ষীকে তিনি এমনিভাবে রিযিক দান করেন। তাদের মধ্যে কেউ দরিদ্র ও কেউ ধনী নেই এবং কেউ কাউকে কিছু দেয়ও না। সবাই প্রকৃতির দস্তরখান থেকে আহার করে। কিন্তু মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার প্রাণসঞ্চার করার জন্য রিযিকের ব্যাপারে একজনকে অপরজনের মাধ্যম করা হয়েছে, যাতে দাতা সওয়াব পায় এবং গ্রহীতা তার অনুগ্রহ স্বীকার করে। কেননা পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার উপরই সমগ্র বিশ্ব ব্যবস্থার ভিত্তি রচিত হয়েছে। এই ভিত্তি তখনই প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে, যখন মানুষ একে অপরের মুখাপেক্ষী হয়; দরিদ্র ধনীর পয়সার মুখাপেক্ষী হয় এবং ধনী দরিদ্রের শ্রমের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে এবং তাদের কেউ কারও প্রতি অমুখাপেক্ষী না হয়। চিন্তা করলে দেখা যায়, কারও প্রতি কারও কোন ঋণ নেই। একজন অপরজনকে কিছু দিলে নিজের স্বার্থেই দান করে।

এখন প্রশ্ন থেকে যায় যে, কাফিররা তো আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাসই রাখে না এবং ফিকাহ্বিদদের বর্ণনা অনুযায়ী তারা খুঁটিনাটি বিধানাবলী পালনে আদিষ্টও নয়। এমতাবস্থায় মুসলমানরা কিসের ভিত্তিতে কাফিরদেরকে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করার আদেশ দিত? এর উত্তর এই যে, মুসলমানদের এই আদেশ কোন শরীয়তগত বিধান পালন করানোর উদ্দেশ্যে নয় বরং মানবিক সহমর্মিতা ও ভদ্রতার প্রচলিত নীতির ভিত্তিতে ছিল।

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤٨﴾ مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا

صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ﴿٤٩﴾ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً

وَّلَآ اِلٰٓى اَهۡلِهِمۡ يَرۡجِعُوۡنَ ۝٥٠ وَنُفِخَ فِى الصُّوۡرِ فَاِذَا هُمۡ مِّنَ الۡاَجۡدَاثِ
اِلٰى رَبِّهِمۡ يَنۡسِلُوۡنَ ۝٥١ قَالُوۡا يٰوَيۡلَنَا مَنۡۢ بَعَثَنَا مِنۡ مَّرۡقَدِنَا ۜ
هٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحۡمٰنُ وَصَدَقَ الۡمُرۡسَلُوۡنَ ۝٥٢ اِنۡ كَانَتۡ اِلَّا صَيۡحَةً
وَّاحِدَةً فَاِذَا هُمۡ جَمِيۡعٌ لَّدَيۡنَا مُحۡضَرُوۡنَ ۝٥٣ فَالۡيَوۡمَ لَا تُظۡلَمُ نَفۡسٌ
شَيۡـًٔا وَّلَا تُجۡزَوۡنَ اِلَّا مَا كُنۡتُمۡ تَعۡمَلُوۡنَ ۝٥٤ اِنَّ اَصۡحٰبَ الۡجَنَّةِ الۡيَوۡمَ
فِىۡ شُغُلٍ فٰكِهُوۡنَ ۝٥٥ هُمۡ وَاَزۡوَاجُهُمۡ فِىۡ ظِلٰلٍ عَلَى الۡاَرَآئِكِ مُتَّكِـُٔوۡنَ ۝٥٦
لَهُمۡ فِيۡهَا فَاكِهَةٌ وَّلَهُمۡ مَّا يَدَّعُوۡنَ ۝٥٧ سَلٰمٌ قَوۡلًا مِّنۡ رَّبٍّ
رَّحِيۡمٍ ۝٥٨ وَامۡتَازُوا الۡيَوۡمَ اَيُّهَا الۡمُجۡرِمُوۡنَ ۝٥٩ اَلَمۡ اَعۡهَدۡ اِلَيۡكُمۡ
يٰبَنِىۡۤ اٰدَمَ اَنۡ لَّا تَعۡبُدُوا الشَّيۡطٰنَ ۚ اِنَّهٗ لَـكُمۡ عَدُوٌّ مُّبِيۡنٌ ۝٦٠ وَّاَنِ
اعۡبُدُوۡنِىۡ ؕ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسۡتَقِيۡمٌ ۝٦١ وَلَقَدۡ اَضَلَّ مِنۡكُمۡ جِبِلًّا كَثِيۡرًا ؕ
اَفَلَمۡ تَكُوۡنُوۡا تَعۡقِلُوۡنَ ۝٦٢ هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِىۡ كُنۡتُمۡ تُوۡعَدُوۡنَ ۝٦٣
اِصۡلَوۡهَا الۡيَوۡمَ بِمَا كُنۡتُمۡ تَكۡفُرُوۡنَ ۝٦٤ اَلۡيَوۡمَ نَخۡتِمُ عَلٰٓى اَفۡوَاهِهِمۡ وَ
تُكَلِّمُنَاۤ اَيۡدِيۡهِمۡ وَتَشۡهَدُ اَرۡجُلُهُمۡ بِمَا كَانُوۡا يَكۡسِبُوۡنَ ۝٦٥ وَلَوۡ نَشَآءُ
لَـطَمَسۡنَا عَلٰٓى اَعۡيُنِهِمۡ فَاسۡتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَاَنّٰى يُبۡصِرُوۡنَ ۝٦٦ وَلَوۡ
نَشَآءُ لَمَسَخۡنٰهُمۡ عَلٰى مَكَانَتِهِمۡ فَمَا اسۡتَطَاعُوۡا مُضِيًّا وَّلَا
يَرۡجِعُوۡنَ ۝٦٧ وَمَنۡ نُّعَمِّرۡهُ نُنَكِّسۡهُ فِى الۡخَلۡقِ ؕ اَفَلَا يَعۡقِلُوۡنَ ۝٦٨

(৪৮) তারা বলে, তোমরা সত্যবাদী হলে বল এই ওয়াদা কবে পূর্ণ হবে? (৪৯) তারা কেবল একটা ভয়াবহ শব্দের অপেক্ষা করছে, যা তাদেরকে আঘাত করবে তাদের পারস্পরিক বাকবিতণ্ডাকালে। (৫০) তখন তারা ওছিয়ত করতেও

সক্ষম হবে না। এবং তাদের পরিবার-পরিজনের কাছেও ফিরে যেতে পারবে না। (৫১) শিংগায় ফুঁক দেওয়া হবে, তখনই তারা কবর থেকে তাদের পালনকর্তার দিকে ছুটে চলবে। (৫২) তারা বলবে, হায় আমাদের দুর্ভোগ! কে আমাদেরকে নিদ্রাস্থল থেকে উত্থিত করল? রহমান আল্লাহ্ তো এরই ওয়াদা দিয়েছিলেন এবং রসূলগণ সত্য বলেছিলেন। (৫৩) এটা তো হবে কেবল এক মহানাদ। সে মুহূর্তেই তাদের সবাইকে আমার সামনে উপস্থিত করা হবে। (৫৪) আজকের দিনে কারও প্রতি জুলুম করা হবে না এবং তোমরা যা করবে কেবল তারই প্রতিদান পাবে। (৫৫) এদিন জান্নাতীরা আনন্দে মশগুল থাকবে। (৫৬) তারা এবং তাদের স্ত্রীরা উপবিষ্ট থাকবে ছায়াময় পরিবেশে আসনে হেলান দিয়ে। (৫৭) সেখানে তাদের জন্য থাকবে ফলমূল এবং যা চাইবে। (৫৮) করুণাময় পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাদেরকে বলা হবে 'সালাম'। (৫৯) হে অপরাধীরা, আজ তোমরা আলাদা হয়ে যাও। (৬০) হে বনী-আদম! আমি কি তোমাদেরকে বলে রাখিনি যে, শয়তানের ইবাদত করো না, সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু? (৬১) এবং আমার ইবাদত কর। এটাই সরল পথ। (৬২) শয়তান তোমাদের অনেক দলকে পথভ্রষ্ট করেছে। তবুও কি তোমরা বুঝনি? (৬৩) এই সে জাহান্নাম, যার ওয়াদা তোমাদেরকে দেওয়া হতো (৬৪) তোমাদের কুফরের কারণে আজ এতে প্রবেশ কর। (৬৫) আজ আমি তাদের মুখে মোহর এঁটে দেব তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং তাদের পা তাদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দেবে (৬৬) আমি ইচ্ছা করলে তাদের দৃষ্টিশক্তি বিলুপ্ত করে দিতে পারতাম, তখন তারা পথের দিকে দৌড়াতে চাইলে কেমন করে দেখতে পেত! (৬৭) আমি ইচ্ছা করলে তাদেরকে স্ব স্ব স্থানে আকার বিকৃত করতে পারতাম, ফলে তারা আগেও চলতে পারত না এবং পেছনেও ফিরে যেতে পারত না। (৬৮) আমি যাকে দীর্ঘ জীবন দান করি, তাকে সৃষ্টিগত পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নেই। তবুও কি তারা বুঝে না?

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তারা (অর্থাৎ কাফিররা পয়গম্বর ও তাঁর অনুসারীদেরকে অস্বীকারের ছলে) বলে, তোমরা (তোমাদের দাবিতে) সত্যবাদী হলে, (বল,) এই ওয়াদা (অর্থাৎ কিয়ামতের ওয়াদা, যা উপরের আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে এবং তোমরাও প্রায়ই এর কথা বলে থাক---) কবে পূর্ণ হবে? (আল্লাহ্ বলেন, এরা যে বারবার জিজ্ঞেস করে, এতে করে মনে হয় যেন,) তারা এক মহানাদের (অর্থাৎ প্রথম ফুঁৎকারের) অপেক্ষা করছে, যা তাদেরকে আঘাত হানবে (সাধারণ অভ্যাস অনুযায়ী নিজেদের ব্যাপারাদিতে পারস্পরিক বাকবিতণ্ডাকালে। (এই মহানাদের সাথে সাথে তারা এমনভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে যে,) তখন তারা ওসিয়ত করতে সক্ষম হবে না এবং তাদের পরিবার-পরিজনের কাছেও ফেরত যেতে পারবে না (বরং যে যে অবস্থায় থাকবে, মরে কাঠ হয়ে যাবে।) এবং (অতপর পুনরায়) শিংগায় ফুঁক দেওয়া হবে, তখনই তারা কবর থেকে (বের

হবে) তাদের পালনকর্তার দিকে (অর্থাৎ হিসাবের জায়গায়) দ্রুত চলতে থাকবে। (সেখানকার ভয়াবহ দৃশ্য দেখে) তারা বলবে, হায়, আমাদের দুর্ভোগ, আমাদেরকে আমাদের কবর থেকে কে উঠাল? (আমরা তো সেখানেই আরামে ছিলাম। ফেরেশতাগণ জওয়াব দেবেন,) রহমান আল্লাহ্ তো এরই (অর্থাৎ এ কিয়ামতেরই) ওয়াদা দিয়েছিলেন এবং রসূলগণ এ সত্যই বলেছিলেন। (কিন্তু তোমরা তখন মাননি। অতপর আল্লাহ্ বলেন, এটা (অর্থাৎ দ্বিতীয় ফুঁক) তো হবে এক মহানাদ (যেমন প্রথম ফুঁকও এক মহানাদ ছিল) ফলে সে মুহূর্তেই তাদের সবাইকে আমার সামনে উপস্থিত করা হবে। পূর্বে চলার কথা হয়েছিল, এখানে উপস্থিত করার কথা বলা হয়েছে। উভয়টিই বাধ্যতামূলক ও জোরপূর্বক হবে। কোরআনের ভাষা مُحْضَرُوْنَ এবং جَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ থেকে জানা যায়।) আজকের দিনে কারও প্রতি জুলুম করা হবে না এবং তোমরা (দুনিয়াতে কুফর ইত্যাদি) যা করতে, কেবল তারই প্রতিফল পাবে। (এখন জান্নাতীদের অবস্থা বর্ণিত হচ্ছে,) নিশ্চয়ই জান্নাতীরা এদিনে তাদের আনন্দে মশগুল থাকবে। তারা এবং তাদের স্ত্রীরা উপবিষ্ট থাকবে ছায়াময় পরিবেশে আসনে হেলান দিয়ে। সেখানে তাদের জন্য থাকবে (সর্বপ্রকার) ফলমূল এবং প্রার্থিত সব কিছু। করুণাময় পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাদেরকে সালাম বলা হবে। [অর্থাৎ আল্লাহ্ বলবেন, আসসালামু আলাইকুম ইয়া আহলাল-জান্নাত---(ইবনে মাজা)। অতপর আবার জাহান্নামীদের অবস্থার পরিশিষ্ট বর্ণনা করা হয়েছে। হাশরে তাদেরকে আদেশ করা হবে] হে অপরাধীরা (যারা কুফরী করেছিলে), আজ তোমরা (মু'মিনদের থেকে) পৃথক হয়ে যাও। (কারণ তাদেরকে জান্নাতে এবং তোমাদেরকে জাহান্নামে প্রেরণ করা হবে। তখন তাদেরকে তিরস্কারছলে বলা হবে,) হে বনী আদম! (এমনিভাবে জিনদেরকেও সম্বোধন করা হবে, যেমন অন্য আয়াতে আছে, يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ) আমি কি তোমাদেরকে জোর দিয়ে বলে রাখিনি যে, শয়তানের ইবাদত করো না সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু; বরং আমারই ইবাদত কর? এটাই সরল পথ। [ইবাদতের অর্থ এখানে আনুগত্য করা। যেমন, এক আয়াতে আছে: وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ অন্য আয়াতে আছে: وَلَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ এ ছাড়া শয়তান সম্পর্কে তোমাদের আরও জানান হয়েছিল যে, সে তোমাদের (বনী-আদমের) অনেক দলকে পথভ্রষ্ট করেছে। তোমাদের পথভ্রষ্টতার শাস্তি ও অতীত সম্প্রদায়সমূহের কাহিনী বর্ণনা প্রসঙ্গে বলে দেওয়া হয়েছিল। অতএব তোমরা কি বুঝনি (যে, তার প্ররোচনায় আমরা পথভ্রষ্ট হয়ে গেলে আমরাও শাস্তির যোগ্য হয়ে যাব? অতএব) এই সে

জাহান্নাম, (কুফর করা হলে) যার ওয়াদা তোমাদেরকে দেওয়া হত। অদ্য তোমাদের কুফরের কারণে এতে প্রবেশ কর। আজ আমি তাদের মুখে মোহর এঁটে দেব (ফলে তারা মিথ্যা ওযর পেশ করতে পারবে না। যেমন, শুরুতে বলবে وَاللّٰهِ مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং তাদের পা তাদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দেবে। (এ শাস্তি তো হবে পরকালে) আমি ইচ্ছা করলে (দুনিয়াতেই তাদের কুফরের শাস্তিস্বরূপ) তাদের দৃষ্টি বিলুপ্ত করতে পারতাম (দৃষ্টিশক্তি বিলুপ্ত করে অথবা চক্ষুই লোপ করে) তখন তারা পথের দিকে (চলার জন্য দৌড়াতে) চাইলে কি করে দেখতে পেত? (লুত সম্প্রদায়ের উপর এমনি আযাব এসেছিল। আল্লাহ্ বলেন, فَطَمَسْنَا তদুপরি) আমি ইচ্ছা করলে (কুফরের শাস্তিস্বরূপ) তাদের আকৃতি বদলে দিতে পারতাম (যেমন, পুরাকালে কতক লোক বানর ও শূকরে পরিণত হয়েছিল।) এমতাবস্থায় তারা যে যেখানে ছিল, সেখানেই থেকে যেত। (অর্থাৎ বদলে দেওয়ার সাথে সাথে তাদেরকে বিকলাঙ্গ জানোয়ার বানিয়ে দিতাম, যে স্বস্থান ত্যাগ করতে পারে না) ফলে তারা অগ্রেও চলতে পারত না এবং পিছনেও ফিরে যেতে পারত না। (এই চক্ষু লোপ করা ও আকার বিকৃত করার ব্যাপারে আশ্চর্যান্বিত হয়ো না যে, এটা কিরূপে হতে পারত! এরই অনুরূপ আমার একটি কাজ দেখ) আমি যাকে দীর্ঘ জীবন দান করি, (অর্থাৎ খুব বয়োবৃদ্ধি করি,) তাকে স্বাভাবিক অবস্থায় উপুড় করে দেই। (স্বাভাবিক অবস্থা বলে জ্ঞান-বুদ্ধি, চেতনা, শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, পরিপাকশক্তি ইত্যাদি এবং রঙ-রূপ ও সৌন্দর্য বোঝানো হয়েছে। উপুড় করার অর্থ তার অবস্থা উপর থেকে নিচের দিকে এবং ভাল থেকে মন্দের দিকে ধাবমান করে দেওয়া। সুতরাং লোপ করা এবং বিকৃত করাও এক প্রকার পূর্ণত্ব থেকে অপূর্ণত্বের দিকে ধাবমান করা।) অতএব (এ অবস্থা দেখেও) তারা কি বুঝেনি? (আল্লাহ্ যখন এক পরিবর্তন করতে সক্ষম, তখন অন্য পরিবর্তনও করতে পারবেন; বরং আল্লাহ্ সম্ভাব্য সবকিছু করতে সমান সক্ষম। অতএব এ বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য করে তাদের সতর্ক হওয়া ও কুফর বর্জন করা উচিত)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

কাফিররা যে مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ বলে مَا يَنْظُرُوْنَ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً ঠাট্টা ও পরিহাসছলে মুসলমানদেরকে জিজ্ঞেস করত, তোমরা যে কিয়ামতের প্রবক্তা, তা কোন্ বছর ও কোন্ তারিখে সংঘটিত হবে? বর্ণিত আয়াতে তারই জওয়াব দেওয়া হয়েছে। তাদের প্রশ্ন বাস্তব বিষয় ে নার জন্য নয়; বরং নিছক ঠাট্টা ও পরিহাসের ছলে ছিল। জানার জন্য হলেও কিয় তের সন-তারিখের নিশ্চিত জ্ঞান কাউকে না দেওয়াই আল্লাহ্র রহস্যের দাবি ছিল। তাই আল্লাহ্ তা'আলা এ জ্ঞান তাঁর নবী-রসূলকেও দান করেন নি। নির্বোধদের এই প্রশ্ন অনর্থক ও বাজে ছিল বিধায় এর জওয়াবে

কিয়ামতের তারিখ বর্ণনা করার পরিবর্তে তাদেরকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, যে বিষয়ের আগমন অবশ্যম্ভাবী তার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা এবং সন-তারিখ খোঁজাখুঁজিতে সময় নষ্ট না করাই বুদ্ধিমানের কাজ। কিয়ামতের খবর শুনে বিশ্বাস স্থাপন করা এবং সৎকর্ম সম্পাদন করাই ছিল বিবেকের দাবি, কিন্তু তারা এমনি গাফিল যে, কিয়ামতের আগমনের পর তারা যেন চিন্তা করার অপেক্ষায় আছে। তাই বলা হয়েছে, তারা কিয়ামতের অপেক্ষা করছে। অথচ কিয়ামত হবে একটি মাত্র মহানাদ যা তাদেরকে তখন অতর্কিতে আঘাত হানবে, যখন তারা নিজেদের কাজ-কারবার ও পারস্পরিক লেনদেনের বাকবিতণ্ডায় রত থাকবে। সবাই তদাবস্থায় মরে কাঠ হয়ে পড়ে থাকবে।

হাদীসে আছে, দুই ব্যক্তি বস্ত্র ক্রয়-বিক্রয়ে রত থাকবে; সামনে বস্ত্র খোলা থাকবে আর এমতাবস্থায় হঠাৎ কিয়ামতের আগমন হবে এবং তারা বস্ত্রটি ভাঁজ করারও অবকাশ পাবে না। কোন ব্যক্তি হয়তো তার চৌবাচ্চাটিতে মাটি দ্বারা লেপ দিতে থাকবে এবং তদাবস্থায়ই মরে যাবে।----(কুরতুবী)

لَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَّلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ—অর্থাৎ তখন যারা একত্রিত হবে, তারা একজন অপরজনকে কোন কাজের ওসিয়ত করারও সুযোগ পাবে না এবং যারা ঘরের বাইরে থাকবে, তারা ঘরে প্রত্যাবর্তন করারও সময় পাবে না। আপন আপন জায়গায় মরে পড়ে থাকবে। প্রথম ফুঁকের এই ঘটনায় সমগ্র বিশ্ব আকাশ ও পৃথিবী ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে।

এরপর বলা হয়েছে ঃ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ—اجداث শব্দটি جدث-এর বহুবচন। অর্থ কবর। ينسلون শব্দটি نسلان থেকে উদ্ভূত। অর্থ দ্রুত চলা। অন্য এক আয়াতে আছে ঃ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا—অর্থাৎ তারা দ্রুত কবর থেকে বের হবে। এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ—অর্থাৎ হাশরের সময় মানুষ কবর থেকে উঠে দেখতে থাকবে। এ বক্তব্য পূর্ববর্তী বক্তব্যের পরিপন্থী নয়। কারণ, প্রথমাবস্থায় বিস্মিত হয়ে দণ্ডায়মান অবস্থায় দেখতে থাকবে এবং পরে দ্রুত গতিতে হাশরের দিকে দৌড়াতে থাকবে। কোরআনের আয়াত থেকেই প্রমাণিত হয় যে, ফেরেশতাগণ সবাইকে ডেকে হাশরের ময়দানে আনবে। এতে বোঝা যায় যে, মানুষ স্বেচ্ছায় হাশরের ময়দানে উপস্থিত হবে না, বরং ফেরেশতাগণের ডাকার কারণে বাধ্যতামূলকভাবে দৌড়াতে দৌড়াতে উপস্থিত হবে।

قَالُوْا يٰوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا কাফিররা কবরেও আরামে ছিল না, বরং কবরের আযাবে পতিত ছিল। কিন্তু কিয়ামতের আযাবের তুলনায় সে আযাবকে আরাম বলেই মনে হবে। তাই তারা বলবে, কে আমাদেরকে কবর থেকে বের করল? সেখানে থাকলেই তো ভাল হত। ফেরেশতাগণ অথবা মু'মিনগণ এর জওয়াবে বলবে :

هٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُوْنَ—অর্থাৎ করুণাময় আল্লাহ্ যে কিয়ামতের ওয়াদা দিয়েছিলেন, এই হল সে কিয়ামত। রসূলগণ তোমাদেরকে সে সত্য সংবাদই শুনিয়েছিলেন, কিন্তু তোমরা ভ্রূক্ষেপ করনি। এখানে আল্লাহ্র 'রহমান' গুণটি উল্লেখ করার মাঝে ইঙ্গিত রয়েছে যে, তিনি তো স্বীয় রহমতে তোমাদের জন্য এ আযাব থেকে বেঁচে থাকার বহু ব্যবস্থা করেছিলেন। পূর্বাহ্নে এর ওয়াদা দেওয়া এবং কিতাব ও পয়গম্বরগণের মাধ্যমে এর খবর তোমাদের কাছে পৌঁছানো আল্লাহ্র 'রহমান' গুণেরই বহিঃপ্রকাশ ছিল।

اِنَّ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِيْ شُغُلٍ فٰكِهُوْنَ—জাহান্নামীদের দুরবস্থা বর্ণনা করার পর কিয়ামতে জান্নাতীদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে যে, তারা তাদের চিত্তবিনোদনে মশগুল থাকবে। فٰكِهُوْنَ--এর অর্থ আনন্দিত, স্বাচ্ছন্দ্যশীল : فِيْ شُغُلٍ--এর এক অর্থ এমনও হতে পারে যে, তারা জাহান্নামীদের দুরবস্থা থেকে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকবে।

এ স্থলে فِيْ شُغُلٍ সংযুক্ত করার কারণ এ ধারণা নিরসন করাও হতে পারে যে, জান্নাতে ফরয-ওয়াজিব কোন ইবাদত থাকবে না এবং জীবিকা উপার্জনেরও কোন প্রয়োজন থাকবে না। এমন বেকার অবস্থায় মানুষ সাধারণত অস্বস্তি বোধ করে। তাই বলা হয়েছে যে, জান্নাতীরা বিনোদনমূলক কাজকর্মে ব্যস্ত থাকবে। কাজেই অস্বস্তিবোধ করার প্রশ্নই দেখা দেয় না।

هُمْ وَاَزْوَاجُهُمْ—اَزْوَاجٌ শব্দের অর্থে জান্নাতের হুর এবং দুনিয়ার স্ত্রী সবাই অন্তর্ভুক্ত।

وَلَهُمْ مَّا يَدَّعُوْنَ- শব্দটি دعوت থেকে উদ্ভূত। অর্থ আহবান করা। অর্থাৎ জান্নাতীরা যে বস্তুকেই ডাকবে, তা পেয়ে যাবে। কোরআন করীম এক্ষেত্রে

يسئلون বলেনি। কেননা, চেয়ে লাভ করাও এক প্রকার শ্রম ও কষ্ট, যা থেকে জান্নাত পবিত্র। সেখানে প্রতিটি প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীই উপস্থিত থাকবে।

وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ — হাশরের ময়দানে প্রথমে মানুষ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় সমবেত হবে। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ—كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ অর্থাৎ তারা হবে বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের মত। কিন্তু পরে কর্মের ভিত্তিতে তাদের পৃথক পৃথক দলে বিভক্ত করা হবে। কাফির, মু'মিন, সৎকর্মী ও অসৎকর্মী লোকগণ পৃথক পৃথক জায়গায় অবস্থান করবে। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ অর্থাৎ যখন মানুষকে জোড়া জোড়া করা হবে। আলোচ্য আয়াতেও এই পৃথকীকরণ ব্যক্ত হয়েছে।

أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ — অর্থাৎ সমস্ত মানুষ এমনকি, জিনদেরকেও কিয়ামতের দিন বলা হবে, আমি কি তোমাদেরকে দুনিয়াতে শয়তানের ইবাদত না করার আদেশ দেইনি? এখানে প্রশ্ন হয় যে, কাফিররা সাধারণত শয়তানের ইবাদত করত না, বরং দেবদেবী অথবা অন্য কোন বস্তুর পূজা করত। কাজেই তাদেরকে শয়তানের ইবাদত করার অভিযোগে কেমন করে অভিযুক্ত করা যায়? জওয়াব এই যে, প্রত্যেক কাজে ও প্রত্যেক অবস্থায় কারও আনুগত্য করার নামই ইবাদত। তারাও চিরকাল শয়তানী শিক্ষার অনুসরণ করেছিল বিধায় তাদেরকে শয়তানের ইবাদতকারী বলা হয়েছে। যে ব্যক্তি অর্থের মহব্বতে প্রতিটি এমন কাজ করে, যদ্দ্বারা অর্থ বৃদ্ধি পায় এবং স্ত্রীর মহব্বতে প্রতিটি এমন কাজ করে যদ্দ্বারা স্ত্রী সন্তুষ্ট হয়, হাদীসে তাদেরকে অর্থের দাস ও স্ত্রীর দাস বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

কোন কোন সূফী বুযুর্গের ভাষণে নফসের অনুসরণকে মূর্তি পূজা বলা হয়েছে। এর অর্থও নফসের কামনা-বাসনা মেনে চলা; কুফর ও শিরক অর্থ নয়। জনৈক সাধক কবি বলেছেন ঃ

سود ه گشت از سجده راه بتاں پیشانیم
چند بر خود تهمت دین مسلمانی نہم

اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى اَفْوَاهِهِمْ – হাশরে হিসাব-নিকাশের জন্য উপস্থিতির সময় প্রথমে প্রত্যেকেই যা ইচ্ছা ওযর বর্ণনা করার স্বাধীনতা পাবে। মুশরিকরা সেখানে শপথ সহকারে কুফর ও শিরক অস্বীকার করবে। তারা বলবে, وَاللّٰهِ مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ কেউ বলবে, আমাদের আমলনামায় ফেরেশতা যা কিছু লিখেছে, আমরা তা থেকে মুক্ত। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মুখে মোহর এঁটে দেবেন, যাতে তারা কোন কিছু বলতে না পারে। অতপর তাদেরই হাত, পা ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে রাজসাক্ষী করে কথা বলার যোগ্যতা দান করা হবে। তারা কাফিরদের যাবতীয় কার্যকলাপের সাক্ষ্য দেবে। আলোচ্য আয়াতে হাত ও পায়ের কথা উল্লিখিত হয়েছে। অন্য আয়াতে মানুষের কর্ণ, চক্ষু ও চর্মের সাক্ষ্যদানের উল্লেখ রয়েছে। বলা হয়েছে ঃ شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَاَبْصَارُهُمْ وَجُلُوْدُهُمْ অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ – অর্থাৎ তাদের জিহবা সাক্ষ্য দেবে। এটা আলোচ্য আয়াতের অর্থাৎ মুখে মোহর এঁটে দেওয়ার পরিপন্থী নয়। কেননা, মোহর করার উদ্দেশ্য এই যে, তারা নিজ ক্ষমতায় কিছু বলতে পারবে না। তাদের জিহবাও তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই সাক্ষ্য দেবে।

এসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বাকশক্তি কোথা থেকে আসবে, এ প্রশ্নের জওয়াব কোরআনেই বর্ণিত হয়েছে যে, اَنْطَقَنَا اللّٰهُ الَّذِىْٓ اَنْطَقَ كُلَّ شَىْءٍ অর্থাৎ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বলবে যে, আল্লাহ্ প্রত্যেক বাকশক্তিসম্পন্নকে বাকশক্তি দিয়েছেন, তিনি আমাদেরকেও বাকশক্তি দিয়েছেন।

وَمَنْ نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِى الْخَلْقِ ؕ اَفَلَا يَعْقِلُوْنَ — نُعَمِّرْ শব্দটি تَعْمِيْر থেকে উদ্ভূত। অর্থ দীর্ঘায়ু দান করা। نُنَكِّسْ শব্দটি تَنْكِيْس থেকে উদগত। অর্থ উপুড় করা। এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর পূর্ণ শক্তি ও প্রজ্ঞার আরও একটি বহিঃপ্রকাশ বর্ণনা করেছেন। তা এই যে, প্রত্যেক মানুষ ও প্রাণী সর্বদা আল্লাহ্র কর্মের অধীনে থাকে এবং তাঁর কর্ম তাদের মধ্যে অবিরাম অব্যাহত থাকে। একটি নোংরা ও নিষ্প্রাণ ফোঁটা থেকে তাদের অস্তিত্বের সূচনা হয়েছে। জননীর গর্ভাশয়ের তিন অন্ধকারে এই ক্ষুদ্র জগতের সৃষ্টি সম্পন্ন হয়েছে। অনেক সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি এই অস্তিত্বের মধ্যে স্থাপন করা হয়েছে। অতপর আত্মা সঞ্চার করে তাকে জীবিত করা হয়েছে। নয় মাস জননী-গর্ভে লালিত-পালিত হয়ে সে একটি পূর্ণাঙ্গ মানুষের আকার ধারণ করেছে এবং পৃথিবীতে পদার্পণ করেছে। পূর্ণাঙ্গ হওয়া সত্ত্বেও তার প্রতিটি অঙ্গ দুর্বল প্রকৃতি

তার উপযুক্ত খাদ্য তার মায়ের স্তনে সৃষ্টি করে তাকে ধাপে ধাপে শক্তি দান করেছেন। অতপর যৌবন পর্যন্ত অনেক স্তর অতিক্রম করে তার যাবতীয় শক্তি সুঠাম ও সবল হয়েছে। ফলে সে শক্তি ও শৌর্য দাবি করতে শুরু করেছে এবং তার মধ্যে প্রতিপক্ষকে পরাজিত করার মনোবল সৃষ্টি হয়েছে।

অতপর আল্লাহ্ যখন ইচ্ছা করলেন, তখন তার সমস্ত বল ও শক্তি হ্রাস পেতে শুরু করেছে। এই হ্রাসপ্রাপ্তিও অনেক স্তর অতিক্রম করে অবশেষে বার্ধক্যের শেষ সীমানায় উপনীত হয়েছে। চিন্তা করলে দেখা যায়, এখানে পৌঁছে সে আবার সে স্তরেই পৌঁছে গেছে, যে স্তরটি শৈশবে অতিক্রম করেছিল। তার সকল অভ্যাস ও ক্রিয়াকর্ম বদলে গেছে। যেসব বস্তু এক সময় তার সর্বাধিক প্রিয় ছিল, সেগুলোই এখন সর্বাধিক ঘৃণিত হয়ে গেছে। পূর্বে যা ছিল সুখের বিষয়, এখন তাই হয়ে গেছে কষ্টের বিষয়। আলোচ্য আয়াতে একেই উপুড় করা বলা হয়েছে। জনৈক কবি চমৎকার বলেছেন ঃ

من عاش اخلقت الايام جدته
وخانه ثقتاه السمع والبصر

অর্থাৎ যে ব্যক্তি জীবিত থাকবেন, কালের আবর্তন তার নতুনত্ব ও শক্তিমত্তাকে জীর্ণ ও মলিন করে দেবে এবং তার সর্বপ্রধান দুই বন্ধু অর্থাৎ শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে পৃথক হয়ে যাবে।

মানুষ দুনিয়াতে চোখে দেখা অথবা কানে শোনা বিষয়ের প্রতি সর্বাধিক আস্থা পোষণ করে। বার্ধক্যে পৌঁছলে এগুলোও আস্থাভাজন থাকে না। শ্রবণশক্তির দুর্বলতার কারণে কথাবার্তা পূর্ণরূপে বোঝা কঠিন হয় এবং দৃষ্টিশক্তির বৈকল্যের কারণে সঠিকভাবে দেখা দুরূহ হয়ে পড়ে। মুতানাব্বী তাই বলেছেন ঃ

ومن صحب الدنيا طويلا تقلبت
على عينه حتى يرى صدقها كذبا

অর্থাৎ যে ব্যক্তি দুনিয়াতে দীর্ঘ জীবন লাভ করে, তার চোখের সামনেই দুনিয়া পাল্টে যায়। ফলে পূর্বে যে বিষয়কে সত্য মনে করত, তা মিথ্যা প্রতীয়মান হতে থাকে।

মানুষের অস্তিত্বে এসব পরিবর্তন যেমন আল্লাহ্ তা'আলার বিস্ময়কর কুদরতের বহিঃপ্রকাশ, তেমনি এতে মানুষের প্রতি এক বিরাট অনুগ্রহও বিদ্যমান। স্রষ্টা মানুষের অস্তিত্বে যেসব শক্তি গচ্ছিত রেখেছেন, সেগুলো প্রকৃতপক্ষে সরকারী যন্ত্রপাতি। এগুলো তাকে দান করে বলে দেওয়া হয়েছে যে, এগুলোর মালিক তুমি নও এবং এগুলো চিরস্থায়ীও নয়। অবশেষে তোমার কাছ থেকে ফেরত নেওয়া হবে। এর পরিপ্রেক্ষিতে নির্ধারিত সময়ে সবগুলো শক্তি একযোগে ফেরত নেওয়া বাহ্যত সঙ্গত ছিল। কিন্তু করুণাময়

আল্লাহ্ এগুলো ফেরত নেয়ার জন্যও দীর্ঘ মেয়াদী কিস্তি নির্ধারিত করে দিয়েছেন এবং ক্রমান্বয়ে ফেরত নিয়েছেন যাতে মানুষ সাবধান হয়ে পরকালের সফরে যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে।

وَمَا عَلَّمْنٰهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْۢبَغِيْ لَهٗ ؕ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ وَّقُرْاٰنٌ مُّبِيْنٌ ۙ﴿٦٩﴾
لِّيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَّيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ﴿٧٠﴾ اَوَلَمْ يَرَوْا
اَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِّمَّا عَمِلَتْ اَيْدِيْنَآ اَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مٰلِكُوْنَ ﴿٧١﴾
وَذَلَّلْنٰهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوْبُهُمْ وَمِنْهَا يَاْكُلُوْنَ ﴿٧٢﴾ وَلَهُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ
وَمَشَارِبُ ؕ اَفَلَا يَشْكُرُوْنَ ﴿٧٣﴾ وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اٰلِهَةً
لَّعَلَّهُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿٧٤﴾ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَهُمْ ۙ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ
مُّحْضَرُوْنَ ﴿٧٥﴾

---

(৬৯) আমি রসূলকে কবিতা শিক্ষা দেইনি এবং তা তার জন্য শোভনীয়ও নয়। এটাতো কেবল এক উপদেশ ও প্রকাশ্য কোরআন। (৭০) যাতে তিনি সতর্ক করেন জীবিতকে এবং যাতে কাফিরদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়। (৭১) তারা কি দেখে না, তাদের জন্য আমি আমার নিজ হাতের তৈরী বস্তুর দ্বারা চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছি, অতপর তারাই এগুলোর মালিক। (৭২) আমি এগুলোকে তাদের হাতে অসহায় করে দিয়েছি। ফলে এদের কতক তাদের বাহন এবং কতক তারা ভক্ষণ করে। (৭৩) তাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে অনেক উপকারিতা ও পানীয় রয়েছে। তবুও কেন তারা শুকরিয়া আদায় করে না? (৭৪) তারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অনেক উপাস্য গ্রহণ করেছে যাতে তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হতে পারে। (৭৫) অথচ এসব উপাস্য তাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম হবে না এবং এগুলো তাদের বাহিনীরূপে ধৃত হয়ে আসবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

[কাফিররা নবুয়ত অস্বীকার করার জন্য রসূল (সা)-কে কবি বলে। এটা নির্জলা মিথ্যা। কেননা,] আমি রসূল (সা)-কে কবিতা (অর্থাৎ কাল্পনিক বিষয় রচনা করতে)

শিক্ষা দেইনি এবং তা (কাব্য রচনা) তার জন্য শোভনীয়ও নয়। তা (অর্থাৎ রসূলকে প্রদত্ত জ্ঞান) তো কেবল এক উপদেশ ও আল্লাহ্ প্রদত্ত গ্রন্থ, যা বিধানাবলী প্রকাশ করে, যাতে (বিধানাবলী বর্ণনার প্রভাবে) তিনি এমন ব্যক্তিকে (কল্যাণজনক) ভয় প্রদর্শন করেন, যে (আত্মিক জীবনের দিক দিয়ে) জীবিত এবং (যাতে) কাফিরদের বিরুদ্ধে আযাবের অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়। তারা (অর্থাৎ মুশরিকরা) কি দেখে না যে, আমি তাদের (কল্যাণের) জন্য নিজ হাতের তৈরী বস্তুর দ্বারা চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছি, অতপর (আমার মালিক করার কারণে) তারাই এগুলোর মালিক। (অতপর কল্যাণের কিছু বর্ণনা দেওয়া হয়েছে,) আমি এগুলোকে তাদের হাতে অসহায় করে দিয়েছি। অতপর এদের কতক তাদের বাহন এবং কতক তারা ভক্ষণ করে। এগুলোতে তাদের জন্য আরও অনেক উপকারিতা রয়েছে (যেমন, লোম, চামড়া ও হাড় প্রভৃতি বিভিন্ন উপায়ে ব্যবহার করা হয়।) এবং (এগুলোতে তাদের) পানীয় বস্তুও (অর্থাৎ দুগ্ধ) আছে। তবুও কেন তারা শুকরিয়া আদায় করে না? (শুকরিয়ার সর্বপ্রথম ও প্রধান স্তর তওহীদে বিশ্বাস স্থাপন করা। কিন্তু) তারা (তওহীদে বিশ্বাস করার পরিবর্তে কুফর ও শিরক করে যাচ্ছে। সেমতে) আল্লাহ্র পরিবর্তে অন্য উপাস্য গ্রহণ করেছে এ আশায় যে, তারা (এ উপাস্যদের পক্ষ থেকে) সাহায্যপ্রাপ্ত হবে। কিন্তু তারা তাদেরকে কোন সাহায্য করতে সক্ষম হবে না। (সাহায্য তো দূরের কথা) উল্টা তারা তাদের এক প্রতিপক্ষ হবে (এবং হিসাবের জায়গায় জোরপূর্বক) ধৃত হয়ে আসবে (সেখানে হাযির হয়ে তারা উপাসনাকারীদের বিরোধিতা প্রকাশ করবে। যেমন, আল্লাহ্ সূরা মরিয়মে বলেনঃ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا এবং সূরা ইউনুসে বলেনঃ

قَالَ شُرَكَاءُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ — নবুয়ত অমান্যকারী কাফিররা মানুষের মনে কোরআনের বিস্ময়কর প্রভাবের কথা অস্বীকার করতে পারত না। কারণ এটা ছিল সাধারণ প্রত্যক্ষ বিষয়। তাই তারা কখনও কোরআনকে যাদু এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে যাদুকর বলত এবং কখনও কোরআনকে কবিতা এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কবি বলে আখ্যা দিত। এভাবে তারা প্রমাণ করতে চাইত যে, এই অনন্য সাধারণ প্রভাব আল্লাহ্র কালাম হওয়ার কারণে নয়, বরং হয় এটা যাদু, যা মানুষের মনে প্রভাব বিস্তার করে, না হয় কবিতা, যা সাধারণের মনে সাড়া জাগাতে পারে।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, আমি নবীকে কবিতা ও কাব্য শিক্ষা দেইনি এবং তা তাঁর জন্য শোভনীয়ও নয়। সুতরাং তাঁকে কবি বলা ভ্রান্ত।

এখানে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, কাব্য রচনা আরব জাতির মজ্জাগত বিষয়। তাদের নারী ও বালক-বালিকারাও অনর্গল কবিতা বলে। কবিতার স্বরূপ সম্পর্কে তারা সম্যক জ্ঞাত। সুতরাং তারা কিসের ভিত্তিতে কোরআনকে কবিতা এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কবি বলেছে? কারণ, কোরআন কবিতার ছন্দ ও শেষ অক্ষরের মিল মেনে চলেনি। একে কোন মূর্খ এবং কাব্য চর্চা সম্পর্কে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিও কবিতা বলতে পারে না।

এর জওয়াব এই যে, কবিতা আসলে কাল্পনিক স্বরচিত বিষয়কে বলা হয়, তা পদ্যেই হোক অথবা গদ্যে। কোরআনকে কবিতা এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কবি বলার পেছনে কাফিরদের উদ্দেশ্য ছিল এই যে, তাঁর আনীত কালাম নিছক কাল্পনিক গল্প-গুজব অথবা তারা বোঝাতে চেয়েছিল যে, পদ্য ও কবিতা যেমন বিশেষ প্রভাব রাখে, এর প্রভাবও ঠিক তেমনি।

ইমাম জাসসাস রেওয়ায়েত করেন যে, হযরত আয়েশা (রা)-কে কেউ জিজ্ঞাসা করল, রসূলুল্লাহ্ (সা) কখনও কোন কবিতা আবৃত্তি করতেন কি? তিনি উত্তরে বললেন, না; তবে ইবনে তুরফার এক পংক্তি কবিতা তিনি আবৃত্তি করেছিলেন। পংক্তিটি এই :

ستبدى لك الايام ما كنت جاهلا
ويأتيك بالاخبار من لم تزود

তিনি একে ছন্দ পরিবর্তন করে, من لم تزود بالاخبار- আবৃত্তি করলে হযরত আবুবকর (রা) আরয করলেন, ইয়া রসূলুল্লাহ্! কবিতাটি এভাবে নয়। তখন তিনি বললেন, আমি কবি নই এবং কাব্য চর্চা আমার জন্য শোভনীয়ও নয়।

তিরমিযী, নাসাঈ ও ইমাম আহমদ এই রেওয়ায়েতটি বর্ণনা করেছেন এবং ইবনে কাসীরও তাঁর তফসীরে এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এ থেকে প্রতীয়মান হল যে, স্বয়ং কোন কবিতা রচনা করা তো দূরের কথা, তিনি অন্যের কবিতা আবৃত্তি করাও নিজের জন্য শোভনীয় মনে করতেন না। কোন কোন রেওয়ায়েতে তাঁর কিছু বাক্য কবিতার ছন্দ অনুযায়ী বর্ণিত রয়েছে। এগুলো কবিতার উদ্দেশ্যে নয়, ঘটনাচক্রে মুখ দিয়ে বের হয়ে গেছে। ঘটনাচক্রে দু'চারটি ছন্দযুক্ত বাক্য কারও মুখ দিয়ে বের হয়ে গেলেই তাকে কবি বলা যায় না। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র এই রহস্যভিত্তিক স্বাভাবিক অবস্থা থেকে এটা জরুরী হয় না যে, কাব্যচর্চা সর্বাবস্থায়ই নিন্দনীয়। কবিতা ও কাব্যচর্চা সম্পর্কিত বিস্তারিত বিধানাবলী সূরা শোয়ারার সর্বশেষ রুকূতে বর্ণিত হয়েছে। বিষয়টি সেখানে নেওয়া বাঞ্ছনীয়।

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ

আয়াতে চতুষ্পদ জন্তু সৃজনে মানুষের উপকারিতা এবং প্রকৃতির অসাধারণ কারিগরি উল্লেখ করার সাথে সাথে আল্লাহ্ তা'আলার আরও একটি মহা অনুগ্রহ বিধৃত হয়েছে। তা এই যে, চতুষ্পদ জন্তু সৃজনে মানুষের কোনই হাত নেই। এগুলো একান্তভাবে প্রকৃতির স্বহস্ত নির্মিত। আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনকে কেবল চতুষ্পদ জন্তু দ্বারা উপকার লাভের সুযোগ ও অনুমতিই দেননি, বরং তাদেরকে এগুলোর মালিকও করে দিয়েছেন। ফলে তারা এগুলোতে সর্বপ্রকারে মালিকসুলভ অধিকার প্রয়োগ করতে পারে। নিজে এগুলোকে কাজে লাগাতে পারে অথবা এগুলো বিক্রি করে সে মূল্য দ্বারা উপকৃত হতে পারে।

মালিকানার মূল কারণ আল্লাহ্র দান পুঁজি ও শ্রম নয়ঃ আজকাল নতুন নতুন অর্থনৈতিক মতবাদের মধ্যে জোরেশোরে আলোচনা চলছে যে, বস্তুনিচয়ের মালিকানায় পুঁজি মূল কারণ, না শ্রম? পুঁজিবাদি অর্থনীতির প্রবক্তারা পুঁজিকেই মূল কারণ সাব্যস্ত করে। পক্ষান্তরে সোশ্যালিজম ও কম্যুনিজমের প্রবক্তারা শ্রমকে মালিকানার আসল কারণ আখ্যা দেয়। আলোচ্য আয়াত ব্যক্ত করেছে যে, বস্তুনিচয়ের মালিকানায় এতদুভয়ের কোনই প্রভাব নেই। কোন বস্তুর সৃষ্টিই মানুষের করায়ত্ত নয়। এটা সরাসরি আল্লাহ্র কাজ। বুদ্ধি ও বিবেকের দাবি এই যে, যে যে বস্তু সৃষ্টি করে, তার মালিকও সেই হবে। এভাবে মূল সত্যিকার মালিকানা জগতের বস্তুনিচয়ের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলারই। যেকোন বস্তুর মধ্যে মানুষের মালিকানা একমাত্র আল্লাহ্র দানের কারণে হতে পারে। বস্তুনিচয়ের মালিকানার প্রমাণ ও তা হস্তান্তরের আইন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর পয়গম্বরগণের মাধ্যমে পৃথিবীতে জারি করেছেন। এই আইনের বিরুদ্ধে কেউ কোন বস্তুর মালিক হতে পারে না।

وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ — এতে আরও একটি অনুগ্রহ ও নিয়ামতের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, উট, ঘোড়া, হাতী, বলদ ইত্যাদি অধিকাংশ জীব-জন্তু মানুষ অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী। তাদের সামনে মানুষ একান্তই দুর্বল। ফলে এসব জন্তু মানুষের বশীভূত না হওয়াই ছিল যুক্তিযুক্ত। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা এগুলো সৃষ্টি করে যেমন মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, তেমনি এসব জন্তুকে স্বভাবগতভাবে মানুষের বশীভূতও করে দিয়েছেন। ফলে একজন বালকও একটি শক্তিশালী ঘোড়ার মুখে অনায়াসে লাগাম পরিয়ে দিতে পারে। এরপর তার পিঠে চেপে বসে যত্রতত্র নিয়ে যেতে পারে। এটাও মানুষের কোন বাহাদুরী নয়; একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার দান।

وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّحْضَرُونَ এখানে جُنْدٌ-এর অর্থ প্রতিপক্ষ নেওয়া হলে আয়াতের উদ্দেশ্য হবে এই যে, তারা দুনিয়াতে যাদেরকে উপাস্য স্থির করেছে, তারাই কিয়ামতের দিন তাদের প্রতিপক্ষ হয়ে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। তফসীরের সার-সংক্ষেপে এ অর্থই বর্ণিত হয়েছে।

হযরত হাসান ও কাতাদাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত এ আয়াতের তফসীর এই যে, কাফিররা সাহায্য পাওয়ার আশায় মূর্তিদেরকে উপাস্য স্থির করেছিল, কিন্তু অবস্থা হচ্ছে এই যে, স্বয়ং তারাই মূর্তিদের সেবাদাস ও সিপাহী হয়ে গেছে। তারা মূর্তিদের হিফাযত করে। কেউ বিরুদ্ধে গেলে তারা ওদের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করে। অথচ তাদেরকে সাহায্য করার যোগ্যতা মূর্তিদের নেই।

فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ ۘ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٦﴾ أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿٧٧﴾ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ ۖ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴿٧٨﴾ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴿٧٩﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ ﴿٨٠﴾ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم ۚ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ﴿٨١﴾ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿٨٢﴾ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٣﴾

---

(৭৬) অতএব তাদের কথা যেন আপনাকে দুঃখিত না করে। আমি জানি যা তারা গোপনে করে এবং যা তারা প্রকাশ্যে করে। (৭৭) মানুষ কি দেখেনা যে, আমি তাকে সৃষ্টি করেছি বীর্য থেকে? অতপর তখনই সে হয়ে গেল প্রকাশ্য বাকবিতণ্ডা-কারী। (৭৮) সে আমার সম্পর্কে এক অদ্ভুত কথা বর্ণনা করে, অথচ সে নিজের সৃষ্টি ভুলে যায়। সে বলে, কে জীবিত করবে অস্থিসমূহকে যখন সেগুলো পচেগলে যাবে? (৭৯) বলুন, যিনি প্রথমবার সেগুলোকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই জীবিত করবেন। তিনি সর্বপ্রকার সৃষ্টি সম্পর্কে সম্যক অবগত। (৮০) যিনি তোমাদের জন্য সবুজ বৃক্ষ থেকে আগুন উৎপন্ন করেন। তখন তোমরা তা থেকে আগুন জ্বালাও। (৮১) যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে সক্ষম নন? হ্যাঁ, তিনি মহাস্রষ্টা, সর্বজ্ঞ। (৮২) তিনি যখন কোন কিছু করতে ইচ্ছা করেন, তখন তাকে কেবল বলে দেন, 'হও' তখনই তা হয়ে যায়। (৮৩) অতএব পবিত্র তিনি, যাঁর হাতে সবকিছুর রাজত্ব এবং তাঁরই দিকে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(কাফিররা সুস্পষ্ট ও খোলাখুলি ব্যাপারেও বিরুদ্ধাচরণই করে) অতএব (তওহীদ ও রিসালত অস্বীকার সম্পর্কিত) তাদের কথা যেন আপনাকে দুঃখিত না করে। [কেননা, দুঃখ হয় আশার কারণে, আর আশা হয় প্রতিপক্ষের বিবেক ও ইনসাফ থেকে। কিন্তু কাফিরদের মধ্যে বিবেক ও ইনসাফ বলতে কিছু নেই। সুতরাং তাদের থেকে আশাও হতে পারে না। অতএব দুঃখ কিসের? অতপর রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে অন্যভাবে সান্ত্বনা দেওয়া হচ্ছে,] নিশ্চয় আমি জানি যা তারা গোপনে করে এবং যা তারা প্রকাশ্যে করে। (তাই নির্দিষ্ট সময়ে তারা তাদের কর্মের শাস্তি পাবে। কিয়ামত অস্বীকারকারী) মানুষ কি জানে না যে, আমি (নিকৃষ্ট) বীর্য থেকে তাকে সৃষ্টি করেছি (ফলে তার উচিত ছিল নিজের প্রাথমিক অবস্থার কথা স্মরণ করে এবং নিজের নিকৃষ্টতা ও স্রষ্টার মাহাত্ম্য দেখে লজ্জাবোধ করা; ধৃষ্টতা প্রদর্শন না করা। এছাড়া আরও চিন্তা করা উচিত ছিল যে, মৃত্যুর পর পুনর্বার জীবিত করা আল্লাহ্র কুদরতের পক্ষে আদৌ অসম্ভব নয়।) অতপর (সে এরূপ চিন্তা করল না; বরং এর বিপরীতে) সে প্রকাশ্যে বাকবিতণ্ডা করতে লাগল। (তার বাকবিতণ্ডা এই যে,) সে আমার সম্পর্কে এক অদ্ভুত বিষয় বর্ণনা করছে। (অদ্ভুত একারণেও যে, এতে কুদরতের অস্বীকার জরুরী হয়ে পড়ে।) এবং সে তার নিজের মূল ভুলে গেছে। (তা এই যে, আমি তাকে নিকৃষ্ট বীর্য থেকে পূর্ণাঙ্গ মানুষ করেছি।) সে বলে, অস্থিকে কে জীবিত করবে, যখন তা পচেগলে যাবে? আপনি বলে দিন, তাকে তিনিই জীবিত করবেন, যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন। (প্রথম সৃষ্টির সময় জীবনের সাথে এসব অস্থির কোন সম্পর্কই ছিল না এখন তো একবার এগুলোর মধ্যে প্রাণ সঞ্চারিত হয়ে জীবনের সাথে এক প্রকার সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। কাজেই পুনরায় এগুলোতে প্রাণ সঞ্চার করা কঠিন কাজ নয়।) তিনি সর্বপ্রকার সৃষ্টি সম্পর্কে সম্যক অবগত। (অর্থাৎ প্রথমত কোন বস্তুকে সৃষ্টি করা অথবা সৃষ্ট বস্তুকে ধ্বংস করে পুনর্বার সৃষ্টি করা ইত্যাদি সব রকম সৃষ্টি কৌশলই তাঁর জানা।) তিনি (এমন সর্বশক্তিমান যে, কতক) সবুজ বৃক্ষ থেকে তোমাদের জন্য আগুন উৎপাদন করেন। অতপর তোমরা তা থেকে আগুন জ্বালাও। (আরবে মারুখ ও ইফার নামক দু'রকম বৃক্ষ ছিল। এগুলোর সবুজ শাখা পরস্পরে সংযুক্ত করলে আগুন উৎপন্ন হত। লোকেরা এগুলোকে আগুন উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করত। অতএব যিনি সবুজ বৃক্ষের পানিতে আগুন উৎপন্ন করেন, অন্যান্য জড় পদার্থে প্রাণ সঞ্চার করা তাঁর জন্য কঠিন হবে কেন?) যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি তাদের মত মানুষকে পুনর্বার সৃষ্টি করতে সক্ষম নন? অবশ্যই সক্ষম। তিনি মহাস্রষ্টা, সর্বজ্ঞ। (তাঁর কুদরত এমন যে,) তিনি যখন কোন কিছু (সৃষ্টি) করতে ইচ্ছা করেন, তখন তাকে কেবল বলে দেন, 'হয়ে যা' তখনই তা হয়ে যায়। (এই আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয় যে,) তিনি পবিত্র, যাঁর হাতে সবকিছুর এখতিয়ার রয়েছে এবং (একথা স্বতঃসিদ্ধ যে,) তাঁরই দিকে তোমরা (কিয়ামতের দিন) প্রত্যাবর্তিত হবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

اَوَلَمْ يَرَ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنٰهُ مِنْ نُّطْفَةٍ—সূরা ইয়াসীনের আলোচ্য সর্বশেষ পাঁচটি আয়াত একটি বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষাপটে অবতীর্ণ হয়েছে, যা কোন কোন রেওয়ায়েতে উবাই ইবনে খলফের ঘটনা বলে এবং কোন কোন রেওয়ায়েতে আ'স ইবনে ওয়ায়েলের ঘটনা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে উভয়ের তরফ থেকে ঘটনাটি সংঘটিত হওয়াও অসম্ভব নয়। প্রথম রেওয়ায়েতটি বায়হাকী শোআবুল-ঈমান এবং দ্বিতীয় রেওয়ায়েতটি ইবনে আবী হাতেম হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন। ঘটনাটি এই যে, আ'স ইবনে ওয়ায়েল মক্কা উপত্যকা থেকে একটি পুরাতন হাড় কুড়িয়ে তাকে স্বহস্তে ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলল, এই যে হাড়টি চূর্ণ-বিচূর্ণ অবস্থায় দেখছেন, আল্লাহ্ তা'আলা একেও জীবিত করবেন কি? রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, হ্যাঁ, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে মৃত্যু দেবেন, পুনরুজ্জীবিত করবেন এবং জাহান্নামে দাখিল করবেন।---(ইবনে কাসীর)

خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ—অর্থাৎ নিকৃষ্ট বীর্য থেকে সৃষ্ট এ মানুষ আল্লাহ্র কুদরত অস্বীকার করে কেমন খোলাখুলি বাকবিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হয়েছে :

ضَرَبَ لَنَا مَثَلًا—আ'স ইবনে ওয়ায়েল পুরাতন হাড়কে স্বহস্তে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে এর পুনরুজ্জীবন অসম্ভব মনে করেছিল। এখানে ضرب مثل (দৃষ্টান্ত বর্ণনা) বলে এ ঘটনাই বুঝানো হয়েছে। এরপর বলা হয়েছে :

وَنَسِىَ خَلْقَهٗ—অর্থাৎ এ দৃষ্টান্ত বর্ণনা করার সময় সে নিজের সৃষ্টিতত্ত্ব ভুলে গেল যে, নিকৃষ্ট, নাপাক ও নিষ্প্রাণ একটি শুক্র বিন্দুতে প্রাণসঞ্চার করে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। যদি সে এই মূল তত্ত্ব বিস্মৃত না হত, তবে এরূপ দৃষ্টান্ত উপস্থিত করে আল্লাহ্র কুদরতকে অস্বীকার করার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করতে পারত না।

جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الشَّجَرِ الْاَخْضَرِ نَارًا—আরবে মারখ ও ইফার নামক দুই ধরনের বৃক্ষ ছিল। আরবরা এই দুই প্রকারের দু'টি শাখা মিসওয়াকের পরিমাণে কেটে নিত। অতপর সম্পূর্ণ তাজা ও রস ভর্তি শাখাদ্বয়কে পরস্পর ঘষে আগুন জ্বালাত। আয়াতে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।---(কুরতুবী)

এ ছাড়া আয়াতের মর্ম এও হতে পারে যে, প্রত্যেক বৃক্ষ শুরুতে সবুজ ও সতেজ থাকার পর পরিশেষে শুকিয়ে আগুনের ইন্ধন হয়ে যায়। কোরআন পাকের

নিম্নোক্ত আয়াতের অর্থও তাই ঃ

أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ءَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ

অর্থাৎ তোমরা কি সে আগুনের প্রতি লক্ষ্য কর না, যাকে তোমরা প্রজ্বলিত করে কাজে লাগাও ? যে বৃক্ষ এই আগুনের স্ফুলিঙ্গ হয়, সেটি কি তোমরা সৃষ্টি করেছ, না আমি ?

কিন্তু আলোচ্য আয়াতে شجر শব্দের সাথে اخضر (সবুজ) বিশেষণ উল্লেখ থাকায় বাহ্যিক অর্থ সে বিশেষ বৃক্ষই হবে যা থেকে সবুজতা সত্ত্বেও আগুন নির্গত হয়।

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ — আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ কোন কিছু তৈরি করতে চাইলে প্রথমে উপকরণ সংগ্রহ করে, অতপর কারিগর ডাকে, অতপর বেশ কিছুকাল কাজ করার পর বাঞ্ছিত বস্তুটি তৈরি হয়। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা যখন কোন কিছু সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করেন, তখন এতসব সাত-পাঁচের প্রয়োজন হয় না। তিনি যখন যে বস্তু সৃষ্টি করতে চান, তখন সে বস্তুকে কেবল আদেশ দেওয়াই যথেষ্ট হয়। তিনি যে বস্তুকে 'হয়ে যা' বলেন, তা তৎক্ষণাৎ হয়ে যায়। এতে জরুরী হয় না যে, প্রত্যেক বস্তুই তাৎক্ষণিকভাবে সৃজিত হবে; বরং স্রষ্টার রহস্যের অধীনে যে বস্তুর তাৎক্ষণিক সৃষ্টি উপযোগী হয়, তা তাৎক্ষণিকভাবেই সৃজিত হয়। পক্ষান্তরে যে বস্তুর পর্যায়ক্রমিক সৃষ্টি কোন রহস্যের ভিত্তিতে উপযুক্ত বিবেচিত হয়, তাকে পর্যায়ক্রমেই সৃষ্টি করা হয়। এমতাবস্থায় প্রথমেই পর্যায়ক্রমিক সৃষ্টির আদেশ জারি করা হয় অথবা প্রত্যেক পর্যায়ে আলাদাভাবে كُنْ (হয়ে যা) আদেশ জারি করা হয়। والله سبحانه وتعالى اعلم

سورة الصّٰفّٰت

সূরা সাফ্ফাত

মক্কায় অবতীর্ণ, ১৮২ আয়াত, ৫ রুকু

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالصّٰٓفّٰتِ صَفًّا ۝١ فَالزّٰجِرٰتِ زَجْرًا ۝٢ فَالتّٰلِيٰتِ ذِكْرًا ۝٣ اِنَّ اِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ ۝٤ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ ۝٥ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ ِۨ الْكَوَاكِبِ ۝٦ وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ مَّارِدٍ ۝٧ لَا يَسَّمَّعُوْنَ اِلَى الْمَلَاِ الْاَعْلٰى وَيُقْذَفُوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ۝٨ دُحُوْرًا وَّلَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ ۝٩ اِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ۝١٠

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্ তা'আলার নামে শুরু।

(১) শপথ তাদের যারা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ানো, (২) অতপর ধমকিয়ে ভীতি প্রদর্শনকারীদের, (৩) অতপর মুখস্থ আবৃত্তিকারীদের---(৪) নিশ্চয় তোমাদের মা'বুদ এক। (৫) তিনি আসমানসমূহ, যমীন ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর পালনকর্তা এবং পালনকর্তা উদয়াচলসমূহের। (৬) নিশ্চয় আমি নিকটবর্তী আকাশকে তারকা-রাজির দ্বারা সুশোভিত করেছি (৭) এবং তাকে সংরক্ষিত করেছি প্রত্যেক অবাধ্য শয়তান থেকে। (৮) তারা ঊর্ধ্ব জগতের কোনকিছু শ্রবণ করতে পারে না এবং চার দিক থেকে তাদের প্রতি উল্কা নিক্ষেপ করা হয় (৯) তাদেরকে বিতাড়নের উদ্দেশ্যে। তাদের জন্য রয়েছে বিরামহীন শাস্তি। (১০) তবে কেউ ছোঁ মেরে কিছু শুনে ফেললে জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড তার পশ্চাদ্ধাবন করে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(শপথ সে ফেরেশতাদের, যারা) ইবাদত (অথবা আল্লাহ্‌র আদেশ শ্রবণ করার সময়) সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায়, (এ সূরায় পরে উল্লিখিত وَاِنَّا لَنَحْنُ الصَّآفُّوْنَ

আয়াতখানি এ ব্যাখ্যার প্রমাণ।) অতপর (শপথ) সে ফেরেশতাদের, যারা (জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ডের মাধ্যমে আকাশ থেকে সংবাদ সংগ্রহকারী শয়তানদের পথে) প্রতিরোধ সৃষ্টি করে। (এ ব্যাখ্যার প্রমাণও এ সূরাতেই সত্বর উল্লিখিত হবে।) অতপর (শপথ) সে ফেরেশতাদের, যারা যিকর (অর্থাৎ আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা) তেলাওয়াত করে। যেমন, এ সূরায়ই বলা হবে وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ মোটকথা এসব শপথের পর বলা হয়েছে— তোমাদের (সত্যিকার) মাবুদ এক। (তাঁর একত্বের প্রমাণ এই যে) তিনি আসমানসমূহ ও যমীনের পালনকর্তা (অর্থাৎ এগুলোর মালিক ও অধি-কর্তা) এবং পালনকর্তা (নক্ষত্ররাজির) উদয়াচলসমূহের। আমিই সুশোভিত করেছি নিকটতম আকাশকে এক (অভিনব শোভায় অর্থাৎ) তারকারাজির মাধ্যমে এবং (এসব তারকা দ্বারাই আকাশের অর্থাৎ তার সংবাদাদির) সংরক্ষণ করেছি প্রত্যেক অবাধ্য শয়তান থেকে। (এর পদ্ধতি পরে বর্ণিত হয়েছে। হিফাযতের এ ব্যবস্থার কারণে) শয়তানরা ঊর্ধ্ব জগতের (অর্থাৎ ফেরেশতাদের) কোন কথা শুনতে পারে না। (অর্থাৎ মার খাওয়ার ভয়ে অধিকাংশ সময় তারা দূরে দূরেই থাকে। দৈবাৎ কখনও কোন সময় সংবাদ শোনার চেষ্টা করলেও) তাদেরকে চারদিক থেকে (অর্থাৎ যেদিকেই সে শয়তান যায়,) মার দিয়ে ঠেলে দেওয়া হয়। (তাদের এই শাস্তি ও লাঞ্ছনা হল তাৎক্ষণিক।) আর (পরকালে) তাদের জন্য রয়েছে (জাহান্নামের) বিরামহীন আযাব। (সারকথা, আকাশের কোন সংবাদ শোনার পূর্বেই ওদের পিটিয়ে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। তারা শোনার নিষ্ফল প্রচেষ্টা চালায় মাত্র।) তবে যে শয়তান কিছু সংবাদ ছোঁ মেরে নিয়ে পালায়, একটি জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড তার পশ্চাদ্ধাবন করে। সে জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ফলে সে সংবাদ অপরের কাছে পৌঁছাতে পারে না। এসব ব্যবস্থাপনা ও কর্মকাণ্ডই তওহীদের দলীল।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরার বিষয়বস্তু ঃ এ সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ। মক্কায় অবতীর্ণ অন্যান্য সূরার মত এর মৌলিক বিষয়বস্তুও ঈমানতত্ত্ব। এতে তওহীদ, রিসালত ও আখিরাতের বিশ্বাসসমূহ বিভিন্ন পন্থায় প্রমাণ করা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে মুশরিকদের ভ্রান্ত আকীদা-সমূহেরও খণ্ডন করা হয়েছে। এতে জান্নাত ও জাহান্নামের অবস্থাসমূহের চিত্রায়ন হয়েছে। পয়গম্বরগণের দাওয়াতের অন্তর্ভুক্ত বিশ্বাসসমূহ প্রমাণ করা এবং কাফিরদের সন্দেহ ও আপত্তি নিরসনের পর অতীতে যারা এসব বিশ্বাসকে সত্য বলে স্বীকার করেছে, তাদের সাথে আল্লাহ্ তা'আলা কি আচরণ করেছেন এবং যারা অস্বীকার ও শিরকের পথ অবলম্বন করেছে, তাদের পরিণতি কি হয়েছে সেসব বিষয় বিবৃত করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে হযরত নূহ (আ), হযরত ইবরাহীম (আ) ও তাঁদের পুত্রগণ, হযরত মূসা (আ) ও হারূন (আ), হযরত ইলিয়াস (আ), হযরত লূত (আ) ও হযরত ইউনুস (আ)-এর ঘটনাবলী কোথাও সংক্ষেপে এবং কোথাও বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।

মক্কার মুশরিকরা ফেরেশতাগণকে 'আল্লাহ্‌র কন্যা' বলে অভিহিত করত। কাজেই, এ সূরার উপসংহারে বিশদভাবে এ বিশ্বাসের খণ্ডন করা হয়েছে। সূরার সামগ্রিক বর্ণনাভঙ্গি থেকে বোঝা যায় যে, এতে বিশেষভাবে ফেরেশতাগণকে আল্লাহ্‌র কন্যা সাব্যস্ত করা সংক্রান্ত বিশেষ বিষয়ের খণ্ডন করাই লক্ষ্য। এ কারণেই সূরাটি ফেরেশতাগণের শপথ এবং তাদের আনুগত্যের গুণাবলী উল্লেখ করে শুরু করা হয়েছে।

প্রথম বস্তু তওহীদ ঃ সূরাটি তওহীদ তথা একত্ববাদ সংক্রান্ত বিশ্বাসের বর্ণনার মাধ্যমে শুরু করা হয়েছে এবং প্রথম চার আয়াতে মূল উদ্দেশ্য হল একথা বর্ণনা করা যে, إِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ (অর্থাৎ নিশ্চিতই তোমাদের মাবুদ একজন।) কিন্তু বর্ণনার আগে তিনটি বিষয়ের শপথ করা হয়েছে। এসব শপথের নির্ভেজাল শাব্দিক অনুবাদ এই ঃ শপথ সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ানোদের, অতপর শপথ প্রতিরোধকারীদের, অতপর শপথ কোরআন তিলাওয়াতকারীদের। কিন্তু এ তিন প্রকার লোক কারা? কোরআনে তার সুস্পষ্ট কোন বর্ণনা নেই। ফলে এর তফসীরে বিভিন্ন রকম উক্তি করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেন ঃ এখানে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদকারী গাজীদেরকে বোঝানো হয়েছে, যারা মিথ্যা শক্তির বিরুদ্ধে বাধার প্রাচীর দাঁড় করার জন্য সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায় এবং সারিবদ্ধ হওয়ার সময় যিকর তথা তসবীহ্ ও কোরআন তিলাওয়াতে মশগুল থাকে।

কেউ কেউ বলেন ঃ আয়াতে সেসব নামাযীকে বোঝানো হয়েছে, যারা মসজিদে সারিবদ্ধ হয়ে শয়তানী চিন্তা-ভাবনা ও কাজকর্মের প্রতি বাধা আরোপ করে এবং নিজেদের সমগ্র ধ্যান-ধারণাকে যিকর ও তিলাওয়াতে নিবদ্ধ করে দেয়।---(তফসীরে কবীর ও কুরতুবী) এতদ্ব্যতীত কোরআনের ভাষার সাথে তেমন সামঞ্জস্যশীল নয়, এ ধরনের আরও কিছু তফসীর বর্ণিত রয়েছে।

কিন্তু অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে স্বীকৃত তফসীর এই যে, আয়াতে ফেরেশ-তাগণকে বোঝানো হয়েছে এবং তাদের তিনটি বিশেষণ উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রথম বিশেষণ হচ্ছে اَلصَّافَّاتِ صَفًّا—এটি صف শব্দ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ কোন জনসমষ্টিকে এক রেখায় সন্নিবেশিত করা।---(কুরতুবী) কাজেই আয়াতের অর্থ হবে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ানো ব্যক্তিবর্গ।

এ সূরায়ই এরপরেও ফেরেশতাগণের সারিবদ্ধ হওয়ার বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। ফেরেশতাগণের উক্তি বর্ণনা করে বলা হয়েছে ঃ—وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ-অর্থাৎ নিঃসন্দেহে আমরা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। এটা কখন হয়? এ প্রশ্নের জওয়াবে তফসীরবিদ হযরত ইবনে আব্বাস (রা), হাসান বসরী (র) ও কাতাদাহ্ (রা) প্রমুখ

বলেন যে, ফেরেশতাগণ সদাসর্বদা শূন্যমার্গে সারিবদ্ধ হয়ে আল্লাহ্র আদেশের অপেক্ষায় উৎকর্ণ থাকে। যখনই কোন আদেশ হয়, তখনই তা কার্যে পরিণত করে।—(মাযহারী) কারও কারও মতে এটা কেবল ইবাদতের সময়ই হয়। অর্থাৎ ফেরেশতাগণ যখন ইবাদত, যিকর ও তসবীহে মশগুল হয়, তখনই সারিবদ্ধ হয়।—(তফসীরে কবীর)

শৃঙখলা নিয়ন্ত্রণঃ আলোচ্য আয়াত থেকে জানা গেল যে, ধর্মে প্রত্যেক কাজে নিয়ম ও শৃঙখলা ও উত্তম রীতি-নীতির প্রতি লক্ষ্য রাখা কাম্য এবং আল্লাহ্ তা'আলার পছন্দনীয়। বলা বাহুল্য, আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত হোক কিংবা তাঁর আদেশ পালন হোক, উভয় কর্ম সারিবদ্ধ হওয়ার পরিবর্তে এলোমেলোভাবে একত্রিত হয়েও ফেরেশতাগণ সম্পাদন করতে পারত, কিন্তু এহেন বিশৃঙখলার পরিবর্তে তাদেরকে সারিবদ্ধ হওয়ার তওফীক দেওয়া হয়েছে। আয়াতে তাদের উত্তম গুণাবলীর মধ্যে সর্বাগ্রে এ গুণটি উল্লেখ করে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, তাদের এ অবস্থা আল্লাহ্ তা'আলার খুবই পছন্দনীয়।

নামাযে সারিবদ্ধ হওয়ার গুরুত্বঃ বস্তুত মানবজাতিকেও ইবাদতের সময় সারিবদ্ধ হওয়ার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে এবং তৎপ্রতি জোর দেওয়া হয়েছে। হযরত জাবের ইবনে সামুরাহ্ বর্ণনা করেন যে, একদিন রসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদেরকে বললেনঃ তোমরা (নামাযে) সারিবদ্ধ হও না কেন, যেমন ফেরেশতাগণ তাদের পালনকর্তার সামনে সারিবদ্ধ হয়? সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞেস করলেনঃ ফেরেশতাগণ তাদের পালনকর্তার সামনে কিভাবে সারিবদ্ধ হয়? তিনি জওয়াব দিলেনঃ তারা কাতার পূর্ণ করে এবং কাতারে গা ঘেঁষে দাঁড়ায় (অর্থাৎ মাঝখানে জায়গা খালি রাখে না)।—(তফসীরে মাযহারী)

নামাযের কাতার পূর্ণ করা ও সোজা রাখার উপর জোর দিয়ে এত অধিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, সেগুলো একত্রে সংগ্রহ করলে একটি পূর্ণ পুস্তিকা রচিত হতে পারে। হযরত আবু মসউদ বদরী (রা) বলেনঃ রসূলে করীম (সা) নামাযে আমাদের কাঁধে হাত লাগিয়ে বলতেনঃ সোজা হয়ে থাক, আগেপিছে থেকো না। নতুবা তোমাদের অন্তরে অনৈক্য মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে।—(মুসলিম, নাসায়ী।)

ফেরেশতাগণের দ্বিতীয় বিশেষণ فَالزّٰجِرٰتِ زَجْرًا বর্ণিত হয়েছে। এটা زجر থেকে উৎপন্ন। অর্থ প্রতিরোধ করা, ধমক দেওয়া, অভিশাপ দেওয়া। হযরত থানভী (র)-এর অনুবাদ করেছেন بندش کرنے والے (প্রতিরোধকারী)। ফলে এ শব্দের সবগুলো সম্ভাব্য অর্থ এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। ফেরেশতাগণ কিসের প্রতিরোধ করে? কোরআন পাকের পূর্বাপর বর্ণনার প্রেক্ষিতে অধিকাংশ তফসীরবিদ এর জওয়াবে বলেন যে, এখানে ফেরেশতাগণের সে কর্মকাণ্ড বোঝানো হয়েছে, যার মাধ্যমে

তারা শয়তানদেরকে উর্ধ্ব জগতে পৌঁছতে বাধা দান করে। খোদ কোরআন পাকে এ সম্পর্কিত বিশদ আলোচনা পরে উল্লিখিত হবে।

তৃতীয় বিশেষণ হচ্ছে فَالتّٰلِيٰتِ ذِكْرًا—অর্থাৎ ফেরেশতাগণ 'যিকর'-এর তিলাওয়াত করে। যিকরের মর্মার্থ উপদেশ বাক্যও হয় এবং আল্লাহ্র স্মরণও হয়। প্রথমোক্ত অর্থ অনুযায়ী উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা ঐশী গ্রন্থসমূহের মাধ্যমে যেসব উপদেশ বাক্য নাযিল করেছেন, তারা সেগুলো তিলাওয়াত করে। এ তিলাওয়াত পুণ্য অর্জন ও ইবাদত হিসাবেও হতে পারে অথবা ওহী বহনকারী ফেরেশতাগণ পয়গম্বরগণের সামনে উপদেশপূর্ণ আল্লাহ্ প্রদত্ত গ্রন্থ তিলাওয়াতের মাধ্যমে যে পয়গাম পৌঁছান, তাও বোঝানো যেতে পারে। পক্ষান্তরে 'যিকর'-এর অর্থ আল্লাহ্র স্মরণ নেওয়া হলে উদ্দেশ্য হবে এই যে, তারা যেসব বাক্য পাঠে রত থাকে, সেগুলো আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা জ্ঞাপন করে।

কোরআন পাক এখানে ফেরেশতাগণের উল্লিখিত তিনটি বিশেষণ বর্ণনা করে আনুগত্য ও দাসত্বের সব ক'টি গুণই সন্নিবেশিত করে দিয়েছে। অর্থাৎ ইবাদতের জন্য সারিবদ্ধ হয়ে থাকা, আল্লাহ্র অবাধ্যতা থেকে শয়তানী শক্তিসমূহকে প্রতিরোধ করা এবং আল্লাহ্র বিধানাবলী ও উপদেশাবলী নিজে পাঠ করা ও অপরের কাছে পৌঁছানো। বলা বাহুল্য, দাসত্বের কোন কর্মকাণ্ড এ তিনটি শাখার বাইরে থাকতে পারে না। অতএব উল্লিখিত চারখানি আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়াল এই যে, যে সব ফেরেশতা দাসত্বের যাবতীয় গুণের অধিকারী তাদের শপথ— একজনই তোমাদের সত্য মা'বুদ।

ফেরেশতাগণের শপথ করার কারণঃ এ সূরায় বিশেষভাবে ফেরেশতাগণের শপথ করার কারণ এই যে, পূর্বেও বলা হয়েছে এ সূরার মূল আলোচ্য বিষয় হল বিশেষ এক প্রকার শিরক খণ্ডন করা। সে বিশেষ শিরক এই যে, মক্কার কাফিররা ফেরেশতাগণকে আল্লাহ্র কন্যা বলে অভিহিত করত। সেমতে সূরার শুরুতেই ফেরেশতাগণের শপথ করে তাদের এমন গুণাবলী উল্লেখ করা হয়েছে, যা থেকে তাদের পরিপূর্ণ দাসত্ব প্রকাশ পায়। উদ্দেশ্য এই যে, ফেরেশতাগণের এসব দাসত্ব জ্ঞাপক গুণাবলী সম্পর্কে চিন্তা করলে তোমরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বোঝতে সক্ষম হবে যে, আল্লাহ্ তা'আলার সাথে তাদের সম্পর্ক পিতা ও কন্যার নয়, বরং তাদের মধ্যে দাস ও প্রভুর সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলার নামে শপথঃ কোরআন পাকে আল্লাহ্ তা'আলা ঈমান ও বিশ্বাস সম্পর্কিত মৌলিক বিষয়ের উপর জোর দেওয়ার জন্য বিভিন্ন ধরনের শপথ করেছেন। কখনও আপন সত্তার এবং কখনও বিশেষ বিশেষ সৃষ্ট বস্তুর শপথ করা হয়েছে। এ সম্পর্কে বহু প্রশ্ন দেখা দিতে পারে বিধায় কোরআন পাকের তফসীরে এটি একটি স্বতন্ত্র ও মৌলিক আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হয়ে গেছে। হাফেয ইবনে কাইয়্যেম (র) এ সম্পর্কে "আত্তিবইয়ান ফী আকসামিল কোরআন" নামে একটি

স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন। আল্লামা সুয়ূতী (র) উসূলে তফসীর সম্পর্কিত 'ইত-কান' গ্রন্থের ৬৭তম অধ্যায়ে এ বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এখানে তার কিছু জরুরী অংশ উদ্ধৃত করা হচ্ছে।

প্রথম প্রশ্ন ঃ আল্লাহ্ তা'আলার শপথ করার ফলে প্রশ্ন জাগে যে, তিনি তো পরম স্বয়ম্ভর ও অমুখাপেক্ষী। কাউকে আশ্বস্ত করার জন্য শপথ করার তাঁর কি প্রয়োজন?

'ইতকান'-এ আবুল কাসেম কুশায়রী (র) থেকে এ প্রশ্নের জওয়াবে বর্ণিত রয়েছে যে, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলার জন্য শপথ করার কোনই প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু মানুষের প্রতি তাঁর অপার স্নেহ ও করুণা তাঁকে শপথ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে, যাতে তারা কোন না কোন উপায়ে সত্য বিষয় কবুল করে নেয় এবং আযাব থেকে অব্যাহতি পায়। জনৈক মরুবাসী وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ - فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ— আয়াত শুনে বলতে লাগল ঃ আল্লাহ্র মত মহান সত্তাকে কে অসন্তুষ্ট করল এবং কে তাঁকে শপথ করতে বাধ্য করল?

সারকথা, মানুষের প্রতি স্নেহ ও করুণাই শপথ করার কারণ। সাংসারিক বিবাদ-বিসংবাদ মীমাংসা করার সুবিদিত পন্থা যেমন দাবির স্বপক্ষে সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করা এবং সাক্ষ্য প্রমাণ না থাকলে শপথ করা, তেমনি আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের এই পরিচিত পন্থাই নিজেও অবলম্বন করেছেন। তিনি কোথাও شهادت শব্দের মাধ্যমে বিষয়বস্তুকে জোরদার করেছেন—যেমন, شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ এবং কোথাও শপথ বাক্যের দ্বারা এ কাজ করেছেন। যেমন, إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ

দ্বিতীয় প্রশ্ন ঃ সাধারণত শপথ করা হয় নিজের চেয়ে উত্তম সত্তার। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা আপন সৃষ্ট বস্তুর শপথ করেছেন, যা আল্লাহ্ অপেক্ষা উত্তম তো নয়ই, বরং সব দিক দিয়েই অধম।

উত্তর এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা অপেক্ষা বড় কোন সত্তা যখন নেই এবং হতেও পারে না, তখন আল্লাহ্ তা'আলার শপথ যে সাধারণ সৃষ্টির শপথের মত হতে পারে না, তা বলাই বাহুল্য। তাই আল্লাহ্ তা'আলা কোথাও আপন সত্তার শপথ করেছেন যেমন إِي وَرَبِّي—এ ধরনের শপথ কোরআন পাকে সাত জায়গায় বর্ণিত হয়েছে—

কোথাও আপন কর্ম, গুণাবলী এবং কোরআনের শপথ করেছেন, যেমন---وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَّمَا سَوَّاهَا--এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে সৃষ্টবস্তুর শপথ করা হয়েছে। কারণ, সৃষ্টবস্তু অধ্যাত্মজ্ঞানের মাধ্যম বিধায় পরিণামে আল্লাহ্‌র সত্তা থেকে পৃথক নয়।---(ইবনে কাইয়্যেম)

বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্যে সৃষ্টবস্তুর শপথ করা হয়েছে। কোথাও কোন সৃষ্ট বস্তুর মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করার লক্ষ্যে তার শপথ করা হয়েছে, যেমন---কোরআন পাকে রসূলে করীম (সা)-এর আয়ুষ্কালের শপথ করে বলা হয়েছে ঃ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ--ইবনে মরদুবিয়্যাহ্‌ হযরত ইবনে আব্বাসের উক্তি বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা পৃথিবীতে রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-র ব্যক্তিসত্তা অপেক্ষা অধিক সম্মানিত ও সম্ভ্রান্ত কোন কিছু সৃষ্টি করেন নি। তাই সমগ্র কোরআনে কোন নবী ও রসূলের সত্তার শপথ উল্লিখিত হয়নি ; কেবল রসূলে করীম (সা)-এর আয়ুষ্কালের শপথ উপরোক্ত আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। এমনিভাবে وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ ---এর শপথও তুর পর্বত ও কিতাবের মহত্ত্ব প্রকাশ করার জন্য করা হয়েছে।

মাঝে মাঝে কল্যাণবহুল হওয়ার কারণে কোন কোন বস্তুর শপথ করা হয়---যেমন, وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ কোন কোন ক্ষেত্রে কোন সৃষ্ট বস্তুর শপথ করা হয় এজন্য যে, সে বস্তুর সৃষ্টি আল্লাহ্‌ তা'আলার মহান কুদরতের পরিচায়ক এবং বিশ্ব-স্রষ্টার পরিচয় লাভের গুরুত্বপূর্ণ উপায় হয়ে থাকে। তবে সাধারণত যে বস্তুর শপথ করা হয়, তার কিছু না কিছু প্রভাব সে বিষয়বস্তু প্রমাণে অবশ্যই থাকে, যার জন্য শপথ করা হয়। প্রতিটি শপথের ক্ষেত্রে চিন্তা করলে এই প্রভাব সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়।

তৃতীয় প্রশ্ন ঃ সাধারণ মানুষের জন্য শরীয়তের প্রসিদ্ধ বিধান এই যে, আল্লাহ্‌ ব্যতীত কারও শপথ করা বৈধ নয়। আল্লাহ্‌ তা'আলা যে সৃষ্টবস্তুর শপথ করেছেন, তা কি এ বিষয়ের প্রমাণ নয় যে, অন্যের জন্যও গায়রুল্লাহ্‌র শপথ করা বৈধ? এ প্রশ্নের জওয়াবে হযরত হাসান বসরী বলেন ঃ---

أَنَّ اللهَ يُقْسِمُ بِمَا شَاءَ مِنْ خَلْقِهِ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُقْسِمَ إِلَّا بِاللهِ -

আল্লাহ্‌ তা'আলা সৃষ্ট যে কোন বস্তুর শপথ করার এখতিয়ার রাখেন, কিন্তু অন্য কারও জন্য আল্লাহ্‌ ব্যতীত কোন কিছুর শপথ করা বৈধ নয়।---(মাযহারী)

উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ যদি নিজেকে আল্লাহ্ তা'আলার অনুরূপ মনে করে, তবে তা নিতান্তই ভ্রান্ত ও বাতিল হবে। শরীয়ত সাধারণ মানুষের জন্য গায়রুল্লাহ্র শপথ নিষিদ্ধ করেছে। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলার ব্যক্তিগত কাজকে এর বিপক্ষে প্রমাণস্বরূপ উপস্থিত করা বাতিল।

এখন উল্লিখিত আয়াতসমূহের তফসীর লক্ষ্য করুন।

প্রথম চার আয়াতে ফেরেশতাগণের শপথ করে বলা হয়েছে যে, তোমাদের সত্য মাবুদ এক আল্লাহ্। শপথের সাথে সাথে উল্লিখিত ফেরেশতাগণের গুণাবলী সম্পর্কে সামান্য চিন্তা করলে যদিও এগুলো তওহীদেরই দলীল বলে মনে হয়, কিন্তু পরবর্তী ছয় আয়াতে আলাদাভাবে তওহীদের দলীল বর্ণনা করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে ঃ

رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ -তিনি পালনকর্তা আসমানসমূহের, যমীনের এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী যাবতীয় সৃষ্টবস্তুর এবং তিনি পালনকর্তা উদয়াচলসমূহের। অতএব যে সত্তা এতসব মহাসৃষ্টির স্রষ্টাও পালনকর্তা, ইবাদতের যোগ্যও তিনিই হবেন। সমগ্র সৃষ্টজগৎ তাঁর অস্তিত্ব ও একত্বের দলীল। এখানে مشارق শব্দটি مشرق-এর বহুবচন। সূর্য বছরের প্রতিদিন এক নতুন জায়গা থেকে উদিত হয়। তাই উদয়াচল অনেক। এ কারণেই এখানে বহুবচন পদবাচ্য হয়েছে।

اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ الْكَوَاكِبِ—এখানে سماء دنيا অর্থ পৃথিবীর নিকটতম আকাশ। উদ্দেশ্য এই যে, আমি পৃথিবীর নিকটতম আকাশকে তারকারাজি দ্বারা সুশোভিত করেছি। এখন এটা জরুরী নয় যে, তারকারাজি আকাশ-গাত্রেই অবস্থিত হবে, বরং আকাশ থেকে পৃথক হলেও পৃথিবী থেকে দেখলে আকাশেই অবস্থিত মনে হবে। তারকারাজির কারণে গোটা আকাশ ঝলমল করতে থাকে। এখানে কেবল এতটুকু বলাই উদ্দেশ্য যে, এই তারকা শোভিত আকাশ এ বিষয়ের সাক্ষ্য দেয় যে, এগুলো আপনা-আপনি অস্তিত্ব লাভ করেনি, বরং একজন স্রষ্টা এগুলোকে সৃষ্টি করেছেন। যে সত্তা এসব মহান বস্তুকে অস্তিত্ব দান করতে সক্ষম তাঁর কোন শরীক বা অংশীদারের প্রয়োজন নেই। এ ছাড়া মুশরিকদের কাছেও একথা স্বীকৃত যে, সমগ্র সৌরজগতের স্রষ্টাই আল্লাহ্ তা'আলা। অতএব আল্লাহ্কে স্রষ্টা ও মালিক জেনেও অন্যের ইবাদত করা সত্যি সত্যিই মহা অবিচার ও জুলুম।

কোরআন পাকের দৃষ্টিকোণে তারকারাজি আকাশগাত্রে গাঁথা, না আকাশ থেকে আলাদা, এছাড়া সৌর বিজ্ঞানের সাথে কোরআনের সম্পর্ক কি ?—এই আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে 'সূরা-হিজরে' বিস্তারিত আলোচনা হয়ে গেছে।

فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ ثَاقِبٌ থেকে وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ مَّارِدٍ পর্যন্ত আয়াতসমূহে শোভা ও সাজসজ্জা ছাড়া তারকারাজির আরও একটি উপকারিতা বর্ণনা করা হয়েছে যে, এগুলোর সাহায্যে দুষ্ট প্রকৃতির শয়তানদেরকে ঊর্ধ্ব জগতের কথা-বার্তা শোনা থেকে বিরত রাখা হয়। শয়তান গায়েবী সংবাদ শোনার জন্য আকাশের কাছাকাছি গিয়ে উপস্থিত হয়। কিন্তু তাদেরকে ফেরেশতাদের কথাবার্তা শোনার সুযোগ দেওয়া হয় না। কোন শয়তান যৎ সামান্য শুনে পালালে তাকে শিখায়িত উল্কাপিণ্ডের আঘাতে ধ্বংস করে দেওয়া হয়, যাতে সে পৃথিবীতে পৌঁছে ভক্ত অতীন্দ্রিয়বাদী ও জ্যোতিষীদেরকে কিছু বলতে না পারে। এই জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ডকে شِهَابٌ ثَاقِبٌ বলা হয়েছে।

উল্কাপিণ্ডের কিছু বিবরণ সূরা হিজরে উল্লিখিত হয়েছে। তবুও এখানে এতটুকু বলে দেওয়া প্রয়োজন যে, প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকদের মতে উল্কাপিণ্ড প্রকৃতপক্ষে ভূ-ভাগে উৎপন্ন এক প্রকার উপাদান, যা বাষ্পের সাথে উপরে উত্থিত হয় এবং অগ্নি-মণ্ডলের নিকটে পৌঁছে বিস্ফোরিত হয়ে যায়। কিন্তু কোরআন পাকের বাহ্যিক ভাষা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, উল্কাপিণ্ড ভূ-ভাগে উৎপন্ন কোন উপাদান নয়, বরং ঊর্ধ্ব-জগতেই তা উৎপন্ন হয়। এখানে প্রাচীন তফসীরবিদগণের বক্তব্য ছিল এই যে, উল্কা-পিণ্ড সম্পর্কে গ্রীক দার্শনিকদের ধারণা নিছক অনুমান ও আন্দাজের উপর নির্ভরশীল। কাজেই এর ভিত্তিতে কোরআনের বিরুদ্ধে কোন আপত্তি উত্থাপন করা যায় না। এছাড়া ভূ-ভাগে উৎপন্ন কোন উপাদান উপরে পৌঁছে বিস্ফোরিত হয়ে গেলেও তা কোরআনের পরিপন্থী নয়।

কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা এ প্রশ্নই খতম করে দিয়েছে। আধুনিক কালের বিজ্ঞানীদের ধারণা এই যে, উল্কাপিণ্ড অসংখ্য তারকারাজিরই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ যা সাধারণত বড় আকারের ইটের সমান হয়ে থাকে। এগুলো মহাশূন্যে অবস্থান করে এবং সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। এরা ৩৩ বছরে একবার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। এগুলোর সমষ্টিকেই 'উল্কা' (Shooting Star) বলা হয়। পৃথিবীর নিকটবর্তী হলে এরা পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি দ্বারাও আকৃষ্ট হয়। তখন প্রচণ্ড বেগে এ উল্কা ভূ-পৃষ্ঠের দিকে ছুটে আসে। বায়ুমণ্ডলের নিম্ন স্তরে ৬০ মাইল দূরত্বে পৌঁছলে তা বাতাসের ঘর্ষণে প্রজ্বলিত ও ভস্মীভূত হয়। ঊর্ধ্বাকাশে পরিলক্ষিত অধিকাংশ উল্কাই বায়ুমণ্ডলে জ্বলে নিঃশেষ হয়ে যায়। (ইংরেজীতে এগুলোকে Meteoriod বলা হয়) আগস্টের ১০ তারিখ এবং নভেম্বরের ২৭ তারিখে এগুলো অধিক পরিলক্ষিত হয় এবং ২০শে এপ্রিল, ২৮শে নভেম্বর, ১৮ই অক্টোবর ও ৬, ৯ ও ১৩ই ডিসেম্বরের রাতে হ্রাস পায়।—(আল্ জাওয়াহির)

আধুনিক বিজ্ঞানের এই গবেষণা কোরআন পাকের বর্ণনার সাথে অধিক সামঞ্জস্যশীল। যারা উল্কাপিণ্ডের সাহায্যে শয়তান ধ্বংস করাকে অলীক মনে করে, তাদের সম্পর্কে তানতাভী মরহুম আল্-জাওয়াহির গ্রন্থে চমৎকার মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন ঃ

কোরআন পাক সমসাময়িক সৌর-বিজ্ঞানের বিপরীতে কোন কথা বলুক, এটা আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যস্থিত একশ্রেণীর জ্ঞানী ও দার্শনিকের কাছে অসহনীয় ছিল। কিন্তু তফসীরবিদগণ তাদের 'বৈজ্ঞানিক' মতবাদ গ্রহণ করে কোরআনকে পরিত্যাগ করতে সম্মত হন নি। পরিবর্তে বরং তাঁরা বৈজ্ঞানিক মতবাদ পরিত্যাগ করে কোরআনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছেন। কিছুদিন পর আপনা-আপনিই একথা প্রমাণিত হয়ে যায় যে, প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকদের মতবাদ সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও বাতিল ছিল। এখন বলুন, যদি আমরা স্বীকার করে নেই যে, এই তারকারাজি শয়তানদেরকে জ্বালায়-পোড়ায় এবং কষ্ট দেয়, তবে এতে বাধা কিসের ? আমরা কোরআন পাকের এই বর্ণনা স্বীকার করে নিয়ে ভবিষ্যতের প্রতীক্ষায় আছি যখন বিজ্ঞানও অকুণ্ঠচিত্তে এ সত্য স্বীকার করে নেবে।---(আল-জাওয়াহির ১৪ পৃঃ অষ্টম খণ্ড)

আসল উদ্দেশ্য ঃ এখানে আকাশমণ্ডলী, তারকারাজি ও উল্কাপিণ্ডের আলোচনার এক উদ্দেশ্য তওহীদ তথা আল্লাহ্র একত্ববাদ প্রমাণ করা। অর্থাৎ যে সত্তা এককভাবে এই সুবিশাল সৌর ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত করেছেন তিনিই ইবাদত ও উপাসনার যোগ্য। দ্বিতীয়ত এতে তাদের ধারণাও খণ্ডন করা হয়েছে যারা শয়তানদেরকে দেবতা অথবা উপাস্য সাব্যস্ত করে। কারণ, শয়তান এক বিতাড়িত ও পরাভূত সৃষ্টজীব। খোদায়ীর সাথে তাদের কি সম্পর্ক থাকতে পারে ?

এছাড়া এই বিষয়বস্তুর ভেতর ওদেরও পরিপূর্ণ খণ্ডন রয়ে গেছে, যারা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রতি অবতীর্ণ কোরআন তথা ওহীকে অতীন্দ্রিয় বিষয় বলে আখ্যায়িত করতো। আলোচ্য আয়াতসমূহে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কোরআন পাক অতীন্দ্রিয়বাদীদের বিরোধিতা করে। তাদের জানা বিষয়সমূহের সর্ববৃহৎ উৎস হচ্ছে শয়তান। অথচ কোরআন বলে যে, শয়তানদের ঊর্ধ্ব জগত পর্যন্ত পৌঁছা সম্ভবপর নয়। তারা অদৃশ্য জগতের সত্য সংবাদ সংগ্রহ করতে পারে না। অতীন্দ্রিয়বাদ সম্পর্কে কোরআন বর্ণিত এ বিশ্বাসের পর স্বয়ং কোরআন কিরূপে অতীন্দ্রিয়বাদ হতে পারে ? এভাবে আলোচ্য আয়াতসমূহ তওহীদ ও রিসালত উভয় বিষয়বস্তুর সত্যতার প্রতি ইংগিত বহন করে। অতপর এসব নভোমণ্ডলীয় সৃষ্ট বস্তুর মাধ্যমেই পরকালের বিশ্বাস সপ্রমাণ করা হয়েছে।

فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَّنْ خَلَقْنَا ۚ إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِينٍ لَّازِبٍ ⑪

بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ ⑫ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ ⑬ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً

يَسْتَسْخِرُونَ ﴿١٤﴾ وَقَالُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿١٥﴾ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا
وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿١٦﴾ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ ﴿١٧﴾ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ ﴿١٨﴾

(১১) আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, তাদেরকে সৃষ্টি করা কঠিনতর, না আমি অন্য যা সৃষ্টি করেছি ? আমিই তাদেরকে সৃষ্টি করেছি এঁটেল মাটি থেকে। (১২) বরং আপনি বিস্ময় বোধ করেন আর তারা বিদ্রূপ করে। (১৩) যখন তাদেরকে বোঝানো হয়, তখন তারা বুঝে না। (১৪) তারা যখন কোন নিদর্শন দেখে তখন বিদ্রূপ করে (১৫) এবং বলে, কিছুই নয়, এযে স্পষ্ট যাদু। (১৬) আমরা যখন মরে যাব এবং মাটি ও হাড়ে পরিণত হয়ে যাব, তখনও কি আমরা পুনরুত্থিত হব ? (১৭) আমাদের পিতপুরুষগণও কি ? (১৮) বলুন, হ্যাঁ এবং তোমরা হবে লাঞ্ছিত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(তওহীদের প্রমাণাদি থেকে যখন জানা গেল যে, আল্লাহ্ তা'আলা এসব মহা-সৃষ্টির মধ্যে এমন সব কর্ম সম্পাদনে সক্ষম এবং এসব মহাসৃষ্টি তাঁরই আয়ত্তাধীন, তখন) আপনি (যারা পরকাল অস্বীকার করে,) তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, তাদেরকে সৃষ্টি করা কঠিনতর, না আমি অন্যান্য (এসব) যা সৃষ্টি করেছি ? (যা এইমাত্র উল্লেখ করা হল। সত্য এই যে, এগুলো সৃষ্টি করাই কঠিনতর। কেননা,) আমি তাদেরকে (আদম সৃষ্টির সময় এক মামুলী) এঁটেল মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি (যাতে না শক্তি আছে, না সামর্থ্য। সুতরাং এ মাটি থেকে সৃষ্ট মানুষও তেমন শক্তিশালী ও শক্ত নয়। এখন চিন্তা করার বিষয় এই যে, যখন আমি এমন শক্তিধর ও শক্ত সৃষ্টিকে নাস্তি থেকে অস্তিত্বে আনয়ন করতে সক্ষম, তখন মানুষের মত দুর্বল সৃষ্টিকে একবার মৃত্যু দিয়ে পুনরায় জীবিত করতে সক্ষম হবো না কেন ? কিন্তু এমন সুস্পষ্ট প্রমাণ সত্ত্বেও কাফিররা পরকালের সম্ভাব্যতায় বিশ্বাসী নয়;) বরং (তদুপরি) আপনি তো (তাদের অস্বীকৃতির কারণে) বিস্ময় বোধ করেন, আর তারা (আরও এগিয়ে গিয়ে পরকাল বিশ্বাসের প্রতি) বিদ্রূপ করে। যখন তাদেরকে (যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা) বোঝানো হয়, তখন তারা বোঝে না এবং যখন তারা কোন মু'জিযা দেখে (যা পরকাল সংক্রান্ত বিশ্বাস প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে আপনার নবুয়তের স্বপক্ষে তাদেরকে দেখানো হয়,) তখন তার প্রতিই উপহাস করে এবং বলে, এটা তো সুস্পষ্ট যাদু। (কারণ, এটা মু'জিযা হলে আপনার নবুয়ত প্রমাণিত হয়ে যাবে। আর আপনাকে নবী মানলে আপনার বর্ণিত পরকাল বিশ্বাসও মানতে হবে। অথচ আমরা তা মানতে পারি না) কেননা আমরা যখন মরে মাটি ও হাড়ে পরিণত হয়ে যাব, তখনও কি আমরা পুনরুত্থিত হব এবং আমাদের পূর্বপুরুষগণও কি ? আপনি বলুন, হ্যাঁ অবশ্যই জীবিত হবে এবং তোমরা লাঞ্ছিতও হবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

তওহীদের বিশ্বাস সপ্রমাণ করার পর আলোচ্য আটটি আয়াতে পরকালের বিশ্বাস বর্ণিত হয়েছে। এ সম্পর্কে মুশরিকদের উত্থাপিত সন্দেহের জওয়াবও দেওয়া হয়েছে। সর্বপ্রথম আয়াতে মানুষের পুনরুজ্জীবন যে সম্ভবপর, তার পক্ষে জোরালো যুক্তি পেশ করা হয়েছে। এই যুক্তির সারমর্ম এই যে, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে উল্লিখিত মহান সৃষ্টবস্তুসমূহের মুকাবিলায় মানুষ নেহায়েত দুর্বল সৃষ্টজীব। তোমরা যখন একথা স্বীকার কর যে, আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতা, চন্দ্র, তারকারাজি, সূর্য ও উল্কা-পিণ্ডের ন্যায়, বস্তুসমূহকে স্বীয় কুদরত দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, তখন তার জন্য মানুষের মত দুর্বল প্রাণীকে মৃত্যু দিয়ে পুনরায় জীবিত করা কঠিন হবে কেন? শুরুতে যেমন তিনি তোমাদেরকে এঁটেল মাটি দ্বারা সৃষ্টি করে তোমাদের দেহে আত্মা সঞ্চারিত করেছিলেন, তেমনিভাবে মৃত্যুর পর যখন তোমরা পুনরায় মাটিতে পরিণত হয়ে যাবে, তখনও আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে পুনরায় জীবন দান করবেন।

"আমি তাদেরকে এঁটেল মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছি"---একথার এক অর্থ এই যে, তাদের পিতামহ হযরত আদম (আ) মাটি দ্বারা সৃজিত হয়েছিলেন। দ্বিতীয় অর্থ প্রত্যেক মানুষই মাটি দ্বারা সৃজিত হয়েছে। কারণ, চিন্তা করলে দেখা যায় যে, প্রত্যেক মানুষের মূল উপাদান পানি মিশ্রিত মাটি। কেননা প্রত্যেক মানুষের জন্ম বীর্য থেকে এবং বীর্য রক্ত দ্বারা গঠিত হয়। রক্ত খাদ্যের নির্যাস। খাদ্য যে কোন আকারেই থাকুক না কেন, উদ্ভিদ তার মূল পদার্থ আর উদ্ভিদ মাটি ও পানি থেকে উৎপন্ন হয়।

মোটকথা, প্রথম আয়াতে পরকাল বিশ্বাসের যুক্তিভিত্তিক দলীল পেশ করা হয়েছে এবং এটা স্বয়ং তাদের কাছেই এ প্রশ্ন রেখে শুরু করা হয়েছে যে, তোমরা কঠিনতর সৃষ্টজীব, না আমি যাদের উল্লেখ করেছি তারা কঠিনতর? জওয়াব বর্ণনা সাপেক্ষ ছিল না। অর্থাৎ উল্লিখিতদের সৃষ্টিই কঠিনতর। তাই জওয়াব উল্লেখ করার পরিবর্তে একথা বলে সেদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, "আমি তাদেরকে এঁটেল মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছি।"

পরকালের যুক্তিপ্রমাণ শুনে মুশরিকরা যে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করত, পরবর্তী পাঁচ আয়াতে তাই বিধৃত হয়েছে। মুশরিকদের সামনে পরকালের দু'রকম প্রমাণ বর্ণনা করা হত। (১) যুক্তিভিত্তিক প্রমাণ। যেমন, প্রথম আয়াতে বর্ণিত হয়েছে এবং (২) ইতিহাসভিত্তিক প্রমাণ। অর্থাৎ তাদেরকে মু'জিযা দেখিয়ে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নবুয়ত বর্ণনা করে বলা হত, তিনি আল্লাহ্র নবী। নবী কখনও মিথ্যা বলতে পারেন না। তাঁর কাছে আল্লাহ্ প্রদত্ত সংবাদাদি আগমন করে। তিনি যখন বলেছেন যে, কিয়ামত আসবে, হাশর-নশর হবে এবং মানুষের হিসাব-নিকাশ নেওয়া হবে, তখন তাঁর এসব সংবাদ নিশ্চিত সত্য। এসব মেনে নেওয়া উচিত। যুক্তিভিত্তিক প্রমাণাদি শুনে মুশরিকদের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُوْنَ وَاِذَا ذُكِّرُوْا لَا يَذْكُرُوْنَ — অর্থাৎ আপনি তো তাদের প্রতি বিস্ময় প্রকাশ করেন যে, এমন সুস্পষ্ট প্রমাণাদি থাকা সত্ত্বেও তারা পথে আসছে না। কিন্তু তারা উল্টো আপনার প্রমাণাদির প্রতি বিদ্রূপবাণ বর্ষণ করে। তাদেরকে যতই বোঝানো হোক, তারা বোঝে না। ইতিহাসভিত্তিক প্রমাণাদির বেলায় তাদের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

وَاِذَا رَاَوْا اٰيَةً يَّسْتَسْخِرُوْنَ — অর্থাৎ তারা আপনার নবুয়ত ও শেষ পর্যন্ত পরকালে বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে—এমন কোন মুজিযা দেখলে তাকেও বিদ্রূপছলে উড়িয়ে দিয়ে বলতে থাকে, এটা প্রকাশ্য যাদু। তাদের কাছে এই উপহাস ও ঠাট্টার একটি মাত্র দলীল আছে। তা এই যে,

ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ اَوَاٰبَاۤؤُنَا الْاَوَّلُوْنَ

অর্থাৎ এটা আমাদের কল্পনায়ও আসে না যে, আমরা অথবা আমাদের পিতৃপুরুষগণ মাটি ও হাড়ে পরিণত হওয়ার পর কেমন করে পুনরুত্থিত হব? ফলে আমরা কোনও যুক্তিভিত্তিক দলীল মানি না এবং কোন মুজিযা ইত্যাদিও স্বীকার করি না। আল্লাহ্ তা'আলা এর জওয়াবে পরিশেষে একটি মাত্র বাক্য উল্লেখ করেছেন ঃ— قُلْ نَعَمْ وَاَنْتُمْ دَاخِرُوْنَ অর্থাৎ আপনি বলে দিন, হ্যাঁ, তোমরা অবশ্যই পুনরুজ্জীবিত হবে এবং লাঞ্ছিত ও অপমাণিত হয়ে জীবিত হবে।

দৃশ্যত এটা একটা শাসকসুলভ জওয়াব, যা হঠকারীদেরকে দেওয়া হয়। কিন্তু সামান্য চিন্তা করলে বোঝা যায় যে, এটা একটা পূর্ণাঙ্গ প্রমাণও বটে। ইমাম রাযী 'তফসীরে কবীরে' এর ব্যাখ্যা করে বলেছেন ঃ উপরে পুনরুজ্জীবনের যুক্তিভিত্তিক দলীল দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, মৃত্যুর পরও মানুষের পুনরুজ্জীবিত হওয়া অসম্ভব ব্যাপার নয়। নিয়ম এই যে, যা যুক্তিগতভাবে সম্ভবপর, বাস্তবে তার অস্তিত্ব লাভ করা কোন সত্য সংবাদদাতার সংবাদ দ্বারা প্রমাণিত হতে পারে। পুনরুজ্জীবনের সম্ভাব্যতা স্বীকৃত হওয়ার পর কোন সত্যবাদী পয়গম্বর যদি বলেন যে, হ্যাঁ তোমরা অবশ্যই পুনরুজ্জীবিত হবে, তবে এটাই বাস্তব, এটাই বাস্তবক্ষেত্রে ঘটনা হওয়ার অকাট্য দলীল।

রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মু'জিযার প্রমাণ ঃ وَاِذَا رَاَوْا اٰيَةً বাক্যে اٰيَةً -এর আভিধানিক অর্থ নিদর্শন। এখানে নিদর্শন বলে মু'জিযা বোঝানো হয়েছে।

সুতরাং এই আয়াত এ বিষয়ের দলীল যে, আল্লাহ্ তা'আলা রসূলে করীম (সা)-কে কোরআন ছাড়াও কিছু কিছু মু'জিযা দান করেছিলেন। কোন কোন বিপথগামী লোক রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মু'জিযাসমূহকে 'ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কারণাদির অধীন' সাব্যস্ত করে দাবি করে যে, তাঁর হাতে কোরআন ব্যতীত অন্য কোন মু'জিযা প্রকাশ করা হয়নি। আলোচ্য আয়াত দ্বারা তাদের দাবি অসার প্রমাণিত হয়।

আলোচ্য চতুর্থ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা পরিষ্কার বলেছেন : وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ (যখন তারা কোন মু'জিযা দেখে তখন ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে।) কোন কোন মু'জিযা অস্বীকারকারী বলে যে, এখানে آيَة--এর অর্থ মু'জিযা নয়; বরং যুক্তিভিত্তিক দলীল। কিন্তু এটা ভুল। কারণ, পরবর্তী আয়াতে আছে وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ অর্থাৎ তারা বলে, এটা তো সুস্পষ্ট যাদু। বলা বাহুল্য' কোন যুক্তি-প্রমাণকে 'প্রকাশ্য যাদু' বলা সংগত নয়। একথা কেবল মু'জিযা দেখেই বলা যায়।

কেউ কেউ আরও বলে آيَة -এর অর্থ কোরআন পাকের আয়াত। কাফিররা কোরআনের আয়াতগুলোকে যাদু আখ্যা দিত। কিন্তু কোরআন পাকের رَأَوْا (দেখে) শব্দটি এর পরিষ্কার বিরুদ্ধে। কেননা কোরআনের আয়াতকে দেখা হয় না----শোনা হয়। কোরআনের যেখানেই আয়াতের উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানেই শোনার কথা বলা হয়েছে----দেখার কথা নয়। কোরআন পাকে যত্রতত্র آيَة শব্দটি মু'জিযা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। উদাহরণত হযরত মূসা (আ)-র কাছে ফেরাউনের দাবি বর্ণনা প্রসংগে বলা হয়েছে : إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ যদি তুমি কোন মু'জিযা নিয়ে এসে থাক, তবে তা প্রদর্শন কর---যদি তুমি সত্যবাদী হও।

এ কথার জওয়াবে মূসা (আ) তাঁর লাঠিকে সর্পে পরিণত করে দেখিয়েছিলেন।

কোরআন পাকের কোন কোন আয়াতে উল্লিখিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) কাফিরদের মু'জিযা প্রদর্শন করার দাবি মেনে নেননি। জওয়াব এই যে, এটা সেক্ষেত্রে যেখানে বারবার মু'জিযা প্রদর্শন করা হয়েছিল, কিন্তু তারা প্রত্যহ ইচ্ছামত নতুন নতুন মু'জিযা দাবি করত। এর প্রত্যুত্তরে মু'জিযা প্রদর্শন করতে অস্বীকার করা হয়েছিল। কারণ, আল্লাহ্র নবী আল্লাহ্র আদেশে মু'জিযা প্রদর্শন করেন। যদি এরপরও কেউ তাঁর কথা না মানে, তবে প্রত্যহ নতুন মু'জিযা প্রকাশ করা নবীর ভাবমূর্তির পরিপন্থী এবং এটা আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছারও বিপরীত।

এছাড়া আল্লাহ্ তা'আলার রীতি এই যে, কোন জাতি তাদের প্রার্থিত মু'জিযা দেখানোর পরও যদি ঈমান না আনে, তবে ব্যাপক আযাব দ্বারা তাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়। যেহেতু উম্মতে-মুহাম্মদীকে কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত রাখা এবং ব্যাপক আযাব থেকে রক্ষা করা আল্লাহ্র ইচ্ছা ছিল, তাই তাদেরকে প্রার্থিত মু'জিযা দেখানো হয়নি।

فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ ﴿١٩﴾ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَٰذَا يَوْمُ الدِّينِ ﴿٢٠﴾ هَٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿٢١﴾ احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿٢٢﴾ مِن دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ ﴿٢٣﴾ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ ﴿٢٤﴾ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ ﴿٢٥﴾ بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ﴿٢٦﴾

---

(১৯) বস্তুত সে উত্থান হবে একটি বিকট শব্দ মাত্র---যখন তারা প্রত্যক্ষ করতে থাকবে! (২০) এবং বলবে, দুর্ভাগ্য আমাদের! এটাই তো প্রতিফল দিবস। (২১) বলা হবে, এটাই ফয়সালার দিন, যাকে তোমরা মিথ্যা বলতে। (২২) একত্র কর গোনাহ্গারদেরকে তাদের দোসরদেরকে এবং যাদের ইবাদত তারা করত (২৩) আল্লাহ্ ব্যতীত। অতপর তাদেরকে পরিচালিত কর জাহান্নামের পথে, (২৪) এবং তাদেরকে থামাও, তারা জিজ্ঞাসিত হবে; (২৫) তোমাদের কি হল যে, তোমরা একে অপরের সাহায্য করছ না? (২৬) বরং তারা আজকের দিনে আত্মসমর্পণকারী।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

বস্তুত কিয়ামত হবে এক বিকট আওয়াজ (অর্থাৎ দ্বিতীয় ফুঁকে) তখন (এর কারণে) সবাই আকস্মিকভাবে (জীবিত হয়ে) প্রত্যক্ষ করতে থাকবে এবং (পরিতাপ করে) বলবে. হায় আমাদের দুর্ভাগ্য! এই তো সেই প্রতিফল দিবস (বলে মনে হয়। ইরশাদ হবে, হ্যাঁ) এটাই ফয়সালার দিন. যাকে তোমরা মিথ্যা বলতে। (পরবর্তীতে কিয়ামতেরই কতিপয় ঘটনা বর্ণিত হয়েছে যে, ফেরেশতাগণকে আদেশ করা হবে,) একত্র কর জালিমদেরকে (অর্থাৎ যারা কুফর ও শিরকের প্রতিষ্ঠাতা ও নেতা ছিল---) তাদের সতীর্থদেরকে (অর্থাৎ যারা তাদের দোসর ছিল) এবং সেসব উপাস্যকে; আল্লাহকে ছেড়ে তারা যাদের ইবাদত করত (অর্থাৎ শয়তান ও

প্রতিমা)। অতপর তাদেরকে জাহান্নামের পথে পরিচালিত কর (অর্থাৎ সেদিকে নিয়ে যাও) এবং (এরপর আদেশ হবে, আচ্ছা----) তাদেরকে (একটু) থামাও, তারা জিজ্ঞাসিত হবে। (সেমতে তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবেঃ) এখন তোমাদের কি হল যে, (আযাবের হুকুম শুনে) তোমরা একে অপরের সাহায্য করছ না! (অর্থাৎ কাফিরদের বড় বড় নেতা তাদের অনুসারীদের সাহায্য করছ না কেন, যেমন দুনিয়াতে ওরা তাদেরকে বিপথগামী করত? কিন্তু এখন জিজ্ঞাসার পরও ওরা সাহায্য করতে পারবে না।) বরং ওরা সেদিন নতশিরে (দাঁড়িয়ে) থাকবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পরকালের সম্ভাব্যতা ও বাস্তবতা প্রমাণ করার পর আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতসমূহে হাশর-নশরের কিছু ঘটনা এবং পুনরুজ্জীবিত হওয়ার পর কাফির ও মুসলমানগণ যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে, তার আলোচনা করেছেন।

প্রথম আয়াতে মৃতদের জীবিত হওয়ার পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে যে, فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ - অর্থাৎ কিয়ামত তো কেবল একটি বিকট আওয়াজ। আরবী ভাষায় زَجْرَةٌ শব্দের একাধিক অর্থ হয়ে থাকে। এক অর্থ গৃহপালিত পশুদেরকে প্রস্থানোদ্যত করার জন্য এমন আওয়াজ করা, যা শুনে তারা প্রস্থান করতে থাকে। এখানে মৃতদেরকে জীবিত করার উদ্দেশ্যে ইসরাফীল (আ)-এর শিংগায় দ্বিতীয় ফুঁৎকার বোঝানো হয়েছে। একে زَجْرَةٌ বলে ব্যক্ত করার কারণ এই যে, জন্তুদেরকে চালনা করার জন্য যেমন কিছু আওয়াজ করা হয়, তেমনি মৃতদেরকে জীবিত করার জন্য এই ফুঁৎকার দেওয়া হবে।----(কুরতুবী)

যদিও আল্লাহ্ তা'আলা শিংগায় ফুঁক দেওয়া ছাড়াই মৃতদেরকে জীবিত করতে সক্ষম, কিন্তু হাশর ও নশরের দৃশ্যকে ভীতিপূর্ণ করার জন্য শিংগায় ফুঁক দেওয়া হবে। (তফসীরে-কবীর) কাফিরদের উপর ফুঁৎকারের প্রভাব হবে এই যে, فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ ----সহসাই তারা প্রত্যক্ষ করতে থাকবে। অর্থাৎ দুনিয়াতে যেমন তারা প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম ছিল, তেমনি সেখানেও প্রত্যক্ষ করতে পারবে। কেউ কেউ এর মর্ম এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, তারা অস্থির অবস্থায় একে অপরকে দেখতে শুরু করবে। ----(কুরতুবী)

اُحْشُرُوا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَاَزْوَاجَهُمْ ---অর্থাৎ যারা শিরকের ন্যায় গুরুতর জুলুম করেছে, তাদেরকে এবং তাদের সতীর্থদেরকে একত্র কর। এখানে সতীর্থদের

জন্য ازواج শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর শাব্দিক অর্থ 'জোড়া'। এ শব্দটি স্বামী ও স্ত্রীর অর্থেও বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। এ কারণেই কোন কোন তফসীরবিদ-এর অর্থ মুশরিক পুরুষদের 'মুশরিক স্ত্রী' বর্ণনা করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে এখানে ازواج -এর অর্থ সতীর্থই। হযরত উমর (রা)-এর এক উক্তি থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। ইমাম বায়হাকী, আবদুর রাজ্জাক প্রমুখ তফসীরবিদ এ আয়াতের তফসীরে হযরত উমরের এ উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে, এখানে ازواجهم -এর অর্থ মুশরিকদের সমমনা লোক। সেমতে সুদখোরকে অন্য সুদখোরদের সাথে, ব্যভিচারীকে অন্য ব্যভিচারীদের সাথে এবং মদ্যপায়ীকে অন্য মদ্যপায়ীদের সাথে একত্র করা হবে।---(রূহুল-মা'আনী, মযহারী)

এ ছাড়া وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ বাক্য দ্বারা বলে দেওয়া হয়েছে যে, মুশরিকদের কাছে তাদের মিথ্যা উপাস্য প্রতিমা ও শয়তানদেরকেও একত্র করা হবে, দুনিয়াতে তারা যাদেরকে আল্লাহ্‌র সাথে অংশীদার করত। এভাবে হাশরের ময়দানে মিথ্যা উপাস্যদের অসহায়ত্ব সকলের দৃষ্টিতে সন্দেহাতীতভাবে ফুটে ওঠবে।

এরপর ফেরেশতাগণকে আদেশ করা হবে ঃ

فَاهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ — অর্থাৎ এদেরকে জাহান্নামের পথপ্রদর্শন কর। তখন ফেরেশতাগণ ওদেরকে নিয়ে পুলসিরাতের নিকটে পৌঁছলে পুনরায় আদেশ হবে ঃ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ — এদেরকে থামাও, এদেরকে প্রশ্ন করা হবে। সেমতে সেখানে তাদেরকে বিশ্বাস ও কর্ম সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন করা হবে, যা কোরআন ও হাদীসের বহু স্থানে বর্ণিত রয়েছে।

وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٢٧﴾ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ ﴿٢٨﴾ قَالُوا بَل لَّمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٢٩﴾ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ ۖ بَلْ كُنتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ ﴿٣٠﴾ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا ۖ إِنَّا لَذَائِقُونَ ﴿٣١﴾ فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ ﴿٣٢﴾ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿٣٣﴾ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ﴿٣٤﴾ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ

يَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿٣٥﴾ وَيَقُوْلُوْنَ اَئِنَّا لَتَارِكُوْٓا اٰلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُوْنٍ ﴿٣٦﴾ بَلْ جَآءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٣٧﴾ اِنَّكُمْ لَذَآئِقُوا الْعَذَابِ الْاَلِيْمِ ﴿٣٨﴾ وَمَا تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٣٩﴾ اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ ﴿٤٠﴾

(২৭) তারা একে অপরের দিকে মুখ করে পরস্পরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। (২৮) বলবে, তোমরা তো আমাদের কাছে ডান দিক থেকে আসতে। (২৯) তারা বলবে, বরং তোমরা তো বিশ্বাসীই ছিলে না। (৩০) এবং তোমাদের উপর আমাদের কোন কর্তৃত্ব ছিল না, বরং তোমরাই ছিলে সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়। (৩১) আমাদের বিপক্ষে আমাদের পালনকর্তার উক্তিই সত্য হয়েছে। আমাদেরকে অবশ্যই স্বাদ আস্বাদন করতে হবে। (৩২) আমরা তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিলাম। কারণ, আমরা নিজেরাই পথভ্রষ্ট ছিলাম। (৩৩) তারা সবাই সেদিন শাস্তিতে শরীক হবে। (৩৪) অপরাধীদের সাথে আমি এমনি ব্যবহার করে থাকি। (৩৫) তাদেরকে যখন বলা হত, "আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই," তখন তারা ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করত (৩৬) এবং বলত, আমরা কি এক উম্মাদ কবির কথায় আমাদের উপাস্যদেরকে পরিত্যাগ করব? (৩৭) না, তিনি সত্যসহ আগমন করেছেন এবং রসূলগণের সত্যতা স্বীকার করেছেন। (৩৮) তোমরা অবশ্যই বেদনাদায়ক শাস্তি আস্বাদন করবে। (৩৯) তোমরা যা করতে, তারই প্রতিফল পাবে। (৪০) তবে তারা নয়, যারা আল্লাহ্র বাছাই করা বান্দা।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(মুশরিকরা তখন একে অপরের সাহায্য তো করতে পারবেই না, উপরন্তু তাদের মধ্যে ঝগড়া বেঁধে যাবে) এবং একে অপরের দিকে মুখ করে জিজ্ঞাসাবাদ (অর্থাৎ মতবিরোধ) করতে থাকবে। তারা (অর্থাৎ অনুসারীরা নেতাদেরকে) বলবে, (আমাদেরকে তো তোমরাই বিভ্রান্ত করেছ; কেননা) তোমরা প্রবল শক্তিসহকারে আমাদের নিকট আগমন করতে (অর্থাৎ তোমরা বল প্রয়োগের মাধ্যমে আমাদেরকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করতে)। তারা (অর্থাৎ নেতারা) বলবে, না, বরং তোমরা নিজেরাই বিশ্বাসী ছিলে না এবং (তোমরা আমাদের প্রতি অহেতুক দোষারোপ করছ, কেননা,) তোমাদের উপর আমাদের কোন কর্তৃত্ব তো ছিলই না। বরং তোমরা নিজেরাই সীমালংঘন করতে। অতএব (আমরা সবাই যখন কাফির ছিলাম, তখন জানা গেল যে,) আমাদের সবারই বিপক্ষে আমাদের পালনকর্তার (আদি) উক্তিই সত্য ছিল যে, আমাদেরকে অবশ্যই (শাস্তির) স্বাদ আস্বাদন করতে হবে। (বস্তুত এর ব্যবস্থা হল এই যে,) আমরা তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিলাম। (ফলে তোমরা

আমাদের জবরদস্তি ছাড়াই স্বেচ্ছায় পথভ্রষ্ট হয়েছিলে) এবং (এদিকে) আমরা নিজেরাও (স্বেচ্ছায়) পথভ্রষ্ট ছিলাম। সুতরাং উভয়ের পথভ্রষ্টতার কারণ একত্রিত হয়ে গেছে। এতে তোমাদের নিজেদের ইচ্ছাই তোমাদের পথভ্রষ্টতার বড় কারণ। এমতাবস্থায় নিজেদেরকে নির্দোষ বলতে চাও কেন? অতপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, যখন উভয় দলের কুফরে শরীকানা প্রমাণিত হল, (তখন) তারা সবাই সে দিন শাস্তিতে (-ও) শরীক হবে। আমি অপরাধীদের সাথে এমনি ব্যবহার করে থাকি। (অতপর তাদের কুফরী ও অপরাধের বিষয় বর্ণিত হয়েছে যে,) তারা (তওহীদেও অস্বীকার করত এবং রিসালতেও। সুতরাং) যখন তাদেরকে (রসূলের মাধ্যমে) বলা হত, "আল্লাহ্ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই", তখন (তা মানত না এবং) ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করে বলত, আমরা কি এক উন্মাদ কবির কথায় আমাদের উপাস্যদেরকে পরিত্যাগ করব? (এতে করে তওহীদ ও রিসালত উভয়টির প্রতি অস্বীকৃতি প্রদর্শন করা হল। আল্লাহ্ বলেন, এ পয়গম্বর, না কবি, না উন্মাদ) বরং (একজন পয়গম্বর---) তিনি সত্য দীন নিয়ে আগমন করেছেন এবং (তওহীদের মূলনীতি প্রভৃতি বিষয়ে) অন্যান্য পয়গম্বরগণের সত্যায়নও করেন। (অর্থাৎ তিনি যেসব মূলনীতি বর্ণনা করেন, তাতে সমস্ত পয়গম্বরই একমত। সুতরাং এসব মূলনীতি অসংখ্য যুক্তি-প্রমাণের আলোকে সত্য---কল্পনাবিলাস নয়। আর সত্য কথা বলাও উন্মাদনা নয়। অন্য উম্মতরাও তাদের পয়গম্বরগণের সাথে এমনি আচরণ করেছে। কিন্তু এখানে সরাসরি আরবের কাফির সম্প্রদায়কে সম্বোধন করা হয়েছে। তাই কেবল এ উম্মতের কাফিরদের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। অতপর বর্ণিত হয়েছে যে, তাদেরকে সরাসরি এ অভিন্ন শাস্তির আদেশ শোনানো হবে।) তোমাদের সবাইকে (অর্থাৎ অনুসারী এ অনুসৃত উভয়কেই) বেদনাদায়ক শাস্তি আস্বাদন করতে হবে। (এ ব্যাপারে তোমাদের প্রতি কোন অবিচার হয়নি; কেননা,) তোমরা যা (অর্থাৎ কুফরী ইত্যাদি) করতে, তারই প্রতিফল প্রাপ্ত হবে। তবে তারা নয়, যারা আল্লাহ্র বাছাই করা বান্দা। (অর্থাৎ সে মু'মিনগণ, যারা সত্যের অনুগামী হয়েছে এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে বিশেষভাবে মনোনীত করে নিয়েছেন---এমন বান্দা আযাব থেকে নিরাপদ থাকবে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

হাশরের ময়দানে বড় বড় কাফির সর্দার তাদের অনুগামীদের সাথে সমবেত হয়ে একে অপরের কোন সাহায্য করতে পারবে না, বরং তারা পরস্পর কথা কাটাকাটি শুরু করে দেবে। আলোচ্য আয়াতসমূহে এ কথা কাটাকাটিরই কিছুটা চিত্র ফুটিয়ে তুলে উভয় দলের অশুভ পরিণতি বর্ণনা করা হয়েছে। আয়াতসমূহের মর্ম তফসীরের সার-সংক্ষেপেই ফুটে উঠেছে। এখানে সংক্ষেপে কয়েকটি কথা উল্লেখযোগ্য।

اِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَاْتُوْنَنَا عَنِ الْيَمِيْنِ---এ বাক্যে يمين শব্দের একাধিক অর্থ হতে

পারে। এক অর্থ শক্তি ও বল। উপরে এ অর্থের আলোকেই তফসীর করা হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা বেশ প্রবলভাবে আমাদের নিকট আসতে এবং বল প্রয়োগের মাধ্যমে আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করতে। এ তফসীরই অধিক পরিচ্ছন্ন ও প্রকৃষ্ট। এ ছাড়া يمين -এর অর্থ শপথও হয়ে থাকে। তাই কেউ কেউ এর তফসীর করেছেন যে, তোমরা আমাদের নিকট শপথ নিয়ে আসতে। অর্থাৎ শপথ করে করে আমাদেরকে আশ্বস্ত করতে যে, আমাদের ধর্ম সঠিক এবং রসূলের শিক্ষা (নাউযুবিল্লাহ্) ভ্রান্ত। কোরআনের ভাষার প্রতি লক্ষ্য করলে উপরোক্ত উভয় তফসীরই স্বতঃস্ফূর্তভাবে খাটে।

فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ — এ আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হল যে, যদি কেউ অপরকে অবৈধ কাজের দাওয়াত দেয় এবং তাকে পাপ কাজে উদ্বুদ্ধ করার জন্য নিজের প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রয়োগ করে, তবে পাপ কাজের প্রতি আহবান জানানোর একথা বলে আযাব অবশ্যই তাকেও ভোগ করতে হবে। কিন্তু যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় তার আমন্ত্রণ কবূল করে, সে-ও আপন কর্মের পাপ থেকে মুক্ত হতে পারবে না। 'আমাকে অমুক ব্যক্তি পথভ্রষ্ট করেছিল' একথা বলে সে পরকালে আযাব থেকে নিষ্কৃতি পাবে না। তবে যদি সে পাপ কাজটি স্বেচ্ছায় না করে বরং জোর-জবরদস্তিতে পড়ে প্রাণ রক্ষার্থে করে থাকে, তবে ইন্‌শাআল্লাহ্ সে ক্ষমা পাবে বলে আশা করা যায়।

أُولَٰئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ ﴿٤١﴾ فَوَاكِهُ ۖ وَهُم مُّكْرَمُونَ ﴿٤٢﴾ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿٤٣﴾
عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ ﴿٤٤﴾ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ ﴿٤٥﴾ بَيْضَاءَ لَذَّةٍ
لِّلشَّارِبِينَ ﴿٤٦﴾ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ ﴿٤٧﴾ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ
الطَّرْفِ عِينٌ ﴿٤٨﴾ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ ﴿٤٩﴾ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ
يَتَسَاءَلُونَ ﴿٥٠﴾ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ﴿٥١﴾ يَقُولُ
أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ ﴿٥٢﴾ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا
لَمَدِينُونَ ﴿٥٣﴾ قَالَ هَلْ أَنتُم مُّطَّلِعُونَ ﴿٥٤﴾ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ
الْجَحِيمِ ﴿٥٥﴾ قَالَ تَاللَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ ﴿٥٦﴾ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنتُ

مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ ﴿٥٧﴾ أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِيْنَ ﴿٥٨﴾ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُوْلَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ ﴿٥٩﴾ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿٦٠﴾ لِمِثْلِ هَٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعٰمِلُوْنَ ﴿٦١﴾

(৪১) তাদের জন্য রয়েছে নির্ধারিত রুযী (৪২) ফলমূল এবং তারা সম্মানিত, (৪৩) নিয়ামতের উদ্যানসমূহ (৪৪) মুখোমুখি হয়ে আসনে আসীন। (৪৫) তাদেরকে ঘুরেফিরে পরিবেশন করা হবে স্বচ্ছ শরাবপাত্র, (৪৬) সুশুভ্র, যা পানকারীদের জন্য সুস্বাদু। (৪৭) তাতে মাথা ব্যথার উপাদান নেই এবং তারা তা পান করে মাতালও হবে না! (৪৮) তাদের কাছে থাকবে নত, আয়তলোচনা তরুণিগণ; (৪৯) যেন তারা সুরক্ষিত ডিম। (৫০) অতপর তারা একে অপরের দিকে মুখ করে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। (৫১) তাদের একজন বলবে, আমার এক সঙ্গী ছিল। (৫২) সে বলত, তুমি কি বিশ্বাস কর যে, (৫৩) আমরা যখন মরে যাব এবং মাটি ও হাড়ে পরিণত হব, তখনও কি আমরা প্রতিফল প্রাপ্ত হব? (৫৪) আল্লাহ্ বলবেন, তোমরা কি তাকে উঁকি দিয়ে দেখতে চাও? (৫৫) অতপর সে উঁকি দিয়ে দেখবে এবং তাকে জাহান্নামের মাঝখানে দেখতে পাবে। (৫৬) সে বলবে, আল্লাহ্‌র কসম, তুমি তো আমাকে প্রায় ধ্বংসই করে দিয়েছিলে! (৫৭) আমার পালনকর্তার অনুগ্রহ না হলে আমিও যে গ্রেফতারকৃতদের সাথেই উপস্থিত হতাম। (৫৮) এখন আমাদের আর মৃত্যু হবে না (৫৯) আমাদের প্রথম মৃত্যু ছাড়া এবং আমরা শাস্তি প্রাপ্তও হব না। (৬০) নিশ্চয় এ-ই মহা সাফল্য। (৬১) এমন সাফল্যের জন্য পরিশ্রমীদের পরিশ্রম করা উচিত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তাদের (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র খাঁটি বান্দাদের) জন্য রয়েছে এমন খাদ্য-সামগ্রী যা (অন্যান্য সূরা) জানা হয়েছে; (অর্থাৎ) ফলমূল। (এগুলো প্রাপ্ত হওয়ার কথা সূরা ইয়াসীনের لَهُمْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ আয়াতে উল্লিখিত রয়েছে এবং এগুলোর গুণাগুণ সূরা ওয়াকেয়ার وَفَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ ۙ لَا مَقْطُوْعَةٍ وَلَا مَمْنُوْعَةٍ — আয়াতে ইতিপূর্বেই অবতীর্ণ হয়েছে। কারণ, সূরা ইয়াসীন ও সূরা ওয়াকেয়া সাফফাতের পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে। এতকালে তাই বর্ণিত আছে।) তারা অত্যন্ত সম্মানিত অবস্থায় সুখময় উদ্যানসমূহে মুখোমুখি উপবিষ্ট থাকবে। তাদের কাছে এমন পানপাত্র আনা হবে (অর্থাৎ জান্নাতী বালকরা আনবে,) যা প্রবাহিত শরাবে পূর্ণ করা হবে, (এতে করে

শরাবের প্রাচুর্য ও স্বচ্ছতা বোঝা গেল। এই শরাব দেখতে) হবে শুভ্র (আর তা পান করতে) পানকারীদের জন্য হবে সুস্বাদু। (দুনিয়ার শরাবের মত) এতে মাথা-ব্যথা হবে না এবং এতে তাদের চৈতন্যও বিলুপ্ত হবে না। তাদের কাছে থাকবে নত আয়তলোচনা তরুণী (হুর)-গণ। তারা (এমন গৌরবর্ণ হবে,) যেন (পাখার নিচে) লুক্কায়িত ডিম (যা ধূলাবালি, দাগ ইত্যাদি থেকে সংরক্ষিত থাকে; অর্থাৎ ডিমের মত পরিচ্ছন্ন হবে)। অতপর (যখন সবাই বৈঠকে একত্রিত হবে, তখন) তারা একে অপরের দিকে মুখ করে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। (এ কথাবার্তার মধ্যে জান্নাতীদের) একজন বলবে, (দুনিয়াতে) আমার এক সঙ্গী ছিল। সে (বিস্ময়ভরে) আমাকে বলত, তুমি কি বিশ্বাস কর যে, আমরা যখন মরে যাব এবং মাটি ও হাড়ে পরিণত হয়ে যাব, তার পরেও আমরা (পুনরুজ্জীবিত হব এবং পুনরুজ্জীবিত হয়ে) প্রতিফলপ্রাপ্ত হব? (অর্থাৎ সে পরকাল অস্বীকার করত। তাই অবশ্যই সে জাহান্নামে পৌঁছে থাকবে।) তিনি (অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা) বলবেন, (হে জান্নাতিগণ,) তোমরা কি (তাকে) উঁকি দিয়ে দেখতে চাও? (চাইলে অনুমতি রয়েছে।) অতপর সে (অর্থাৎ কাহিনী বর্ণনাকারী) উঁকি দিয়ে দেখবে এবং তাকে (পৃথিবীর আলোচ্য সঙ্গীকে) জাহান্নামের মাঝখানে (পতিত) দেখতে পাবে। (তাকে সেখানে দেখে) সে বলবে, আল্লাহ্র কসম তুমি যে আমাকে প্রায় ধ্বংসই করে দিয়েছিলে! (অর্থাৎ আমাকেও পরকালে অবিশ্বাসী বানাতে চেষ্টা করেছিলে।) আমার পালনকর্তার অনুগ্রহ না হলে, (কারণ, তিনি আমাকে বিশুদ্ধ বিশ্বাসের উপর কায়েম রেখেছেন,) আমিও (তোমার মত) গ্রেফতার-কৃতদের মধ্যে থাকতাম। (এরপর জান্নাতী ব্যক্তি বৈঠকের লোকদের বলবে,) (দুনিয়ার) প্রথম মৃত্যু ছাড়া আমাদের এখন আর মৃত্যু হবে না এবং আমরা আযাবও ভোগ করব না। (এসব কথাবার্তা এই আনন্দের আতিশয্যে বলা হবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে যাবতীয় বিপদ-আপদ ও দুঃখ-কষ্ট থেকে রক্ষা করেছেন এবং চিরতরে সুখী করেছেন। অতপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন যে, উপরে বর্ণিত জান্নাতের সকল দৈহিক ও আত্মিক নিয়ামত লাভ করা) নিশ্চয়ই এটা বিরাট সাফল্য। এমন সাফল্যের জন্যই পরিশ্রমীদের পরিশ্রম করা উচিত। (অর্থাৎ ঈমান ও আনুগত্য অবলম্বন করা উচিত।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

জাহান্নামীদের অবস্থা বর্ণনা করার পর আলোচ্য আয়াতসমূহে জান্নাতীদের অবস্থা আলোচনা করা হয়েছে। এই আলোচনা দু'ভাগে বিভক্ত। প্রথম দশ আয়াতে সাধারণ জান্নাতীদের আরাম-আয়েশ বিবৃত হয়েছে এবং পরবর্তী আয়াতসমূহে একজন বিশেষ জান্নাতীর শিক্ষাপ্রদ ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম দশ আয়াতে বর্ণিত কয়েকটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

أُولَٰئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ — এ আয়াতের শাব্দিক অর্থ এই যে, তাদের জন্য

এমন রুযী তথা খাদ্য-সামগ্রী রয়েছে, যার অবস্থা জানা হয়ে গেছে। তফসীরবিদগণ এর বিভিন্ন মর্মার্থ বর্ণনা করেছেন। কেউ বলেছেন, এতে বিভিন্ন সূরায় বর্ণিত বেহেশতী খাদ্য-সামগ্রীর বিশদ বিবরণের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। তফসীরের সার-সংক্ষেপে হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (র) এ ব্যাখ্যাই অবলম্বন করেছেন। কেউ কেউ বলেন, رزق معلوم- এর অর্থ এই যে, এ রিযিকের সময়কাল নির্দিষ্ট ও জানা। অর্থাৎ এ রিযিক সকাল-সন্ধ্যা নিয়মিতভাবে সরবরাহ করা হবে। অন্য এক আয়াতে غدوا و عشيا (সকাল ও সন্ধ্যা) পরিষ্কার উল্লেখ করা হয়েছে। তৃতীয় এক তফসীর এই যে, সেটা নিশ্চিত ও স্থায়ী রিযিক হবে। দুনিয়ার মত নয় যে, কেউ নিশ্চয়তা সহকারে বলতে পারে না যে, আগামীকাল কি এবং কতটুকু রিযিক পাবে। দুনিয়াতে কেউ একথাও জানে না যে,তার অর্জিত রিযিক কত দিন তার কাছে থাকবে। আজ যে নিয়ামত আছে কাল হয়তো তা থাকবে না---প্রত্যেকেই এই আশংকায় সদা শংকিত থাকে। কিন্তু জান্নাতে এমন কোন আশংকা থাকবে না। জান্নাতের রিযিক যেমন নিশ্চিত, তেমনই চিরস্থায়ী।---(কুরতুবী)।

فَوَاكِهُ— শব্দের মাধ্যমে কোরআন নিজেই জান্নাতের রিযিকের তফসীর করে দিয়েছে যে, সে রিযিক হবে ফলমূল। এ শব্দটি فَاكِهَةٌ-এর বহুবচন (যে বস্তু ক্ষুধার প্রয়োজন মেটানোর জন্য নয়; বরং স্বাদ হাসিল করার জন্য খাওয়া হয়, তাকেই আরবী ভাষায় فاكهة বলা হয়। ফলমূল ও স্বাদ হাসিল করার জন্য খাওয়া হয়। তাই এর অনুবাদ করা হয় 'ফলমূল'। অন্যথায় এর অর্থ ফলমূলের অর্থের চেয়ে ব্যাপক। ইমাম রাযী فواكه শব্দ থেকে এ সূক্ষ্ম তত্ত্ব বের করেছেন যে, জান্নাতে যেসব খাদ্য-সামগ্রী দেওয়া হবে, তা সবই স্বাদ ভোগ করার জন্য দেওয়া হবে---ক্ষুধা মেটানোর জন্য নয়। কারণ, জান্নাতে মানুষের কোন কিছুরই প্রয়োজন হবে না। সেখানে জীবন ধারণ অথবা স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যও কোন কিছুর প্রয়োজন হবে না। তবে আকাঙ্ক্ষা হবে এবং আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হলেই আনন্দ লাভ হবে। জান্নাতের যাবতীয় নিয়ামতের লক্ষ্যই হল আনন্দ দান করা।

وَهُمْ مُكْرَمُونَ— বলে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, জান্নাতীদেরকে এ রিযিক পূর্ণ সম্মান ও মর্যাদাসহকারে দেওয়া হবে। কারণ, সম্মান ব্যতীত সুস্বাদু খাদ্যও বিস্বাদ হয়ে যায়। এ থেকে আরও জানা গেল যে, কেবল খানা খাওয়ালেই মেহমানের হক আদায় হয়ে যায় না বরং তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করাও তার অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।

عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ---এটা জান্নাতীদের মজলিসের চিত্র। তারা

রাজাসনে মুখোমুখি হয়ে বসবে। কারও দিকে কারও পিঠ থাকবে না। এর বাস্তব চিত্র কি হবে সে সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলাই সঠিক জানেন। কেউ কেউ বলেন, মজলিসের পরিধি এত সুদূর বিস্তৃত হবে যে, একে অপরের দিকে পিঠ করার প্রয়োজন হবে না। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতীদেরকে এমন দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি ও বাকশক্তি দান করবেন, যার ফলে তারা দূরে উপবিষ্টদের সাথে স্বচ্ছন্দে কথাবার্তা বলতে পারবে।

কেউ কেউ বলেন, জান্নাতীদের রাজাসন ঘূর্ণায়মান হবে, যার সাথে কথা বলতে হবে, তার দিকেই ঘুরে যাবে।

لَذَّةٍ لِّلشّٰرِبِيْنَ—لَذَّةٍ— শব্দটি আসলে ধাতু। অর্থ সুস্বাদু হওয়া। তাই কেউ কেউ বলেন, এখানে আসলে ছিল ذَاتِ لَذَّةٍ—অর্থাৎ স্বাদবিশিষ্ট। কিন্তু এসব ঘষা-মাজার আদৌ প্রয়োজন নেই। প্রথমত এটা ধাতু হলেও ধাতু কর্তার অর্থে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। এমতাবস্থায় অর্থ হবে, সেই শরাব পানকারীদের জন্য 'সাক্ষাৎ স্বাদ' হবে। এছাড়া এটা لَذّ বিশেষণ পদের স্ত্রীলিঙ্গ لَذَّةٍ-ও হতে পারে। এমতাবস্থায় অর্থ হবে পানকারীদের জন্য সুস্বাদু।—(কুরতুবী)

لَا فِيْهَا غَوْلٌ—غول-এর অর্থ কেউ 'মাথা ব্যথা' এবং কেউ 'পেট ব্যথা' বর্ণনা করেছেন। আবার কেউ দুর্গন্ধ ও আবর্জনা,' কেউ 'মতিভ্রম হওয়া' উল্লেখ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে শব্দটি উল্লিখিত সব অর্থেই ব্যবহৃত হতে পারে। হাকেম ইবনে জরীর বলেন, এখানে غول-এর অর্থ আপদ। অর্থাৎ জান্নাতের শরাবে দুনিয়ার শরাবের মত কোন আপদ হবে না। মাথা ব্যথা, পেট ব্যথা, দুর্গন্ধ, মতিভ্রষ্টতা ইত্যাদি কিছুই হবে না।

قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ – অর্থাৎ জান্নাতের হুরদের বৈশিষ্ট্য হবে এই যে, তারা হবে 'আনতনয়না'। যেসব স্বামীর সাথে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপন করে দেবেন, তারা তাদের ছাড়া কোন ভিন্ন পুরুষের প্রতি দৃষ্টিপাত করবে না। আল্লামা ইবনে জওযী বর্ণনা করেন যে, তারা তাদের স্বামীদেরকে বলবে,—আমার পালনকর্তার ইয্‌যতের কসম, জান্নাতে তোমার চেয়ে উত্তম ও সুশ্রী পুরুষ আমার দৃষ্টিগোচর হয় না। যে আল্লাহ্ আমাকে তোমার স্ত্রী এবং তোমাকে আমার স্বামী করেছেন, সমস্ত প্রশংসা তাঁরই।

আল্লামা ইবনে জওযী قاصرات الطرف-এর আরও একটি অর্থ এই বর্ণনা করেছেন যে, তারা তাদের স্বামীদের দৃষ্টি নত রাখবে। অর্থাৎ তারা নিজেরা

এমন "অনিন্দ্য সুন্দরী ও স্বামীর প্রতি নিবেদিতা" হবে যে, স্বামীদের মনে অন্য কোন নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করার বাসনাই হবে না।----(তফসীরে যাদুল মাসীর)

كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ----এখানে জান্নাতের হুরগণকে লুকানো ডিমের সাথে তুলনা করা হয়েছে। আরবদের কাছে এই তুলনা প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত ছিল। যে ডিম পাখার নিচে লুকানো থাকে, তার উপর বাইরের ধূলিকণার কোন প্রভাব পড়ে না। ফলে তা খুব স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন থাকে। এছাড়া এর রঙ সাদা হলুদাভ হয়ে থাকে, যা আরবদের কাছে রমণীদের সর্বাধিক চিত্তাকর্ষক রঙ হিসাবে গণ্য হত। তাই এর সাথে তুলনা করা হয়েছে। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন, এখানে ডিমের সাথে তুলনা করা হয়নি; বরং ডিমের বাকলের অভ্যন্তরস্থিত ঝিল্লীর সাথে তুলনা করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, এই রমণিগণ ডিমের ঝিল্লীর ন্যায় নরম ও কোমল হবে।--- (রূহুল মা'আনী)

এক জান্নাতী ও তার কাফির সঙ্গী ঃ প্রথম দশ আয়াতে জান্নাতীদের ব্যাপক অবস্থা বর্ণনা করার পর কোন এক জান্নাতীর বিশেষ আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, সে জান্নাতের মজলিসে পৌঁছার পর তার এক কাফির বন্ধুর কথা স্মরণ করবে। বন্ধুবর দুনিয়াতে থাকাকালে পরকাল অস্বীকার করত। অতপর আল্লাহ্ তা'আলার অনুমতিক্রমে সে জাহান্নামের অভ্যন্তরে উঁকি দিয়ে বন্ধুর সাথে কথা বলার সুযোগ পাবে। কোরআন পাকে এই জান্নাতী ব্যক্তির নাম-ঠিকানা উক্ত হয়নি। তাই নিশ্চিন্তরূপে বলা যায় না যে, সে কে? এতদসত্ত্বেও কোন কোন তফসীরবিদ ধারণা করেছেন যে, সে মু'মিন ব্যক্তিটির নাম 'ইয়াহুদাহ' এবং তার কাফির সঙ্গীর নাম 'মাতরূস'। তারাই সে সঙ্গীদ্বয়, যাদের উল্লেখ সূরা কাহ্ফের وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ আয়াতে করা হয়েছে।---(মাযহারী)

আল্লামা সুয়ূতী কতিপয় তাবেয়ী থেকে এ প্রসঙ্গে আরও একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। যার সারমর্ম এই যে, দুই ব্যক্তি একত্রে কারবার করে আট হাজার দীনার মুনাফা অর্জন করল এবং উভয়ে চার হাজার করে বন্টন করে নিল। একজন তার অর্থ থেকে এক হাজার দীনার দিয়ে কিছু জমি খরিদ করল। অপরজন ছিল খুবই সৎ ও সাধু ব্যক্তি। সে দোয়া করল ঃ ইয়া আল্লাহ্, অমুক ব্যক্তি এক হাজার দীনার দিয়ে জমি খরিদ করেছে। আমি আপনার কাছ থেকে এক হাজার দীনারের বিনিময়ে জান্নাতে জমি খরিদ করতে চাই। অতপর সে এক হাজার দীনার গরীব-দুঃখীকে দান করে দিল। এরপর তার সঙ্গী এক হাজার দীনার ব্যয় করে একটি গৃহ নির্মাণ করলে সে হাত তুলে বলল ঃ ইয়া আল্লাহ্, অমুক ব্যক্তি এক হাজার দীনার ব্যয় করে পৃথিবীতে একটি গৃহ নির্মাণ করেছে। আমি এক হাজার দীনার দিয়ে আপনার কাছ

থেকে জান্নাতের একটি গৃহ ক্রয় করতে চাই। অতপর সে আরও এক হাজার দীনার দান করে দিল। এরপর তার সঙ্গী এক মহিলাকে বিয়ে করল এবং সে বিয়েতে এক হাজার দীনার ব্যয় করল। তখন সে হাত তুলে দোয়া করলঃ ইয়া আল্লাহ্, অমুক ব্যক্তি বিয়ে করে এক হাজার দীনার ব্যয় করেছে। আমি জান্নাতের রমণীদের মধ্য থেকে একজনকে বিয়ের পয়গাম দিচ্ছি এবং তার জন্য এক হাজার দীনার উৎসর্গ করছি। একথা বলে সে এক হাজার দীনার দান করে দিল। অতপর তার সঙ্গী এক হাজার দীনার দিয়ে কিছু গোলাম ও আসবাবপত্র ক্রয় করলে সে আবার এক হাজার দীনার দান করে আল্লাহ্র কাছে এর বিনিময়ে জান্নাতের গোলাম ও জান্নাতের আসবাবপত্র প্রার্থনা করল।

এরপর ঘটনাক্রমে মু'মিন লোকটি দারুন অভাব-অনটনের সম্মুখীন হয়ে কিছু সাহায্য পাওয়ার আশায় বন্ধুর কাছে উপস্থিত হল। সে নিজের অভাব-অনটনের কথা ব্যক্ত করলে বন্ধু বললঃ তোমার ধনসম্পদ কি হল? উত্তরে সে তার দান-খয়রাতের সমুদয় ঘটনা বর্ণনা করল। এতে বন্ধুবর বিস্মিত হয়ে বললঃ তুমি কি বাস্তবিকই বিশ্বাস কর যে, আমরা মৃত্যুর পর মাটিতে পরিণত হয়ে গেলেও পুনরায় জীবন লাভ করব এবং সেখানে আমাদের কাজকর্মের হিসাব-নিকাশ হবে? যাও, আমি তোমাকে কিছুই দেব না। এরপর তারা উভয়েই মৃত্যুমুখে পতিত হল। আলোচ্য আয়াত-সমূহে জান্নাতী বলে সে সৎ ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে, যে পরকালের জন্য তার সমুদয় ধনসম্পদ দান করে ফেলেছিল এবং তার জাহান্নামী সঙ্গী বলে সে ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে, যে পরকালকে সত্য জানার অজুহাতে তাকে বিদ্রূপ করে তাড়িয়ে দিয়েছিল। —(দুররে মনসুর)

কুসংসর্গ থেকে আত্মরক্ষার শিক্ষাঃ মোটকথা, জান্নাতী ব্যক্তি যে-ই হোক না কেন, এখানে এ ঘটনা উল্লেখ করার আসল উদ্দেশ্য মানুষকে শিক্ষা দেওয়া যে, প্রত্যেকটি মানুষের উচিত তার বন্ধু মহলকে যাচাই করে দেখা যে, তাদের মধ্যে কেউ তাকে জাহান্নামের পরিণতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে কি না। কুসংসর্গের সম্ভাব্য ধ্বংসকারিতার সঠিক অনুমান পরকালেই হবে। তখন এ ধ্বংসকারিতা থেকে আত্মরক্ষার কোন পথই খোলা থাকবে না। তাই দুনিয়াতেই যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনা করে বন্ধুত্ব ও একাত্ম-তার সম্পর্ক স্থাপন করা উচিত। প্রায়ই কোন কাফির অথবা আল্লাহ্দ্রোহী ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক স্থাপন করার পর মানুষ অজ্ঞাতেই তার চিন্তাধারা, মতবাদ ও জীবন পদ্ধতি দ্বারা প্রভাবিত হতে থাকে। এটা পরকালীন পরিণতির জন্য চরম বিপজ্জনক প্রমাণিত হয়।

মৃত্যুর বিলুপ্তিতে বিস্ময় প্রকাশঃ এখানে জান্নাতী ব্যক্তি সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সে জান্নাতের নিয়ামতসমূহ লাভ করে আনন্দের আতিশয্যে বলবেঃ আমাদের আর কখনও মৃত্যু হবে না কি! এ বাক্যের উদ্দেশ্য এই নয় যে, সে জান্নাতের অনন্ত জীবনে বিশ্বাস করবে না, বরং চরম পর্যায়ের আনন্দ অর্জিত হওয়ার পর মানুষ প্রায়ই

এমন কথা বলে ফেলে, যেন তার আনন্দ অর্জিত হয়েছে বলে বিশ্বাস হচ্ছে না। জান্নাতী ব্যক্তির বাক্যটিও এমনি ধরনের।

অবশেষে কোরআন পাক এ ঘটনার আসল শিক্ষার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছে ঃ لِمِثْلِ هٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُوْنَ অর্থাৎ এমনি ধরনের সাফল্যের জন্য আমলকারীদের আমল করা উচিত।

أَذٰلِكَ خَيْرٌ نُّزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّوْمِ ۝٦٢ إِنَّا جَعَلْنٰهَا فِتْنَةً لِّلظّٰلِمِيْنَ ۝٦٣
إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِيْٓ أَصْلِ الْجَحِيْمِ ۝٦٤ طَلْعُهَا كَأَنَّهٗ رُءُوْسُ
الشَّيٰطِيْنِ ۝٦٥ فَإِنَّهُمْ لَاٰكِلُوْنَ مِنْهَا فَمَالِـُٔوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ ۝٦٦
ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيْمٍ ۝٦٧ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى
الْجَحِيْمِ ۝٦٨ إِنَّهُمْ أَلْفَوْا اٰبَآءَهُمْ ضَآلِّيْنَ ۝٦٩ فَهُمْ عَلٰٓى اٰثٰرِهِمْ
يُهْرَعُوْنَ ۝٧٠ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِيْنَ ۝٧١ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا
فِيْهِمْ مُّنْذِرِيْنَ ۝٧٢ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِيْنَ ۝٧٣ إِلَّا
عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ ۝٧٤

---

(৬২) এই কি উত্তম আপ্যায়ন, না যাক্কুম বৃক্ষ? (৬৩) আমি জালিমদের জন্য একে বিপদ করেছি। (৬৪) এটি একটি বৃক্ষ, যা উদ্গত হয় জাহান্নামের মূলে। (৬৫) এর গুচ্ছ শয়তানের মস্তকের মত। (৬৬) কাফিররা একে ভক্ষণ করবে এবং এর দ্বারা উদর পূর্ণ করবে। (৬৭) তদুপরি তাদেরকে দেওয়া হবে ফুটন্ত পানির মিশ্রণ, (৬৮) অতপর তাদের প্রত্যাবর্তন হবে জাহান্নামের দিকে। (৬৯) তারা তাদের পূর্বপুরুষদেরকে পেয়েছিল বিপথগামী। (৭০) অতপর তারা তাদের পদাংক অনুসরণে তৎপর ছিল। (৭১) তাদের পূর্বেও অগ্রবর্তীদের অধিকাংশ বিপথগামী হয়েছিল। (৭২) আমি তাদের মধ্যে ভীতিপ্রদর্শনকারী প্রেরণ করেছিলাম। (৭৩) অতএব লক্ষ্য করুন, যাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছিল, তাদের পরিণতি কি হয়েছে। (৭৪) তবে আল্লাহ্‌র বাছাই করা বান্দাদের কথা ভিন্ন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(আযাব ও সওয়াবের মূল্যায়ন করার পর এখন মু'মিনদেরকে উৎসাহ দান এবং কাফিরদেরকে ভীতিপ্রদর্শন করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে ঃ) বলো তো, এটাই (অর্থাৎ জান্নাতের এ নিয়ামত, যা মু'মিনদের জন্য রয়েছে) উত্তম আপ্যায়ন, না যাক্কুম বৃক্ষ (যা কাফিরদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে)? আমি এ বৃক্ষকে (পরকালের শাস্তি সাব্যস্ত করা ছাড়াও দুনিয়াতে) জালিমদের জন্য পরীক্ষার বিষয় করেছি। (আমি দেখতে চাই, তারা এর কথা শুনে সত্য বলে বিশ্বাস করে, না মিথ্যারোপ ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে? বস্তুত কাফিররা এর প্রতি মিথ্যারোপ ও বিদ্রূপছলে বলে, যাক্কুম তো মাখন ও খোরমাকে বলা হয়, যা খুবই সুস্বাদু বস্তু। তারা আরো বলে, যাক্কুম যদি বৃক্ষই হবে তবে তা জাহান্নামের আগুনে কেমন করে থাকতে পারে? আল্লাহ্ তা'আলা এর জওয়াবে বলেন ঃ) এটা এমন এক বৃক্ষ যা জাহান্নামের গভীরদেশ থেকে উদ্‌গত হয়। (অর্থাৎ মাখন আর খোরমা নয়। যেহেতু আগুনেই এর জন্ম, তাই তাতে টিকে থাকা এর পক্ষে অবান্তর নয়। যেমন, 'সমন্দর' নামক এক প্রকার কীট আগুনে জন্মলাভ করে এবং আগুনেই থাকে। অতপর যাক্কুমের একটি অবস্থা উল্লেখ করা হয়েছে যে,) এর গুচ্ছ সাপের ফণার মত (কদাকার। এ বৃক্ষের দ্বারা জালিমদেরকে আপ্যায়ন করা হবে।) কাফিররা ক্ষুধার তাড়নায় (যখন আর কিছুই পাবে না, তখন) এটি ভক্ষণ করবে এবং (ক্ষুধায় অস্থির থাকার দরুন) এর দ্বারাই উদর পূর্ণ করবে। তদুপরি (পিপাসায়) ছটফট করে যখন পানি চাইবে, তখন তাদেরকে পানি (পুঁজের সাথে) মিশিয়ে দেওয়া হবে। (এখানেই বিপদের শেষ নয়, বরং) তাদের শেষ ঠিকানা হবে জাহান্নাম। (অর্থাৎ এরপরও সেখানে চিরকাল থাকতে হবে। তাদের এই শাস্তি এ জন্য যে,) তারা (আল্লাহ্‌র হিদায়েতের অনুসরণ করেনি, বরং) তাদের পূর্বপুরুষ-দেরকে পেয়েছিল বিপথগামী, অতপর তারাও তাদের পায়ের সাথে পা মিলিয়ে দ্রুত চলছিল। (অর্থাৎ একান্ত আগ্রহভরে তাদেরই বিপথগামিতার অনুসরণ করেছিল।) তাদের (অর্থাৎ বর্তমান কাফিরদের) পূর্বেও অগ্রবর্তীদের অধিকাংশই বিপথগামী হয়েছে। (আমি তাদের মধ্যেও সতর্ককারী প্রেরণ করেছিলাম।) অতএব লক্ষ্য করুন, যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল, তাদের কেমন (অশুভ) পরিণতি হয়েছে। (তারা সতর্ককারী পয়গম্বরগণকে মানেনি। ফলে দুনিয়াতেই আযাবে পতিত হয়েছে।) তবে আল্লাহ্‌র খাছ বান্দাদের (অর্থাৎ মু'মিনদের) কথা স্বতন্ত্র। (তারা পার্থিব আযাব থেকে মুক্ত রয়েছে।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

জাহান্নাম ও জান্নাত উভয়ের কিছু কিছু অবস্থা বর্ণনা করার পর আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেকটি লোককে এ বিষয়টির মূল্যায়ন করার দাওয়াত দিয়েছেন যে, উভয়ের মধ্যে কোন্‌টি উত্তম তা চিন্তা করে দেখ। সেমতে বলা হয়েছে ঃ

أَذٰلِكَ خَيْرٌ نُّزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ —জান্নাতের যেসব নিয়ামত উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো উত্তম, না জাহান্নামীদের খাদ্য যাক্কুম বৃক্ষ উত্তম?

যাক্কুম কি? যাক্কুম নামের এক রকম বৃক্ষ আরব উপদ্বীপের তাহামা নামক অঞ্চলে পাওয়া যায়। আল্লামা আলুসী লিখেন ঃ এটা অন্যান্য অনুর্বর মরু এলাকায়ও উৎপন্ন হয়। কেউ কেউ বলেন, এটা সে বৃক্ষ যাকে উর্দুতে 'থোহড়' বলা হয়। এরই কাছাকাছি আরও একটি বৃক্ষ ভারতবর্ষে 'নাগফন' (ফণিমনসা) নামে খ্যাত। কেউ কেউ একেই যাক্কুম বলে সাব্যস্ত করেছেন এবং এটাই অধিক যুক্তিসম্মত। এ সম্পর্কে তফসীরবিদদের বিভিন্ন মত রয়েছে যে, দুনিয়ার এ যাক্কুমই জাহান্নামীদের খাদ্য হবে, না সেটা অন্য কোন বৃক্ষ? কেউ কেউ বলেন ঃ আয়াতে দুনিয়ার যাক্কুমই বোঝানো হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেন, জাহান্নামের যাক্কুম হবে ভিন্ন বস্তু; দুনিয়ার যাক্কুমের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। বাহ্যত মনে হয়, পৃথিবীতে যেমন সাপ-বিচ্ছু প্রভৃতি রয়েছে, তেমনি জাহান্নামেও আছে। কিন্তু জাহান্নামের সাপ-বিচ্ছু দুনিয়ার সাপ-বিচ্ছু অপেক্ষা বহুগুণে ভয়ংকর হবে। এমনিভাবে জাহান্নামের যাক্কুমও প্রজাতি হিসাবে দুনিয়ার যাক্কুমের মত হলেও দুনিয়ার যাক্কুম অপেক্ষা অনেক বেশি কদাকার ও কণ্টভক্ষ হবে।

إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِّلظَّالِمِينَ---অর্থাৎ আমি যাক্কুম বৃক্ষকে জালিমদের জন্য ফেতনা বানিয়েছি। এক্ষেত্রে কোন কোন তফসীরবিদ ফেতনার অর্থ করেছেন আযাব। অর্থাৎ এ বৃক্ষকে আযাবের হাতিয়ার বানিয়েছি। কিন্তু অধিকাংশ তফসীরবিদের বক্তব্য এই যে, ফেতনার অর্থ 'পরীক্ষা' করা অধিক উপযুক্ত। উদ্দেশ্য এই যে, এ বৃক্ষের আলোচনা করে আমি পরীক্ষা করতে চাই যে, কে এর প্রতি বিশ্বাস করে, আর কে বিদ্রূপ করে? সেমতে আরবের কাফিররা এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে ব্যর্থ হয়েছে। তারা এ আযাবকে ভয় করে বিশ্বাস স্থাপন করার পরিবর্তে উপহাস ও ঠাট্টার পথ বেছে নিয়েছে। বর্ণিত আছে যে, কাফিরদেরকে যাক্কুম খাওয়ানোর আলোচনা-সম্বলিত আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হলে আবু জাহল তার সহচরদেরকে বলল ঃ তোমাদের বন্ধু (মুহাম্মদ) বলে যে, আগুনের ভেতরে নাকি একটি বৃক্ষ আছে, অথচ আগুন বৃক্ষকে হজম করে ফেলে। খোদার কসম, আমরা জানি যে, খেজুর ও মাখনকে যাক্কুম বলা হয়। অতএব এসো এই খেজুর ও মাখন খেয়ে নাও।---(দুররে মনসুর)। আসলে বর্বরীয় ভাষায় খেজুর ও মাখনকে যাক্কুম বলা হয়। তাই আবু জাহল বিদ্রূপের এই পন্থা অবলম্বন করেছে। আল্লাহ্ তা'আলা একটি মাত্র বাক্যে উভয় বিষয়ের জওয়াব দিয়ে দিয়েছেন ঃ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ অর্থাৎ যাক্কুম তো জাহান্নামের গভীরে উদ্‌গত একটি বৃক্ষ। কাজেই এর অর্থ খেজুর ও মাখন নয় এবং আগুনের ভেতরে বৃক্ষ থাকার আপত্তিও যুক্তিসঙ্গত নয়। বৃক্ষটি যখন আগুনেই জন্ম লাভ করে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা এতে এমন বৈশিষ্ট্য দিয়ে রেখেছেন যে, তা আগুনে পুড়ে যাওয়ার পরিবর্তে আগুনের সাহায্যে বিকশিত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ আগুনের মধ্যে জীবিত থাকতে পারে, এমন অনেক প্রাণী পৃথিবীতেও বিদ্যমান রয়েছে। আগুন তাদেরকে দহন করার পরিবর্তে আরও বিকশিত করে।

طلعها كانه رؤوس الشيطين—এতে যাক্কুম ফলকে শয়তানের মাথার সাথে তুলনা করা হয়েছে। কেউ কেউ এখানে شيطين-এর অনুবাদ করেছেন সাপ। অর্থাৎ যাক্কুম ফল সাপের ফণার মত হয়ে থাকে। উর্দুতে একে 'নাগফন' (ফণিমনসা) এ কারণেই বলা হয়। কিন্তু অধিকাংশ তফসীরবিদ বলেন যে, এখানে شيطين বলে তার সাধারণ অর্থই বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, যাক্কুম ফল শয়তানের মাথার ন্যায় কুৎসিত। এখানে এরূপ প্রশ্ন করা উচিত নয় যে, শয়তানকে তো কেউ দেখেনি, সুতরাং তার সাথে তুলনা করার মানে কি? জওয়াব এই যে, এটি একটি কল্পনাভিত্তিক তুলনা। সাধারণ বাকপদ্ধতিতে বিশ্রী ও কুৎসিত বস্তুকে শয়তান ও ভূতপ্রেতের সাথে তুলনা করার রীতি প্রচলিত রয়েছে। এর উদ্দেশ্য কেবল চূড়ান্ত পর্যায়ে কদর্যতা বর্ণনা করাই হয়ে থাকে। এখানে ব্যবহৃত তুলনাও এমনি ধরনের।—(রূহুল মা'আনী)

وَلَقَدْ نَادٰىنَا نُوْحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيْبُوْنَ ۝ وَنَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ ۝ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهٗ هُمُ الْبٰقِيْنَ ۝ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْاٰخِرِيْنَ ۝ سَلٰمٌ عَلٰى نُوْحٍ فِي الْعٰلَمِيْنَ ۝ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ۝ اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ۝ ثُمَّ اَغْرَقْنَا الْاٰخَرِيْنَ ۝

(৭৫) আর নূহ আমাকে ডেকেছিল। আর কি চমৎকারভাবে আমি তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম। (৭৬) আমি তাকে ও তার পরিবারবর্গকে এক মহা সংকট থেকে রক্ষা করেছিলাম (৭৭) এবং তার বংশধরদেরকেই আমি অবশিষ্ট রেখেছিলাম। (৭৮) আমি তার জন্য পরবর্তীদের মধ্যে এ বিষয় রেখে দিয়েছি যে, (৭৯) বিশ্ববাসীর মধ্যে নূহের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। (৮০) আমি এভাবেই সৎকর্মপরায়ণদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি। (৮১) সে ছিল আমার ঈমানদার বান্দাদের অন্যতম। (৮২) অতপর আমি অপরাপর সবাইকে নিমজ্জিত করেছিলাম।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর নূহ (আ) আমাকে (সাহায্যের জন্য) ডেকেছিল (অর্থাৎ প্রার্থনা করেছিল।) আর (আমি তাকে সাহায্য করেছিলাম এবং) আমি প্রার্থনার চমৎকার সাড়াদানকারী। আমি তাকে ও তার অনুসরণকারীদেরকে এক মহা সংকট থেকে (যা কাফিরদের

মিথ্যারোপ ও উৎপীড়নের কারণ দেখা দিয়েছিল) রক্ষা করেছিলাম (অর্থাৎ জলোচ্ছ্বাসের মাঝে কাফিরদেরকে নিমজ্জিত করেছিলাম এবং তার অনুসারীদেরকে উদ্ধার করেছিলাম।) এবং আমি তার বংশধরদেরকেই অবশিষ্ট রেখেছিলাম। (পরবর্তীতে অন্য কারও বংশপরম্পরা প্রচলিত থাকেনি।) আমি তার জন্য পরবর্তীদের মধ্যে এ বিষয় (সুদীর্ঘ কালের জন্য) প্রচলিত রেখেছি যে, বিশ্ববাসীর মধ্যে নূহের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। (অর্থাৎ আল্লাহ্ করুন, তার প্রতি সমগ্র বিশ্ববাসী--জিন-ইনসান ও ফেরেশতাকুল সালাম প্রেরণ করুক।) আমি খাঁটি বান্দাদেরকে এমনিভাবে পুরস্কৃত করে থাকি। নিশ্চয় সে ছিল আমার ঈমানদার বান্দাদের অন্যতম। অতপর আমি অন্য (পন্থী) লোকদেরকে (অর্থাৎ কাফিরদেরকে) নিমজ্জিত করেছিলাম।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতে আলোচনা ছিল যে, প্রথম উম্মতদের কাছেও সতর্ককারী পয়গম্বর প্রেরিত হয়েছিলেন, অধিকাংশ লোকই তাদের কথা মানেনি। ফলে তাদের পরিণতি খুবই অশুভ হয়েছে। এখানে এরই কিছু বিশদ বিবরণ পেশ করা হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে কয়েকজন পয়গম্বরের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে সর্ব প্রথম হযরত নূহ (আ)-এর ঘটনা বিবৃত হয়েছে। অবশ্য তা বিস্তারিতভাবে সূরা হুদে বর্ণিত হয়েছে। এখানে বিশেষভাবে আয়াতসমূহের সাথে সংশ্লিষ্ট কতিপয় বিষয় উল্লেখ করা হচ্ছে।

وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ— এতে বলা হয়েছে যে, হযরত নূহ (আ) আমাকে ডাক দিয়েছিলেন। অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে এখানেও 'ডাকা' বলতে সূরা নূহে উল্লিখিত নূহ (আ)-এর رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا (অর্থাৎ পরওয়ারদিগার, পৃথিবীতে কাফিরদের মধ্য থেকে একজন বাসিন্দাকেও অবশিষ্ট রেখ না,) দোয়া বোঝানো হয়েছে। অথবা সূরা কমরে উল্লিখিত এই দোয়া বোঝানো হয়েছে أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ—(আমি পরাভূত, আমাকে সাহায্য কর।) স্বজাতির উপর্যুপরি অবাধ্যতার পর হযরত নূহ (আ) এ দোয়া তখন করেছিলেন, যখন তাঁর গোত্র তাঁর প্রতি মিথ্যারোপ করেই ক্ষান্ত থাকেনি, উপরন্তু তাঁকে হত্যা করার পরিকল্পনা তৈরি করেছিলেন।

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ—(আমি তার বংশধরকেই অবশিষ্ট রেখেছি।)

অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে এ আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, হযরত নূহ (আ)-র সময়ে আগত জলোচ্ছ্বাসে পৃথিবীর অধিকাংশ জনবসতি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। এর

পর তাঁরই তিন পুত্র থেকে সারাবিশ্বে মানব গোষ্ঠী বিস্তার লাভ করে। তাঁর এক পুত্রের নাম ছিল 'সাম' তারই সন্তান-সন্ততি থেকে আরব ও পারস্যবাসীদের বংশধারা শুরু হয়। দ্বিতীয় পুত্রের নাম ছিল 'হাম'। আফ্রিকান দেশসমূহের জনবসতি তার বংশধর থেকে প্রসারিত হয়। কেউ কেউ ভারতবর্ষের অধিবাসীদেরকেও এ বংশের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তৃতীয় পুত্র ছিল 'ইয়াফেছ'। তার সন্তানদের থেকে তুর্কী, মঙ্গোলীয় এবং ইয়াজুজ-মাজুজের বংশ নির্গত হয়। হযরত নূহ (আ)-র নৌকায় আরোহণ করে প্রাণ রক্ষা করতে যারা সক্ষম হয়েছিল তাদের মধ্যে নূহ (আ)-র এ তিন পুত্র ছাড়া অন্য কারও বংশ বিস্তার লাভ করেনি।

তবে অতি অল্পসংখ্যক আলিম এ বিষয়ের প্রবক্তা যে, নূহ (আ)-র তুফান বিশ্বগ্রাসী ছিল না বরং কেবল আরব ভূমিতেই সীমাবদ্ধ ছিল। তাদের মতে আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আরব ভূমিতে কেবল নূহ (আ)-র সন্তানগণ অবশিষ্ট ছিল এবং তাদের থেকেই আরবদের বংশ বিস্তৃতি লাভ করে। দুনিয়ার অন্যান্য ভূ-খণ্ডে অন্যদের বংশ বিস্তৃতি লাভ করেনি, একথা আয়াত থেকে বোঝা যায় না। ----(বয়ানুল কোরআন)

তৃতীয় একদল তফসীরবিদ বলেন, নূহের তুফান বিশ্বগ্রাসীই ছিল এবং দুনিয়ার বংশধর কেবল নূহ (আ)-র পুত্রত্রয় থেকে নয়, বরং নৌকায় যারা আরোহণ করেছিল তাদের সন্তানবর্গ থেকেও বিস্তার লাভ করেছে। তারা বলেন, আয়াতের আসল উদ্দেশ্য একথা বর্ণনা করা যে, নিমজ্জিতদের বংশ বিস্তার লাভ করেনি।----(কুরতুবী)

কোরআন পাকের পূর্বাপর বর্ণনাদৃষ্টে তৃতীয় উক্তি খুবই দুর্বল, প্রথম উক্তি সর্বোত্তম। কারণ, কোন কোন হাদীস থেকেও এমতের সমর্থন পাওয়া যায়, যা ইমাম তিরমিযী প্রমুখ হুযুরে আকরাম (সা) থেকে এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সরাসরি উদ্ধৃত করেছেন। হযরত সামুরাহ্ ইবনে জুন্দুব বর্ণিত রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন: সাম আরববাসীদের আদি পিতা, হাম আবিসিনিয়াবাসীদের এবং ইয়াফেছ রোমকদের আদি পুরুষ।----(রূহুল মা'আনী)

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ سَلَامٌ عَلٰى نُوْحٍ فِى الْعٰلَمِيْنَ---(আমি তার জন্য পরবর্তীদের মধ্যে এ বিষয়টি প্রচলিত রেখেছি যে, নূহের প্রতি সালাম বর্ষিত হোক বিশ্ববাসীদের মধ্যে।) এর মর্মার্থ এই যে, আমি নূহ (আ)-র পরবর্তী লোক-দের দৃষ্টিতে তাকে সম্মানিত ও মহিমান্বিত করে দিয়েছি। ফলে তারা কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর জন্য নিরাপত্তার দোয়া করতে থাকবে। বাস্তব ঘটনাও তাই। সুতরাং বিশ্বের সমস্ত আসমানী ধর্মশাস্ত্রে [হযরত নূহ (আ)-র নবুয়ত ও পবিত্রতায় বিশ্বাসী মুসলমানদের কথা তো বলাই বাহুল্য, ইহুদী ও খৃস্টানরাও তাঁকে নিজেদের নেতা বলে মান্য করে।

وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ ﴿٨٣﴾ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٨٤﴾ إِذْ قَالَ
لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ ﴿٨٥﴾ أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ ﴿٨٦﴾
فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٨٧﴾ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ ﴿٨٨﴾ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ﴿٨٩﴾
فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ ﴿٩٠﴾ فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿٩١﴾ مَا لَكُمْ
لَا تَنْطِقُونَ ﴿٩٢﴾ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ ﴿٩٣﴾ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ ﴿٩٤﴾ قَالَ
أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ ﴿٩٥﴾ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾ قَالُوا ابْنُوا لَهُ
بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ ﴿٩٧﴾ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ ﴿٩٨﴾

(৮৩) আর নূহপন্থীদেরই একজন ছিল ইবরাহীম। (৮৪) যখন সে তার পালনকর্তার নিকট সুস্থ চিত্তে উপস্থিত হয়েছিল, (৮৫) যখন সে তার পিতা ও সম্প্রদায়কে বলেছিল ঃ তোমরা কিসের উপাসনা করছ? (৮৬) তোমরা কি আল্লাহ্ ব্যতীত মিথ্যা উপাস্য কামনা করছ? (৮৭) বিশ্বজগতের পালনকর্তা সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কি? (৮৮) অতঃপর সে একবার তারকাদের প্রতি লক্ষ্য করল, (৮৯) এবং বলল ঃ আমি পীড়িত হতে যাচ্ছি। (৯০) অতপর তারা তার প্রতি পিঠ ফিরিয়ে চলে গেল। (৯১) অতঃপর সে তাদের দেবালয়ে গিয়ে ঢুকল এবং বলল ঃ তোমরা খাচ্ছ না কেন? (৯২) তোমাদের কি হল যে, কথা বলছ না? (৯৩) অতঃপর সে প্রবল আঘাতে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। (৯৪) তখন লোকজন তার দিকে ছুটে এলো ভীত-সন্ত্রস্ত পদে (৯৫) সে বলল ঃ তোমরা স্বহস্তে নির্মিত পাথরের পূজা কর কেন? (৯৬) অথচ আল্লাহ্ তোমাদেরকে এবং তোমরা যা নির্মাণ করছ সবাইকে সৃষ্টি করেছেন। (৯৭) তারা বলল ঃ এর জন্যে একটি ভিত নির্মাণ কর এবং অতপর তাকে আগুনের স্তূপে নিক্ষেপ কর। (৯৮) তারপর তারা তার বিরুদ্ধে মহা ষড়যন্ত্র আঁটতে চাইল, কিন্তু আমি তাদেরকেই পরাভূত করে দিলাম।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর ইবরাহীমও ছিলেন নূহপন্থীদের একজন [অর্থাৎ তাদের একজন ছিলেন যারা মৌলিক বিশ্বাসে নূহ (আ)-এর সাথে একমত ছিল। তাঁর সে ঘটনা স্মরণযোগ্য,] যখন তিনি সুস্থচিত্তে তাঁর পরওয়ারদিগারের প্রতি মনোনিবেশ করলেন। ('সুস্থ চিত্তে'----অর্থ, তাঁর অন্তর কুবিশ্বাস ও লৌকিকতার প্রেরণা থেকে মুক্ত ছিল।)

যখন তিনি (মূর্তিপূজারী) পিতা ও স্বগোত্রীয় লোকদেরকে বললেনঃ তোমরা কি (তুচ্ছ) বস্তুর পূজা করছ? তোমরা কি মিছেমিছি দেবতাদেরকে আল্লাহ্‌র পরিবর্তে উপাস্য সাব্যস্ত করতে চাও? তাহলে বিশ্বজগতের পালনকর্তা সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কি? [অর্থাৎ তোমরা যে তাঁর ইবাদত বর্জন করে রেখেছ তাতে তার উপাস্য হওয়ার ব্যাপারে তোমাদের কি কোন সন্দেহ আছে? প্রথমত এরূপ সন্দেহ থাকা উচিত নয়। যদি থাকে, তবে তা দূর করা উচিত। -মোটকথা, ইবরাহীম এবং তাদের মাঝে প্রায়ই এমনি ধরনের বাকবিতণ্ডা চলত। এক দিনের ঘটনা, সেটি তাদের কোন পর্বের দিন ছিল। তারা ইবরাহীম (আ)-কেও মেলায় নিয়ে যেতে চাইল।] কিন্তু ইবরাহীম (আ) তারকাদের প্রতি একবার চাইলেন এবং বললেনঃ আমি পীড়িত হতে যাচ্ছি। (কাজেই মেলায় যেতে পারছি না।) তারা (তাঁর এই অজুহাত শুনে তাঁকে ছেড়ে চলে গেল। কারণ, পীড়িত হয়ে পড়লে তিনি নিজে এবং তাঁর কারণে অন্যরাও কষ্ট করবে।) তখন তিনি তাদের দেবালয়ে গিয়ে প্রবেশ করলেন এবং (উপহাসচ্ছলে প্রতিমাদেরকে) বললেনঃ তোমরা (সামনে রাখা এসব নৈবেদ্য) খাচ্ছ না কেন? (তাছাড়া তোমাদের কি হল যে, কথাও বলছ না? অতঃপর তিনি সজোরে প্রহার করতে করতে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন (এবং কুড়াল মেরে মেরে সব চুরমার করে দিলেন।) অতপর (গোত্রের লোকেরা যখন জানতে পারল, তখন) তারা তার কাছে অস্থির হয়ে (ক্রোধভরে) ছুটে এল (এবং কথা কাটাকাটি শুরু হল)। তিনি বললেনঃ তোমরা কি এমন বস্তুর পূজা কর, যা নিজেরাই (স্বহস্তে) নির্মাণ কর? (যে বস্তু তোমাদের মুখাপেক্ষী, সে উপাস্য হবে কেমন করে?) অথচ তোমাদেরকে এবং তোমাদের নির্মিত এসব বস্তুসামগ্রীকে আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন। (সুতরাং তাঁরই ইবাদত করা উচিত।) তারা (যখন তর্কে হেরে গেল, তখন রাগান্বিত হয়ে পরস্পর) বলতে লাগলঃ ইবরাহীমের জন্য একটি অগ্নিকুণ্ড তৈরি কর (এবং তাতে আগুন জ্বালিয়ে) তাকে সে জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ কর। মোটকথা, তারা তাঁর বিরুদ্ধে মন্দাচরণ করতে চেয়েছিল (এবং মনে করেছিল, তিনি ধ্বংস হয়ে যাবেন)। অতপর আমি তাদেরকেই বিধ্বস্ত করে দিয়েছি। (বিস্তারিত কাহিনী সূরা আম্বিয়ায় বর্ণিত হয়েছে।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

হযরত নূহ্ (আ)-এর ঘটনার পর কোরআন পাক হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পূতঃপবিত্র জীবনের দু'টি ঘটনা উল্লেখ করেছে। উভয় ঘটনায় হযরত ইবরাহীম (আ) আল্লাহ্‌র জন্য অপূর্ব ত্যাগের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন। আলোচ্য আয়াতসমূহে তাঁকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করার প্রথম ঘটনাটি বিবৃত হয়েছে, যার বিশদ বিবরণ সূরা আম্বিয়ায় বর্ণিত হয়েছে। তবে এখানে ঘটনাটি যে ভঙ্গিতে বর্ণনা করা হয়েছে, তাতে কয়েকটি বিষয় ব্যাখ্যাসাপেক্ষ বটে।

وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ —মৌলিক মতবাদ ও পন্থা-পদ্ধতিতে একমত

ব্যক্তিবর্গের দলকে আরবী ভাষায় شِيْعَةٌ বলা হয়। এখানে شِيْعَتِهٖ শব্দের সর্বনাম দ্বারা বাহ্যত নূহ (আ)-কে বোঝানো হয়েছে। তাই আয়াতের মর্মার্থ এই দাঁড়ায় যে, হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁর পূর্বসূরি পয়গম্বর নূহ (আ)-এর পন্থাবলম্বী ছিলেন এবং ধর্মের মৌলিক নীতিসমূহে উভয়ের পরিপূর্ণ ঐকমত্য ছিল। উভয়ের শরীয়তও একই রকম অথবা কাছাকাছি হওয়াও সম্ভব। উল্লেখ্য যে, কোন কোন ঐতিহাসিক রেওয়ায়েত অনুযায়ী হযরত নূহ ও হযরত ইবরাহীম (আ)-এর মাঝখানে দু'হাজার ছ'শ চল্লিশ বছরের ব্যবধান ছিল। তাদের মাঝখানে হযরত হূদ ও সালেহ্ (আ) ব্যতীত কোন নবী আবির্ভূত হন নি।——(কাশশাফ)

إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ——এর নির্ভেজাল শাব্দিক অনুবাদ এই যে, যখন তিনি আগমন করলেন তাঁর পালনকর্তার নিকট পরিচ্ছন্ন অন্তরে। আল্লাহ্‌র নিকট আগমন করার অর্থ আল্লাহ্‌র দিকে রুজু করা, তাঁর প্রতি মনোনিবেশ করা এবং তাঁর ইবাদত করা। এর সাথে 'পরিচ্ছন্ন মন নিয়ে' কথাটি যুক্ত করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র কোন ইবাদত ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য নয়, যতক্ষণ ইবাদত-কারীর মন ভ্রান্ত বিশ্বাস ও মন্দ প্রেরণা থেকে পবিত্র না হয়। ভ্রান্ত বিশ্বাসসহ কোন ইবাদত করলে ইবাদতকারী তাতে যত শ্রমই স্বীকার করুক না কেন, তা গ্রহণযোগ্য নয়। এমনিভাবে ইবাদতকারীর আসল লক্ষ্য আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির পরিবর্তে লোক দেখানো অথবা কোন বৈষয়িক লাভ হলে সে ইবাদত প্রশংসার যোগ্য নয়। আল্লাহ্‌র দিকে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর রুজু হওয়া এসব সংমিশ্রণ থেকে পবিত্র ছিল।

فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ——এসব আয়াতের পটভূমিকা এই যে, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সম্প্রদায় এক বিশেষ দিনে উৎসব উদযাপন করত। সে পর্বের দিনে তারা ইবরাহীম (আ)-কেও আমন্ত্রণ জানাল যে, আপনিও আমাদের সাথে উৎসবে যোগদানের জন্য চলুন। উদ্দেশ্য, হযরত ইবরাহীম (আ) উৎসবে যোগদান করলে হয়তো তাদের ধর্মের প্রতি প্রভাবান্বিত হয়ে পড়বেন এবং নিজের ধর্মের দাওয়াত পরিত্যাগ করবেন।——(দুররে মনসুর, ইবনে জরীর)। কিন্তু হযরত ইবরাহীম (আ) মনে মনে এই সুযোগকে অন্যভাবে ব্যবহার করার মতলব আঁটছিলেন। তাঁর পরিকল্পনা ছিল যে, যখন গোটা সম্প্রদায় উৎসব উদযাপন করতে চলে যাবে, তখন আমি তাদের দেবমন্দিরে প্রবেশ করে প্রতিমাসমূহকে ভেঙ্গে চুরমার করে দেব। যাতে তারা ফিরে এসে মিথ্যা উপাস্যদের অসহায়ত্বের বাস্তব দৃশ্য স্বচক্ষে দেখে নিতে পারে। হয়তো এতে করে তাদের কারো কারো অন্তরে নিজেদের প্রতিমাসমূহকে অসহায় ও অক্ষম দেখে ঈমান জাগ্রত হবে এবং সে শিরক থেকে তওবা করে নেবে। এ উদ্দেশ্যে হযরত ইবরাহীম (আ) সম্প্রদায়ের লোকদের সাথে উৎসবে যেতে অস্বীকার করলেন। আর অস্বীকারের পথ এই বেছে নিলেন যে, প্রথমে তারকার

দিকে গভীর দৃষ্টিপাত করলেন এবং অতপর বললেনঃ আমি অসুস্থ। সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁকে অপারগ মনে করে ছেড়ে দিল এবং উৎসব উদযাপনে চলে গেল।

এ ঘটনার সাথে একাধিক তফসীর ও ফিকাহ্ সংক্রান্ত আলোচনার সম্পর্ক রয়েছে। নিম্নে যেসব আলোচনার সারমর্ম উল্লেখ করা হল।

তারকার দিকে দৃষ্টিপাত করার উদ্দেশ্যঃ সর্বপ্রথম আলোচনা এই যে, জওয়াব দানের পূর্বেই ইবরাহীম (আ) যে তারকার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তার উদ্দেশ্য কি ছিল? কেউ কেউ বলেনঃ এটা নিছক একটা উদ্দেশ্যহীন ও অনিচ্ছাধীন কর্ম ছিল। কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় চিন্তা করার সময় মানুষ মাঝে মাঝে অজ্ঞাতে ও অনিচ্ছায় আকাশের দিকে দেখতে থাকে। হযরত ইবরাহীম (আ)-কে যখন উৎসবে যোগদান করার দাওয়াত দেওয়া হল, তখন তিনি ভাবতে লাগলেন যে, এ দাওয়াত কিভাবে এড়ানো যায়। এই ভাবনার মধ্যেই তিনি অনিচ্ছায় তারকারাজির দিকে দেখতে থাকেন এবং এরপর জওয়াব দেন। এ ব্যাখ্যাটি বাহ্যত অমলিন মনে হলেও কোরআন পাকের বর্ণনাভঙ্গির আলোকে একে সঠিক বলে মেনে নেওয়া কঠিন। কারণ, প্রথমত কোরআন পাকের বর্ণনাপদ্ধতি এই যে, সে ঘটনাবলীর কেবল গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী অংশই বর্ণনা করে এবং অনাবশ্যক বিবরণ বাদ দেয়। খোদ আলোচ্য আয়াতসমূহেই ঘটনার বেশ কয়েকটি অংশ উহ্য রয়েছে। এমনকি, ঘটনার পূর্ণ পটভূমিও বর্ণনা করা হয়নি। এটা বিশ্বাস করা সম্ভবপর নয় যে, কোরআন পাক ঘটনার পটভূমিকা তো দীর্ঘ হয়ে যাওয়ার আশংকায় বাদ দিয়েছে অথচ ঘটনার সাথে দূরের সম্পর্কও রাখে না, এমন একটি নিশ্চিত অনিচ্ছাধীন কর্ম পূর্ণ এক আয়াতে ব্যক্ত করেছে। দ্বিতীয়ত তারকারাজিকে দেখার মধ্যে বিশেষ কোন রহস্য না থাকলে এবং এটা নিতান্তই অনিচ্ছাধীন কর্ম হলে আরবী ব্যাকরণ দৃষ্টে فَنَظَرَ نَظْرَةً اِلَى النُّجُوْمِ বলা উচিত ছিল---

فِى النُّجُوْمِ নয়।

এ থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, তারকারাজিকে দেখার মধ্যে ইবরাহীম (আ)-এর দৃষ্টিতে কোন বিশেষ উপযোগিতা বিদ্যমান ছিল। তাই কোরআন পাকও গুরুত্ব সহকারে এর উল্লেখ করেছে। এখন সে উপযোগিতা কি ছিল? এ প্রশ্নের জওয়াবে অধিকাংশ তফসীরবিদ বলেনঃ প্রকৃতপক্ষে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সম্প্রদায় জ্যোতিঃশাস্ত্রের নিতান্ত ভক্ত ছিল। তারা তারকারাজি দেখে দেখে নিজেদের কাজ-কর্ম নির্ধারণ করত। কাজেই হযরত ইবরাহীম (আ) ও তারকারাজির দিকে দেখে জওয়াব দিলেন, যাতে সম্প্রদায়ের লোকেরা মনে করে যে, তিনি নিজের অসুস্থতা সম্পর্কে যা বলেছেন, তা ভিত্তিহীন নয়, বরং তারকারাজির গতিবিধি লক্ষ্য করেই বলেছেন। ইবরাহীম (আ) নিজে যদিও জ্যোতিঃশাস্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন না; কিন্তু উৎসবে যোগদান থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য তিনি সে পন্থাই অবলম্বন করলেন, যা তাদের দৃষ্টিতে অধিক-

তর নির্ভরযোগ্য ছিল। তিনি মুখে জ্যোতিঃশাস্ত্রের কোন বরাত দেন নি এবং এ কথাও বলেন নি যে, তারকারাজিকে দেখার উদ্দেশ্য জ্যোতিঃশাস্ত্রের সাহায্য নেওয়া। তাই এতে মিথ্যার নাম-গন্ধও আবিষ্কার করা যায় না।

এখানে সন্দেহ হতে পারে যে, ইবরাহীম (আ)-এর এই কর্ম দ্বারা হয়তো সে কাফিররা উৎসাহিত হয়ে থাকবে, যারা কেবল জ্যোতিঃশাস্ত্রেই বিশ্বাসী ছিল না, বরং জগতের কাজ-কারবারে তারকারাজিকে সত্যিকার প্রভাবশালী বলেও মনে করত। এর জওয়াব এই যে কাফিররা উৎসাহিত তখন হত, যখন ইবরাহীম (আ) পরবর্তী সময়ে পরিষ্কারভাবে তাদের পথভ্রষ্টতা বর্ণনা না করতেন। এখানে তো যাবতীয় কলাকৌশলই অবলম্বন করা হচ্ছিল তাদেরকে তওহীদের দাওয়াত অধিকতর কার্যকররূপে দেওয়ার উদ্দেশে। সেমতে এ ঘটনার অব্যবহিত পরেই হযরত ইবরাহীম (আ) সম্প্রদায়ের প্রত্যেকটি পথভ্রষ্টতা পুংখানুপুংখরূপে বর্ণনা করেছেন। তাই কেবল এই অস্পষ্ট কর্ম দ্বারা কাফিরদের উৎসাহিত হওয়ার প্রশ্নই উঠে না। এখানে আসল লক্ষ্য ছিল উৎসবে যোগদানের দাওয়াত এড়িয়ে যাওয়া, যাতে তওহীদের দাওয়াতের জন্য অধিক কার্যকর পরিবেশ সৃষ্টি করা যায়। এ লক্ষ্য হাসিলের জন্য অস্পষ্টতার এই পন্থা সম্পূর্ণ যুক্তিভিত্তিক। এর বিরুদ্ধে কোন যুক্তিসঙ্গত আপত্তি উত্থাপন করা যায় না।

উপরোক্ত ব্যাখ্যা অধিকাংশ তফসীরবিদ থেকে বর্ণিত রয়েছে। বয়ানুল কোর-আনেও তাই অবলম্বন করা হয়েছে।

জ্যোতির্বিদ্যার শরীয়তগত মর্যাদা ঃ এখানে দ্বিতীয় আলোচনা এই যে, জ্যোতির্বিদ্যার শরীয়তগত মর্যাদা কি? নিম্নে সংক্ষেপে এ প্রশ্নের জওয়াব দেওয়া হল।

এটা সর্ববাদিসম্মত সত্য যে, আল্লাহ্ তা'আলা চন্দ্র, সূর্য ও তারকারাজির মধ্যে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য সন্নিহিত রেখেছেন, যা মানুষের জীবনে প্রভাব বিস্তার করে। তন্মধ্যে কোন কোন বৈশিষ্ট্য প্রত্যেকেরই দৃষ্টিগোচর হয়। যেমন, সূর্যের কাছে ও দূরে অবস্থানের কারণে গ্রীষ্ম ও শৈত্য দেখা দেওয়া, চন্দ্রের উত্থান-পতনের ফলে সমুদ্রে জোয়ার-ভাটা সৃষ্টি হওয়া ইত্যাদি। এখন কেউ কেউ বলেন যে, তারকারাজির বৈশিষ্ট্য ততটুকুই যতটুকু আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। আবার কেউ কেউ বলেন, এগুলো ছাড়াও তারকারাজির পরিভ্রমণের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, যা মানব জীবনের অধিকাংশ ব্যাপারে প্রভাব বিস্তার করে। কোন তারকার কোন বিশেষ রাশিচক্রে চলে যাওয়া কারও জন্য সুখ ও সাফল্যের কারণ হয় এবং কারও জন্য দুঃখ ও ব্যর্থতার বার্তা বয়ে আনে। এর পর কেউ কেউ তো তারকারাজিকেই সাফল্য ও ব্যর্থতার ব্যাপারে সত্যিকার প্রভাবশালী মনে করে এবং কেউ কেউ বলে যে, সত্যিকার প্রভাবশালী তো আল্লাহ্ তা'আলাই বটে, কিন্তু তিনি তারকারাজিকে এমন বৈশিষ্ট্য দান করেছেন। তাই দুনিয়ার অন্যান্য কারণের ন্যায় তারকারাজিও মানুষের সাফল্য ও ব্যর্থতার এক কারণ হয়ে থাকে।

যারা তারকারাজিকে সত্যিকার প্রভাবশালী মনে করে এবং বিশ্বের বৈপ্লবিক

ঘটনাবলীকে তারকারাজির কারসাজি বলে বিশ্বাস করে, তাদের ধারণা নিঃসন্দেহে ভ্রান্ত ও বাতিল। এ বিশ্বাস মানুষকে শিরকের সীমায় পৌঁছিয়ে দেয়। আরবরা বৃষ্টি সম্পর্কে এরূপ বিশ্বাস পোষণ করত যে, 'নূ' নামক এক বিশেষ তারকা বৃষ্টি নিয়ে আগমন করে এবং বৃষ্টির জন্য এটাই সত্যিকার প্রভাবশালী। রসূলুল্লাহ্ (সা)এ বিশ্বাসের তীব্র নিন্দা করেছেন, যা বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত আছে।

পক্ষান্তরে যারা মনে করে যে, সত্যিকার প্রভাবশালী শক্তি তো আল্লাহ্ তা'আলাই বটে, কিন্তু তিনি তারকারাজিকে এমন বৈশিষ্ট্য দান করেছেন, যা ঘটনার কারণ পর্যায়ে মানব জীবনে প্রভাব বিস্তার করে। উদাহরণত সত্যিকার বৃষ্টি বর্ষণকারী তো আল্লাহ্ তা'আলা, কিন্তু এর বাহ্যিক কারণ মেঘমালা। এমনিভাবে যাবতীয় সাফল্য ও ব্যর্থতার মূল উৎস আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা; কিন্তু তারকারাজি এসব সাফল্য ও ব্যর্থতার কারণ হয়ে যায়। এরূপ বিশ্বাস শিরক নয়। কোরআন ও হাদীস দ্বারা এ বিশ্বাসের সত্যায়নও হয় না, খণ্ডনও হয় না। কাজেই এটা অবান্তর নয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা তারকারাজির পরিভ্রমণ ও তাদের উদয় ও অস্তের মধ্যে এসব প্রভাব নিহিত রেখেছেন। কিন্তু এসব প্রভাব খোঁজ করার জন্য জ্যোতির্বিদ্যা অধ্যয়ন করা, এর প্রতি আস্থা রাখা এবং এর ভিত্তিতে ভবিষ্যত সম্পর্কে ফয়সালা করা সর্বাবস্থায় নিষিদ্ধ ও অবৈধ। হাদীসে এ সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত আছে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন:

اذا ذكر القدر فامسكوا واذا ذكرت النجوم فامسكوا واذا ذكر اصحابى فامسكوا

যখন তকদীরের আলোচনা উঠে, তখন থেমে যাও (অর্থাৎ তাতে অধিক চিন্তাভাবনা ও তর্ক-বিতর্ক করো না), যখন তারকারাজির আলোচনা শুরু হয়, তখন থেমে যাও এবং যখন আমার সাহাবীদের (অর্থাৎ তাদের পারস্পরিক মতবিরোধ ইত্যাদির) আলোচনা উঠে, তখন থেকে যাও।—(এরাকী প্রণীত এহ্ইয়াউল উলুম)

হযরত উমর ফারুক (রা) বলেন:

تعلموا من النجوم ما تهتدون به فى البر والبحر ثم امسكوا

জ্যোতির্বিদ্যা থেকে এতটুকু জ্ঞান অর্জন কর, যতটুকুর সাহায্যে তোমরা স্থলে ও সমুদ্রে রাস্তা জানতে পার। এরপর থেমে যাও।—(গাযযালী প্রণীত এহইয়াউল উলুম)

এই নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে তারকারাজির বৈশিষ্ট্য ও প্রভাব অস্বীকার করা হয়নি। কেবল এসব বৈশিষ্ট্যের পেছনে পড়তে, এগুলোর সন্ধানে মূল্যবান সময় নষ্ট করতে বারণ করা হয়েছে মাত্র। ইমাম গাযযালী (র) এহইয়াউল উলুম গ্রন্থে এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করতে গিয়ে এ নিষেধাজ্ঞার একাধিক কারণ বর্ণনা করেছেন।

জ্যোতির্বিদ্যা নিষিদ্ধ ও নিন্দিত হওয়ার প্রথম কারণ এই যে, যারা এ বিদ্যায় অধিক মনোনিবেশ করে, অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা গেছে, তারা ক্রমান্বয়ে তারকা-

রাজিকেই সবকিছুর নিয়ামক মনে করে বসে। তা তাদেরকে ক্রমান্বয়ে তারকারাজি সত্যিকার প্রভাবশালী—এই মুশরিকসুলভ বিশ্বাসের দিকে নিয়ে যায়।

দ্বিতীয় কারণ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা তারকারাজির মধ্যে কিছু বৈশিষ্ট্য ও প্রভাব রেখে থাকলেও তার নিশ্চিত জ্ঞান লাভের কোন পথ ওহী ব্যতীত আমাদের কাছে নেই। হাদীসে বর্ণিত আছে, হযরত ইদরীস (আ)-কে আল্লাহ্ তা'আলা (ওহীর মাধ্যমে) এ ধরনের কিছু বিদ্যা দান করেছিলেন। কিন্তু সে ওহীভিত্তিক বিদ্যা এখন দুনিয়া থেকে মিটে গেছে। এখন জ্যোতির্বিদ্যাবিশারদদের কাছে যা আছে, তা নিছক অনুমান ও আন্দাজ। এসব অনুমান ও আন্দাজের সাহায্যে কোন নিশ্চিত জ্ঞান লাভ করা যায় না। এ কারণেই জ্যোতির্বিদদের অনেক ভবিষ্যদ্বাণী প্রায়ই ভ্রান্ত প্রমাণিত হতে দেখা যায়। জনৈক পণ্ডিত এ বিদ্যা সম্পর্কে চমৎকার মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেনঃ مفيده غير معلوم و معلومه غير مفيد অর্থাৎ এ বিদ্যার যেটুকু অংশ উপকারী হতে পারে, তা কারও জানা নেই এবং যেটুকু অংশ মানুষের জানা আছে তা উপকারী নয়।

আল্লামা আলুসী রূহুল মা'আনীতে এ প্রসংগে ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর কয়েকটি দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। এসব দৃষ্টান্তে জ্যোতির্বিদ্যার সর্বজনস্বীকৃত নিয়মানুযায়ী একটি ঘটনা যেভাবে সংঘটিত হওয়া উচিত ছিল, বাস্তব ক্ষেত্রে তার সম্পূর্ণ বিপরীত সংঘটিত হয়েছে। সেমতে অনেক বড় বড় পণ্ডিত, যারা এ বিদ্যা অর্জনে আজীবন সাধনা করে-ছেন তারা শেষ পর্যন্ত মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, এ বিদ্যার শেষ ফল অনুমান ও আন্দাজের অধিক কিছুই নয়। খ্যাতনামা জ্যোতির্বিদ কুশিয়ার দায়লমী জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কিত তাঁর গ্রন্থ 'আল মুজমাল ফিল আহকাম'-এ লিখেন ঃ জ্যোতি-র্বিদ্যা একটি প্রমাণবিহীন বিদ্যা। এতে মানুষের মনোগত জল্পনা-কল্পনা ও ধারণার জন্য অনেক ফাঁক রয়েছে।—(রূহুল মা'আনী)

আল্লামা আলুসী আরও কয়েকজন জ্যোতির্বিদের এ ধরনের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। মোটকথা, এটা স্বীকৃত সত্য যে, জ্যোতির্বিদ্যা কোন নিশ্চিত বিদ্যা নয়। এতে সীমাহীন ভুলভ্রান্তির সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু যারা এ বিদ্যা অর্জনে ব্রতী হয়, তারা একে সম্পূর্ণ অকাট্য ও নিশ্চিত বিদ্যারূপে আখ্যায়িত করে, এর ভিত্তিতে ভবিষ্যতের ফয়সালা করে এবং এর কারণেই অন্যদের সম্পর্কে ভালমন্দ মতামত স্থির করে নেয়। সর্বো-পরি এ বিদ্যার মিথ্যা অহমিকা কোন কোন সময় মানুষকে 'ইলমে গায়েব' তথা অদৃশ্য জ্ঞানের দাবি পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়। বলা বাহুল্য, এসব বিষয়ের প্রত্যেকটিই অসংখ্য অনিষ্ট সৃষ্টিতে সহায়ক হয়।

জ্যোতির্বিদ্যা নিষিদ্ধ হওয়ায় তৃতীয় কারণ এই যে, এটা জীবনকে এক নিষ্ফল কাজে ব্যয় করার নামান্তর। যখন এ বিদ্যা থেকে কোন ফলাফল নিশ্চিতরূপে অর্জন করা যায় না, তখন দুনিয়ার কাজকারবারে এ বিদ্যা যে সহায়ক হতে পারে না, তা বলাই বাহুল্য। সুতরাং অনর্থক এক নিষ্ফল বিষয়ের পেছনে পড়া ইসলামী শরীয়তের

মর্ম ও মেযাজের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। তাই এটিকে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

ইবরাহীম (আ)-এর অসুস্থতার তাৎপর্য ঃ আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে তৃতীয় আলোচনা এই যে, হযরত ইবরাহীম (আ) স্বগোত্রের আমন্ত্রণের জওয়াবে বলেছিলেন ঃ إِنِّي سَقِيمٌ আমি অসুস্থ। এখানে প্রশ্ন এই যে, তিনি কি বাস্তবিকই তখন অসুস্থ ছিলেন? কোরআন পাকে এ সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট বর্ণনা নেই। কিন্তু সহীহ্ বুখারীর এক হাদীস থেকে জানা যায়, তিনি তখন এমন অসুস্থ ছিলেন না যে, মেলায় যেতে পারেন না। তাই প্রশ্ন উঠে তিনি এ কথা কেমন করে বললেন?

অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে এর জওয়াব এই যে, প্রকৃতপক্ষে এ বাক্যের সাহায্যে হযরত ইবরাহীম (আ)-'তওরিয়া' করেছিলেন। তওরিয়ার অর্থ এমন কথা বলা, যার বাহ্যিক অর্থ বাস্তবের প্রতিকূলে এবং বক্তার উদ্দিষ্ট অর্থ বাস্তবের অনুকূলে। এখানে ইবরাহীম (আ)-এর বাক্যের বাহ্যিক অর্থ তো এটাই যে, 'আমি এখন অসুস্থ, কিন্তু তাঁর আসল উদ্দিষ্ট অর্থ তা ছিল না। আসল অর্থ কি ছিল, সে সম্পর্কে তফসীরবিদগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। কেউ বলেন, এতে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল মানসিক সঙ্কোচন, যা স্বগোত্রের মুশরিকসুলভ কাণ্ডকীর্তি দেখে দেখে তার মধ্যে সৃষ্টি হচ্ছিল। এখানে سَقِيمٌ শব্দের ব্যবহার থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। কারণ, এটা مَرِيضٌ শব্দের অপেক্ষা অর্থের দিক দিয়ে অনেকটা হাল্কা। 'আমার মন খারাপ' বলেও এ অর্থ অনেকটা ব্যক্ত করা যায়। বলা বাহুল্য, এ বাক্যে 'মানসিক সঙ্কোচন' অর্থেরও পুরোপুরি অবকাশ রয়েছে।

কেউ কেউ বলেন, إِنِّي سَقِيمٌ বলে ইবরাহীম (আ)-এর উদ্দেশ্য ছিল এই যে, আমি অসুস্থ হয়ে পড়ব। কারণ, আরবী ভাষায় اسم فاعل-এর পদবাচ্য বহুল পরিমাণে ভবিষ্যত কালের জন্য ব্যবহৃত হয়। কোরআন পাকে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে ঃ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ-এর বাহ্যিক অর্থ এমনও হতে পারে——আপনিও মৃত এবং তারাও মৃত। কিন্তু এখানে এরূপ অর্থ উদ্দেশ্য নয়, বরং অর্থ এই যে, আপনিও মৃত্যুবরণ করবেন এবং তারাও মৃত্যুবরণ করবে। এমনি-ভাবে হযরত ইবরাহীম (আ) إِنِّي سَقِيمٌ-এর অর্থ নিয়েছিলেন যে, 'আমি অসুস্থ হয়ে পড়ব।' এ কথা বলার কারণ এই যে, মৃত্যুর পূর্বে প্রত্যেক মানুষের অসুস্থ হওয়া স্থির নিশ্চিত। কেউ বাহ্যিকভাবে অসুস্থ না হলেও মৃত্যুর কিছুক্ষণ পূর্বে মন-মেযাজে ত্রুটি সংঘটিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

যদি কেউ এসব ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট না হয়, তবে সর্বোত্তম ব্যাখ্যা এই যে, হযরত ইবরাহীম (আ) তখন বাস্তবিকই অল্পবিস্তর অসুস্থ ছিলেন; তবে উৎসবে যোগদানে প্রতিবন্ধক হতে পারে, এমন অসুস্থতা ছিল না। তিনি তাঁর মামুলী অসুস্থতার কথাই

এমনভাবে ব্যক্ত করেছেন, যাতে শ্রোতারা মনে করে নেয় যে, তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। কাজেই মেলায় যাওয়া সম্ভবপর নয়। ইবরাহীম (আ)-এর তওরিয়ার এ ব্যাখ্যা সর্বাধিক যুক্তিযুক্ত এবং সন্তোষজনক। সহীহ্ বুখারীর এক হাদীসে ইবরাহীম (আ)-এর উক্তি إِنِّي سَقِيمٌ -এর জন্যে كَذِبٌ (মিথ্যা) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। উপরোক্ত ব্যাখ্যা দৃষ্টে এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, এর অর্থ তওরিয়া, যা বাহ্যিক আকার-আকৃতিতে মিথ্যা মনে হয়, কিন্তু বক্তার উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য করলে মিথ্যা হয় না। এ হাদীসেরই কোন কোন রেওয়ায়েতে আরও বলা হয়েছে ঃ ما منها كذبة إلا ما حل بها عن دين الله অর্থাৎ এগুলোর মধ্যে কোন মিথ্যা এরূপ নয়, যা আল্লাহ্র দীনের প্রতিরক্ষা ও সমর্থনে বলা হয়নি।

এ বাক্যটি পরিষ্কার করে দিয়েছে যে, এখানে كذب শব্দটি সাধারণ অর্থ থেকে ভিন্ন অর্থ রাখে। এ হাদীস সম্পর্কে কিছুটা বিস্তারিত বিবরণ সূরা আম্বিয়ার بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ আয়াতের অধীনে পূর্ণ বর্ণিত হয়েছে।

তওরিয়ার শরীয়তসম্মত বিধান ঃ আলোচ্য আয়াতসমূহ থেকে এ বিষয়ও জানা যায় যে, প্রয়োজনের ক্ষেত্রে তওরিয়া করা জায়েয। তওরিয়া দুই প্রকার। এক. উক্তিগত। অর্থাৎ এমন কথা বলা, যার বাহ্যিক অর্থ বাস্তব ঘটনার প্রতিকূল, কিন্তু বক্তার উদ্দিষ্ট অর্থ বাস্তব ঘটনার অনুকূল। দুই. কর্মগত। অর্থাৎ এমন কাজ করা, যার প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধারণ দর্শকের বুঝে নেওয়া উদ্দেশ্য থেকে ভিন্ন। একে 'ঈহাম'-ও বলা হয়। তারকারাজির দিকে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দৃষ্টিপাত করা অধিকাংশ তফসীরবিদের উক্তি অনুযায়ী ঈহামই ছিল এবং নিজেকে অসুস্থ বলা ছিল তওরিয়া।

প্রয়োজনের ক্ষেত্রে উপরোক্ত উভয় প্রকার তওরিয়া স্বয়ং রসূলে করীম (সা) থেকে প্রমাণিত রয়েছে। তিনি যখন মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনার পথে ছিলেন এবং কাফিররা তাঁর সন্ধানে ব্যাপৃত ছিল, তখন পথে এক ব্যক্তি হযরত আবূ বকর (রা)-কে তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল ঃ ইনি কে? হযরত আবূ বকর জওয়াব দিলেন ঃ هو هاد يهديني "ইনি আমার পথপ্রদর্শক। আমাকে পথ দেখান।" শ্রোতা মনে করল যে, সাধারণ পথ প্রদর্শক বোঝানো হয়েছে। তাই সে চলে গেল। অথচ হযরত আবূ বকরের উদ্দেশ্য ছিল 'ইনি আমার ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক পথ প্রদর্শক!' (রূহুল মা'আনী)

এমনিভাবে হযরত কা'ব ইবনে মালেক (রা) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিহাদের জন্য কোন দিকে যেতে হলে মদীনা থেকে বের হওয়ার সময় সেদিকে রওয়ানা হওয়ার পরিবর্তে অন্যদিকে রওয়ানা হতেন, যাতে দর্শকরা সঠিক গন্তব্যস্থল জানতে না পারে। এটা ছিল কর্মগত তওরিয়া তথা ঈহাম।---(মুসলিম)

কৌতুক ও হাস্যরসের ক্ষেত্রেও রসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে তওরিয়ার প্রমাণ আছে। শামায়েলে তিরমিযীতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ (সা) একবার এক বৃদ্ধাকে দেখে কৌতুক-ছলে বললেনঃ কোন বৃদ্ধা জান্নাতে যাবে না। বৃদ্ধা একথা শুনে হায় আফসোস শুরু করলে তিনি এর ব্যাখ্যা করে বললেনঃ বৃদ্ধাদের জান্নাতে না যাওয়ার অর্থ এই যে, তারা বৃদ্ধাবস্থায় জান্নাতে যাবে না—ষোড়শী যুবতী হয়ে যাবে।

এর পরবর্তী আয়াতসমূহের মর্ম তফসীরের সার-সংক্ষেপেই ফুটে উঠছে। ঘটনার বিবরণ সূরা আম্বিয়ায় বর্ণিত হয়েছে।

وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿٩٩﴾ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ
الصَّالِحِينَ ﴿١٠٠﴾ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ﴿١٠١﴾ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ
يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ۚ قَالَ يَا أَبَتِ
افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۖ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴿١٠٢﴾ فَلَمَّا
أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ﴿١٠٣﴾ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ ﴿١٠٤﴾ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا ۚ
إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٠٥﴾ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ ﴿١٠٦﴾
وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ﴿١٠٧﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿١٠٨﴾ سَلَامٌ عَلَىٰ
إِبْرَاهِيمَ ﴿١٠٩﴾ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١١٠﴾ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١١﴾
وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿١١٢﴾ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ ۚ
وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مُبِينٌ ﴿١١٣﴾

(৯৯) সে বললঃ আমি আমার পালনকর্তার দিকে চললাম, তিনি আমাকে পথপ্রদর্শন করবেন। (১০০) হে আমার পরওয়ারদিগার! আমাকে এক সৎপুত্র দান কর। (১০১) সুতরাং আমি তাকে এক সহনশীল পুত্রের সুসংবাদ দান করলাম। (১০২) অতপর সে যখন পিতার সাথে চলাফেরা করার বয়সে উপনীত হল, তখন ইবরাহীম তাকে বললঃ বৎস! আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে যবেহ করছি; এখন তোমার অভিমত কি দেখ। সে বললঃ পিতঃ! আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে, তাই করুন। আল্লাহ্ চাহে তো আপনি আমাকে সবরকারী পাবেন। (১০৩) যখন

পিতা-পুত্র উভয়েই আনুগত্য প্রকাশ করল এবং ইবরাহীম তাকে যবেহ্ করার জন্য শায়িত করল, (১০৪) তখন আমি তাকে ডেকে বললামঃ হে ইবরাহীম, (১০৫) তুমি তো স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করে দেখালে। আমি এভাবেই সৎকর্মীদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি। (১০৬) নিশ্চয় এটা এক সুস্পষ্ট পরীক্ষা। (১০৭) আমি তার পরিবর্তে দিলাম যবেহ্ করার জন্য এক মহান জন্তু। (১০৮) আমি তার জন্য এ বিষয়টি পরবর্তীদের মধ্যে রেখে দিয়েছি যে, (১০৯) ইবরাহীমের প্রতি সালাম বর্ষিত হোক। (১১০) এমনিভাবে আমি সৎকর্মীদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি। (১১১) সে ছিল আমার বিশ্বাসী বান্দাদের একজন। (১১২) আমি তাকে সুসংবাদ দিয়েছি ইসহাকের, সে সৎকর্মীদের মধ্য থেকে একজন নবী। (১১৩) তাকে এবং ইসহাককে আমি বরকত দান করেছি। তাদের বংশধরদের মধ্যে কতক সৎকর্মী এবং কতক নিজেদের উপর স্পষ্ট জুলুমকারী।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

ইবরাহীম [(আ) যখন তাদের ঈমানের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেলেন, তখন] বললেনঃ আমি (তোমাদের কাছ থেকে হিজরত করে) আমার পরওয়ারদিগারের (পথে কোন) দিকে চললাম। তিনি আমাকে (ভাল জায়গার দিকে) পথ প্রদর্শন করবেন। (সেমতে তিনি সিরিয়ায় পৌঁছলেন এবং দোয়া করলেনঃ) হে আমার পালন-কর্তা, আমাকে এক সৎ পুত্র দান করুন। অতপর আমি তাকে এক সহনশীল পুত্রের সুসংবাদ দিলাম। (সে পুত্র জন্মগ্রহণ করল এবং কৈশোরে পৌঁছল।) অতপর সে যখন পিতার সাথে চলাফেরা করার বয়সে পৌঁছল, তখন ইবরাহীম [(আ) স্বপ্নে দেখলেন যে, তিনি আল্লাহ্‌র আদেশে পুত্রকে যবেহ্ করছেন। গ্রীবা কর্তিতও দেখেছেন কি না তার প্রমাণ পাওয়া যায় না। নিদ্রাভঙ্গের পর তিনি একে আল্লাহ্‌র আদেশ মনে করলেন। কারণ পয়গম্বরগণের স্বপ্নও ওহীর পর্যায়ভুক্ত হয়ে থাকে। তিনি এই আদেশ পালনে ব্রতী হলেন। অতপর এ ব্যাপারে পুত্রের কি মত, তা জেনে নেওয়া জরুরী বিবেচনা করে পুত্রকে] বললেনঃ বৎস, আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, তোমাকে (আল্লাহ্‌র আদেশে) যবেহ করছি। এখন তুমিও দেখ, তোমার অভিমত কি? সে বললঃ পিতঃ, (এ ব্যাপারে আমাকে জিজ্ঞেস করার কি আছে! আপনি যখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আদিষ্ট হয়েছেন, তখন) আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে, (নির্দ্বিধায়) তাই করুন। ইনশাআল্লাহ্ আপনি আমাকে সবরকারীদের মধ্যে পাবেন। মোটকথা, যখন উভয়েই (আল্লাহ্‌র আদেশ) মেনে নিলেন এবং পিতা পুত্রকে (যবেহ্ করার জন্য) কাত করে শুইয়ে দিলেন, (অতপর গলা কাটতে উদ্যত হলেন,) তখন আমি তাকে ডেকে বললামঃ হে ইবরাহীম, (শাবাশ) তুমি স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করে দেখিয়েছ। (অর্থাৎ স্বপ্নে যে আদেশ করা হয়েছিল, নিজের পক্ষ থেকে তা পুরোপুরি পালন করেছ। এখন আমি আদেশ প্রত্যাহার করে নিচ্ছি। অতএব তাকে ছেড়ে দাও। ইবরাহীম পুত্রকে ছেড়ে দিলেন। এভাবে প্রাণও রক্ষা পেল এবং তদুপরি উচ্চ মর্তবাও লাভ হল।) আমি

সৎকর্মীদেরকে এমনিভাবে প্রতিদান দিয়ে থাকি। (দু'জাহানের সুখ তাদেরকে দান করি!) নিশ্চিতই এটা ছিল এক মহা পরীক্ষা, [যা খাঁটি কামিল পুরুষ ছাড়া কেউ বরদাশত করতে পারে না। এই মহা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার আমি পুরস্কারও দিয়েছি বিরাট। এতে যেমন ইবরাহীম (আ)-এর পরীক্ষা ছিল, তেমনি ইসমাঈল (আ)-এরও ছিল। সুতরাং সে-ও পুরস্কারে অংশীদার হবে। আমি] এর বিনিময়ে (যবেহ্ করার জন্য) একটি মহান জন্তু দিলাম। [ইবরাহীম (আ) যেটি যবেহ করেন।] আমি তার জন্য পরবর্তীদের মধ্যে এ বিষয় রেখে দিয়েছি যে, ইবরাহীমের প্রতি সালাম বর্ষিত হোক। (সেমতে তার নামের সাথে আজ পর্যন্ত আলায়হিস সালাম বলা হচ্ছে।) আমি সৎকর্মীদেরকে এমনি প্রতিদান দিয়ে থাকি। (তাদেরকে মানুষের দোয়া ও নিরাপত্তার সংবাদের কেন্দ্র করে দেই।) নিশ্চয়ই সে ছিল আমার ঈমানদার বান্দাদের একজন। আমি (তাঁর প্রতি এক অনুগ্রহ করেছি এই যে) তাঁকে ইসহাকের সুসংবাদ দিয়েছি। সে নবী এবং সৎকর্মীদের অন্যতম। আমি ইবরাহীম ও ইসহাককে বরকত দান করেছি। (তন্মধ্যে এক বরকত এই যে, তাদের বংশ খুব বিস্তৃতি লাভ করেছে এবং তাতে বহু সংখ্যক পয়গম্বর আবির্ভূত হয়েছে। অতপর) তাদের বংশধরগণের মধ্যে কতক সৎকর্মী এবং কতক এমনও (রয়েছে) যারা (অপকর্ম করে) প্রকাশ্যভাবে নিজেদের ক্ষতি করে যাচ্ছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পুত্র কোরবানীর ঘটনা : আলোচ্য আয়াতসমূহে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পবিত্র জীবনালেখ্যের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। এতে হযরত ইবরাহীম (আ) আল্লাহ্র জন্য তাঁর একমাত্র পুত্রের কোরবানী পেশ করেছিলেন। ঘটনার মৌলিক বিষয়বস্তু তফসীরের সার-সংক্ষেপে ফুটে উঠেছে। এখানে কতক ঐতিহাসিক বিবরণ আয়াতসমূহের তফসীরে বর্ণনা করা হচ্ছে।

وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي—[ইবরাহীম (আ) বললেন : আমি তো আমার পরওয়ারদিগারের দিকে চললাম।] দেশবাসীর তরফ থেকে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়েই তিনি একথা বলেছিলেন। সেখানে তাঁর ভাগিনেয় লূত (আ) ব্যতীত কেউ তাঁর কথায় বিশ্বাস স্থাপন করেনি। পরওয়ারদিগারের দিকে চলে যাওয়ার অর্থ এই যে, দারুল-কুফর পরিত্যাগ করে আমার পরওয়ারদিগার যেখানে আদেশ করেন, সেখানে চলে যাব। সেখানে আমি তাঁর ইবাদত করতে পারব। সেমতে তিনি পত্নী সারা ও ভাগিনেয় হযরত লূতকে সাথে নিয়ে গেলেন এবং ইরাকের বিভিন্ন অঞ্চল অতিক্রম করে অবশেষে সিরিয়ায় পৌঁছলেন। এ পর্যন্ত হযরত ইবরাহীম (আ)-এর কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করেনি। তাই তিনি পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত দোয়া করলেন।

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ (পরওয়ারদিগার, আমাকে এক সৎপুত্র দান কর।) তাঁর এ দোয়া কবুল হয় এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে এক পুত্রের সুসংবাদ দেন।

فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ —(অতপর আমি তাকে এক সহনশীল পুত্রের সুসংবাদ দিলাম।) 'সহনশীল' বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ নবজাত তার জীবনে সবর, ধৈর্য ও সহনশীলতার এমন পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করবে, যার দৃষ্টান্ত দুনিয়ায় কেউ পেশ করতে পারবে না। এ পুত্রের জন্মলাভের ঘটনা এই ঃ হযরত সারা যখন দেখলেন যে তাঁর গর্ভে কোন সন্তান হচ্ছে না তখন তিনি নিজেকে বন্ধ্যা মনে করে নিলেন। এদিকে মিসরের সম্রাট ফিরাউন তার হাজেরা নাম্নী কন্যাকে হযরত সারার খিদমতের জন্য দান করেছিলেন। হযরত সারা হাজেরাকে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর খিদমতের জন্য দিয়ে দিলেন। অতপর তিনি তাকে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করে নিলেন। এ হাজেরার গর্ভেই এ পুত্র জন্মগ্রহণ করে। হযরত ইবরাহীম (আ) তার নাম রাখেন ইসমাঈল।

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ

—[অতপর যখন পুত্র পিতার সাথে চলাফেরা করার মত বয়সে উপনীত হল, তখন ইবরাহীম (আ) বললেন ঃ বৎস, আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে যবেহ্ করছি।] কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, এই স্বপ্ন হযরত ইবরাহীম (আ)-কে উপর্যুপরি তিন দিন দেখানো হয়।——(কুরতুবী) একথা স্বীকৃত সত্য যে, পয়গম্বরগণের স্বপ্নও ওহীই হয়ে থাকে। তাই এ স্বপ্নের অর্থ ছিল এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে ইবরাহীম (আ)-এর প্রতি একমাত্র পুত্রকে যবেহ্ করার হুকুম করা হয়েছে। এ হুকুমটি সরাসরি কোন ফেরেশতার মাধ্যমেও নাযিল করা যেত, কিন্তু স্বপ্নে দেখানোর তাৎপর্য হযরত ইবরাহীম (আ)-এর আনুগত্য পূর্ণ মাত্রায় প্রকাশ পাওয়া। স্বপ্নের মাধ্যমেও প্রদত্ত আদেশে মানব মনের পক্ষে ভিন্ন অর্থ করার যথেষ্ট অবকাশ ছিল। কিন্তু ইবরাহীম (আ) ভিন্ন অর্থের পথ অবলম্বন করার পরিবর্তে আল্লাহ্র আদেশের সামনে মাথা নত করে দেন।——(তফসীরে কবীর)

এছাড়া এখানে আল্লাহ্ তা'আলার প্রকৃত লক্ষ্য হযরত ইসমাঈল (আ)-কে যবেহ্ করা ছিল না এবং ইবরাহীম (আ)-কেও এ আদেশ দেওয়া ছিল না যে, প্রাণপ্রতিম পুত্রকেই যবেহ্ করে ফেল। বরং উদ্দেশ্য ছিল এ আদেশ দেওয়া যে, নিজের পক্ষ থেকে যবেহ্ করার সমস্ত আয়োজন সমাপ্ত করে যবেহ্ করতে উদ্যত হয়ে যাও। বস্তুত এ নির্দেশ সরাসরি মৌখিক দেওয়া হলে তাতে পরীক্ষা হতো না। তাই তাঁকে স্বপ্নে দেখানো হয়েছে যে, তিনি পুত্রকে যবেহ্ করেছেন। এতে হযরত ইবরাহীম (আ)

বুঝে নিলেন যে, যবেহ্ করার নির্দেশ হয়েছে এবং তিনি যবেহ করতে পুরোপুরি প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। এভাবে পরীক্ষাও পূর্ণতা লাভ করল এবং স্বপ্নও সত্যে পরিণত হল। অথচ মৌখিক আদেশের মাধ্যমে হলে তাতে পরীক্ষা হত না। অথবা পরে রহিত করতে হত। এ বিষয়টি কত যে ভীষণ পরীক্ষা সেদিকে ইঙ্গিত করার জন্য এখানে فلما بلغ معه السعى—কথাগুলো সংযুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ অনেক কামনা-বাসনা ও দোয়া প্রার্থনার পর পাওয়া এই প্রাণপ্রতিম পুত্রকে কোরবানী করার নির্দেশ এমন সময় দেওয়া হয়েছিল, যখন পুত্র পিতার সাথে চলাফেরার যোগ্য হয়ে গিয়েছিল এবং লালন-পালনের দীর্ঘ কষ্ট সহ্য করার পর এখন সময় এসেছিল যে, সে পিতার বাহুবল হয়ে আপদে-বিপদে তাঁর পার্শ্বে দাঁড়াবে। তফসীরবিদগণ লিখেছেন যে, সে সময় হযরত ইসমাঈল (আ)-এর বয়স ছিল তের বছর। কেউ কেউ বলেন যে, তিনি সাবালক হয়ে গিয়েছিলেন।—(মাযহারী)

فانظر ماذا ترى -(অতএব তুমিও দেখ, তোমার অভিমত কি?) হযরত ইবরাহীম (আ) একথা হযরত ইসমাঈলকে এজন্য জিজ্ঞেস করেন নি যে, তিনি আল্লাহ্র নির্দেশ পালনে কোনরূপ সন্দিগ্ধ ছিলেন। বরং প্রথমত তিনি পুত্রের পরীক্ষাও নিতে চেয়েছিলেন যে, এ পরীক্ষায় সে কতদূর উত্তীর্ণ হয়? দ্বিতীয়ত পয়গম্বরগণের চিরন্তন কর্মপদ্ধতি এই যে, তাঁরা আল্লাহ্র আদেশ পালনের জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকেন, কিন্তু আনুগত্যের জন্য সর্বদা উপযোগী ও যথাসম্ভব সহজ পথ অবলম্বন করেন। যদি ইবরাহীম (আ) পূর্বাহ্নে কিছু না বলেই পুত্রকে যবেহ্ করতে উদ্যত হতেন, তবে বিষয়টি উভয়ের পক্ষেই কঠিন হয়ে যেতে পারত। তিনি পরামর্শের ভঙ্গিতে ব্যাপারটি উল্লেখ করলেন, যাতে পুত্র পূর্ব থেকেই আল্লাহ্র নির্দেশের কথা জেনে যবেহ্ হওয়ার কষ্ট সহ্য করার জন্য প্রস্তুত হতে পারে। এছাড়া পুত্রের মনে কোনরূপ দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হলেও তাকে বুঝিয়ে-শুনিয়ে সম্মত করা যাবে।—(রূহুল মা'আনী, বয়ানুল কোরআন)

কিন্তু সে পুত্রও ছিলেন খলীলুল্লাহ্রই পুত্র এবং স্বয়ং ভাবী পয়গম্বর। তিনি জওয়াব দিলেন:

يا ابت افعل ما تؤمر—(পিতঃ আপনাকে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তা সেরে ফেলুন।) এতে হযরত ইসমাঈল (আ)-এর অতুলনীয় বিনয় ও আত্মনিবেদনের পরিচয় তো পাওয়া যায়ই, তদুপরি একথাও প্রতীয়মান হয় যে, এহেন কচি বয়সেই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে কি পরিমাণ মেধা ও জ্ঞান দান করেছিলেন। হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁর সামনে আল্লাহ্র কোন নির্দেশের বরাত দেননি—বরং একটি স্বপ্নের কথা বলেছিলেন মাত্র। কিন্তু ইসমাঈল (আ) বুঝে নিলেন যে, পয়গম্বরগণের স্বপ্নও ওহী হয়ে থাকে। কাজেই এ স্বপ্নও প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্র একটি নির্দেশ। অতএব তিনি

জওয়াবে স্বপ্নের পরিবর্তে নির্দেশের কথা বললেন।

অপঠিত ওহীর প্রমাণ ঃ এতেই হাদীস অস্বীকারকারীদের খণ্ডন হয়ে যায়, যারা তিলাওয়াত করা হয় না এমন ওহীর অস্তিত্ব স্বীকার করে না এবং বলে যে, ওহী এক-মাত্র তাই, যা আসমানী গ্রন্থে অবতীর্ণ হয়। এছাড়া ওহীর অন্য কোন প্রকার বিদ্যমান নেই। উপরোক্ত ঘটনা থেকে তাদের এ বক্তব্যের অসারতা প্রমাণিত হয়। আপনি লক্ষ্য করে থাকবেন যে, ইবরাহীম (আ)-কে পুত্র কোরবানীর নির্দেশ স্বপ্নের মাধ্যমে দেওয়া হয়েছিল। হযরত ইসমাঈল (আ) পরিষ্কার ভাষায় একে আল্লাহ্র নির্দেশ বলে আখ্যায়িত করেছেন। যদি অপঠিত ওহীর অস্তিত্বই না থাকবে, তবে ঐ নির্দেশটি কোন্ আসমানী গ্রন্থে অবতীর্ণ হয়েছিল?

হযরত ইসমাঈল (আ) নিজের পক্ষ থেকে পিতাকে এ আশ্বাসও দিলেন যে, سَتَجِدُنِىْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ — ইনশাআল্লাহ্ আপনি আমাকে সবরকারীদের মধ্যে পাবেন। এ বাক্যে হযরত ইসমাঈল (আ)-এর চূড়ান্ত আদব ও বিনয় লক্ষ্য করুন। প্রথমত তিনি 'ইনশাআল্লাহ্' বলে ব্যাপারটি আল্লাহ্র কাছে সমর্পণ করেছেন এবং এ ওয়াদায় দাবির যে বাহ্যিক আকার ছিল, তা খতম করে দিলেন। দ্বিতীয়ত তিনি একথাও বলতে পারতেন, 'ইনশাআল্লাহ্ আপনি আমাকে সবরকারী পাবেন'; কিন্তু এর পরিবর্তে তিনি বললেন, 'সবরকারীদের মধ্যে পাবেন।' এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ সবর ও সহনশীলতা একা আমারই কৃতিত্ব নয়; বরং দুনিয়াতে আরও বহু সবরকারী হয়েছে। ইনশাআল্লাহ্ আমিও তাদের মধ্যে শামিল হয়ে যাব। এভাবে তিনি উপরোক্ত বাক্যে অহংকার, আত্মপ্রীতি ও অহমিকার নাম-গন্ধটুকু পর্যন্ত খতম করে দিয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ের বিনয় ও বশ্যতা প্রকাশ করেছেন। ——(রূহুল মা'আনী) এর দ্বারা এ শিক্ষা পাওয়া যায় যে, মানুষ কোন ব্যাপারে নিজের উপর যত আত্মবিশ্বাসই পোষণ করুক না কেন, গর্ব ও অহংকার প্রকাশ পেতে পারে এমন লম্বা-চওড়া দাবি করা মোটেই উচিত নয়। কোথাও এমন কথা বলার প্রয়োজন হলে ভাষা এমন হওয়া চাই যে, নিজের পরিবর্তে আল্লাহ্র উপর ভরসা প্রকাশ পায়। যথাসম্ভব বিনয় ও নম্রতা পরিত্যক্ত হওয়া উচিত নয়।

فَلَمَّا اَسْلَمَا — (যখন তাঁরা উভয়েই নত হয়ে গেলেন।) اسلام শব্দের অর্থ নত হওয়া, অনুগত হওয়া ও বশীভূত হওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, তাঁরা যখন আল্লাহ্র নির্দেশের সামনে নত হয়ে পিতা-পুত্রকে যবেহ্ করতে এবং পুত্র যবেহ্ হতে সম্মত হলেন। এরপর কি হল, তা এখানে উল্লেখ করা হয়নি। এতে ইঙ্গিত আছে যে, পিতা-পুত্রের এই আত্ম নিবেদনমূলক কার্যক্রম এমন বিস্ময়কর ও অভাবিত ছিল, যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

ইতিহাস ও তফসীরভিত্তিক কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, শয়তান তিনবার হযরত ইবরাহীম (আ)-কে প্রতারিত করার চেষ্টা করে এবং ইবরাহীম (আ) প্রত্যেক বারই তাকে সাতটি কংকর নিক্ষেপের মাধ্যমে তাড়িয়ে দেন। অদ্যাবধি এই প্রশংসনীয় কাজের স্মৃতি মীনায় তিনবার কংকর নিক্ষেপের মাধ্যমে উদ্‌যাপন করা হয়। অবশেষে পিতা-পুত্র উভয়েই যখন এই অভিনব ইবাদত উদ্‌যাপন করার উদ্দেশ্যে কোরবানগাহে পৌঁছলেন, তখন ইসমাঈল (আ) পিতাকে বললেন ঃ পিতঃ, আমাকে খুব শক্ত করে বেঁধে নিন, যাতে আমি বেশি ছটফট করতে না পারি। আপনার পরিধেয় বস্ত্রও সামলে নিন, যাতে আমার রক্তের ছিটা তাতে না পড়ে। এতে আমার সওয়াব হ্রাস পেতে পারে। এছাড়া রক্ত দেখলে আমার মা অধিক ব্যাকুল হবেন। আপনার ছুরিটিও ধার দিয়ে নিন এবং তা আমার গলায় দ্রুত চালাবেন যাতে আমার প্রাণ সহজে বের হয়ে যায়। কারণ, মৃত্যু বড় কঠিন ব্যাপার। আপনি আমার মায়ের কাছে পৌঁছে আমার সালাম বলবেন। যদি আমার জামা তার কাছে নিয়ে যেতে চান, তবে নিয়ে যাবেন। হয়তো এতে তিনি কিছুটা সান্ত্বনা পাবেন। একমাত্র পুত্রের মুখে এসব কথা শুনে পিতার মানসিক অবস্থা যে কি হতে পারে, তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু হযরত ইবরাহীম (আ) দৃঢ়তার অটল পাহাড় হয়ে জওয়াব দিলেন ঃ বৎস, আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালন করার জন্য তুমি আমার চমৎকার সহায়ক হয়েছ। অতপর তিনি পুত্রকে চুম্বন করলেন এবং অশ্রুপূর্ণ নেত্রে তাকে বেঁধে নিলেন।

وَتَلَّهُ لِلْجَبِيْنِ—(এবং তাকে উপুড় করে মাটিতে শুইয়ে দিলেন।) হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর এই অর্থ করেন যে, তাকে কাত করে এমনভাবে শুইয়ে দিলেন যাতে কপালের একদিক মাটি স্পর্শ করেছিল। (মাযহারী) আভিধানিক দিক দিয়ে এ তফসীরই অগ্রগণ্য। কারণ আরবী ভাষায় جبين কপালের দুই পার্শ্বকে বলা হয়। কপালের মধ্যস্থলকে বলা হয় جبهة এ কারণেই হযরত থানভী (র)-এর অনুবাদ করেছেন বালুর উপর শুইয়ে দিলেন।" কিন্তু অন্যান্য কোন কোন তফসীরবিদ এর অর্থ করেছেন 'উপুড় করে মাটিতে শুইয়ে দিলেন'। যাই হোক, ঐতিহাসিক রেওয়ায়েতে এভাবে শোয়ানোর কারণ এই বর্ণিত হয়েছে যে, শুরুতে ইবরাহীম (আ) তাকে সোজা করে শুইয়ে দিলেন; কিন্তু বারবার ছুরি চালানো সত্ত্বেও গলা কাটছিল না। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় কুদরতে পিতলের একটি টুকরা মাঝখানে অন্তরায় করে দিয়েছিলেন। তখন পুত্র নিজেই আবদার করে বললেন পিতঃ, আমাকে কাত করে শুইয়ে দিন। কারণ, আমার মুখমণ্ডল দেখে আপনার মধ্যে পৈতৃক স্নেহ উথলে উঠে। ফলে গলা পূর্ণরূপে কাটা হয় না। এ ছাড়া ছুরি দেখে আমিও ঘাবড়ে যাই। সেমতে হযরত ইবরাহীম (আ) তাকে এভাবে শুইয়ে দিলেন এবং ছুরি চালাতে লাগলেন।—(মাযহারী)

وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا—(আমি তাকে ডেকে

বললাম ঃ হে ইবরাহীম তুমি স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করে দেখিয়েছ।) অর্থাৎ আল্লাহ্র আদেশ পালনে তোমার যা করণীয় ছিল, তাতে সত্যি নিজের পক্ষ থেকে কোন ত্রুটি রাখনি। (স্বপ্নেও সম্ভবত এ বিষয়টি শেখানো হয়েছিল যে, ইবরাহীম (আ) যবেহ্ করার জন্য পুত্রের গলায় ছুরি চালাচ্ছেন) এখন এই পরীক্ষা পূর্ণ হয়ে গেছে। তাই তাকে ছেড়ে দাও।

إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ —(আমি খাঁটি বান্দাদেরকে এমনি প্রতিদান দিয়ে থাকি।) অর্থাৎ আল্লাহ্র কোন বান্দা যখন আল্লাহ্র আদেশের সামনে নতশির হয়ে নিজের সমস্ত ভাবাবেগকে কোরবান করতে উদ্যত হয়ে যায়, তখন আমি পরিশেষে তাকে পার্থিব কষ্ট থেকেও বাঁচিয়ে রাখি এবং পরকালের সওয়াবও তার আমলনামায় লিখে দেই।

وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ —(আমি যবেহ্ করার জন্য এক মহান জীব এর বিনিময়ে দিলাম।) বর্ণিত আছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ) উপরোক্ত গায়েবী আওয়ায শুনে উপরের দিকে তাকালে হযরত জিবরাঈলকে একটি ভেড়া নিয়ে দণ্ডায়মান দেখতে পেলেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, এটা ছিল সে ভেড়া যা হযরত আদম (আ)-এর পুত্র হাবীল কোরবানী করেছিলেন।

মোটকথা, এ জান্নাতী ভেড়া হযরত ইবরাহীম (আ)-কে দেওয়া হলে তিনি আল্লাহ্র নির্দেশক্রমে পুত্রের পরিবর্তে সেটি কোরবানী করলেন। একে عظيم (মহান) বলার কারণ এই যে, এটি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এসেছিল এবং এর কোরবানী কবূল হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ ছিল না।—(মাযহারী)

কোরবানী ইসমাঈল (আ) হয়েছিলেন, না ইসহাক (আ)?ঃ একথা মেনে নিয়ে উপরোক্ত আয়াতসমূহের তফসীর করা হয়েছে যে, ইবরাহীম (আ) যে পুত্রকে যবেহ করার জন্য আদিষ্ট হয়েছিলেন, সে পুত্র ছিলেন ইসমাঈল (আ)। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ ব্যাপারে তফসীরবিদ ও ইতিহাসবিদদের মধ্যে ভীষণ মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। হযরত উমর, আলী, আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ, আব্বাস, ইবনে আব্বাস, কা'ব আহবার, সাঈদ ইবনে জুবায়ের, কাতাদাহ, মসরূক, ইকরিমা, আতা, মুকাতিল, যুহরী, সুদ্দী প্রমুখ সাহাবী, তাবেয়ী ও তফসীরবিদ থেকে বর্ণিত আছে যে, সে পুত্র ছিলেন ইসহাক (আ)। এর বিপরীতে হযরত আলী, ইবনে আব্বাস, আবদুল্লাহ ইবনে উমর, আবু হুরায়রা, আবু তোফায়েল, সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব, সাঈদ ইবনে জুবায়ের, হাসান বসরী, মুজাহিদ, উমর ইবনে আবদুল আজীজ, শা'বী মুহাম্মদ ইবনে কা'ব ও অন্য বহু তাবেয়ী থেকে বর্ণিত আছে যে, সে পুত্র ছিলেন হযরত ইসমাঈল (আ)।

পরবর্তী তফসীরবিদগণের মধ্যে ইবনে জারীর প্রথম উক্তিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন এবং ইবনে কাসীর প্রমুখ দ্বিতীয় উক্তি অবলম্বন করে প্রথম উক্তির কঠোরভাবে খণ্ডন করেছেন। এখানে উভয় পক্ষের প্রমাণাদি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নয়। এতদসত্ত্বেও কোরআন পাকের বর্ণনা পদ্ধতি এবং রেওয়ায়েতসমূহের বলিষ্ঠতার ভিত্তিতে এটাই অগ্রগণ্য বলে মনে হয় যে, হযরত ইবরাহীম (আ) পুত্র ইসমাঈলকে কোরবানী করার জন্য আদিষ্ট হয়েছিলেন। এর পক্ষে যুক্তি প্রমাণ নিম্নরূপ ঃ

১. কোরআন পাক পুত্র কোরবানীর আগাগোড়া ঘটনা বর্ণনা করার পর বলেছে ঃ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ —(আমি ইবরাহীমকে ইসহাকের সুসংবাদ দিলাম, যিনি হবেন নবী ও সৎ লোকদের অন্যতম।) এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, যে পুত্রের কুরবানী করার আদেশ করা হয়েছিল, তিনি হযরত ইসহাক নন—অন্য কেউ। এছাড়া হযরত ইসহাকের সুসংবাদ কোরবানীর ঘটনার পরে দেওয়া হয়েছে।

২. হযরত ইসহাক (আ)-এর সুসংবাদে আরও উল্লিখিত আছে যে, তিনি নবী হবেন। অন্য আয়াতে বর্ণিত সুসংবাদে একথাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাঁর ঔরসে হযরত ইয়াকুব (আ) জন্মগ্রহণ করবেন। আয়াতটি এই ঃ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ -এর পরিষ্কার অর্থ এই যে, ইসহাক (আ) সুদীর্ঘকাল জীবিত থাকবেন এবং সন্তানের পিতা হবেন। এমতাবস্থায় তাঁকেই শৈশবে যবেহ্ করার আদেশ দেওয়া কিরূপে সম্ভবপর ছিল? যদি তাঁকেই শৈশবে নবুয়ত লাভের পূর্বে যবেহ্ করার নির্দেশ দেওয়া হত, তবে ইবরাহীম (আ) বিলক্ষণ বুঝে নিতেন যে, তাকে তো এখনও নবুয়তের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে এবং তার ঔরসে হযরত ইয়াকুবের জন্ম অবধারিত। তাই যবেহ্ করলে তার মৃত্যু হতে পারবে না। বলা বাহুল্য, এমতাবস্থায় এটা কোন পরীক্ষা হত না এবং এটা সম্পাদন করে হযরত ইবরাহীমও কোন প্রশংসার যোগ্য হতেন না। পরীক্ষা কেবল তখনই সম্ভব ছিল, যখন ইবরাহীম (আ) একথা পুরোপুরি বুঝতেন যে, তাঁর পুত্র যবেহ্ করলে মারা যাবে, এরপর তিনি যবেহ্ করতে উদ্যত হতেন। হযরত ইসমাঈল (আ)-এর ব্যাপারেই একথা পুরোপুরি প্রযোজ্য। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা পূর্বে তাঁর জীবিত থাকার ও নবী হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী করেন নি।

৩. কোরআন পাকের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, যে পুত্রকে যবেহ্ করার হুকুম দেওয়া হয়েছিল, তিনি ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আ)-এর প্রথম সন্তান। কারণ, তিনি দেশ থেকে হিজরত করার সময় এক পুত্রের দোয়া করেছিলেন। এ দোয়ারই জওয়াবে সুসংবাদ দেওয়া হয় যে, তাঁর গৃহে এক সহনশীল পুত্র জন্মগ্রহণ করবে। অতপর এই পুত্র সম্পর্কেই বলা হয়েছে যে, সে যখন পিতার সাথে চলাফেরা করার বয়সে

উপনীত হল, তখন তাকে যবেহ্ করার নির্দেশ হল। সুতরাং ঘটনার ধারাবাহিকতায় প্রতীয়মান হচ্ছে যে, সে পুত্র ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আ)-এর প্রথম সন্তান। এদিকে এটা সর্বসম্মত যে, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর হযরত ইসমাঈলই ছিলেন প্রথম পুত্র এবং হযরত ইসহাক ছিলেন তাঁর দ্বিতীয় পুত্র। সুতরাং সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় যে, হযরত ইসমাঈলকেই যবেহ্ করার হুকুম হয়েছিল।

৪. এটাও প্রায় নির্ধারিত যে, পুত্র-কোরবানীর এ ঘটনা মক্কা মোকাররমার নিকটবর্তী এলাকায় সংঘটিত হয়েছে। এ কারণেই আরবদের মধ্যে সর্বদা হজ্জের সময় কোরবানী করার প্রথা প্রচলিত রয়েছে। এছাড়া হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পুত্রের বিনিময়ে যে ভেড়া জান্নাত থেকে প্রেরিত হয়েছিল, তার শিং বহু বছর পর্যন্ত কা'বা গৃহের অভ্যন্তরে ঝুলানো ছিল। ইবনে কাসীর এর সমর্থনে একাধিক রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন এবং আমের শা'বীর এ উক্তিও বর্ণনা করেছেন যে, 'আমি কা'বা গৃহে এই ভেড়ার শিং স্বচক্ষে দেখেছি।' হযরত সুফিয়ান বলেন ঃ এই ভেড়ার শিং অনবরত কা'বায় ঝুলানো ছিল। হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের আমলে যখন কা'বা গৃহে অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়, তখন এই শিং ভস্মীভূত হয়ে যায়। এখন বলাবাহুল্য যে, মক্কায় হযরত ইসমাঈল (আ) বাস করেছিলেন---হযরত ইসহাক (আ) নয়। তাই এটা সুস্পষ্ট যে, যবেহ্ করার হুকুম হযরত ইসমাঈলের সাথে জড়িত ছিল---হযরত ইসহাকের সাথে নয়।

এখন যেসব রেওয়ায়েতে আছে যে, বিভিন্ন সাহাবী ও তাবেয়ী যবেহ্ করার আদেশ হযরত ইসহাকের সাথে সম্পর্ক করেছেন, সেগুলো সম্পর্কে ইবনে কাসীর লিখেন ঃ

আল্লাহ্ তা'আলাই ভাল জানেন; কিন্তু বাহ্যত মনে হয়, এসব উক্তি কা'ব আহবার থেকে গৃহীত হয়েছে। কারণ, তিনি হযরত উমর (রা)-এর খিলাফতকালে ইসলাম গ্রহণ করে হযরত উমর (রা)-কে তার প্রাচীন গ্রন্থাদির বিষয়বস্তু শুনাতে শুরু করেন। মাঝে মাঝে খলীফা তাঁর কথাবার্তা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। এতে অন্যরাও সুযোগ পায় এবং তারাও তার রেওয়ায়েত শুনে তা বর্ণনা করতে শুরু করে। এসব রেওয়ায়েতে সত্য মিথ্যা সব বিষয়ই অন্তর্ভুক্ত থাকত। মুসলিম উম্মতের এসব কথাবার্তার মধ্য থেকে একটি অক্ষরেরও প্রয়োজন নেই।

ইবনে কাসীরের উপরোক্ত বক্তব্য খুবই যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়। কারণ, হযরত ইসহাককে যবেহ্র আদেশের সাথে জড়িত করার বিষয়টি ইসরাঈলী রেওয়ায়েতের উপরই ভিত্তিশীল। এ কারণেই 'ইহুদী ও খৃস্টান সম্প্রদায় হযরত ইসমাঈলের পরিবর্তে হযরত ইসহাককে যবেহ্ করার আদেশের সাথে জড়িত করে। বর্তমান বাইবেলে ঘটনাটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ

এসব বিষয়ের পর খোদা আব্রাহামের পরীক্ষা নিলেন এবং তাকে বললেন ঃ হে আব্রাহাম, তিনি বললেন, আমি উপস্থিত আছি। তখন খোদা বললেন ঃ তুমি

তোমার একমাত্র ও আদরের পুত্র ইসহাককে সাথে নিয়ে সুরিয়া দেশে যাও এবং সেখানে আমি যে পাহাড়ের কথা বলব, সেই পাহাড়ে তাকে কোরবানীর জন্য পেশ কর। (জন্ম ২২, ১ ও ২)

এতে যবেহ করার ঘটনাকে হযরত ইসহাকের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু বিবেকের দৃষ্টিতে দেখলে এবং তথ্যানুসন্ধান করলে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, এখানে ইহুদীরা তাদের ঐতিহ্যগত বিদ্বেষকে কাজে লাগিয়ে তওরাতের শব্দ পরিবর্তন করে দিয়েছে। কারণ, জন্ম অধ্যায়ের উপরোক্ত বাক্যাবলীতেই 'তোমার একমাত্র পুত্র' কথাটি ব্যক্ত করছে যে, কোরবানীর হুকুমের সাথে জড়িত পুত্র হযরত ইবরাহীমের একমাত্র পুত্র ছিল। এ অধ্যায়েই অতপর আরও লিখিত আছে ঃ

"তুমি তোমার একমাত্র পুত্রকেও আমার জন্য উৎসর্গ করতে দ্বিধা করনি" (জন্ম ২২, ১২)

এ বাক্যেও স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, সে পুত্র ছিল হযরত ইবরাহীম (আ)-এর একমাত্র পুত্র। এদিকে এটা সর্বসম্মত যে, হযরত ইসহাক তাঁর একমাত্র পুত্র ছিলেন না। একমাত্র পুত্র বলতে হযরত ইসমাঈলই ছিলেন। জন্ম অধ্যায়ের অন্যান্য বাক্যাবলী এর পক্ষে সাক্ষ্য বহন করে যে, হযরত ইসমাঈলের জন্ম হযরত ইসহাকের পূর্বে হয়েছিল। দেখুন ঃ

"এবং আব্রাহামের স্ত্রী সারার কোন সন্তান হয়নি। তার হাজেরা নাম্নী এক মিসরীয় বাঁদী ছিল। আব্রাহাম হাজেরার কাছে গেল এবং সে গর্ভবতী হল। খোদা-ওয়ান্দের ফেরেশতা তাকে বলল ঃ তুমি গর্ভবতী, তোমার পুত্র হবে। তার নাম রাখবে ইসমাঈল। যখন হাজেরার গর্ভে আব্রাহামের পুত্র ইসমাঈল জন্মগ্রহণ করল, তখন আব্রাহামের বয়স ছিল ছিয়াশি বছর।" (জন্ম-১৬-১ ৪, ১০, ১৬)

এর পরবর্তী অধ্যায়ে আছে ঃ

"এবং খোদা আব্রাহামকে বলল ঃ তোমার স্ত্রী সারার গর্ভ থেকেও তোমাকে এক পুত্র দান করব। তখন আব্রাহাম নতশির হয়ে হেসে মনে মনে বলল ঃ শত বছরের বৃদ্ধের ঔরসেও সন্তান হবে? আর নব্বই বছরের সারার গর্ভেও সন্তান হবে? আব্রাহাম আল্লাহ্‌কে বলল ঃ আহা, ইসমাঈল তোমার সকাশে জীবিত থাকুক। তখন আল্লাহ্ বললেন ঃ নিশ্চয়ই তোমার ঔরসে সারার পুত্র হবে। তার নাম রাখবে ইসহাক।" (জন্ম ১৭, ১৫—২০) এর পর হযরত ইসহাকের জন্মের আলোচনা করে বলা হয়েছে ঃ

"এবং যখন তার পুত্র ইসহাক জন্মগ্রহণ করল, তখন আব্রাহামের বয়স ছিল শত বছর।" (জন্ম ২১-৫)

উপরোক্ত বক্তব্য থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, হযরত ইসহাক হযরত ইসমাঈল অপেক্ষা চৌদ্দ বছরের ছোট ছিলেন। এই চৌদ্দ বছর ইসমাঈল হযরত ইবরাহীম (আ)-এর একমাত্র পুত্র ছিলেন। এর বিপরীতে হযরত ইসহাক কোন দিনই পিতার একমাত্র

সন্তান ছিলেন না। এরপর জন্মগ্রন্থের ২২তম অধ্যায়ে পুত্র কোরবানীর আলোচনায় 'একমাত্র' শব্দটি পরিষ্কার সাক্ষ্য দেয় যে, ইসমাঈলই একমাত্র পুত্র এবং কোন ইহুদী হয়তো এর সাথে 'ইসহাক' শব্দটি জুড়ে দিয়ে থাকবে আর এই জুড়ে দেওয়ার একমাত্র কারণ হচ্ছে ইসমাঈল বংশের পরিবর্তে ইসহাক বংশের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করা।

এ ছাড়া বাইবেলের জন্মগ্রন্থের যে জায়গায় হযরত ইবরাহীম (আ)-কে ইসহাক সম্পর্কে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে, সেখানে আরও বলা হয়েছে ঃ

"নিশ্চিতই আমি তাকে (ইসহাককে) বরকত দেব--তার বংশে অনেক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হবে।" (জন্ম ১৭, ১৬)

বলাবাহুল্য, যে পুত্র সম্পর্কে জন্মের পূর্বেই সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, তার বংশে অনেক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হবে, তাকে কোরবানী করার হুকুম কিরূপে দেওয়া যেতে পারে? এ থেকেও জানা যায় যে, কোরবানীর হুকুম হযরত ইসহাকের সাথে নয়--ইসমাঈলের সাথেই সম্পৃক্ত ছিল।

বাইবেলের উপরোক্ত উদ্ধৃতিসমূহ দেখার পর ইবনে কাসীরের নিম্নোক্ত অভিমত যে কত নির্ভুল, তা সহজেই অনুমান করা যায় ঃ

"ইহুদীদের পবিত্র গ্রন্থসমূহে বর্ণিত আছে যে, ইসমাঈল (আ)-এর জন্মের সময় হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বয়স ছিল ছিয়াশি বছর এবং হযরত ইসহাকের জন্মের সময় তাঁর বয়স ছিল পূর্ণ একশ বছর। এসব গ্রন্থে আরও বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে তাঁর একমাত্র পুত্র যবেহ্ করার হুকুম দিয়েছিলেন। কোন কোন গ্রন্থে 'একমাত্র' শব্দের পরিবর্তে 'প্রথম' শব্দও উল্লিখিত আছে। সুতরাং ইহুদীরা এখানে নিজেদের তরফ থেকে দুরভিসন্ধিমূলকভাবে 'ইসহাক' শব্দটি জুড়ে দিয়েছে। একে বিশুদ্ধ বলার কোন বৈধতা নেই। কেননা, এটা স্বয়ং তাদের গ্রন্থাদির বর্ণনারও বিপক্ষে। এই জুড়ে দেওয়ার কারণ এই যে, হযরত ইসহাক তাদের পিতৃপুরুষ এবং হযরত ইসমাঈল আরবদের পিতৃপুরুষ। সুতরাং হিংসার বশবর্তী হয়ে তারা শব্দটি জুড়ে দিয়েছে। এখন তারা 'একমাত্র' শব্দের অর্থ এই বর্ণনা করে যে, "আদেশ দেওয়ার সময় তোমার নিকট উপস্থিত একমাত্র পুত্র।" কারণ, হযরত ইসমাঈল তখন সেখানে পিতার সাথে ছিলেন না। (তাই হযরত ইসহাককে এই অর্থে একমাত্র বলা যায়।) কিন্তু এ ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত এবং সত্যের অপলাপ মাত্র। কারণ, যে সন্তান ব্যতীত পিতার অন্য কোন সন্তান নেই, তাকেই 'একমাত্র' সন্তান বলা হয়।—(তফসীরে ইবনে কাসীর)

হাফেয ইবনে কাসীর আরও বর্ণনা করেছেন যে, হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীযের শাসনামলে জনৈক ইহুদী আলিম ইসলাম গ্রহণ করলে উমর ইবনে আবদুল আযীয তাকে জিজ্ঞেস করেন ঃ ইবরাহীম (আ)-এর কোন পুত্রকে যবেহ্ করার হুকুম হয়েছিল? সে বলল ঃ আল্লাহ্র কসম আমিরুল মু'মিনীন, সে পুত্র ছিলেন ইসমাঈল (আ)। ইহুদীরা এটা ভালভাবেই জানে, কিন্তু প্রতিহিংসাবশত তারা অন্য রকম বলে।

উপরোক্ত প্রমাণাদির আলোকে এটা সন্দেহাতীত যে, হযরত ইসমাঈলকেই যবেহ্ করার হুকুম হয়েছিল।

وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَّظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ مُبِيْنٌ —(তাঁদের উভয়ের বংশধর-দের মধ্যে কিছু সৎকর্মী এবং কিছু নিজেদের প্রকাশ্য ক্ষতি সাধনে লিপ্ত।) এ আয়াতের মাধ্যমে ইহুদীদের এই মিথ্যা ধারণা খণ্ডন করা হয়েছে যে, পয়গম্বরগণের বংশধর হওয়াই মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ও মুক্তির জন্য যথেষ্ট। আলোচ্য আয়াত পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করেছে যে, কোন সৎলোকের সাথে বংশগত সম্পর্ক থাকা মুক্তির জন্য যথেষ্ট নয়, বরং এটা মানুষের নিজের বিশ্বাস ও কর্মের উপর ভিত্তিশীল।

وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلٰى مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ﴿١١٤﴾ وَنَجَّيْنٰهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ ﴿١١٥﴾ وَنَصَرْنٰهُمْ فَكَانُوْا هُمُ الْغٰلِبِيْنَ ﴿١١٦﴾ وَاٰتَيْنٰهُمَا الْكِتٰبَ الْمُسْتَبِيْنَ ﴿١١٧﴾ وَهَدَيْنٰهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ﴿١١٨﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْاٰخِرِيْنَ ﴿١١٩﴾ سَلٰمٌ عَلٰى مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ﴿١٢٠﴾ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٢١﴾ اِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٢٢﴾

---

(১১৪) আমি অনুগ্রহ করেছিলাম মূসা ও হারূনের প্রতি। (১১৫) তাদেরকে ও তাদের সম্প্রদায়কে উদ্ধার করেছি মহা সংকট থেকে। (১১৬) আমি তাদেরকে সাহায্য করেছিলাম, ফলে তারাই ছিল বিজয়ী। (১১৭) আমি উভয়কে দিয়েছিলাম সুস্পষ্ট কিতাব (১১৮) এবং তাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করেছিলাম। (১১৯) আমি তাদের জন্য পরবর্তীদের মধ্যে এ বিষয় রেখে দিয়েছি যে, (১২০) মূসা ও হারূনের প্রতি সালাম বর্ষিত হোক। (১২১) এভাবে আমি সৎকর্মীদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি। (১২২) তারা উভয়েই ছিল আমার বিশ্বাসী বান্দাদের অন্যতম।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি মূসা ও হারূন (আ)-এর প্রতি অনুগ্রহ করেছিলাম (তাদেরকে নবুয়ত ও অন্যান্য পরাকাষ্ঠা দানের মাধ্যমে) আমি তাদের উভয়কে ও তাদের সম্প্রদায় (বনী ইসরাঈল)-কে মহা সংকট থেকে উদ্ধার করেছিলাম এবং তাদেরকে (ফিরাউনের নির্যাতন থেকে) উদ্ধার করেছিলাম এবং তাদেরকে (ফেরাউনের বিরুদ্ধে) সাহায্য

করেছিলাম। ফলে (শেষ পর্যন্ত) তারাই ছিল বিজয়ী। (ফেরাউন নিমজ্জিত হয় এবং তারা রাজত্ব লাভ করে।) আমি (ফেরাউন নিমজ্জিত হওয়ার পর) উভয়কে (অর্থাৎ মূসাকে সরাসরি ও হারূনকে অনুসারীরূপে) সুস্পষ্ট কিতাব (অর্থাৎ তওরাত) দিয়েছিলাম (এতে বিধানাবলী সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত ছিল।) এবং তাদেরকে সরল পথে কায়েম রেখেছিলাম। (এর সর্বোচ্চস্তর হিসাবে তাদেরকে নিষ্পাপ পয়গম্বর করেছিলাম)। আমি তাদের জন্য পরবর্তীদের মধ্যে (সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত) এ বিষয় রেখে দিয়েছি যে, মূসা ও হারূনের প্রতি সালাম বর্ষিত হোক। (সেমতে উভয়ের নামের সাথে আজ পর্যন্ত 'আলাইহিস সালাম' বলা হয়।) আমি খাঁটি বান্দাদেরকে এমনি প্রতিদান দিয়ে থাকি। (তাদেরকে প্রশংসা ও দোয়ার যোগ্য করে দেই।) নিশ্চয় তারা উভয়ই ছিল আমার (পূর্ণ) বিশ্বাসী বান্দাদের অন্যতম। (তাই প্রতিদানও পূর্ণরূপেই প্রাপ্ত হয়েছে।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহে তৃতীয় ঘটনা হযরত মূসা ও হারূন (আ)-এর বর্ণনা করা হয়েছে। এ ঘটনা ইতিপূর্বে কয়েক জায়গায় বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। এখানে বর্ণিত সেসব ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে মাত্র। এখানে ঘটনাটি উল্লেখ করার আসল উদ্দেশ্য একথা ব্যক্ত করা যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর খাঁটি ও অনুগত বান্দাদেরকে কিভাবে সাহায্য করেন এবং তাদেরকে কি কি নিয়ামত দ্বারা ভূষিত করেন। সেমতে এখানে আল্লাহ্ তা'আলা মূসা ও হারূন (আ)-এর প্রতি তাঁর নিয়ামতসমূহের আলোচনা করেছেন। আল্লাহ্‌র নিয়ামতসমূহ দু'ধরনের হয়ে থাকে—এক. ধনাত্মক নিয়ামত, অর্থাৎ উপকারী وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ — আয়াতে এ ধরনের নিয়ামতের দিকে ইংগিত রয়েছে। দুই. ঋণাত্মক নিয়ামত। অর্থাৎ ক্ষতি থেকে বাঁচিয়ে রাখার নিয়ামত। পরবর্তী নিয়ামতসমূহে এ ধরনের নিয়ামতের বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٢٣﴾ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٢٤﴾ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ ﴿١٢٥﴾ اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٢٦﴾ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿١٢٧﴾ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿١٢٨﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿١٢٩﴾ سَلَامٌ عَلَىٰ إِلْ يَاسِينَ ﴿١٣٠﴾ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣١﴾ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٣٢﴾

(১২৩) নিশ্চয় ইলিয়াস ছিল রসূল। (১২৪) যখন সে তার সম্প্রদায়কে বলল ঃ তোমরা কি ভয় কর না? (১২৫) তোমরা কি বা'আল দেবতার ইবাদত করবে এবং সর্বোত্তম স্রষ্টাকে পরিত্যাগ করবে (১২৬) যিনি আল্লাহ্, তোমাদের পালনকর্তা এবং তোমাদের পূর্বপুরুষদের পালনকর্তা? (১২৭) অতপর তারা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। অতএব তারা অবশ্যই গ্রেফতার হয়ে আসবে। (১২৮) কিন্তু আল্লাহ্র খাঁটি বান্দাগণ নয়। (১২৯) আমি তার জন্য পরবর্তীদের মধ্যে এ বিষয় রেখে দিয়েছি যে, (১৩০) ইলিয়াসের প্রতি সালাম বর্ষিত হোক! (১৩১) এভাবেই আমি সৎকর্মীদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি। (১৩২) সে ছিল আমার বিশ্বাসী বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং ইলিয়াস (আ)-ও ছিলেন (বনী ইসরাঈলের) রসূলগণের একজন। (তাঁর তখনকার ঘটনা স্মরণ করুন,) যখন তিনি তাঁর (পৌত্তলিক বনী ইসরাঈল) সম্প্রদায়কে বলেছিলেন ঃ তোমরা কি আল্লাহকে ভয় কর না? তোমরা কি বা'আল (যা একটি দেবমূর্তির নাম)-এর পূজা করবে এবং সর্বোত্তম স্রষ্টাকে (অর্থাৎ তাঁর ইবাদতকে) পরিত্যাগ করবে (আল্লাহ্ শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা এজন্য যে, অন্যরা কেবল কোন কোন বস্তুর সংমিশ্রণ ও সংযোজনের ক্ষমতা রাখে, তাও সাময়িকভাবে, কিন্তু আল্লাহ্ যাবতীয় বস্তুকে নাস্তি থেকে অস্তিতে আনয়ন করার ক্ষমতা রাখেন। এছাড়া অন্য কেউ প্রাণ সঞ্চার করতে পারে না, তিনিই প্রাণ সঞ্চার করেন।) যিনি আল্লাহ্, তোমাদের পালনকর্তা এবং তোমাদের পূর্ব পুরুষদেরও পালনকর্তা। অতপর তারা (তওহীদের এই দাবির কারণে) তাঁকে মিথ্যাবাদী বলল ঃ সুতরাং (এই মিথ্যাবাদী বলার কারণে) তারা (পরকালের আযাবে) গ্রেফতার হয়ে আসবে। কিন্তু যারা আল্লাহ্র খাঁটি বান্দা (তারা সওয়াব ও পুরস্কার লাভ করবে)। আমি ইলিয়াসের জন্য পরবর্তীদের মধ্যে (সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত) এ বিষয় রেখে দিয়েছি যে, ইলিয়াসীনের প্রতি (এটাও তাঁর নাম) সালাম বর্ষিত হোক। আমি এমনিভাবে খাঁটি বান্দাদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি। (তাদেরকে প্রশংসা ও দোয়ার যোগ্য করে দিই।) নিশ্চয় তিনি ছিলেন আমার (পূর্ণ) বিশ্বাসী বান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

হযরত ইলিয়াস (আ) ঃ আলোচ্য আয়াতসমূহে চতুর্থ ঘটনা হযরত ইলিয়াস (আ)-এর বর্ণনা করা হয়েছে। আয়াতসমূহের তফসীরের পূর্বে হযরত ইলিয়াস (আ) সম্পর্কে কতিপয় জ্ঞাতব্য বিষয় নিম্নে উল্লেখ করা হল ঃ

কোরআন পাকে মাত্র দু'জায়গায় হযরত ইলিয়াস (আ)-এর আলোচনা দেখা যায়---সূরা আন'আমে ও সূরা সাফ্ফাতের আলোচ্য আয়াতসমূহে। সূরা আন'আমে

কেবল পয়গম্বরগণের তালিকায় তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু কোন ঘটনা বর্ণনা করা হয়নি। তবে এখানে খুবই সংক্ষেপে তাঁর দাওয়াত ও প্রচারের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে।

যেহেতু কোরআন পাকে হযরত ইলিয়াস (আ)-এর জীবনালেখ্য বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়নি এবং নির্ভরযোগ্য হাদীসেও তা নেই, তাই তাঁর সম্পর্কে তফসীরের কিতাবাদিতে যেসব বিভিন্ন উক্তি ও বিচ্ছিন্ন রেওয়ায়েত পাওয়া যায়, এগুলোর অধিকাংশই ইসরাঈলী রেওয়ায়েত থেকে গৃহীত।

অল্পসংখ্যক তফসীরবিদের বক্তব্য এই যে, ইলিয়াস হযরত ইদরীস (আ)-এরই অপর নাম, এই দু' ব্যক্তিত্বের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কেউ কেউ আরও বলেন যে, হযরত ইলিয়াস (আ) ও হযরত খিযির (আ) অভিন্ন ব্যক্তি। (দুররে মনসূর) কিন্তু অনুসন্ধানবিদগণ এসব উক্তিই খণ্ডন করেছেন। কোরআন পাকও হযরত ইদরীস এবং হযরত ইলিয়াস (আ)-এর আলোচনা এমন পৃথক পৃথকভাবে করেছে যে, উভয়কে একই ব্যক্তি সাব্যস্ত করার কোন অবকাশ দেখা যায় না। তাই ইবনে কাসীর তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে বলেন যে, তাঁরা যে আলাদা আলাদা রসূল, এটাই সহীহ্।—(আলবিদায়া ওয়ান্নিহায়া)

নবুয়ত লাভের সময়কাল ও স্থান ঃ হযরত ইলিয়াস (আ) কখন এবং কোথায় প্রেরিত হয়েছিলেন, কোরআন ও হাদীস থেকে তাও জানা যায় না। কিন্তু ঐতিহাসিক ও ইসরাঈলী রেওয়ায়েত এ বিষয়ে প্রায় একমত যে, তিনি হযরত হিয্কীল (আ)-এর পর এবং হযরত আল্‌ইয়াসা' (আ)-র পূর্বে বনী ইসরাঈলের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন। এ সময়ে হযরত সোলায়মান (আ)-এর স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিদের অপকর্মের কারণে বনী ইসরাঈলের সাম্রাজ্য দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। এক অংশকে 'ইয়াহুদাহ্' অথবা 'ইয়াহুদিয়াহ' বলা হত। এর রাজধানী ছিল বায়তুল মোকাদ্দাসে অবস্থিত। আর অপর অংশের নাম ছিল 'ইসরাঈল'। এর রাজধানী তৎকালীন সামেরাহ এবং বর্তমান নাবলুসে অবস্থিত ছিল। হযরত ইলিয়াস (আ) জর্দানে 'জলআদ' নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তখনকার ইসরাঈলের শাসনকর্তার নাম বাইবেলে 'আখিয়াব' এবং আরবী ইতিহাসে 'আজিব' অথবা 'আখিব' বলে উল্লিখিত রয়েছে। তার স্ত্রী ঈযবিল বা'আল নামক এক দেবমূর্তির পূজা করত। সে ইসরাঈলে বা'আলের নামে এক সুবিশাল বধ্যভূমি নির্মাণ করে বনী ইসরাঈলকে মূর্তি পূজায় আকৃষ্ট করেছিল। হযরত ইলিয়াস (আ) আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে এ ভূখণ্ডে তওহীদ প্রচার করার এবং বনী ইসরাঈলকে মূর্তিপূজা থেকে বিরত রাখার নির্দেশ লাভ করেন।—(তফসীরে ইবনে জরীর, ইবনে কাসীর, মযহারী, বাইবেলের কিতাবে সালাতীন)

সম্প্রদায়ের সাথে সংঘর্ষ ঃ অন্যান্য পয়গম্বরকেও নিজ নিজ সম্প্রদায়ের সাথে গুরুতর সংঘর্ষের সম্মুখীন হতে হয়েছে, হযরত ইলিয়াস (আ)-এর বেলাও তার ব্যতিক্রম

ঘটেনি। তবে কোরআন পাক ইতিহাস গ্রন্থ নয়, তাই এসব সংঘর্ষের বিস্তারিত বিবরণদানের পরিবর্তে এতে কেবল এর শিক্ষা ও উপদেশমূলক অংশটি বিবৃত হয়েছে। অর্থাৎ কোরআন কেবল এতটুকু অংশই বর্ণনা করেছে যে, তাঁর সম্প্রদায় তাঁকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করল এবং কয়েকজন নিষ্ঠাবান লোক ছাড়া কেউ তাঁর দাওয়াত গ্রহণ করল না। ফলে পরকালে তাদেরকে ভয়াবহ পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে।

কোন কোন তফসীরবিদ এখানে এ সংঘর্ষের বিস্তারিত অবস্থা বর্ণনা করেছেন। প্রচলিত তফসীরসমূহের মধ্যে তফসীরে মযহারীতে আল্লামা বগভীর বরাত দিয়ে হযরত ইলিয়াস (আ) সম্বন্ধে সবিস্তার আলোচনা করা হয়েছে। এতে উল্লিখিত ঘটনাবলীর প্রায় সবটুকুই বাইবেল থেকে গৃহীত। অন্যান্য তফসীরেও এসব ঘটনার কিছু অংশ ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বেহ, কা'বে আহবার প্রমুখের বরাত সহকারে বর্ণিত হয়েছে, তাদের অধিকাংশই ইসরাঈলী রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন।

এ সমস্ত রেওয়ায়েতের অভিন্ন সার-সংক্ষেপ এই যে, হযরত ইলিয়াস (আ) ইসরাঈলীদের শাসনকর্তা আখিয়াব ও তার প্রজাবৃন্দকে বা'আল দেবমূর্তির পূজা করতে নিষেধ করলেন এবং তওহীদের দাওয়াত দিলেন। কিন্তু দু'একজন সত্যপন্থী ছাড়া কেউ তাঁর কথায় কর্ণপাত করল না, বরং তাঁকে নানাভাবে উত্ত্যক্ত করার চেষ্টা করল। এমনকি, বাদশাহ আখিয়াব ও রাণী ঈযবিল তাকে হত্যা করার পরিকল্পনা তৈরি করল। ফলে তিনি সুদূর এক গুহায় আশ্রয় নিলেন এবং দীর্ঘকাল পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করলেন। অতপর তিনি দোয়া করলেন যেন ইসরাঈলের অধিবাসীরা দুর্ভিক্ষের শিকার হয়। তাতে করে দুর্ভিক্ষ দূর করার জন্য যদি তিনি তাদেরকে মু'জিযা প্রদর্শন করেন, তাহলে হয়তো তারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে। এই দোয়ার ফলে ইসরাঈলে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল।

এরপর হযরত ইলিয়াস (আ) আল্লাহর আদেশে সম্রাট আখিয়াবের সাথে সাক্ষাৎ করে বললেন ঃ এই দুর্ভিক্ষের কারণ আল্লাহর নাফরমানী। তোমরা এখনও বিরত হলে এ আযাব দূর হতে পারে। আমার সত্যতা পরীক্ষা করারও এটা সুবর্ণ সুযোগ। তুমি বলে থাক যে, ইসরাঈল সাম্রাজ্যে তোমাদের উপাস্য বা'আল দেবতার সাড়ে চারশ নবী আছে। তুমি একদিন তাদের সবাইকে আমার সামনে উপস্থিত কর। তারা বা'আল-এর নামে কোরবানী পেশ করুক আর আমি আল্লাহর নামে কুরবানী পেশ করব। যার কুরবানী আকাশ থেকে অগ্নিবিদ্যুৎ এসে ভস্ম করে দেবে, তার ধর্মই সত্য বলে সাব্যস্ত হবে। সবাই এ প্রস্তাব সানন্দে মেনে নিল।

সেমতে 'কোহে করমল' নামক স্থানে উভয় পক্ষের সমাবেশ হল। বা'আল দেবতার মিথ্যা নবীরা তাদের কোরবানী পেশ করল। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত বা'আলের উদ্দেশে অনুনয়-বিনয় সহকারে প্রার্থনা করল, কিন্তু কোন সাড়া পাওয়া গেল না। অতপর হযরত ইলিয়াস (আ) কুরবানী পেশ করলে আকাশ থেকে অগ্নি-বিদ্যুৎ এসে তা ভস্ম করে দিল। এ দৃশ্য দেখে অনেকেই সিজদায় পড়ে গেল। তাদের

সামনে সত্য প্রস্ফুটিত হয়ে উঠল। কিন্তু বা'আল দেবের মিথ্যা নবীরা এর পরেও সত্য গ্রহণ করল না; ফলে হযরত ইলিয়াস (আ) তাদেরকে কায়শুন উপত্যকায় হত্যা করিয়ে দিলেন।

এই ঘটনার পর মুষলধারে বৃষ্টি হল এবং সম্পূর্ণ ভূখণ্ড ধুয়েমুছে সাফ হয়ে গেল। কিন্তু আখিয়াবের পত্নী ঈযবিলের তাতেও চক্ষু খুলল না। সে বিশ্বাস স্থাপনের পরিবর্তে উলটা হযরত ইলিয়াস (আ)-এর শত্রু হয়ে গেল এবং তাকে হত্যা করার প্রস্তুতি শুরু করল। হযরত ইলিয়াস (আ) খবর পেয়ে পুনরায় সামেরাহ থেকে আত্মগোপন করলেন এবং কিছু দিন পর বনী ইসরাঈলের অপর রাষ্ট্র ইয়াহুদিয়াহ পেঁাছে দীনের তবলীগ আরম্ভ করলেন। কারণ, সেখানেও আস্তে আস্তে বা'আল পূজার আধিপত্য ছড়িয়ে পড়েছিল। সেখানকার সম্রাট ইহরামও হযরত ইলিয়াস (আ)-এর কথা শুনল না। অবশেষে হযরত ইলিয়াস (আ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী সেও ধ্বংসপ্রাপ্ত হল। কয়েক বছর পর তিনি আবার ইসরাঈলে ফিরে এলেন এবং আখিয়াব ও তদীয় পুত্র আখযিয়াকে সত্য পথে আনার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তারা পূর্ববৎ কুকর্মেই লিপ্ত রইল। অবশেষে তাদেরকে বৈদেশিক আক্রমণ ও মারাত্মক ব্যাধির শিকার করে দেওয়া হল। অতপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর পয়গম্বরকে তুলে নিলেন।

হযরত ইলিয়াস (আ) জীবিত আছেন কি? ইতিহাসবিদ ও তফসীরবিদদের মধ্যে এখানে এ বিষয়টিও আলোচিত হয়েছে যে, ইলিয়াস (আ) জীবিত আছেন, না মৃত্যুবরণ করেছেন? তফসীরে মযহারীতে বগভীর বরাত দিয়ে বর্ণিত দীর্ঘ রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, ইলিয়াস (আ)-কে অগ্নিঅশ্বে সওয়ার করিয়ে আকাশে তুলে নেওয়া হয় এবং তিনি হযরত ঈসা (আ)-র মতই জীবিত রয়েছেন। আল্লামা সুয়ূতী ও ইবনে আসাকির হাকেম প্রমুখের বরাত দিয়ে একাধিক রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন। সেসব রেওয়ায়েত থেকেও প্রতীয়মান হয় যে, তিনি জীবিত আছেন। কা'বে আবহার বর্ণনা করেন যে, চারজন পয়গম্বর এখনো পর্যন্ত জীবিত আছেন। হযরত খিযির ও হযরত ইলিয়াস—এ দু'জন পৃথিবীতে এবং হযরত ঈসা ও হযরত ইদরীস আকাশে জীবিত আছেন। (দুররে মনসূর)। এমনকি, কেউ কেউ এমনও বলেছেন যে, হযরত খিযির ও হযরত ইলিয়াস (আ) প্রতি বছর রমযান মাসে বায়তুল মোকাদ্দাসে একত্রিত হন এবং রোযা রাখেন।—(কুরতুবী)

কিন্তু হাকেম ও ইবনে কাসীরের মত অনুসন্ধানবিদ আলিমগণ এসব রেওয়ায়েত বিশুদ্ধ মনে করেন নি। তারা এ ধরনের রেওয়ায়েত সম্পর্কে বলেন ঃ

وهو من الاسرائيليات التى لا تصدق و لا تكذب بل الظاهر ان صحتها بعيدة

এগুলো ইসরাঈলী রেওয়ায়েত, যেগুলোকে সত্য বা মিথ্যা কিছুই বলা যায় না। এগুলোর সত্যতা সুদূর পরাহত।—(আলবিদায়া ওয়ান্নিহায়া)

তাঁরা আরও বলেন ঃ

ইবনে আসাকির এমন লোকদেরও একাধিক রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন, যারা হযরত ইলিয়াস (আ)-এর সাক্ষাৎ পেয়েছেন। কিন্তু এগুলো কোনটিই সন্তোষজনক নয়; দুর্বল সনদের কারণে অথবা ঘটনার সাথে যাদেরকে জড়িত করা হয়েছে, তাদের অপরিচিতির কারণে।---(আলবিদায়া ওয়ান্নিহায়া)

হযরত ইলিয়াস (আ)-এর আকাশে উত্থিত হওয়ার মতবাদ যে ইসরাঈলী রেওয়ায়েত থেকে গৃহীত হয়েছে বাহ্যত তাই ঠিক। বাইবেলে আছে ঃ

"আর তাঁরা সামনের দিকে এগুচ্ছিল এবং কথা বলছিল ঃ দেখ, একটি আগ্নেয় রথ ও আগ্নেয় ঘোড়া তাদের দু'জনকে পৃথক করে দিল এবং ইলিয়াহ্ ঘূর্ণি হাওয়ায় আকাশে চলে গেল।"---(সালাতীন---২ ঃ ১১)

এ কারণেই ইহুদীদের মধ্যে এ বিশ্বাস দানা বেঁধে উঠেছিল যে, হযরত ইলিয়াস (আ) পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করবেন। কাজেই হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ) পয়গম্বর-রূপে প্রেরিত হলে তারা তাঁকে ইলিয়াস বলে সন্দেহ করে। ইয়ুহান্নার ইঞ্জিলে আছে ঃ

"তারা তাঁকে জিজ্ঞেস করল ঃ তুমি কে ? তুমি ইলিয়াহ্ ? সে বলল ঃ না, আমি নই।" --(ইয়ুহান্না—১ ঃ ২১)

মনে হয়, কা'বে আহবার, ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বেহ্ এবং অন্যান্য কতিপয় আলিম যাঁরা আহলে-কিতাবদের ধর্মশাস্ত্র বিষয়ে পণ্ডিত ছিলেন তারাই এসব রেওয়ায়েত মুসল-মানদের কাছে বর্ণনা করে থাকবেন। ফলে হযরত ইলিয়াস (আ)-এর অদ্যাবধি জীবিত থাকার মতবাদ কিছু সংখ্যক মুসলমানের মধ্যেও প্রসার লাভ করে। নতুবা ইলিয়াস (আ)-এর জীবিত অথবা আকাশে উত্থিত হওয়ার পক্ষে কোরআন ও হাদীসে কোন প্রমাণ নেই। মুস্তাদরাক হাকেমে একটিমাত্র রেওয়ায়েত পাওয়া যায়, যাতে বলা হয়েছে যে, তাবুক গমনের পথে ইলিয়াস (আ)-এর সাথে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাক্ষাৎ ঘটেছিল। কিন্তু হাদীসবিদদের বর্ণনা অনুযায়ী এ রেওয়ায়েতটি বানোয়াট। হাফেয যাহাবী বলেন ঃ

بل هو موضوع قبح الله من وضعه وما كنت احسب ولا اجوزان الجهل يبلغ بالحاكم الى ان يصحح هذا -

("বরং এই হাদীসটি মওযু। যে ব্যক্তি এই মিথ্যা হাদীস তৈরি করেছে, আল্লাহ্ তার মন্দ করুন। ইতিপূর্বে আমার কল্পনায়ও ছিল না যে, ইমাম হাকিমের অজ্ঞতা এতদূর পৌঁছে যাবে এবং তিনি এই হাদীসকে সহীহ্ বলে দিবেন।")---(দুররে মনসূর)

সারকথা, হযরত ইলিয়াস (আ)-এর জীবিত থাকার বিষয়টি কোন নির্ভরযোগ্য ইসলামী রেওয়ায়েত দ্বারা প্রামাণ্য নয়। সুতরাং এ ব্যাপারে নীরব থাকাই নিরাপত্তার

উত্তম পথ। ইসরাঈলী রেওয়ায়েত সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র শিক্ষা এই যে, "এগুলোকে সত্যও বলবে না এবং মিথ্যাও বলবে না।" ইলিয়াস (আ)-এর ব্যাপারে এ শিক্ষা গ্রহণ করাই বিপদমুক্ত পথ। কেননা কোরআনের তফসীর এবং শিক্ষা ও উপদেশের লক্ষ্য এগুলো ছাড়াও পূর্ণরূপে অর্জিত হতে পারে।

আয়াতসমূহের তফসীর লক্ষণীয়—

أَتَدْعُونَ بَعْلًا—(তোমরা কি বা'আল দেবতার পূজা কর?) 'বা'আল'-এর আভিধানিক অর্থ 'স্বামী', 'মালিক' ইত্যাদি। কিন্তু এটা হযরত ইলিয়াস (আ)-এর সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবমূর্তির নাম ছিল। বা'আল পূজার ইতিহাস খুবই প্রাচীন। হযরত মূসা (আ)-র যমানায় সিরিয়া অঞ্চলে এর পূজা হত এবং এটা ছিল তাদের সর্বাধিক জনপ্রিয় দেবতা। সিরিয়ার প্রসিদ্ধ শহর বা'আলাবাক্কাকেও এ দেবতার নামেই নামকরণ করা হয়েছে। কারও কারও ধারণা এই যে, আরবদের প্রসিদ্ধ দেবমূর্তি হুবালও এই বা'আলেরই অপর নাম।—(কাসাসল কোরআন)

وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ—(এবং সর্বোত্তম স্রষ্টাকে পরিত্যাগ করেছ?) এখানে উদ্দেশ্য আল্লাহ্ তা'আলা। 'সর্বোত্তম স্রষ্টা'-র অর্থ এরূপ নয় যে, অন্য কোন স্রষ্টা হতে পারে। বরং উদ্দেশ্য এই যে, যে সমস্ত মিথ্যা উপাস্যকে তোমরা স্রষ্টা বলে সাব্যস্ত করে রেখেছ, তিনি ওদের সবার তুলনায় অনেক উচ্চ মর্যাদাশীল।—(কুরতুবী)। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন: এখানে خالق শব্দটি صانع (নির্মাতা) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ তিনি সমস্ত নির্মাতার সেরা ও উত্তম নির্মাতা। কেননা অন্যান্য নির্মাতা কেবল বিভিন্ন অংশকে সংযুক্ত করে কোন বস্তু তৈরি করে। কোন বস্তুকে নাস্তি থেকে আস্তিত্বে আনয়ন করা তাদের ক্ষমতার বাইরে। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ তা'আলা অস্তিত্বহীন বস্তুকে অস্তিত্ব দান করার নিজস্বভাবেই ক্ষমতা রাখেন।—(বয়ানুল কোরআন)

আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো সাথে সৃষ্টিগুণকে সম্পৃক্ত করা জায়েয নয়: এখানে স্মর্তব্য যে, خلق শব্দের অর্থ সৃষ্টি করা। অর্থাৎ কোন বস্তুকে নাস্তি থেকে নিজস্ব ক্ষমতায় অস্তিত্বে আনয়ন করা। তাই এটা আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ গুণ। অন্য কারও সাথে এ গুণের সংযুক্তি জায়েয নয়। আমাদের যুগে প্রচলিত রীতি রয়েছে যে, লেখকদের রচনা, কবিদের কবিতা এবং চিত্র শিল্পীদের চিত্রকর্মকে তাদের সৃষ্টি বলে দেওয়া হয়। এটা মোটেই বৈধ নয়। স্রষ্টা আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ হতে পারে না। তাই লেখকদের লেখাকে চিন্তার ফসল অথবা রচনা ইত্যাদি বলাই উচিত—সৃষ্টি নয়।

فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ—(অতপর ওরা তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। ফলে ওদেরকে গ্রেফতার করা হবে।) উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্‌র সত্য রসূলের প্রতি মিথ্যারোপ করার মজা তাদেরকে আস্বাদন করতে হবে। এর অর্থ পরকালের আযাব এবং দুনিয়ার অশুভ পরিণতি উভয়ই হতে পারে। পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, ইলিয়াস (আ)-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার পরিণতিতে ইয়াহুদাহ্ ও ইসরাঈল উভয় সাম্রাজ্য বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিল। এর বিশদ বিবরণ তফসীরে মাযহারীতে এবং বাইবেলে পাওয়া যাবে।

إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ—এখানে مخلصين শব্দের লাম-এর উপর 'যবর' রয়েছে। এর অর্থ হল এমন লোক যাদেরকে নিখাদ করা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যাদেরকে তাঁর আনুগত্য এবং পুরস্কার ও সওয়াবের জন্য খাঁটি করে নিয়েছেন। সুতরাং এর অনুবাদ নিষ্ঠাবান অপেক্ষা 'মনোনীত' করা অধিক সমীচীন।

سَلَامٌ عَلَى إِلْ يَاسِينَ—'ইলিয়াসীন' ও ইলিয়াস (আ)-এর আর এক নাম। আরবরা প্রায়ই অনারব নামের শেষে 'ইয়া' ও 'নূন' বর্ণ যুক্ত করে দেয়। যেমন, سينا থেকে سينين বলে। এখানেও তেমনি দু'টি বর্ণ সংযুক্ত করা হয়েছে।

وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٣٣﴾ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ﴿١٣٤﴾ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ﴿١٣٥﴾ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ ﴿١٣٦﴾ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ ﴿١٣٧﴾ وَبِاللَّيْلِ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٣٨﴾

---

(১৩৩) নিশ্চয় লূত ছিলেন রসূলগণের একজন। (১৩৪) যখন আমি তাকে ও তার পরিবারের সবাইকে উদ্ধার করেছিলাম; (১৩৫) কিন্তু এক বৃদ্ধাকে ছাড়া; সে অন্যদের সঙ্গে থেকে গিয়েছিল। (১৩৬) অতপর অবশিষ্টদেরকে আমি সমূলে উৎপাটিত করেছিলাম। (১৩৭) তোমরা তাদের ধ্বংসস্তূপের উপর দিয়ে গমন কর ভোর বেলায় (১৩৮) এবং সন্ধ্যায়, তার পরেও কি তোমরা বুঝ না?

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নিশ্চয়ই লূত (আ)-ও পয়গম্বরগণের একজন ছিলেন। (তাঁর তখনকার ঘটনা স্মরণীয়—) যখন আমি তাঁকে ও তাঁর পরিবারের সবাইকে উদ্ধার করেছিলাম, কিন্তু

এক বৃদ্ধাকে (অর্থাৎ তাঁর স্ত্রীকে) ছাড়া। সে (আযাবে) যারা থেকে গিয়েছিল, তাদের মধ্যে রয়ে গেল। অতপর আমি অবশিষ্টদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি। (এ কাহিনী কয়েক জায়গায় বর্ণিত হয়েছে। হে মক্কাবাসীরা,) তোমরা তো (সিরিয়ার সফরে) তাদের (ধ্বংসস্তূপের) উপর দিয়ে (কখনও) ভোরে এবং (কখনও) সন্ধ্যায় অতিক্রম কর (এবং ধ্বংসাবশেষ প্রত্যক্ষ কর) তবুও কি তোমরা বুঝ না ? (কুফরের কি পরিণতি হয়েছে এবং যে ভবিষ্যতে কুফর করবে, তার জন্যও এরূপ আশংকা রয়েছে।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহে পঞ্চম ঘটনা হযরত লূত (আ)-এর উল্লেখ করা হয়েছে। এ ঘটনা পূর্বে কয়েক জায়গায় বর্ণিত হয়েছে। তাই এখানে বিস্তারিত বর্ণনার প্রয়োজন নেই। এখানে মক্কার লোকদেরকে বিশেষভাবে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, তোমরা সিরিয়ার বাণিজ্যিক সফরে সাদ্দুমের সে এলাকা দিবারাত্র অতিক্রম কর, যেখানে এসব দৃষ্টান্তমূলক ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু তোমরা এ থেকে কোন শিক্ষা গ্রহণ কর না। 'সকাল' ও 'সন্ধ্যা' বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, আরবরা সাধারণত এ সময়েই এ এলাকা অতিক্রম করত। কাযী আবু সউদ বলেন : খুব সম্ভব সাদ্দুম এলাকাটি রাস্তার এমন মনযিলে অবস্থিত ছিল, যেখান থেকে প্রস্থানকারীরা ভোরে রওয়ানা হত এবং আগমনকারীরা সন্ধ্যায় আগমন করত।—(তফসীরে আবু সউদ)

وَاِنَّ يُوْنُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٣٩﴾ اِذْ اَبَقَ اِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ ﴿١٤٠﴾ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِيْنَ ﴿١٤١﴾ فَالْتَقَمَهُ الْحُوْتُ وَهُوَ مُلِيْمٌ ﴿١٤٢﴾ فَلَوْلَاۤ اَنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِيْنَ ﴿١٤٣﴾ لَلَبِثَ فِيْ بَطْنِهٖۤ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ﴿١٤٤﴾ فَنَبَذْنٰهُ بِالْعَرَآءِ وَهُوَ سَقِيْمٌ ﴿١٤٥﴾ وَاَنْۢبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَّقْطِيْنٍ ﴿١٤٦﴾ وَاَرْسَلْنٰهُ اِلٰى مِائَةِ اَلْفٍ اَوْ يَزِيْدُوْنَ ﴿١٤٧﴾ فَاٰمَنُوْا فَمَتَّعْنٰهُمْ اِلٰى حِيْنٍ ﴿١٤٨﴾

(১৩৯) আর ইউনূসও ছিলেন পয়গম্বরগণের একজন। (১৪০) যখন তিনি পালিয়ে বোঝাই নৌকায় গিয়ে পৌঁছেছিলেন। (১৪১) অতপর লটারী (সুরতি) করালে তিনি দোষী সাব্যস্ত হলেন। (১৪২) অতপর একটি মাছ তাঁকে গিলে ফেলল, তখন তিনি অপরাধী গণ্য হয়েছিলেন। (১৪৩) যদি তিনি আল্লাহ্‌র তসবীহ্ পাঠ না করতেন, (১৪৪) তবে তাঁকে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত মাছের পেটেই থাকতে হত। (১৪৫)

অতপর আমি তাঁকে এক বিস্তীর্ণ-বিজন প্রান্তরে নিক্ষেপ করলাম, তখন তিনি ছিলেন রুগ্ন। (১৪৬) আমি তাঁর উপর এক লতাবিশিষ্ট বৃক্ষ উদ্গত করলাম। (১৪৭) এবং তাঁকে লক্ষ বা ততোধিক লোকের প্রতি প্রেরণ করলাম। (১৪৮) তাঁরা বিশ্বাস স্থাপন করল; অতপর আমি তাদেরকে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত জীবনোপভোগ করতে দিলাম।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নিশ্চয় ইউনুস (আ)-ও পয়গম্বরগণের একজন ছিলেন। (তাঁর তখনকার ঘটনা স্মরণ করুন,) যখন তিনি [তাঁর সম্প্রদায়কে ঈমান না আনার কারণে আল্লাহ্র আদেশে আযাবের ভবিষ্যদ্বাণী শুনিয়ে নিজে সেখান থেকে সরে গেলেন। নির্দিষ্ট সময়ে যখন আযাবের লক্ষণ দেখা দিল, তখন সম্প্রদায়ের লোকেরা ঈমান আনার জন্য ইউনুস (আ)-কে খোঁজাখুঁজি করেও পেল না। অগত্যা তারা আল্লাহ্র উদ্দেশে খুব কান্নাকাটি করল এবং সংক্ষেপে ঈমান আনল। ফলে আযাব অপসারিত হয়ে গেল। ইউনুস (আ) কোনরূপে এ সংবাদ পেয়ে লজ্জার কারণে সেখানে প্রত্যাবর্তন করলেন না এবং আল্লাহ্ তা'আলার প্রকাশ্য অনুমতি ছাড়াই কোন দূরবর্তী স্থানে চলে যাওয়ার ইচ্ছায় তাঁর অবস্থান থেকে] পালিয়ে (রওয়ানা হলেন। পথিমধ্যে নদী ছিল। তাতে ছিল যাত্রী বোঝাই একটি নৌকা, সে) বোঝাই নৌকায় পৌঁছলেন। (নৌকা রওয়ানা হতেই ঝড় দেখা দিল। যাত্রীরা বলল : আমাদের মধ্যে কোন নতুন দোষী ব্যক্তি আছে। তাকে নৌকা থেকে সরিয়ে দেওয়া দরকার। সে লোক-টিকে চিহ্নিত করার জন্য যাত্রীরা লটারী তথা সুরতি করতে একমত হল) অতপর তিনি [অর্থাৎ ইউনুস (আ)] লটারী (সুরতি)-তে অংশগ্রহণ করলেন, (পরীক্ষায়) তিনিই দোষী সাব্যস্ত হলেন। (অর্থাৎ লটারীতে তাঁর নামই উঠল। সুতরাং তিনি নিজেই নদীতে ঝাঁপ দিলেন। সম্ভবত তীর নিকটেই ছিল। তাই কিনারায় পৌঁছার আশায় ঝাঁপ দিয়েছিলেন; আত্মহত্যার ইচ্ছায় নয়।) অতপর (নদীতে ঝাঁপ দেওয়ার পর আমার হুকুমে) একটি মাছ তাকে (আস্ত) গিলে ফেলল। তিনি তখন নিজেকে (এই ইজতেহাদী ভ্রান্তির কারণে) ধিক্কার দিচ্ছিলেন। (এটা ছিল আন্তরিক তওবা। তিনি মুখেও তসবীহ পাঠ করে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন। অন্য এক আয়াতে আছে যে, এই তসবীহ ছিল—لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ) যদি তিনি (তখন আল্লাহ্র) তসবীহ (ও ইস্তেগফার) পাঠ না করতেন, তবে কিয়ামত পর্যন্ত মাছের পেটেই থেকে যেতেন। (উদ্দেশ্য এই যে, মাছের পেট থেকে বের হওয়া সম্ভবপর হত না এবং তিনি মাছেরই খোরাক হয়ে যেতেন।) অতপর (যেহেতু তিনি তসবীহ ও তওবা করেছেন, তাই) আমি (তাঁকে নিরাপদ রেখেছি এবং মাছের পেট থেকে বের করে) তাঁকে এক প্রান্তরে নিক্ষেপ করেছি, (অর্থাৎ আমি মাছটিকে নির্দেশ করলাম যে, তাঁকে নদীতীরে উদ্গীরণ কর।) তিনি তখন রুগ্ন ছিলেন। (কেননা মাছের পেটে পর্যাপ্ত বায়ু ও খাদ্য পৌঁছাত না।) আমি (রৌদ্র থেকে

ছায়া দানের জন্য) তাঁর উপর এক লতাবিশিষ্ট বৃক্ষ উদ্গত করেছি। (এবং একটি পাহাড়ী ছাগল তাঁকে দুধ পান করিয়ে যেত।) আমি তাঁকে এক লক্ষ বা ততোধিক লোকের প্রতি (মুসেলের নিকটবর্তী নায়নুয়া শহরে) প্রেরণ করেছিলাম। অতপর তারা বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। [অর্থাৎ আযাবের লক্ষণ দেখে তারা সংক্ষেপে বিশ্বাস স্থাপন করেছিল এবং মাছের ঘটনার পর ইউনুস (আ) পুনরায় সেখানে গেলে তারা বিস্তারিত বিশ্বাস স্থাপন করেছিল।] অতপর (ঈমানের বরকতে) আমি তাদেরকে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত (অর্থাৎ আয়ুষ্কাল পর্যন্ত স্বাচ্ছন্দ্যের জীবনোপভোগ করতে দিয়েছিলাম।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য সূরায় সর্বশেষ ঘটনা হযরত ইউনুস (আ)-এর বর্ণনা করা হয়েছে। ঘটনাটি সূরা ইউনুসের শেষভাগে সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। উপরে তফসীরের সার-সংক্ষেপেও এর সারকথা এসে গেছে। তাই এখানে পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। তবে বিশেষভাবে আয়াতগুলো সম্পর্কে কতিপয় জরুরী বিষয় নিম্নে উল্লেখ করা হল।

وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ---কোন কোন তফসীর ও ইতিহাসবিদ এ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন যে, হযরত ইউনুস (আ) মাছের ঘটনার পূর্বেই রসূল পদে বরিত হয়েছিলেন, না পরে বরিত হয়েছেন? কেউ কেউ বলেন যে, মাছের ঘটনার পরে তিনি রসূল হন। কিন্তু কোরআন পাকের বাহ্যিক বর্ণনা এবং অনেক রেওয়ায়েতদৃষ্টে এটাই প্রবল যে, তিনি পূর্বেই রসূলপদে অভিষিক্ত ছিলেন। মাছের ঘটনা পরে সংঘটিত হয়।

إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ---(যখন তিনি পলায়ন করেন যাত্রী বোঝাই নৌকার দিকে। إِبَاق শব্দের অর্থ প্রভুর নিকট থেকে কোন গোলামের পালিয়ে যাওয়া। হযরত ইউনুস (আ)-এর জন্য এ শব্দ ব্যবহার করার কারণ এই যে, তিনি তাঁর পরওয়ারদিগারের ওহীর অপেক্ষা না করেই রওয়ানা হয়ে গিয়েছিলেন। পয়গম্বরগণ আল্লাহ্‌র নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দা। তাঁদের সামান্য পদস্খলনও বিরাটাকারে ধরপাকড়ের কারণ হয়ে যায়। এ কারণেই এই কঠোর ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে।

فَسَاهَمَ ---(অর্থাৎ তিনি লটারী তথা সুরতির সম্মুখীন হলেন। এই সুরতি তখন করা হয়, যখন নৌকা নদীর মাঝখানে তুফানে পড়ে এবং অতিরিক্ত বোঝাই হওয়ার কারণে ডুবে যাওয়ার আশংকা দেখা দেয়। এ সময় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, এক ব্যক্তিকে নদীতে ফেলে দেওয়া হোক। কাকে ফেলে দেওয়া হবে, তা নির্ধারণকল্পে এই সুরতি পরীক্ষা করা হয়েছিল যে, লোকটি কে?

লটারী (সুরতি) বিধান ঃ এখানে স্মরণ রাখা দরকার যে, লটারী বা সুরতির মাধ্যমে কারও অধিকার প্রতিষ্ঠা করা যায় না এবং কাউকে অপরাধীও সাব্যস্ত করা যায় না। উদাহরণত লটারীযোগে কাউকে চোর প্রমাণ করা যায় না। এমনিভাবে কোন বিরোধপূর্ণ সম্পত্তির মালিকানার ফয়সালাও লটারী তথা সুরতির মাধ্যমে করা যায় না। তবে লটারী এমনক্ষেত্রে জায়েয বরং উত্তম, যেখানে কোন ব্যক্তি আইনত কয়েকটি বৈধ উপায়ের মধ্য থেকে কোন একটিকে অবলম্বন করার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়। সেখানে সে যদি নিজের ক্ষমতা প্রয়োগ করার পরিবর্তে লটারীর মাধ্যমে কোন একটি উপায় অবলম্বন করে, তবে তা বৈধ। উদাহরণত যদি কারও একাধিক স্ত্রী থাকে, তবে সফরে যাওয়ার সময় যে কোন স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে তার এখতিয়ার রয়েছে। এখন আপন ক্ষমতার প্রয়োগ করার পরিবর্তে লটারীর মাধ্যমে একজনকে বেছে নিলে তা উত্তম হবে। এতে কেউ মনঃক্ষুণ্ণ হবে না। রসূলুল্লাহ্ (সা) তাই করতেন।

হযরত ইউনুস (আ)-এর ঘটনায়ও লটারীযোগে কাউকে অপরাধী প্রমাণিত করা উদ্দেশ্য ছিল না, বরং নৌকাকে বাঁচানোর জন্য যে কাউকে নদীতে ফেলে দেওয়ার ক্ষমতা ছিল। লটারীর মাধ্যমে তাই নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِيْنَ —(অতপর তিনি পরাজিত হলেন।) اِدْحَاض এর আভিধানিক অর্থ কাউকে অকৃতকার্য করে দেওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, লটারীতে তাঁরই নাম বের হয়ে এল এবং তিনি নিজেকে নদীতে নিক্ষেপ করলেন। এতে আত্ম-হত্যার সন্দেহ করা উচিত নয়। কারণ, নদীর কিনারা সম্ভবত নিকটেই ছিল। তিনি সাঁতার কেটে কিনারায় পৌঁছার ইচ্ছায় নদীতে ঝাঁপ দিয়েছিলেন।

فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِيْنَ —এ আয়াত থেকে একথা অনুমান করা ঠিক নয় যে, ইউনুস (আ) তসবীহ্ পাঠ না করলে মাছটি কিয়ামত পর্যন্ত জীবিত থাকত। বরং উদ্দেশ্য এই যে, এ মাছের পেটেই ইউনুস (আ)-এর কবর হয়ে যেত।

তসবীহ্ ও ইস্তেগফার দ্বারা বিপদাপদ দূর হয় ঃ এ আয়াত থেকে আরও জানা গেল যে, বিপদাপদ দূর করার ক্ষেত্রে তসবীহ্ ও ইস্তেগফার বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। সূরা আম্বিয়ায় বর্ণিত হয়েছে যে, ইউনুস (আ) মাছের পেটে থাকা অবস্থায় বিশেষ-ভাবে এ কলেমা পাঠ করতেন ঃ

لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ —এ কলেমার বরকতেই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে এই পরীক্ষা থেকে উদ্ধার করেন। তিনি মাছের পেট থেকে নিরাপদে বেরিয়ে আসেন। এ জন্যই বুযুর্গগণের চিরাচরিত রীতি এই যে, তাঁরা ব্যক্তিগত অথবা সমষ্টিগত বিপদাপদের সময় উল্লিখিত কলেমা সোয়া লাখ

বার পাঠ করেন। এর বরকতে আল্লাহ্ তা'আলা বিপদ দূর করেন।

আবূ দাউদে হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাসের এক রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ মাছের পেটে হযরত ইউনুস (আ)-এর পঠিত দোয়া যে কোন মুসলমান যে কোন উদ্দেশ্যে পাঠ করবে, তার দোয়া কবূল হবে।—(কুরতুবী)

فَنَبَذْنٰهُ بِالْعَرَاۗءِ وَهُوَ سَقِيْمٌ—(অতপর আমি তাঁকে প্রান্তরে নিক্ষেপ করলাম। তিনি তখন পীড়িত ছিলেন।) কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, মাছের পেটে থাকার কারণে ইউনুস (আ) তখন খুবই দুর্বল ছিলেন। তাঁর শরীরে কোন লোমও অবশিষ্ট ছিল না।

وَاَنْۢبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَّقْطِيْنٍ—(আমি তাঁর উপর এক লতাবিশিষ্ট বৃক্ষও উদ্গত করে দিয়েছিলাম।) কাণ্ডবিহীন বৃক্ষকে يقطين বলা হয়। রেওয়ায়েতে লাউ গাছের কথা উল্লেখ আছে। ছায়ার জন্য এ ব্যবস্থা করা হয়েছিল شجرة শব্দ থেকে বোঝা যায় যে, হয় আল্লাহ্ তা'আলা লাউ গাছকেই কাণ্ডবিশিষ্ট করে দিয়েছিলেন, না হয় অন্য কোন বৃক্ষ ছিল যার উপর লতাপাতা জড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, যাতে ছায়া ঘন হয়। অন্যথায় শুধু লতার দ্বারা ছায়া পাওয়া কঠিন।

وَاَرْسَلْنٰهُ اِلٰى مِائَةِ اَلْفٍ اَوْ يَزِيْدُوْنَ—(আমি তাকে এক লাখ অথবা ততোধিক লোকের প্রতি পয়গম্বর করে প্রেরণ করেছিলাম।) এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তো সর্বজ্ঞ, সবকিছুর খবর রাখেন, তিনি এই সন্দেহ প্রকাশ করলেন কেন? এর জওয়াব এই যে, এক লাখ অথবা ততোধিক---এ বাক্যটি সাধারণ মানুষ সম্পর্কে বলা হয়েছে। অর্থাৎ একজন সাধারণ মানুষ তাদেরকে দেখলে একথা বলত যে, তাদের সংখ্যা এক লাখ অথবা তার চেয়ে কিছু বেশী। হযরত থানভী (র) বলেন ঃ এখানে সন্দেহ প্রকাশ উদ্দেশ্যই নয়। তাদেরকে এক লাখও বলা যায়, ততোধিকও বলা যায়। কারণ, ভগ্নাংশের প্রতি লক্ষ্য না করলে তাদের সংখ্যা এক লাখ ছিল এবং ভগ্নাংশও গণনা করা হলে একলাখের কিছু বেশী ছিল।----(বয়ানুল কোরআন)

এ বাক্যটি যেহেতু মাছের ঘটনার পরে উল্লিখিত হয়েছে, তাই এর ভিত্তিতে কোন কোন তফসীরবিদ বলেন যে, ইউনুস (আ) এ ঘটনার পরে নবুয়ত লাভ করে-ছিলেন। আল্লামা বগভী এমনও বলেছেন যে, এ আয়াতে তাঁকে নায়নুয়ার দিকে প্রেরণ করার উল্লেখ নেই; বরং মাছের ঘটনার পরে তাঁকে অন্য এক সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করা হয়েছিল। তাদের সংখ্যা ছিল এক লাখ অথবা ততোধিক। কিন্তু কোর-

আন পাক ও হাদীস থেকে এ উক্তির সমর্থন পাওয়া যায় না। এখানে ঘটনার শুরুতেই ইউনুস (আ)-এর রিসালত উল্লেখ করা হয়েছে। এতে বোঝা যায় যে, মাছের ঘটনা রসূল হওয়ার পরে সংঘটিত হয়েছে। অতপর এখানে বাক্যটির পুনরাবৃত্তি করার কারণ এই যে, সুস্থ হওয়ার পর তাঁকে পুনরায় সেখানেই প্রেরণ করা হয়েছিল। এতে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, তারা অল্পসংখ্যক লোক ছিল না, বরং তাদের সংখ্যা ছিল লাখেরও উপরে।

فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ—(বস্তুত তারা বিশ্বাস স্থাপন করল, ফলে আমি তাদেরকে কিছুকাল পর্যন্ত জীবনোপভোগ করতে দিলাম।) 'কিছুকাল পর্যন্ত' -এর উদ্দেশ্য এই যে, যতদিন তারা পুনরায় কুফর ও শিরকে লিপ্ত না হল, ততদিন তারা আযাব থেকেও বেঁচে রইল।

মির্যা কাদিয়ানীর বিভ্রান্তির জওয়াব ঃ হযরত ইউনুস (আ)-এর সম্প্রদায় যথা-সময়ে ঈমান গ্রহণ করার কারণে তাদের উপর থেকে আযাব সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। এটা সূরা ইউনুসের তফসীরেও বর্ণিত হয়েছে এবং আলোচ্য আয়াত থেকেও ফুটে উঠেছে। এরই ফলশ্রুতিতে পাঞ্জাবের মিথ্যা নবী মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর বিভ্রান্তির অবসান হয়ে যায়। সে তার বিরোধীদেরকে চ্যালেঞ্জ করেছিল, যদি তারা বিরোধিতা অব্যাহত রাখে, তবে অমুক সময়ে তাদের উপর আযাব এসে যাবে। এটা আল্লাহ্র ফয়সালা। কিন্তু এই চ্যালেঞ্জের পরেও বিরোধী পক্ষের তৎপরতা আরও বেড়ে যায় অথচ আযাব আসেনি। তখন এই ব্যর্থতার গ্লানি ঢাকা দেওয়ার জন্য কাদিয়ানী বলতে শুরু করে যে, বিরোধীরা মনে মনে ভীত হয়ে পড়েছে, তাই আযাব অপসারিত হয়ে গেছে। যেমন, ইউনুস (আ)-এর সম্প্রদায়ের উপর থেকে সরে গিয়েছিল। কোরআন পাকের আলোচ্য আয়াত এ অপব্যাখ্যা প্রত্যাখ্যান করে। কারণ, ইউনুস (আ)-এর সম্প্রদায় ঈমানের কারণে আযাব থেকে রক্ষা পেয়েছিল। এর বিপরীতে কাদিয়ানীর বিরোধীপক্ষ ঈমান আনা দূরের কথা তার বিরুদ্ধে আরও কোমর বেঁধে লেগে গিয়েছিলেন।

فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ ﴿١٤٩﴾ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ ﴿١٥٠﴾ أَلَا إِنَّهُم مِّنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ ﴿١٥١﴾ وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿١٥٢﴾ أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ ﴿١٥٣﴾ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿١٥٤﴾ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٥﴾ أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُّبِينٌ ﴿١٥٦﴾ فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنتُمْ

صٰدِقِيْنَ ﴿١٥٧﴾ وَجَعَلُوْا بَيْنَهٗ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا ۚ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ اِنَّهُمْ لَمُحْضَرُوْنَ ﴿١٥٨﴾ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿١٥٩﴾ اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ ﴿١٦٠﴾ فَاِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ ﴿١٦١﴾ مَآ اَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفٰتِنِيْنَ ﴿١٦٢﴾ اِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيْمِ ﴿١٦٣﴾ وَمَا مِنَّآ اِلَّا لَهٗ مَقَامٌ مَّعْلُوْمٌ ﴿١٦٤﴾ وَّاِنَّا لَنَحْنُ الصَّآفُّوْنَ ﴿١٦٥﴾ وَاِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُوْنَ ﴿١٦٦﴾

(১৪৯) এবার তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, তোমার পালনকর্তার জন্য কি কন্যা-সন্তান রয়েছে এবং তাদের জন্য কি পুত্র-সন্তান? (১৫০) নাকি আমি তাদের উপ-স্থিতিতে ফেরেশতাগণকে নারীরূপে সৃষ্টি করেছি? (১৫১) জেনো; তারা মনগড়া উক্তি করে যে, (১৫২) 'আল্লাহ্ সন্তান জন্ম দিয়েছেন।' নিশ্চয় তারা মিথ্যাবাদী। (১৫৩) তিনি কি পুত্র-সন্তানের স্থলে কন্যা-সন্তান পছন্দ করেছেন? (১৫৪) তোমা-দের কি হল, তোমাদের এ কেমন সিদ্ধান্ত? (১৫৫) তোমরা কি অনুধাবন কর না? (১৫৬) না কি তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট কোন দলীল রয়েছে? (১৫৭) তোমরা সত্যবাদী হলে তোমাদের কিতাব আন। (১৫৮) তারা আল্লাহ্ ও জিনদের মধ্যে সম্পর্ক সাব্যস্ত করেছে, অথচ জিনেরা জানে যে, তারা গ্রেফতার হয়ে আসবে। (১৫৯) তারা যা বলে তা থেকে আল্লাহ্ পবিত্র। (১৬০) তবে যারা আল্লাহ্র নিষ্ঠাবান বান্দা, তারা গ্রেফতার হয়ে আসবে না। (১৬১) অতএব তোমরা এবং তোমরা যাদের উপাসনা কর, (১৬২) তাদের কাউকেই তাঁর হাত থেকে বিভ্রান্ত করতে পারবে না (১৬৩) শুধুমাত্র তাদের ছাড়া যারা জাহান্নামে পেঁৗছবে। (১৬৪) আমাদের প্রত্যেকের জন্য রয়েছে নির্দিষ্ট স্থান। (১৬৫) এবং আমরাই সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান থাকি (১৬৬) এবং আমরাই আল্লাহ্র পবিত্রতা ঘোষণা করি।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(উপরে তওহীদের প্রমাণাদি বর্ণিত হয়েছে।) অতপর [যারা ফেরেশতাগণকে আল্লাহ্র কন্যা এবং জিন সরদারদের কন্যাদেরকে ফেরেশতাগণের জননী বলে সাব্যস্ত করে---(নাউযুবিল্লাহ) যাতে ফেরেশতাগণের সাথে আল্লাহ্ তা'আলার বংশগত সম্পর্ক এবং জিনদের সাথে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক অপরিহার্য হয়ে পড়ে----যারা আল্লাহ্র সাথে ফেরেশতা ও জিন জাতিকে এভাবে শরীক স্থির করে] তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন, আল্লাহ্র জন্য কি রয়েছে কন্যা-সন্তান আর তাদের জন্য কি পুত্র-সন্তান। (অর্থাৎ তোমরা যখন নিজেদের জন্য পুত্র-সন্তান পছন্দ কর, তখন উপরোক্ত বিশ্বাসে আল্লাহ্র

জন্য কন্যা-সন্তান কেমন করে সাব্যস্ত কর? এই হচ্ছে সে বিশ্বাসের প্রথম ত্রুটি। আরও শোন,) না কি আমি তাদের উপস্থিতিতে ফেরেশতাগণকে নারীরূপে সৃষ্টি করেছি? (অর্থাৎ দ্বিতীয় ত্রুটি এই যে, তারা বিনা প্রমাণে ফেরেশতাগণের প্রতি নারীত্বের অপবাদ আরোপ করে।) জেনে রাখ, (তাদের কোন প্রমাণ নেই, বরং নিছক) তারা মনগড়া উক্তি করে যে, আল্লাহ্ সন্তান জন্ম দিয়েছেন। নিশ্চয়ই তারা মিথ্যাবাদী। (সুতরাং এ বিশ্বাসের তৃতীয় ত্রুটি এই যে, এতে আল্লাহ্র সন্তান হওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়ে। প্রথম ত্রুটি যে মন্দ তা সাধারণ প্রচলন দ্বারা, দ্বিতীয় ত্রুটি যে মন্দ, তা ইতিহাস-ভিত্তিক প্রমাণ দ্বারা এবং তৃতীয় ত্রুটি যে মন্দ, তা যুক্তি-ভিত্তিক দলীল দ্বারা প্রমাণিত। মূর্খদের জন্য কোন বিষয় সাধারণের মধ্যে মন্দ প্রমাণিত করা হলে তা অধিক কার্যকর হয়ে থাকে। তাই প্রথম ত্রুটি ভিন্ন ভঙ্গিতে পুনরায় বর্ণনা করা হচ্ছে—) আল্লাহ্ কি পুত্র সন্তানের পরিবর্তে কন্যাসন্তান পছন্দ করেছেন? তোমাদের কি হল? তোমাদের এ কেমন সিদ্ধান্ত, (যা সাধারণের মধ্যে তোমরাও মন্দ মনে কর।) তোমরা কি অনুধাবন কর না (যে, এই বিশ্বাস যুক্তি-প্রমাণেরও পরিপন্থী? যদি যুক্তি-প্রমাণ না থাকে, তবে) তোমাদের কাছে এর সুস্পষ্ট কোন (ইতিহাস-ভিত্তিক) দলিল আছে কি? তোমরা (এতে) সত্যবাদী হলে তোমাদের কিতাব উপস্থিত কর। (উপরোক্ত বিশ্বাসে ফেরেশতাগণকে সন্তান স্থির করা ছাড়াও) তারা আল্লাহ্র মধ্যে ও জিনদের মধ্যে সম্পর্ক স্থির করেছে, (যা আরও স্পষ্টরূপে বাতিল। কেননা, যে কাজের জন্য স্ত্রী দরকার, আল্লাহ্ তা থেকে পবিত্র। সুতরাং দাম্পত্য সম্পর্ক অসম্ভব হলে তারই শাখা—শ্বশুর সম্পর্কও অসম্ভব হবে।) অথচ জিনেরা জানে যে, তারা (অর্থাৎ তাদের কাফিররা আযাবে) গ্রেফতার হবে। (কারণ তারা আল্লাহ্ সম্পর্কে মন্দ বিষয়াদি বর্ণনা করে। অথচ) আল্লাহ্ সেসব বিষয় থেকে পবিত্র, যা তারা বর্ণনা করে। (সুতরাং এসব বর্ণনার কারণে তারা আযাবে গ্রেফতার হবে।) কিন্তু যারা আল্লাহ্র খাঁটি (অর্থাৎ মু'মিন) বান্দা, (তারা আযাব থেকে বেঁচে থাকবে)। অতএব তোমরা এবং তোমরা যেসব উপাস্যের পূজা কর, তারা (সবাই মিলেও) আল্লাহ্ থেকে কাউকে বিচ্যুত করতে পারবে না, (বস্তুত তোমরা তো এ চেষ্টাই কর।) কিন্তু তাকেই (বিচ্যুত করতে পারবে) যে (আল্লাহ্র জ্ঞানে) জাহান্নামে পৌঁছবে। (অতপর বলা হচ্ছে যে, তাদের মধ্যে যারা ফেরেশতা, তারা বলে, আমরা তো কেবল দাস। আমাদেরকে যে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে, তাতে) আমাদের প্রত্যেকের জন্য এক নির্দিষ্ট স্তর রয়েছে (আমরা তাই পালনে রত থাকি। নিজের খেয়াল-খুশীমত কিছুই করতে পারি না।) আমরা (আল্লাহ্র সামনে তাঁর হুকুম শোনার সময় অথবা তাঁর ইবাদত করার সময় আদব সহকারে) সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান থাকি এবং আল্লাহ্র পবিত্রতাও বর্ণনা করি। (ফেরেশতাগণ নিজেরাই যখন দাসত্ব স্বীকার করছে, তখন তাদেরকে উপাস্য বলে সন্দেহ করা নিরেট বোকামি। সুতরাং জিন ও ফেরেশতাগণকে আল্লাহ্রূপে বিশ্বাস করা উত্তমরূপে বাতিল প্রমাণিত হল।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পয়গম্বরগণের ঘটনাবলী উপদেশ ও শিক্ষার উদ্দেশ্যে বর্ণিত হয়েছিল। এখন আবার তওহীদ সপ্রমাণ করা ও শিরক বাতিল করার আসল বিষয়বস্তু বর্ণনা করা হচ্ছে। এখানে এক বিশেষ ধরনের শিরক খণ্ডন করা হয়েছে। মক্কার কাফিরদের বিশ্বাস ছিল যে, ফেরেশতাগণ আল্লাহ্‌র কন্যা এবং জিন সরদার-দুহিতারা ফেরেশতা-গণের জননী। আল্লামা ওয়াহেদী বলেনঃ এ বিশ্বাস কোরাইশ গোত্র ছাড়াও জুহাইনা, বনূ সালমা, বনু-খোযা'য়া ও বনূ সালীহ্‌দের মধ্যেও বদ্ধমূল ছিল।---(তফসীর-কবীর)

فَاسْتَفْتِهِمْ ... إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ—এসব আয়াতে কাফিরদের উপরোক্ত বিশ্বাস খণ্ডনের দলীল পেশ করা হয়েছে। এসব দলীলের সারমর্ম এই যে, প্রথমত তোমাদের এ বিশ্বাস স্বয়ং তোমাদের প্রচলিত প্রথা-পদ্ধতির দিক দিয়ে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। কারণ, তোমরা কন্যা-সন্তানকে লজ্জার কারণ মনে কর। যে বস্তু তোমাদের জন্য লজ্জাজনক, তা আল্লাহ্‌র জন্য কেন লজ্জাজনক হবে না? এরপর তোমরা ফেরেশতা-গণকে আল্লাহ্‌র কন্যা বলে সাব্যস্ত করেছ। তোমাদের কাছে এর কোন দলীল আছে কি? কোন দাবি প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিন রকম দলীল হতে পারে--(১) চাক্ষুষ দলীল, (২) ইতিহাসভিত্তিক দলীল অর্থাৎ এমন ব্যক্তির উক্তি, যার সততা সর্বজন-স্বীকৃত এবং (৩) যুক্তিভিত্তিক দলীল। প্রথমোক্ত দলীল নিশ্চিত অনুপস্থিত। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা যখন ফেরেশতাগণকে সৃষ্টি করেন, তখন তোমরা উপস্থিত ছিলে না। কাজেই ফেরেশতাগণ যে নারী, তা জানা সম্ভব নয়।

أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ—আয়াতের মতলব তাই। ইতিহাসভিত্তিক দলীলও তোমাদের কাছে নেই। কারণ, সর্বজনস্বীকৃত সত্যবাদী ব্যক্তির উক্তিই ধর্তব্য হয়ে থাকে। অথচ যারা এই বিশ্বাসের প্রবক্তা, তারা মিথ্যাবাদী, সুতরাং তাদের উক্তি দলীল হতে পারে না।

أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ—আয়াতের অর্থ তাই। পক্ষান্তরে যুক্তি-গত দলীলও তোমাদের সমর্থন করে না। কারণ, স্বয়ং তোমাদের ধারণা অনুযায়ী পুত্র-সন্তানের মুকাবিলায় কন্যা-সন্তান হীন। এখন যে সত্তা সমগ্র সৃষ্টজগতের সেরা তিনি নিজের জন্য হীন বস্তু কেমন করে পছন্দ করতে পারেন? أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ— আয়াতের উদ্দেশ্য তাই। এখন একটিমাত্র পথ অবশিষ্ট থাকে। তা এই যে, কোন আসমানী কিতাব ওহীর মাধ্যমে তোমাদেরকে এই বিশ্বাস শিক্ষা

দিয়েছে। এমনটি হয়ে থাকলে সে ওহী ও কিতাব এনে দেখাও। أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُّبِينٌ فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ — আয়াতের অর্থ তাই।

হঠকারীদের জন্য আক্রমণাত্মক উত্তরই অধিক উপযুক্ত ঃ আলোচ্য আয়াত-সমূহ থেকে জানা গেল যে, যারা হঠকারিতায় বদ্ধপরিকর, তাদেরকে আক্রমণাত্মক জওয়াব দেওয়াই অধিক উপযুক্ত। আক্রমণাত্মক জওয়াব বলা হয় প্রতিপক্ষের দাবি তারই অন্য কোন স্বীকৃত নীতি দ্বারা খণ্ডন করা। এতে এটা জরুরী হয় না যে, সেই অন্য নীতি আমরাও স্বীকার করি; বরং প্রায়ই সে নীতিও ভ্রান্ত হয়ে থাকে। কিন্তু প্রতিপক্ষকে বোঝানোর জন্য একে কাজে লাগানো হয়। এখানে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের বিশ্বাস খণ্ডন করার জন্য স্বয়ং তাদেরই এই নীতি ব্যবহার করেছেন যে, কন্যা-সন্তান লজ্জা ও দোষের বিষয়। বলা বাহুল্য, এর অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ্ তা-'আলার মতেও কন্যা-সন্তান লজ্জার বিষয়। এছাড়া এর অর্থ এমনও নয় যে, কাফিররা ফেরেশতাগণকে আল্লাহ্র কন্যা-সন্তান না বলে পুত্র-সন্তান বললে সঠিক হত। বরং এটা ইলযামী জওয়াব, যার লক্ষ্য স্বয়ং তাদেরই স্বীকৃত ধারণা দিয়ে তাদের বিশ্বাসকে খণ্ডন করা। নতুবা এ জাতীয় বিশ্বাসের সত্যিকার জওয়াব তাই, যা কোর-আন পাকের কয়েক জায়গায় উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ্ অভাবমুক্ত, তাঁর কোন সন্তানের প্রয়োজন নেই এবং সন্তান থাকা তাঁর মহান মর্যাদার যোগ্যও নয়।

وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا — (তারা আল্লাহ্ তা'আলা ও জিনদের মধ্যে বংশ সম্পর্ক স্থির করেছে।) এটা মুশরিকদের ভ্রান্ত বিশ্বাসের বর্ণনা যে, জিন সরদার-দুহিতারা ফেরেশতাগণের জননী। কাজেই (নাউযুবিল্লাহ্) আল্লাহ্ তা'আলা ও জিন সরদার-দুহিতাদের মধ্যে দাম্পত্য সম্পর্ক হল। এই সম্পর্কের ফলেই ফেরেশতা-গণ জন্মলাভ করেছে। এক রেওয়ায়েতে আছে, মুশরিকরা যখন ফেরেশতাগণকে আল্লাহ্র কন্যা সাব্যস্ত করল, তখন হযরত আবু বকর (রা) জিজ্ঞেস করলেন ঃ তবে তাদের জননী কে? তারা জওয়াবে বলল ঃ জিন-সরদার-দুহিতারা।---(ইবনে-কাসীর)। কিন্তু এই তফসীরে খট্‌কা থেকে যায় যে, আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ও জিনদের মধ্যে 'বংশগত সম্পর্কের উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু এ সম্পর্ক তো বংশগত সম্পর্ক নয়।

সুতরাং অপর একটি তফসীর এখানে অগ্রগণ্য মনে হয়, যা হযরত ইবনে-আব্বাস, হাসান বসরী ও যাহ্হাক থেকে বর্ণিত রয়েছে। তাঁরা বলেন ঃ কোন কোন আরববাসীর বিশ্বাস ছিল যে, ইবলীস আল্লাহ্র ভ্রাতা (নাউযুবিল্লাহ্)। আল্লাহ্ মঙ্গলের স্রষ্টা আর সে অমঙ্গলের স্রষ্টা। এখানে এই বাতিল বিশ্বাস খণ্ডন করা হয়েছে।

وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ — (জিনদের বিশ্বাস এই যে,

তারা গ্রেফতার হবে।) উদ্দেশ্য এই যে, যেসব শয়তান ও জ্বিনকে তোমরা আল্লাহ্র সাথে শরীক স্থির করে রেখেছ, তারা স্বয়ং ভালরূপেই জানে যে, পরকালে তাদেরকেও মন্দ পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে। উদাহরণত ইবলীস তার অশুভ পরিণতি সম্পর্কে সম্যক অবগত রয়েছে। এখন যে নিজেই আযাবে গ্রেফতার হওয়ার দৃঢ় বিশ্বাস রাখে, তাকে আল্লাহ্র সমকক্ষ স্থির করা কত বড় বোকামি!

وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ ﴿١٦٧﴾ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ ﴿١٦٨﴾ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿١٦٩﴾ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿١٧٠﴾ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ﴿١٧١﴾ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ ﴿١٧٢﴾ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴿١٧٣﴾ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿١٧٤﴾ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿١٧٥﴾ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿١٧٦﴾ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ ﴿١٧٧﴾ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿١٧٨﴾ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿١٧٩﴾

---

(১৬৭) তারা তো বলত (১৬৮) যদি আমাদের কাছে পূর্ববর্তীদের কোন উপদেশ থাকত, (১৬৯) তবে আমরা অবশ্যই আল্লাহ্র মনোনীত বান্দা হতাম। (১৭০) বস্তুত তারা এই কোরআনকে অস্বীকার করেছে। এখন শীঘ্রই তারা জেনে নিতে পারবে, (১৭১) আমার রসূল বান্দাগণের ব্যাপারে আমার এই বাক্য সত্য হয়েছে যে, (১৭২) অবশ্যই তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হয়, (১৭৩) আর আমার বাহিনীই হয় বিজয়ী। (১৭৪) অতএব আপনি কিছুকালের জন্য তাদেরকে উপেক্ষা করুন (১৭৫) এবং তাদেরকে দেখতে থাকুন। শীঘ্রই তারাও এর পরিণাম দেখে নেবে। (১৭৬) আমার আযাব কি তারা দ্রুত কামনা করে? (১৭৭) অতপর যখন তাদের আঙিনায় আযাব নাযিল হবে তখন যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল, তাদের সকালবেলাটি হবে খুবই মন্দ। (১৭৮) আপনি কিছুকালের জন্য তাদেরকে উপেক্ষা করুন (১৭৯) এবং দেখতে থাকুন, শীঘ্রই তারাও এর পরিণাম দেখে নেবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তারা [অর্থাৎ আরবের কাফিররা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নবুয়ত লাভের পূর্বে] বলত, যদি আমাদের কাছে পূর্ববর্তীদের (গ্রন্থের মত) কোন উপদেশ থাকত, (অর্থাৎ ইহুদী ও খৃস্টানদের কাছে যেমন রসূল ও কিতাব এসেছে, আমাদের জন্যও যদি তেমন

হত,) তবে আমরা আল্লাহ্র খাঁটি বান্দা হতাম। (অর্থাৎ সেই কিতাবকে সত্য মনে করতাম এবং তা মেনে চলতাম--তাদের মত মিথ্যারোপ ও বিরোধিতা করতাম না।) অতপর (যখন সে উপদেশগ্রন্থ কোরআন রসূলের মাধ্যমে তাদের কাছে পেঁছাল, তখন) তারা একে অস্বীকার করতে শুরু করেছে। তারা তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে। কাজেই শীঘ্রই তারা (এর পরিণাম) জেনে নেবে। [সে মতে মৃত্যুর সাথে সাথেই কুফরের পরিণাম সামনে এসে গেছে এবং কোন কোন শাস্তি মৃত্যুর পূর্বেও ভোগ করেছে। অতপর রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, শত্রু পক্ষের বর্তমান শান-শওকত ক্ষণস্থায়ী। কেননা,] আমার রসূল বান্দাগণের জন্য আমার এই বাক্য পূর্ব থেকেই (অর্থাৎ লওহে-মাহফুযেই) অবধারিত আছে যে, নিশ্চয় তারাই হবে প্রবল এবং (আমার সাধারণ নিয়ম এই যে,) আমার বাহিনীই বিজয়ী হয়ে থাকে। (এতে রসূলের অনুসারিগণও অন্তর্ভুক্ত।) অতএব, আপনি (আশ্বস্ত হোন এবং) কিছুকালের জন্য (সবর করুন এবং তাদের বিরোধিতা ও উৎপীড়ন থেকে) মুখ ফিরিয়ে রাখুন এবং তাদেরকে দেখতে থাকুন। শীঘ্রই তারাও দেখে নেবে। (অর্থাৎ মৃত্যুর পরেও এবং মৃত্যুর পূর্বেও তাদেরকে শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। ভীতি প্রদর্শনের হুমকির পরে তারা বলতে পারত এবং বলতও যে, এরূপ কবে হবে। এর জওয়াবে বলা হয়েছে ঃ) তারা কি আমার আযাব দ্রুত কামনা করে? অতপর যখন তাদের আঙিনায় আযাব নাযিল হবে, তখন যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল, তাদের দিন খুবই মন্দ হবে (আযাব সরবে না)। অতএব আপনি (আশ্বস্ত হোন এবং) কিছুকাল পর্যন্ত (সবর করুন,) তাদের (বিরোধিতা ও উৎপীড়নের প্রতি) খেয়াল করবেন না এবং (তাদেরকে) দেখতে থাকুন (অর্থাৎ অপেক্ষা করুন)। শীঘ্রই তারাও দেখে নেবে। (অর্থাৎ আপনি তো শুনেই বিশ্বাস করেন, তারা দেখে বিশ্বাস করবে।)

আনুষঙ্গিক-জ্ঞাতব্য বিষয়

ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসসমূহ যুক্তি-প্রমাণের দ্বারা সপ্রমাণ করার পর আলোচ্য আয়াতসমূহে কাফিরদের হঠকারিতা বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে, তারা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নবুয়ত আগমনের পূর্বে বাসনা প্রকাশ করে বলত যে, কোন পয়গম্বর আগমন করলে আমরা তাঁর অনুসরণ করতাম। কিন্তু যখন মহানবী (সা)-র আগমন ঘটল, তখন তারা জেদ ও হঠকারিতার পথ অবলম্বন করল। অতপর রসূলে করীম (সা)-কে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, আপনি তাদের উৎপীড়নে মনঃক্ষুণ্ণ হবেন না। সেদিন দূরে নয়, যখন আপনি বিজয়ী ও কৃতকার্য হবেন এবং তারা হবে পরাভূত ও আযাবের লক্ষ্যবস্তু। পরকালে তো তা পরিপূর্ণভাবেই দেখা যাবে, তদুপরি দুনিয়া-তেও আল্লাহ্ দেখিয়েছেন যে, বদর যুদ্ধ থেকে মক্কা বিজয় পর্যন্ত প্রতিটি জিহাদে আল্লাহ্ তাঁর রসূলকে সাফল্য দান করেছেন এবং শত্রু পক্ষকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করেছেন।

আল্লাহ্‌ ওয়ালাদের বিজয়ের মর্ম ঃ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا ـ ـ ـ وَاِنَّ جُنْدَنَا

لَهُمُ الْغَالِبُوْنَ— ---এসব আয়াতের অর্থ এই যে, আমি পূর্বাহ্নেই স্থির করে রেখেছি যে, আমার বিশেষ অনুগ্রহপ্রাপ্ত বান্দা পয়গম্বরগণই বিজয়ী হবেন। এতে প্রশ্ন হতে পারে যে, কোন কোন পয়গম্বর তো দুনিয়াতে বিজয়ী হননি। জওয়াব এই যে, জানা পয়গম্বরগণের মধ্যে অধিকাংশ পয়গম্বরের সম্প্রদায় মিথ্যারোপের অপরাধে আযাবে পতিত হয়েছে, কিন্তু পয়গম্বরগণকে আযাব থেকে দূরে রাখা হয়েছে। মাত্র কয়েকজন পয়গম্বর দুনিয়াতে শেষ পর্যন্ত বৈষয়িক বিজয় লাভ করতে সক্ষম হন নি, কিন্তু যুক্তিতর্কে তাঁরাই সর্বদা ঊর্ধ্বে রয়েছেন এবং আদর্শগত বিজয় লাভ করেছেন। তবে এই বিজয়ের বৈষয়িক আলামত পরীক্ষা ইত্যাদির মত বিশেষ কোন উপযোগিতার কারণে পরকাল পর্যন্ত পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। হযরত থানভী (র)-র ভাষায় এর দৃষ্টান্ত এমন যে, কোন ঘৃণিত দস্যু কোন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তার সাথে সফররত অবস্থায় পথি-মধ্যে দস্যুবৃত্তিতে লিপ্ত হলে সরকারী কর্মকর্তা আল্লাহ্‌-প্রদত্ত অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার কারণে হয়ত দস্যুকে তোষামোদ করবেন; কিন্তু রাজধানীতে পৌঁছে দস্যুকে গ্রেফতার করে শাস্তি দেবে। সুতরাং এই সাময়িক প্রতিপত্তির কারণে দস্যুকে শাসক এবং কর্মকর্তাকে শাসিত বলা যায় না। বরং আসল অবস্থার দিক দিয়ে দস্যু প্রতিপত্তির অবস্থায়ও শাস্তিত এবং সরকারী কর্মকর্তা পরাভূত অবস্থায়ও শাসক। এ বিষয়টিই হযরত ইবনে আব্বাস (রা) সংক্ষিপ্ত ও সাবলীল ভঙ্গীতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, اِنْ لَّمْ يُنْصَرُوْا فِى الدُّنْيَا يُنْصَرُوْا فِى الْاٰخِرَةِ-(বয়ানুল কোরআন)

কিন্তু সর্বদা মনে রাখা দরকার যে, পার্থিব বিজয় হোক কিংবা পারলৌকিক বিজয়, কোন জাতি কেবল বংশগত বৈশিষ্ট্য অথবা ধর্মের সাথে নামেমাত্র সম্পর্কের দ্বারা তা অর্জন করতে পারে না। বরং মানুষ যখন নিজেকে আল্লাহ্‌র বাহিনীর একজন সৈনিকরূপে গড়ে তোলে, তখনই তা অর্জিত হতে পারে। এর অপরিহার্য মর্মার্থ হচ্ছে এই যে, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র আনুগত্যকে লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। এখানে جُنْدَنَا (আমার বাহিনী) শব্দটি ব্যক্ত করছে যে, যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে সে নিজের সকল কর্মশক্তি শয়তানী শক্তির বিরুদ্ধে ব্যয় করার জন্য আল্লাহ্‌র সাথে চুক্তি করে। এই শর্তের উপরই বৈষয়িক অথবা আদর্শগত, পার্থিব অথবা পার-লৌকিক বিজয় নির্ভরশীল।

فَاِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ—(যখন সে আযাব তাদের আঙিনায় নেমে আসবে, তখন যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল, তাদের সে সকাল বেলাটি হবে খুবই মন্দ।) আরবী বাক-পদ্ধতিতে আঙিনায় নেমে আসার অর্থ কোন

বিপদ একেবারে সামনে এসে উপস্থিত হওয়া বোঝায়। 'সকাল' বলার কারণ এই যে, আরবে শত্রুরা সাধারণত এ সময়েই আক্রমণ পরিচালনা করত। রসূলুল্লাহ্ (সা)-ও তাই করতেন। তিনি কোন শত্রুর ভূখণ্ডে রাত্রি বেলায় পৌঁছালেও আক্রমণের জন্য সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন।—(মাযহারী)। হাদীসে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ (সা) যখন সকাল বেলায় খয়বর দুর্গ আক্রমণ করেন, তখন এই বাক্যাবলী উচ্চারণ করেনঃ الله اكبر خربت خيبر، انا اذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين (অর্থাৎ আল্লাহ্ মহান। খয়বর বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। আমরা যখন কোন সম্প্রদায়ের আঙিনায় অবতরণ করি, তখন যাদেরকে পূর্ব-সতর্ক করা হয়েছিল, তাদের সকাল খুবই মন্দ হয়।)

سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ۝ وَسَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ۝ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

---

(১৮০) পবিত্র আপনার পরওয়ারদিগারের সত্তা, তিনি সম্মানিত ও পবিত্র, যা তারা বর্ণনা করে তা থেকে। (১৮১) পয়গম্বরগণের প্রতি সালাম বর্ষিত হোক। (১৮২) সমস্ত প্রশংসা বিশ্বপালক আল্লাহ্‌র নিমিত্ত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনার মহান পরওয়ারদিগার যিনি বিরাট মহিমার অধিকারী সেসব বিষয় থেকে পবিত্র যা তারা (কাফিররা) বর্ণনা করে। (অতএব আল্লাহ্‌কে এসব বিষয় থেকে পবিত্রই সাব্যস্ত করুন এবং পয়গম্বরগণকে অবশ্য অনুসরণীয় মনে করুন। কেননা আমি তাঁদের শানে বলিঃ) সালাম বর্ষিত হোক পয়গম্বরগণের প্রতি (এবং আল্লাহ্‌কে শিরক ইত্যাদি থেকে পবিত্র মনে করার সাথে সাথে তাঁকে সর্বগুণে গুণান্বিতও মনে করুন। কেননা) সমস্ত প্রশংসা বিশ্বপালক (ও মালিক) আল্লাহ্ তা'আলারই নিমিত্ত।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

উপরোক্ত আয়াতগুলোর মাধ্যমে সূরা সাফ্‌ফাত সমাপ্ত করা হয়েছে। সত্য বলতে কি, এই সুন্দর সমাপ্তির ব্যাখ্যার জন্য বিরাট পুস্তক দরকার। সংক্ষেপে বলা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা এই সংক্ষিপ্ত তিনটি আয়াতের মধ্যে সূরার সমস্ত বিষয়বস্তু ভরে দিয়েছেন। তওহীদের বর্ণনা দ্বারা সূরার সূচনা হয়েছিল, যার সার-মর্ম ছিল এই যে, মুশরিকরা আল্লাহ্ সম্পর্কে যেসব বিষয় বর্ণনা করে, আল্লাহ্ তা'আলা সেগুলো থেকে পবিত্র। সেমতে আলোচ্য প্রথম আয়াতে সে দীর্ঘ বিষয়বস্তুর

দিকেই ইঙ্গিত রয়েছে। এরপর সূরায় পয়গম্বরগণের ঘটনাবলী বর্ণিত হয়েছিল। সেমতে দ্বিতীয় আয়াতে সেগুলোর দিকে ইশারা করা হয়েছে। অতপর পুংখানুপুংখরূপে কাফিরদের বিশ্বাস, সন্দেহ ও আপত্তিসমূহ যুক্তি ও উক্তির মাধ্যমে খণ্ডন করে বলা হয়েছিল যে, শেষ বিজয় সত্যপন্থীরাই অর্জন করবে। এসব বিষয়বস্তু যে ব্যক্তিই জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি সহকারে পাঠ করবে, সে অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা ও স্তুতি পাঠ করতে বাধ্য হবে। সেমতে এই প্রশংসা ও স্তুতির উপরই সূরার সমাপ্তি টানা হয়েছে।

এছাড়া এই তিন আয়াতে ইসলামের বুনিয়াদী বিশ্বাস---তওহীদ ও রিসালতের বিষয় প্রত্যক্ষভাবে এবং পরকালের বিষয় পরোক্ষভাবে স্থান পেয়েছে। এগুলো সপ্রমাণ করাই ছিল সূরার আসল লক্ষ্য। এতদসঙ্গে এ শিক্ষাও দেওয়া হয়েছে যে, মু'মিনের কর্তব্য তার প্রত্যেকটি প্রসঙ্গ, ভাষণ ও বৈঠক আল্লাহ্র মহত্ত্ব বর্ণনা ও প্রশংসা দিয়ে সমাপ্ত করবে। সেমতে আল্লামা কুরতুবী এ ক্ষেত্রে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা)-র একটি উক্তি বর্ণনা করেছেন। তিনি বললেনঃ আমি রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে নামায সমাপনান্তে سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ —এই আয়াত তিনটি তিলাওয়াত করতে একাধিকবার শুনেছি। এছাড়া কতিপয় তফসীর গ্রন্থে এ মর্মে হযরত আলী (রা)-র উক্তি বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন পূর্ণমাত্রায় পুরস্কার পেতে চায়, তার প্রত্যেক বৈঠক শেষে এই আয়াতত্রয় তিলাওয়াত করা উচিত। এ উক্তিই ইবনে আবী হাতেম হযরত শা'বীর বাচনিক রসূলুল্লাহ্ (সা) থেকেও বর্ণনা করেছেন।—(তফসীর ইবনে কাসীর)

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -

سُوْرَةُ صٓ

সূরা ছোয়াদ

মক্কায় অবতীর্ণ, ৫ রুকূ, ৮৮ আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

صٓ وَالْقُرْاٰنِ ذِي الذِّكْرِ ۝١ بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ عِزَّةٍ وَّشِقَاقٍ ۝٢

كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ فَنَادَوْا وَّلَاتَ حِيْنَ مَنَاصٍ ۝٣

وَعَجِبُوْۤا اَنْ جَآءَهُمْ مُّنْذِرٌ مِّنْهُمْ ز وَقَالَ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا سٰحِرٌ كَذَّابٌ ۝٤

اَجَعَلَ الْاٰلِهَةَ اِلٰهًا وَّاحِدًا ۚ اِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ۝٥ وَانْطَلَقَ الْمَلَاُ مِنْهُمْ

اَنِ امْشُوْا وَاصْبِرُوْا عَلٰۤى اٰلِهَتِكُمْ ۚ اِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ يُّرَادُ ۝٦ مَا سَمِعْنَا بِهٰذَا

فِي الْمِلَّةِ الْاٰخِرَةِ ۚ اِنْ هٰذَاۤ اِلَّا اخْتِلَاقٌ ۝٧ ءَاُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ

بَيْنِنَا ۭ بَلْ هُمْ فِيْ شَكٍّ مِّنْ ذِكْرِيْ ۚ بَلْ لَّمَّا يَذُوْقُوْا عَذَابِ ۝٨ اَمْ

عِنْدَهُمْ خَزَآئِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيْزِ الْوَهَّابِ ۝٩ اَمْ لَهُمْ مُّلْكُ السَّمٰوٰتِ

وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۣ فَلْيَرْتَقُوْا فِي الْاَسْبَابِ ۝١٠ جُنْدٌ مَّا هُنَالِكَ

مَهْزُوْمٌ مِّنَ الْاَحْزَابِ ۝١١ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّعَادٌ وَّفِرْعَوْنُ ذُو

الْاَوْتَادِ ۝١٢ وَثَمُوْدُ وَقَوْمُ لُوْطٍ وَّاَصْحٰبُ لْئَيْكَةِ ۭ اُولٰٓئِكَ الْاَحْزَابُ ۝١٣

اِنْ كُلٌّ اِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ۝١٤ وَمَا يَنْظُرُ هٰۤؤُلَآءِ اِلَّا صَيْحَةً

وَّاحِدَةً مَّا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ ۝١٥ وَقَالُوْا رَبَّنَا عَجِّلْ لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ

الْحِسَابِ ۝١٦

পরম করুণাময় ও অসীম দয়াবান আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) ছোয়াদ—শপথ উপদেশপূর্ণ কোরআনের, (২) বরং যারা কাফির, তারা অহংকার ও বিরোধিতায় লিপ্ত। (৩) তাদের আগে আমি কত জনগোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছি, অতপর তারা আর্তনাদ করতে শুরু করেছে, কিন্তু তাদের নিষ্কৃতি লাভের সময় ছিল না। (৪) তারা বিস্ময়বোধ করে যে, তাদেরই কাছে তাদের মধ্য থেকে একজন সতর্ককারী আগমন করেছেন। আর কাফিররা বলে এ-তো এক মিথ্যাচারী যাদুকর। (৫) সে কি বহু উপাস্যের পরিবর্তে এক উপাস্যের উপাসনা সাব্যস্ত করে দিয়েছে। নিশ্চয় এটা এক বিস্ময়কর ব্যাপার! (৬) তাদের কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি এ কথা বলে প্রস্থান করে যে, তোমরা চলে যাও এবং তোমাদের উপাস্যদের পূজায় দৃঢ় থাক। নিশ্চয়ই এ বক্তব্য কোন বিশেষ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। (৭) আমরা সাবেক ধর্মে এ ধরনের কথা শুনিনি। এটা মনগড়া ব্যাপার বৈ নয়। (৮) আমাদের মধ্য থেকে শুধু কি তারই প্রতি উপদেশবাণী অবতীর্ণ হল? বস্তুত ওরা আমার উপদেশ সম্পর্কে সন্দিহান; বরং ওরা এখনও আমার শাস্তি আস্বাদন করেনি। (৯) না কি তাদের কাছে আপনার পরাক্রান্ত দয়াবান পালনকর্তার রহমতের কোন ভাণ্ডার রয়েছে? (১০) না কি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর উপর তাদের সাম্রাজ্য রয়েছে? থাকলে তাদের আকাশে আরোহণ করা উচিত রশি ঝুলিয়ে। (১১) এক্ষেত্রে বহু বাহিনীর মধ্যে ওদেরও এক বাহিনী আছে, যা পরাজিত হবে। (১২) তাদের পূর্বেও মিথ্যারোপ করেছিল নূহের সম্প্রদায়, আদ, কীলকবিশিষ্ট ফেরাউন, (১৩) সামূদ, লূতের সম্প্রদায় ও আইকার লোকেরা; এরাই ছিল বহু বাহিনী। (১৪) এদের প্রত্যেকেই পয়গম্বরগণের প্রতি মিথ্যারোপ করেছে। ফলে আমার আযাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। (১৫) কেবল একটি মহানাদের অপেক্ষা করছে, যাতে দম ফেলার অবকাশ থাকবে না। (১৬) তারা বলে, হে আমাদের পরওয়ারদিগার, আমাদের প্রাপ্য অংশ হিসাব দিবসের আগেই দিয়ে দাও।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

ছোয়াদ (এর অর্থ আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন।)—কসম উপদেশপূর্ণ কোরআনের, (কাফিররা আপনার রিসালত অস্বীকার করে যা কিছু বলছে তা যথার্থ নয়) বরং (স্বয়ং) এ কাফিররাই বিদ্বেষ ও (সত্যের) বিরোধিতায় লিপ্ত রয়েছে। এ বিদ্বেষ ও বিরোধিতার শাস্তি একদিন তাদেরকেই ভোগ করতে হবে। (যেমন,) তাদের পূর্বে অনেক উম্মতকে আমি (আযাব দ্বারা) ধ্বংস করেছি। অতপর তারা (ধ্বংস হওয়ার সময়) বড়ই হা-হুতাশ করে ডেকেছে (এবং আর্তনাদ করেছে) কিন্তু (তা করলে কি হবে,) তখন নিষ্কৃতি লাভের সময় ছিল না। (কারণ আযাব এসে গেলে তওবাও কবুল হয় না।) তারা (কোরায়শ কাফিররা) এ ব্যাপারে বিস্ময়বোধ করে যে, তাদের কাছে তাদেরই মধ্য থেকে (অর্থাৎ যিনি তাদের মতই মানুষ) একজন সতর্ককারী (পয়গম্বর) আগমন করেছেন। (বিস্ময়ের কারণ ছিল এই যে, তারা

اللّٰه اعلم ما لا — অর্থাৎ এ দুদিন এমন যাহা আল্লাহ্ নিজ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। এ দুদিন সম্পর্কে আল্লাহ্ পাকই সর্বাধিক জ্ঞাত এবং আল্লাহ্ পাকের গ্রন্থের যে বিষয় সম্পর্কে অবহিত নই সে সম্পর্কে কোন মন্তব্য করা অবাঞ্ছনীয় বলে মনে করি (ইহা আবদুর রাজ্জাক ও হাকেম বর্ণনা করেছেন এবং তা বিশুদ্ধ বলে মন্তব্য করেছেন)।

দুনিয়ার সকল বস্তুই মূলত উত্তম ও কল্যাণকর, অকল্যাণ ও অপকৃষ্টতা শুধু তার ভ্রান্ত ব্যবহারের কারণেঃ اَلَّذِىْٓ اَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهٗ অর্থাৎ যিনি যাবতীয় বস্তু অত্যন্ত সুন্দর ও নিপুণভাবে সৃষ্টি করেছেন। কারণ এ বিশ্ব-জগতে তিনি যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, তা এ জগতের কল্যাণ ও মঙ্গলোপযোগী করেই সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং এ প্রতিটি বস্তুই মূলত এক বিশেষ সৌন্দর্যের অধিকারী। এদের মধ্যে সর্বাধিক উত্তম ও সুন্দর করে মানবকে সৃষ্টি করেছেন। যেমন ইরশাদ করেছেনঃ لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِىْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ অর্থাৎ নিশ্চয় আমি মানবকে অতি সুন্দর গঠন ও উত্তম আকৃতি-প্রকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছি। অন্যান্য সৃষ্ট বস্তু বাহ্যত যত অশ্লীল ও অকল্যাণকরই মনে হোক না কেন---কুকুর, শূকর সাপ, বিচ্ছু, সিংহ, বাঘ প্রভৃতি বিষধর ও হিংস্র জন্তু সাধারণ দৃষ্টিতে অকল্যাণকর বলে মনে হয়। কিন্তু, গোটা বিশ্বের মঙ্গলামঙ্গল বিবেচনায় এগুলো কোনটাই অপকৃষ্ট অমঙ্গলকর নয়। জনৈক কবি বলেনঃ

نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں
کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں

বিশ্বমাঝারে পাবে না কিছু অকেজো অসার
অকর্মা হেথা নাহি কিছু লীলাক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র ।।

হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (র) বলেছেন যে, যাবতীয় মৌলিক এবং আনুষঙ্গিক বস্তু كُلَّ شَيْءٍ-এর অন্তর্গত। অর্থাৎ যে সব বস্তু মৌলিক সত্তার অধিকারী ও দৃশ্যমান যথা---প্রাণীজগত, উদ্ভিদ জগত, জড় জগত প্রভৃতি এবং আনুষঙ্গিক অদৃশ্য বস্তু যথা, স্বভাব-চরিত্র ও আমলসমূহ সবই এর অন্তর্ভুক্ত। এমন কি যেগুলো কুচরিত্র ও কুস্বভাব বলে কথিত যথা, ক্রোধ, লোভ, যৌন কামনা প্রভৃতি ও প্রকৃতিগতভাবে খারাপ নয়। যথাস্থানে ও যথাসময়ে ব্যবহৃত না হওয়ার দরুন এগুলো অপকৃষ্ট ও অকল্যাণকর প্রতিপন্ন হয়। যথাস্থলে ব্যবহৃত হলে এগুলোর কোনটাই খারাপ ও অমঙ্গলজনক নয়। কিন্তু এ দ্বারা এসব বস্তুর সৃষ্টিগত দিকই উদ্দেশ্য---যা নিঃসন্দেহে শুভ ও সুন্দর কিন্তু আমলের অপর দিক মানব কর্তৃক তা সাধন ও অর্জন---অর্থাৎ কোন কাজ সম্পর্কে

নিজস্ব ইচ্ছা নিয়োজিত করা। এ দিক দিয়ে সবকিছু শুভ ও সুন্দর নয়, আল্লাহ্ পাক যেগুলো করতে অনুমতি দেননি সেগুলো সুন্দর ও কল্যাণকর নয়ঃ অশ্লীল ও অপকৃষ্ট।

وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ---ইতিপূর্বে এ কথাই ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ পাক বিশ্ব-জগতের যাবতীয় বস্তু অতি সুন্দর ও নিখুঁতভাবে সৃষ্টি করেছেন। অতপর এর মাঝে সর্বাধিক সুদর্শন ও মনোরম মানুষের আলোচনা করেছেন। এর সাথে তাঁর পূর্ণ ও অনন্য ক্ষমতা প্রকাশার্থে এ কথাও ব্যক্ত করেছিলেন যে, মানবকে আমি সর্বোত্তম সেরা সৃষ্টি করে তৈরী করেছি। তার সৃষ্টি উপকরণ সর্বোন্নত ও সর্বোৎকৃষ্ট বলে সে শ্রেষ্ঠ নয়। বরং তার সৃষ্টি উপকরণ তো নিকৃষ্টতম বস্তু---বীর্য। অতপর তাঁর অনন্য ক্ষমতা ও অসাধারণ সৃষ্টিকৌশল প্রয়োগ করে এই নিকৃষ্টতম বস্তুকে সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন সেরা সৃষ্টিতে রূপান্তরিত করেছেন।

وَقَالُوٓا۟ ءَإِذَا ضَلَلْنَا فِى ٱلْأَرْضِ ءَإِنَّا لَفِى خَلْقٍ جَدِيدٍۭ ۚ بَلْ هُم بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ كَـٰفِرُونَ ⑩ قُلْ يَتَوَفَّىٰكُم مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِى وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ⑪ وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذِ ٱلْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا۟ رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَآ أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَٱرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَـٰلِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ⑫ وَلَوْ شِئْنَا لَـَٔاتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَىٰهَا وَلَـٰكِنْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنِّى لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ⑬ فَذُوقُوا۟ بِمَا نَسِيتُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَـٰذَآ إِنَّا نَسِينَـٰكُمْ وَذُوقُوا۟ عَذَابَ ٱلْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ⑭ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِـَٔايَـٰتِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا۟ بِهَا خَرُّوا۟ سُجَّدًا وَسَبَّحُوا۟ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ۩ ⑮ تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَـٰهُمْ يُنفِقُونَ ⑯ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ

مَّآ أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍۢ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾ أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا ۚ لَّا يَسْتَوُۥنَ ﴿١٨﴾ أَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ فَلَهُمْ جَنَّـٰتُ ٱلْمَأْوَىٰ نُزُلًۢا بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُوا۟ فَمَأْوَىٰهُمُ ٱلنَّارُ ۖ كُلَّمَآ أَرَادُوٓا۟ أَن يَخْرُجُوا۟ مِنْهَآ أُعِيدُوا۟ فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا۟ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِى كُنتُم بِهِۦ تُكَذِّبُونَ ﴿٢٠﴾ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَدْنَىٰ دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢١﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِـَٔايَـٰتِ رَبِّهِۦ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَآ ۚ إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ﴿٢٢﴾

(১০) তারা বলে, আমরা মৃত্তিকায় মিশ্রিত হয়ে গেলেও পুনরায় নতুন করে সৃজিত হব কি ? বরং তারা তাদের পালনকর্তার সাক্ষাতকে অস্বীকার করে। (১১) বলুন, তোমাদের প্রাণ হরণের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা তোমাদের প্রাণ হরণ করবে। অতপর তোমরা তোমাদের পালনকর্তার কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে। (১২) যদি আপনি দেখতেন যখন অপরাধীরা তাদের পালনকর্তার সামনে নতশির হয়ে বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা দেখলাম ও শ্রবণ করলাম। এখন আমাদেরকে পাঠিয়ে দিন, আমরা সৎকর্ম করব। আমরা দৃঢ়বিশ্বাসী হয়ে গেছি। (১৩) আমি ইচ্ছে করলে প্রত্যেককে সঠিক দিক নির্দেশ দিতাম ; কিন্তু আমার এ উক্তি অবধারিত সত্য যে, আমি জ্বিন ও মানব সকলকে দিয়ে অবশ্যই জাহান্নাম পূর্ণ করব। (১৪) অতএব এ দিবসকে ভুলে যাওয়ার কারণে তোমরা মজা আস্বাদন কর। আমিও তোমাদেরকে ভুলে গেলাম। তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের কারণে স্থায়ী আযাব ভোগ কর। (১৫) কেবল তারাই আমার আয়াতসমূহের প্রতি ঈমান আনে, যারা আয়াতসমূহ দ্বারা উপদেশপ্রাপ্ত হয়ে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে এবং অহংকারমুক্ত হয়ে তাদের পালনকর্তার সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করে। (১৬) তাদের পার্শ্ব শয্যা থেকে আলাদা থাকে। তারা তাদের পালনকর্তার ডাকে ভয়ে ও আশংকায় এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে। (১৭) কেউ জানে না তার জন্য কৃতকর্মের কি কি নয়ন-প্রীতিকর প্রতিদান লুক্কায়িত আছে। (১৮) ঈমানদার ব্যক্তি কি অবাধ্যের অনুরূপ? তারা সমান নয়। (১৯) যারা

ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তাদের জন্য রয়েছে তাদের কৃতকর্মের আপ্যায়ন-স্বরূপ বসবাসের জান্নাত। (২০) পক্ষান্তরে যারা অবাধ্য হয়, তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। যখনই তারা জাহান্নাম থেকে বের হতে চাইবে, তখনই তাদেরকে তথায় ফিরিয়ে দেয়া হবে এবং তাদেরকে বলা হবে, তোমরা জাহান্নামের যে আযাবকে মিথ্যা বলতে, তার স্বাদ আস্বাদন কর। (২১) গুরু শাস্তির পূর্বে আমি অবশ্যই তাদেরকে লঘু শাস্তি আস্বাদন করাব, যাতে তারা প্রত্যাবর্তন করে। (২২) যে ব্যক্তিকে তার পালনকর্তার আয়াতসমূহ দ্বারা উপদেশ দান করা হয়, অতঃপর সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার চেয়ে জালিম আর কে? আমি অপরাধীদেরকে শাস্তি দেব।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং এসব (কাফিরগণ) বলে যে, আমরা যখন মাটিতে (মিশে) একেবারে বিলীন হয়ে যাবো তখন কি আমরা (কিয়ামতের দিন) আবার নবজন্ম লাভ করবো (এদের বাহ্যিক কথাবার্তায় বোঝা যায় যে, তারা কিয়ামত দিবসের পুনরুত্থান ও পুনর্মিলন সম্পর্কে কেবল বিস্ময়ই প্রকাশ করছে না) বরং (প্রকৃত প্রস্তাবে) এসব লোক স্বীয় পালনকর্তার সন্দর্শন সম্বন্ধেও অবিশ্বাসী (এবং আলোচ্য আয়াতে أَسَنْفُهَا م—প্রশ্নবোধক বাক্যের ব্যবহার অস্বীকৃতি প্রকাশার্থেই ব্যবহৃত হয়েছে) আপনি (উত্তরে) বলে দিন যে, (আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে) মৃত্যু সংঘটন কার্যের নির্ধারিত ফেরেশতা তোমাদের প্রাণ বিয়োগ ঘটাবেন; তৎপর তোমরা স্বীয় পালনকর্তার দিকেই প্রত্যাবর্তিত হবে। (উত্তরের মাঝে আসল উদ্দেশ্যই এই تُرْجَعُوْنَ—প্রত্যাবর্তিত হবে এবং ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে মাঝখানে يَتَوَفّٰكُمْ—তোমাদের মৃত্যু ঘটবে একথা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে—ফেরেশতার মাধ্যমে তোমাদের প্রাণবিয়োগও ঘটবে—যাঁরা প্রাণ বের করার সময় তোমাদেরকে মারধরও করবেন। যেমন অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَلَوْ تَرٰى اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِيْنَ كَفَرُوا الْمَلٰٓئِكَةُ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ الخ -

অর্থাৎ হে নবী, আপনি যদি ফেরেশতাগণ কর্তৃক কাফিরদের মুখমণ্ডল (শরীরের সম্মুখাংশ) ও পশ্চাদাংশে আঘাত করে করে মৃত্যু ঘটানোর করুণ অবস্থা দেখতে পেতেন। সুতরাং মৃত্যুর পরিণতি কেবল মাটির সাথে মিশে যাওয়াই নয়. যেমন তোমাদের উক্তি ءَاِذَا ضَلَلْنَا الخ দ্বারা বোঝা যায় এবং তাদের—প্রত্যাবর্তিত হওয়া-কালীন অবস্থা) যদি আপনি দেখতে পেতেন—যখন এসব অপরাধীগণ (নিজ কৃতকর্মের জন্য চরমভাবে

লজ্জিত হয়ে) স্বীয় পালনকর্তার সম্মুখে নতশিরে (দাঁড়িয়ে) থাকবে (এবং বলতে থাকবে) হে আমাদের পালনকর্তা (এখন) আমাদের চোখ-কান খুলে গেছে (এবং পয়গম্বরগণ যে কথা বলেছেন তা সবই সত্য ছিল) সুতরাং আমাদেরকে (পৃথিবীতে) আবার প্রেরণ করুন। আমরা (এবার গিয়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে) সৎকাজ করবো। (এখন) আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপিত হয়েছে। এবং (তাদের এরূপ বক্তব্য সম্পূর্ণ অসার প্রতিপন্ন হবে। কেননা) যদি আমি এরূপ ইচ্ছা করতাম (যে তারা অবশ্যই সঠিক পথ লাভ করুক) তবে আমি প্রত্যেক লোককে তার (মুক্তি ও কল্যাণের) রাস্তা (ইপ্সিত লক্ষ্যে পেঁ ছানো রূপ স্তর পর্যন্ত) অবশ্যই প্রদান করতাম (যে তারা অবশ্যই সঠিক পথ লাভ করুক) তবে আমি প্রত্যেক লোককে তার (মুক্তি ও কল্যাণের) রাস্তা (ঈপ্সিত লক্ষ্যে পেঁছানো রূপ স্তর পর্যন্ত) অবশ্যই প্রদান করতাম (যেরূপভাবে তাদেরকে কাম্য পথ প্রদর্শনার্থে হিদায়ত প্রদান করেছি।) কিন্তু আমার এই (চিরন্তন সুনির্ধারিত) কথা (অগণিত হিকমত দ্বারা) সপ্রমাণিত যে, আমি নরককে মানব-দানব উভয়ের (মধ্যে যারা কাফির তাদের দ্বারা) অবশ্যই পরিপূর্ণ করে দেব। (এবং কতক হিকমতের বর্ণনা সূরায়ে হূদের শেষ ভাগে অনুরূপ আয়াতের তফসীরে বর্ণিত হয়েছে।) তখন (তাদেরকে বলা হবে) এখন তোমরা যে দিনের সন্দর্শন সম্বন্ধে বিস্মৃত হয়েছিলে তার আস্বাদ গ্রহণ কর, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের বিস্মৃত হলাম (অর্থাৎ করুণা ও দয়া থেকে বঞ্চিত করে দেওয়াকে বিস্মৃত হয়ে গেছে বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং) আমি যে তাদেরকে আস্বাদ গ্রহণ করতে বলেছি তা কেবল দু-এক দিনের জন্য নয়। (বরং এর নিগূঢ় তত্ত্ব এই যে,) স্বীয় পাপ কর্মসমূহের বদৌলতে চিরন্তন শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ কর। (এ তো হলো কাফিরদের অবস্থা ও পরি-ণতি। পরবর্তী পর্যায়ে মু'মিনগণের অবস্থা ও তাদের পরিণামের কথা বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ) আমার আয়াতসমূহের প্রতি কেবল তারাই বিশ্বাস স্থাপন করে যাদেরকে যখনই এসব আয়াতসমূহ স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় তখনই তারা সিজদায় পড়ে যায় (যার বিশ্লেষণ পূর্বে সূরায়ে মরিয়মের চতুর্থ রুকূতে করা হয়েছে) এবং স্বীয় পালনকর্তার প্রশংসা-স্তুতি করতে থাকে এবং তারা (ঈমান লাভের দরুন) অহংকার করে না। (যেমনটি হয় কাফিরদের বেলায়—وَلّٰى مُسْتَكْبِرًا—গর্বস্ফীত হয়ে অবজ্ঞাভরে মুখমণ্ডল ফিরিয়ে রাখে। এ তো তাদের বক্তব্য-বিশ্বাস ও চরিত্রগত অবস্থা। এবং তাদের আমলের অবস্থা এই যে, রাতের বেলায়) তাদের (শরীরের) পার্শ্বদেশ শয্যা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা থাকে (ইশার ফরযের কারণে হোক বা তাহাজ্জুদের কারণে, এর ফলে সকল রেওয়ায়েতের সমন্বয় সাধিত হলো। কেবল আলাদাই থাকে না, বরং) এরূপভাবে (আলাদা থাকে) যে, তারা স্বীয় পালনকর্তাকে (সওয়াবের) আশায় এবং (শাস্তির) ভয়ে আহ্বান করতে থাকে (নামায, দোয়া ও যিক্‌র সবই এর অন্তর্ভুক্ত) এবং আমি তাদেরকে যা কিছু দান করেছি তা হতে ব্যয় করে। (সারকথা এগুলো মু'মিনগণের গুণাবলী। তন্মধ্যে কতকগুলো এমন যেগুলোর উপর মূল ঈমান নির্ভর করে এবং কতকগুলোর

উপর ঈমানের পরিপূর্ণতা নির্ভর করে) সুতরাং এদের জন্য অদৃশ্য ভাণ্ডারে এদের চোখ সুশীতল ও পরিতৃপ্তকারী কি সব বস্তু বিদ্যমান রয়েছে, তা কেউ অবগত নয়। এগুলো তারা তাদের কৃতকর্মের প্রতিদান স্বরূপ লাভ করবে। (এবং যখন উভয় দলের অবস্থা ও পরিণাম ফল জানতে পেলে) তবে (এখন বল তো) যে বিশ্বাস স্থাপনকারী সে অপকৃষ্ট দুষ্কৃতিকারীদের অনুরূপ হতে পারে কি? তারা পরস্পর (অবস্থাগত ও পরিণামগত কোনভাবেই) সমতুল্য হতে পারে না (যা জানাও গেছে। বিশেষ করে পরিণামগত অসমতুল্য হওয়ার বর্ণনা বিশেষ অবগতির জন্য আবার শুনে নাও যে) যেসব লোক ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে (পরকালে) স্বর্গোদ্যানই তাদের চিরস্থায়ী বাসস্থান। স্রা তারা তাদের কৃত সৎকাজের বিনিময়ে আতিথ্য স্বরূপ লাভ করবে (অর্থাৎ অতিথি-বৃন্দের ন্যায় এসব বস্তু বিশেষ মর্যাদা ও সম্মানের সাথে লাভ করবে—অভাবগ্রস্ত ভিক্ষুকের ন্যায় গ্লানি ও অমর্যাদার সাথে নয়) এবং যারা নির্দেশ অমান্যকারী, অবাধ্য, তাদের বাসস্থান নরক। যখন তারা এখান থেকে বের হতে চাইবে (এবং এতদুদ্দেশ্যে কিনারাভিমুখে অগ্রসর হবে। যদিও অত্যন্ত গভীর ও দ্বার রুদ্ধ হওয়ার দরুন বের হওয়া সম্ভব হবে না। কিন্তু সে সময়ে তাদের এরূপ স্বাভাবিক গতিবিধির পর) পুনরায় তাদেরকে ধাক্কা মেরে ঠেলে দেওয়া হবে এবং তাদেরকে বলা হবে যে, তোমরা সেই নরকাগ্নির শাস্তি আস্বাদন কর—যা তোমরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে প্রয়াস পেতে (কিন্তু অঙ্গীকারকৃত শাস্তি তো পরকালে হবে এবং) নিশ্চয়ই আমি তাদেরকে (পরকালে অঙ্গীকারকৃত) বৃহত্তর শাস্তির পূর্বে নিকটতর (অর্থাৎ ইহকালে) শাস্তি প্রদান করবো (যথা, রোগব্যাধি, বিপদাপদ প্রভৃতি। কেননা কোরআনের বর্ণনানুযায়ী অসুখ-বিসুখ, বিপদাপদ প্রধানত মানবকৃত কুকর্মের কারণেই আসে। যেমন ইরশাদ হয়েছে ঃ ظَهَرَ الْفَسَادُ ..... لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ——এতদসত্ত্বেও যারা সাবধান হয়ে ফিরে আসবে না তাদের জন্য বৃহত্তর শাস্তিই রয়েছে। এ প্রকৃতির লোকের প্রতি শাস্তি প্রয়োগে আশ্চর্যান্বিত হওয়ার কিছুই নেই) কেননা সে ব্যক্তি হতে অধিকতর অত্যাচারী কে—যাকে স্বীয় পালনকর্তার আয়াতসমূহের সাহায্যে উপদেশ প্রদান করা সত্ত্বেও উহা থেকে বিমুখ থাকে। (সুতরাং এদের শাস্তির যোগ্য হওয়া সম্পর্কে কি সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে? তাই) আমি এরূপ অপরাধীদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করবো।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

قُلْ يَتَوَفّٰكُمْ مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِىْ وُكِّلَ بِكُمْ ——পূর্ববর্তী আয়াতে কিয়ামত অস্বীকারকারীগণের প্রতি সতর্কবাণী এবং মৃত্যুঅন্তে মাটিতে পরিণত হয়ে যাওয়ার পর পুনর্জীবন লাভ সম্পর্কে তাদের যে বিস্ময়—তার উত্তর ছিল। এ আয়াতে এ কথা বর্ণিত হয়েছে যে, নিজের মৃত্যু সম্পর্কে যদি চিন্তাভাবনা কর তবে এতে আল্লাহ্‌ পাকের কুদরতে কামেলা ও অনন্য ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ দেখতে পাবে। তোমরা নিজ অজ্ঞানতা

ও নির্বুদ্ধিতাবশত একথা মনে কর যে, মৃত্যু আপনা-আপনিই সংঘটিত হয়; কিন্তু ব্যাপার এমনটি নয়—বরং আল্লাহ্ পাকের নিকটে তোমাদের মৃত্যুর এক নির্দিষ্ট ক্ষণ রয়েছে; এ সম্পর্কে ফেরেশতাদের মাধ্যমে এক বিশেষ ব্যবস্থাপনাও নির্ধারিত রয়েছে। সেক্ষেত্রে আজরাঈল (আ)-এর ভূমিকাই সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। সমস্ত প্রাণীজগতের মৃত্যু তাঁর উপর ন্যস্ত, যে ব্যক্তির মৃত্যু যখন এবং যে স্থান নির্ধারিত রয়েছে ঠিক সে সময়েই তিনি তার প্রাণ বিয়োগ ঘটাবেন। আলোচ্য আয়াতে এর বর্ণনাই রয়েছে। এখানে ملك الموت এক বচনে বর্ণনা করা হয়েছে এবং অপর এক আয়াতে রয়েছে الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلٰئِكَةُ—অর্থাৎ ফেরেশতাগণ যাদের প্রাণ বিয়োগ ঘটায়—এখানে ملئكة বহুবচনের শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এতে এ ইঙ্গিত রয়েছে যে, আজরাঈল (আ) একাকী এ কাজ সম্পন্ন করেন না—বহু ফেরেশতা তাঁর অধীনে এ কাজে অংশগ্রহণ করেন।

আত্মবিয়োগ ও মালাকুল মউত সম্পর্কে কিছু বিশ্লেষণ ঃ প্রখ্যাত মুফাস্সির মুজাহিদ বলেন, মালাকুল মউতের সম্মুখে গোটা বিশ্ব কোন ব্যক্তির সম্মুখে রক্ষিত বিভিন্ন খাবার সামগ্রীপূর্ণ একটা থালার ন্যায়—তিনি যাকে চান তুলে নেন। বিষয়টি এক 'মারফূ' হাদীসেও আছে (ইমাম কুরতুবী 'তাযকিরা'তে ইহা বর্ণনা করেছেন)। অপর এক হাদীসে রয়েছে যে, নবীজী (সা) একদা জনৈক সাহাবীর শিয়রে মালাকুল-মউতকে দেখে বললেন যে, আমার সাহাবীর সাথে সহজ ও কোমল ব্যবহার করো। মালাকুল-মউত উত্তরে বললেন, আপনি নিশ্চিত থাকুন—আমি প্রত্যেক মু'মিনের সাথে নরম ব্যবহার করে থাকি এবং বলেন যে, যত মানুষ গ্রাম-গঞ্জে, বনে-জঙ্গলে, পাহাড়-পর্বতে বা সমুদ্রে বসবাস করছে—আমি এদের প্রত্যেককে প্রতিদিন পাঁচবার দেখে থাকি এজন্য এদের ছোট-বড় প্রত্যেক সম্পর্কে আমি প্রত্যক্ষভাবে পুরোপুরি জ্ঞাত। অতঃপর বলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্ (সা)! এগুলো যা কিছু হয় সব আল্লাহ্র হুকুমে। অন্যথায় আল্লাহ্র হুকুম ব্যতীত আমি কোন মশারও প্রাণ বিয়োগ ঘটাতে সক্ষম নই।

মালাকুল-মউতই কি অন্যান্য জীবজন্তুরও প্রাণবিয়োগ ঘটান? ঃ উল্লিখিত হাদীসের রেওয়ায়েত দ্বারা বোঝা যায় যে, আল্লাহ্ পাকের অনুমতি সাপেক্ষে মশার মৃত্যুও মালাকুল-মউতই ঘটায়। হযরত ইমাম মালিকও এক প্রশ্নের উত্তরে এ রকমই বলেন। কিন্তু অন্যান্য কতিপয় রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, ফেরেশতাগণের দ্বারা আত্মার বিয়োগ ঘটানো কেবল মানুষের জন্য নির্দিষ্ট—কেবল তার মান-মর্যাদা রক্ষার্থে—অন্যান্য জীব-জন্তু আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে ফেরেশতাগণের মাধ্যম ব্যতীতই আপনা-আপনিই মৃত্যু-বরণ করবে।—(কুরতুবী'র বরাত দিয়ে ইবনে আতিয়া বর্ণনা করেন)

এ বিষয়ই আবুশশায়েখ, উকাইলী, দায়লামী প্রমুখ হযরত আনাস (রা) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, নবীজী (সা) ইরশাদ করেছেন যে, জীবজন্তু ও কীট-পতঙ্গ সবই আল্লাহ্ পাকের প্রশংসা স্তুতিতে মগ্ন (এ-ই এগুলোর জীবন)। যখন এদের গুণ কীর্তন

বন্ধ হয়ে যায় তখনই আল্লাহ্ পাক এদের প্রাণ বিয়োগ ঘটান। জীব-জন্তুর মৃত্যু মালাকুল-মউতে'র উপর ন্যস্ত নয়। ঠিক একই মর্মে এক হাদীস হযরত ইবনে উমর (রা) থেকেও বর্ণিত আছে।---(মাযহারী)

অপর এক আয়াতে রয়েছে যে, যখন আল্লাহ্ পাক আযরাঈল (আ)-এর উপর গোটা বিশ্বের মৃত্যু সংঘটনের দায়িত্ব অর্পণ করেন তখন তিনি (আযরাঈল) আরয করেন ; হে প্রভু, আপনি আমার উপর এমন দায়িত্ব অর্পণ করলেন যার ফলে বিশ্ব-জগৎ ও গোটা মানবজাতি আমাকে ভর্ৎসনা করবে এবং আমার প্রসংগ উঠলে অত্যন্ত বিরূপ মন্তব্য করবে। প্রত্যুত্তরে হক তা'আলা বললেন ঃ আমি এর সুরাহা এরূপভাবে করেছি যে, জগতে রোগ-ব্যাধি ও অন্যান্য রূপে মৃত্যুর কিছু বাহ্যিক কারণ রেখে দিলাম যার ফলে প্রত্যেক মানুষ সেসব উপলক্ষ ও রোগ-ব্যাধিকে মৃত্যুর কারণরূপে আখ্যায়িত করবে এবং তুমি তাদের অপবাদ থেকে রক্ষা পাবে।---(কুরতুবী)

ইমাম বগভী (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন---যত প্রকারের রোগ-ব্যাধি ক্ষত ও আঘাত রয়েছে---এসবই মৃত্যুর দূত---মানুষকে তার মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। অতপর যখন মৃত্যুর ক্ষণ ঘনিয়ে আসে তখন মালাকুল-মউত মৃত্যুপথযাত্রীকে সম্বোধন করে বলেন, ওগো আল্লাহ্র বান্দা, আমার আগমনের পূর্বে তোমাদেরকে সাবধান করে মৃত্যুর প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য আমি রোগ ব্যাধি ও দুর্যোগ-দুর্বিপাক রূপে কত সংবাদ কত দূত পাঠিয়েছি। এখন আমি পৌঁছে গেছি। এরপর আর কোন সংবাদ প্রদানকারী বা কোন দূত আসবে না। এখন তুমি স্বীয় প্রভুর নির্দেশ বাধ্যতামূলকভাবে পালন করবে---চাই স্বেচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছাকৃতভাবে হোক।---(মাযহারী)

মাস'আলা ঃ কারো আত্মা বের করে নিয়ে আসার নির্দেশ প্রদানের পূর্ব পর্যন্ত মালাকুল-মউত কারো মৃত্যুক্ষণ সম্পর্কে কিছুই জানেন না।---(আহমদ কর্তৃক মা'মার থেকে বর্ণিত ---মাযহারী)

---تَتَجَافٰى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাফির, মুশরিক ও কিয়ামত অস্বীকারকারীদের প্রতি সতর্কবাণী ছিল। অতপর (اِنَّمَا يُؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا) থেকে খাঁটি ও নিষ্ঠাবান মু'মিনগণের বিশেষ গুণাবলী ও তাদের সুমহান মর্যাদাসমূহের বর্ণনা রয়েছে। উল্লিখিত আয়াতে মু'মিনগণের এক গুণ এই বলে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাদের শরীরের পার্শ্বদেশ শয্যা থেকে আলাদা থাকে এবং শয্যা পরিত্যাগ করে আল্লাহ্ পাকের যিক্র ও দোয়ায় আত্মনিয়োগ করে। কেননা এরা আল্লাহ্ পাকের অসন্তুষ্টি ও শাস্তিকে ভয় করে এবং তাঁর করুণা ও পুণ্যের আশা করে থাকে। আশা-নিরাশাপূর্ণ এ অবস্থা তাদেরকে যিক্র ও দোয়ার জন্য ব্যাকুল করে তোলে।

তাহাজ্জুদের নামায ঃ অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে শয্যা পরিত্যাগ করে যিকর ও দোয়ায় আত্মনিয়োগ করার অর্থ তাহাজ্জুদ ও নফল নামায—যা ঘুম থেকে উঠার পর গভীর রাতে পড়া হয়। (এ প্রসঙ্গে হযরত হাসান, মুজাহিদ, মালিক ও আওযায়ীর বক্তব্যও ঠিক একই রূপ) এবং হাদীসের অপরাপর রেওয়ায়েত থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়।

মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী, নাসায়ী প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে হযরত মায়ায ইবনে জাবাল থেকে বর্ণিত আছে ; তিনি বলেন যে, আমি একদা নবীজীর সংগে সফরে ছিলাম, সফরকালে একদিন আমি তাঁর (নবীজীর) সন্নিকটে গেলাম এবং আরজ করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্ (সা), আমাকে এমন কোন আমল বলে দিন, যার মাধ্যমে আমি বেহেশত লাভ করতে পারি এবং দোযখ থেকে অব্যাহতি পেতে পারি। তিনি বললেন, তুমি তো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বস্তু প্রার্থনা করেছ। কিন্তু আল্লাহ্ পাক যার তরে তা সহজ-লভ্য করে দেন তার জন্য তা লাভ করা অতি সহজ। অতঃপর বললেন, সে আমল এই যে, আল্লাহ্র ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কোন অংশীদার স্থাপন করবে না। নামায প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত প্রদান করবে, রোযা রাখবে এবং বায়তুল্লাহ্ শরীফে হজ্জ সম্পন্ন করবে। অতঃপর তিনি বললেন—এসো, তোমাকে পুণ্য দ্বারের সন্ধান দিয়ে দেই, (তা এই যে,) রোযা ঢাল স্বরূপ। (যা শাস্তি থেকে মুক্তি দেয়) এবং সদকা মানুষের পাপানল নির্বাপিত করে দেয়। অনুরূপভাবে মানুষের গভীর রাতের নামায। এই বলে কোরআন মজীদের উল্লিখিত আয়াত تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ الخ তিলাওয়াত করেন।

হযরত আবুদ্দারদা (রা), কাতাদাহ (রা) ও যাহহাক (রা) বলেন যে, সেসব লোকও শয্যা থেকে শরীরের পার্শ্বদেশ পৃথক হয়ে থাকা গুণের অধিকারী, যারা ইশা ও ফজর উভয় নামায জামা'আতের সাথে আদায় করেন। তিরমিযী শরীফে হযরত আনাস (রা) থেকে বিশুদ্ধ সনদসহ বর্ণিত আছে যে, উল্লিখিত আয়াত تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ الخ যারা ইশার নামাযের পূর্বে শয্যা গ্রহণ না করে, ইশার জামা'আতের জন্য প্রতীক্ষারত থাকেন, তাদের সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে।

আবার কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, এ আয়াত সেসব লোক সম্পর্কে নাযিল হয়েছে যারা মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়টুকু নফল নামায আদায় করে করে কাটান (মুহাম্মদ বিন নসর এই হাদীসটি রেওয়ায়েত করেন।) এ আয়াত সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন যে, যে ব্যক্তি শুয়ে, বসে বা পার্শ্বদেশে শায়িত অব-স্থায় চোখ উন্মিলনের সাথে সাথে আল্লাহ্ পাকের যিক্রে লিপ্ত হন, তাঁরাও এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত।

ইবনে কাসীর ও অন্যান্য তফসীরকার বলেছেন যে, এসব বক্তব্যের মধ্যে পরস্পর কোন বিরোধ নেই। প্রকৃতপক্ষে এরা সকলেই এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। এর মধ্যে শেষরাতের নামাযই সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী। 'বয়ানুল কোরআনেও' ইহাই গ্রহণ করা হয়েছে।

হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদ থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন—কিয়ামতের দিন যখন আল্লাহ্ পাক পূর্ববর্তী মানবমণ্ডলীকে একত্রিত করবেন তখন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এক আহ্বানকারী, যার আওয়াজ সমগ্র সৃষ্টিকুল শুনতে পাবে, দাঁড়িয়ে আহ্বান করবেন,—হে হাশর ময়দানে সমবেত জনমণ্ডলী! আজ তোমরা অবহিত হতে পারবে যে, আল্লাহ্ পাকের নিকটে সর্বাধিক সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী কে ? অনন্তর সে ফেরেশতা تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ الخ যাদের পার্শ্বদেশ শয্যা থেকে পৃথক থাকে) এরূপ-গুণের অধিকারী লোকগণকে দাঁড়াতে আহ্বান জানাবেন। এ আওয়াজ শুনে এসব লোক দাঁড়িয়ে পড়বেন—যাদের সংখ্যা হবে খুবই নগণ্য—(ইবনে-কাসীর।) এই রেওয়ায়েতেরই কোন কোন শব্দে রয়েছে যে, এদেরকে হিসাব গ্রহণ ব্যতীতই বেহেশতে প্রেরণ করা হবে। অতপর অন্যান্য সমগ্র লোক দাঁড়াবে এবং তাদের থেকে হিসাব গ্রহণ করা হবে।—(মাযহারী)

وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ — أَدْنَى অর্থ নিকটতম عذاب الادنى (নিকটতম শাস্তি) বলে ইহলৌকিক বিপদাপদ ও রোগ-ব্যাধিকে বোঝানো হয়েছে এবং বৃহত্তম শাস্তি (عذاب الاكبر) বলতে পারলৌকিক শাস্তি বোঝানো হয়েছে।

আল্লাহ্র দিকে যারা ফিরে আসে তাদের পক্ষে ইহলৌকিক বিপদাপদ রহমত-স্বরূপ : এর মর্ম এই যে, আল্লাহ্ পাক অনেক মানুষকে তাদের কৃত পাপের জন্য সাবধান করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে ইহকালে তাদের উপর নানাবিধ দুঃখ-যন্ত্রণা ও রোগ-ব্যাধি চাপিয়ে দেন। যেন তারা সতর্ক হয়ে পাপ থেকে ফিরে আসে এবং পরকালের কঠিনতম শাস্তি থেকে অব্যাহতি পেয়ে যায়।

এ আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, পাপীদের প্রতি দুনিয়াতে আপতিত বিপদ-আপদ ও জরা-ব্যাধি এক প্রকারের রহমত স্বরূপ—যার ফলে স্বীয় নির্লিপ্ততা ও অসাবধানতা থেকে ফিরে এসে পরকালের গুরুতর শাস্তি থেকে মুক্তি পেয়ে যায়। অবশ্য যে সব লোক এরূপ দুর্যোগ দুর্বিপাক সত্ত্বেও আল্লাহ্র প্রতি ধাবিত না হয়—তাদের পক্ষে এটা দ্বিগুণ শাস্তি, একটা দুনিয়াতেই নগদ, দ্বিতীয়টা পরকালের কঠিনতম শাস্তি। কিন্তু

নবী ও ওলীগণের ওপর যে বিপদাপদ আসে, তাঁদের ব্যাপার এদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। এগুলো তাঁদের পক্ষে পরীক্ষা স্বরূপ—যার মাধ্যমে তাঁদের মর্যাদা উন্নত হতে থাকে। তার লক্ষণ ও পরিচয় এই যে, এরূপ বিপদ-আপদ ও রোগ-ব্যাধির সময়ও তাঁরা আল্লাহ্ পাকের পক্ষ থেকে এক প্রকারের আত্মিক শান্তি ও স্বস্তি লাভ করে থাকেন।

কতক অপরাধের শাস্তি পরকালের পূর্বে ইহকালেই হয়ে যায়ঃ إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ—বাহ্যত প্রত্যেক শ্রেণীর অপরাধকারী مجرمين শব্দের অন্তর্ভুক্ত এবং প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষেত্রে চাই ইহকালের হোক চাই পরকালের—উভয় এর অন্তর্গত। কিন্তু হাদীসের কোন কোন রেওয়ায়েতে রয়েছে তিন ধরনের শাস্তি পরকালের পূর্বে ইহকালেই পেয়ে যায়। (১) ন্যায় ও সত্যের বিপক্ষে পতাকা তুলে প্রকাশ্যভাবে তার বিরুদ্ধাচরণ, (২) পিতামাতার প্রতি অশ্রদ্ধা জ্ঞাপন ও অবাধ্যতা প্রদর্শন, (৩) অত্যাচারীর সহযোগিতা করা (হযরত মা'আয বিন জাবাল থেকে ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন)।

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ ۖ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿٢٣﴾ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا ۖ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ﴿٢٤﴾ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٢٥﴾ أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ ۖ أَفَلَا يَسْمَعُونَ ﴿٢٦﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ ۖ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ﴿٢٧﴾ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٨﴾ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿٢٩﴾ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرْ إِنَّهُم مُّنتَظِرُونَ ﴿٣٠﴾

(২৩) আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছি, অতএব আপনি কোরআন প্রাপ্তির বিষয়ে কোন সন্দেহ করবেন না। আমি একে বনী ইসরাঈলের জন্য পথপ্রদর্শক করেছিলাম। (২৪) তারা সবর করত বিধায় আমি তাদের মধ্য থেকে নেতা মনোনীত করেছিলাম, যারা আমার আদেশে পথপ্রদর্শন করত। তারা আমার আয়াতসমূহে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিল। (২৫) তারা যে বিষয়ে মতবিরোধ করছে, আপনার পালনকর্তাই কিয়ামতের দিন সে বিষয়ে তাদের মধ্যে ফয়সালা দেবেন। (২৬) এতে কি তাদের চোখ খোলেনি যে, আমি তাদের পূর্বে অনেক সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি, যাদের বাড়িঘরে এরা বিচরণ করে। অবশ্যই এতে নিদর্শনাবলী রয়েছে। তারা কি শোনে না? (২৭) তারা কি লক্ষ্য করে না যে, আমি উষর ভূমিতে পানি প্রবাহিত করে শস্য উদ্গত করি, যা থেকে ভক্ষণ করে তাদের জন্তুরা এবং তারা। তারা কি দেখে না? (২৮) তারা বলে তোমরা সত্যবাদী হলে বল; কবে হবে এই ফয়সালা? (২৯) বলুন, ফয়সালার দিনে কাফিরদের ঈমান তাদের কোন কাজে আসবে না এবং তাদেরকে অবকাশও দেওয়া হবে না। (৩০) অতএব আপনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন এবং অপেক্ষা করুন, তারাও অপেক্ষা করছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নিশ্চয়ই আমি (আপনার ন্যায় হযরত) মূসা (আ)-কেও গ্রন্থ প্রদান করেছিলাম (যা প্রচার করতে গিয়ে তাঁকে বহু দুঃখ-যন্ত্রণা বরদাস্ত করতে হয়েছিল। সুতরাং আপনারও তা বরদাস্ত করা উচিত। এক সান্ত্বনা তো এই! অনন্তর অনুরূপভাবে আপনাকেও ঐশী গ্রন্থ প্রদান করা হয়েছে।) সুতরাং আপনি (আপনার) এ গ্রন্থ লাভ করা সম্পর্কে কোন সন্দেহ পোষণ করবেন না। (যেমন আল্লাহ্ পাকের ইরশাদ إِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ—নিশ্চয় আপনাকে কোরআন প্রদান করা হবে। সুতরাং আপনি ঐশী গ্রন্থের অধিকারী এবং আল্লাহ্ কর্তৃক রসূলরূপে সম্বোধিত ব্যক্তি। আপনি যখন এরূপভাবে আল্লাহ্র নিকটে মনোনীত, তখন যদি গুটিকয়েক নির্বোধ আপনাকে গ্রহণ না করে তবে বিচলিত ও দুঃখিত হওয়ার কিছুই নেই। এও এক প্রকার সান্ত্বনা) এবং আমি সেই (মূসা আ-র) গ্রন্থকে ইসরাঈল বংশীয়গণের জন্য পথ প্রদর্শক করেছিলাম। (অনুরূপভাবে আপনার গ্রন্থের মাধ্যমেও অনেকে হিদায়ত-প্রাপ্ত হবে। সুতরাং আপনি প্রসন্ন থাকুন। এও এক প্রকার সান্ত্বনা) এবং আমি সেই ইসরাঈল বংশীয়দের মধ্যে বহুসংখ্যক ধর্মীয় অধিনায়ক নিযুক্ত করেছিলাম--- যারা আমার নির্দেশ মত সঠিক পথ প্রদর্শন করতো। যখন তারা দুঃখ-কষ্টের সময় ধৈর্য ধারণ করেছিল এবং আয়াতসমূহের উপর স্থির বিশ্বাসী ছিল। (তাই তারা সেগুলো প্রচার ও প্রসার এবং সৃষ্টিকুলের হিদায়ত করতে গিয়ে দুঃখ-কষ্ট বরণ করতো। এতে রয়েছে মু'মিনগণের জন্য সান্ত্বনা যে, তোমরা ধৈর্য ধারণ কর। যখন তোমরা বিশ্বাসের অধিকারী এবং বিশ্বাস চায় ধৈর্য ধারণ---তাই তোমাদের পক্ষে ধৈর্য ধারণ

অবশ্য প্রয়োজনীয়। এ সময়ে আমি তোমাদেরকেও ধর্মীয় অধিনায়ক করে দেব। এ তো ইহলৌকিক সান্ত্বনা এবং তোমাদের এক পারলৌকিক সান্ত্বনাও ধারণ করা উচিত। সে সান্ত্বনার বস্তু এই যে) নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা কিয়ামতের দিন সেসব বিষয়ের (বাস্তব ও কার্যকর) মীমাংসা করে দেবেন যেগুলো সম্পর্কে তারা পরস্পর মতবিরোধ করছিল। অর্থাৎ মু'মিনগণকে বেহেশত এবং কাফিরদেরকে নরকে নিক্ষেপ করবেন এবং কিয়ামতও খুব দূরে নয়। এ থেকেও সান্ত্বনা লাভ করা উচিত। এ বক্তব্য শুনে কাফিরেরা দু'প্রকারের সন্দেহ পোষণ করতে পারত।---প্রথমত আমরা এ কথাই বিশ্বাস করি না যে কুফরী আল্লাহ্‌র নিকটে অপছন্দনীয়---যেমন يفصل--- তিনি মীমাংসা করবেন,-----শব্দ দ্বারা বোঝা যায়। দ্বিতীয়ত----আমরা কিয়ামত সংঘটিত হওয়াই অসম্ভব বলে মনে করি। সামনে উভয় সন্দেহ অপনোদনের জন্য দুটি পৃথক বক্তব্য পেশ করা হয়েছে---১. কুফরী গর্হিত ও অপছন্দনীয় হওয়া সম্পর্কে যে তারা সন্দেহ পোষণ করে; তবে কি একথা তাদের পথ প্রদর্শনের পক্ষে যথেষ্ট নয় যে, আমি তাদের পূর্বে (শিরক ও কুফরের জন্য) কত জনপদকে ধ্বংস করে দিয়েছি! (অর্থাৎ তাদের ধ্বংস প্রক্রিয়া থেকে এবং নবীর ভবিষ্যদ্বাণী মুতাবিক স্বাভাবিক রীতি ভংগ করে সংঘটিত হওয়া থেকে খোদার রোষাগ্নি বিচ্ছুরিত হচ্ছিল---যদ্দ্বারা কুফরী যে নিন্দিত ও গর্হিত তা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। এসব লোক যাদের বসবাসের স্থানসমূহের (সিরিয়া ভ্রমণকালে) যাতায়াত করে (অতিক্রম) করে। এ ক্ষেত্রে (কুফরী গর্হিত হওয়ার) সুস্পষ্ট লক্ষণাদি বিদ্যমান রয়েছে। এরা কি অতীত কালের জনমণ্ডলীর ধ্বংস সংশ্লিষ্ট কাহিনীসমূহ শুনতে পায় না (যা বহুল প্রচারিত ও সর্বজনবিদিত ও আলোচিত। দ্বিতীয় বিষয়---কিয়ামত সংঘটন সম্পর্কে তাদের সন্দেহ পোষণ।) তবে কি তারা এ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করছে না যে, আমি (মেঘমালা ও নদীনালা প্রভৃতির মাধ্যমে) বিশুষ্ক ভূমিতে পানি পেঁাছিয়ে থাকি এবং তার সাহায্যে শস্যাদি উৎপাদন করে থাকি---যাহা হতে তাদের (গৃহপালিত) পশুসমূহ এবং তারা নিজেও ভক্ষণ করে থাকে। তবে তারা কি (দিবারাত্রি) এসব কিছু অবলোকন করছে না? (এ হলো মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত হওয়ার সুস্পষ্ট প্রমাণ। যেমন পূর্বেও কয়েক জায়গায় তার বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে। সুতরাং উভয় সন্দেহের অবসান ঘটলো এবং) এরা (কিয়ামত ও বিচারের বর্ণনা শুনে বিস্ময়ভরে বিদ্রূপাত্মক সুরে) বলে যে যদি তোমরা (তোমাদের এ কথায়) সত্য হয়ে থাকো তবে (বল তো) এ মীমাংসা কবে সম্পন্ন হবে? আপনি বলে দিন যে (তোমরা তো অহেতুকভাবে এর তাকীদ দিচ্ছ। তোমাদের জন্য তো তা হবে কঠিন বিপদের দিন। কেননা) সে মীমাংসার দিনে কাফিরদেরকে তাদের ঈমান (মোটেও) কোন সুফল প্রদান করবে না। (এবং তাদের অব্যাহতি লাভের একই পথ ছিল তাও হাতছাড়া) আর, (অব্যাহতি লাভ তো দূরের কথা, সে শাস্তি হতে এক মুহূর্তের তরেও) তাদেরকে অবকাশ দেয়া হবে না। সুতরাং [হে নবী (সা)] আপনি (বিদ্রূপাত্মক) কথাবার্তার প্রতি (মোটেও) লক্ষ্য করবেন না (যেগুলোর প্রতি লক্ষ্য করলে সন্ত্রাস ও মনোকষ্টের উদ্রেক করবে।

এবং আপনি (প্রতিশ্রুত মীমাংসার) প্রতীক্ষায় থাকুন (কিন্তু সত্বর জানা যাবে যে, কার প্রতীক্ষা বাস্তবানুগ এবং কারটা নয়। যেমন তাদের প্রত্যুত্তরে আল্লাহ্ পাকের উক্তি : قُلْ تَرَبَّصُوْا فَاِنِّىْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُتَرَبِّصِيْنَ--অর্থাৎ আপনি বলে দিন--তোমরা প্রতীক্ষারত থাক; অনন্তর আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষায় থাকবো।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

فَلَا تَكُنْ فِىْ مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَائِهٖ--لقاء শব্দের অর্থ সাক্ষাৎ----এ আয়াতে কার সাথে কার সাক্ষাৎ বোঝানো হয়েছে সে সম্বন্ধে মুফাস্‌সিরগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। 'তফসীরের সার-সংক্ষেপে' لقائه-র 'যমীর' (সর্বনাম) কিতাব----অর্থাৎ কোরআনের দিকে ধাবিত করে এই অর্থ করা হয়েছে যে, যেরূপভাবে মহান আল্লাহ্ হযরত মূসা (আ)-কে গ্রন্থ প্রদান করেছেন অনুরূপভাবে আপনার প্রতিও আল্লাহ্ পাকের পক্ষ থেকে গ্রন্থ অবতীর্ণ হওয়া সম্পর্কে কোন সন্দেহ পোষণ করবেন না। যেরূপভাবে কোরআন সম্পর্কে অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে وَاِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْاٰنَ ---অর্থাৎ, এবং নিশ্চয় আপনাকে কোরআন প্রদান করা হবে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এবং কাতাদাহ্ (রা)-র ব্যাখ্যা এরূপভাবে করেছেন যে, لقائه--র যমীন (সর্বনাম) হযরত মূসা (আ)-র দিক ধাবিত হয়েছে। এ আয়াতে হযরত মূসা (আ)-র সাথে রসূলুল্লাহ্‌র (সা) সাক্ষাতের সংবাদ দেয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, আপনি এ সম্পর্কে কোন সন্দেহ পোষণ করবেন না যে, হযরত মূসা (আ)-র সাথে আপনার সাক্ষাৎ সংঘটিত হবে। সুতরাং মি'রাজের রাতে এক সাক্ষাতকার সংঘটিত হওয়ার কথা বিশুদ্ধ হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত; অতপর কিয়ামতের দিন সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত হওয়ার কথাও প্রমাণিত আছে।

হযরত হাসান বসরী (র) এর ব্যাখ্যা এরূপভাবে করেছেন যে, হযরত মূসা (আ)-কে ঐশী গ্রন্থ প্রদানের দরুন যেরূপভাবে মানুষ তাঁকে মিথ্যুক প্রতিপন্ন করতে প্রয়াস পেয়েছে এবং নানাভাবে দুঃখ-যন্ত্রণা দিয়েছে, আপনিও এসব কিছুর সম্মুখীন হবেন বলে নিশ্চিত থাকুন। তাই কাফিরদের প্রদত্ত দুঃখ-যন্ত্রণার ফলে আপনি মনক্ষুণ্ণ হবেন না; বরং নবীগণের ক্ষেত্রে এমনটি হওয়া স্বাভাবিক রীতি মনে করে আপনি তা বরদাশত করুন।

কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের পরিচালক ও নেতা হওয়ার দুটি শর্ত : وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوْا وَكَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يُوْقِنُوْنَ--অর্থাৎ,

আমি ইসরাঈল সম্প্রদায়ের মাঝে কিছু লোককে নেতা ও অগ্রপথিক নিযুক্ত করেছিলাম, যারা তাঁদের পয়গম্বরের প্রতিনিধি হিসাবে মহান প্রভুর নির্দেশানুসারে লোকদেরকে হিদায়ত করতেন---যখন তাঁরা ধৈর্য ধারণ করতেন এবং আমার বাণীসমূহের উপর স্থির বিশ্বাস স্থাপন করতেন।

ইসরাঈল বংশের ওলামাগণের মধ্য হতে কতককে যে জাতির নেতা ও পুরোধার মর্যাদায় উন্নীত করা হয়েছে, তার দুটি কারণ রয়েছে। এ আয়াতে সে দুটি কারণ বর্ণনা করা হয়েছে---১. ধৈর্য ধারণ করা, ২. আল্লাহ্র আয়াতসমূহের উপর অটুট বিশ্বাস স্থাপন করা। আরবী ভাষায় সবর করার অর্থ অত্যন্ত বিস্তৃত ও ব্যাপক। এর শাব্দিক অর্থ অনড় ও দৃঢ়বদ্ধ থাকা। এখানে সবর দ্বারা আল্লাহ্ পাকের আদেশসমূহ পালনে অটল ও দৃঢ়পদ থাকা এবং আল্লাহ্ পাক যে সব বস্তু বা কাজ হারাম ও গর্হিত বলে নির্দেশ করেছেন, সেগুলো থেকে নিজেকে বিরত রাখা। শরীয়তের যাবতীয় নির্দেশই এর অন্তর্গত---যা এক বিরাট কর্মগত দক্ষতা ও সাফল্য। এর দ্বিতীয় কারণ আল্লাহ্ পাকের আয়াতসমূহের উপর সুদৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন---আয়াতসমূহের মর্ম অনুধাবণ করা এবং অনুধাবনান্তে তার উপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা---উভয়ই এর অন্তর্গত। এটা এক বিরাট জ্ঞানগত দক্ষতা ও সাফল্য।

সারকথা, আল্লাহ্ পাকের নিকটে নেতৃত্ব ও পৌরোহিত্যের যোগ্য কেবল সেসব লোকই, যারা কর্ম ও জ্ঞান--উভয় দিকে পূর্ণতা লাভ করেছে। এ স্থলে কর্মগত পূর্ণতা ও দক্ষতাকে জ্ঞানগত পূর্ণতা ও দক্ষতার পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। অথচ জ্ঞানের স্থান স্বভাবত কর্মের পূর্বে; এখানে ইংগিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্র নিকটে কর্মহীন শিক্ষা ও জ্ঞানের কোন মূল্য নেই।

ইবনে কাসীর এ আয়াতের তফসীর প্রসংগে কিছুসংখ্যক ওলামার মন্তব্য উদ্ধৃত করেন। তা এই ঃ بالصبر واليقين تنال الامامة فى الدين---অর্থাৎ ধৈর্য ও দৃঢ় বিশ্বাসের মাধ্যমেই দ্বীনের ক্ষেত্রে নেতৃত্বের মর্যাদা লাভ করা যায়।

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا نَسُوْقُ الْمَاءَ اِلَى الْاَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهٖ زَرْعًا---

অর্থাৎ, তারা কি লক্ষ্য করে না যে, আমি শুষ্ক ভূমিতে পানি প্রবাহিত করি যদ্দ্বারা নানা প্রকারের শস্য সমুদগত হয়। جرز শুষ্ক ভূমিকে বলা হয়---যেখানে কোন বৃক্ষলতা উদগত হয় না।

ভূমিতে পানি প্রবাহের বিশেষ কৌশলপূর্ণ ব্যবস্থা ঃ শুষ্ক ভূমিতে পানি প্রবাহের; অনন্তর সেখানে নানাবিধ উদ্ভিদ ও তরুলতা উদগত হওয়ার বর্ণনা কোরআনে করীমের বিভিন্ন জায়গায় এরূপভাবে করা হয়ে যে---ভূমিতে বৃষ্টি বর্ষিত হয়---ফলে ভূমি রসালো হয়ে শস্যাদি উৎপাদনের যোগ্য হয়ে উঠে। কিন্তু এ আয়াতে বৃষ্টির স্থলে

ভূ-পৃষ্ঠের উপর দিয়ে শুষ্ক ভূমির দিকে পানি প্রবাহিত করে গাছপালা উদগত করার কথা বর্ণনা করা হয়েছে অর্থাৎ অন্য কোন ভূমির উপর বৃষ্টি বর্ষণ করে সেখান থেকে নদী-নালার মাধ্যমে ভূ-পৃষ্ঠের উপর দিয়ে যেসব শুষ্ক ভূ-ভাগে সাধারণত বৃষ্টি হয় না সেদিকে প্রবাহিত করা হয়।

এতে এ ইঙ্গিত রয়েছে যে, কতক ভূমি এমন নরম ও কোমল হয় যে, তা বৃষ্টি বহন করার যোগ্যও নয়।---যেখানে পুরোপুরি বৃষ্টি বর্ষিত হলে দালান-কোঠা বিধ্বস্ত হবে, গাছপালার মূলোৎপাটিত হয়ে যাবে। তাই এরূপ ভূমি সম্পর্কে আল্লাহ পাক এ ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন যে, অধিক পরিমাণে বৃষ্টি কেবল সেসব ভূমিতেই বর্ষিত হয় যেগুলো তা বহন করার যোগ্যতা রাখে। অতপর পানি প্রবাহিত করে এমন ভূমি অভিমুখে নিয়ে যাওয়া হয় যেগুলোর বৃষ্টি বহনের ক্ষমতা নেই।---যেমন মিসরের ভূমি। কিছু সংখ্যক তফসীরকার ইয়ামনের ও শামের কতক ভূমি এরূপ বলে বর্ণনা করেছেন।---যেমন ইবনে আব্বাস ও হাসান (রা) থেকে বর্ণিত আছে।

প্রকৃত প্রস্তাবে এ ধরনের সকল ভূমি এর অন্তর্ভুক্ত। মিসরের ভূমি বিশেষভাবে এর অন্তর্গত---সেখানে বৃষ্টির পরিমাণ খুবই কম। কিন্তু আবিসিনিয়া ও আফ্রিকার অন্যান্য দেশ হতে বৃষ্টির পানি নীল নদ দিয়ে মিসরে পৌঁছে---সাথে করে সেখানকার অত্যন্ত উর্বর লাল পলিমাটি বহন করে আনে। তাই মিসরবাসিগণ সেখানে বৃষ্টি না হওয়া সত্ত্বেও প্রতি বছর নতুন পানি ও পলিমাটি দ্বারা উপকৃত হয়।

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ---অর্থাৎ কাফিররা পরিহাসছলে বলে থাকে যে, আপনি কাফিরদের বিরুদ্ধে মুসলিমগণের যে বিজয়ের কথা বলেন তা কখন সংঘটিত হবে?---আমরা তো এর কোন লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি না।---আমরা তো মুসলমানদেরকে ভীত-সন্ত্রস্তভাবে আত্মগোপন করে থাকতে দেখি।

এর উত্তরে হক তা'আলা ফরমান : قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ ----অর্থাৎ আপনি তাদের প্রত্যুত্তরে একথা বলে দিন যে, তোমরা যে আমাদের বিজয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করছো, সেদিন তোমাদের জন্য তা সমূহ বিপদ বহন করে আনবে। কেননা, যখন আমরা বিজয় লাভ করবো সেদিন তোমরা কঠিন শাস্তিতে জড়িয়ে পড়বে। চাই ইহকালে হোক যেমন বদরের যুদ্ধে বা পরকালে এবং যে মুহূর্তে কারো উপর আল্লাহ্র শাস্তি আপতিত হয় তখন তার ঈমান আর গৃহীত হয় না।---(ইবনে-কাসীর অনুরূপ বর্ণনা করেছেন)।

কোন কোন বিজ্ঞজন مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ --এর অর্থ কিয়ামতের দিন বলে বর্ণনা করেছেন। উপরে 'তফসীরের সার-সংক্ষেপ' অংশে তাই গ্রহণ করা হয়েছে।

سورة الاحزاب

সূরা আহযাব

মদীনায় অবতীর্ণ, ৯ রুকূ, ৭৩ আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللّٰهَ وَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۙ﴿۱﴾ وَّاتَّبِعْ مَا يُوْحٰٓى اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ۙ﴿۲﴾ وَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ﴿۳﴾

পরম করুণাময় আল্লাহ্র নামে আরম্ভ।

(১) হে নবী! আল্লাহ্কে ভয় করুন এবং কাফির ও কপট বিশ্বাসীদের কথা মানবেন না। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (২) আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ হয়, আপনি তার অনুসরণ করুন। নিশ্চয় তোমরা যা কর, আল্লাহ্ সে বিষয়ে খবর রাখেন। (৩) আপনি আল্লাহ্র উপর ভরসা করুন। কার্যনির্বাহীরূপে আল্লাহ্ই যথেষ্ট।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে নবী! আল্লাহ্কে ভয় করতে থাকুন---(অন্য কাউকে ভয় করবেন না ---এবং তাদের ধমকের প্রতি মোটেও ভ্রূক্ষেপ করবেন না।) এবং কাফির (যারা প্রকাশ্যভাবে ইসলামের বিরুদ্ধাচরণ করে) ও মুনাফিকদের (যারা গোপনে তাদের সাথে একমত পোষণ করে) অনুসরণ করবেন না এবং তাদের কথার প্রতি কর্ণপাতও করবেন না (বরং কেবল আল্লাহ্রই নির্দেশ পালন করবেন)। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ পাক মহাজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান (তাঁর প্রতিটি নির্দেশ নানাবিধ কল্যাণ ও মঙ্গলে পরিপূর্ণ) এবং (আল্লাহ্র নির্দেশ পালনের অর্থ এই) আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে যে আদেশ করা হয়েছে, তা অনুসরণ করুন। (এবং হে মানব সন্তান) আল্লাহ্ পাক নিঃসন্দেহে তোমাদের যাবতীয় কার্যক্রম সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত। (তোমাদের

মাঝে যারা আমার নবীর বিরোধিতা করছে আমি তাদের সম্পূর্ণ হিসাব (নেব) এবং (হে নবী) আপনি (তাদের এরূপ ধমকী ও ভীতি প্রদর্শন ব্যাপারে) মহান আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করুন। আর কার্যনির্বাহী অভিভাবকরূপে আল্লাহ্ পাকই যথেষ্ট। (এর মুকাবিলায় এদের যাবতীয় চক্রান্ত ও কূট-কৌশল ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। এ ব্যাপারে আপনি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবেন না। আর যদি আল্লাহ্ পাকের পক্ষ থেকে পরীক্ষাচ্ছলে আপনার প্রতি কোন সাময়িক দুঃখ-কষ্ট পেঁছে তবে কোন ক্ষতি নেই বরং এতে কল্যাণই নিহিত।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এটা মাদানী সূরা। এর অধিকাংশ আলোচ্য বিষয় আল্লাহ্ পাক সমীপে রসূলুল্লাহ্‌র (সা) বিশিষ্ট স্থান ও উচ্চ মর্যাদা সংশ্লিষ্ট। এ সূরার বিভিন্ন শিরোনামায় রসূল (সা)-এর প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের আবশ্যকতা এবং তাঁকে দুঃখ-যন্ত্রণা দেওয়া হারাম হওয়ার কথা বিবৃত হয়েছে। সূরার অবশিষ্ট বিষয়সমূহও এগুলোরই পরিপূরক ও সহায়ক।

শানে নুযুল ঃ এ সূরা নাযিল হওয়ার কারণ সম্পর্কে কয়েকটি রেওয়ায়েত রয়েছে। একটি এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) হিজরতের পর যখন মদীনায় তশরীফ নিয়ে যান, তখন মদীনার আশেপাশে কুরায়জা, নযীর, বনু কায়নুকাহ্ প্রভৃতি কতিপয় ইহুদী গোত্র বসবাস করত। রাহমাতুল্লিল-আলামীনের এটাই একান্ত কামনা ছিল যেন এসব লোক মুসলমান হয়ে যায়। ঘটনাক্রমে এসব ইহুদীর মধ্য থেকে কয়েক ব্যক্তি নবীজীর (সা) খিদমতে যাতায়াত করতে আরম্ভ করে এবং কপট ও বর্ণচোরা রূপ ধারণ করে নিজেদেরকে মৌখিকভাবে মুসলমান বলে প্রকাশ করতে থাকে, কিন্তু তাদের অন্তরে ঈমান ছিল না। কিছু লোক মুসলমান হলে অপরাপরদের নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানো সহজতর হবে মনে করে নবীজী এটাকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে তাদেরকে স্বাগতম জানালেন। এদের সাথে বিশেষ সৌজন্যমূলক ব্যবহার করতে লাগলেন এবং ছোট-বড় সবার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে লাগলেন। এমনকি ওদের দ্বারা কোন অশালীন ও অসংগতিপূর্ণ কাজ সংঘটিত হলে পরও ধর্মীয় কল্যাণের কথা চিন্তা করে সেগুলোর প্রতি তেমন গুরুত্ব আরোপ করতেন না। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই সূরায়ে আহযাবের প্রারম্ভিক আয়াতসমূহ নাযিল হয়েছে।—(কুরতুবী)

ইবনে জারীর (রা) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে অপর এক ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তা এই যে, হিজরতের পর ওয়ালীদ বিন মুগীরা, মুগীরা ও শায়বা বিন রাবীয়াহ্ মদীনায় পেঁছে মক্কার কাফিরদের পক্ষ থেকে হুযুরে পাকের খিদমতে এ প্রস্তাব পেশ করেন যে, যদি আপনি ইসলামের প্রতি দাওয়াতের কাজ পরিত্যাগ করেন তবে আমরা আপনাকে মক্কার অর্ধেক সম্পদ প্রদান করবো। আবার মদীনার মুনাফিক ও ইহুদীগণ এই মর্মে ভীতি প্রদর্শন করে যে, যদি তিনি নিজ দাবী ও দাওয়াত

থেকে বিরত না থাকেন তবে আমরা তাকে হত্যা করে ফেলবো। এমতাবস্থায় এ আয়াত-সমূহ নাযিল হয়।---(রূহুল-মা'আনী)

সা'লাবী ও ওয়াহেদী এক তৃতীয় ঘটনা সনদহীনভাবে এরূপ বর্ণনা করেন যে, হোদায়বিয়ার ঘটনার সময় মক্কার কাফিরগণ ও নবীজীর মাঝে 'যুদ্ধ নয় চুক্তি' স্বাক্ষরিত হওয়ার পর যখন আবূ সুফিয়ান, ইকরামা বিন আবূ জেহেল ও আবুল আ'ওয়ার সালামী মদীনায় পৌঁছে নবীজীর খিদমতে নিবেদন করতো যে, আপনি আমাদের উপাস্য দেব-দেবীদের প্রতি কটূক্তি প্রয়োগ পরিহার করুন---এবং কেবল একথা বলুন যে, (পরকালে) এরাও সুপারিশ করবে এবং উপকার ও কল্যাণ সাধন করবে। যদি আপনি এমনটি করেন তবে আমরাও আপনার পালনকর্তার নিন্দাবাদ পরিত্যাগ করবো।---এভাবে আমাদের পারস্পরিক বিবাদ মিটে যাবে।

তাদের এ কথা রসূলুল্লাহ্ (সা) ও সমস্ত মুসলমানের নিকট অত্যন্ত অপছন্দনীয় বোধ হলো। মুসলমানগণ এদেরকে হত্যা করার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন। নবীজী (সা) ইরশাদ করলেন যে, আমি এদের সাথে সন্ধিচুক্তিতে আবদ্ধ বলে এমনটি হতে পারে না। ঠিক এই সময় এ আয়াতসমূহ নাযিল হয়।---(রূহুল মা'আনী)

এসব রেওয়ায়েত যদিও বিভিন্ন প্রকারের, কিন্তু এদের মধ্যে পরস্পর কোন বিরোধ বা অসামঞ্জস্য নেই। এসব ঘটনা ও উল্লিখিত আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হওয়ার কারণ হতে পারে।

এ আয়াতসমূহে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রতি দুটো নির্দেশ রয়েছে---প্রথম. اتَّقِ اللّٰهَ অর্থাৎ আল্লাহ্কে ভয় কর, দ্বিতীয়. ---لَا تُطِعِ الْكَافِرِيْنَ--- অর্থাৎ অবিশ্বাসীদের অনুসরণ করো না। আল্লাহ্কে ভয় করার নির্দেশ এজন্য দেওয়া হয়েছে যে, এসব লোককে হত্যা করা চুক্তিভঙ্গের শামিল---যা সম্পূর্ণ হারাম এবং কাফিরদের কথা অনুসরণ না করার নির্দেশ এ জন্য দেওয়া হয়েছে যে, এ সব ঘটনা সম্পর্কে কাফিরদের যা মতামত, তা মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়, যার বিস্তারিত বিবরণ পরবর্তী পর্যায়ে আসছে।

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللّٰهَ---ইহা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বিশেষ মর্যাদা ও সম্মান যে, সমগ্র কোরআনের কোথাও তাঁকে নাম ধরে সম্বোধন করা হয়নি। যেমনটি অন্যান্য নবীকে সম্বোধনের বেলায় করা হয়েছে। যেমন---يَا آدم - يَا موسى - يَا نوح يَا ابراهيم প্রভৃতি। বরং খাতামুন্নাবিয়্যিন (সা)-কে কোরআন পাকের যেখানেই সম্বোধন করা হয়েছে---তাঁর উপাধি---নবী বা রসূল প্রভৃতির মাধ্যমে করা হয়েছে। কেবল চার জায়গায়, তিনি যে রসূল তা প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়েছে---যা একান্ত জরুরী ছিল।

এস্থলে আঁ হযরত (সা)-কে সম্বোধন করে দুটো নির্দেশ দেওয়া হয়েছে---এক, আল্লাহ্ পাককে ভয় করার---অর্থাৎ মক্কার মুশরিকদের সাথে যে চুক্তি হয়েছে তা যেন লংঘন করা না হয়, দুই---মুশরিক, মুনাফিক ও ইহুদীদের মতামত গ্রহণ না করার। প্রশ্ন হতে পারে যে, 'রসূলুল্লাহ্ (সা) তো যাবতীয় পাপ-পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত। চুক্তি ভংগ করা মহাপাপ (কবীরা গোনাহ্) এবং উপরে শানে-নুযুল প্রসংগে কাফির মুশরিকদের যেসব কথা বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলো গ্রহণ করা তো মারাত্মক পাপ; আর তিনি (নবীজী) এ থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র ---সুতরাং এ নির্দেশের কি প্রয়োজন ছিল? রূহুল মা'আনীতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এসব নির্দেশের অর্থ ভবিষ্যতে এগুলোর উপর স্থির থাকা---যেমনভাবে তিনি এ ঘটনার সময়ও এসব হুকুমের উপর অটল ছিলেন এবং اتق الله--এর নির্দেশ প্রথম উল্লেখ করার কারণ এই যে, মুসলমানগণ শান্তি-চুক্তিতে আবদ্ধ মক্কার মুশরিকদেরকে হত্যা করার ইচ্ছা পোষণ করছিল। সুতরাং চুক্তি লংঘন থেকে বেঁচে থাকার জন্য اتق الله-এর মাধ্যমে প্রথম হিদায়ত করা হয়েছে। অপরপক্ষে যেহেতু কোন মুসলমান মুশরিক---কাফিরদের অনুসরণের ইচ্ছাও পোষণ করতেন না, তাই এর উল্লেখ পরে বলা হয়েছে।

কোন কোন তফসীরকার বলেন যে, এ আয়াতে যদিও নবী করীম (সা)-কে সম্বোধন করা হয়েছে কিন্তু উদ্দেশ্য গোটা উম্মত---তিনি তো ছিলেন সম্পূর্ণ নিষ্পাপ, ---তাঁর দ্বারা আল্লাহ্ পাকের নির্দেশাবলীর বিরুদ্ধাচরণের কোন আশংকাই ছিল না। কিন্তু বিধান গোটা উম্মতের জন্য এবং সেটা বর্ণনার জন্যই এই পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে যে, সম্বোধন করা হয়েছে রসূলুল্লাহ (সা)-কে---যার ফলে হুকুমের গুরুত্ব বহুগুণে বেড়ে গিয়েছে। কেননা, যে বিষয়ে আল্লাহ্র রসূলকেও সম্বোধন করা হয়েছে সে ক্ষেত্রে কোন মানুষই এর আওতা-বহির্ভূত থাকতে পারে না।

ইবনে-কাসীর বলেন যে, এ আয়াতে কাফির ও মুশরিকদের অনুসরণ থেকে বারণ করার মূল উদ্দেশ্য এই যে, তিনি যেন তাদের সাথে কোন ব্যাপারে পরামর্শ না করেন---তাদেরকে অত্যধিক ওঠা-বসা, মেলা-মেশার সুযোগ না দেন। কেননা, এদের সহিত অত্যধিক মেলামেশা ও পরামর্শ করা অনেক সময় এদের কথা গ্রহণ করার কারণরূপে পরিণত হতে পারে। সুতরাং যদিও নবীজীর পক্ষে তাদের কথা গ্রহণের কোন সম্ভাবনাই ছিল না, কিন্তু তাদের সাথে কোন সম্পর্ক রাখা এবং নিজের পরামর্শে তাদের অংশ গ্রহণের সুযোগ প্রদান থেকেও নবীজীকে বারণ করা হয়েছে। পরন্তু এ-ক্ষেত্রে اطاعت (অনুসরণ করা) শব্দ এজন্য ব্যবহার করা হয়েছে যে. এরূপ পরামর্শ ও পারস্পরিক সম্পর্কে স্বভাবত তাদের মতামতের কিছুটা অনুপ্রবেশের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। সুতরাং এস্থলে পরোক্ষভাবে হলেও তাদের মতামত কিছুটা প্রভাবান্বিত করতে পারে; এরূপ কোন সুযোগও যাতে না হয় তারই পথ বন্ধ করা হয়েছে। তাঁর পক্ষে ওদের অনুসরণের তো কোন প্রশ্নই উঠে না।

এখন প্রশ্ন উঠে যে, উল্লিখিত আয়াতে কাফিরদের পক্ষ থেকে শরীয়ত বিরোধী ও হকের পরিপন্থী উক্তি অতি স্বাভাবিক এবং সেগুলোর অনুসরণ না করার নির্দেশও একান্ত যুক্তিযুক্ত। কিন্তু মুনাফিকগণ যদি আপনার নিকটে প্রকাশ্যভাবে কোন ইসলাম বিরোধী উক্তি করে, তবে তো তারা আর মুনাফিক থাকে না---পরিষ্কার কাফির হয়ে যায়---এমতাবস্থায় তাদের কথা স্বতন্ত্রভাবে বলার প্রয়োজনীয়তা কি? এর উত্তর এই হতে পারে যে, মুনাফিকগণ একেবারে স্পষ্টভাবে তো ইসলাম বিরোধী কোন উক্তি করতো না, কিন্তু অন্যান্য কাফিরের সমর্থনে কথা বলতো।

শানে নুযুল প্রসঙ্গে মুনাফিকদের যে ঘটনা উপরে বর্ণনা করা হয়েছে, যদি এটাকেই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ বলে ধরে নেয়া হয়, তবে তো কোন কথাই থাকে না। কেননা এ ঘটনানুযায়ী যেসব ইহুদী কপটভাবে নিজেদেরকে মুসলমান বলে প্রকাশ করে তাদের সাথে বিশেষ সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার করতে নবীজীকে বারণ করা হয়েছে।

এ আয়াতের উপসংহার إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا---বলে, আল্লাহ্‌কে ভয় করার এবং কাফির ও মুনাফিকদের অনুসরণ না করার পূর্ব বর্ণিত যে হুকুম তার তাৎপর্য ও যৌক্তিকতা বর্ণনা করা হয়েছে। কেননা যে আল্লাহ্ যাবতীয় কর্মের পরিণতি ও ফলাফল সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত, তিনি অত্যন্ত প্রজ্ঞাময়---মানুষের যাবতীয় কল্যাণ ও মংগল তাঁর পরিজ্ঞাত। একথা এজন্য বলা হয়েছে যে, কাফির ও মুনাফিকদের কোন কোন কথা এমনও ছিল যদ্দ্বারা অন্যায়-অশান্তি লাঘব এবং পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সদ্ভাবপূর্ণ পরিবেশ স্থাপন এরূপ, অন্যান্য কল্যাণ ও উপকার সাধনে সহায়ক হতো। কিন্তু এদের সাথে সৌজন্যমূলক আচরণও মংগলের পরিপন্থী বলে হক তা'আলা নবীজীকে তা করতে বারণ করেছেন এবং বলেছেন যে, এর পরিণাম শুভ নয়।

وَاتَّبِعْ مَا يُوْحٰى اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا---

ইহা পূর্ববর্তী হুকুমেরই অবশিষ্টাংশ---যেন আপনি কাফির ও মুনাফিকদের কথায় পড়ে তাদের অনুসরণ না করেন, বরং ওহীর মাধ্যমে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যা কিছু পৌঁছেছে, আপনি সাহাবায়ে কিরামসহ কেবল তাই অনুসরণ করুন। যেহেতু সাহাবায়ে কিরাম ও সমগ্র মুসলমানই এ সম্বোধনের অন্তর্ভুক্ত। তাই বহুবচন ক্রিয়া بِمَا تَعْمَلُوْنَ ব্যবহার করে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে।

وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا---ইহাও পূর্ববর্তী হুকুমের সমাপনী অংশ বিশেষ। ইরশাদ হয়েছে যে, আপনি এসব লোকের কথায় পড়ে কোন কাজে উদ্যোগী হবেন না, স্বীয় উদ্দেশ্য সাধন ও লক্ষ্য অর্জনে কেবল আল্লাহ্‌র উপরে ভরসা

করুন। কেননা অভিভাবকরূপে তিনিই যথেষ্ট। তাঁর বর্তমানে আপনার অন্য কারো সাহায্য-সহযোগিতার প্রয়োজন নেই।

মাস'আলা ঃ উল্লিখিত আয়াতসমূহ দ্বারা একথা প্রমাণিত হলো যে, দীন সংক্রান্ত কোন বিষয়ে কাফিরদের পরামর্শ গ্রহণ করা জায়েয নয়। অবশ্য অভিজ্ঞতাসংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে তাদের পরামর্শ গ্রহণে কোন দোষ নেই।

مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِىْ جَوْفِهٖ ۚ وَمَا جَعَلَ اَزْوَاجَكُمُ الّٰٓـِٔىْ تُظٰهِرُوْنَ مِنْهُنَّ اُمَّهٰتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَآءَكُمْ اَبْنَآءَكُمْ ؕ ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِاَفْوَاهِكُمْ ؕ وَاللّٰهُ يَقُوْلُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِى السَّبِيْلَ ﴿٤﴾ اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَآئِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ لَّمْ تَعْلَمُوْٓا اٰبَآءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ وَمَوَالِيْكُمْ ؕ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيْمَآ اَخْطَاْتُمْ بِهٖ وَلٰكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوْبُكُمْ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٥﴾

---

(৪) আল্লাহ্ কোন মানুষের মধ্যে দুটি হৃদয় স্থাপন করেন নি। তোমাদের স্ত্রীগণ যাদের সাথে তোমরা 'জিহার' কর, তাদেরকে তোমাদের জননী করেন নি এবং তোমাদের পোষ্য পুত্রদেরকে তোমাদের পুত্র করেন নি। এগুলো তোমাদের মুখের কথা মাত্র। আল্লাহ্ ন্যায় কথা বলেন এবং পথ প্রদর্শন করেন। (৫) তোমরা তাদেরকে তাদের পিতৃপরিচয়ে ডাক। এটাই আল্লাহ্র কাছে ন্যায়সঙ্গত। যদি তোমরা তাদের পিতৃ-পরিচয় না জান, তবে তারা তোমাদের ধর্মীয় ভাই ও বন্ধুরূপে গণ্য হবে। এ ব্যাপারে তোমাদের কোন বিচ্যুতি হলে তাতে তোমাদের কোন গোনাহ্ নেই, তবে ইচ্ছাকৃত হলে ভিন্ন কথা। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আল্লাহ্ পাক কারো বক্ষাভ্যন্তরে দু'টি অন্তকরণ তৈরী করেন নি এবং (অনুরূপভাবে) তোমরা যে সব স্ত্রীকে মা সম্বোধন কর তাদেরকে তোমাদের মায়ে পরিণত করেন নি এবং (অনুরূপভাবে জেনে রাখ যে,) তোমাদের পোষ্য পুত্রদেরকে প্রকৃত পুত্রেও পরিণত করেন নি। এটা তোমাদের নিছক মৌখিক বাক্য (যা অলীক---বাস্তবের সাথে

সঙ্গতিহীন) এবং আল্লাহ্ পাক সত্য কথা বলেন এবং তিনিই সরল পথ প্রদর্শন করেন। (এবং যখন পোষ্য পুত্র তোমাদের প্রকৃত পুত্র নয় কাজেই) তোমরা এদেরকে (পালক পিতার পুত্র বলে সম্বোধন করো না বরং) এদের (প্রকৃত) পিতৃগণের নামে আহবান কর। আল্লাহ্র নিকট ইহাই সুসঙ্গত। যদি তোমরা তাদের পিতৃগণের পরিচয় না জান তবে তাদেরকে তোমাদের ভাই বা বন্ধু বলে সম্বোধন কর। (কেননা তারা তোমাদের ধর্মীয় ভাই ও বন্ধু) আর এ ব্যাপারে তোমাদের যে ভুলত্রুটি হয়েছে তাতে কোন পাপ হবে না। কিন্তু হ্যাঁ, যা তোমরা অন্তর থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে বলতে (তাতে অবশ্যই পাপ হবে) এবং (এ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করলে তাও ক্ষমা হয়ে যাবে কেননা) আল্লাহ্ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম করুণাময়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রতি কাফির ও মুনাফিকদের পরা-মর্শানুযায়ী কাজ না করা ও তাদের কথায় কর্ণপাত না করার নির্দেশ রয়েছে। উল্লিখিত আয়াতসমূহে কাফিরদের মাঝে প্রচলিত তিনটি কুপ্রথা ও ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন করা হয়েছে। প্রথমত বর্বর যুগে আরববাসিগণ অসাধারণ মেধাবী লোকের বক্ষাভ্যন্তরে দুটি অন্তকরণ আছে বলে মনে করত। দ্বিতীয়ত নিজ পত্নীগণ সম্পর্কে এ প্রথা বিরাজ-মান ছিল যে, যদি কোন ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রীকে তার মার পিঠ বা অন্য কোন অঙ্গের সাথে তুলনা করে বলতো যে, তুমি আমার পক্ষে আমার মায়ের পিঠের সমতুল্য, যাকে তাদের পরিভাষায় 'জিহার' বলা হতো, তবে 'জিহার'কৃত সে স্ত্রী তার কাছে চিরকালের জন্য হারাম হয়ে যেত। ظهار এর উৎপত্তি ظهر থেকে---যার অর্থ-পিঠ।

তৃতীয়ত তাদের মধ্যে এরূপ প্রথা ছিল যে, যদি কোন ব্যক্তি অপর কারো পুত্রকে পোষ্য পুত্ররূপে গ্রহণ করত, তবে এ পোষ্য পুত্র তার প্রকৃত পুত্র বলেই পরিচিত হতো; এবং তারই পুত্র বলে সম্বোধন করা হতো; এ পোষ্য পুত্র সকল ক্ষেত্রে প্রকৃত পুত্রেরই মর্যাদাভুক্ত হতো। যথা---তারা প্রকৃত সন্তানের ন্যায়ই মীরাসের অংশীদার হতো এবং বংশ ও রক্তগত সম্পর্কের ভিত্তিতে যেসব নারীর সাথে বিয়ে-শাদী হারাম---এ পোষ্য পুত্রের সম্পর্কের ক্ষেত্রেও এরূপই মনে করা হতো। যেমন---বিচ্ছেদ সংঘটিত হওয়ার পরও ঔরসজাত পুত্রের স্ত্রীকে বিয়ে করা যেরূপ হারাম, অনুরূপভাবে পালক পুত্রের তালাক প্রাপ্ত স্ত্রীও সে ব্যক্তির পক্ষে হারাম বলে মনে করা হতো।

বর্বর যুগের এই তিনটি ভ্রান্ত ধারণা ও কুপ্রথার মধ্যে প্রথমটি ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস ও ক্রিয়াকর্মের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয় বলে ইসলামী শরীয়তে একে রদ করা বিশেষ প্রয়োজন ছিল না। এটা তো একান্তই শরীরতত্ত্ব, বিজ্ঞান ও চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ব্যাপার যে, মানুষের বক্ষাভ্যন্তরে একটি অন্তকরণ থাকে, না দু'টি অন্তকরণ থাকে। এর স্পষ্ট অসারতা সর্বজনজ্ঞাত। এজন্য সম্ভবত এর অসারতার বর্ণনা অপর দুটো বিষয়ের সমর্থনে ভূমিকা স্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, বর্বর যুগের অধিবাসীদের মানুষের বক্ষ মাঝে দু'টি অন্তকরণ আছে বলে যে বিশ্বাসের অসারতা ও

অযৌক্তিকতা যেমন সাধারণ-অসাধারণ সর্বজনবিদিত, অনুরূপভাবে তাদের 'জিহার' ও পালক পুত্র সংশ্লিষ্ট ধারণাও সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও অমূলক।

অবশিষ্ট দুটি বিষয়---জিহার ও পালক পুত্রের হুকুম---এগুলো এমন সব সামাজিক ও পারিবারিক বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত, ইসলামে যেগুলোর বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। আল্লাহ্ পাক যার বিস্তারিত বিবরণ ও খুঁটি-নাটি পর্যন্ত কোরআনে প্রদান করেছেন। অন্যান্য বিষয়ের মত নিছক মূলনীতিগুলো উল্লেখ করে সবিস্তার বিশ্লেষণের ভার নবীজী (সা)-র উপর ন্যস্ত করেন নি। এ দু'ব্যাপারে বর্বর আরবগণ নিজেদের খেয়াল খুশীমত হালাল-হারাম ও জায়েয-না-জায়েয সংশ্লিষ্ট স্বকীয় কল্পনাপ্রসূত বিধি-বিধান প্রণয়ন করে রেখেছিল। এসব অমূলক ধারণা ও প্রথাসমূহের অন্তঃসারশূন্যতা প্রতিপন্ন করে যা প্রকৃত সত্য, তা উদ্‌ঘাটন করে দেওয়া সত্য ধর্ম ইসলামের অবশ্য কর্তব্য ছিল---তাই বলা হয়েছে ঃ---وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ الَّٰئِي تُظٰهِرُوْنَ مِنْهُنَّ أُمَّهٰتِكُمْ---অর্থাৎ এ ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক যে, যদি কোন ব্যক্তি নিজ স্ত্রীকে মায়ের সদৃশ বলে ঘোষণা করে তবে তার পক্ষে সে স্ত্রী প্রকৃত মায়ের ন্যায় চিরদিনের তরে হারাম হয়ে যায়। তোমাদের এরূপ বলার ফলে সে স্ত্রী প্রকৃত মা হয়ে যায় না। তোমাদের প্রকৃত মা তো সে-ই, যার উদর থেকে তোমরা জন্মগ্রহণ করেছ।

এ আয়াতে 'জিহারের' দরুন স্ত্রী চিরতরে হারাম হয়ে যাওয়ার অন্ধকার যুগের ভ্রান্ত ধারণা সম্পূর্ণ বাতিল বলে ঘোষণা করা হয়েছে। আর এরূপ বলার ফলে শরীয়তের কোন প্রতিক্রিয়া হয় কিনা, এ সম্পর্কে 'সূরায়ে মুজাদালায়' এরূপ বলাকে পাপ বলে আখ্যায়িত করে এ থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এরূপ বলার পর যদি জিহারের কাফ্‌ফারা আদায় করে, তবে স্ত্রী তার তরে হালাল হয়ে যাবে। 'সূরায়ে মুজাদালায়' জিহারের কাফ্‌ফারার বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করা হয়েছে ঃ

দ্বিতীয় বিষয় পালক পুত্র সংশ্লিষ্ট। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ---أَدْعِيَاء দعی-এর বহুবচন, যার পালক ছেলে---আয়াতের মর্ম এই, যেমন কোন মানুষের দুটি অন্তকরণ থাকে না এবং যেমন স্ত্রীকে মা বলে সম্বোধন করলে সে প্রকৃত মা হয়ে যায় না ; অনুরূপভাবে তোমাদের পোষ্য ছেলেও প্রকৃত ছেলেতে পরিণত হয় না অর্থাৎ অন্য সন্তানদের ন্যায় সে মীরাসেরও অংশীদার হবে না এবং বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন নিষিদ্ধ হওয়া সংশ্লিষ্ট মাস'আলাসমূহও এর প্রতি প্রযোজ্য হবে না। সুতরাং সন্তানের তালাক প্রাপ্তা স্ত্রী যেমন পিতার জন্য চিরতরে হারাম, কিন্তু পোষ্য পুত্রের স্ত্রী পালক পিতার তরে তেমনভাবে হারাম হবে না।

যেহেতু এই শেষোক্ত বিষয়ের প্রতিক্রিয়া বহু ক্ষেত্রে পড়ে থাকে, সুতরাং এ নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে যে, যখন পালক ছেলেকে ডাকবে বা তার উল্লেখ করবে তখন তা তার প্রকৃত পিতার নামেই করবে। পালক পিতার পুত্র বলে সম্বোধন করবে

না। কেননা এর ফলে বিভিন্ন ব্যাপারে নানাবিধ সন্দেহ ও জটিলতা উদ্ভবের আশংকা রয়েছে।

বুখারী, মুসলিম প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে হযরত ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে আমরা যায়েদ বিন হারিসা (রা)-কে যায়েদ বিন মুহাম্মদ (সা) বলে সম্বোধন করতাম। [কেননা রসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে পালক ছেলে-রূপে গ্রহণ করেছিলেন।] এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর আমরা এ অভ্যাস পরি-ত্যাগ করি।

মাস'আলা ঃ এর দ্বারা বোঝা যায়, অনেকে যে অপরের সন্তানকে নিজ পুত্র বলে আহবান করে তা যদি নিছক স্নেহপরবশজনিত হয়---পালক পুত্রে পরিণত করার উদ্দেশ্যে না হয় তবে যদিও জায়েয, কিন্তু তবুও বাহ্যত যা নিষিদ্ধ, তাতে জড়িত হওয়া সমীচীন নয়।---(রূহুল বায়ান, বায়যাবী)

এ ব্যাপারটা কুরায়শদেরকে চরম বিভ্রান্তিতে ফেলে এক গুরুতর পাপে লিপ্ত করে রেখেছিল। এমন কি নবীজী (সা)-কে পর্যন্ত এ অপবাদ দেওয়ার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেছিল যে, তিনি নিজ পুত্রের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিয়ে করেছেন। অথচ যায়েদ (রা) তাঁর সন্তান ছিলেন না বরং পালকপুত্র ছিলেন, যার বিবরণ এ সূরাতে পরে আছে।

اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجُهٗۤ اُمَّهٰتُهُمْ ط وَاُولُوا
الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُهٰجِرِيْنَ
اِلَّاۤ اَنْ تَفْعَلُوْۤا اِلٰۤى اَوْلِيٰٓئِكُمْ مَّعْرُوْفًا ط كَانَ ذٰلِكَ فِي الْكِتٰبِ
مَسْطُوْرًا ﴿٦﴾

---

(৬) নবী মু'মিনদের নিকট তাদের নিজেদের অপেক্ষা অধিক ঘনিষ্ঠ এবং তার স্ত্রীগণ তাদের মাতা। আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী মু'মিন ও মুহাজিরগণের মধ্যে যারা আত্মীয়, তারা পরস্পরে অধিক ঘনিষ্ঠ। তবে তোমরা যদি তোমাদের বন্ধুদের প্রতি দয়া-দাক্ষিণ্য করতে চাও, করতে পার। এটা লওহে-মাহ্ফুজে লিখিত আছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নবী (সা) বিশ্বাসিগণের সাথে তাদের নিজেদের চাইতেও নিবিড় সম্পর্ক রাখেন (কেননা মানুষ স্বয়ং তার উপকার ও ক্ষতি উভয়ই সাধন করতে পারে। কারণ মানব হৃদয় যদি কলুষমুক্ত থেকে সঠিক পথে চলে, সৎকাজে আকৃষ্ট হয়, তবে তো উপকার

ও কল্যাণ ; কিন্তু যদি পাপকর্মে ধাবিত হয় তবে নিজ সত্তাই তার জন্য সমূহ বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। পক্ষান্তরে নবীজীর শিক্ষা-দীক্ষা মানবের তরে কেবল কল্যাণ ও মঙ্গলই আনয়ন করে। হৃদয় যদি কলুষমুক্তও থাকে এবং সঠিক পথেই ধাবিত হয়, তবুও এর লাভ নবীজীর লাভ ও উপকারের তুল্য হতে পারে না। কেননা, মানবমন ও বিবেক শুভ-অশুভ, কল্যাণ ও অকল্যাণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিভ্রান্তিতে পড়ার আশংকাও রয়েছে। আর মঙ্গলামঙ্গল সম্পর্কেও পুরোপুরি জ্ঞানও তার নেই। পক্ষান্তরে রসূলুল্লাহ্ (সা) প্রদত্ত শিক্ষায় কোন বিভ্রান্তির আশংকা নেই। যেহেতু রসূলুল্লাহ্ (সা) মানবের তরে তাদের স্বীয় জন-প্রাণের চাইতেও অধিকতর উপকার ও কল্যাণ সাধনকারী, সুতরাং আমাদের উপর তাঁর অধিকার আমাদের প্রাণের চাইতে বেশী এবং এ অধিকার হলো আমাদের প্রতিটি কাজে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করা ও তাঁর প্রতি সমগ্র সৃষ্টিকুলের চাইতে বেশী শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করা)। আর নবী-পত্নীগণ তাঁদের (মু'মিনগণের) মা (অর্থাৎ উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারা বোঝা গেল যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) মু'মিনগণের আধ্যাত্মিক পিতা। যিনি তাদের প্রতি তাদের নিজের চাইতেও অধিক দরদী ও স্নেহপরায়ণ। এ সম্পর্কের ভিত্তিতে তাঁর পুণ্যবতী স্ত্রীগণ তাদের মায়ে পরিণত হলেন। অর্থাৎ তাঁরা মায়ের অনুরূপ ভক্তি-শ্রদ্ধা লাভের অধিকারিণী।

এ আয়াতে নবীজীর পুণ্যবতী স্ত্রীগণকে সুস্পষ্টভাবে মুসলিম জাতির মা এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে পরোক্ষভাবে আধ্যাত্মিক পিতা বলে আখ্যায়িত করার ফলে পোষ্য পুত্রকে পালক পিতার প্রতি সম্বোধন করার দরুন যেরূপ সন্দেহের উদ্রেক করত, এক্ষেত্রেও অনুরূপ সন্দেহের উদ্রেক করতে পারত; যার ফলশ্রুতি স্বরূপ সমগ্র মুসলিমের মাঝে পরস্পর আপন ভাই-বোনের সম্পর্ক স্থাপন হয়ে যাওয়ায় আপসে তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন নিষিদ্ধ হয়ে যেত এবং মীরাসের ক্ষেত্রেও প্রত্যেক মুসলমান অপরের উত্তরাধিকারে পরিণত হতো। এ সন্দেহ অপনোদনের জন্য আয়াতের উপসংহারে বলে দেয়া হয়েছে : وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ الاية — অর্থাৎ আত্মীয়-স্বজনগণ আল্লাহ্‌র কিতাব অনুসারে (শরীয়তের বিধানানুযায়ী মীরাসের ক্ষেত্রে) অন্যান্য মু'মিন ও মুহাজিরগণ অপেক্ষা পরস্পর নিবিড়তর সম্পর্ক রাখে। কিন্তু যদি তোমরা নিজেদের (ঐ) বন্ধুগণের সাথে (অসিয়তের মাধ্যমে) কোন সদ্ব্যবহার ও সহানুভূতি প্রদর্শন করতে চাও তবে তা জায়েয আছে। এ কথাটি লাওহে মাহ্ফুযে লিপিবদ্ধ রয়েছে (যে হিজরতের সূচনা-পর্বে ঈমানী ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে মুহাজিরগণকে আনসারদের মীরাসের অংশীদার করে দেয়া হয়েছিল; কিন্তু পরবর্তী সময়ে মীরাসের বাটোয়ারা আত্মীয়তা ও রক্ত সম্পর্কের ভিত্তিতে সংঘটিত হবে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, "সূরায়ে আহ্যাবের" অধিকাংশ আলোচ্য বিষয় রসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও তাঁকে দুঃখ-কষ্ট দেয়া হারাম হওয়া সংশ্লিষ্ট। সূরার প্রারম্ভে মুশরিক ও মুনাফিকদের প্রদত্ত জ্বালা-যন্ত্রণার বর্ণনা দেওয়ার পর রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে প্রাসঙ্গিক নানাবিধ উপদেশ প্রদান করা হয়েছিল। অতপর অন্ধকার যুগের তিনটি অযৌক্তিক প্রথার অসারতা প্রমাণ করা হয়েছে। ঘটনাক্রমে শেষ কুপ্রথাটি সম্পর্কে আলোচনার একটি সম্পর্ক নবীজীকে যন্ত্রণাদান সংশ্লিষ্ট ছিল। কেননা কাফিরগণ হযরত যায়েদের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী পুণ্যবতী যয়নব (রা)-এর সাথে নবীজীর বিবাহ অনুষ্ঠিত হওয়ার কালে বর্বরযুগের এই পোষ্য পুত্র জনিত কুপ্রথার ভিত্তিতে এরূপ অপবাদ দেয় যে, তিনি নিজ ছেলের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিবাহ করেছেন। সূরার শুরু থেকে এ পর্যন্ত নবীজীকে যন্ত্রণা প্রদান-সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু ছিল। আলোচ্য আয়াতে সমস্ত সৃষ্টিকুলের চাইতে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও তাঁর অনুসরণ অধিক প্রয়োজনীয় বলে বর্ণনা করা হয়েছে। اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ الخ

اولى با لمو منين—এর যে মর্ম তফসীরের সার-সংক্ষেপ অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে, তা ইবনে আতিয়াহ্ (ابن عطية) প্রমুখের অভিমত—যা কুরতুবী ও অধিকাংশ তফসীরকার গ্রহণ করেছেন, যার সারমর্ম এই যে, প্রত্যেক মুসলমানের পক্ষে আপনার (সা) নির্দেশ পালন করা স্বীয় পিতা-মাতার নির্দেশের চাইতেও অধিক আবশ্যকীয়। যদি পিতা-মাতার হুকুম তাঁর (সা) হুকুমের পরিপন্থী হয় তবে তা পালন করা জায়েয নয়। এমনকি তাঁর (সা) নির্দেশকে নিজের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষার চাইতেও অগ্রাধিকার দিতে হবে।

সহীহ্ বুখারী প্রমুখ হাদীস গ্রন্থে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, হুযূরে পাক (সা) ইরশাদ করেছেনঃ

ما من مؤمن الا وانا اولى الناس به فى الدنيا والاخرة اقرأوا ان شئتم النبى اولى با لمؤمنين من انفسهم

অর্থাৎ এমন কোন মু'মিনই নেই, যার পক্ষে আমি (সা) ইহকাল ও পরকালে সমস্ত মানবকুলের চাইতে অধিক হিতাকাঙ্ক্ষী ও আপনজন নই। যদি তোমাদের মনে চায় তবে এর সমর্থন ও সত্যতা প্রমাণের জন্য কোরআনের আয়াতঃ النَّبِىُّ اولى با لمؤمنين من انفسهم—পাঠ কর।

যার সারমর্ম এই যে, আমি প্রত্যেক মু'মিন-মুসলমানের জন্য গোটা সৃষ্টিকুলের চাইতে অধিক স্নেহপরায়ণ ও মমতাবান। একথা সুস্পষ্ট যে, এর অবশ্যম্ভাবী ফল

এরূপ হওয়া উচিত যে, নবীজীর প্রতি প্রত্যেক মু'মিনের ভালবাসা সর্বাধিক গভীর হওয়া বান্ছনীয়। যেমন হাদীসে ইরশাদ হয়েছেঃ

لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين - بخارى، مسلم - مظهرى

অর্থাৎ তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন হতে পারবে না, যে পর্যন্ত তার অন্তরে আমার ভালবাসা নিজ পিতা, নিজ সন্তান এবং সমস্ত মানব হতে অধিক পরিমাণে না হবে। (বুখারী, মুসলিম, মাযহারী)

وَاَزْوَاجُهٗۤ اُمَّهٰتُهُمْ---তাঁর পুণ্যবতী স্ত্রীগণকে উম্মতে মুসলিমার মা বলে আখ্যায়িত করার অর্থ---ভক্তি শ্রদ্ধার ক্ষেত্রে মায়ের পর্যায়ভুক্ত হওয়া। মা-ছেলের সম্পর্ক-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আহকাম, যথা---পরস্পর বিয়ে-শাদী হারাম হওয়া। মুহরিম হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে পরস্পর পর্দা না করা এবং মীরাসে অংশীদারিত্ব প্রভৃতি এক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। যেমন আয়াতের শেষে একথা স্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে। আর নবীজীর শুদ্ধাচারিণী পত্নীগণের সাথে উম্মতের বিয়ে অনুষ্ঠান হারাম হওয়ার কথা অন্য এক আয়াতে ভিন্নভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং এক্ষেত্রে বিয়ে অনুষ্ঠান হারাম হওয়া মা হওয়ার কারণেই ছিল, এমনটি হওয়া জরুরী নয়।

মাস'আলা ঃ উপরোক্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, নবীজীর পুণ্যবতী বিবি-গণের (রা) মধ্যে কারো প্রতি সামান্যতম বে-আদবী ও অশিষ্টাচারও এজন্য হারাম যে, তাঁরা উম্মতের মা। উপরন্তু তাঁদেরকে দুঃখ দিলে নবীজীকেও দুঃখ দেয়া হয়, যা চরমভাবে হারাম।

وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ---واولوا الارحام-শব্দগত অর্থানুযায়ী সকল আত্মীয়-স্বজনই এর অন্তর্ভুক্ত---চাই সেসব ব্যক্তিবর্গ যাদেরকে ফকীহগণ 'আসাবাত' (عصبات) বলে আখ্যায়িত করেছেন যা যাদেরকে বিশেষ পরি-ভাষানুযায়ী 'আসবাতে'র মুকাবিলায় اولوا الارحام নামে নামকরণ করা হয়েছে। অবশ্য কোরআনী আয়াতের মর্ম পরবর্তীকালে গৃহীত ফিকাহ্‌র এ পরিভাষা নয়।

সারকথা এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) ও তদীয় পত্নীগণের সাথে মুসলিম উম্মতের সম্পর্ক যদিও পিতা-মাতার চাইতেও উন্নততর ও অগ্রস্থানীয় কিন্তু মীরাসের ক্ষেত্রে তাদের কোন স্থান নেই বরং মীরাস বংশ ও আত্মীয়তার সম্পর্কের ভিত্তিতে বন্টিত হবে।

ইসলামের সূচনাকালে মীরাসের অংশীদারিত্ব ঈমান ও আত্মিক সম্পর্কের ভিত্তিতে নির্ধারিত হতো। পরবর্তী সময়ে তা রহিত করে আত্মীয়তার সম্পর্ককেই অংশীদারিত্ব

নির্ধারণের ভিত্তি ধার্য করে দেয়া হয়েছে। স্বয়ং কোরআন করীমই তার বিস্তারিত বর্ণনা প্রদান করেছে। এতদসংশ্লিষ্ট রহিতকারী ও রহিত আয়াতসমূহের বিস্তারিত বিবরণ ইতিপূর্বে সূরায়ে আনফালে প্রদত্ত হয়েছে। আয়াতে المؤمنين এর পরে আবার المهاجرين এর উল্লেখ এ ক্ষেত্রে তাঁদের বিশিষ্টতা ও স্বাতন্ত্র্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে করা হয়েছে।

কোন কোন মনীষীর মতে এ স্থলে মু'মিনীন' (مؤمنين) বলে আনসারগণকে বোঝানো হয়েছে। এখানে 'মু'মিনীন' অর্থ যে আনসার, তা মুহাজিরীনের মুকাবিলায় 'মু'মিনীন' শব্দ ব্যবহার থেকে বোঝা যায়। এমতাবস্থায় এ আয়াত হিজরতের মাধ্যমে মীরাসে অধিকার প্রদান সংক্রান্ত পূর্ববর্তী হুকুমের রহিতকারী (নাসেখ) বলে বিবেচিত হবে। কেননা নবীজী হিজরতের প্রারম্ভিককালে মুহাজিরীন ও আনসারের মাঝে ঈমানী ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপন করে পরস্পর পরস্পরের উত্তরাধিকার লাভ সংক্রান্ত নির্দেশও প্রয়োগ করে দিয়েছিলেন। এ আয়াতের মাধ্যমে হিজরতের ফলে উত্তরাধিকার লাভ সংশ্লিষ্ট সে হুকুমও রহিত করা হয়েছে---(কুরতুবী)

إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا---অর্থাৎ উত্তরাধিকার তো কেবল আত্মীয়তার সম্পর্কের ভিত্তিতে লাভ করা যাবে। কোন অনাত্মীয় উত্তরাধিকারী হতে পারবে না। কিন্তু ঈমানী ভ্রাতৃত্বজনিত সম্পর্কের কারণে কাউকে কিছু প্রদান করতে চাইলে সে অধিকার বহাল থাকবে---নিজ জীবদ্দশায়ও দান ও উপঢৌকন হিসেবে তাদেরকে প্রদান করতে পারবে এবং মৃত্যুর পর তাদের জন্য অসিয়তও করা যাবে।

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۖ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٧﴾ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ ۚ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٨﴾

---

(৭) যখন আমি পয়গম্বরগণের কাছ থেকে, আপনার কাছ থেকে এবং নূহ, ইবরাহীম, মূসা ও মরিয়ম-তনয় ঈসার কাছ থেকে অংগীকার নিলাম এবং অংগীকার নিলাম তাদের কাছ থেকে দৃঢ় অংগীকার---(৮) সত্যবাদীদেরকে তাদের সত্যবাদিতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার জন্য। তিনি কাফিরদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং (সে ক্ষণটি বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য) যখন আমি সমস্ত পয়গম্বর থেকে (এ) অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম (যেন তাঁরা আল্লাহ্র আহ্কামের অনুসরণ করেন----সমগ্র সৃষ্টিকুলকে আল্লাহ্র পথে আহবান এবং পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতাও এর অন্তর্গত) এবং (সেসব পয়গম্বরগণের সাথে) আপনার নিকট হতেও অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম (অনুরূপভাবে) নূহ, ইব্রাহীম, মূসা ও মরিয়ম-তনয় ঈসা (আ) থেকেও এবং (এটা কোন সাধারণ অঙ্গীকার ছিল না বরং) তাদেরকে অত্যন্ত সুদৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ করেছিলাম যেন (কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ পাক) সেসব সত্যবাদী ব্যক্তির থেকে (অর্থাৎ, নবীগণ থেকে) তাদের সত্যপরায়ণতা সম্পর্কে অনুসন্ধান করেন (যেন এর ফলে তাঁদের মান-মর্যাদা এবং অমান্যকারীগণের বিপক্ষে প্রয়োজনীয় দলীল প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। এই অঙ্গীকার ও তার অনুসন্ধান ক্রিয়া থেকে দুটো কাজ ওয়াজিব ---অপরিহার্য বলে প্রমাণিত হলো। এক--যার উপর ওহী নাযিল হয় তাঁর পক্ষেও সে ওহীর অনুসরণ ওয়াজিব---দুই---সাধারণ লোকের উপর সাহেবে ওহী তথা ওহী-প্রাপ্ত পয়গম্বরের অনুসরণ ওয়াজিব) এবং কাফিরদের জন্য (যারা নবীর অনুসরণ থেকে পরাঙ্মুখ) আল্লাহ্ পাক যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরার শুরুতে নবী করীম (সা)-কে তাঁর উপর অবতরিত ওহী অনুসরণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে و اتبع ما يوحى اليك من ربك---অর্থাৎ আপনার উপর আপনার পালনকর্তার পক্ষ হতে যে ওহী অবতরিত হয়েছে, তা অনু-সরণ করুন। আর পূর্ববর্তী আয়াত النبى اولى بالمؤمنين এর মাধ্যমে মু'মিনগণের উপর সাহেবে ওহী---পয়গম্বর (সা)-এর নির্দেশাবলী পালন করা ওয়াজিব বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এ দুটো কথাই আরো অধিক প্রমাণ ও প্রকাশের উদ্দেশ্যে উল্লিখিত আয়াতদ্বয়েও দুটি বিষয় বিবৃত হয়েছে। অর্থাৎ, সাহেবে ওহীর পক্ষে তাঁর উপর অবতরিত ওহীর এবং অন্যান্যদের পক্ষে সাহেবে ওহীর অনুসরণ করা ওয়াজিব অপরিহার্য।

নবীগণের অঙ্গীকার গ্রহণ : উল্লিখিত আয়াতে নবীগণ থেকে যে অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি গ্রহণের কথা আলোচিত হয়েছে তা সমস্ত মানবকুল থেকে গৃহীত সাধারণ অঙ্গীকার হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। যেমন মিশকাত শরীফে ইমাম আহমদ (র) থেকে বর্ণিত আছে :

خصوا بميثاق الرسالة والنبوة وهو قوله تعالى واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم الاية ـ

অর্থাৎ রিসালত ও নবুয়তসংশ্লিষ্ট অঙ্গীকার নবী ও রসূলগণ থেকে স্বতন্ত্র-রূপে বিশেষভাবে গ্রহণ করা হয়েছে। যথা---আল্লাহ্ পাকের বাণী ঃ

وَاِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّيْنَ مِيْثَاقَهُمْ الاية

নবীগণ (সা) থেকে গৃহীত এ অঙ্গীকার ছিল নবুয়ত ও রিসালত সংশ্লিষ্ট দায়িত্বসমূহ পালন এবং পরস্পর একে অপরের সত্যতা প্রকাশ ও সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান সম্পর্কিত। ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেম প্রমুখ হযরত কাতাদাহ (রা) থেকে অনুরূপ রেওয়ায়েত করেছেন। পর এক রেওয়ায়েত অনুসারে একথাও নবীগণের (সা) এ অঙ্গীকারভুক্ত ছিল যেন তাঁরা সকলে এ ঘোষণাও করেন যে---محمد رسول الله لا نبى بعده ---অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্র রসূল, তাঁর পরে কোন নবী আসবেন না।

নবীগণের এ অঙ্গীকারও 'আযল' জগতে সেদিনই গ্রহণ করা হয়েছিল যেদিন সমগ্র মানবকুল থেকে الست بربكم এর অঙ্গীকার গৃহীত হয়েছিল।---(রূহুল-বায়ান ও মাযহারী)

وَمِنْكَ وَمِنْ نُوْحٍ الاية ---সাধারণভাবে সমস্ত নবীগণের কথা (সা) উল্লেখের পর পাঁচজনের নাম আবার বিশেষভাবে এজন্য উল্লেখ করা হয়েছে যে, নবীকুলের মধ্যে তাঁরা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। এদের মাঝে রসূলে মকবুল (সা)-এর আবির্ভাব সকলের শেষে হয়ে থাকলেও منك শব্দের মাধ্যমে নবীজীকে সর্বাগ্রে উল্লেখ করা হয়েছে। যার কারণ হাদীসের মধ্যে এরূপ বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

كنت اول الناس فى الخلق واخرهم فى البعث (رواه ابن سعد والبطرنى) ---অর্থাৎ আমি (নবীকুলের মাঝে) সৃষ্টিগতভাবে সকলের আগে, কিন্তু আবির্ভাবগতভাবে নবুয়ত প্রাপ্তির দিক দিয়ে সকলের পরে।---(মাযহারী)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَآءَتْكُمْ جُنُوْدٌ

فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَّجُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

بَصِيْرًا ۝ اِذْ جَآءُوْكُمْ مِّنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ اَسْفَلَ مِنْكُمْ وَاِذْ

زَاغَتِ الْاَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوْبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ الظُّنُوْنَا ﴿١٠﴾
هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَزُلْزِلُوْا زِلْزَالًا شَدِيْدًا ﴿١١﴾ وَاِذْ يَقُوْلُ
الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ
اِلَّا غُرُوْرًا ﴿١٢﴾ وَاِذْ قَالَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ يٰٓاَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ
لَكُمْ فَارْجِعُوْا ج وَيَسْتَاْذِنُ فَرِيْقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُوْلُوْنَ اِنَّ بُيُوْتَنَا
عَوْرَةٌ ط وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ ج اِنْ يُّرِيْدُوْنَ اِلَّا فِرَارًا ﴿١٣﴾ وَلَوْ دُخِلَتْ
عَلَيْهِمْ مِّنْ اَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَاٰتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوْا بِهَآ
اِلَّا يَسِيْرًا ﴿١٤﴾ وَلَقَدْ كَانُوْا عَاهَدُوا اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّوْنَ الْاَدْبَارَ ط
وَكَانَ عَهْدُ اللّٰهِ مَسْئُوْلًا ﴿١٥﴾ قُلْ لَّنْ يَّنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ اِنْ فَرَرْتُمْ مِّنَ
الْمَوْتِ اَوِ الْقَتْلِ وَاِذًا لَّا تُمَتَّعُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿١٦﴾ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِيْ
يَعْصِمُكُمْ مِّنَ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَ بِكُمْ سُوْٓءًا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً ط وَلَا
يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ﴿١٧﴾ قَدْ يَعْلَمُ
اللّٰهُ الْمُعَوِّقِيْنَ مِنْكُمْ وَالْقَآئِلِيْنَ لِاِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ اِلَيْنَا ج وَلَا يَاْتُوْنَ
الْبَاْسَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿١٨﴾ لا اَشِحَّةً عَلَيْكُمْ صلے فَاِذَا جَآءَ الْخَوْفُ رَاَيْتَهُمْ
يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ تَدُوْرُ اَعْيُنُهُمْ كَالَّذِيْ يُغْشٰى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ج
فَاِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوْكُمْ بِاَلْسِنَةٍ حِدَادٍ اَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ ط

أُولَٰئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ
يَسِيرًا ﴿١٩﴾ يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا ۖ وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا
لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ ۖ وَلَوْ
كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا ﴿٢٠﴾ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ
أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾
وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَٰذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ
وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ۚ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا ﴿٢٢﴾
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُمْ مَنْ
قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ﴿٢٣﴾ لِيَجْزِيَ
اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ
عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٢٤﴾ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا
بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا ۚ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ
قَوِيًّا عَزِيزًا ﴿٢٥﴾ وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ
صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ
فَرِيقًا ﴿٢٦﴾ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا ۚ
وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿٢٧﴾

(৯) হে মু'মিনগণ! তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র নিয়ামতের কথা স্মরণ কর, যখন শত্রু বাহিনী তোমাদের নিকটবর্তী হয়েছিল, অতপর আমি তাদের বিরুদ্ধে

ঝঞ্ঝাবায়ু এবং এমন সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেছিলাম, যাদেরকে তোমরা দেখতে না। তোমরা যা কর, আল্লাহ্ তা দেখেন। (১০) যখন তারা তোমাদের নিকটবর্তী হয়েছিল উচ্চ ভূমি ও নিম্নভূমি থেকে এবং যখন তোমাদের দৃষ্টিভ্রম হচ্ছিল, প্রাণ কণ্ঠাগত হয়েছিল এবং তোমরা আল্লাহ্ সম্পর্কে নানা বিরূপ ধারণা পোষণ করতে শুরু করছিলে। (১১) সে সময়ে মু'মিনগণ পরীক্ষিত হয়েছিল এবং ভীষণভাবে প্রকম্পিত হচ্ছিল। (১২) এবং যখন মুনাফিক ও যাদের অন্তরে রোগ ছিল তারা বলছিল, আমাদেরকে প্রদত্ত আল্লাহ্ ও রসূলের প্রতিশ্রুতি প্রতারণা বৈ নয়। (১৩) এবং যখন তাদের একদল বলেছিল, হে ইয়াসরিববাসী, এটা টিকবার মত জায়গা নয়, তোমরা ফিরে চল। তাদেরই একদল নবীর কাছে অনুমতি প্রার্থনা করে বলেছিল, আমাদের বাড়ি-ঘর খালি, অথচ সেগুলো খালি ছিল না, পলায়ন করাই ছিল তাদের ইচ্ছা। (১৪) যদি শত্রু পক্ষ চতুর্দিক থেকে নগরে প্রবেশ করে তাদের সাথে মিলিত হত, অতপর বিদ্রোহ করতে প্ররোচিত করত, তবে তারা অবশ্যই বিদ্রোহ করত এবং তারা মোটেই বিলম্ব করত না। (১৫) অথচ তারা পূর্বে আল্লাহ্র সাথে অঙ্গীকার করেছিলে যে, তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না। আল্লাহ্র অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। (১৬) বলুন! তোমরা যদি মৃত্যু অথবা হত্যা থেকে পলায়ন কর, তবে এ পলায়ন তোমাদের কাজে আসবে না। তখন তোমাদেরকে সামান্যই ভোগ করতে দেওয়া হবে। (১৭) বলুন! কে তোমাদেরকে আল্লাহ্ থেকে রক্ষা করবে যদি তিনি তোমাদের অমঙ্গল ইচ্ছা করেন অথবা তোমাদের প্রতি অনুকম্পার ইচ্ছা? তারা আল্লাহ্ ব্যতীত নিজেদের কোন অভিভাবক ও সাহায্যদাতা পাবে না। (১৮) আল্লাহ্ খুব জানেন তোমাদের মধ্যে কারা তোমাদেরকে বাধা দেয় এবং কারা তাদের ভাইদেরকে বলে, আমাদের কাছে এস। তারা কমই যুদ্ধ করে। (১৯) তারা তোমাদের প্রতি কুণ্ঠাবোধ করে। যখন বিপদ আসে, তখন আপনি দেখবেন মৃত্যুভয়ে অচেতন ব্যক্তির মত চোখ উল্টিয়ে তারা আপনার প্রতি তাকায়। অতপর যখন বিপদ টলে যায় তখন তারা ধন-সম্পদ লাভের আশায় তোমাদের সাথে বাকচাতুরীতে অবতীর্ণ হয়। তারা মু'মিন নয়। তাই আল্লাহ্ তাদের কর্মসমূহ নিষ্ফল করে দিয়েছেন। এটা আল্লাহ্র জন্য সহজ। (২০) তারা মনে করে শত্রু বাহিনী চলে যায়নি। যদি শত্রু বাহিনী আবার এসে পড়ে, তবে তারা কামনা করবে যে যদি তারা গ্রামবাসীদের মধ্য থেকে তোমাদের সংবাদাদি জেনে নিত, তবেই ভাল হত। তারা তোমাদের মধ্যে অবস্থান করলেও যুদ্ধ সামান্যই করত। (২১) যারা আল্লাহ্ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে তাদের জন্য রসূলুল্লাহ্র মধ্যে উত্তম নমুনা রয়েছে। (২২) যখন মু'মিনরা শত্রু বাহিনীকে দেখল, তখন বলল, আল্লাহ ও তাঁর রসূল এরই ওয়াদা আমাদেরকে দিয়েছিলেন এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল সত্য বলেছেন। এতে তাদের ঈমান ও আত্মসমর্পণই বৃদ্ধি পেল। (২৩) মু'মিনদের মধ্যে কতক আল্লাহ্র সাথে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেছে। তাদের কেউ কেউ মৃত্যুবরণ করেছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষা করেছে। তারা তাদের সংকল্প মোটেই

পরিবর্তন করেনি। (২৪) এটা এজন্যে যাতে আল্লাহ্ সত্যবাদীদেরকে তাদের সত্য-বাদিতার কারণে প্রতিদান দেন এবং ইচ্ছা করলে মুনাফিকদেরকে শাস্তি দেন অথবা ক্ষমা করেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (২৫) আল্লাহ্ কাফিরদেরকে ক্রুদ্ধাবস্থায় ফিরিয়ে দিলেন। তারা কোন কল্যাণ পায়নি। যুদ্ধ করার জন্য আল্লাহ্ মু'মিনদের জন্য যথেষ্ট হয়ে গেলেন! আল্লাহ্ শক্তিধর, পরাক্রমশালী। (২৬) কিতাবী-দের মধ্যে যারা কাফিরদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিল, তাদেরকে তিনি তাদের দুর্গ থেকে নামিয়ে দিলেন এবং তাদের অন্তরে ভীতি নিক্ষেপ করলেন। ফলে তোমরা একদলকে হত্যা করছ এবং একদলকে বন্দী করছ। (২৭) তিনি তোমাদেরকে তাদের ভূমির, ঘর বাড়ীর, ধন-সম্পদের এবং এমন এক ভূ-খণ্ডের মালিক করে দিয়েছেন, যেখানে তোমরা অভিযান করনি। আল্লাহ্ সর্ববিষয়োপরি সর্বশক্তিমান।

তফসীরের সা-সংক্ষেপ

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের প্রতি মহান আল্লাহ্র অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর, যখন তোমাদের উপর বিভিন্ন সৈন্যদল চড়াও করেছিল---(অর্থাৎ 'উয়ায়না'র সৈন্যদল, আবূ সুফিয়ানের সৈন্যদল ও বনূ কুরাইযার ইহুদী সৈন্যদল) অতপর আমি এক প্রচণ্ড ঝড় প্রেরণ করলাম (যা তাদেরকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে তুললো এবং তাদের ছাউনীগুলোর মূলোৎপান করে দিল।) এবং (ফেরেশতার সমন্বয়ে গঠিত) এমন সেনাবাহিনী প্রেরণ করলাম, যা তোমরা (সাধারণভাবে) দেখতে পাওনি। (তবে কোন কোন সাহাবী যথা---হযরত হুযায়ফা (রা) কিছু সংখ্যক ফেরেশতাকে মানুষের আকৃতিতে দেখতেও পেয়েছিলেন। অবশ্য ফেরেশতাগণ সক্রিয়ভাবে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন নি; বরং কাফিরদের অন্তরে ভীতি সঞ্চারের জন্য তাদেরকে প্রেরণ করা হয়েছিল) এবং আল্লাহ্ পাক তোমাদের (সে সময়ের যাবতীয়) কার্যাবলী দেখতে-ছিলেন। (যে তোমরা অসাধারণ পরিশ্রম করে এক সুদীর্ঘ, প্রশস্ত ও গভীর পরিখা খনন করেছিলে এবং অতুলনীয় দৃঢ়তা প্রদর্শন করে কাফিরদের মুকাবিলায় সম্পূর্ণ অনড় ও অটল ছিলে। আর তোমাদের এ কার্যক্রমে সন্তুষ্ট হয়ে তোমাদের সাহায্য করছিলেন। এসব কিছু তখনই সংঘটিত হয়) যখন যেসব (শত্রু) পক্ষ তোমাদের উপরের দিক নিম্নদিক হতে (অর্থাৎ চতুর্দিক থেকে পরিবেষ্টিত করে) তোমাদের উপর চড়াও করেছিল। (অর্থাৎ কোন সম্প্রদায় মদীনার নিম্নাঞ্চল থেকে এবং কোন সম্প্রদায় মদীনার উর্ধ্বাঞ্চল থেকে অগ্রসর হলো) এবং যখন তোমাদের চোখ (ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে) বিস্ফারিত হয়ে উঠেছিলো এবং হৃদপিণ্ড ওষ্ঠাগত হওয়ার উপক্রম হয়ে-ছিল এবং তোমরা আল্লাহ্ পাক সম্বন্ধে নানাবিধ ধারণা পোষণ করতেছিলে (যেমন দুর্যোগকালে স্বাভাবিকভাবে নানাবিধ ধারণার উদ্রেক হয়। এগুলো সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃত বলে এতে কোন পাপ নেই; এবং তা বিশ্বাসীগণের পরবর্তী এ উক্তিরও পরিপন্থী নয়--- هَٰذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ অর্থাৎ, মহান আল্লাহ্

ও তাঁর রসূল যা সংঘটিত হওয়া সম্পর্কে আমাদের নিকট অঙ্গীকার আগাম উক্তি করেছিলেন এ তো তাই এবং আল্লাহ্‌পাক ও তাঁর রসূল এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ সত্য বলেছিলেন। কেননা هذا শব্দ দ্বারা সম্মিলিত শত্রুবাহিনী কর্তৃক মুসলমানদের উপর চড়াও করার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। যেহেতু এ সংবাদ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে পূর্বেই প্রদত্ত হয়েছিল ; সুতরাং এটা সংঘটিত হওয়া ছিল স্থির নিশ্চিত। কিন্তু এ ঘটনার ফলাফল ও পরিণতি ব্যক্ত করা হয়নি। সুতরাং এতে জয়-পরাজয়ের উভয় সম্ভাবনাই ছিল।) এ স্থলে মু'মিনগণকে (পুরোপুরি) পরীক্ষা করা হয়েছিল (তাতে তাঁরা সম্পূর্ণ কৃতকার্য হয়েছিলেন) এবং তাদেরকে প্রবল প্রকম্পে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। এবং (এ ঘটনা সে সময় সংঘটিত হয়) যখন কপট বিশ্বাসীরা এবং যাদের অন্তকরণ (কপটতা ও দ্বিধা-শঙ্কার) ব্যাধিতে আক্রান্ত এরূপ বলতেছিল যে, আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূল তাদেরকে নিছক প্রতারণামূলক অঙ্গীকারই প্রদান করে রেখেছেন। (যেরূপ-ভাবে মু'আত্তাব বিন কোশায়ের ও তার সঙ্গীরা এরূপ উক্তি তখন করেছিল যখন পরিখা খননকালে কোদালের আঘাতে কয়েকবার অগ্নি স্ফুলিঙ্গ বের হচ্ছিল এবং হুযূর (সা) প্রতিবারই ইরশাদ করছিলেন যে, আলোকরশ্মিতে আমি পারস্য, সিরিয়া ও রোমের রাজপ্রাসাদসমূহ দেখতে পাচ্ছি ; এবং শীঘ্রই তা তোমাদের করতলগত হবে বলে আল্লাহ্‌ পাক ওয়াদা করেছেন। কিন্তু সম্মিলিত শত্রুবাহিনীর সমাবেশের ফলে যখন মুসলমানগণ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়লেন তখন এরা বিদ্রূপের সুরে বলাবলি করতে লাগল যে অবস্থা তো এই অথচ রোম ও সিরিয়া বিজয়ের সুসংবাদ শোনানো হচ্ছে---এ তো নিছক প্রতারণা। মুনাফিকরা একে আল্লাহ্‌র ওয়াদা ও তাঁকে (সা) রসূল বলে বিশ্বাস না করা সত্ত্বেও তাদের এ উক্তি---مَا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُولُهٗ অর্থাৎ আল্লাহ্‌ ও তদীয় রসূল আমাদের সাথে যে ওয়াদা করেছেন---নিছক উপহাস ও বিদ্রূপচ্ছলেই ছিল।) এবং (এ ঘটনা সে সময়ের) যখন সে সব মুনাফিকদের মাঝ থেকে কতিপয় লোক (রণক্ষেত্রে উপস্থিত অন্যান্যদেরকে) বলল---হে মদীনাবাসিগণ! এখানে তোমাদের টিকে থাকার অবকাশ নেই (কেননা এখানে অবস্থান করা নির্ঘাত মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ারই নামান্তর মাত্র। সুতরাং (নিজ নিজ বাড়িতে) ফিরে যাও। (আউছ বিন কাইতী আরো কিছু লোকসহ এরূপ উক্তি করেছিল) এবং সে সব মুনাফিকদের মাঝে কতক লোক নবী করীম (সা)-এর নিকটে (নিজ নিজ বাড়ি) ফিরে যাওয়ার জন্য এই বলে অনুমতি চাইতে লাগলো যে, আমাদের বাড়ি অরক্ষিত (অর্থাৎ কোলের শিশু ও নারীগণ রয়েছে---প্রাচীরগুলোও সে রকম নির্ভরযোগ্য নয়---হয়ত বা চোর ঢুকে পড়বে---এ উক্তি ছিল 'আবু আবারা' এবং অপর কিছু সংখ্যক হারেসাহ্‌ গোত্র-ভুক্তদের) অথচ তারা (তাদের ধারণানুযায়ী) অরক্ষিত নয় (অর্থাৎ তাদের চুরির ও অন্যান্য কোন বিপদাশংকা অবশ্যই ছিল না বা তাদের বাড়ি ফিরে যাওয়ার পেছনে এরূপ উদ্দেশ্যও ছিল না যে, সন্তোষজনকভাবে ওখানকার যাবতীয় প্রয়োজন মিটানোর পর আবার রণক্ষেত্রে চলে আসবে।) এরা কেবল পালাতে চাচ্ছিল। আর (অথচ তাদের অবস্থা এই যে, তাদের নিজ নিজ বাড়িতে থাকাবস্থায়) যদি মদীনার চার দিক

থেকে তাদের মাঝে কেহ (কাফির সৈন্যদল) প্রবেশ করে, অতপর যদি তাদের নিকটে বিশৃংখলা সৃষ্টির (অর্থাৎ মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সমরে উপনীত হওয়ার) আবেদন করা হয় তবে এরা (সঙ্গে সঙ্গে) তা (ফাসাদ সৃষ্টির আবেদন) গ্রহণ করে নেবে ; এবং তাদের বাড়িতে খুব অল্পই অবস্থান করবে (অর্থাৎ কেবল এতটুকু সময়ের জন্য অবস্থান করবে যাতে কেউ আবেদন করতে পারে এবং এরা তা মঞ্জুর করে নিতে পারে ; এবং অনতিবিলম্বে প্রস্তুত হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে মুকাবিলার জন্য গিয়ে উপস্থিত হবে এবং বাড়ির প্রতি কোন লক্ষ্যই করবে না যে, আমরা যদি অপরের বাড়িঘরে লুট-তরাজ করতে যাই তবে কেউ হয়তো আমাদের বাড়িও লুণ্ঠন করে নিতে পারে। তাই যদি এদের ইচ্ছা প্রকৃত প্রস্তাবেই বাড়ির রক্ষণাবেক্ষণ হয়ে থাকে তবে এখন কেন বাড়িতে অবস্থান করে না। সুতরাং একথা স্পষ্ট বোঝা যায় যে, আসলে এদের মুসলমানদের প্রতি রয়েছে শত্রুতা আর কাফিরদের সাথে গোপন সম্প্রীতি। তাই, মুসলমানদেরকে সাহায্য করা এদের মোটেই কাম্য নয়। বাড়ি অরক্ষিত থাকার কথা নিতান্তই ভাওতা মাত্র।) অথচ এরা (ইতি) পূর্বে আল্লাহ্‌র সাথে অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিল যে, (শত্রুর মুকাবিলায়) এরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে না। (এ অঙ্গীকার সে সময় করেছিল যখন কতক লোক বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকায় কিছু সংখ্যক মুনাফিক কৃত্রিম দরদ ও সহানুভূতি প্রদর্শনার্থে বলতে লাগলো যে, আফসোস ! আমরা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারিনি, অন্যথায় এমন করতাম অমন করতাম। কিন্তু যখন সময় আসলো---সব গোমর ফাঁস হয়ে গেল।) আর আল্লাহ্‌র সাথে (এ ধরনের) যে সব অঙ্গীকার করা হয়, সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। আপনি (এদেরকে) বলে দিন যে, (তোমরা যে পালিয়ে ফিরছ---যেমন আল্লাহ্ পাক বলেন : اِنْ يُّرِيْدُوْنَ اِلَّا فِرَارًا ---অর্থাৎ তারা কেবল পালিয়ে থাকতে চায়) তবে তোমাদের এরূপ পালানো কোন উপকারে আসবে না, যদি তোমরা এর মাধ্যমে মৃত্যু বা হত্যা থেকে পালাতে চাও। এর (পালানোর) ফলে সামান্য কয়েকদিন ব্যতীত (নির্ধারিত অবশিষ্ট আয়ুষ্কাল) জীবনে আর অধিক লাভবান হতে পারবে না। (অর্থাৎ পালানোর ফলে আয়ু বৃদ্ধি পাবে না। কেননা এর সময় নির্ধা-রিত। তা যখন নির্ধারিত তখন না পালালেও নির্ধারিত সময়ের আগে মৃত্যুবরণ করতে পারবে না। সুতরাং অবস্থান করলেও কোন ক্ষতি নেই ; আর পালালেও কোন লাভ নেই। সুতরাং পলায়ন করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। বস্তুত এই তকদীরের মাস'আলা বিশ্লেষণ প্রসংগে তাদেরকে) আপনি বলে দিন যে, যদি আল্লাহ্ তোমাদের কোন ক্ষতি সাধন করতে চান তবে তোমাদেরকে তাঁর থেকে কে রক্ষা করতে পারবে (উদাহরণত যদি তোমাদেরকে তিনি ধ্বংস করতে চান তবে তোমাদেরকে কেউ রক্ষা করতে সক্ষম হবে কি ?---যেমন তোমরা পালানোকে লাভজনক হবে বলে মনে কর।) অথবা সে কে যে তোমাদের উপর থেকে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহকে রোধ করতে পারে যদি তিনি তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে চান ? (যথা, যদি

তিনি জীবন্ত রাখতে চান---যা পার্থিব অনুগ্রহের অন্তর্গত, তবে কেউ তাতে প্রতিবন্ধকতা আরোপ করতে পারবে না---যেমন তোমরা যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থানকে তোমাদের জীবন হরণকারী ও আয়ু হ্রাসকারী বলে মনে হয়) এবং (তারা যেন স্মরণ রাখে যে,) আল্লাহ্ ভিন্ন নিজেদের কোন সাহায্যকারী পাবে না (যে তাদের কোন উপকার সাধন করতে পারে) আর কোন সহায়কও পাবে না (যে তাদেরকে ক্ষতি ও দুঃখ-যন্ত্রণা থেকে রক্ষা করতে পারে। তকদীর সম্পর্কিত আলোচনার পর কপট বিশ্বাসীদের হীনতা ও নিন্দাবাদের বর্ণনাধারা পুনরারম্ভ হয়েছে। (অর্থাৎ) আল্লাহ্ পাক তোমাদের মধ্যকার সে সব লোকদের (ভালভাবেই) জানেন যারা (অপর লোকদের যুদ্ধে যোগদানের পথে) অন্তরায় সৃষ্টি করে এবং যারা নিজ (দেশীয় বা বংশোদ্ভূত) ভাইদেরকে বলে যে, আমাদের নিকটে চলে এস (ওখানে নিজেদের প্রাণ দিতে যাচ্ছ কেন? একথা এক ব্যক্তি নিজের সহোদর ভাইকে গোশ্ত-রুটি খেতে খেতে বলছিল। মুসলমান ভাই আক্ষেপ করে বলতে লাগল, তুমি নিশ্চিন্তে বসে আছো অথচ নবীজী এমন দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করছেন। সে বললো---মিয়া, তুমিও এখানে চলে আস) এবং (তাদের ভীরুতা, অর্থলোলুপতা ও কৃপণতার অবস্থা এরূপ যে) তারা যুদ্ধে খুব কমই যোগদান করে। (এ তো তাদের কাপুরুষতার দিক, আবার যদি যোগদান করেও, তবে) তোমাদের প্রতি কৃপণতা সহকারে (অর্থাৎ যোগদানের মুখ্য উদ্দেশ্য এই যে, মুসলমানগণ সমস্ত গনীমতের মাল ভোগ করতে যেন সক্ষম না হয়, নামে মাত্র যুদ্ধে যোগদানের ফলে গনীমতের মালে অন্তত অংশীদারিত্বের দাবি তো করতে পারবে) সুতরাং (যখন তাদের কাপুরুষতা ও কৃপণতা উভয়টাই প্রমাণিত হলো, যার মোটামুটি প্রতিক্রিয়া এই যে,) যখন (কোন) আতঙ্ক ও ভীতিজনক (জায়গা বা) অবস্থার সম্মুখীন হয় তখন আপনি তাদেরকে দেখতে পান যে, তারা আপনার প্রতি এমনভাবে তাকাচ্ছে যেন মৃত্যু বিভীষিকায় আচ্ছন্ন হয়ে তাদের চোখগুলো ঘুরছে (এ তো কাপুরুষতার ফলশ্রুতি) অতপর যখন সে আতঙ্ক দূরীভূত হয় তখন সম্পদের (গনীমত) লোভে তোমাদেরকে তীব্র ভাষায় ভর্ৎসনা করতে থাকে (অর্থাৎ গনীমতের মাল পাওয়ার আশায় হৃদয় বিদীর্ণ করে দেয় এবং এমন কঠোর ভাষায় কথা বলতে থাকে যে, আমাদের অংশ কেন থাকবে না? আমাদের সহযোগিতায়ই তো তোমরা জয়লাভ করতে সক্ষম হয়েছ। এটা হলো কৃপণতা ও লোলুপতার পরিচয় ও লক্ষণ। এ তো হলো তোমাদের সাথে তাদের ব্যাপার। আর আল্লাহ্র সঙ্গে তাদের সম্পর্ক এই যে,) এরা (প্রারম্ভিক অবস্থায়) ঈমান আনেনি বলে আল্লাহ্ পাক তাদের যাবতীয় পুণ্য (প্রথম দিকেই) বিফল করে দিয়েছেন (পরকালে কোন পুণ্যফল লাভ করবে না।) এবং একথা আল্লাহ্র পক্ষে একেবারে সহজসাধ্য (অর্থাৎ এ ব্যাপারে কেউ আল্লাহ্র বিরোধিতা করে একথা বলতে পারে না যে, আমরা এসব কৃত পুণ্যকর্মের প্রতিদান দেব। সম্মিলিত শত্রু বাহিনীর সমাবেশকালেই তাদের অবস্থা ছিল এই। কিন্তু তাদের কাপুরুষতা এমন পর্যায়ে ছিল যে, সম্মিলিত শত্রু বাহিনী চলে যাওয়ার পরও) তাদের এরূপ ধারণা ছিল যে, (এখন পর্যন্ত) এসব সৈন্য ফিরে যায়নি। (এবং তাদের চরম কাপুরুষতার দরুন তাদের অবস্থা এই যে,) যদি (ধরে নেওয়া হয় যে,)

এই (প্রত্যাগমনকারী) সৈন্যদল (পুনরায় ফিরে) আসে (তবে) এরা (নিজেদের তরে) এ কামনাই করবে যে, কতইনা ভাল হতো যদি না আমরা শহরের বাইরে পল্লীগ্রামে (কোথাও) গিয়ে থাকতাম (এবং সেখানে বসে বসেই পথচারীদের নিকটে) তোমাদের খবরাখবর জিজ্ঞেস করতে থাকতাম (এবং এ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ না দেখতে পেতাম)। আর যদি (ঘটনা চক্রে এদের সকলে বা কিছু সংখ্যক পল্লীতে যেতে সক্ষম নাও হয়) বরং তোমাদের মাঝেই থেকে যায়, তবুও (তিরস্কার-ভর্ৎসনা শোনেও তাদের লজ্জার উদ্রেক করবে না তবে নাম মাত্র) লড়াইতে যোগদান করতো। (পরবর্তী পর্যায়ে যুদ্ধক্ষেত্রে অনড় ও দৃঢ়পদ থাকাকে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র অনুসরণ এবং ঈমানের স্বাভাবিক চাহিদা বলে উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে মুনাফিকরা এই বলে লজ্জা-বোধ করে যে, তারা ঈমানের দাবীদার হওয়া সত্ত্বেও এর স্বাভাবিক চাহিদা অনুশীল-নের ক্ষেত্রে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছে এবং অকপট ও অকৃত্রিম বিশ্বাসীগণকে এ সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে যে, এরা নিঃসন্দেহে كَانَ يَرْجُوا اللهَ .. الخ---এর শ্রেণীভুক্ত।

তাই ইরশাদ হয়েছে যে,) তোমাদের জন্য (অর্থাৎ এমন সব লোকের জন্য) যারা আল্লাহ্ ও পরকাল সম্পর্কে ভয় পোষণ করে এবং অধিক পরিমাণে আল্লাহ্র যিকির করে (অর্থাৎ পূর্ণ মু'মিন তাদের তরে) রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মাঝে এক উত্তম আদর্শ বিদ্যমান (আর যখন স্বয়ং তিনি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছেন, তখন তার চাইতে অধিক প্রিয় এমন কে আছে যে, তাঁর (নবীজীর) অনুসরণ না করে দূরে অবস্থান করে নিজ প্রাণ বাঁচিয়ে ফিরবে) এবং (পরবর্তী পর্যায়ে মুনাফিকদের মুকাবিলায় খাঁটি মু'মিনগণের আলোচনা হচ্ছে) যখন মু'মিনগণ সৈন্যদল-সমূহকে দেখতে পেল তখন বলতে লাগলো যে, এটা তো সে (স্থান) যে সম্পর্কে আল্লাহ্ ও তদীয় রসূল (সা) (পূর্বেই) অবহিত করেছিলেন। (যেমন সূরা বাকারার এ আয়াতে এর প্রতি সুস্পষ্ট ইঙ্গিতে রয়েছে... ... أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ

وَزُلْزِلُوا - الخ----কেননা সূরা-বাকারা, সূরা আহযাবের পূর্বে নাযিল হয়েছে---

"ইতকানে" অনুরূপ উল্লেখ রয়েছে।) এবং আল্লাহ্ পাক ও তাঁর রসূল (সা) সত্য বলেছেন এবং এ দ্বারা (সম্মিলিত সৈন্যদল দেখে----যে ভবিষ্যদ্বাণী ছিল তা সম্পূর্ণ সত্য বিধায়) তাদের ঈমান ও আনুগত্যের আরো উন্নতি ঘটলো (এটা তো সমস্ত মু'মিনকুলের সাধারণ গুণ, আবার কিছু সংখ্যক মু'মিনের কতকগুলো বিশিষ্ট গুণাবলীও রয়েছে। সেগুলো এই যে,) এসব মু'মিনগণের মাঝে কিছু সংখ্যক এমনও রয়েছে, যারা আল্লাহ্র সাথে যেসব কথার অঙ্গীকার করেছে তা সত্যে পরিণত করেছে (এরূপ শ্রেণীবিভাগের অর্থ এটা নয় যে, কতক মুসলমান অঙ্গীকার করে তা সত্যে পরিণত করেনি। বরং এ শ্রেণীবিভাগ এই ভিত্তিতে করা হয়েছে যে. কতক মু'মিন অঙ্গীকার না

করেও অনড় ও দৃঢ়পদ রয়েছে। আয়াতে وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللّٰهَ-الخ --উল্লিখিত কপট-বিশ্বাসীদের মুকাবিলায় এ আয়াতে এসব অঙ্গীকারকারীগণের বর্ণনা সুস্পষ্টভাবে প্রদান করা হয়েছে এবং এসব অঙ্গীকারকারীগণের দ্বারা হযরত আনাস বিন নাযার ও তাঁর সঙ্গীগণকে বোঝানো হয়েছে। এসব মহৎ ব্যক্তিবর্গ ঘটনাক্রমে বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে সক্ষম না হওয়ায় অনুতপ্ত হয়ে অঙ্গীকার করেন যে, অদূর ভবিষ্যতে যদি আবার কোন জিহাদ সংঘটিত হয় তবে প্রাণপণ পরিশ্রম ও অসাধারণ ত্যাগের দৃশ্য পরিলক্ষিত হবে অর্থাৎ মৃত্যুবরণ করবে কিন্তু পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না) আবার (এসব অঙ্গীকারকারীগণ দু'শ্রেণীতে বিভক্ত) এদের মধ্যে কতক তো নিজেদের মানত পূরণ করেছেন (অর্থাৎ মানততুল্য অবশ্যপালনীয় অঙ্গীকার পূরণ করেছেন---শাহাদত বরণ করেছেন এবং শেষ মুহূর্ত পর্যন্তও পশ্চাদপসরণ করেন নি। তাই আনাস বিন নাযার (রা) ও হযরত মাস'আব (রা) যুদ্ধ করে করে শহীদ হয়ে যান।) আবার এদের মাঝে কতক (এ অঙ্গীকার পালনের সর্বশেষ লক্ষণ---অর্থাৎ শাহাদত বরণের) অভিলাষী (এখনও শাহাদত বরণ করেন নি) এবং (এখনো) এরা (এ ক্ষেত্রে) বিন্দুমাত্র পরিবর্তন ঘটায়নি (অর্থাৎ নিজ সংকল্পে অটল ও অনড়। সুতরাং সমগ্র জাতি দু'শ্রেণীতে বিভক্ত (১) মুনাফিক, কপট বিশ্বাসী যাদের বর্ণনা পূর্বেই প্রদত্ত হয়েছে (২) মু'মিনগণ, আবার মু'মিনগণ দু'শ্রেণীতে বিভক্ত---অঙ্গীকারাবদ্ধ ও অঙ্গীকারবিহীন। দৃঢ়তা গুণ উভয় শ্রেণীতে বিদ্যমান যেরূপ কোরআনের আয়াত لَمَّا رَاَى الْمُؤْمِنُوْنَ-الخ দ্বারা একথা প্রমাণিত হয়। অঙ্গীকারাবদ্ধগণ পুনরায় দু'ভাগে বিভক্ত, শাহাদত প্রাপ্ত---শাহাদতের তরে প্রতীক্ষারত। এ আয়াতসমূহ সর্বমোট চার শ্রেণীর বর্ণনা রয়েছে। পরবর্তী পর্যায়ে এ যুদ্ধের এক নিগূঢ় তত্ত্ব বর্ণনার উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে যে,) এ ঘটনা এ কারণে সংঘটিত হয়েছিল, যেন আল্লাহ্ পাক খাঁটি বিশ্বাসীগণকে তাঁদের সত্যবাদিতার যথাযথ প্রতিদান প্রদান করেন এবং কপটবিশ্বাসীদেরকে চাই শাস্তি প্রদান করেন বা তাদেরকে (কপটতা থেকে) তওবা করার তওফীক প্রদান করেন। (কেননা এরূপ কঠিন সংকট ও দুর্যোগের মাঝে অকপট ও কপট উভয়ই একে অপর থেকে পৃথক হয়ে উঠে। আবার কখনো কখনো শাসনের দরুন কতক কৃত্রিম---কপট বিশ্বাসীও অকৃত্রিম নিষ্ঠাবানরূপে পরিণত হয়। আর কতক সে অবস্থাতে থেকে যায়।) নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ পাক পরম ক্ষমাশীল ও মহান দয়াল। (তাই তওবা গৃহীত হওয়া অসম্ভব কিছু নয়। এখানে তওবার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে।) এবং (এ পর্যন্ত বিভিন্ন শ্রেণীর মুসলমানগণের অবস্থাসমূহের বর্ণনা ছিল। সামনে বিরুদ্ধবাদী কাফিরদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে,) আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদেরকে (অর্থাৎ মুশরিকদেরকে) ক্রোধপূর্ণ অবস্থায় (মদীনা থেকে) হটিয়ে দিয়েছেন। যেন তাদের কোন উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়নি (এবং তারা ক্রোধে পরিপূর্ণ ছিল)। এবং সমর ক্ষেত্রে

মুসলমানগণের জন্য স্বয়ং আল্লাহ্ পাকই যথেষ্ট ছিলেন (অর্থাৎ কাফিররা মূল যুদ্ধে উপনীত হওয়ার পূর্বেই প্রতিনিবৃত্ত হয়ে যায়। প্রণিধানযোগ্য যে, ছোট-খাটো বিক্ষিপ্ত যুদ্ধ এর পরিপন্থী নয়।) আর (এরূপভাবে কাফিরদেরকে হটিয়ে দেওয়া বিস্ময়কর কিছু নয়। কেননা) আল্লাহ্ পাক---মহাশক্তিধর ও পরাক্রমশালী। (তাঁর অসাধ্য কিছুই নয়। এ তো গেল মুশরিকদের অবস্থা। বিরোধী পক্ষের অপর দল ছিল কোরায়যা গোত্রভুক্ত ইহুদীগণ, যাদের বর্ণনা পরবর্তী পর্যায়ে আসছে।) যেসব আহ্লে কিতাব এই (মুশরিকদের) সহায়তা করেছিল তাদেরকে (আল্লাহ্ তা'আলা) তাদের দুর্গসমূহ হতে নিচে নামিয়ে দিলেন (যার মধ্যে তারা আবদ্ধ ছিল) এবং তাদের অন্তরে তোমাদের ভয় সঞ্চার করে দেন, (যদ্দরুন তারা নিচে নেমে আসে। অতঃপর) তোমরা কতককে তো হত্যা করতে লাগলে, আবার কতককে বন্দী করে নিলে। আর তোমাদেরকে তাদের ভূমি, ঘরবাড়ী ও ধনসম্পদের অধিকারী করে দেওয়া হলো (এবং নিজের অনন্ত জ্ঞানে তোমাদেরকে) এমন সব ভূমিরও (মালিক করে দেওয়া হলো) যার উপর তোমরা (এখনো পর্যন্ত) পদার্পণও করনি (এখানে সাধারণভাবে ভবিষ্যত বিজয়সমূহের এবং বিশেষভাবে স্বল্পকাল পরই অর্জিতব্য খায়বার বিজয়ের সুসংবাদ রয়েছে) আর আল্লাহ্ পাক যাবতীয় বস্তুর উপর পূর্ণভাবে ক্ষমতাবান (সুতরাং এসব কাজ তাঁর পক্ষে মোটেও অসাধ্য নয়)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র অনন্য ও মহান মর্যাদার বর্ণনা এবং মুসলমানদের প্রতি তাঁর পরিপূর্ণ অনুকরণ ও পদাংক অনুসরণের নির্দেশ ছিল। এ পরিপ্রেক্ষিতে আহ্যাবের (সম্মিলিত বাহিনী) যুদ্ধের ঘটনা সম্পর্কিত কোরআন পাকের এ দু'রুকূ অবতীর্ণ হয়েছে।---যাতে মুসলমানদের উপর কাফির ও মুশরিকদের সম্মিলিত আক্রমণ ও কঠিন পরিবেষ্টনের পর মুসলমানদের প্রতি মহান আল্লাহ্র নানাবিধ অনুগ্রহ-রাজি এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বিভিন্ন মু'জিযার বর্ণনা রয়েছে। আর আনুষঙ্গিকভাবে জীবনের বিভিন্ন দিক সংশ্লিষ্ট বহুবিধ হিদায়ত ও নির্দেশাবলী রয়েছে। এসব অমূল্য নির্দেশাবলীর দরুন বিশিষ্ট তফসীরকারকগণ আহ্যাবের ঘটনা সবিস্তার বর্ণনা করেছেন; বিশেষ করে কুরতুবী ও মাযহারী প্রমুখ তফসীরকার। তাই এখানে সে সব নির্দেশা-বলী সমেত আহযাবের বিস্তারিত ঘটনা বর্ণনা করা হলো---যার অধিকাংশটুকু কুরতুবী ও মাযহারী থেকে সংগৃহীত হয়েছে। যেটুকু অন্যান্য গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত হয়েছে তারও যথাযথ উদ্ধৃতি প্রদত্ত হয়েছে।

আহযাবের যুদ্ধের বিবরণ : احزاب—حزب-এর বহুবচন, যার অর্থ পার্টি বা দল। এ যুদ্ধে কাফিরদের বিভিন্ন দল ও গোত্র একতাবদ্ধ হয়ে মুসলমানদেরকে সম্পূর্ণ-ভাবে নির্মূল করার সংকল্প নিয়ে মদীনার উপর চড়াও করেছিল বলে এর নাম আহ-যাবের (সম্মিলিত বাহিনীর) যুদ্ধ রাখা হয়েছে। যেহেতু এ যুদ্ধে শত্রুদের আগমন পথে নবীজী (সা)-র নির্দেশানুযায়ী পরিখা খনন করা হয়েছিল, এজন্য একে খন্দক (পরিখার)

যুদ্ধও বলা হয়। আর আহযাব যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই যেহেতু বনূ কুরায়যার যুদ্ধও সংঘটিত হয়---উল্লিখিত আয়াতসমূহেও যার বর্ণনা রয়েছে; সুতরাং এ যুদ্ধও 'আহযাব' যুদ্ধেরই অংশ বিশেষ---যা বিস্তারিত ঘটনার মাধ্যমে জানা যাবে।

রসূলুল্লাহ্ (সা) যে বছর মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় আসেন, তার পরের বছরই বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং তৃতীয় বছর হয় ওহুদের যুদ্ধ। আহযাবের যুদ্ধ সংঘটিত হয় চতুর্থ বছর। আবার কোন কোন রেওয়ায়েতে এটা পঞ্চম হিজরীর ঘটনা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যা হোক, হিজরতের সূচনা থেকে এ যাবত মুসলমানদের উপর পর্যায়ক্রমে কাফিরদের আক্রমণ চলে আসছিল। আহযাবের যুদ্ধের আক্রমণ হয়েছিল দৃঢ় সংকল্প, অটুট মনোবল, অভূতপূর্ব শক্তি-পরাক্রম ও পরিপূর্ণ প্রস্তুতি সহকারে। তাই হযরত (সা) ও সাহাবায়ে কিরামের পক্ষে এ যুদ্ধ ছিল অপরাপর সকল যুদ্ধের চাইতে সর্বাধিক কঠিন ও সংকট সঙ্কুল। কেননা এ যুদ্ধে আক্রমণকারী কাফিরদের সম্মিলিত বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা পনের হাজারের মত ছিল বলে বলা হয়। পক্ষান্তরে মুসলমানদের মোট সংখ্যা মাত্র তিন হাজার---তাও আবার প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম ও অস্ত্রশস্ত্রহীন---তদুপরি সময়টা ছিল কঠিন শীতের। কোরআনে করীম ঘটনার ভয়াবহতা এরূপভাবে বর্ণনা করেছে ঃ زَاغَتِ الْاَبْصَارُ— (চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠেছিল) وَبَلَغَتِ الْقُلُوْبُ الْحَنَاجِرَ— (হৃৎপিণ্ড--অর্থাৎ প্রাণ ছিল কণ্ঠাগত) وَزُلْزِلُوْا زِلْزَالًا شَدِيْدًا (এবং তারা কঠিন কম্পনে নিপতিত হয়)।

এ ঘটনা মুসলমানদের জন্য যেমন কঠিন ও সঙ্কটময় ছিল, ঠিক তেমনই আল্লাহ্ পাকের অদৃশ্য সাহায্য-সহযোগিতার বদৌলতে মুসলমানগণের পক্ষে এর পরিণাম ফল এমন মহান বিজয় ও চরম সাফল্যরূপে আত্মপ্রকাশ করে যে, বিপক্ষ মুশরিক ইহুদী ও কপট বিশ্বাসী মুনাফিকদের সম্মিলিত বাহিনীর মেরুদণ্ড ভেংগে চুরমার হয়ে যায়---এবং মুসলমানদের উপর ভবিষ্যতে আবার আক্রমণের দুঃসাহস দেখাতে পারে---তারা এমন যোগ্য আর রইল না। তাই এটা ছিল কুফর ও ইসলামের মধ্যকার একটা চূড়ান্ত ফয়সালার যুদ্ধ---যা চতুর্থ বা পঞ্চম হিজরীতে মদীনার মূল ভূ-খণ্ডে সংঘটিত হয়েছিল।

ঘটনার সূচনা এরূপভাবে হয় যে, নবীজী (সা) ও মুসলমানগণের প্রতি চরম শত্রুতা পোষণকারী বনূ নাযীর ও আবূ-ওয়ায়েল গোত্রভুক্ত বিশজন ইহুদী মক্কায় গিয়ে কুরায়শ নেতৃবৃন্দকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে অনুপ্রাণিত করলো। কুরায়শ নেতৃবৃন্দ মনে করত যে, যেরূপভাবে মুসলমানগণ আমাদের প্রতিমা পূজাকে

কুফরী বলে আখ্যায়িত করে, আমাদের ধর্মকে অপকৃষ্ট বলে ধারণা করে, আমাদের ধর্ম সম্পর্কে ইহুদীদের ধারণাও ঠিক একই রকম।---সুতরাং তাদের সহযোগিতা ও একাত্মতার আশা কিভাবে করা যেতে পারে। তাই তারা ইহুদীদেরকে প্রশ্ন করলো যে, মুহাম্মদ (সা) ও আমাদের মাঝে ধর্ম ব্যাপারে যে বিরোধ ও মতপার্থক্য রয়েছে তা আপনারা জানেন---আপনারা ঐশী গ্রন্থানুসারী প্রজ্ঞাবান লোক। সুতরাং একথা বলুন যে, আপনাদের দৃষ্টিতে আমাদের ধর্ম উত্তম না তাদের (মুসলমানের) ধর্ম।

রাজনীতিক্ষেত্রে মিথ্যার আশ্রয় নতুন ব্যাপার নয়ঃ সেসব ইহুদীরা নিজেদের অন্তরস্থ জ্ঞান ও বিশ্বাসের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে তাদেরকে নিঃসংকোচে এ উত্তর দিয়ে দিল যে, তোমাদের ধর্ম মুহাম্মদ (সা)-এর ধর্মের চাইতে উত্তম। এ উত্তরে তারা খানিকটা সান্ত্বনা লাভ করলো। এতদসত্ত্বেও ব্যাপার এ পর্যন্ত গড়াল যে, আগত এই বিশজন ইহুদী পঞ্চাশজন কুরায়শ নেতাসহ মসজিদে হারামে প্রবেশ করে বায়তুল্লাহ্‌র দেয়ালে নিজেদের বুক লাগিয়ে আল্লাহ্‌র সামনে এ অঙ্গীকার করলো যে, এক ব্যক্তিও জীবিত থাকা পর্যন্ত তারা মুহাম্মদ (সা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাবে।

আল্লাহ্‌র ধৈর্য ঃ আল্লাহ্‌র ঘরে---সে ঘরেরই দেয়ালে বুক লাগিয়ে আল্লাহ্‌র শত্রুরা তদীয় রসূল (সা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের অঙ্গীকার ও সংকল্প গ্রহণ করছে---এবং যুদ্ধের নতুন প্রেরণা নিয়ে পূর্ণ তৃপ্তিসহ নিশ্চিন্তে ফিরে আসছে। এটা ছিল আল্লাহ্‌র ধৈর্য ও অনুগ্রহের বিস্ময়কর প্রকাশ। কাহিনীর শেষভাগে তাদের এ অঙ্গীকারের করুণ পরিণতি সম্পর্কেও অবহিত হওয়া যাবে যে, এ যুদ্ধে তারা সবাই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পালিয়ে যায়।

এই ইহুদীরা মক্কার কুরায়শদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে আরবের এক খ্যাতনামা সমরকুশলী গোত্র বনূ গাতফানের নিকটে পৌঁছে তাদেরকে বলল যে, আমরা মক্কার কুরায়শদের সাথে এ ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ হয়েছি যে, নতুন ধর্ম ইসলামের বাহক ও সম্প্রসারকদেরকে এক যৌথ আক্রমণের মাধ্যমে সমূলে উৎপাটিত করে দেব। আপনারাও এ বিষয়ে আমাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হোন। সাথে সাথে ঘুষ হিসাবে এ প্রস্তাবও পেশ করল যে, এক বছরে খায়বারে যে পরিমাণে খেজুর উৎপন্ন হবে তার সম্পূর্ণটুকু, কোন কোন বর্ণনামতে তার অর্ধেক, বনূ গাতফানকে প্রদান করা হবে। গাতফান গোত্র প্রধান উয়াইনা বিন হাসান উপরোক্ত শর্তে তাদের সাথে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে যথারীতি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে।

পারস্পরিক চুক্তিপত্র মুতাবিক আবূ সুফিয়ানের নেতৃত্বে যুদ্ধের সাজ সরঞ্জামসহ তিন'শ ঘোড়া ও এক হাজার উট সমেত চার হাজার কুরায়শ সৈন্য মক্কা থেকে রওয়ানা হয়ে মাররে যাহরান নামক স্থানে অবস্থান গ্রহণ করে। এখানে বনূ আসলাম, বনূ আশজা, বনূ মুররাহ, বনূ কেনানাহ, বনূ ফাযারাহ, বনূ গাতফান প্রমুখ গোত্রের লোক এদের সাথে মিলিত হয়। যাদের মোট সংখ্যা কোন সূত্রানুযায়ী দশ হাজার, কোন সূত্রানুযায়ী বার হাজার, আবার কোন সূত্রানুযায়ী পনের হাজার বর্ণনা করা হয়েছে।

মদীনার উপর বৃহত্তর আক্রমণ ঃ বদরের যুদ্ধে মুসলমানগণের বিপক্ষীয় কাফির সৈন্যের সংখ্যা ছিল এক হাজার। আবার ওহুদের যুদ্ধে আক্রমণকারী সৈন্য ছিল তিন হাজার। এবার সৈন্য সংখ্যাও পূর্ববর্তী প্রত্যেক বারের চাইতে অনেক বেশি। সাজ-সরঞ্জামও প্রচুর—আর এটা সমগ্র আরব ও ইহুদী গোত্রের সম্মিলিত শক্তি।

মুসলমানগণের যুদ্ধ প্রস্তুতি—(১) আল্লাহ্র উপর নির্ভরশীলতা (২) পারস্পরিক পরামর্শ—(৩) সাধ্যানুসারে বাহ্যিক বস্তুগত বাহন ও উপকরণ সংগ্রহ ঃ রসূলুল্লাহ্ (সা) এ সম্মিলিত বাহিনীর সংবাদ প্রাপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর মুখনিঃসৃত সর্ব প্রথম বাক্যটি ছিল—حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ মহান আল্লাহ্ আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই আমাদের সর্বোত্তম নিয়ামক।) অতপর মুহাজির ও আনসারদের নেতৃ-স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে একত্র করে তাঁদের পরামর্শ গ্রহণ করলেন। যদিও প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য অপরের সাথে পরামর্শের প্রয়োজন নেই—তিনি সরাসরি বিধাতার ইংগিত ও অনুমতিসাপেক্ষে কাজ করেন; কিন্তু পরামর্শে দু'ধরনের লাভ রয়েছে; (১) উম্মতের মাঝে পরামর্শের রীতি চালু করা, (২) মু'মিনগণের অন্তকরণে. পারস্পরিক ঐক্য ও সংহতির উন্মেষ সাধন এবং পরস্পরের মধ্যে সাহায্য-সহযোগিতার প্রেরণা পুনর্জাগরণ।উপরন্তু যুদ্ধ ও দেশরক্ষা সংক্রান্ত বাহ্যিক উপকরণ সম্পর্কেও চিন্তা-ভাবনা করা হয়েছে। পরামর্শ সভায় হযরত সালমান ফারসী (রা)-ও উপস্থিত ছিলেন। —যিনি সদ্য জনৈক ইহুদীর দাসত্ব শৃংখল থেকে মুক্তি লাভ করে ইসলামের খিদমতের জন্য প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। তিনি পরামর্শ দিলেন যে, এরূপ পরিস্থিতিতে পারসিকদের রণকৌশল হচ্ছে শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে পরিখা খনন করে তাদের প্রবেশ পথ রুদ্ধ করে দেওয়া। রসূলুল্লাহ (সা) তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করে পরিখা খননের নির্দেশ প্রদান করেন। তিনি নিজেও সক্রিয়ভাবে এ কাজে অংশ গ্রহণ করেন।

পরিখা খনন ঃ শত্রুদের মদীনার সম্ভাব্য প্রবেশদ্বার 'সালা' পর্বতের পশ্চাৎবর্তী পথের সমান্তরালে এ পরিখা খননের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পরিখার দৈর্ঘ্য-প্রস্থের নক্সা নবীজী স্বয়ং অংকন করেন। এই পরিখা 'শায়খাইন' নামক স্থান হতে আরম্ভ করে 'সালা' পর্বতের পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত সম্প্রসারিত ছিল। পরবর্তী পর্যায়ে তা 'বাতহান' উপত্যকা ও 'রাতুনা' উপত্যকার সংযোগস্থল পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়। এই পরিখার দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় সাড়ে তিন মাইল। এর প্রশস্ততা ও গভীরতার সঠিক পরিমাণ কোন রেওয়ায়েত থেকে পাওয়া যায় না। তবে একথা পরিষ্কার যে, এতটুকু গভীর ও প্রশস্ত অবশ্যই ছিল, যাতে শত্রুসৈন্য তা সহজে অতিক্রম করতে সক্ষম না হয়। হযরত সাল্মান (রা)-এর পরিখা খনন প্রসংগে বলা হয় যে, তিনি প্রত্যহ পাঁচ গজ দীর্ঘ ও পাঁচ গজ গভীর—এ পরিমাণ পরিখা খনন করতেন।—(মাযহারী) এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, পরিখার গভীরতা পাঁচগজ পরিমাণ ছিল।

মুসলমানদের সৈন্যসংখ্যা ঃ এ যুদ্ধে মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যা ছিল সর্বমোট তিন হাজার এবং ঘোড়া ছিল সর্বমোট ৩৬ টি।

পূর্ণ বয়স্কতা লাভের জন্য পনর বছর নির্দিষ্ট হয়ঃ মুসলিম সৈন্যবাহিনীর মধ্যে কিছুসংখ্যক অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকও ঈমানী জোশে উদ্বুদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। রসূলুল্লাহ্ (সা) পনর বছরের চাইতে কম বয়স্ক বালকগণকে ফেরত পাঠিয়ে দেন। হযরত আবদুল্লাহ্ বিন উমর, যায়েদ বিন সাবেত, আবূ সাঈদ খুদরী, 'বারা বিন আযিব প্রমুখ এঁদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মুসলিম বাহিনী যখন মুকাবিলার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়, তখন যে সব মুনাফিক মুসলমানদের সাথে মিলেমিশে থাকতো, তারা গড়িমসি করতে লাগলো। কিছুসংখ্যক তো অজ্ঞাতসারে চুপে চুপে বের হয়ে গেল। আবার কিছু সংখ্যক মিথ্যা ওযর পেশ করে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নিকটে বাড়ি ফিরে যাওয়ার অনুমতি চাইতে লাগলো। উপরোল্লিখিত আয়াতসমূহে এ সব মুনাফিকের প্রসংগে কয়েকটি আয়াত নাযিল হয়েছে।---(কুরতুবী)

সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও শৃংখলা বিধানের উদ্দেশ্যে বংশ ও গোত্রগত শ্রেণীবিভাগ ইসলামী ঐক্য ও জাতিত্বের পরিপন্থী নয়ঃ রসূলুল্লাহ্ (সা) এই যুদ্ধে মুহাজিরদের পতাকা হযরত যায়েদ বিন হারিসা (রা)-কে এবং আনসারের পতাকা হযরত সা'আদ বিন ওবাদাহ্ (রা)-কে প্রদান করেন। এ সময়---মুহাজির ও আনসারের মধ্যকার ভ্রাতৃত্ব বন্ধন অত্যন্ত নিবিড় ও সুদৃঢ় ছিল এবং সকলে পরস্পর ভাই-ভাই ছিলেন। কিন্তু শৃংখলা বিধান ও ব্যবস্থাগত সুবিধার জন্য মুহাজির ও আনসারদের নেতৃত্ব পৃথক করে দেওয়া হয়। এ দ্বারা বোঝা যায় যে, ব্যবস্থাপনাগত সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস ইসলামী ঐক্য ও জাতিত্বের পরিপন্থী নয়; বরং প্রত্যেক দলের উপর দায়িত্বভার পৃথকভাবে অর্পিত হলে পারস্পরিক বিশ্বাস, সহানুভূতি ও সহযোগিতাবোধ সুদৃঢ় হয়। এ যুদ্ধের সর্বপ্রথম কাজ---পরিখা খননের ক্ষেত্রে এই পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতাবোধ বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়।

পরিখা খননের দায়িত্বভার বন্টনঃ রসূলুল্লাহ্ (সা) মুহাজির ও আনসার সমন্বয়ে গঠিত সমগ্র সৈন্যকে দশ দশ ব্যক্তি সম্বলিত দলে বিভক্ত করে প্রত্যেক দলের উপর চল্লিশ গজ পরিমাণ পরিখা খননের দায়িত্ব অর্পণ করেন। হযরত সালমান ফারসী (রা) যেহেতু পরিখা খনন পরিকল্পনার উদ্ভাবক ও এ কাজে বিশেষ অভিজ্ঞ ও দক্ষ ছিলেন এবং তিনি মুহাজির ও আনসার কারো অন্তর্গত ছিলেন না, তাই তাঁকে নিজ নিজ দলভুক্ত করার জন্য মুহাজির ও আনসারদের মাঝে কিছুটা প্রতিযোগিতার ভাব পরিলক্ষিত হওয়ায় নবীজী (সা) এই মীমাংসা করলেনঃ سلمان منا اهل البيت অর্থাৎ সালমান আমার পরিবারভুক্ত।

যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতার ক্ষেত্রে স্বদেশী ও বিদেশী, স্থানীয় ও বহিরাগত বৈষম্যঃ অধুনা বিশ্বে মানুষ পরদেশী বহিরাগত অধিবাসীগণকে সমমর্যাদা দিতে অনিচ্ছুক। কিন্তু এ ক্ষেত্রে প্রত্যেক দল যোগ্য ব্যক্তিকে নিজ নিজ দলভুক্ত করা গৌরবজনক বলে মনে করতো। তাই রসূলুল্লাহ্ (সা) সালমানকে নিজ পরিবারভুক্ত করে বিবাদের পরিসমাপ্তি ঘটান এবং কিছু সংখ্যক মুহাজির ও আনসার অন্তর্ভুক্ত করে দশজনের

পৃথক দল গঠন করেন। হযরত আমর বিন আউফ (রা), হযরত হুযায়ফা (রা) প্রমুখ মুহাজির এ সম্মিলিত দলের অন্তর্গত ছিলেন।

একটি বিশেষ মু'জিযা ঃ পরিখার যে অংশ হযরত সালমান (রা) প্রমুখের উপর ন্যস্ত ছিল, ঘটনাক্রমে সেখানে এক সুকঠিন, মসৃণ ও সুবিস্তৃত প্রস্তরখণ্ড পরিলক্ষিত হয়। হযরত সালমান (রা)-এর সহকারী হযরত আমর বিন আউফ (রা) বলেন যে, এ প্রস্তরখণ্ড আমাদের যাবতীয় যন্ত্রপাতি বিকল করে দেয় এবং আমরা এটা কাটতে অক্ষম হয়ে পড়ি। অতপর আমি সালমান (রা)-কে বলি যে, এখানে খানিকটা বাঁকা করে খনন করে মূল পরিখার সাথে মিলিয়ে দেওয়া অবশ্য সম্ভব। কিন্তু আমাদের নিজস্ব মতে রসূলুল্লাহ্ (সা) অংকিত রেখা পরিত্যাগ করে অন্যত্র পরিখা খনন করা বাঞ্ছনীয় নয়। সুতরাং আপনি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাথে পরামর্শ করুন যে, এখন আমাদের কর্তব্য কি হবে।

বিধাতার সতর্ক সংকেত ঃ এই সুদীর্ঘ তিন মাইল পরিখা খনন করতে গিয়ে কোন খননকারীই কোন দুর্জয় প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হন নি, কিন্তু সম্মুখীন হলেন পরিখার পরামর্শদাতা হযরত সালমান (রা) স্বয়ং। আল্লাহ্ পাক এ কথা প্রমাণ করে দিলেন যে, পরিখা খননের ক্ষেত্রেও তাঁর সাহায্য ব্যতীত অন্য কোন উপায় নেই, যাবতীয় যন্ত্রপাতি ব্যর্থ প্রতিপন্ন হয়েছে। এতে এ শিক্ষাই নিহিত রয়েছে যে, সাধ্যানুসারে বাহ্যিক ও বস্তুগত মাধ্যম ও উপকরণ সংগ্রহ করা অবশ্য ফরয---কিন্তু এগুলোর উপর নির্ভর করা বৈধ নয়। যাবতীয় বস্তুগত উপকরণ ও বাহন সংগৃহীত হওয়ার পরও মু'মিনের কেবল আল্লাহ্ তা'আলার উপরই নির্ভর করা উচিত।

হযরত সালমান (রা) রসূলুল্লাহ্ (সা)-র খিদমতে উপস্থিত হয়ে ঘটনা বিবৃত করলেন। রসূলুল্লাহ্ (সা) স্বয়ং নিজ অংশের খননকার্যে লিপ্ত থেকে সেখান থেকে পরিখার মাটি স্থানান্তরিত করছিলেন। হযরত বারা বিন আযিব (রা) বলেন, আমি দেখলাম যে, নবীজী (সা)-র শরীর ধূলো-বালিতে এমনভাবে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল যে, তাঁর পেট ও পিঠের চামড়া পরিদৃষ্ট হচ্ছিল না, এমতাবস্থায় সালমানকে কোন পরামর্শ বা নির্দেশনা দিয়ে নবীজী (সা) স্বয়ং ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন এবং পরিখায় অবতরণ করে সালমান (রা)-এর নেতৃত্বে খননকার্যে লিপ্ত দশজন সাহাবীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান এবং নিজ হাতে কোদাল ধারণ করে সেই প্রস্তর খণ্ডের উপর প্রচণ্ড আঘাত হানেন আর এ আয়াত পাঠ করেন تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا (অর্থাৎ আপনার পালনকর্তার অনুগ্রহ সত্য সত্যই পূর্ণ হয়েছে) প্রথম আঘাতেই পাথরের এক-তৃতীয়াংশ কেটে যায়। সাথে সাথে প্রস্তরখণ্ড থেকে এক আলোকচ্ছটা উদ্ভাসিত হয়। অতপর তিনি দ্বিতীয়বার আঘাত হেনে উল্লিখিত আয়াতের শেষ পর্যন্ত পাঠ করেন। অর্থাৎ تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلاً — দ্বিতীয়বারের আয়াতে আরো এক-তৃতীয়াংশ কেটে যায় ও পূর্বের ন্যায় আবার আলোকচ্ছটা উদ্ভাসিত হয়। তৃতীয়বার সেই পুরো আয়াত

পাঠ করে তৃতীয় আঘাত হানেন। এ আঘাতে অবশিষ্টাংশ কেটে যায়। অতপর রসূলুল্লাহ্ (সা) পরিখা থেকে উঠে আসেন এবং পরিখার পার্শ্বে রক্ষিত চাদর তুলে নিয়ে এক পাশে বসে পড়েন। সে সময়ে হযরত সালমান (রা) আরয করেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্ (সা), আপনি পাথরের উপর যতবার আঘাত করেছিলেন ততবার সে পাথর থেকে আলোক-রশ্মি বিচ্ছুরিত হতে দেখেছি। রসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত সালমানকে জিজ্ঞেস করলেন, সত্যি কি তুমি এমন রশ্মি দেখেছ? তিনি আরয করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্! আমি তা স্বচক্ষে দেখেছি।

রসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করলেন, প্রথম আঘাতে নিঃসৃত আলোকচ্ছটায় ইয়ামান ও কিসরার (পারস্য) বিভিন্ন নগরের প্রাসাদসমূহ দেখতে পাই এবং হযরত জিবরাঈল আমীন আমাকে বললেন যে, আপনার উম্মত অদূর ভবিষ্যতে এসব শহর জয় করবে, আর দ্বিতীয় আঘাতে নিঃসৃত আলোকরশ্মির সাহায্যে আমাকে রোমের লোহিত বর্ণের প্রাসাদসমূহ প্রদর্শন করানো হয় এবং জিবরাঈল (আ) এ সুসংবাদ প্রদান করেন যে, আপনার উম্মতগণ এসব শহরও অধিকার করবে। নবীজী (সা)-র এই ইরশাদ শুনে মুসলমানগণ স্বস্তি লাভ করলেন এবং ভবিষ্যতের সুমহান বিজয় ধারা সম্পর্কে তাদের পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপিত হলো।

মুনাফিকদের কটাক্ষপাত: সে সময়ে যেসব মুনাফিক পরিখা খনন কাজে অংশ নিয়েছিল, তারা বলতে লাগল, তোমাদের কি মুহাম্মদ (সা)-এর কথায় বিস্ময়ের উদ্রেক করে না? তিনি তোমাদেরকে কিরূপ অবাস্তব ও অমূলক (ভবিষ্যদ্বাণী শোনাচ্ছেন) যে, মদীনার পরিখা গহবরে তিনি হীরা, মাদায়েন ও পারস্যের প্রাসাদসমূহ দেখতে পাচ্ছেন। আবার তোমরা নাকি সেগুলো অধিকার করবে! নিজেদের অবস্থার প্রতি একটু তাকাও।—তোমাদের নিজ শরীরের খবর লওয়ার মত হুঁশজ্ঞান নেই—পায়খানা প্রস্রাব করার মত সময়টুকু পর্যন্ত নেই। অথচ রোম-পারস্য প্রভৃতি দেশ নাকি অধিকার করবে। এসব কটাক্ষপাতের পরিপ্রেক্ষিতেই উপরোল্লিখিত আয়াতসমূহ নাযিল হয়: إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا অর্থাৎ যখন কপট বিশ্বাসী ও ব্যাধিগ্রস্ত অন্তরবিশিষ্ট লোকেরা বলতে লাগল যে, আল্লাহ্ ও তদীয় রসূল (সা) প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার প্রতারণা বৈ কিছুই নয়। এ আয়াতে الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ বাক্যে সে সব কপট বিশ্বাসীদের অবস্থা বিবৃত হয়েছে যাদের অন্তর কপটতা ব্যাধিতে আচ্ছন্ন।

ভেবে দেখুন যে, মুসলমানগণের ঈমান এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-র ভবিষ্যদ্বাণীর উপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন সম্পর্কে কিরূপ কঠিন পরীক্ষা ছিল। সর্বদিক থেকে কাফিরদের দ্বারা

পরিবেষ্টিত এবং চরম বিপদ ও দুর্যোগের মুখোমুখি---পরিখা খননের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমিক নেই, হাড়-কাঁপানো প্রচণ্ড শীতের মাঝে আয়াস সাপেক্ষ পরিখা খননের এরূপ কঠিন দায়িত্ব নিজেদের মাথায়ই তুলে নিয়েছেন। সকল দিক থেকে ভয়ভীতি বাহ্যিক উপকরণ ও অবস্থা দৃষ্টে নিজেদের টিকে থাকা ও নিছক অস্তিত্বটুকু বজায় রাখা সম্পর্কে আস্থাবান থাকাই কঠিন। এমতাবস্থায় তদানীন্তন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শক্তি---বৃহত্তম সাম্রাজ্য রোম ও পারস্য বিজয়ের সুসংবাদ ও আগাম বার্তার উপর বিশ্বাস স্থাপন কি প্রকারে সম্ভব ? কিন্তু সমস্ত আমল থেকে ঈমানের মূল্য অধিক হওয়ার কারণ এই যে, পরিবেশ-পরিস্থিতি---বাহ্যিক বাহন ও উপকরণসমূহ সম্পূর্ণ পরিপন্থী হওয়া সত্ত্বেও রসূল (সা)-এর ইরশাদের প্রতি বিন্দুমাত্র সন্দেহ বা শংকা দ্বিধার উদ্রেক করে না।

উল্লিখিত ঘটনাতে উম্মতের জন্য বিশেষ নির্দেশ ঃ একথা কারো অজানা নয় যে, সাহাবায়ে কিরাম (রা) নবীজীর কেমন উৎসর্গিত প্রাণ সেবক ছিলেন।---তাঁরা কখনো এটা কামনা করতেন না যে, মজুরের এই কঠিন ও প্রাণান্তকর পরিশ্রমে রসূলুল্লাহ্ (সা)-ও অংশগ্রহণ করুন। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবায়ে কিরামের মনের সান্ত্বনা ও পরিতৃপ্তি এবং উম্মতের শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে এই পরিশ্রমে সমভাবে অংশ নেন। নবীজী (সা)-র জন্য তাঁর সাহাবায়ে কিরামের উৎসর্গ এবং ত্যাগ তাঁর অনন্য ও অনুপম গুণাবলী এবং নবুয়ত ও রিসালতের ভিত্তিতে তো অবশ্যই ছিল। কিন্তু দৃশ্যমান কারণসমূহের মাঝে বৃহত্তম কারণ এটাই ছিল যে, তিনি একজন সাধারণ মানুষের ন্যায় প্রতিটি কায়-ক্লেশ, অভাব-অনটন ও দুঃখকষ্টে পুরোপুরি শরীক থাকতেন,---শাসক-শাসিত, রাজা-প্রজা, নেতা-অনুসারী জনিত বৈষম্য ও পার্থক্যের কোন ধারণাও সেখানে ছিল না। আর যখন থেকে মুসলিম শাসকমণ্ডলী এ নীতি বর্জন করেছে তখন থেকে এ বিভেদ ও বিচ্ছেদের উন্মেষ ঘটেছে।---নানাবিধ অশান্তি---উচ্ছৃংখলতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে।

যাবতীয় বিপদাপদ উত্তীর্ণ হওয়ার অমোঘ বিধান ঃ উল্লিখিত ঘটনায় নবীজী এই দুর্জেয় প্রস্তরখণ্ডের উপর আঘাত হানার সাথে সাথে কোরআনের আয়াত---

تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلًا ط لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ পাঠ করেন।

সুতরাং বোঝা গেল যে, এ আয়াত যে কোন কঠিন সমস্যা ও বিপদ থেকে উদ্ধারের এক অমোঘ ব্যবস্থাপত্র---অব্যর্থ বিধান।

সাহাবায়ে কিরামের অনন্য ত্যাগ ঃ উপরে জানা গেছে যে, প্রত্যেক দশ গজ পরিমাণ খননের জন্য দশজন করে লোক নিযুক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু এ কথা সুস্পষ্ট যে, কতক লোক অধিক দক্ষ ও সবল এবং দ্রুত কাজ সম্পন্ন করতে সক্ষম। সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে যাঁদের খনন কার্যের নির্ধারিত অংশ সম্পন্ন হয়ে যেত তাঁরা তাঁদের কর্তব্য শেষ হয়ে গেছে ভেবে নিষ্ক্রিয়ভাবে বসে থাকতেন না ; বরং যাঁদের কাজ অসমাপ্ত রয়েছে তাঁদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসতেন।---(কুরতুবী, মাযহারী)

দীর্ঘ পরিখা ছ'দিনে সমাপ্ত হয়ঃ সাহাবায়ে কিরামের শ্রম সাধনার ফলাফল ছ'দিনেই প্রকাশিত হলো---এই সুদীর্ঘ, প্রশস্ত---গভীর পরিখা ছ'দিনেই সম্পন্ন হয়ে গেল।---(মাযহারী)

হযরত জাবির (রা)-এর দাওয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে সংঘটিত এক চাক্ষুষ মু'জিযা ঃ এই পরিখা খননকালে সেই প্রসিদ্ধ ঘটনা সংঘটিত হয়। একদিন হযরত জাবির (রা) নবীজী (সা)-কে ক্ষুধায় কাতর বলে উপলব্ধি করে বাড়ি গিয়ে স্ত্রীকে বললেন যে, রান্না করার মত কিছু থাকলে তা রান্না কর। স্ত্রী বললেন যে, বাড়িতে এক সা' (সাড়ে তিন সের) পরিমাণ যব আছে---তা পিষে নেই। স্ত্রী আটা তৈরি করে পাকাতে লেগে গেলেন। বাড়িতে একটি ছাগল ছানা ছিল, হযরত জাবির (রা) তা জবাই করে তৈরি করে ফেললেন। অতপর মহানবী হযরত (সা)-কে ডেকে আনতে রওয়ানা হলেন। স্ত্রী ডেকে বললেন যে, নবীজীর সাথে তো সাহাবায়ে কিরামের এক বিশাল জমাত রয়েছে। তাই কেবল নবীজী (সা)-কে চুপে-চুপে একা ডেকে আনবেন। সাহাবায়ে কিরামের এই বিশাল জমাত এলে কিন্তু লজ্জিত হতে হবে। হযরত জাবির (রা) নবীজী (সা)-র নিকট প্রকৃত অবস্থা সবিস্তারে বর্ণনা করে বললেন যে, কেবল এ পরিমাণ খাবার রয়েছে। কিন্তু নবীজী (সা) সাহাবায়ে কিরামের বিশাল জমাতকে সম্বোধন করে বললেন জাবির (রা)-এর বাড়িতে দাওয়াত----সবাই চলো। হযরত জাবির (রা) বিব্রত হয়ে পড়লেন। বাড়ি পৌঁছে স্ত্রীকে অবহিত করায় তিনি চরম উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে স্বামীকে জিজ্ঞেস করলেন যে, নবীজী (সা)-কে খাবারের পরিমাণ জ্ঞাত করেছেন কিনা ? হযরত জাবির (রা) বললেন যে, হ্যাঁ, তা করেছি। মহীয়সী স্ত্রী তখন নিশ্চিত হয়ে বললেন যে, তবে আর উদ্বেগের কারণ নেই।---নবীজী (সা) স্বয়ংই এখন মালিক ; যেমনি খুশি তিনিই ব্যবস্থা করবেন।

ঘটনার সবিস্তার বর্ণনা এ ক্ষেত্রে নিষ্প্রয়োজন। এতটুকু জেনে রাখা যথেষ্ট যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) স্বহস্তে রুটি ও তরকারি পরিবেশন করেন---এবং জমাতভুক্ত প্রত্যেকে পূর্ণ তৃপ্তি সহকারে পেট পুরে খান। হযরত জাবির (রা) বলেন যে, এই বিশাল জমাত খাওয়ার পরও হাঁড়ির গোশত বিন্দুমাত্র হ্রাস পেল না এবং মথিত আটা অপরিবর্তিতই রয়ে গেল। আমরা পরিবারের সকল সদস্যও পেট পুরে খেয়ে অবশিষ্টাংশ প্রতিবেশিগণের মাঝে বন্টন করে দিলাম।

এরূপভাবে ছ'দিনে পরিখার খননকার্য সম্পন্ন হওয়ার পর শত্রু সৈন্যের সম্মিলিত বাহিনী এসে পড়ল, রসূলুল্লাহ্ (সা) ও সাহাবায়ে কিরাম (রা) সালা' (سلع) পর্বত নিজেদের পশ্চাতে ফেলে সৈন্যগণকে সারিবদ্ধ করেন।

কুরায়যা গোত্রের ইহুদীদের চুক্তি লংঘন ও সম্মিলিত বাহিনীর পক্ষাবলম্বন ঃ এ সময়ে দশ-বার হাজারের সম্পূর্ণ সুসজ্জিত সশস্ত্র বাহিনীর সাথে সাজ-সরঞ্জামহীন নিরস্ত্র তিন হাজার লোকের মুকাবিলা যুক্তি-বুদ্ধির সম্পূর্ণ বাইরে। তদুপরি আবার নতুন কিছুর সংযোজন হলো। সম্মিলিত বাহিনীভুক্ত বনূ নযীর গোত্রপতি হুইয়াই বিন

আখতাব—যে রসূলুল্লাহ্ (সা) ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে সকলকে ঐক্যবদ্ধ করতে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছিল—মদীনা পেঁ ৗছে ইহুদী গোত্র বনু কুরায়যাকেও নিজেদের দলভুক্ত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। বনু কুরায়যা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাথে মৈত্রী চুক্তিবদ্ধ ছিল বলে একে অপর সম্পর্কে নিরুদ্বিগ্ন ছিল। বনু কুরায়যার নেতা ছিল কা'ব বিন আসাদ। হুইয়াই বিন আখতাব তার উদ্দেশে রওয়ানা করলো। এ সংবাদ পেয়ে কা'ব তার দুর্গের দ্বার বন্ধ করে দিল—যাতে হুইয়াই সে পর্যন্ত পৌঁছতে না পারে। কিন্তু হুইয়াই দরজা খোলার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগল। কা'আব দুর্গের ভেতর থেকেই উত্তর দিল যে, আমরা মুহাম্মদ (সা)-এর সাথে মৈত্রী-চুক্তিতে আবদ্ধ এবং এ যাবত তারা চুক্তির শর্তাবলী পুরোপুরি পালন করে আসছে। —চুক্তির পরিপন্থী কোন আচরণই পরিলক্ষিত হয়নি, সুতরাং আমরা এরূপ চুক্তিতে আবদ্ধ বলে আপনাদের পক্ষ অবলম্বন করতে পারছি না। দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত হুইয়াই বিন আখতাব দরজা খোলার এবং কা'বের সাথে কথাবার্তা বলার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলো এবং সে ভেতর থেকে অস্বীকৃতি জানাতে লাগল, কিন্তু কা'বকে পুনঃ পুনঃ ধিক্কার দেওয়ায় অবশেষে সে দরজা খুলে হুইয়াইকে ভেতরে ডেকে নিল, হুইয়াইর মিথ্যা প্রলোভনে প্রলুব্ধ হয়ে অবশেষে কা'ব তার ফাঁদে পড়ে গেল ও সম্মিলিত বাহিনীর সাথে অংশ গ্রহণ করবে বলে অঙ্গীকার করল। কিন্তু কা'ব যখন গোত্রের অন্য নেতৃবৃন্দের নিকটে একথা প্রকাশ করলো তারা সমস্বরে বলে উঠলো যে, অকারণে মুসলমানদের সহিত চুক্তিভংগ করে মারাত্মক ভুল করেছ। কা'বও তাদের কথায় নিজের ভুল অনুবাধন করে কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা প্রকাশ করল। কিন্তু পরিস্থিতি তার নাগালের বাইরে চলে গিয়েছিল। অবশেষে এ চুক্তি লংঘনই বনু কোরায়যার ধ্বংস ও পতনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়—যার বিবরণ পরে আসছে।

রসূলুল্লাহ্ (সা) ও সাহাবায়ে কিরাম এই সংকটময় মুহূর্তে বনু নাযীরের চুক্তি ভঙ্গের সংবাদে অত্যন্ত মর্মাহত হন। সম্মিলিত বাহিনীর আগমন পথে পরিখা খননের মাধ্যমে প্রতিরোধ সৃষ্টি করা হয়েছিল। কিন্তু এ গোত্র মদীনার অভ্যন্তরেই অবস্থান করছে বলে এদের থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় কি—তা নিয়ে বিশেষভাবে চিন্তাগ্রস্ত ও বিচলিত হয়ে উঠলেন। কোরআন করীমে 'কাফিরদের সম্মিলিত সৈন্য তোমাদের উপর চড়াও করে ফেলে, এ বাক্য সম্পর্কে যে বলা হয়েছে مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ এর ব্যাখ্যা প্রসংগে কোন কোন বিশিষ্ট তফসীরকার এ অভিমতই প্রকাশ করেছেন যে, فَوْقَ—উপর দিক থেকে আগমনকারী দ্বারা বনু কুরায়যাকে এবং أَسْفَلَ নিম্নদিক থেকে আগমনকারী দ্বারা সম্মিলিত বাহিনীর অবশিষ্টাংশকে বোঝানো হয়েছে।

রসূলুল্লাহ্ (সা) চুক্তিভঙ্গের মূল তত্ত্ব ও সঠিক অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার উদ্দেশ্যে আনসারের 'আউস গোত্রের নেতা হযরত সা'দ বিন মায়াযকে এবং খাযরাজ গোত্রের নেতা হযরত সা'দ বিন ওবাদাহ্‌কে কা'বের সাথে আলোচনার জন্য প্রতিনিধিরূপে প্রেরণ করেন। তাদেরকে এ মর্মে নির্দেশ দিয়ে দেন যে, চুক্তিভঙ্গের ব্যাপারটা যদি অসত্য বলে প্রমাণিত হয় তবে তা সকল সাহাবায়ে-কিরামের সামনে খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করে দেবে ; আর যদি সত্য হয় তবে আকার ইঙ্গিতেবলবে যাতে আমরা বুঝে নিতে পারি, যাতে সাধারণ সাহাবীগণের মাঝে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার উদ্রেক না করে। এই মহান ব্যক্তিদ্বয় ওখানে পৌঁছে চুক্তিভঙ্গের সুস্পষ্ট লক্ষণ দেখতে পান। তাদের ও কা'বের মাঝে বাদানুবাদ ও কড়া কথাবার্তাও হয়। ফিরে এসে পূর্বনির্দেশমত আকার-ইঙ্গিতে চুক্তিভঙ্গের ব্যাপারটা সঠিক বলে হুযূর (সা)-কে অবহিত করেন।

এ সময় মুসলমানদের সাথে মৈত্রীচুক্তিতে আবদ্ধ---ইহুদী গোত্র বনূ কুরায়যা প্রকাশ্যভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলে তখন যারা কপটতাসহ মুসলমানদের সাথে অবস্থান করছিল, তাদের কপটতা প্রকাশ পেতে লাগলো। কেউ কেউ তো খোলাখুলিভাবে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বিরুদ্ধে কথাবার্তা বলতে আরম্ভ করলো, যেমন উপরে বলা হয়েছে إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ—আবার কতক মিথ্যা অমূলক অজুহাত তুলে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালাবার উদ্দেশ্যে নবীজী (সা)-র নিকটে অনুমতি চাইতে লাগলো। যার বর্ণনা উল্লিখিত আয়াতে إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ الخ বাক্যে রয়েছে।

এখন যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থা ছিল এই যে, পরিখার দরুন আক্রমণকারী সম্মিলিত বাহিনী অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে সক্ষম হচ্ছিল না। এর অপর প্রান্তে মুসলিম সৈন্য অবস্থান করছিল। সর্বক্ষণ উভয়ের মাঝে তীর নিক্ষেপ অব্যাহত ছিল। এ অবস্থায়ই প্রায় একমাস কেটে যায়---খোলাখুলি ভাগ্য নির্ধারিত কোন যুদ্ধও হচ্ছিল না---আবার কখনো নিশ্চিন্তে শংকামুক্ত থাকাও যাচ্ছিল না। দিবা-রাত্রি সর্বক্ষণ রসূলুল্লাহ্ (সা) ও সাহাবায়ে কিরাম পরিখা প্রান্তে অবস্থান করে এর রক্ষণাবেক্ষণ কার্যে নিয়োজিত থাকছেন যদিও রসূলুল্লাহ্ (সা) স্বয়ংও এই প্রাণান্তকর পরিশ্রম ও দুঃখ-কষ্টে শরীক ছিলেন, কিন্তু সমগ্র সাহাবায়ে কিরামের চরম উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার মাঝে কালাতিপাত নবীজীর পক্ষে সবিশেষ পীড়াদায়ক ছিল।

রসূলুল্লাহ্‌র একটি যুদ্ধ কৌশল ঃ হুযূর (সা) এ কথা জানতে পেরেছিলেন যে, গাতফান গোত্রপতি খায়বারের ফলমূল ও খেজুরের লোভে এসব ইহুদীর সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। তিনি বনূ গাতফানের অপর দুটি গোত্রপতি উয়াইনা বিন হাসান ও আবুল হারিস বিন আমরের নিকটে দূত মারফত প্রস্তাব পাঠালেন যে, তোমরা যদি স্বীয় সহচরবৃন্দসহ যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে চলে যাও তবে তোমাদেরকে মদীনায় উৎপন্ন ফলের

এক-তৃতীয়াংশ প্রদান করা হবে। এ প্রসঙ্গে কথাবার্তা চলছিল। এ প্রস্তাবে উভয় নেতা সম্মতিও প্রদান করেছিল---চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয় হয় ভাব। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর অভ্যাস মুতাবিক এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরামের সাথে পরামর্শ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। আউস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের দুই বরেণ্য নেতা---হযরত সা'দ বিন মায়ায ও সা'দ বিন ওবাদাহ্কে ডেকে তাঁদের সাথে পরামর্শ করলেন।

হযরত সা'দ (রা)-এর ঈমানী জোশ ঃ উভয় নেতাই আরয করলেন যে, হুযূর, আপনি যদি এ কাজ করতে আল্লাহ্ পাক কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে থাকেন, তবে আমাদের কিছু বলার নেই---তা মেনে নেব। অন্যথায় বলুন এটা কি আপনার স্বাভাবিক মত না আমাদেরকে পরিশ্রম ও কায়ক্লেশ থেকে অব্যাহতি দেওয়ার জন্য এরূপ চিন্তা করছেন ?

রসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করলেন যে, এটা বিধাতার নির্দেশও নয় বা আমার ব্যক্তিগত স্বাভাবিক ইচ্ছাও এরূপ নয় বরং তোমাদের দুঃখকষ্টের কথা বিবেচনা করে এ পথে অগ্রসর হচ্ছি। কেননা তোমরা সকল দিক থেকে পরিবেষ্টিত। আমি এই পদক্ষেপের মাধ্যমে অনতিবিলম্বে বিপক্ষদলের শক্তি ভেংগে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছি। হযরত সা'দ (রা) আরয করলেন---হে আল্লাহ্র রসূল!---আমরা যে সময়ে প্রতিমা পূজারী ছিলাম---মহান আল্লাহ্কে চিনতাম না---তাঁর উপাসনা আরাধনাও করতাম না---সে সময়েও এ নগরের এসব লোক এ শহরের কোন ফলের একটি দানা পর্যন্ত লাভের আশা প্রকাশ করতে সাহস পেত না। অবশ্য যদি না তারা আমাদের মেহমান হয়ে আসত এবং মেহমান হিসাবে তাদেরকে খাইয়ে দিতাম---অথবা খরিদ করে নিত। আজ যখন আল্লাহ্ পাক মেহেরবানীপূর্বক তাঁর পরিচয় প্রদান করে ধন্য করেছেন এবং ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার সম্মানে ভূষিত করেছেন, তবে এখন কি আমরা তাদেরকে আমাদের ফল-মূল ও ধনসম্পদ চুক্তির মাধ্যমে দিয়ে দেব! তাদের সাথে আমাদের চুক্তিবদ্ধ হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। আমরা তাদেরকে তরবারির আঘাত ব্যতীত অন্য কিছুই দেব না। যতদিন পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের ও তাদের মাঝে চূড়ান্ত ফয়সালা না করে দেন।

রসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত সা'দের সুদৃঢ় মনোবল ও ঈমানী মর্যাদাবোধ দেখে নিজের মত পরিত্যাগ করে ইরশাদ করলেন যে, তোমাদের ইচ্ছা---যা চাও তাই করতে পার। হযরত সা'দ (রা) তাদের নিকট থেকে সুলেহনামার কাগজপত্র নিয়ে উহার লেখা মুছে বিলীন করে দেন। কেননা এ পর্যন্ত তা স্বাক্ষরিত হয়নি। গাতফান গোত্র-পতি হারিস ও উয়াইনা---যারা সন্ধির জন্য প্রস্তুত হয়ে মজলিসে এসেছিল, সাহাবায়ে কিরামের শৌর্যবীর্য ও সুদৃঢ় মনোবল দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেল এবং মনে মনে দোদুল্যমান হয়ে পড়লো।

আহত হওয়ার পর হযরত সা'দ বিন মা'আযের দোয়া ঃ এদিকে পরিখার উভয় দিক থেকে পাথর ও তীর নিক্ষেপের ধারা অবিরাম চলছিল। হযরত সা'দ বিন মা'আয মহিলাগণের জন্য সংরক্ষিত বনী হারেসার ছাউনিতে তাঁর মায়ের নিকটে যান।

হযরত আয়েশা (রা) ফরমান যে, আমিও সে সময় এ ছাউনিতে ছিলাম। তখন পর্যন্ত নারীদের জন্য পর্দা করার আয়াত নাযিল হয়নি। আমি হযরত সা'দকে একটি ছোট বর্ম পরিহিত অবস্থায় দেখতে পেলাম---যার মধ্য থেকে তাঁর হাত বের হয়ে পড়ছিল এবং তার মা তাকে বলেছিলেন যে, অতিসত্বর রসূলুল্লাহ (সা)-র পাশে চলে যাও। আমি তাঁর মাকে বললাম যে, বর্মটা আরও কিছুটা বড় হলে ভাল হতো। তাঁর বর্ম বহির্ভূত হাত-পা আহত ও ক্ষত হওয়ার আশংকা আছে। মা বললেন, কোন ক্ষতি নেই। আল্লাহ্ যা করতে চান তা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে।

হযরত সা'দ বিন মা'আয (রা) সৈন্যদের মাঝে প্রবেশ করার পর তীরবিদ্ধ হন। তাঁর একটি গুরুত্বপূর্ণ রগ কেটে যায়। অতপর সা'দ (রা) এই দোয়া করেন, হে আল্লাহ্! ভবিষ্যতে রসূলুল্লাহ (সা)-র বিরুদ্ধে যদি কুরায়শদের আরো কোন আক্রমণ নির্ধারিত থেকে থাকে, তবে তার জন্য আমাকে জীবন্ত রাখুন। কেননা এটাই আমার একান্ত কামনা যে, আমি সে সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব, যারা নবীজীর প্রতি নানাভাবে নির্যাতন করেছে---মাতৃভূমি থেকে বহিষ্কার করে দিয়েছে---এবং তাঁর আদর্শকে মিথ্যা বলে আখ্যায়িত করেছে। আর যদি আপনার জানা মতে এ যুদ্ধের ধারা সমাপ্ত হয়ে গিয়ে থাকে, তবে আমাকে আপনি শহীদী মৃত্যু প্রদান করুন। কিন্তু যে পর্যন্ত বনূ কুরায়যার বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ গ্রহণ করে আমার চোখ শীতল না হয় সে পর্যন্ত যেন আমার মৃত্যু না হয়।

আল্লাহ্ পাক তাঁর দোয়াই গ্রহণ করেছেন।---আহ্যাবের এ যুদ্ধকেই কাফিরদের সর্বশেষ আক্রমণে পরিণত করেন। এরপর থেকেই মুসলমানদের বিজয়াভিযানের সূচনা হয়---প্রথমে খায়বার, অতপর মক্কা মুকাররামাহ্ এবং এরপর অন্যান্য দেশ ও নগর অধিকারভুক্ত হয়; এবং বনূ কুরায়যার ঘটনা যা পরবর্তী পর্যায়ে বর্ণিত হয়েছে যে তাদেরকে বন্দী করে আনা হয়; এবং তাদের ব্যাপারে মীমাংসার ভার হযরত মা'আয (রা)-এর উপর ন্যস্ত হয়। তাঁর মীমাংসানুযায়ী এদের যুবক শ্রেণীকে হত্যা করা হয় এবং নারী ও বালকদেরকে বন্দী করে রাখা হয়।

আহ্যাবের এই ঘটনাকালে সাহাবায়ে কিরাম ও রসূলুল্লাহ্ (সা) সারারাত পরিখা দেখাশোনা করতেন। কোন সময় বিশ্রামের জন্য ক্ষণিকের তরে শয়ন করলেও কোন দিক থেকে ক্ষীণতম হট্টগোলের আভাস পেলেই অস্ত্রসজ্জিত হয়ে ময়দানে চলে আসতেন। উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালমা (রা) ইরশাদ করেছেন যে, একই রাতে কয়েকবার এমন হত যে, তিনি ক্ষণিক বিশ্রামের জন্য তশরীফ আনতেন এবং কোন শব্দ শুনে তৎক্ষণাৎ বাইরে চলে যেতেন। আবার ফিরে এসে আরামের জন্য শয্যায় খানিকটা গা লাগাতেন, পুনরায় কোন শব্দ পেয়েই বাইরে তশরীফ নিতেন।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালমা (রা) বলেন যে, আমি অনেক যুদ্ধে---যথা খায়বারের যুদ্ধ, হোদায়বিয়া, মক্কা বিজয়, হুনায়নের যুদ্ধের সময় রসূলুল্লাহ (সা)-র সংগে ছিলাম; কিন্তু তিনি অন্য কোন যুদ্ধে খন্দকের (পরিখার) যুদ্ধের ন্যায় এত দুঃখ

কষ্টের সম্মুখীন হন নি। এ যুদ্ধে মুসলমানরা নানাভাবে ক্ষত-বিক্ষত হয়---প্রচণ্ড শীতের কারণে ভীষণ যন্ত্রণা পোহাতে হয়। তদুপরি খাওয়া-দাওয়ার দ্রব্যসামগ্রীও ছিল একেবারেই অপর্যাপ্ত।---(মাযহারী)

এই জিহাদে রসূলুল্লাহর চার ওয়াক্ত নামায কাযা হয়ে যায়ঃ একদিন বিপক্ষ কাফিররা স্থির করল যে, তারা একবার সকলে সমবেতভাবে আক্রমণ করে কোন প্রকারে পরিখা অতিক্রম করে সম্মুখে অগ্রসর হবে। এরূপ স্থির করে মুসলমানদের উপর প্রচণ্ড ও নির্মম আক্রমণ চালায় এবং সর্বত্র ব্যাপকভাবে তীর নিক্ষেপ করতে থাকে। এ নিয়ে রসূলুল্লাহ (সা) ও সাহাবায়ে কিরামকে সারাদিন এত বেশি ব্যস্ত থাকতে হয় যে, নামায পড়ার পর্যন্ত সুযোগ পান নি। সুতরাং ইশার সময় চার ওয়াক্ত নামায একই সাথে পড়লেন।

রসূলুল্লাহ (সা)-র দোয়াঃ যখন দুঃখ-যন্ত্রণা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে, তখন নবীজী সম্মিলিত কাফির বাহিনীর পরাজয় ও পশ্চাদপসরণ এবং মুসলমানদের বিজয়ের জন্য মসজিদে ফাতহের ভিতরে সোম, মংগল ও বুধ---একাধারে এই তিনদিন বিরামহীন-ভাবে দোয়া করতে থাকেন। তৃতীয় দিন যোহর ও আসরের মাঝামাঝি সময়ে দোয়া কবুল হয়। রসূলুল্লাহ (সা) সহাস্য বদনে প্রফুল্লচিত্তে সাহাবায়ে কিরামের নিকটে তশরীফ এনে বিজয়ের সুসংবাদ প্রদান করেন। সাহাবায়ে কিরাম বলেন যে, এর পর থেকে কোন মুসলমানের কোন প্রকারের কষ্ট হয়নি।---(মাযহারী)

সাফল্য ও বিজয়ের মাধ্যম এবং সূত্রসমূহের বহিঃপ্রকাশের সূচনাঃ গাতফান গোত্র ছিল শত্রু পক্ষের শক্তির অন্যতম প্রধান উৎস। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর অসীম কুদরতে এ গোত্রভুক্ত 'নুয়াইম বিন মাসুদ' নামক জনৈক ব্যক্তির অন্তর ঈমানের আলোকে উদ্ভাসিত করে দেন। তিনি হুযূর (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার কথা প্রকাশ করেন এবং বলেন যে, এখনো আমার গোত্রের কেউ আমার ইসলাম গ্রহণের কথা জানতে পারেনি---এখন আমাকে মেহেরবানী করে বলে দিন যে, আমি এ পর্যায়ে ইসলামের কি খিদমত করতে পারি। রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন যে, তুমি একা মানুষ---এখানে বিশেষ কিছু করতে সক্ষম হবে না। নিজ সম্প্রদায়ে ফিরে গিয়ে তাদের মাঝে অবস্থান করেই ইসলামের স্বার্থে যা সম্ভব হয় তাই কর। নুয়াইম (রা) অত্যন্ত বিচক্ষণ ও প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি ছিলেন। মনে মনে এক পরিকল্পনা গ্রহণ করে স্ব-গোত্রীয়দের মাঝে গিয়ে যা ভাল বিবেচিত হয় তাই বলা ও করার অনুমতি চাইলেন। হুযূর (সা) তাঁকে অনুমতি দিলেন।

বনূ কুরায়যার সাথে নুয়াইমের অন্ধকার যুগ থেকেই নিবিড় সম্পর্ক ছিল। তাদের নিকট গিয়ে তিনি বললেন---হে বনূ কুরায়যা! তোমরা ভালভাবেই জান যে, আমি তোমাদের বহু পুরাতন বন্ধু। তারা স্বীকৃতি জ্ঞাপন করে বলল, আপনার বন্ধুত্ব ও কল্যাণবোধ সম্পর্কে আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। অতপর হযরত নুয়াইম (রা) বনূ কুরায়যার নেতৃবৃন্দকে নিতান্ত উপদেশপূর্ণ ও কল্যাণ কামনার সুরে জিজ্ঞেস করলেন

নিজেদের মূর্খতার দরুন মানবত্বকে নবুয়তের পরিপন্থী বলে মনে করত)। আর [এ অস্বীকৃতিতে তারা এতটা এগিয়ে গিয়েছিল যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নবুয়ত ও নবুয়তের দাবি সম্পর্কে] বলতে লাগল, (অলৌকিক ঘটনাবলীর ব্যাপারে) এ ব্যক্তি যাদুকর এবং (নবুয়ত দাবির ব্যাপারে) মিথ্যাবাদী। সে যখন বহু উপাস্যের জায়-গায় এক উপাস্য করে দিয়েছে (কাজেই সে কি সত্যবাদী হতে পারে?)। নিশ্চয় এটা এক বিস্ময়কর ব্যাপার। (তওহীদের বিষয়বস্তু শুনে) কতিপয় কাফির মোড়ল (মজলিস থেকে উঠে মানুষের কাছে) এ কথা বলে প্রস্থান করল যে, তোমরা চলে যাও এবং তোমাদের উপাস্যদের পূজায় স্থির থাক। (কেননা প্রথমত তওহীদের) এ দাওয়াত উদ্দেশ্যপ্রণোদিত (বলে মনে হয়। অর্থাৎ এই বাহানায় সে রাজা হতে চায়। দ্বিতীয়ত তওহীদের দাবিও অবান্তর ও অভূতপূর্ব। কেননা) আমরা পূর্ববর্তী ধর্মে এমন কথা শুনিনি। এটা (এ ব্যক্তির) মনগড়া ব্যাপার বৈ নয়। (পূর্ববর্তী ধর্মের অর্থ এই যে, দুনিয়াতে অনেক ধর্মাবলম্বী এসেছে। সবার শেষে আমরা এসেছি এবং আমরা সত্যপন্থী। এই পন্থাবলম্বী বড়দের কাছে আমরা কখনও এরূপ কথা শুনিনি। এ ব্যক্তি যে নবুয়ত দাবি করে এবং তওহীদকে আল্লাহ্‌র শিক্ষা বলে আখ্যা দেয় প্রথমত, তো নবুয়ত মানবত্বের পরিপন্থী, দ্বিতীয়ত, এদিকে লক্ষ্য না করলেও) আমাদের সবার মধ্যে তারই (শ্রেষ্ঠত্ব ছিল যে, সে-ই নবুয়ত পেয়েছে এবং তারই) প্রতি কি কোরআন অবতীর্ণ হল? (বরং তা যদি কোন সরদারের প্রতি অবতীর্ণ হত তাহলে কোন আপত্তি থাকত না। অতপর আল্লাহ্ বলেন, তাদের এই বক্তব্যের কারণ এই নয় যে, এমনটি হলে তারা অনুসরণ করত---) বরং (আসল কথা এই যে,) তারা আমার কোরআনের প্রতি সন্দেহে পতিত; (অর্থাৎ তারা কোন মানুষকে পয়গম্বর মানতে প্রস্তুত নয়। এটাও দলীলের ভিত্তিতে নয়) বরং (কারণ এই যে,) তারা এখনও আমার আযাবের স্বাদ আস্বাদন করেনি। (আস্বাদন করলে বুদ্ধি-বিবেক ঠিক পথে এসে যেত। অতপর অন্যভাবে জওয়াব দেওয়া হচ্ছে যে,) না কি তাদের কাছে আপনার পরাক্রান্ত মহা দয়াবান প্রতিপালকের রহমতের কোন ভাণ্ডার রয়েছে (যাতে নবুয়তও দাখিল আছে। অর্থাৎ নবুয়তসহ রহমতের সকল ভাণ্ডার যদি তাদের করায়ত্ত থাকত তবেই তাদের একথা বলার অবকাশ থাকত যে, আমরা মানুষকে নবুয়ত দেইনি; সুতরাং সে কেমন করে নবী হয়ে গেল?) না কি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সব কিছুর উপর তাদের সার্বভৌমত্ব আছে? (এরূপ সার্বভৌমত্ব থাকলেও তাদের একথা বলার অবকাশ ছিল যে, তারা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের উপযোগিতা সম্পর্কে অবগত। কাজেই তারা যাকে চায়, তারই নবুয়ত পাওয়া উচিত। অতপর অক্ষমতা প্রকাশার্থে বলা হচ্ছে যে, তাদের এরূপ সার্বভৌমত্ব) থাকলে তারা সিঁড়ি লাগিয়ে (আকাশে) আরোহণ করুক। (বলা বাহুল্য, তাদের এরূপ ক্ষমতা নেই। সুতরাং নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের উপর তাদের কি সার্বভৌমত্ব থাকতে পারে? এমতাবস্থায় এরূপ ভিত্তিহীন কথাবার্তা বলারও তাদের কোন অধিকার নেই। কিন্তু হে রসূল! আপনি তাদের বিরোধিতার কারণে চিন্তাযুক্ত হবেন না। কেননা) এখানে

(অর্থাৎ মক্কায় পয়গম্বর বিরোধীদের) বহু বাহিনীর মধ্যে তাদেরও একটি বাহিনী রয়েছে, যারা (শীঘ্রই) পরাজিত হবে। (বদর যুদ্ধে এই ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবে পরিণত হয়েছে।) তাদের পূর্বেও মিথ্যারোপ করেছিল নূহের সম্প্রদায়, আদ, ফিরাউন যার (সাম্রাজ্যের) খুঁটি আমূল বিদ্ধ ছিল, সামূদ, লূতের সম্প্রদায় এবং আইকার লোকেরা। (তাদের কাহিনী পূর্বে কয়েক জায়গায় বর্ণিত হয়েছে।) এরাই ছিল বিপুল বাহিনী (উপরে من الاحزاب বলে যাদের উল্লেখ করা হয়েছে।) এরা সবাই পয়গম্বরগণের প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল (যেমন কোরায়শ কাফিররা আপনার প্রতি মিথ্যারোপ করছে।) ফলে আমার আযাব (তাদের উপর) পতিত হয়েছে। (সুতরাং অপরাধ যখন অভিন্ন, তখন আযাবও অভিন্নই হবে। এ ব্যাপারে তারা নিশ্চিন্ত কেন?) তারা (অর্থাৎ মিথ্যারোপ করতে বদ্ধপরিকর কাফিররা) কেবল একটি মহানাদের (অর্থাৎ দ্বিতীয় ফুঁকের) অপেক্ষা করছে, যাতে দম ফেলার অবকাশও থাকবে না (অর্থাৎ কিয়ামত)। তারা (কিয়ামতের কথা শুনে মিথ্যারোপ ও ঠাট্টার ছলে) বলে, হে আমাদের পালনকর্তা, (পরকালে কাফিরদের যে আযাব হবে, তা থেকে) আমাদের প্রাপ্য অংশ আমাদেরকে হিসাব দিবসের পূর্বেই দিয়ে দিন। (উদ্দেশ্য এই যে, কিয়ামত আসবে না। হলে আমরা এখনই আযাব চাই। আযাব যখন হয় না, তখন কিয়ামতও আসবে না। (নাউযুবিল্লা!)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

শানে নুযুল ঃ এই সূরার প্রাথমিক আয়াতগুলোর পটভূমিকা এই যে, রসূলে করীম (সা)-এর পিতৃব্য আবু তালিব ইসলাম গ্রহণ না করা সত্ত্বেও ভ্রাতুষ্পুত্রের পূর্ণ দেখা-শোনা ও হিফাযত করে যাচ্ছিলেন। তিনি যখন রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লেন, তখন কোরায়শ সরদাররা এক পরামর্শসভায় মিলিত হল। এতে আবু জহল, আ'স ইবনে ওয়ায়েল, আসওয়াদ ইবনে মুত্তালিব, আসওয়াদ ইবনে এয়াগুস ও অন্যান্য সরদার যোগদান করল। তারা পরামর্শ করল যে, আবু তালিব রোগাক্রান্ত। যদি তিনি পরলোকগমন করেন এবং তার অবর্তমানে আমরা মুহাম্মদ (সা)-এর বিরুদ্ধে কোন কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করি, তবে আরবের লোকেরা আমাদেরকে দোষারোপ করার সুযোগ পাবে। তারা বলবে; আবু তালিবের জীবদ্দশায় তো তারা মুহাম্মদ (সা)-এর কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারল না, এখন তার মৃত্যুর পর তাকে উৎপীড়নের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেছে। তাই আমরা আবু তালিব জীবিত থাকতেই তার সাথে মুহাম্মদ (সা)-এর ব্যাপারে একটা মীমাংসায় উপনীত হতে চাই যাতে সে আমাদের দেবদেবীর নিন্দাবাদ পরিত্যাগ করে।

সেমতে তারা আবু তালিবের নিকট উপস্থিত হয়ে বলল ঃ আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র আমাদের উপাস্য দেবদেবীর নিন্দা করে। অথচ রসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের দেবদেবী সম্পর্কে এছাড়া কিছুই বলতেন না যে, এগুলো চেতনাহীন নিষ্প্রাণ মূর্তি মাত্র; তোমাদের স্রষ্টাও নয়, অন্নদাতাও নয়। তোমাদের কোন লাভ-লোকসান তাদের করায়ত্ত নয়।

আবূ তালিব রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে মজলিসে ডেকে এনে বললেন ঃ ভ্রাতুষ্পুত্র, এ কোরায়শ সরদাররা তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে যে, তুমি নাকি তাদের উপাস্য দেবদেবীর নিন্দা কর। তাদেরকে তাদের ধর্মে ছেড়ে দাও এবং তুমি আল্লাহ্র ইবাদত করে যাও। এ সম্পর্কে কোরায়শের লোকেরাও বলাবলি করে।

অবশেষে রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ চাচাজান, "আমি কি তাদেরকে এমন বিষয়ের প্রতি দাওয়াত দেবো না, যাতে তাদের মঙ্গল রয়েছে?" আবূ তালিব বললেন ঃ সে বিষয়টা কি? তিনি বললেন ঃ আমি তাদেরকে এমন একটি কলেমা বলাতে চাই, যার দৌলতে সমগ্র আরব তাদের সামনে মাথা নত করবে এবং তারা সমগ্র অনারবের অধীশ্বর হয়ে যাবে। একথা শুনে আবূ জহ্ল বলে উঠল ঃ বল, সেই কলেমা কি? তোমার পিতার কসম আমরা এক কলেমা নয়, দশ কলেমা বলতে প্রস্তুত। রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ ব্যস "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" বলে দাও। একথা শুনে সবাই পরিধেয় বস্ত্র ঝেড়ে উঠে দাঁড়াল এবং বলল ঃ আমরা কি সমস্ত দেবদেবীকে পরিত্যাগ করে মাত্র একজনকে অবলম্বন করব? এ যে বড়ই বিস্ময়ের ব্যাপার! এ ঘটনার প্রেক্ষাপটেই সূরা ছোয়াদের আলোচ্য আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়।---(ইবনে কাসীর)

وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ---(তাদের সরদাররা একথা বলে প্রস্থান করল)---এতে উল্লিখিত ঘটনার দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। তওহীদের দাওয়াত শুনে তারা মজলিস ত্যাগ করেছিল।

وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ---এর শাব্দিক অর্থ "কীলকওয়ালা ফিরাউন"। এর তফসীরে তফসীরবিদদের উক্তি বিভিন্নরূপ। কেউ কেউ বলেন ঃ এতে তার সাম্রাজ্যের দৃঢ়তার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ কারণেই হযরত থানভী (র) এর তরজমা করেছেন ----"যার খুঁটি আমূল বিদ্ধ ছিল।" কেউ কেউ বলেন ঃ সে মানুষকে চিৎ করে শুইয়ে তার চার হাত-পায়ে কীলক এঁটে দিত এবং তার উপরে সাপ-বিচ্ছু ছেড়ে দিত। এটাই ছিল তার শাস্তি দানের পদ্ধতি। কেউ কেউ বলেন ঃ সে রশি ও কীলক দ্বারা বিশেষ এক প্রকার খেলা খেলত। কেউ কেউ আরও বলেন ঃ এখানে কীলক বলে অট্টালিকা বোঝানো হয়েছে। সে সুদৃঢ় অট্টালিকা নির্মাণ করেছিল। ---(কুরতুবী)

أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ---এটা مَهْزُومٌ مِّنَ الْأَحْزَابِ বাক্যের বর্ণনা। অর্থাৎ এ আয়াতে যেসব দলের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছিল, তারা এরাই। হযরত থানভী (র) এ অর্থ অনুযায়ীই তফসীর করেছেন। কিন্তু অন্য তফসীরবিদগণ এর অর্থ করেছেন, এরাই ছিল সে দল অর্থাৎ প্রকৃত শৌর্যবীর্যের অধিকারী সম্প্রদায়ই ছিল আদ, সামূদ প্রমুখ। তাদের মুকাবিলায় মক্কার মুশরিকরা তো তুচ্ছ ও নগণ্য।

তারাই যখন খোদায়ী আযাব থেকে আত্মরক্ষা করতে পারেনি, তখন এই মুশরিকরা কি আত্মরক্ষা করবে ?---(কুরতুবী)

مَا لَهَا مِن فَوَاقٍ —আরবীতে فَوَاق -এর একাধিক অর্থ হয়। এক. একবার দুগ্ধ দোহনের পর পুনরায় স্তনে দুগ্ধ আসার মধ্যবর্তী সময়কে فَوَاق বলা হয়। দুই সুখ-শান্তি। উদ্দেশ্য এই যে, ইসরাফিলের শিঙ্গার ফুঁক অনবরত চলতে থাকবে এতে কোন বিরতি হবে না।----(কুরতুবী)

عَجِّل لَّنَا قِطَّنَا —আসলে কাউকে পুরস্কার দানের প্রতিশ্রুতি সম্বলিত দলীল দস্তাবেজকে قط বলা হয়। কিন্তু পরে শব্দটি 'অংশ' অর্থে ব্যবহৃত হতে শুরু করেছে। এখানে তা-ই বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ পরকালের শাস্তি ও প্রতিদানে আমাদের যা অংশ রয়েছে, তা এখানেই আমাদেরকে দিয়ে দিন।

اِصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوٗدَ ذَا الْاَيْدِ اِنَّهٗۤ اَوَّابٌ ﴿١٧﴾ اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهٗ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْاِشْرَاقِ ﴿١٨﴾ وَالطَّيْرَ مَحْشُوْرَةً كُلٌّ لَّهٗۤ اَوَّابٌ ﴿١٩﴾ وَشَدَدْنَا مُلْكَهٗ وَاٰتَيْنٰهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ ﴿٢٠﴾

---

(১৭) তারা যা বলে তাতে আপনি সবর করুন এবং আমার শক্তিশালী বান্দা দাউদকে স্মরণ করুন। সে ছিল আমার প্রতি প্রত্যাবর্তনশীল। (১৮) আমি পর্বত-মালাকে তার অনুগামী করে দিয়েছিলাম, তারা সকাল-সন্ধ্যায় তার সাথে পবিত্রতা ঘোষণা করত; (১৯) আর পক্ষীকুলকেও, যারা তার কাছে সমবেত হত। সবাই ছিল তাঁর প্রতি প্রত্যাবর্তনশীল। (২০) আমি তাঁর সাম্রাজ্যকে সুদৃঢ় করেছিলাম এবং তাঁকে দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও ফয়সালাকারী বাগ্মীতা।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি তাদের কথাবার্তায় সবর করুন এবং আমার বান্দা দাউদকে স্মরণ করুন, সে (সবরসূচক ইবাদতে খুব) শক্তি (ও সাহসিকতা) সম্পন্ন ছিল। সে (আল্লাহ্‌র দিকে) খুব প্রত্যাবর্তনশীল ছিল। (আমি তাকে অনেক নিয়ামত দান করেছিলাম। এক---) আমি পর্বতমালাকে হুকুম করেছিলাম যে, তার সাথে (শরীক হয়ে) সন্ধ্যায় ও সকালে [এটাই ছিল দাউদ (আ)-এর পবিত্রতা ঘোষণার সময়] পবিত্রতা ঘোষণা কর। আর (এমনিভাবে) পক্ষীকুলকেও (হুকুম করেছিলাম) যারা

(পবিত্রতা ঘোষণা করার সময়) তার কাছে সমবেত হত। এই পর্বতমালা ও পক্ষীকুল সবাই তার (পবিত্রতা ঘোষণার) কারণে যিকিরে মশগুল থাকত। (দ্বিতীয় নিয়ামত ছিল এই যে,) আমি তার সাম্রাজ্যকে সুদৃঢ় করেছিলাম। (তৃতীয় নিয়ামত ছিল যে,) আমি তাকে প্রজ্ঞা (অর্থাৎ নবুয়ত) ও ফয়সালাকারী (সুস্পষ্ট ও সারগর্ভ) বাগ্মীতা দান করেছিলাম।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

কাফিরদের ঠাট্টা-বিদ্রূপের কারণে রসূলুল্লাহ্ (সা) মর্মবেদনা অনুভব করতেন। এই মর্মবেদনা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে সান্ত্বনার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা এখানে অতীত পয়গম্বরগণের ঘটনাবলী বর্ণনা করেছেন। সেমতে আলোচ্য আয়াতসমূহেও রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সবর শিক্ষা দিয়ে কয়েকজন পয়গম্বরের ঘটনাবলী বর্ণিত হয়েছে। সর্বপ্রথম হযরত দাউদ (আ)-এর ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে।

وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْاَيْدِ—(স্মরণ করুন, আমার বান্দা দাউদকে যে ছিল শক্তিশালী।) প্রায় সমস্ত তফসীরবিদই এর একই ধরনের অর্থ বর্ণনা করেছেন যে, দাউদ (আ) খুবই শক্তি ও সাহসিকতার পরিচয় দিতেন। اِنَّهٗ اَوَّابٌ (নিশ্চয় তিনি আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তনশীল ছিলেন।) বুখারী ও মুসলিমের এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ আল্লাহ্ তা'আলার কাছে সর্বাধিক পছন্দনীয় নামায ছিল দাউদ (আ)-এর নামায এবং সর্বাধিক পছন্দনীয় রোযা ছিল দাউদ (আ)-এর রোযা। তিনি অর্ধরাত্রি নিদ্রা যেতেন, এক তৃতীয়াংশ ইবাদত করতেন এবং পুনরায় রাত্রির ষষ্ঠাংশে নিদ্রা যেতেন এবং তিনি একদিন পর পর রোযা রাখতেন। শত্রুর মুকাবিলায় অবতীর্ণ হয়ে তিনি কখনও পশ্চাদপসরণ করতেন না। নিঃসন্দেহে দাউদ (আ) আল্লাহ্র দিকে খুব প্রত্যাবর্তনশীল ছিলেন।—(ইবনে কাসীর)

ইবাদতের উপরোক্ত পদ্ধতি সর্বাধিক পছন্দনীয় হওয়ার কারণ এই যে, এতে কষ্ট বেশি হয়। সারা জীবন রোযা রাখলে মানুষ রোযায় অভ্যস্ত হয়ে যায়। ফলে কিছুদিন পর রোযায় কোন কষ্টই অনুভূত হয় না। কিন্তু এক দিন পর পর রোযা রাখলে কষ্ট অব্যাহত থাকে। এছাড়া এই পদ্ধতিতে মানুষ ইবাদতের সাথে সাথে নিজের পরিবার-পরিজনের এবং আত্মীয়-স্বজনের অধিকারও পুরোপুরি আদায় করতে পারে।

اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهٗ—এ আয়াতে দাউদ (আ)-এর সাথে পর্বতমালা ও পক্ষীকুলের ইবাদতে ও তসবীহে শরীক হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ইতিপূর্বে এর ব্যাখ্যা সূরা আম্বিয়া ও সূরা সাবায় বর্ণিত হয়েছে। এখানে উল্লেখযোগ্য

বিষয় এই যে, পর্বতমালা ও পক্ষীকুলের তসবীহ্ পাঠকে আল্লাহ্ তা'আলা এখানে দাউদ (আ)-এর প্রতি নিয়ামত হিসাবে উল্লেখ করেছেন। প্রশ্ন উঠতে পারে যে, এটা দাউদ (আ)-এর প্রতি নিয়ামত হল কেমন করে? পর্বতমালা ও পক্ষীকুলের তসবীহ্ পাঠে তাঁর বিশেষ কি উপকার হত?

এর এক উত্তর এই যে, এতে দাউদ (আ)-এর একটি মু'জিযা প্রকাশ পেয়েছে। বলা বাহুল্য, মু'জিযা এক বড় নিয়ামত। এছাড়া হযরত থানভী (র) এর এক সূক্ষ্ম জওয়াবে বলেনঃ পর্বতমালা ও পক্ষীকুলের তসবীহ্র ফলে যিকিরের এক বিশেষ আনন্দঘন পরিবেশ সৃষ্টি হত। ফলে ইবাদতে স্ফূর্তি, সজীবতা ও সাহসিকতা অনুভূত হত। সঙ্ঘবদ্ধ যিকিরের আরও একটি উপকারিতা এই যে, এতে যিকিরের বরকত পরস্পরের উপর প্রতিফলিত হতে থাকে। সূফী বুযুর্গগণের মধ্যে যিকিরের একটি বিশেষ পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে। এতে যিকিরের অবস্থায় ধ্যান করা হয় যে, সমগ্র সৃষ্টজগৎ যিকির করে যাচ্ছে। আত্মশুদ্ধি ও ইবাদত স্পৃহায় এ পদ্ধতির প্রভাব বিস্ময়কর। আলোচ্য আয়াতে এই বিশেষ পদ্ধতির ভিত্তিও পাওয়া যায়। ---(মাসায়েলে সুলুক)

চাশ্তের নামায ঃ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ — যোহরের পর থেকে পরদিন সকাল পর্যন্ত সময়কে عشى বলা হয়। আর اشراق এর অর্থ সকাল, যখন সূর্যের আলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস এই আয়াতকে চাশ্তের নামায শরীয়তসিদ্ধ হওয়ার পক্ষে দলীল হিসাবে পেশ করেছেন। চাশ্তের নামাযকে সালাতে আওয়াবীন এবং কেউ কেউ সালাতে ইশরাকও বলেন। পরবর্তীতে "সালাতে আওয়াবীন" নাম মাগরিবের পরে ছয় রাক'আতের জন্য এবং 'সালাতে ইশরাক' নাম সূর্যোদয় সংলগ্ন দুই অথবা চার রাক'আত নফল নামাযের জন্য অধিক খ্যাত হয়ে গেছে।

চাশ্তের নামায দুই রাক'আত থেকে বার রাক'আত পর্যন্ত যত রাক'আত ইচ্ছা পড়া যায়। হাদীসে এর অনেক উপকারিতা বর্ণিত হয়েছে। তিরমিযীতে হযরত আবূ হোরায়রা রেওয়ায়েত করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-বলেনঃ যে ব্যক্তি চাশ্তের দুই রাক'আত নামায নিয়মিত পড়ে, তার গোনাহ্ মাফ করা হয় যদিও তা সমুদ্রের ফেনা সমান হয়। হযরত আনাসের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-বলেনঃ যে ব্যক্তি চাশতের বার রাক'আত নামায পড়বে, আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে স্বর্ণের প্রাসাদ তৈরি করে দেবেন।---(কুরতুবী)

আলিমগণ বলেন ঃ চাশ্তের নামাযে দুই থেকে বার পর্যন্ত যত রাক'আত ইচ্ছা পড়া যায়। কিন্তু এর জন্য কোন সংখ্যা নির্দিষ্ট করে নিয়মিত পড়াই উত্তম। এই নির্মিত সংখ্যা চার রাক'আত হওয়াই শ্রেয়। কেননা চার রাক'আত পড়াই রসূলুল্লাহ্ (সা)-রও নিয়ম ছিল।

وَاٰتَيْنٰهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ — (আমি তাকে হিকমত ও ফয়সালাকারী বাগ্মিতা দান করেছি।) হিকমত অর্থ প্রজ্ঞা। অর্থাৎ আমি তাকে অসাধারণ বিবেকবুদ্ধিরূপী ধন দান করেছিলাম। কেউ কেউ হিকমতের অর্থ নিয়েছেন নবুয়ত। فصل الخطاب — এর বিভিন্ন তফসীর করা হয়েছে। কেউ বলেছেন, এর ভাবার্থ অসাধারণ বাগ্মিতা। হযরত দাউদ (আ) উচ্চস্তরের বক্তা ছিলেন। বক্তৃতায় হামদ ও সালাতের পর اما بعد শব্দ সর্বপ্রথম তিনিই বলেছিলেন। কেউ কেউ বলেন, এর ভাবার্থ সর্বোত্তম বিচারশক্তি। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ঝগড়া-বিবাদ মেটানো ও বাদানুবাদ মীমাংসা করার শক্তি দান করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে শব্দগুলোর মধ্যে একই সময়ে উভয় অর্থের পুরোপুরি অবকাশ রয়েছে। হযরত থানভী যে তরজমা করেছেন, তাতেও উভয় অর্থই একত্রিত থাকতে পারে।

وَهَلْ اَتٰىكَ نَبَؤُا الْخَصْمِ ۘ اِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ ﴿٢١﴾ اِذْ دَخَلُوْا عَلٰى دَاوٗدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوْا لَا تَخَفْ ۚ خَصْمٰنِ بَغٰى بَعْضُنَا عَلٰى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَآ اِلٰى سَوَآءِ الصِّرَاطِ ﴿٢٢﴾ اِنَّ هٰذَآ اَخِيْ ۫ لَهٗ تِسْعٌ وَّتِسْعُوْنَ نَعْجَةً وَّلِيَ نَعْجَةٌ وَّاحِدَةٌ ۫ فَقَالَ اَكْفِلْنِيْهَا وَعَزَّنِيْ فِي الْخِطَابِ ﴿٢٣﴾ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ اِلٰى نِعَاجِهٖ ۭ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْخُلَطَآءِ لَيَبْغِيْ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَقَلِيْلٌ مَّا هُمْ ۭ وَظَنَّ دَاوٗدُ اَنَّمَا فَتَنّٰهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهٗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَّاَنَابَ ﴿٢٤﴾ فَغَفَرْنَا لَهٗ ذٰلِكَ ۭ وَاِنَّ لَهٗ عِنْدَنَا لَزُلْفٰى وَحُسْنَ مَاٰبٍ ﴿٢٥﴾

---

(২১) আপনার কাছে দাবিদারদের বৃত্তান্ত পৌঁছেছে যখন তারা প্রাচীর ডিঙিয়ে ইবাদতখানায় প্রবেশ করেছিল। (২২) যখন তারা দাঊদের কাছে অনুপ্রবেশ করল, তখন সে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। তারা বলল ঃ ভয় করবেন না; আমরা বিবদমান দুটি পক্ষ একে অপরের প্রতি বাড়াবাড়ি করেছি। অতএব আমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করুন, অবিচার করবেন না। আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করুন। (২৩) সে আমার

ভাই, সে নিরানব্বইটি দুম্বার মালিক আর আমি মালিক একটি মাদী দুম্বার। এরপরও সে বলেঃ এটিও আমাকে দিয়ে দাও। সে কথাবার্তায় আমার উপর বলপ্রয়োগ করে। (২৪) দাঊদ বলল ঃ সে তোমার দুম্বাটিকে নিজের দুম্বাগুলোর সাথে সংযুক্ত করার দাবি করে তোমার প্রতি অবিচার করেছে। শরীকদের অনেকেই একে অপরের প্রতি জুলুম করে থাকে। তবে তারা করে না যারা আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাসী ও সৎকর্ম সম্পাদনকারী। অবশ্য এমন লোকের সংখ্যা অল্প। দাঊদের খেয়াল হল যে, আমি তাকে পরীক্ষা করছি। অতপর সে তার পালনকর্তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করল, সিজদায় লুটিয়ে পড়ল এবং তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করল। (২৫) আমি তার সে অপরাধ ক্ষমা করলাম। নিশ্চয় আমার কাছে তার জন্য রয়েছে উচ্চ মর্তবা ও সুন্দর আবাসস্থল।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনার কাছে দাবিদারদের বৃত্তান্ত পেঁৗছেছে [যারা দাঊদ (আ)-এর কাছে মোকাদ্দমা পেশ করেছিল] যখন তারা [দাঊদ (আ)-এর] ইবাদতখানার প্রাচীর ডিঙিয়ে (তাঁর কাছে) পেঁৗছেছিল। (কেননা, সে সময়টি ছিল ইবাদতের। মোকদ্দমার বিচারের সময় ছিল না বিধায় পাহারাদাররা তাদেরকে দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে দেয়নি।) তিনি (তাদের এই নিয়ম বিরুদ্ধ আগমনের কারণে) সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন। (কে জানে এরা হত্যার অভিপ্রায়ে এভাবে নির্জন কক্ষে প্রবেশ করল কি না?) তারা (তাঁকে) বলল ঃ আপনি ভীত হবেন না। আমরা বিবদমান দু'টি পক্ষ। একে অপরের প্রতি (কিছু) বাড়াবাড়ি করেছি। (এর মীমাংসার জন্যই আমরা এসেছি। পাহারাদাররা দরজা দিয়ে আসতে দেয়নি বলে আমরা এভাবে আসতে বাধ্য হয়েছি।) অতএব আপনি আমাদের মধ্যে ন্যায়সংগত মীমাংসা করুন; অবিচার করবেন না। আমাদেরকে (এ বিষয়ে) সরল পথ প্রদর্শন করুন। অতপর এক ব্যক্তি বলল ঃ (অভিযোগ এই যে,) এ লোকটি আমার ভাই (অর্থাৎ ধর্মীয় ভাই। দূররে মনসূরে হযরত ইবনে মাসঊদ থেকে তাই বর্ণিত রয়েছে।) তার নিরানব্বইটি দুম্বা আছে আর আমার আছে (সর্বমোট) একটি মাত্র মাদী দুম্বা। তবুও সে বলে ঃ এটিও আমাকে দিয়ে দাও। কথাবার্তায় সে আমার প্রতি বল প্রয়োগ করে (এবং মুখের জোরে আমার কথা অগ্রাহ্য করে।) দাঊদ বললেন ঃ সে তোমার দুম্বাকে তার দুম্বাগুলোর সাথে সংযুক্ত করার দাবি করে তোমার প্রতি বাস্তবিকই অন্যায় করেছে। শরীকদের অনেকেই একে অপরের প্রতি (এমনি) অন্যায় করে থাকে; তবে যারা ঈমানদার এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে (তাদের কথা স্বতন্ত্র)। অবশ্য তাদের সংখ্যা স্বল্পই। (একথাটি তিনি মযলুমের সান্ত্বনার জন্য বললেন।) দাঊদ (আ) মনে করলেন, (এ মোকাদ্দমাটি এভাবে উত্থাপন করে) আমি তাকে পরীক্ষা করছি। অতপর তার পালনকর্তার সামনে তওবা করলেন এবং সিজদায় লুটিয়ে পড়লেন এবং (আল্লাহ্‌র দিকে) রুজু হলেন। আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম সে বিষয়ে আমার কাছে তার জন্য রয়েছে নৈকট্য ও শুভ পরিণতি (অর্থাৎ জান্নাত)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত দাউদ (আ)-এর ঘটনা উল্লেখ করেছেন। কোরআন পাকে এ ঘটনা যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, তাতে কেবল এতটুকু বোঝা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর ইবাদতখানায় বিবদমান দু'টি পক্ষ পাঠিয়ে কোন এক বিষয়ে তাঁকে পরীক্ষা করেছিলেন। দাউদ (আ) এ পরীক্ষার ফলে সতর্ক হয়ে যান এবং আল্লাহ্ তা'আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে সিজদায় লুটিয়ে পড়েন। আল্লাহ্ তা'আলাও তাঁকে ক্ষমা করে দেন। কোরআন পাকের আসল লক্ষ্য এখানে এ বিষয়টি ফুটিয়ে তোলা যে, হযরত দাউদ (আ) সব ব্যাপারেই আল্লাহ্ তা'আলার দিকে রুজু করতেন এবং কোন সময় সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটলেও সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমা প্রার্থনায় রত হয়ে যেতেন। তাই এখানে এসব বিষয়ের বিবরণ দেওয়া হয়নি যে, সে পরীক্ষা কি ছিল, দাউদ (আ) কি ভুল করেছিলেন, যে কারণে তিনি ক্ষমাপ্রার্থী হয়েছিলেন এবং যা আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমা করে দিয়েছিলেন?

তাই কোন কোন অনুসন্ধানী ও সাবধানী তফসীরবিদ এসব আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বিশেষ রহস্য ও উপযোগিতার কারণে তাঁর প্রথিতযশা পয়গম্বরের এসব ত্রুটি-বিচ্যুতি ও পরীক্ষার বিশদ বিবরণ দেন নি। তাই আমাদেরও এর পেছনে পড়া উচিত নয়। যতটুকু বিষয় কোরআন পাকে উল্লিখিত হয়েছে, ততটুকুতেই ঈমান রাখা দরকার। হাফেয ইবনে কাসীরের মত অনুসন্ধানী তফসীরবিদও এ নীতিই অনুসরণ করে ঘটনার বিবরণ দানে বিরত রয়েছেন। নিঃসন্দেহে এটা সর্বাধিক সাবধানী ও বিপদমুক্ত পথ। এ কারণেই পূর্ববর্তী মনীষীগণ থেকে বর্ণিত আছে—

ابهموا ما ابهمه الله— অর্থাৎ আল্লাহ্ যে বিষয়কে অস্পষ্ট রেখেছেন, তোমরাও তাকে অস্পষ্ট থাকতে দাও। বলা বাহুল্য, এতে এমনসব বিষয়কে অস্পষ্ট রাখতে বলা হয়েছে, যেগুলোর সাথে আমাদের কর্ম এবং হালাল ও হারামের সম্পর্ক নেই। পক্ষান্তরে মুসলমানদের কর্ম সম্পর্কিত বিষয়সমূহের অস্পষ্টতা স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সা) নিজের উক্তি ও কর্মের মাধ্যমে দূর করে দিয়েছেন।

তবে কোন কোন তফসীরবিদ রেওয়ায়েত ও পূর্ববর্তীদের উক্তির আলোকে এ পরীক্ষা ও যাচাইর বিষয়টি নির্ধারিত করতে চেষ্টা করেছেন। এ সম্পর্কে সাধারণের মধ্যে খ্যাত একটি রেওয়ায়েত এই যে, হযরত দাউদ (আ)-এর দৃষ্টি একবার তাঁর সেনাধ্যক্ষ উরিয়ার পত্নীর উপর পড়ে গেলে তাঁর মনে তাকে বিয়ে করার স্পৃহা জাগ্রত হয়। তিনি উরিয়াকে হত্যা করানোর উদ্দেশ্যে তাকে এক ভয়ানক বিপজ্জনক অভিযানে প্রেরণ করেন। ফলে সে শহীদ হয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে দাউদ (আ) তার পত্নীকে বিয়ে করে নেন। এ কর্মের ব্যাপারে সতর্ক করার জন্য উপরোক্ত ফেরেশতাদ্বয়কে মানবাকৃতিতে বাদী-বিবাদীরূপে প্রেরণ করা হয়।

কিন্তু এ রেওয়ায়েতটি নিঃসন্দেহে একটি বাজে প্রবচন, যা ইহুদীদের প্রভাবাধীন সাধারণ মুসলমানদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছিল। প্রকৃতপক্ষে এ রেওয়ায়েতটি বাইবেলের

সামুয়েল কিতাবের একাদশ অধ্যায় থেকে সংগৃহীত। পার্থক্য এতটুকু যে, বাইবেলে খোলাখুলি হযরত দাউদ (আ)-এর প্রতি উরিয়ার পত্নীর সাথে বিয়ের পূর্বেই ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে এ তফসীরী রেওয়ায়েতসমূহে ব্যভিচারের অংশটি বাদ দেওয়া হয়েছে। মনে হয়, কেউ এই ইসরাঈলী রেওয়ায়েতটি দেখে এ থেকে ব্যভিচারের কাহিনী বাদ দিয়ে একে উল্লিখিত আয়াতসমূহের তফসীরে জুড়ে দিয়েছে। অথচ সামুয়েল কিতাবটিই মূলত ভিত্তিহীন। সুতরাং রেওয়ায়েতটি নিশ্চিত-রূপেই মিথ্যা অপবাদ বৈ কিছু নয়। এ কারণেই অনুসন্ধানী তফসীরবিদগণ একে ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

হাফেয ইবনে কাসীরই নয়, আল্লামা ইবনে জওযী, কাযী আবূ সউদ, কাযী বায়যাভী, কাযী আয়ায, ইমাম রাযী, আল্লামা আবূ হাইয়্যান আন্দালুসী, খাযেন, যমখশরী, ইবনে হযম, আল্লামা খাফফাজী, আহমদ ইবনে নসর, আবূ তামাম, আল্লামা আলূসী (র) প্রমুখ খ্যাতনামা তফসীরবিদ রেওয়ায়েতটিকে মিথ্যা ও বানোয়াট বলে অভিহিত করেছেন। হাফেয ইবনে কাসীর লিখেন ঃ

কোন কোন তফসীরবিদ এ প্রসঙ্গে একটি কাহিনী উল্লেখ করেছেন, যার বেশির ভাগই ইসরাঈলী রেওয়ায়েত থেকে সংগৃহীত। রসূলে করীম (সা) থেকে এ সম্পর্কে অনুসরণীয় কোন কিছু প্রমাণিত নেই। কেবল ইবনে আবী হাতেম এখানে একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এর সনদও বিশুদ্ধ নয়।

মোটকথা, অনেক যুক্তি-প্রমাণের আলোকে আলোচ্য আয়াতের তফসীর থেকে উপরোক্ত রেওয়ায়েতটি সম্পূর্ণভাবে খারিজ হয়ে যায়। এসব যুক্তি-প্রমাণের কিছু বিবরণ ইমাম রাযীর তফসীরে কবীর এবং জওযীর যাদুল মাসীর ইত্যাদি গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে।

হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (র) এই যাচাই ও ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন ঃ মোকদ্দমার দু'পক্ষ প্রাচীর ডিঙিয়ে প্রবেশ করে এবং ধৃষ্টতাপূর্ণ ভঙ্গিতে কথাবার্তা শুরু করে। মোকদ্দমা পেশ করার আগেই তারা হযরত দাউদ (আ)-কে ন্যায় বিচার করার এবং অবিচার না করার উপদেশ দিতে থাকে। কোন সাধারণ ব্যক্তি হলে এ ধরনের ধৃষ্টতার কারণে তাদের জওয়াব দেওয়ার পরিবর্তে উল্টা শাস্তি দিত। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত দাউদ (আ)-কে পরীক্ষা করলেন যে, তিনিও ক্রোধান্বিত হয়ে তাদেরকে শাস্তি দেন, না পয়গম্বরসুলভ ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখে তাদের কথাবার্তা শুনেন।

হযরত দাউদ (আ) এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন, কিন্তু একটি ভুল রয়ে গেল। তা এই যে, ফয়সালা দেওয়ার সময় জালিমকে সম্বোধন না করে তিনি মজলুমকে সম্বোধন করলেন। এ থেকে এক প্রকার পক্ষপাতিত্ব বোঝা যাচ্ছিল। কিন্তু তিনি অবিলম্বে সতর্ক হয়ে গেলেন এবং সিজদায় লুটিয়ে পড়লেন। আল্লাহ্ তা'আলাও তাঁকে ক্ষমা করে দিলেন।—(বয়ানুল কোরআন)

কোন কোন তফসীরবিদ ভুলের এ ব্যাখ্যা করেছেন যে, হযরত দাউদ (আ) বিবাদীকে চুপ থাকতে দেখে তার বিবৃতি শোনা ব্যতিরেকেই কেবল বাদীর কথা শুনে এমন উপদেশ দেন যা থেকে মোটামুটি বাদীর সমর্থন হচ্ছিল। অথচ আগে বিবাদীকে তার বক্তব্য পেশ করতে বলা উচিত ছিল। দাউদ (আ) যদিও কেবল উপদেশের ভঙ্গিতে কথাগুলো বলেছিলেন এবং মোকদ্দমার ফয়সালা দেননি, তবুও এটা তাঁর মত সম্মানিত পয়গম্বরের পক্ষে সমীচীন ছিল না ; এ কারণেই তিনি পরে হুঁশিয়ার হয়ে সিজদায় লুটিয়ে পড়েন।---(রূহুল মা'আনী)

কেউ কেউ বলেন ঃ হযরত দাউদ (আ) তাঁর সময়সূচী যেভাবে নির্ধারণ করে-ছিলেন, তাতে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে প্রতি মুহূর্তেই তাঁর গৃহের কোন না কোন ব্যক্তি ইবাদত, যিকির ও তসবীহে মশগুল থাকত। একদিন তিনি আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে নিবেদন করলেন ঃ হে আমার পালনকর্তা, দিন ও রাতের মধ্যে এমন কোন মুহূর্ত যায় না, যখন দাউদের পরিবারের কেউ না কেউ আপনার ইবাদত, যিকির ও তসবীহে নিয়োজিত থাকে না। আল্লাহ্ বললেন ঃ দাউদ, এটা আমার দেওয়া তওফী-কের কারণেই হয়। আমার সাহায্য না থাকলে তোমার এরূপ করার সাধ্য নাই। আমি একদিন তোমাকে তোমার অবস্থার উপর ছেড়ে দেব। সেমতে আল্লাহ্ তা'আলার এই উক্তির পর উপরোক্ত ঘটনা সংঘটিত হয়। দাউদ (আ)-এর ইবাদতে নিয়োজিত থাকার সময় এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় তাঁর সময়সূচী বিঘ্নিত হয়ে পড়ে। তিনি বিবাদ মীমাংসা করার কাজে মশগুল হয়ে পড়েন এবং তাঁর পরিবারের অন্য কেউ তখন ইবাদত ও যিকিরে মশগুল ছিল না। এতে দাউদ (আ) বুঝতে পারেন যে, আল্লাহ্র কাছে ইবাদতের গর্ব প্রকাশ করা ভুল ছিল। তাই তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করেন ও সিজদায় লুটিয়ে পড়েন। মুস্তাদরাক হাকেমে সহীহ্ সনদ সহকারে বর্ণিত হযরত ইবনে আব্বাসের একটি উক্তি দ্বারাও এ ব্যাখ্যার সমর্থন হয়। ---(আহকামুল কোরআন)।

উপরোক্ত সবগুলো ব্যাখ্যার অভিন্ন স্বীকৃত বিষয় এই যে, মোকাদ্দমাটি কাল্পনিক নয়---সত্যিকার ঘটনার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং দাউদ (আ)-এর যাচাই ও পরীক্ষার সাথে এর কোন সম্পর্ক ছিল না। এর বিপরীতে অনেক তফসীরবিদের ব্যাখ্যার সারমর্ম এই যে, মোকদ্দমার পক্ষদ্বয় মানুষ নয়---ফেরেশতা ছিল এবং আল্লাহ্ তা'আলা দাউদ (আ)-এর সামনে একটি কাল্পনিক মোকদ্দমা পেশ করার জন্য তাদেরকে পাঠিয়ে-ছিলেন যাতে দাউদ (আ) নিজের ভুল বুঝতে পারেন।

সেমতে তাঁদের বক্তব্য এই যে, উরিয়াকে হত্যা করানো এবং তার পত্নীকে বিয়ে করার কাহিনী সম্পূর্ণ বানোয়াট। তবে বাস্তব সত্য এই যে, বনী ইসরাঈলের মধ্যে তখন কাউকে "তুমি তোমার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে আমার বিবাহে দিয়ে দাও"---এ কথাটি বলা দূষণীয় ছিল না। বরং তখন এ ধরনের ফরমায়েশের ব্যাপক প্রচলনও ছিল। এর ভিত্তিতেই দাউদ (আ) উরিয়ার কাছে ফরমায়েশ করেছিলেন। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা

দু'জন ফেরেশতা প্রেরণ করে তাঁকে সতর্ক করেন। কেউ কেউ বলেনঃ ব্যাপারটি এই যে, উরিয়া কোন এক মহিলাকে বিয়ের পয়গাম দিয়েছিল। দাউদ (আ)-ও সে মহিলাকে বিয়ের পয়গাম দেন। এতে উরিয়া খুবই দুঃখিত হয়। বিষয়টি বোঝানোর জন্য আল্লাহ্ তা'আলা দু'জন ফেরেশতা প্রেরণ করেন এবং সূক্ষ্ম ভঙ্গিতে দাউদ (আ)-এর ভুলের ব্যাপারে সতর্ক করেন। কাযী আবূ ইয়া'লা এ ব্যাখ্যার প্রমাণস্বরূপ কোরআন পাকের وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ বাক্যটি পেশ করেছেন। তিনি বলেন, এ বাক্যটি প্রমাণ করে যে, ব্যাপারটি নিছক বিয়ের পয়গামের ক্ষেত্রেই সংঘটিত হয়েছিল এবং দাউদ (আ)-তখনও তাকে বিয়ে করেন নি।---(যাদুল মাসীর)

অধিকাংশ তফসীরবিদ শেষোক্ত ব্যাখ্যাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। সাহাবায়ে কিরামের কোন কোন উক্তি থেকেও এ দু'টি ব্যাখ্যার সমর্থন পাওয়া যায়। (রূহুল মা'আনী, তফসীরে আবূ সউদ, যাদুল মাসীর, তফসীরে কবীর ইত্যাদি।) কিন্তু বাস্তব ঘটনা এই যে, এ পরীক্ষা ও ভুলের বিবরণ কোরআন ও সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রামাণ্য নয়। তাই এতটুকু বিষয় তো মীমাংসিত যে, উরিয়াকে হত্যা করানোর যে কাহিনী প্রচলিত রয়েছে, তা ভ্রান্ত। কিন্তু আসল ঘটনার ব্যাপারে উল্লিখিত সবগুলো সম্ভাবনাই বিদ্যমান রয়েছে কিন্তু এগুলোর কোন একটিকেও অকাট্য ও নিশ্চিত বলা যায় না। সুতরাং হাফেয ইবনে কাসীরের অবলম্বিত পথই নির্ঝঞ্ঝাট। তা এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা যে বিষয় অস্পষ্ট রেখেছেন, আমরা যেন নিজেদের আনুমান ও ধারণার মাধ্যমে তার বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা না করি, যেহেতু এর সাথে আমাদের কোন কর্মের সম্পর্ক নেই। এ অস্পষ্টতার মধ্যেও অবশ্যই কোন রহস্য নিহিত রয়েছে। সুতরাং কেবল কোরআন পাকে উল্লিখিত ঘটনার উপরই ঈমান রাখা এবং বিশদ বিবরণ আল্লাহ্ তা'আলার উপর সমর্পণ করা উচিত। তবে এ ঘটনা থেকে কতিপয় কর্মগত উপকারিতা অর্জিত হয়। এগুলোর প্রতি অধিক মনোযোগ দেওয়া দরকার। এখন আয়াতসমূহের তফসীর দেখুন, ইনশাআল্লাহ্ প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো এসে যাবে।

إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ— (যখন তারা ইবাদতখানার প্রাচীর ডিঙিয়ে প্রবেশ করল।) محراب আসলে বাড়ির উপর তলা অথবা কোন গৃহের সম্মুখভাগকে বলা হয়। কিন্তু পরবর্তীতে বিশেষভাবে মসজিদ অথবা ইবাদতখানার সামনের অংশকে বোঝানোর জন্য শব্দটি ব্যবহৃত হতে শুরু করেছে। কোরআনে এটি ইবাদতখানার অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লামা সুয়ূতী লিখেন, আজকাল মসজিদসমূহে যে বৃত্তাকারের মেহরাব নির্মাণ করা হয়, তা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আমলে ছিল না।---(রূহুল মা'আনী)

فَفَزِعَ مِنْهُمْ— [হযরত দাউদ (আ) তাদেরকে দেখে ঘাবড়ে গেলেন।]

ঘাবড়ানোর কারণ সুস্পষ্ট। অসময়ে দু'ব্যক্তির পাহারা ডিঙিয়ে ভেতরে প্রবেশ করা সাধারণত মন্দ অভিপ্রায়েই হয়ে থাকে।

স্বাভাবিক ভীতি নবুয়ত ও ওলীত্বের পরিপন্থী নয়ঃ এ থেকে জানা গেল যে, কোন ভয়াবহ জিনিস দেখে স্বাভাবিকভাবে ভীত হয়ে যাওয়া নবুয়ত ও ওলীত্বের পরিপন্থী নয়। তবে এই ভীতিকে মন-মস্তিষ্কে বদ্ধমূল করে কর্তব্য কাজ ছেড়ে দেওয়া অবশ্যই মন্দ। কোরআন পাকে পয়গম্বরগণের শানে বলা হয়েছে—وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللّٰهَ (তারা আল্লাহ্ ব্যতীত কাউকে ভয় করেন না।) অতপর প্রশ্ন হতে পারে যে, এখানে হযরত দাউদ (আ) ভীত হলেন কেন? জওয়াব এই যে, ভয় দু'রকম হয়ে থাকে। এক ভয় ইতর প্রাণীদের কষ্ট দেওয়ার আশংকায় হয়ে থাকে। আরবীতে একে خَوْف বলা হয়। দ্বিতীয় ভয় কোন মহান ব্যক্তির মাহাত্ম্য, প্রতাপ ও প্রভাবের কারণে হয়ে থাকে। আরবীতে একে خَشْيَة বলা হয়। (মুফরাদাতে রাগিব) শেষোক্ত ভয় আল্লাহ্ ব্যতীত কারও জন্য হওয়া উচিত নয়। তাই পয়গম্বর-গণ আল্লাহ্ ব্যতীত কারও প্রতি এ ধরনের ভয়ে ভীত হতেন না। তবে স্বাভাবিক পর্যায়ে ইতর বস্তুর ভয় তাঁদের মধ্যেও ছিল।

অনিয়ম দেখলে প্রকৃত অবস্থা জানা পর্যন্ত সবর করা উচিতঃ قَالُوا لَا تَخَفْ —(তারা বললঃ আপনি ভীত হবেন না।) আগন্তুকরা একথা বলে তাদের বক্তব্য শুরু করে দেয় এবং দাউদ (আ) চুপচাপ তাদের কথা শুনতে থাকেন। এ থেকে জানা গেল যে, কোন ব্যক্তি হঠাৎ নিয়মের ব্যতিক্রম করে ফেললে সাথে সাথেই তাকে তিরস্কার করা উচিত নয়, বরং প্রথমে তার কথা শুনে নেওয়া দরকার, যাতে জানা যায় যে, এরূপ ব্যতিক্রম করার বৈধতা ছিল কিনা। অন্য কেউ হলে আগন্তুকদের উদ্দেশ্যে তৎক্ষণাৎ বকাবকি শুরু করে দিত, কিন্তু দাউদ (আ) আসল ব্যাপার জানার জন্য অপেক্ষা করেছেন। তিনি মনে করেছেন যে, সম্ভবত এরা অসুবিধাগ্রস্ত। وَلَا تُشْطِطْ (এবং অবিচার করবেন না।) আগন্তুকদের কথা বলার এ ভঙ্গি বাহ্যত ধৃষ্টতাপূর্ণ ছিল। প্রথমত প্রাচীর ডিঙিয়ে অসময়ে আসা, অতপর এসেই দাউদ (আ)-এর মত মহান পয়গম্বরকে সুবিচার করার এবং অবিচার থেকে বেঁচে থাকার আদেশ দেওয়া—এগুলোর সবই ছিল কাণ্ডজ্ঞানহীনতা। কিন্তু দাউদ (আ) সবর করেন এবং তাদেরকে গালমন্দ করেন নি।

অভাবগ্রস্তদের ভুলভ্রান্তিতে বড়দের যথাসম্ভব ধৈর্য ধরা উচিতঃ এ থেকে জানা গেল যে, আল্লাহ্ তা'আলা যাকে উচ্চ পদমর্যাদা দান করেন এবং সাধারণ মানুষের প্রয়োজনাদি তার সাথে সম্পর্কযুক্ত থাকে, তার উচিত অভাবগ্রস্তদের অনিয়ম ও কথাবার্তার

ভুলভ্রান্তিতে যথাসম্ভব ধৈর্য ধরা। এটাই তার পদমর্যাদার দাবি। বিশেষভাবে শাসক, বিচারক ও মুফতীগণের এদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার।—(রূহুল মা'আনী)

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ اِلٰى نِعَاجِهٖ — [দাউদ (আ) বললেন ঃ সে তোমার দুম্বীকে তার দুম্বাগুলোর সাথে সংযুক্ত করার দাবি করে তোমার প্রতি অন্যায় করেছে]। এখানে দুটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য—(১) হযরত দাউদ (আ) এ কথাটি কেবল বাদীর বর্ণনা শুনেই বলে দিয়েছেন——বিবাদীর বিবৃতি শুনেন নি। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন, এটাই ছিল তাঁর ভুল, যে কারণে তিনি আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। কিন্তু অন্য তফসীরবিদগণ বলেন, প্রকৃতপক্ষে এখানে মোকদ্দমার পূর্ণ বিবরণ বর্ণিত হচ্ছে না; কেবল প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো বর্ণনা করা হয়েছে। দাউদ (আ) নিশ্চয়ই বিবাদীর কথাও শুনে থাকবেন। ফয়সালার এটাই সুবিদিত পন্থা।

এছাড়া এমনও হতে পারে যে, আগন্তুকরা যদিও তাঁর কাছে আদালতী মীমাংসা কামনা করেছিল, কিন্তু তখন আদালত অথবা কাছারির সময় ছিল না এবং সেখানে রায় কার্যকর করার প্রয়োজনীয় উপায়ও ছিল না। তাই দাউদ (আ) বিচারকের পদমর্যাদায় নয়—মুফতীর পদমর্যাদায় ফতোয়া দেন। মুফতীর কাজ ঘটনার তদন্ত করা নয় বরং, প্রশ্ন মুতাবিক জওয়াব দেওয়া।

চাপ প্রয়োগে চাঁদা বা দান-খয়রাত চাওয়া লুণ্ঠনের নামান্তর ঃ এখানে দ্বিতীয় প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, হযরত দাউদ (আ) কেবল এক ব্যক্তির দুম্বা দাবি করাকে জুলুম বলে আখ্যা দিয়েছেন। অথচ বাহ্যত কারও কাছে কোন বস্তু প্রার্থনা করা অপরাধ নয়। কারণ এই যে, এখানে দৃশ্যত প্রার্থনা হলেও সে কথা ও কর্মের চাপ সহকারে প্রার্থনা করা হচ্ছিল তার বর্তমানে তা লুণ্ঠনের পর্যায়ে চলে গিয়েছিল।

এ থেকে জানা গেল যে, যদি কোন ব্যক্তি কারও কাছে এভাবে কোন কিছু চায় যে, প্রতিপক্ষ সম্মত হোক বা না হোক, প্রার্থিত বস্তু দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না, তবে এভাবে উপঢৌকন চাওয়াও লুণ্ঠনের শামিল। সুতরাং যে চায়, সে ক্ষমতাসীন অথবা প্রভাবশালী ব্যক্তি হলে এবং প্রতিপক্ষ তার ব্যক্তিত্বের চাপের দরুন দিতে অস্বীকার করতে সক্ষম না হলে তা দৃশ্যত উপঢৌকন চাওয়া হলেও প্রকৃতপক্ষে লুণ্ঠন হয়ে থাকে। যে চায়, তার পক্ষে এভাবে অর্জিত বস্তু ব্যবহার করা বৈধ নয়। এ বিষয়টির প্রতি মনোযোগ দেওয়া বিশেষভাবে তাদের জন্য খুবই জরুরী, যারা মক্তব-মাদ্রাসা, মসজিদ, সমিতি ও দলের জন্য চাঁদা আদায় করে। একমাত্র সে চাঁদাই হালাল, যা দাতা পূর্ণ ক্ষমতা সহকারে, মনের খুশিতে দান করে। যদি চাঁদা আদায়কারীরা তাদের ব্যক্তিত্বের চাপে অথবা একযোগে আট-দশ ব্যক্তি কাউকে উত্যক্ত করে চাঁদা আদায় করে নেয়, তবে এটা প্রকাশ্য অবৈধ কাজ বলে গণ্য হবে। রসূলে করীম

(সা) পরিষ্কার বলেন ঃ لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه — কোন মুসলমান ব্যক্তির মাল তার মনের খুশি ছাড়া হালাল নয়।

কাজ-কারবারে শরীক হওয়ার ব্যাপারে সাবধানতা প্রয়োজন ঃ وَاِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ —(শরীকদের অনেকেই একে অন্যের প্রতি বাড়াবাড়ি করে থাকে।) এতে বলে দেওয়া হয়েছে যে, দু'ব্যক্তি কোন কাজ-কারবারে শরীক হলে প্রায়ই একের দ্বারা অপরের অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়ে যায়। কোন সময় এক ব্যক্তি একটি কাজকে মামুলী ভেবে করে ফেলে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা গোনাহের কারণ হয়ে যায়। তাই কাজ-কারবারে খুবই সাবধানতা আবশ্যক।

وَظَنَّ دَاوُدُ اَنَّمَا فَتَنَّاهُ —(দাউদের ধারণা হল যে, আমি তাকে পরীক্ষা করেছি।) মোকদ্দমার বিবরণকে যদি হযরত দাউদ (আ)-এর ভুলের দৃষ্টান্ত সাব্যস্ত করা হয় তবে এমন মনে হওয়াই স্বাভাবিক। পক্ষান্তরে ভুলের সাথে এর কোন সম্পর্ক না থাকলেও উভয়পক্ষের মোটামুটি অবস্থা এ বিষয়টি ফুটিয়ে তোলার পক্ষে যথেষ্ট ছিল যে, এরা পরীক্ষার্থে প্রেরিত হয়েছে। একদিকে তারা মোকদ্দমার ফয়সালা ত্বরান্বিত করার জন্য বিলম্ব সহ্য করেনি এবং সাহসিকতার সাথে প্রাচীর ডিঙিয়ে ভেতরে প্রবেশ করেছে। অপরদিকে মোকদ্দমা পেশ করার সময় বিবাদী চুপচাপ বসে রয়েছে এবং কথায় ও কাজে বাদীর কথা নির্দ্বিধায় মেনে নিয়েছে।

যদি বাদীর বর্ণিত ঘটনা বিবাদী পূর্বেই সমর্থন করত, তবে ফয়সালার জন্য দাউদ (আ)-এর কাছে আসার কোন প্রয়োজনই ছিল না। দাউদ (আ)-এর ফয়সালা যে বাদীর পক্ষে হবে, এটা সামান্য বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিও বোঝতে পারত। পক্ষদ্বয়ের এই রহস্যপূর্ণ তৎপরতা ব্যক্ত করছিল যে, এটি একটি অনন্য সাধারণ ঘটনা। দাউদ (আ)-ও টের পেয়ে গেলেন যে, এরা আল্লাহ্ প্রেরিত এবং এতে আমার পরীক্ষা করার উদ্দেশ্য। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, ফয়সালা শোনার পর তারা একে অপরের প্রতি তাকিয়ে মুচকি হাসল এবং মুহূর্তের মধ্যে আকাশে চলে যায়।

فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَّاَنَابَ -(অতপর তিনি তাঁর পরওয়ারদিগারের দরবারে প্রার্থনা করলেন এবং সিজদায় লুটিয়ে পড়ে রুজু হলেন।) এখানে 'রুকূ' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর আভিধানিক অর্থ নত হওয়া। অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে এতে এখানে সিজদা বোঝানো হয়েছে। হানাফী আলিমগণের মতে এ আয়াত তিলাওয়াত করলে সিজদা ওয়াজিব হয়।

রুকূর মাধ্যমে তিলাওয়াতের সিজদা আদায় হয় : ইমাম আবূ হানীফা এ আয়াতটিকে এ বিষয়ের প্রমাণ মনে করেন যে, নামাযে সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করলে যদি রুকূতেই সিজদার নিয়্যত করা হয়, তবে সিজদা আদায় হয়ে যায়। কারণ, এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা সিজদার জন্য 'রুকূ' শব্দ ব্যবহার করেছেন। যা এ বিষয়েরই প্রমাণ যে, রুকূও সিজদার স্থলাভিষিক্ত হতে পারে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে কতিপয় জরুরী মাস'আলা স্মরণ রাখা দরকার :

(১) নামাযের ফরয রুকূর মাধ্যমে সিজদা তখনই আদায় হতে পারে, যখন সিজদার আয়াত নামাযে পাঠ করা হয়। নামাযের বাইরে তিলাওয়াত করলে রুকূর মাধ্যমে সিজদা আদায় হয় না। কারণ, রুকূ কেবল নামাযেই ইবাদত—নামাযের বাইরে সিদ্ধ নয়। (২) রুকূর মধ্যে সিজদা তখন আদায় হবে, যখন সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করার সাথে সাথে অথবা বেশির চেয়ে বেশি দু'তিন আয়াত তিলাওয়াত করার পরে রুকূ করে নেবে। সুদীর্ঘ সময় তিলাওয়াত করার পরে রুকূতে গেলে সিজদা আদায় হবে না। (৩) তিলাওয়াতের সিজদা রুকূতে আদায় করার ইচ্ছা থাকলে রুকূতে যাওয়ার সময় সিজদার নিয়্যত করতে হবে। নতুবা সিজদা আদায় হবে না। অবশ্য সিজদায় যাওয়ার সময় নিয়্যত ছাড়াই সিজদা আদায় হয়ে যাবে। (৪) তিলাওয়াতের সিজদা নামাযের ফরয রুকূতে আদায় করার পরিবর্তে নামাযে আলাদা সিজদা করাই সর্বোত্তম। সিজদা থেকে উঠে দু'এক আয়াত তিলাওয়াত করার পর রুকূতে যেতে হবে।—(বাদায়ে)

وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ — (নিশ্চয় দাউদের জন্য আমার কাছে বিশেষ নৈকট্য ও শুভ পরিণতি রয়েছে।) এ আয়াতের মাধ্যমে ঘটনার সমাপ্তি টেনে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, হযরত দাউদ (আ) যে ভুলই করে থাকুন, তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা ও রুকূর পর আল্লাহ্‌র সাথে তাঁর সম্পর্ক আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

ভুল ভ্রান্তির জন্য সতর্ক করতে হলে প্রজ্ঞার প্রয়োজন : এ ঘটনা সম্পর্কিত আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, দাউদ (আ)-এর বিচ্যুতি যাই হোক না কেন, আল্লাহ্ তা'আলা সরাসরি ওহীর মাধ্যমেও তাঁকে এ বিষয়ে হুঁশিয়ার করতে পারতেন। কিন্তু এর পরিবর্তে একটি মোকদ্দমা পাঠিয়ে হুঁশিয়ার করার এই বিশেষ পন্থা কেন অবলম্বন করা হল? প্রকৃতপক্ষে এখানে যারা "সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধের" কর্তব্য পালন করে, তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, কোন ব্যক্তিকে তার ভুল-ভ্রান্তি সম্পর্কে হুঁশিয়ার করতে হলে তা প্রজ্ঞা সহকারে করতে হবে। একাজে এমন পন্থা অবলম্বন করা উচিত, যাতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নিজেই নিজের ভুল উপলব্ধি করতে পারে এবং মৌখিকভাবে হুঁশিয়ার করার প্রয়োজনই দেখা না দেয়। এর জন্য এমন দৃষ্টান্তের মাধ্যমে কাজ করা অধিক কার্যকর যাতে কারও মনে কষ্ট না লাগে এবং প্রয়োজনীয় বিষয়ও ফুটে উঠে।

يٰدَاوٗدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۭ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

(২৬) হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি অতএব তুমি মানুষের মাঝে ন্যায়সঙ্গতভাবে রাজত্ব কর এবং খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না। তা তোমাকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে। নিশ্চয় যারা আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিচ্যুত হয়, তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি, একারণে যে, তারা হিসাবদিবসকে ভুলে যায়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে শাসক করেছি। অতএব (এ পর্যন্ত যেমন করেছ, তেমনি ভবিষ্যতেও) মানুষের মধ্যে ইনসাফ সহকারে ফয়সালা করতে থেকো এবং (এ পর্যন্ত যেমন রিপুর কামনা-বাসনার অনুসরণ করনি, তেমনি ভবিষ্যতেও) রিপুর তাড়নায় তাড়িত হয়ো না। (এরূপ করলে) এটা তোমাকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে। যারা আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়, তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি, এ কারণে যে তারা হিসাব দিবসকে ভুলে যায়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

হযরত দাউদ (আ)-কে আল্লাহ্ তা'আলা নবুয়তের সাথে শাসনক্ষমতা এবং নামাযও দান করেছিলেন। সুতরাং আলোচ্য আয়াতে শাসনকার্যের জন্য তাঁকে একটি বুনিয়াদী পথ নির্দেশ দান করা হয়েছে। এ নির্দেশনামায় তিনটি মৌলিক বিষয় ব্যক্ত করা হয়েছে।

১. আমি আপনাকে পৃথিবীতে নিজের প্রতিনিধি করেছি, ২. সেমতে আপনার মূল কর্তব্য হচ্ছে ন্যায়ানুগ ফয়সালা করা, ৩. এ কর্তব্য পালনের জন্য নফসানী খেয়াল-খুশীর অনুসরণ থেকে বেঁচে থাকা একটি অপরিহার্য শর্ত।

পৃথিবীতে প্রতিনিধি করার অর্থ সূরা বাকারায় বর্ণিত হয়েছে। এ থেকেই ইসলামী রাষ্ট্রের এ মূলনীতি ফুটে উঠে যে, সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্ তা'আলারই। পৃথিবীর শাসকবর্গ তারই নির্দেশানুযায়ী চলার জন্য আদিষ্ট। কেউ এর বাইরে যাবে না সুতরাং মুসলমানদের শাসনকর্তা, উপদেষ্টা-পরিষদ অথবা আইনসভা ইসলামী আইনের ব্যাখ্যা অথবা সম্পাদনা করতে পারলেও আইন রচনা করতে পারে না। তারা আল্লাহ্‌র আইনসমূহের উপস্থাপক মাত্র।

ন্যায় প্রতিষ্ঠাই ইসলামী রাষ্ট্রের মৌল কর্তব্য ঃ এখানে একথাও পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে যে, ইসলামী রাষ্ট্রের বুনিয়াদী কাজ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা। রাষ্ট্রের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে প্রশাসনিক ব্যাপারাদিতে ও কলহ-বিবাদ মীমাংসার ক্ষেত্রে সুবিচার ও ইনসাফ কায়েম করা।

ইসলাম একটি চিরন্তন ধর্ম। তাই সে শাসনকার্যের জন্য সে সব প্রশাসনিক খুঁটিনাটি নির্দিষ্ট করেনি, যেগুলো সময় ও পরিস্থিতির পরিবর্তনে পরিবর্তিত হয়ে যায়, বরং সে কতগুলো মৌলিক নির্দেশ দান করেছে, যার আলোকে সর্বযুগের উপযোগী প্রশাসনিক খুঁটিনাটি নিজে থেকেই মীমাংসা করা যায়। এ কারণেই এখানে বলে দেওয়া হয়েছে যে, রাষ্ট্রের আসল কাজ ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু এর প্রশাসনিক বিশ্লেষণ সর্বযুগের সুধী মুসলমানদের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে।

বিচার বিভাগ ও শাসন বিভাগের সম্পর্ক ঃ সেমতে বিচার বিভাগ শাসন বিভাগ থেকে পৃথক থাকবে, না একীভূত থাকবে---এ ব্যাপারে অপরিবর্তনীয় কোন নির্দিষ্ট বিধান দেওয়া হয়নি যা কোন কালেই পরিবর্তিত হতে পারবে না। যদি কোন যুগে শাসক-বর্গের বিশ্বস্ততা ও সততায় পুরোপুরি আস্থা স্থাপন করা যায়, তবে বিচার বিভাগ ও শাসন বিভাগের পৃথক সত্তা বিলোপ করা সম্ভব। কোন যুগে শাসকবর্গ এরূপ আস্থাভাজন না হলে বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে পৃথকও রাখা যায়।

হযরত দাউদ (আ) আল্লাহ্‌র মনোনীত পয়গম্বর ছিলেন। তাঁর চেয়ে অধিক বিশ্বস্ততা ও সততার দাবি কে করতে পারত? তাই তাঁকে একই সময়ে শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগের প্রধান নিযুক্ত করে ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসার দায়িত্বও অর্পন করা হয়েছিল। খোলফায়ে-রাশেদীনের মধ্যেও এই পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। আমিরুল-মু'মিনীন নিজেই বিচারকার্য পরিচালন করতেন। পরবর্তী ইসলামী রাষ্ট্রসমূহে এ পদ্ধতির পরিবর্তন করা হয় এবং আমিরুল-মু'মিনীনকে শাসন বিভাগের এবং প্রধান বিচারপতিকে বিচার বিভাগের প্রধান নিযুক্ত করা হয়।

তৃতীয় যে নির্দেশের উপর আলোচ্য আয়াতে সর্বাধিক জোর দেওয়া হয়েছে, তা হচ্ছে 'খেয়াল-খুশির' অনুসরণ করো না এবং হিসাব দিবসের কথা সর্বদা মনে রেখো। যেহেতু এটা সুবিচার প্রতিষ্ঠার মূলভিত্তি, তাই এর উপর সর্বাধিক জোর দেওয়া হয়েছে। যে শাসক অথবা বিচারকের অন্তরে আল্লাহ্‌র ভয় এবং পরকালের চিন্তা থাকবে, সে-ই সত্যিকার অর্থে ন্যায় ও সুবিচার কায়েম করতে পারে। তা না হলে আপনি যত উৎকৃষ্ট থেকে উৎকৃষ্টতর আইনই রচনা করুন না কেন, খেয়াল-খুশির দুরন্তপনা সর্বত্র নতুন ছিদ্র-পথ বের করে নেবে। খেয়াল-খুশির উপস্থিতিতে কোন উৎকৃষ্টতর আইন-ব্যবস্থাই ন্যায় ও সুবিচার কায়েম করতে পারে না। পৃথিবীর ইতিহাস এবং বর্তমান যুগের পরিস্থিতিই এর সাক্ষ্য বহন করে।

দায়িত্বশীল পদে নিয়োগের জন্য সর্বপ্রথম দেখার বিষয় চরিত্র ঃ এখান থেকে আরও জানা গেল যে, কোন ব্যক্তিকে, শাসক, বিচারক অথবা কোন বিভাগের প্রধান কর্মকর্তা নিযুক্ত করার জন্য সর্বপ্রথম দেখতে হবে, তার মধ্যে আল্লাহ্‌ভীতি ও পরকাল চিন্তা আছে কিনা এবং তার চরিত্র ও কর্ম কিরূপ? যদি বোঝা যায়, তার অন্তরে আল্লাহ্‌ভীতির পরিবর্তে খেয়াল-খুশির রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, তবে সে যত উচ্চ ডিগ্রীধারীই হোক না কেন, নিজ বিষয়ে যত বিশেষজ্ঞ ও কর্মঠই হোক না কেন, ইসলামের দৃষ্টিতে সে কোন উচ্চ পদের যোগ্য নয়।

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَآءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ۚ ذٰلِكَ ظَنُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۚ فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنَ النَّارِ ﴿٢٧﴾ اَمْ نَجْعَلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَالْمُفْسِدِيْنَ فِي الْاَرْضِ ۫ اَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِيْنَ كَالْفُجَّارِ ﴿٢٨﴾ كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ مُبٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوْٓا اٰيٰتِهٖ وَلِيَتَذَكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ ﴿٢٩﴾

---

(২৭) আমি আসমান-যমীন ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী কোন কিছু অযথা সৃষ্টি করিনি। এটা কাফিরদের ধারণা। অতএব কাফিরদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ অর্থাৎ, জাহান্নাম। (২৮) আমি কি বিশ্বাসী ও সৎকর্মীদেরকে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী কাফিরদের সমতুল্য করে দেব? না আল্লাহ্‌ভীরুদেরকে পাপাচারীদের সমান করে দেব। (২৯) এটি একটি বরকতময় কিতাব যা আমি আপনার প্রতি বরকত হিসাবে অবতীর্ণ করেছি, যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহ লক্ষ্য করে এবং বুদ্ধিমানগণ যেন তা অনুধাবন করে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি আসমান, জমীন ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী কোন কিছুই অযথা সৃষ্টি করিনি; (বরং এ সৃষ্টির ভেতরে অনেক তাৎপর্য রয়েছে। তন্মধ্যে সর্ববৃহৎ তাৎপর্য হল এগুলোর মাধ্যমে তওহীদ ও পরকাল প্রমাণিত হওয়া।) এটা (অর্থাৎ সৃষ্টিকে তাৎপর্যহীন মনে করা) তাদেরই ধারণা, যারা কাফির। (কেননা, তারা তওহীদ ও পরকাল অস্বীকার করার মাধ্যমে জগৎ সৃষ্টির সর্ববৃহৎ তাৎপর্যকেও অস্বীকার করে।) অতএব কাফিরদের জন্য রয়েছে (পরকালে) দুর্ভোগ অর্থাৎ জাহান্নাম। (কেননা, তারা তওহীদ অস্বীকার করত। তারা কিয়ামত অস্বীকার করে, অথচ কিয়ামতের তাৎপর্য হল সৎকর্মীদেরকে পুরস্কার এবং দুষ্কৃতকারীদেরকে শাস্তি দান। এখন তাদের কিয়ামত অস্বীকারের কারণে জরুরী হয়ে পড়ে যে, রহস্য বাস্তবায়িত না হোক, বরং সব সমান হয়ে যাক।) অতএব আমি কি বিশ্বাসী ও সৎকর্মীদেরকে তাদের সমতুল্য করে দেব,

যারা (কুফর ইত্যাদি করে) পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে? না (শব্দান্তরে) আমি আল্লাহ্‌ভীরুদেরকে পাপাচারীদের সমান করে দেব? (অর্থাৎ এরূপ হতে পারে না। সুতরাং কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী, যাতে সৎকর্মীরা পুরস্কার এবং দুষ্কর্মীরা শাস্তি পাবে। এমনিভাবে তওহীদ ও পরকালের সাথে রিসালতে ঈমান রাখাও জরুরী। কেননা,) এটা (অর্থাৎ কোরআন) এক কল্যাণময় কিতাব, যা আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহ অনুধাবন করে (অর্থাৎ এর অলৌকিকতা ও মহোপকারী বিষয়বস্তু অনুবাধন করে।) এবং বুদ্ধিমানগণ উপদেশ গ্রহণ করে (অর্থাৎ তদনুযায়ী আমল করে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আয়াতসমূহের সূক্ষ্ম ধারাবাহিকতা ঃ আলোচ্য আয়াতসমূহে ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস, বিশেষত পরকালের বিশ্বাস সপ্রমাণ করা হয়েছে। এ আয়াতগুলো হযরত দাউদ ও সোলায়মান (আ)-এর ঘটনাবলীর মাঝখানে খুব সূক্ষ্ম ধারাবাহিকতা সহকারে উল্লিখিত হয়েছে। ইমাম রাযী বলেন ঃ যদি কোন ব্যক্তি হঠকারিতাবশত কোন বিষয় বোঝতে না চায়, তবে তার সাথে বিজ্ঞজনোচিত পন্থা এই যে, আলোচ্য বিষয়-বস্তু ছেড়ে দিয়ে কোন অসংলগ্ন কথা শুরু করতে হবে। যখন তার চিন্তাধারা প্রথম বিষয় থেকে সরে যাবে, তখন কথা প্রসঙ্গেই তাকে প্রথম বিষয়টি মেনে নিতে বাধ্য করতে হবে। এখানে পরকাল সপ্রমাণ করার জন্য এ পন্থাই অবলম্বন করা হয়েছে। হযরত দাউদ (আ)-এর ঘটনার পূর্বে কাফিরদের হঠকারিতার আলোচনা চলছিল, যা وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّل لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ — আয়াতে এসে শেষ হয়েছিল। এর সারমর্ম ছিল এই যে, তারা পরকাল অস্বীকার করে এবং পরকালের প্রতি বিদ্রূপ করে। এরই সাথে সাথে পরে বলা হয়েছে যে, اصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ (তাদের কথাবার্তায় সবর করুন এবং আমার বান্দা দাউদকে স্মরণ করুন।) এভাবে একটি নতুন বিষয় শুরু করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু দাউদ (আ)-এর ঘটনা এ কথা বলে শেষ করা হয়েছে যে, হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি। সুতরাং তুমি মানুষের মধ্যে ইনসাফ সহকারে ফয়সালা করবে। এখন আলোচ্য আয়াত থেকে এক অননুভূত পন্থায় পরকাল সপ্রমাণ করা হয়েছে। কারণ, যে সত্তা তার প্রতিনিধিকে পৃথিবীতে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করার আদেশ দেয় এবং কুকর্মীদেরকে শাস্তি ও সৎকর্মীদেরকে শান্তি দিতে বলে, সে কি নিজে এই সৃষ্টজগতে সুবিচার ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত করবে না? অবশ্যই সে ভালমন্দ সবাইকে এক লাঠি দিয়ে হাঁকাবার পরিবর্তে পাপাচারী-দেরকে শাস্তি দেবে এবং সৎকর্মপরায়ণদেরকে পুরস্কৃত করবে। এটাই তার প্রজ্ঞার দাবি এবং এটাই জগৎ সৃষ্টির লক্ষ্য। এই লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য কিয়ামত ও পরকাল অবশ্যম্ভাবী। যারা পরকাল অস্বীকার করে, তারা যেন পরোক্ষভাবে এ দাবিই করে যে,

এ জগৎ এমনি উদ্দেশ্যহীন ও অযথা সৃষ্টি করা হয়েছে। এতে ভালমন্দ সব মানুষ জীবন-যাপন করে মরে যাবে এবং এরপর তাদের জিজ্ঞাসাকারী কেউ থাকবে না। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার প্রজ্ঞায় যারা বিশ্বাসী তারা একথা কিছুতেই মেনে নিতে পারে না।

أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا ..... كَالْفُجَّارِ — (আমি কি বিশ্বাসী ও সৎকর্মী-দেরকে পৃথিবীতে ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারীদের সমান গণ্য করে দেব, না পরহিযগারদেরকে পাপাচারীদের সমান করে দেব?) অর্থাৎ এমন কখনও হতে পারে না। বরং উভয় দলের পরিণতি হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন। এ থেকেই জানা গেল যে, পরকালীন বিধানাবলীর ক্ষেত্রে মু'মিন ও কাফিরের মধ্যে পার্থক্য হবে। এ পৃথিবীতে হয়তো এমনটি সম্ভবপর যে, কাফিররা মু'মিন অপেক্ষা বস্তুনিষ্ঠ সুখ-শান্তি প্রাপ্ত হবে। এ থেকে একথাও বলা যায় না যে, ইসলামী রাষ্ট্রে কাফিরের পার্থিব অধিকার মু'মিনের সমান হতে পারে না, বরং কাফিরকে মুসলমানের সমান মানবিক অধিকার দেওয়া যেতে পারে। সেমতে ইসলামী রাষ্ট্রে যেসব অমুসলিম সংখ্যালঘু সম্প্রদায় চুক্তিবদ্ধ হয়ে বসবাস করে, তাদেরকে যাবতীয় মানবিক অধিকার মুসলমানদের সমানই দেওয়া হবে।

وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ ۚ نِعْمَ الْعَبْدُ ۖ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴿٣٠﴾ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ ﴿٣١﴾ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّىٰ تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ﴿٣٢﴾ رُدُّوهَا عَلَيَّ ۖ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ ﴿٣٣﴾

---

(৩০) আমি দাউদকে সোলায়মান দান করেছি। সে একজন উত্তম বান্দা। সে ছিল প্রত্যাবর্তনশীল। (৩১) যখন তার সামনে অপরাহ্নে উৎকৃষ্ট অশ্বরাজি পেশ করা হল, (৩২) তখন সে বলল ঃ আমি তো আমার পরওয়ার দিগারের স্মরণ বিস্মৃত হয়ে সম্পদের মহব্বতে মুগ্ধ হয়ে পড়েছি—এমনকি সূর্য ডুবে গেছে। (৩৩) এগুলোকে আমার কাছে ফিরিয়ে আন। অতপর সে তাদের পা ও গলদেশ ছেদন করতে শুরু করল।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর আমি দাউদ (আ)-কে পুত্র সুলায়মান (আ) দান করেছি। সে ছিল উত্তম বান্দা; (আল্লাহ্‌র দিকে) খুব প্রত্যাবর্তনশীল ছিল। (কাজেই তার সে কাহিনী স্মরণীয়,) যখন (কোন এক) অপরাহ্নে তার সামনে উৎকৃষ্ট (জাতের) অশ্বরাজি (যা জিহাদের উদ্দেশ্যে রাখা হত) উপস্থিত করা হল, (আর সেগুলো পরিদর্শনে এত বিলম্ব হয়ে গেল যে, দিন শেষ হয়ে গেল এবং নামায জাতীয় কোন একটি নিয়মিত

ইবাদত ব্যাহত হয়ে গেল। তাঁর ভীতি ও প্রতাপের কারণে কোন কর্মচারীও তাঁকে এ বিষয়ে অবহিত করতে সাহস পেল না। অবশেষে যখন নিজেই টের পেলেন,) তখন তিনি বললেনঃ আমি আমার পরওয়ারদিগারের স্মরণ (অর্থাৎ নামায) বিস্মৃত হয়ে এই সম্পদের মহব্বতে মগ্ন হয়ে পড়েছি; এমনকি সূর্য আড়ালে (অর্থাৎ অস্তা-চলে) অস্তমিত হয়ে গেছে। (অতপর কর্মচারীদেরকে আদেশ দিলেনঃ) অশ্বরাজিকে আবার আমার সামনে আন। (আদেশ মত আনা হলে) তিনি (তরবারি দ্বারা) সেগুলোর পা ও গলদেশ ছেদন করতে শুরু করলেন। (অর্থাৎ যবেহ্ করে ফেললেন।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহে হযরত সুলায়মান (আ)-এর একটি ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। এ ঘটনার প্রসিদ্ধ বিবরণ তাই, যা উপরে তফসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। এর সারমর্ম এই যে, হযরত সুলায়মান (আ) অশ্বরাজি পরিদর্শনে এমনভাবে মগ্ন হয়ে পড়েন যে, নামায পড়ার নিয়মিত সময় আসর অতিবাহিত হয়ে যায়। পরে সম্বিৎ ফিরে পেয়ে তিনি সমস্ত অশ্ব যবেহ্ করে দেন। কেননা, এগুলোর কারণেই আল্লাহ্র স্মরণ বিঘ্নিত হয়েছিল।

এ নামায নফল হলেও কোন আপত্তির কারণ নেই। কেননা, পয়গম্বরগণ এত-টুকু ক্ষতিও পূরণ করার চেষ্টা করে থাকেন। পক্ষান্তরে তা ফরয নামায হলে ভুলে যাওয়ার কারণে তা কাযা হতে পারে এতে কোন গোনাহ্ হয় না। কিন্তু সুলায়মান (আ) স্বীয় উচ্চ মর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতে এরও প্রতিকার করেছেন।

এ তফসীরটি কয়েকজন তফসীরবিদ থেকে বর্ণিত হয়েছে। হাফেজ ইবনে-কাসীরের ন্যায় অনুসন্ধানী আলিমও এই তফসীরকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। আল্লামা সুয়ূতী বর্ণিত রসূলে করীম (সা)-এর এক উক্তি থেকেও এই তফসীরের সমর্থন পাওয়া যায়। উক্তিটি নিম্নরূপঃ

عن ابى بن كعب عن النبى صلى الله عليه وسلم فى قوله فطفق مسحا بالسوق والاعناق قال قطع سوقها و اعنا قها با السيف -

আল্লামা সুয়ূতীর মতে এ হাদীসের সনদ নির্ভরযোগ্য। আল্লামা হুসায়মী (র) মজমাউয্ যাওয়ায়েদ গ্রন্থে এ হাদীস উদ্ধৃত করে লেখেনঃ

"তিবরানী এ হাদীসটি আওসাতে বর্ণনা করেছেন। এতে একজন বর্ণনাকারী সাঈদ ইবনে বশীর রয়েছেন যাকে শো'বা প্রমুখ নির্ভরযোগ্য বলেছেন এবং ইবনে মুঈন প্রমুখ দুর্বল বলেছেন। অবশিষ্ট সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য।"

এ হাদীসের কারণে বর্ণিত তফসীরটি খুব মজবুত। কিন্তু এতে সন্দেহ হয় যে, অশ্বরাজি আল্লাহ্ প্রদত্ত একটি পুরস্কার ছিল। নিজের সম্পদকে এভাবে বিনষ্ট করা একজন পয়গম্বরের পক্ষে শোভা পায় না। কিন্তু তফসীরবিদগণ এর জওয়াবে বলেন

যে, এ অশ্বরাজি সুলায়মান (আ)-এর ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ছিল। তার শরীয়তে গরু, ছাগল ও উটের ন্যায় অশ্ব কোরবানী করাও বৈধ ছিল। তাই তিনি অশ্বরাজি বিনষ্ট করেননি; বরং আল্লাহ্‌র নামে কোরবানী করেছেন। গরু, ছাগল ও উট কোরবানী করলে যেমন তা বিনষ্ট করা হয় না, অশ্বরাজির বেলায়ও তাই হয়েছে। (রূহুল মা'আনী)

কিন্তু আলোচ্য আয়াতসমূহের আরও একটি তফসীর হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে। তাতে ঘটনাটি সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে বর্ণনা করা হয়েছে। এই তফসীরের সারমর্ম এই যে, হযরত সোলায়মান (আ)-এর সামনে জিহাদের জন্য তৈরি অশ্বরাজি পরিদর্শনের নিমিত্তে পেশ করা হলে সেগুলো দেখে তিনি খুব আনন্দিত হন। সাথে সাথে তিনি বললেনঃ এই অশ্বরাজির প্রতি আমার যে মহব্বত ও মনের টান, তা পার্থিব মহব্বতের কারণে নয়; বরং আমার পালনকর্তার স্মরণের কারণেই। কারণ এগুলো জিহাদের উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে। জিহাদ একটি উচ্চস্তরের ইবাদত। ইতিমধ্যে অশ্বরাজির দল তাঁর দৃষ্টি থেকে উধাও হয়ে গেল। তিনি আদেশ দিলেনঃ এগুলোকে আবার আমার সামনে উপস্থিত কর। সেমতে পুনরায় উপস্থিত করা হলে তিনি অশ্বরাজির গলদেশে ও পায়ে আদর করে হাত বুলালেন।

এই তফসীর অনুযায়ী عَنْ ذِكْرِ رَبِّي বাক্যে عَنْ কারণার্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং رُدُّوْهَا-এর সর্বনাম দ্বারা অশ্বরাজিই বোঝানো হয়েছে। এখানে مَسْحٌ-এর অর্থ কর্তন করা নয়। বরং আদর করে হাত বুলানো।

প্রাচীন তফসীরবিদগণের মধ্যে হাফেজ ইবনে-জরীর, তাবারী, ইমাম রাযী প্রমুখ এ তফসীরকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কেননা, এই তফসীর অনুযায়ী সম্পদ নষ্ট করার সন্দেহ হয় না।

কোরআন পাকের ভাষাদৃষ্টে উভয় তফসীরের অবকাশ আছে। কিন্তু প্রথম তফসীরের পক্ষে একটি হাদীস থাকায় তার শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে।

সূর্য ফিরিয়ে আনার কাহিনীঃ কেউ কেউ প্রথম তফসীর অবলম্বন করে আরও বলেছেন যে, আসরের নামায কাযা হয়ে যাওয়ার পর সোলায়মান (আ) আল্লাহ্ তা'আলার কাছে অথবা ফেরেশতাগণের কাছে সূর্যকে পুনরায় ফিরিয়ে আনার নিবেদন জানান। সেমতে সূর্যকে ফিরিয়ে আনা হলে তিনি নিয়মিত ইবাদত পূর্ণ করেন। এরপর পুনরায় সূর্য অস্তমিত হয়। তাদের মতে رُدُّوْهَا বাক্যের সর্বনাম দ্বারা সূর্য বোঝানো হয়েছে।

কিন্তু আল্লামা আলুসী প্রমুখ অনুসন্ধানী তফসীরবিদগণ এই কাহিনী খণ্ডন করে বলেছেনঃ رُدُّوْهَا বাক্যের সর্বনাম দ্বারা অশ্বরাজিই বোঝানো হয়েছে—সূর্য নয়।

এর কারণ এটা নয় যে, সূর্যকে পুনরায় ফিরিয়ে আনার ক্ষমতা আল্লাহ্ তা'আলার নাই; বরং কারণ এই যে, এ কাহিনী কোরআন ও হাদীসের কোন দলীল দ্বারা প্রামাণ্য নয়।---(রূহুল মা'আনী)

আল্লাহ্র স্মরণে শৈথিল্য হলে নিজের উপর শাস্তি নির্ধারণ করা ধর্মীয় মর্যাদা-বোধের দাবিঃ সর্বাবস্থায় এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোন সময় আল্লাহ্র স্মরণে শৈথিল্য হয়ে গেলে নিজেকে শাস্তি দেওয়ার জন্য কোন মুবাহ্ (অনুমোদিত) কাজ থেকে বঞ্চিত করে দেওয়া জায়েয। সূফী বুযুর্গগণের পরিভাষায় একে 'গায়রত' বলা হয়।---(বয়ানুল কোরআন)

কোন সৎকাজের অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য নিজের উপর এধরনের শাস্তি নির্ধারণ করা আত্মশুদ্ধির একটি ব্যবস্থা। এ ঘটনা থেকে এর বৈধতা বরং পছন্দনীয়তা জানা যায়। হুযুরে আকরাম (সা) থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার আবূ জুহায়ম (রা) তাঁকে একটি শামী চাদর উপহার দেন। চাদরটি ছিল কারুকার্যখচিত। তিনি চাদর পরিধান করে নামায পড়লেন এবং ফিরে এসে হযরত আয়েশাকে বললেন, চাদরটি আবূ জুহায়মের কাছে ফেরত পাঠিয়ে দাও। কেননা নামাযে আমার দৃষ্টি এর কারুকার্যের উপর পড়ে গিয়েছিল এবং আমার মনোনিবেশে বিপর্যয় সৃষ্টি হওয়ার উপক্রম হয়েছিল।---(আহকামুল কোরআন)

এমনিভাবে হযরত আবূ তালহা (রা) একবার তাঁর বাগানে নামাযরত অবস্থায় একটি পাখীকে দেখায় মশগুল হয়ে যান। ফলে নামাযের নিবিষ্টতা নষ্ট হয়ে যায়। পরে তিনি বাগানটি সদকা করে দেন।

কিন্তু স্মরণ রাখা দরকার যে, এই উদ্দেশ্যের জন্য বৈধ শাস্তি নির্ধারণ করা উচিত। কারণ, অহেতুক কোন সম্পদ বিনষ্ট করা জায়েয নয়। সুতরাং সম্পদ বিনষ্ট হয়, এরূপ কোন কাজ করা বৈধ নয়। সূফীগণের মধ্যে হযরত শিবলী (র) একবার এ ধরনের শাস্তি হিসাবে তাঁর বস্ত্র জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন; কিন্তু শায়খ আবদুল ওয়াহ্হাব শে'রানী (র)-র মত অনুসন্ধানী সূফী বুযুর্গগণ তার এই কর্মকে সঠিক বলে আখ্যা দেন নি।---(রূহুল মা'আনী)

ব্যক্তিগতভাবে রাজ্যের কাজকর্ম দেখাশোনা করা শাসনকর্তার উচিতঃ এ ঘটনা থেকে আরও জানা যায় যে, রাষ্ট্রের দায়িত্বশীল উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার অধীনস্থ বিভাগ-সমূহের কাজকর্ম স্বয়ং দেখাশোনা করা উচিত; কাজকর্ম অধীনস্থদের উপর ছেড়ে নিশ্চিন্ত বসে থাকা উচিত নয়। এ কারণেই হযরত সোলায়মান (আ) অধীনস্থদের প্রাচুর্য সত্ত্বেও স্বয়ং অশ্বরাজি পরিদর্শন করেন। খলিফা হযরত উমর (রা)-এর কর্ম থেকেও তাই প্রমাণিত আছে।

এক ইবাদতের সময় অন্য ইবাদতে মশগুল থাকা ভুলঃ এ ঘটনা থেকে আরও প্রমাণিত হয় যে, এক ইবাদতের নির্দিষ্ট সময় অন্য ইবাদতে ব্যয় করা অনুচিত। বলা বাহুল্য, জিহাদের অশ্ব পরিদর্শন করা একটি বৃহত্তম ইবাদত, কিন্তু সময়টি ছিল এ

ইবাদতের পরিবর্তে নামাযের জন্য নির্দিষ্ট। তাই হযরত সোলায়মান (আ) একে ভুল গণ্য করে তার প্রতিকার করেছেন। এ কারণেই আমাদের ফিকাহ্‌বিদগণ লিখেন ঃ জুম'আর আযানের পর যেমন ক্রয়বিক্রয়ে মশগুল থাকা জায়েয নয়, তেমনি জুম'আর নামাযের প্রস্তুতি ছাড়া অন্য কোন কাজে মশগুল হওয়াও বৈধ নয়, যদিও তা তিলাওয়াতে-কোরআন অথবা নফল পড়ার ইবাদত হয়।

وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمٰنَ وَاَلْقَيْنَا عَلٰى كُرْسِيِّهٖ جَسَدًا ثُمَّ اَنَابَ ۝٣٤

---

(৩৪) আমি সোলায়মানকে পরীক্ষা করলাম এবং রেখে দিলাম তার সিংহাসনের উপর একটি নিষ্প্রাণ দেহ। অতপর সে রুজু হল।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি সোলায়মান (আ)-কে (অন্য এক উপায়েও) পরীক্ষা করলাম এবং তার সিংহাসনের উপর রেখে দিলাম একটি নিষ্প্রাণ দেহ। অতপর তিনি (আল্লাহ্‌র দিকে) রুজু হলেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত সোলায়মান (আ)-এর আরও একটি পরীক্ষা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এক্ষেত্রে কেবল এতটুকু বলা হয়েছে যে, এই পরীক্ষার সময় একটি নিষ্প্রাণ দেহ সোলায়মান (আ)-এর সিংহাসনে রেখে দেওয়া হয়েছিল। এখন সে নিষ্প্রাণ দেহটি কি ছিল, একে সিংহাসনে রাখার অর্থ কি এবং এর মাধ্যমে পরীক্ষা কিভাবে হল, এসব বিবরণ কোরআন পাকে বিদ্যমান নেই এবং কোন সহীহ্ হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত নেই। তাই হাফেয ইবনে কাসীরের সে মনোভাব এখানেও তাই দেখা যায় যে, কোরআন পাক যে বিষয়কে অস্পষ্ট রেখে দিয়েছে, তার বিশদ বিবরণ দেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। কেবল এ বিষয়ের উপর ঈমান রাখা উচিত যে, আল্লাহ্ তা'আলা সোলায়মান (আ)-কে কোন ভাবে পরীক্ষা করেছিলেন, যার ফলে তিনি আল্লাহ্‌র দিকে আরও বেশি রুজু হয়েছিলেন। এতেই কোরআন পাকের আসল লক্ষ্য অর্জিত হয়ে যায়।

তবে কোন কোন তফসীরবিদ এ পরীক্ষার বিবরণ খোঁজ করারও প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁরা এ ক্ষেত্রে একাধিক সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে কোন কোনটি নির্ভেজাল ইসরাঈলী রেওয়ায়েত থেকে গৃহীত। উদাহরণত হযরত সোলায়মান (আ)-এর রাজত্বের রহস্য তাঁর আংটির মধ্যে নিহিত ছিল। একদিন এক শয়তান এই আংটি করায়ত্ত করে নেয় এবং এর কারণে সে সোলায়মান (আ)-এর সিংহাসনে তাঁরই আকৃতি ধারণ করে বাদশাহ্ রূপে জেঁকে বসে। চল্লিশ দিন পর সোলায়মান (আ) সে আংটি

একটি মাছের পেট থেকে উদ্ধার করেন এবং পুনরায় সিংহাসন লাভ করতে সমর্থ হন। এই রেওয়ায়েতটি আরও কতিপয় কাহিনীসহ কয়েকটি তফসীরগ্রন্থেও উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু হাফেজ ইবনে কাসীর এ ধরনের সমস্ত রেওয়ায়েতই ইসরাঈলী গণ্য করার পর লিখেন ঃ

"আহলে-কিতাবের একটি দল হযরত সোলায়মান (আ)-কে পয়গম্বর বলেই মানে না। বাহ্যত এসব মিথ্যা কাহিনী তাদেরই অপকীর্তি।" সুতরাং এ ধরনের রেওয়ায়েতকে আলোচ্য আয়াতের তফসীর বলা কিছুতেই জায়েয নয়।

হযরত সোলায়মান (আ)-এর আরও একটি ঘটনা সহীহ্ বুখারী ইত্যাদি কিতাবে বর্ণিত আছে। আলোচ্য আয়াতের সাথে এ ঘটনার কিছু সাদৃশ্য দেখে কেউ কেউ একে আলোচ্য আয়াতের তফসীর বলে সাব্যস্ত করেছেন। ঘটনার সারমর্ম এই ঃ একবার হযরত সোলায়মান (আ) স্বীয় মনোভাব ব্যক্ত করলেন যে, এ রাত্রিতে আমি সকল বিবির সঙ্গে সহবাস করব এবং তাদের প্রত্যেকের গর্ভ থেকে এক একটি পুত্র সন্তান জন্ম-গ্রহণ করবে। তারা আল্লাহ্র পথে জিহাদ করবে। কিন্তু এ মনোভাব ব্যক্ত করার সময় তিনি 'ইনশাআল্লাহ্' বলতে ভুলে গেলেন। একজন মহামান্য পয়গম্বরের এ ত্রুটি আল্লাহ্ তা'আলা পছন্দ করলেন না এবং তিনি তার দাবি ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করে দিলেন। ফলে সকল বিবির মধ্যে মাত্র একজনের গর্ভ থেকে একটি মৃত ও পার্শ্ববিহীন সন্তান ভূমিষ্ঠ হল।

কোন কোন তফসীরবিদ এ ঘটনার ভিত্তিতে বলেন ঃ সিংহাসনে নিষ্প্রাণ দেহ রাখার অর্থ এই যে, সোলায়মান (আ)-এর জনৈক চাকর এ মৃত সন্তানকে এনে তাঁর সিংহাসনে রেখে দেয়। এতে সোলায়মান (আ) বুঝে নেন যে, এটা তাঁর ইনশাআল্লাহ্ না বলার ফল। সেমতে তিনি আল্লাহ্র দিকে রুজু হলেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করলেন।

কাযী আবুস সউদ, আল্লামা আলূসী প্রমুখের মত কতিপয় বিজ্ঞ তফসীরবিদও এ তফসীর অবলম্বন করেছেন। হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (র) বয়ানুল কোরআনেও তদনুরূপ তফসীর করেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ ঘটনাকেও আয়াতের অকাট্য তফসীর বলা যায় না। কারণ, এ ঘটনার সবগুলো রেওয়ায়েতের মধ্যে কোথাও এরূপ নিদর্শন পাওয়া যায় না যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) ঘটনাটি আলোচ্য আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন। ইমাম বুখারীর হাদীসটি কিতাবুল জিহাদ, কিতাবুল আম্বিয়া, কিতাবুল আইমান প্রভৃতি অধ্যায়ে একাধিক তরীকায় উল্লেখ করেছেন, কিন্তু কিতাবুত্ তফসীরে সূরা ছোয়াদের তফসীর প্রসংগে কোথাও এর উল্লেখ নেই। বরং وَهَبْ لِي مُلْكًا আয়াতের অধীনে অন্য একটি রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন। অথচ এই হাদীসের কোন বরাত পর্যন্ত দেননি। এ থেকে বোঝা যায় যে, ইমাম বুখারীর মতেও হাদীসটি আলোচ্য আয়াতের তফসীর নয়; বরং রসূলুল্লাহ্ (সা) অন্যান্য পয়গম্বরের যেমন অন্যান্য আরও

অনেক ঘটনা বর্ণনা করেছেন, তেমনিভাবে এটাও একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা। এটা কোন আয়াতের তফসীর হওয়া জরুরী নয়।

তৃতীয় এক তফসীর ইমাম রাযী প্রমুখ বর্ণনা করেছেন। তা এই যে, সোলায়-মান (আ) একবার গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। ফলে এত দুর্বল হয়ে পড়েন যে, যখন তাঁকে সিংহাসনে বসানো হত, তখন মনে হত যেন একটি নিষ্প্রাণ দেহ সিংহাসনে রেখে দেওয়া হয়েছে। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে সুস্থতা দান করেন। তখন তিনি আল্লাহ্র দিকে রুজু হয়ে শুকরিয়া আদায় করেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এছাড়া তিনি ভবিষ্যতের জন্য নজিরবিহীন রাজত্বের জন্যও দোয়া করেন।

কিন্তু এ তফসীরও অনুমানভিত্তিক। কোরআন পাকের ভাষার সাথে এর তেমন মিল নেই এবং কোন রেওয়ায়েতেও এর প্রমাণ পাওয়া যায় না।

বাস্তব সত্য এই যে, আলোচ্য আয়াতে যে ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, তার নিশ্চিত বিবরণ জানার কোন উপায় আমাদের কাছে নেই। আমরা এ জন্য আদিষ্টও নই। সুতরাং এতটুকু ঈমান রাখাই যথেষ্ট যে, আল্লাহ্ তা'আলা সোলায়মান (আ)-কে কোন পরীক্ষা করেছিলেন, যার ফলে তিনি আল্লাহ্র দিকে অধিকতর রুজু হয়েছেন।

কোরআন পাকে এই ঘটনা উল্লেখ করার আসল উদ্দেশ্য মানুষকে দাওয়াত দেওয়া যে, তারা কোন বিপদাপদ অথবা পরীক্ষায় পতিত হলে তাদের পক্ষেও সোলায়মান (আ)-এর মত আল্লাহ্র দিকে পূর্বাপেক্ষা অধিক রুজু হওয়া উচিত। বস্তুত সোলায়-মান (আ)-এর পরীক্ষার বিষয়টির বিস্তারিত বিবরণ আল্লাহ্ তা'আলার উপর সমর্পণ করাই বাঞ্ছনীয়।

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي ۖ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ ﴿٣٥﴾ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ ﴿٣٦﴾ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ ﴿٣٧﴾ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ﴿٣٨﴾ هَٰذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٩﴾ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ ﴿٤٠﴾

(৩৫) সোলায়মান বলল ঃ হে আমার পালনকর্তা, আমাকে মাফ করুন এবং আমাকে এমন সাম্রাজ্য দান করুন যা আমার পরে আর কেউ পেতে পারবে না। নিশ্চয় আপনি মহাদাতা। (৩৬) তখন আমি বাতাসকে তার অনুগত করে দিলাম, যা তার হুকুমে অবাধে প্রবাহিত হত যেখানে সে পৌঁছাতে চাইত। (৩৭) আর সকল শয়তানকে তার অধীন করে দিলাম অর্থাৎ যারা ছিল প্রাসাদ নির্মাণকারী ও ডুবুরী (৩৮) এবং অন্য আরও অনেককে অধীন করে দিলাম, যারা আবদ্ধ থাকত শৃংখলে। (৩৯)

এগুলো আমার অনুগ্রহ, অতএব এগুলো কাউকে দাও অথবা নিজে রেখে দাও—এর কোন হিসাব দিতে হবে না। (৪০) নিশ্চয় তার জন্য আমার কাছে রয়েছে মর্যাদা ও শুভ পরিণতি।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

[হযরত সোলায়মান (আ) আল্লাহ্‌র কাছে] দোয়া করলেন, হে আমার পালনকর্তা, আমার (বিগত) ত্রুটি ক্ষমা করুন এবং (ভবিষ্যতের জন্য) আমাকে এমন সাম্রাজ্য দান করুন, যা আমাকে ছাড়া (আমার আমলে) কেউ পেতে পারবে না (কোন অদৃশ্য সাজসরঞ্জাম দান করুন, অথবা আমার সমসাময়িক রাজন্যবর্গকে এমনিতেই পরাভূত করে দিন, যাতে কেউ আমার মুকাবিলা করতে সমর্থ না হয়)। আপনি মহাদাতা (এ দোয়া কবুল করা আপনার জন্য কঠিন নয়)। তখন (আমি তার দোয়া কবুল করলাম এবং তার ত্রুটি ক্ষমা করে দিলাম। এছাড়া) আমি বাতাসকে তার অনুগত করে দিলাম, যা তাঁর হুকুমে অবাধে প্রবাহিত হত যেখানে সে যেতে চাইত (ফলে অশ্বরাজির প্রয়োজন থাকেনি)। জিনদেরকেও তাঁর অধীন করে দিলাম অর্থাৎ প্রাসাদ নির্মাণকারীদেরকে এবং (মণিমুক্তা আহরণের জন্য) ডুবুরীদেরকে এবং অন্য আরও অনেক জিনকে যারা শৃংখলে আবদ্ধ থাকত। (সম্ভবত অর্পিত দায়িত্ব পালন না করা অথবা তাতে ত্রুটি করার কারণে তাদেরকে শাস্তিস্বরূপ শৃংখলিত করা হত। এসব সাজসরঞ্জাম দান করে আমি বললাম ঃ) এগুলো আমার দান। অতএব এগুলো কাউকে দাও অথবা না দাও, এজন্য তোমাকে হিসাব দিতে হবে না। (অর্থাৎ আমি তোমাকে যেসব সাজসরঞ্জাম দিলাম, এতে অন্যান্য রাজা-বাদশাহ্‌র ন্যায় তোমাকে কেবল কোষাধ্যক্ষ ও ব্যবস্থাপকই নিযুক্ত করিনি, বরং তোমাকে মালিকও করে দিলাম। দুনিয়াতে প্রদত্ত এসব সাজসরঞ্জাম ছাড়াও) তাঁর জন্য আমার কাছে রয়েছে (বিশেষ) নৈকট্য ও (উচ্চ পর্যায়ের) শুভ পরিণতি (যার ফলাফল পূর্ণরূপে পরকালে প্রকাশ পাবে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

هَبْ لِىْ مُلْكًا لَّا يَنْۢبَغِىْ لِاَحَدٍ مِّنْ ۢبَعْدِىْ—(আমাকে এমন সাম্রাজ্য দিন যা আমার পরে কেউ পেতে পারবে না।) কেউ কেউ এ দোয়ার অর্থ বর্ণনা করেছেন যে, আমার আমলে আমার মত বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী অন্য কেউ যেন না হয়। তাঁদের মতে 'আমার পরে' শব্দটির অর্থ 'আমাকে ছাড়া'। হযরত থানভীও এরূপ অনুবাদই করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে এ দোয়ার অর্থ এই যে, আমার পরেও কেউ যেন এরূপ সাম্রাজ্যের অধিকারী না হয়। সুতরাং বাস্তবেও তাই দেখা যায়। হযরত সুলায়মান (আ)-কে যেরূপ সাম্রাজ্য দান করা হয়েছিল, তেমন রাজত্বের অধিকারী পরবর্তীকালেও কেউ হতে পারেনি। কেননা বাতাস অধীনস্থ হওয়া, জিন জাতির বশীভূত হওয়া এগুলো পরবর্তীকালে কেউ লাভ করতে পারেনি।

কেউ কেউ বিভিন্ন আমল ও সাধনার মাধ্যমে কোন কোন জিনকে বশীভূত করে নেয়। এটা তার পরিপন্থী নয়। কেননা, হযরত সুলায়মান (আ)-এর জিন বশীভূতকরণের সাথে এর কোন তুলনাই হয় না। আমল বিশেষজ্ঞরা দু'একজন অথবা কয়েকজন জিনকে বশীভূত করে নেয়; কিন্তু সোলায়মান (আ) জিনদের উপর যেরূপ সর্বব্যাপী রাজত্ব কায়েম করেছিলেন, তদ্রূপ কেউ কায়েম করতে পারেনি।

রাজত্ব ও শাসন ক্ষমতা লাভের দোয়া ঃ এখানে স্মরণ রাখা দরকার যে, পয়গম্বরগণের কোন দোয়া আল্লাহ্ তা'আলার অনুমতি ব্যতিরেকে হয় না। হযরত সোলায়মান (আ) এ দোয়াটিও আল্লাহ্র অনুমতিক্রমেই করেছিলেন। ক্ষমতা লাভই এর উদ্দেশ্য ছিল না, বরং এর পেছনে আল্লাহ্ তা'আলার বিধানাবলী প্রয়োগ করা ও সত্যকে সমুন্নত করার অনুপ্রেরণাই কার্যকর ছিল। আল্লাহ্ তা'আলা জানতেন যে, রাজত্ব লাভের পর সোলায়মান (আ) এসব মহৎ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্যই কাজ করবেন এবং প্রতিপত্তি লাভের বাসনা তাঁর অন্তরে স্থান পাবে না। তাই তাঁকে এরূপ দোয়ার অনুমতি দেওয়া হয় এবং তা কবুলও করা হয়। কিন্তু সাধারণ মানুষের জন্য নিজের পক্ষ থেকে শাসনক্ষমতা প্রার্থনা করা হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ, এতে প্রভাব-প্রতিপত্তি ও ধনসম্পদ লাভের কামনা-বাসনা শামিল হয়ে যায়। সেমতে কেউ যদি এরূপ বাসনা থেকে মুক্ত থাকবে বলে দৃঢ় বিশ্বাসী হয় এবং সত্যকে সমুন্নত করা ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে ক্ষমতা লাভ করার প্রত্যাশী না হয়, তবে তার জন্য রাজত্ব লাভের দোয়া করা বৈধ।---(রূহুল মা'আনী)

مُقَرَّنِيْنَ فِى الْاَصْفَادِ ---(শৃংখলিত অবস্থায়---) জিন জাতিকে বশীকরণ এবং তারা যে যে কাজ করত, তার বিবরণ সূরা সাবায় বর্ণিত হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে যে, অবাধ্য জিনদেরকে সোলায়মান (আ) শিকলে আবদ্ধ করে রেখেছিলেন। এখন এটা জরুরী নয় যে, এগুলো দৃষ্টিগ্রাহ্য লোহার শিকলই হবে। বরং জিনদেরকে আবদ্ধ করার জন্য অন্য কোন পন্থাও অবলম্বন করা সম্ভব, যা সহজে বোঝাবার জন্য এখানে শিকল বলে ব্যক্ত করা হয়েছে।

وَاذْكُرْ عَبْدَنَآ اَيُّوْبَ ۘ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗٓ اَنِّيْ مَسَّنِيَ الشَّيْطٰنُ بِنُصْبٍ وَّعَذَابٍ ۝٤١ اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ ۚ هٰذَا مُغْتَسَلٌۢ بَارِدٌ وَّشَرَابٌ ۝٤٢ وَوَهَبْنَا لَهٗٓ اَهْلَهٗ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرٰى لِاُولِي الْاَلْبَابِ ۝٤٣ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِّهٖ وَلَا تَحْنَثْ ۗ اِنَّا وَجَدْنٰهُ صَابِرًا ۗ نِعْمَ الْعَبْدُ ۗ اِنَّهٗٓ اَوَّابٌ ۝٤٤

(৪১) স্মরণ করুণ আমার বান্দা আইউবের কথা, যখন সে তার পালনকর্তাকে আহ্বান করে বললঃ শয়তান আমাকে যন্ত্রণা ও কষ্ট পৌঁছিয়েছে। (৪২) তুমি তোমার পা দিয়ে ভূমিতে আঘাত কর। ঝরনা নির্গত হল গোসল করার জন্য শীতল ও পান করার জন্য। (৪৩) আমি তাকে দিলাম তার পরিজনবর্গ ও তাদের মত আরও অনেক আমার পক্ষ থেকে রহমতস্বরূপ এবং বুদ্ধিমানদের জন্য উপদেশস্বরূপ। (৪৪) তুমি তোমার হাতে এক মুঠো তৃণ-শলা নাও, তা দ্বারা আঘাত কর এবং শপথ ভঙ্গ করো না। আমি তাকে পেলাম সবরকারী। চমৎকার বান্দা সে। নিশ্চয় সে ছিল প্রত্যাবর্তনশীল।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি আমার বান্দা আইয়্যুব (আ)-কে স্মরণ করুন, যখন সে তার পালন-কর্তাকে আহ্বান করে বললঃ শয়তান আমাকে যন্ত্রণা ও কষ্টে ফেলেছে। [এই যন্ত্রণা ও কষ্ট কি ছিল, এ সম্পর্কে ইমাম আহমদ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত আইয়্যুব (আ)-এর অসুস্থতার সময় শয়তান চিকিৎসকের বেশে আইউব (আ)-এর পত্নীর সাথে সাক্ষাৎ করেছিল। তিনি তাকে চিকিৎসক মনে করে চিকিৎসা করতে অনুরোধ করলেন। সে বললঃ এই শর্তে চিকিৎসা করতে পারি যে, আরোগ্য লাভ করলে এ কথা বলতে হবেঃ "তুমি তাকে আরোগ্য দান করেছ।" এ উক্তি ছাড়া আমি অন্য কিছু নজরানা চাই না। পত্নী আইয়্যুব (আ)-কে এ কথা জানালে তিনি বললেন, হায়রে তোমার সরলতা, সে তো শয়তান ছিল। আমি প্রতিজ্ঞা করছি, যদি আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে আরোগ্য দান করেন, তবে তোমাকে একশ' বেত্রাঘাত করব। এ ঘটনা থেকে আইয়্যুব (আ) ভীষণ কষ্ট পেলেন। তাঁর অসুস্থতার সুযোগে শয়তানের এতদূর দুঃসাহস হয়েছে যে, বিশেষ করে তাঁর পত্নীর মুখ দিয়ে এমন বাক্য উচ্চারণ করাতে চেয়েছে, যা বাহ্যত শিরকের কারণ। হযরত আইউব (আ) রোগ দূরীকরণের জন্য পূর্বেও দোয়া করেছিলেন; কিন্তু এ ঘটনার পর তিনি আরও বেশি কাকুতি-মিনতি সহকারে দোয়া করলেন। সুতরাং আমি তার দোয়া কবূল করলাম এবং আদেশ দিলামঃ] তুমি তোমার পা দিয়ে ভূমিতে আঘাত কর। (বস্তুত আঘাত করার পর) সেখানে একটি ঝরনা সৃষ্টি হয়ে গেল। (অতপর আমি তাকে বললামঃ) এটা (তোমার জন্য) গোসলের ও পান করার শীতল পানি। (অর্থাৎ এ থেকে গোসল কর এবং পান কর। গোসল ও পান করার পর সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেল) আমি তাকে দান করলাম তার পরিবারবর্গ এবং তাদের মত (গণনায়) আরও অনেক (দিলাম) আমার বিশেষ রহমতের কারণে এবং বুদ্ধিমানদের জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকার কারণে। [অর্থাৎ বুদ্ধিমানরা স্মরণ রাখবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা সবরকারীদেরকে কিরূপ প্রতিদান দেন। অতপর আইয়্যুব (আ) প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করার ইচ্ছা করলেন। যেহেতু তাঁর পত্নী অসুস্থ অবস্থায় তাঁর অসাধারণ সেবা-শুশ্রূষা করেছিলেন এবং কোন গোনাহেও জড়িত ছিলেন না, তাই আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় রহমতে তাঁর শাস্তি হাল্কা করে দিলেন এবং বললেনঃ

হে আইউব,] তুমি তোমার হাতে একমুঠো চিকন শলা নাও (যাতে একশ' শলা থাকবে) অতপর তা দ্বারা আঘাত কর এবং প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করো না। [সেমতে তাই করা হল। অতপর আইয়্যুব (আ)-এর প্রশংসা করা হচ্ছে---] নিশ্চয় আমি তাকে (খুব) সবরকারী পেয়েছি। সে ছিল বড়ই ভাল, (আল্লাহ্‌র দিকে) বড়ই প্রত্যাবর্তনশীল।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

রসূলে করীম (সা)-কে সবর শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে এখানে আইয়্যুব (আ)-এর কাহিনী উল্লেখ করা হয়েছে। এ কাহিনীর বিস্তারিত বিবরণ সূরা আম্বিয়ায় বর্ণিত হয়েছে। এখানে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় বর্ণিত হচ্ছে ঃ

مَسَّنِىَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَّعَذَابٍ— (শয়তান আমাকে যন্ত্রণা ও কষ্ট দিয়েছে।)

এ যন্ত্রণা ও কষ্টের বিবরণ দিতে গিয়ে কোন কোন তফসীরবিদ বলেন, হযরত আইউব (আ) যে রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন, তা শয়তানের প্রবলতার কারণে দেখা দিয়েছিল। ঘটনা এই যে, একবার ফেরেশতাগণ আইয়্যুব (আ)-এর খুব প্রশংসা করলে শয়তান প্রতিহিংসায় অস্থির হয়ে গেল। সে আল্লাহ্‌র দরবারে হাত তুলে প্রার্থনা করল ঃ আমাকে তার দেহ, ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততির উপর এমন প্রবলতা দেওয়া হোক, যদ্দ্বারা আমি তার সাথে যা ইচ্ছা তাই করতে পারি। আল্লাহ্ তা'আলারও উদ্দেশ্য ছিল আইউব (আ)-কে পরীক্ষা করা। তাই শয়তানকে তার প্রার্থিত অধিকার দেওয়া হল। অতপর সে তাঁকে রোগাক্রান্ত করে দিল।

কিন্তু বিজ্ঞ তফসীরবিদগণ এ কাহিনী খণ্ডন করে বলেন ঃ কোরআন পাকের বর্ণনা অনুযায়ী শয়তান পয়গম্বরগণের উপর প্রবলতা অর্জন করতে পারে না। তাই এটা সম্ভব নয় যে, শয়তান আইউব (আ)-কে রোগাক্রান্ত করে দেবে।

কেউ কেউ বলেন, রুগ্নাবস্থায় শয়তান হযরত আইয়্যুব (আ)-এর অন্তরে কুমন্ত্রণা জাগ্রত করত। এতে তিনি আরও অধিক কষ্ট অনুভব করতেন। আলোচ্য আয়াতে তাই উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এর সর্বোৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা তাই যা উপরে তফসীরের সার সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে।

হযরত আইয়্যুব (আ)-এর রোগ কি ছিল? কোরআন পাকে কেবল বলা হয়েছে যে, আইউব (আ) কোন গুরুতর রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু রোগটি কি ছিল তা উল্লেখ করা হয়নি। হাদীসেও রসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে এর কোন বিবরণ বর্ণিত নেই। তবে কোন কোন সাহাবীর উক্তি থেকে জানা যায় যে, তাঁর সর্বাঙ্গে ফোড়া হয়ে গিয়েছিল। ফলে ঘৃণাভরে লোকেরা তাঁকে একটি আবর্জনার স্তূপে রেখে দিয়েছিল। কিন্তু গবেষক তফসীরবিদগণ এ রেওয়ায়েতের সত্যতা স্বীকার করেন নি। তাঁরা বলেন, মানুষের ঘৃণা উদ্রেক করার মত কোন রোগে পয়গম্বরগণকে আক্রান্ত করা হয় না। সুতরাং হযরত আইয়্যুব (আ)-এর রোগও এমন হতে পারে না, বরং এটা কোন

সাধারণ রোগই ছিল। কাজেই উপরোক্ত রেওয়ায়েত নির্ভরযোগ্য নয়।——(রাহুল মা'আনী, আহ্‌কামুল কোরআন থেকে সংক্ষেপিত)

خُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا——(তুমি তোমার হাতে এক মুঠো তৃণশলা লও।) এ ঘটনার পটভূমিকা তফসীরের সার-সংক্ষেপে এসে গেছে। এখানে এ সম্পর্কে কয়েকটি মাস'আলা বর্ণনা করা হচ্ছে।

প্রথম এই যে, এ ঘটনা থেকে জানা গেল, যদি কোন ব্যক্তি কাউকে একশ' বেত্রাঘাত করার প্রতিজ্ঞা করে এবং পরে পৃথক পৃথক একশ' বেত্রাঘাত করার পরিবর্তে সবগুলো বেতের একটি আঁটি তৈরি করে নিয়ে তদ্দ্বারা একবার আঘাত করে, তবে তাঁর প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হয়ে যায়। তাই হযরত আইয়্যুব (আ)-কে এরূপ করার হুকুম করা হয়েছিল। ইমাম আবূ হানীফার মাযহাব তাই। কিন্তু আল্লামা ইবনে হুমাম লিখেছেন যে, এর জন্য দু'টি শর্ত রয়েছে——১. সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির গায়ে প্রত্যেকটি বেত দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে লাগতে হবে এবং ২. এর কারণে কিছু না কিছু কষ্ট অবশ্যই পেতে হবে। যদি মোটেই কষ্ট না পায়, তবে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হবে না। হযরত থানভী বয়ানুল কোর-আনে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হওয়ার যে উক্তি করেছেন, তার অর্থও সম্ভবত তাই। নতুবা হানাফী ফকীহ্‌গণ পরিষ্কার উল্লেখ করেছেন যে, উপরোক্ত শর্তদ্বয়সহ আঘাত করা হলে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হয়ে যায়।——(ফতহুল কাদীর)

শরীয়তের দৃষ্টিতে কৌশল ঃ দ্বিতীয় মাস'আলা এই যে, কোন অসমীচীন অথবা মকরূহ বিষয় থেকে আত্মরক্ষার জন্য শরীয়তসম্মত কোন কৌশল অবলম্বন করা জায়েয। বলা বাহুল্য, হযরত আইয়্যুব (আ)-এর প্রতিজ্ঞার আসল দাবি এই যে, তিনি তাঁর স্ত্রীকে পূর্ণ একশ' বেত্রাঘাত করবেন। কিন্তু তাঁর পত্নী যেহেতু নিরপরাধ ছিলেন এবং স্বামীর নজিরবিহীন সেবাশুশ্রূষা করেছিলেন, তাই আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং আইয়্যুব (আ)-কে একটি কৌশল শিক্ষা দিলেন এবং বলে দিলেন যে, এভাবে তাঁর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। তাই ঘটনাটি কৌশলের বৈধতা জ্ঞাপন করে।

কিন্তু স্মরণ রাখা দরকার যে, এ ধরনের কৌশল অবলম্বন করা তখনই জায়েয, যখন একে শরীয়তসম্মত উদ্দেশ্য বানচাল করার উপায় না করা হয়। পক্ষান্তরে যদি কৌশলের উদ্দেশ্য কোন হকদারের হক বাতিল করা হয় অথবা প্রকাশ্য হারাম কাজকে তার মূল প্রাণ বজায় রেখে নিজের জন্য হালাল করা হয়, তবে এরূপ কৌশল সম্পূর্ণ না-জায়েয। উদাহরণত যাকাত থেকে গা বাঁচানোর জন্য কেউ কেউ বছর পূর্ণ হওয়ার সামান্য আগেই নিজের ধনসম্পদ স্ত্রীর মালিকানায় সমর্পণ করে কিছুদিন পর স্ত্রী স্বামীর মালিকানায় ফিরিয়ে দেয়। যখন পরবর্তী বছর কাছাকাছি হয়, তখন স্বামী আবার স্ত্রীকে দান করে দেয়। এভাবে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কারও উপর যাকাত ওয়াজিব হয় না। এরূপ কৌশল শরীয়তের উদ্দেশ্যকে বানচাল করারই অপচেষ্টা। তাই হারাম। এর শাস্তি হয়তো যাকাত আদায় না করার শাস্তির চেয়েও গুরুতর হবে।——(রাহুল মা'আনী)

অসমীচীন কাজের প্রতিজ্ঞা ঃ তৃতীয় মাস'আলা এই যে, কোন ব্যক্তি কোন অসমীচীন, ভ্রান্ত অথবা অবৈধ কাজের প্রতিজ্ঞা করলে প্রতিজ্ঞা হয়ে যাবে এবং তা ভঙ্গ করলে কাফ্ফারা দিতে হবে। যদি কাফ্ফারা ওয়াজিব না হত, তবে আইয়্যুব (আ)-কে কৌশল শিখানো হত না। এতদসঙ্গে স্মরণ রাখা উচিত যে, কোন অসমীচীন কাজের প্রতিজ্ঞা করলে তা ভেঙ্গে কাফ্ফারা আদায় করাই শরীয়তের বিধান। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোন প্রতিজ্ঞা করে, অতপর দেখে যে, এ প্রতিজ্ঞার বিপরীত কাজ করাই উত্তম, তবে তার উচিত উত্তম কাজটি করা এবং প্রতিজ্ঞার কাফ্ফারা আদায় করা।

وَاذْكُرْ عِبٰدَنَآ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ اُولِي الْاَيْدِيْ وَالْاَبْصَارِ ﴿٤٥﴾ اِنَّآ
اَخْلَصْنٰهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ ﴿٤٦﴾ وَاِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ
الْاَخْيَارِ ﴿٤٧﴾ وَاذْكُرْ اِسْمٰعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ ؕ وَكُلٌّ مِّنَ الْاَخْيَارِ ﴿٤٨﴾ هٰذَا
ذِكْرٌ ؕ وَاِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ لَحُسْنَ مَاٰبٍ ﴿٤٩﴾ جَنّٰتِ عَدْنٍ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ
الْاَبْوَابُ ﴿٥٠﴾ مُتَّكِـِٕيْنَ فِيْهَا يَدْعُوْنَ فِيْهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ وَّشَرَابٍ ﴿٥١﴾ وَعِنْدَ
هُمْ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ اَتْرَابٌ ﴿٥٢﴾ هٰذَا مَا تُوْعَدُوْنَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴿٥٣﴾ اِنَّ
هٰذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهٗ مِنْ نَّفَادٍ ﴿٥٤﴾ هٰذَا ؕ وَاِنَّ لِلطّٰغِيْنَ لَشَرَّ مَاٰبٍ ﴿٥٥﴾ جَهَنَّمَ
يَصْلَوْنَهَا ۚ فَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿٥٦﴾ هٰذَا ۙ فَلْيَذُوْقُوْهُ حَمِيْمٌ وَّغَسَّاقٌ ﴿٥٧﴾ وَّاٰخَرُ مِنْ
شَكْلِهٖٓ اَزْوَاجٌ ﴿٥٨﴾ هٰذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ ۚ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ ؕ اِنَّهُمْ صَالُوا
النَّارِ ﴿٥٩﴾ قَالُوْا بَلْ اَنْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ ؕ اَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوْهُ لَنَا ۚ فَبِئْسَ
الْقَرَارُ ﴿٦٠﴾ قَالُوْا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هٰذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ ﴿٦١﴾
وَقَالُوْا مَا لَنَا لَا نَرٰى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِّنَ الْاَشْرَارِ ﴿٦٢﴾ اَتَّخَذْنٰهُمْ
سِخْرِيًّا اَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْاَبْصَارُ ﴿٦٣﴾ اِنَّ ذٰلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ اَهْلِ النَّارِ ﴿٦٤﴾

(৪৫) স্মরণ করুন হাত ও চোখের অধিকারী আমার বান্দা ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুবের কথা। (৪৬) আমি তাদের এক বিশেষ গুণ তথা পরকালের স্মরণ দ্বারা স্বাতন্ত্র্য দান করেছিলাম। (৪৭) আর তারা আমার কাছে মনোনীত ও সৎ-লোকদের অন্তর্ভুক্ত। (৪৮) স্মরণ করুন ইসমাঈল, আল ইয়াসা' ও যুল্‌কিফ্‌লের কথা। তারা প্রত্যেকেই গুণীজন। (৪৯) এ এক মহৎ আলোচনা। আল্লাহ্‌ভীরুদের জন্য রয়েছে উত্তম ঠিকানা—(৫০) তথা স্থায়ী বসবাসের জান্নাত; তাদের জন্য তার দ্বার উন্মুক্ত রয়েছে। (৫১) সেখানে তারা হেলান দিয়ে বসবে। তারা সেখানে চাইবে অনেক ফলমূল ও পানীয়। (৫২) তাদের কাছে থাকবে আনতনয়না সমবয়স্কা রমণীগণ। (৫৩) তোমাদেরকে এরই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে বিচার দিবসের জন্য। (৫৪) এটা আমার দেওয়া রিযিক যা শেষ হবে না। (৫৫) এটা তো শুনলে, এখন দুষ্টদের জন্য রয়েছে নিকৃষ্ট ঠিকানা (৫৬) তথা জাহান্নাম। তারা সেখানে প্রবেশ করবে। অতএব কত নিকৃষ্ট সেই আবাসস্থল। (৫৭) এটা উত্তপ্ত পানি ও পুঁজ; অতএব তারা একে আস্বাদন করুক। (৫৮) এ ধরনের আরও কিছু শাস্তি আছে। (৫৯) এইতো একদল তোমাদের সাথে প্রবেশ করছে। তাদের জন্য অভিনন্দন নেই। তারা তো জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (৬০) তারা বলবে, তোমাদের জন্যও তো অভিনন্দন নেই। তোমরাই আমাদেরকে এ বিপদের সম্মুখীন করেছ। অতএব এটি কতই না ঘৃণ্য আবাসস্থল। (৬১) তারা বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা, যে আমাদেরকে এর সম্মুখীন করেছে, আপনি জাহান্নামে তার শাস্তি দ্বিগুণ করে দিন। (৬২) তারা আরও বলবে, আমাদের কি হল যে, আমরা যাদেরকে মন্দ লোক বলে গণ্য করতাম, তাদেরকে এখানে দেখছি না। (৬৩) আমরা কি অহেতুক তাদেরকে ঠাট্টার পাত্র করে নিয়েছিলাম, না আমাদের দৃষ্টি ভুল করছে? (৬৪) এটা অর্থাৎ জাহান্নামীদের পারস্পরিক বাক-বিতণ্ডা অবশ্যম্ভাবী।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমার বান্দা ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুব (আ)-কে স্মরণ করুন, যারা হাত বিশিষ্ট (অর্থাৎ হাতে কাজ করতেন ও) চোখ বিশিষ্ট ছিলেন। (অর্থাৎ তাঁদের মধ্যে কর্মশক্তি ও জ্ঞানশক্তি উভয়ই ছিল।) আমি তাদেরকে এক বিশেষ গুণ তথা পরকালের স্মরণ দ্বারা স্বাতন্ত্র্য দান করেছিলাম। (বলা বাহুল্য, পয়গম্বরগণের মধ্যে এ গুণ পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান থাকে। এ বাক্যটি সংযুক্ত করার কারণ সম্ভবত এই যে, গাফিলরা বুঝুক, পয়গম্বরগণ যখন এ চিন্তা থেকে মুক্ত ছিলেন না, তখন আমরা কোন্ কাতারে আছি?) আর তারা আমার কাছে মনোনীত ও সৎলোকদের অন্তর্ভুক্ত। (অর্থাৎ মনোনীতদের মধ্যেও সর্বোত্তম। সেমতে পয়গম্বরগণ অন্যান্য ওলী ও সৎকর্মী-গণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয়ে থাকেন।) ইসমাঈল, আল ইয়াসা, যুলকিফলকেও স্মরণ করুন। তাদের সবাই সজ্জনদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। (অতপর তওহীদ, পরকাল ও রিসালতের কিছুটা বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে।) এক উপদেশ তো এই হল। (অর্থাৎ

পয়গম্বরগণের ঘটনাবলীর মধ্যে কাফিরদের উদ্দেশ্যে রিসালতের প্রচার এবং মু'মিনদের জন্য উত্তম চরিত্র ও উত্তম কর্মের শিক্ষা। পরকালের প্রতিদান ও শাস্তি সম্পর্কিত দ্বিতীয় বিষয় এই যে,) আল্লাহ্‌ভীরুদের জন্য (পরকালে) রয়েছে উত্তম ঠিকানা তথা স্থায়ী বসবাসের জান্নাত, যার দ্বার তাদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। (অর্থাৎ পূর্ব থেকেই উন্মুক্ত থাকবে।) তারা সেখানে হেলান দিয়ে বসবে। তারা (খাদেমদের কাছে) চাইবে অনেক ফলমূল ও পানীয়। তাদের কাছে থাকবে আনতনয়না সমবয়স্কা রমণী-গণ (অর্থাৎ হুরগণ। হে মুসলমানগণ,) এরই (অর্থাৎ উল্লিখিত নিয়ামতসমূহেরই) প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে তোমাদেরকে হিসাব দিবসের জন্য। নিশ্চয় এটা আমার দান, যার কোন শেষ নেই। (অর্থাৎ চিরন্তন নিয়ামত।) এ তো হল, সৎ ও পরহিযগারদের বিষয়। (অতপর কাফিরদের সম্পর্কে কথা এই যে,) অবাধ্যদের জন্য (অর্থাৎ যারা কুফরীতে অন্যদের পথপ্রদর্শক ছিল, তাদের জন্য) রয়েছে মন্দ ঠিকানা তথা জাহান্নাম, তাতে তারা প্রবেশ করবে। অতএব কত নিকৃষ্ট সে আবাসস্থল। এটা ফুটন্ত পানি ও পুঁজ; অতএব তারা তা আস্বাদান করুক! এ ছাড়া আরও এ ধরনের (অপ্রিয় ও কষ্টদায়ক) শাস্তি রয়েছে। (তাও আস্বাদন করুক। তাদের অনুসারীদের জন্যও এসব শাস্তি রয়েছে। তবে অগ্র-পশ্চাৎ এবং শক্ত ও শক্ততরে তফাৎ আছে। আমল ও আযাবে সবাই শরীক থাকবে। সেমতে কাফিরদের পথপ্রদর্শক প্রথমে জাহান্নামে প্রবেশ করবে, অতপর তাদের অনুসারীরা আগমন করবে। তখন পথপ্রদর্শকরা বলবে ঃ) এই এক দল (তোমাদের সাথে আযাবে শরীক হওয়ার জন্য জাহান্নামে) প্রবেশ করছে। তাদের উপর আল্লাহ্‌র গযব---তারাও জাহান্নামেই প্রবেশ করবে। (অর্থাৎ আযাবের যোগ্য নয়, এমন কেউ এলে তার আগমনে আনন্দবোধ করতাম এবং তাকে অভ্যর্থনা করতাম। এরা তো নিজেরাই জাহান্নামী, এদের কাছে কি আশা করা যায় এবং তাদের আগমনে আনন্দ কি ও অভ্যর্থনাই কি---) তারা (অর্থাৎ অনুসারীরা তাদের পথপ্রদর্শকদেরকে) বলবে, তোমাদের উপরও আল্লাহ্‌র গযব কেননা, তোমরাই আমাদেরকে এ বিপদের সম্মুখীন করেছ। (তোমরাই আমাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিলে।) অতএব (জাহান্নাম) কত মন্দ আবাসস্থল! (যা তোমাদের কারণে আমাদের সামনে এসেছে। অতপর প্রত্যেকেই যখন একে অপরকে দোষারোপ করতে থাকবে, তখন অনুসারীরা আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করে) বলবে ঃ হে আমাদের পালনকর্তা, সে আমা-দেরকে এ বিপদের সম্মুখীন করেছে, জাহান্নামে তার শাস্তি দ্বিগুণ করে দিন। তারা (অর্থাৎ অনুসারীরা অথবা জাহান্নামের সবাই) বলবে ঃ ব্যাপার কি, আমরা তাদেরকে (জাহান্নামে) দেখছি না, যাদেরকে আমরা মন্দ বলে গণ্য করতাম! (অর্থাৎ মুসলমান-দেরকে বিপথগামী ও নিকৃষ্ট মনে করতাম, তারা দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না কেন?) আমরা কি (অহেতুক) তাদেরকে ঠাট্টার পাত্র করে নিয়েছিলাম, (ফলে তারা জাহান্নামে আসেনি---) না কি (জাহান্নামেই বিদ্যমান রয়েছে, কিন্তু) আমাদের দৃষ্টি ভুল করছে? (উদ্দেশ্য এই যে, শাস্তির সাথে সাথে এ পরিতাপও করবে যে, যাদেরকে তারা মন্দ বলত; তারা আযাব থেকে বেঁচে গেছে।) এটা (অর্থাৎ জাহান্নামীদের পারস্পরিক বাকবিতণ্ডা) অবশ্যম্ভাবী সত্য।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ — এর শাব্দিক অর্থ তাঁরা হস্ত ও দৃষ্টি বিশিষ্ট ছিলেন। উদ্দেশ্য এই যে, তাঁরা তাঁদের জ্ঞানগত ও কর্মগত শক্তি আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্যে নিয়োজিত করতেন। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্র আনুগত্যেই ব্যয়িত হওয়া উচিত। যে সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এতে ব্যয়িত হয় না, সেগুলোর থাকা না থাকা উভয়ই সমান।

পরকালচিন্তা পয়গম্বরগণের স্বাতন্ত্র্যমূলক গুণ : ذِكْرَى الدَّارِ — শাব্দিক অর্থ গৃহের স্মরণ। গৃহ বলে এখানে পরকাল বোঝানো হয়েছে। পরকালের পরিবর্তে গৃহ বলে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, পরকালই মানুষের আসল গৃহ। অতএব পরকাল চিন্তাকেই তাদের যাবতীয় চিন্তা ও কর্মের ভিত্তি করা উচিত। এ থেকে জানা গেল যে, পরকাল চিন্তা মানুষের চিন্তাগত ও কর্মগত শক্তিকে অধিকতর ঔজ্জ্বল্য দান করে। কোন কোন আল্লাহ্দ্রোহীর এ ধারণা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন যে, পরকাল চিন্তা মানুষের শক্তি-সমূহকে ভোঁতা করে দেয়।

হযরত আল ইয়াসা (আ) : وَالْيَسَعَ [আল ইয়াসা (আ)-কে স্মরণ করুন।] হযরত আল ইয়াসা (আ) বনী ইসরাঈলের অন্যতম পয়গম্বর। কোরআন পাকে মাত্র দু'জায়গায় তাঁর উল্লেখ দেখা যায় এখানেও সূরা আন'আমে। কিন্তু কোথাও তাঁর বিস্তা-রিত অবস্থা উল্লেখ করা হয়নি, বরং পয়গম্বরগণের তালিকায় তাঁর নাম গণনা করা হয়েছে মাত্র।

ঐতিহাসিক গ্রন্থসমূহে বর্ণিত আছে যে, তিনি হযরত ইলিয়াস (আ)-এর চাচাত ভাই এবং তাঁর নায়েব বা প্রতিনিধি ছিলেন। ইলিয়াস (আ)-এর পর তাঁকেই নবুয়ত দান করা হয়। বাইবেলে তাঁর বিস্তারিত অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। তাতে তাঁর নাম 'ইলিশা ইবনে সাকেত' উল্লিখিত হয়েছে।

وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ — (তাদের কাছে আনতনয়না সম-বয়স্কা রমণীগণ থাকবে।) অর্থাৎ জান্নাতের হুরগণ থাকবে। 'সমবয়স্কা'-এর এক অর্থ তারা পরস্পর সমবয়স্কা হবে এবং অপর অর্থ স্বামীদের সমবয়স্কা হবে। প্রথম অর্থে সমবয়স্কা হওয়ার উপকারিতা এই যে, তাদের পরস্পর ভালবাসা, সম্প্রীতি ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক হবে—সপত্নীসুলভ হিংসা-বিদ্বেষ ও ঘৃণা থাকবে না। বলা বাহুল্য, এটা স্বামীদের জন্য পরম সুখের ব্যাপার।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বয়সের মিল থাকা উত্তম ঃ দ্বিতীয় অর্থে স্বামীদের সমবয়স্কা হওয়ার উপকারিতা এই যে, এর কারণে মনের ও মতের মিল অধিক হবে। ফলে একে অপরের সুখ ও কৌতূহলের প্রতি অধিকতর লক্ষ্য রাখবে। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, স্বামী-স্ত্রীর বয়সের তারতম্যের দিকে লক্ষ্য রাখা বাঞ্ছনীয়। কারণ, এ থেকেই পারস্পরিক ভালবাসা জন্মায় এবং বৈবাহিক সম্পর্ক মধুময় ও স্থায়ী হয়।

قُلْ إِنَّمَآ أَنَا مُنذِرٌ ۖ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا ٱللَّهُ ٱلْوَٰحِدُ ٱلْقَهَّارُ ﴿٦٥﴾ رَبُّ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّٰرُ ﴿٦٦﴾ قُلْ هُوَ نَبَؤٌا۟ عَظِيمٌ ﴿٦٧﴾
أَنتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ﴿٦٨﴾ مَا كَانَ لِىَ مِنْ عِلْمٍۭ بِٱلْمَلَإِ ٱلْأَعْلَىٰٓ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿٦٩﴾
إِن يُوحَىٰٓ إِلَىَّ إِلَّآ أَنَّمَآ أَنَا۠ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٧٠﴾ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّى
خَٰلِقٌۢ بَشَرًا مِّن طِينٍ ﴿٧١﴾ فَإِذَا سَوَّيْتُهُۥ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِى فَقَعُوا۟
لَهُۥ سَٰجِدِينَ ﴿٧٢﴾ فَسَجَدَ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿٧٣﴾ إِلَّآ إِبْلِيسَ ٱسْتَكْبَرَ
وَكَانَ مِنَ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٧٤﴾ قَالَ يَٰٓإِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ
بِيَدَىَّ ۖ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ ﴿٧٥﴾ قَالَ أَنَا۠ خَيْرٌ مِّنْهُ ۖ خَلَقْتَنِى مِن
نَّارٍ وَخَلَقْتَهُۥ مِن طِينٍ ﴿٧٦﴾ قَالَ فَٱخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿٧٧﴾ وَإِنَّ
عَلَيْكَ لَعْنَتِىٓ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿٧٨﴾ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِىٓ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿٧٩﴾
قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ﴿٨٠﴾ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ﴿٨١﴾ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ
لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٨٢﴾ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿٨٣﴾ قَالَ فَٱلْحَقُّ
وَٱلْحَقَّ أَقُولُ ﴿٨٤﴾ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٨٥﴾
قُلْ مَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلْمُتَكَلِّفِينَ ﴿٨٦﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا
ذِكْرٌ لِّلْعَٰلَمِينَ ﴿٨٧﴾ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُۥ بَعْدَ حِينٍۭ ﴿٨٨﴾

(৬৫) বলুন, আমি তো একজন সতর্ককারী মাত্র এবং এক পরাক্রমশালী আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। (৬৬) তিনি আসমান-যমীন ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সব কিছুর পালনকর্তা, পরাক্রমশালী, মার্জনাকারী। (৬৭) বলুন, এটি এক মহা সংবাদ, (৬৮) যা থেকে তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছ। (৬৯) ঊর্ধ্ব জগৎ সম্পর্কে আমার কোন জ্ঞান ছিল না যখন ফেরেশতারা কথাবার্তা বলছিল। (৭০) আমার কাছে এ ওহীই আসে যে, আমি একজন স্পষ্ট সতর্ককারী। (৭১) যখন আপনার পালনকর্তা ফেরেশতাগণকে বললেন, আমি মাটির মানুষ সৃষ্টি করব। (৭২) যখন আমি তাকে সুষম করব এবং তাতে আমার রূহ ফুঁকে দেব, তখন তোমরা তার সম্মুখে সিজদায় নত হয়ে যেয়ো; (৭৩) অতপর সমস্ত ফেরেশতাই একযোগে সিজদায় নত হল, (৭৪) কিন্তু ইবলীস; সে অহংকার করল এবং অস্বীকারকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। (৭৫) আল্লাহ্ বললেন, হে ইবলীস! আমি স্বহস্তে যাকে সৃষ্টি করেছি, তার সম্মুখে সিজদা করতে তোমাকে কিসে বাধা দিল? তুমি অহংকার করলে, না তুমি তার চেয়ে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন? (৭৬) সে বলল ঃ আমি তার চেয়ে উত্তম। আপনি আমাকে আগুনের দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, আর তাকে সৃষ্টি করেছেন, মাটির দ্বারা। (৭৭) আল্লাহ্ বললেন ঃ বের হয়ে যা এখান থেকে। কারণ, তুই অভিশপ্ত। (৭৮) তোর প্রতি আমার এ অভিশাপ বিচার দিবস পর্যন্ত স্থায়ী হবে। (৭৯) সে বলল, হে আমার পালনকর্তা আপনি আমাকে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিন। (৮০) আল্লাহ্ বললেন ঃ তোকে অবকাশ দেওয়া হল (৮১) সে সময়ের দিন পর্যন্ত যা জানা। (৮২) সে বলল, আপনার ইয্যতের কসম, আমি অবশ্যই তাদের সবাইকে বিপথগামী করে দেব। (৮৩) তবে তাদের মধ্যে যারা আপনার খাঁটি বান্দা, তাদেরকে ছাড়া। (৮৪) আল্লাহ্ বললেন ঃ তাই ঠিক, আর আমি সত্য বলছি—(৮৫) তোর দ্বারা আর তাদের মধ্যে যারা তোর অনুসরণ করবে তাদের দ্বারা আমি জাহান্নাম পূর্ণ করব। (৮৬) বলুন, আমি তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না আর আমি লৌকিকতাকারীও নই। (৮৭) এটা তো বিশ্ববাসীর জন্য এক উপদেশ মাত্র। (৮৮) তোমরা কিছুকাল পরে এর সংবাদ অবশ্যই জানতে পারবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি বলে দিন, (তোমরা যে রিসালত ও তওহীদ অস্বীকার করছ, এতে ক্ষতি তোমাদেরই, আমার নয়। কেননা,) আমি তো (আযাব থেকে তোমাদেরকে) সতর্ককারী (পয়গম্বর) মাত্র। (আমার রসূল ও সতর্ককারী হওয়া যেমন বাস্তব, তেমনি তওহীদও সত্য। অর্থাৎ) এক পরাক্রমশালী আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ ইবাদতের যোগ্য নয়। তিনি আসমান-যমীন ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর পালনকর্তা, পরাক্রমশালী, (এবং পাপ) মার্জনাকারী। (যেহেতু তারা কোন না কোন পর্যায়ে তওহীদ মানলেও রিসালতকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করত, তাই রিসালত সপ্রমাণ করার লক্ষ্যে বলা হচ্ছে, হে পয়গম্বর!) আপনি বলে দিন, এটা (অর্থাৎ তওহীদ ও শরীয়তের হুকুম-আহ্কাম শিক্ষা দেওয়ার জন্য আমাকে রসূল নিযুক্ত করা) এক বিরাট বিষয়

যা (অর্থাৎ যার প্রতি খুব যত্নবান হওয়া তোমাদের উচিত ছিল। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, এ) থেকে তোমরা (সম্পূর্ণভাবে) বিমুখ হয়ে আছ। (এতে বিশ্বাসী হওয়া ব্যতীত সত্যিকার সৌভাগ্য অর্জন অসম্ভব বিধায়) এটা বিরাট বিষয়। (অতপর রিসালত সপ্রমাণ করার একটি দলীল বর্ণনা করা হয়েছে। তা এই যে,) ঊর্ধ্ব জগৎ সম্পর্কে (অর্থাৎ সেখানকার সে আলাপ-আলোচনা সম্পর্কে) আমার (কোন উপায়ে) কোন জ্ঞানই ছিল না, যখন ফেরেশতারা (আদম সৃষ্টির ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে) কথাবার্তা বলছিল। (অথচ আমি এ ঘটনা সম্পর্কে তোমাদেরকে অবহিত করছি। এখন চিন্তা করার বিষয় এই যে, আমি এ ঘটনা কোথা থেকে জানলাম, স্বচক্ষে তো দেখিনি? আহলে-কিতাব ইহুদী খৃস্টানদের সাথেও আমার তেমন মেলা-মেশা নেই যে, তাদের কাছ জেনে নেব। নিশ্চিতই এ জ্ঞান ওহীর মাধ্যমেই আমি পেয়েছি। সুতরাং প্রমাণিত হল যে,) আমার কাছে (যে) ওহী (আসে, যদ্দ্বারা ঊর্ধ্ব জগতের অবস্থাও জানা যায়, তা) শুধু এ কারণেই আসে যে, আমি (আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে) সুস্পষ্ট সতর্ককারী। (অর্থাৎ আমি পয়গম্বরী পেয়েছি বিধায় আমার কাছে ওহী আসে। অতএব আমার রিসালত মেনে নেওয়া ওয়াজিব। আর ঊর্ধ্ব জগতের উল্লিখিত আলাপ-আলোচনা তখন হয়েছিল,) যখন আপনার পালনকর্তা ফেরেশতা-দেরকে বললেনঃ আমি মাটির দলা দ্বারা এক মানব (অর্থাৎ তার পুতুল) সৃষ্টি করতে যাচ্ছি। যখন আমি তাকে (অর্থাৎ তার দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে) পরিপূর্ণভাবে তৈরি করে ফেলব এবং তাতে নিজের (পক্ষ থেকে) প্রাণ সঞ্চার করব, তখন তোমরা সবাই তার সামনে সিজদায় নত হয়ে যেয়ো। বস্তুত (যখন আল্লাহ্ তাকে তৈরি করলেন, তখন) সমস্ত ফেরেশতা (আদমকে) সিজদা করল, কিন্তু ইবলীস—সে অহংকারী হয়ে গেল এবং কাফিরে পরিণত হল। আল্লাহ্ বললেনঃ হে ইবলীস, আমি নিজ হাতে যা সৃষ্টি করেছি (অর্থাৎ যে বস্তুকে অস্তিত্ব দান করার জন্য আল্লাহ্‌র বিশেষ দৃষ্টি ব্যয়িত হয়েছে, অতপর তাঁকে সিজদা করবার আদেশ করা হয়েছে) তাকে সিজদা করতে তোমাকে কিসে বাধা দিল? তুমি কি অহংকারী হয়ে গেলে, না (বাস্তবে) তুমি উচ্চ মর্যাদাশীল (যে, তোমাকে সিজদার আদেশ করা শোভনীয় নয়)? সে বললঃ (দ্বিতীয় কথাটিই ঠিক। অর্থাৎ) আমি আদম থেকে উত্তম। কারণ, আপনি আমাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছেন আর তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি দ্বারা। (সুতরাং তাকে সিজদা করার নির্দেশ দেওয়াটাই প্রজ্ঞা বিরুদ্ধ।) আল্লাহ্ বললেনঃ (তা হলে) তুই বেরিয়ে যা আকাশ থেকে। নিশ্চিতই তুই (এ কাজ করে) অভিশপ্ত। তোর প্রতি আমার অভিশাপ বিচার দিবস পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। (এরপরে অনুগ্রহ লাভের সম্ভাবনা নেই।) সে বললঃ (আমাকে যদি আদমের কারণে অভিশপ্ত করে থাকেন, তবে আমাকে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত (মৃত্যু থেকে) অবকাশ দিন (যাতে তার কাছ থেকে এবং তার সন্তান-সন্ততির কাছ থেকে যথেষ্ট প্রতিশোধ নিতে পারি)। আল্লাহ্ বললেনঃ (তুই যখন অবকাশ চাস, তখন) তোকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দেওয়া হল। সে বললঃ (অবকাশ যখন পেলাম, তখন) আপনারই ইজ্জতের কসম, আমি সবাইকে বিপথগামী করে ছাড়ব, আপনার মনোনীত বান্দাগণ ছাড়া। (অর্থাৎ আপনি যাদেরকে

আমার প্রভাব থেকে মুক্ত রাখবেন।) আল্লাহ্ বললেনঃ আমি সত্য বলি আর আমি তো (সর্বদা) সত্যই বলি, আমি তোর দ্বারা এবং তোর অনুসারীদের দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করব।

[সূরার শুরু ভাগের আয়াতেই সুস্পষ্ট ছিল যে, এ সূরার মৌল উদ্দেশ্য রসূলুল্লাহ্ (সা)-র রিসালত সপ্রমাণ করা। এর প্রমাণাদি সমাপ্ত হয়েছে। এখন উপদেশ দান প্রসঙ্গে ঈমানের দাওয়াত দেওয়া হচ্ছেঃ] আপনি (শেষ প্রমাণ হিসাবে) বলে দিন, আমি তোমাদের কাছে এর (অর্থাৎ কোরআন প্রচারের) জন্য কোন প্রতিদান চাই না এবং আমি কৃত্রিমতাশ্রয়ীও নই (যে, কৃত্রিমভাবে নবুয়ত দাবি করব এবং যা কোরআন নয়, তাকে কোরআন বলে দেব। অর্থাৎ মিথ্যা বললে তার কারণ হয় কোন বস্তুনিষ্ঠ উপকার হত, যেমন প্রতিদান, না হয় কোন স্বভাবগত অভ্যাস হত, যেমন কৃত্রিমতা। উভয়টিই নাই; বরং বাস্তবে) এটা (অর্থাৎ কোরআন আল্লাহ্র কালাম এবং) বিশ্ববাসীর জন্য এক উপদেশ মাত্র। (এর প্রচারের জন্য আমি নবুয়ত পেয়েছি। এতে তোমাদেরই লাভ। কাজেই সত্য ফুটে উঠার পরও যদি তোমরা না মান, তবে) কিছুকাল পরে তোমরা এর অবস্থা অবশ্যই জানতে পারবে। (অর্থাৎ মৃত্যুর পরেই বুঝতে পারবে যে, এটা সত্য ছিল এবং একে না মানা অন্যায় ছিল। কিন্তু তখন জানলেও কোন ফায়দা হবে না।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরার সার-সংক্ষেপ ঃ قُلْ اِنَّمَا اَنَا مُنْذِرٌ--এ সূরার আসল লক্ষ্য রসূলুল্লাহ্ (সা)-র রিসালত প্রমাণ এবং কাফিরদের দাবি খণ্ডন করা। সূরার শুরুতেই এটা স্পষ্ট ছিল। এ প্রসঙ্গে পয়গম্বরগণের ঘটনাবলী দ্বিবিধ কারণে উল্লেখ করা হয়েছে--- এক. রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সান্ত্বনা দেওয়া যে, পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের মত আপনিও কাফির-দের অহেতুক কার্যকলাপে সবর করুন। দুই. এসব ঘটনা থেকে তারাও শিক্ষালাভ করুক, যারা একজন সত্য পয়গম্বরের রিসালত অস্বীকার করে যাচ্ছে। এর পর মু'মিন-দের শুভ পরিণতি ও কাফিরদের তীব্র শাস্তির চিত্র অংকন করে কাফিরদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া হয়েছে এবং হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, যাদের অনুকরণ করে আজ তোমরা রসূলে করীম (সা)-এর প্রতি মিথ্যারোপ করছ কিয়ামতের দিন তারাই তোমাদের সাহায্য-সহায়তা থেকে হাত গুটিয়ে নেবে। তারা তোমাদেরকে গালমন্দ করবে এবং তোমরা তাদের প্রতি অভিসম্পাত বর্ষণ করবে।

এসব বিষয়বস্তুর পর উপসংহারে আবার আসল দাবি অর্থাৎ রিসালতের প্রমাণ উপস্থিত করা হয়েছে। প্রমাণাদি পেশ করার সাথে সাথে উপদেশ প্রসঙ্গে দাওয়াতও দেওয়া হয়েছে।

مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَإِ الْأَعْلَىٰ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ---(উর্ধ্ব জগতের কোন জ্ঞানই আমার ছিল না যখন তারা কথাবার্তা বলছিল।) অর্থাৎ আমার রিসালতের উজ্জ্বল প্রমাণ এই যে, আমি তোমাদেরকে উর্ধ্ব জগতের বিষয়াদি সম্পর্কে অবহিত করে থাকি যা ওহী ছাড়া অন্য কোন উপায়েই আমার জানার কথা নয়। এসব বিষয়াদির এক অর্থ সেসব আলোচনা, যা আদম সৃষ্টির সময় আল্লাহ্ তা'আলা ও ফেরেশতাগণের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সূরা বাকারায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। ফেরেশতা-গণ বলেছিল, أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ ---আপনি কি পৃথিবীতে এমন কিছু সৃষ্টি করবেন, যারা সেখানে অনর্থ সৃষ্টি করবে এবং রক্তগঙ্গা বহাবে? এসব কথাবার্তাকে এখানে اختصام ---বলে ব্যক্ত করা হয়েছে, যার শাব্দিক অর্থ 'ঝগড়া করা' অথবা 'বাকবিতণ্ডা করা'। অথচ বাস্তব ঘটনা এই যে, ফেরেশতা-গণের এই প্রশ্ন কোন আপত্তি অথবা বাকবিতণ্ডার উদ্দেশ্যে ছিল না, বরং তারা কেবল আদম সৃষ্টির রহস্য জানতে চেয়েছিল। কিন্তু প্রশ্ন ও উত্তরের বাহ্যিক আকার বাক-বিতণ্ডার অনুরূপ হয়ে গিয়েছিল বিধায় একে اختصام শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। মাঝে মাঝে কোন ছোট বড়কে কোন প্রশ্ন করলে বড় তার আলোচনা প্রসঙ্গে কৌতুকবশত এ প্রশ্নোত্তরকে ঝগড়া বলে ব্যক্ত করে দেয়।

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ ---(যখন আপনার পালনকর্তা ফেরেশতাগণকে বললেন---) এখানে আল্লাহ্ তা'আলা ও ফেরেশতাগণের উপরোক্ত কথাবার্তার প্রতি ইঙ্গিত করার সাথে সাথে এদিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে, ইবলীস নিছক প্রতিহিংসা ও অহংকারবশত আদম (আ)-কে সিজদা করতে অস্বীকার করেছিল। তেমনিভাবে আরবের মুশরিকরাও প্রতিহিংসা ও অহংকারের কারণে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নবুয়ত অস্বীকার করে যাচ্ছে। ফলে ইবলীসের যে পরিণতি হয়েছে, তাদেরও তাই হবে।---(তফসীরে কবীর)

لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ ---এখানে আদম (আ) সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেছেন যে, আমি নিজ হাতে তাকে সৃষ্টি করেছি। সকল তফসীরবিদই এ ব্যাপারে একমত যে, মানুষের ন্যায় আল্লাহ্ তা'আলারও হাত আছে, এখানে তা বোঝানো হয়নি। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মুখাপেক্ষিতা থেকে মুক্ত ও পবিত্র। কাজেই এর অর্থ হল আল্লাহ্র কুদরত। আরবী ভাষায় يد শব্দটি কুদরত অর্থে বহুল ব্যবহৃত। উদাহরণত এক আয়াতে আছে بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ---অতএব আয়াতের মর্মার্থ এই যে, আমি

আদমকে নিজ কুদরত দ্বারা সৃষ্টি করেছি। এমনিতে সৃষ্ট জগতের সবকিছুই আল্লাহ্‌র কুদরত দ্বারা সৃজিত হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা যখন কোন বস্তুর বিশেষ মর্যাদা প্রকাশ করতে চান, তখন তাকে বিশেষভাবে নিজের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে দেন। যেমন কা'বাকে বায়তুল্লাহ্ (আল্লাহ্‌র ঘর), সালেহ্ (আ)-এর উষ্ট্রীকে 'নাকাতুল্লাহ্' (আল্লাহ্‌র উষ্ট্রী), ঈসা (আ)-কে কলেমাতুল্লাহ্ (আল্লাহ্‌র বাক্য) অথবা 'রুহুল্লাহ্' (আল্লাহ্‌র রূহ) বলা হয়েছে। এখানেও হযরত আদম (আ)-এর সম্মান প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে এই সম্বন্ধ করা হয়েছে।---(কুরতুবী)

লৌকিকতা ও কৃত্রিমতার নিন্দা ঃ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ---(আমি কৃত্রিমতাশ্রয়ী নই।) উদ্দেশ্য এই যে, আমি লৌকিকতা ও কৃত্রিমতার আশ্রয়ে নবুয়ত, রিসালত ও জ্ঞান-গরিমা প্রকাশ করছি না, বরং আল্লাহ্‌র বিধি-বিধানই যথাযথভাবে প্রচার করছি। এ থেকে জানা গেল যে, লৌকিকতা ও কৃত্রিমতা শরীয়তের দৃষ্টিতে নিন্দনীয়। সেমতে এর নিন্দায় বুখারী ও মুসলিমে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদের একটি উক্তিও বর্ণিত রয়েছে। তিনি বলেন ঃ

"লোকসকল! তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কোন বিষয় সম্পর্কে জানে, সে তা অন্যের কাছে বর্ণনা করুক, কিন্তু যে বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান নেই, তার ক্ষেত্রে الله اعلم (আল্লাহ্ ভাল জানেন) বলে ক্ষান্ত থাকুক। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রসূল সম্পর্কে বলেছেন ঃ قُلْ مَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَّمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ ---(রূহুল-মা'আনী)

سورة الزمر

সূরা যুমার

মক্কায় অবতীর্ণ, ৭৫ আয়াত, ৮ রুকু

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ① اِنَّآ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ

بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ ② اَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ ط

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ م مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَآ اِلَى اللّٰهِ

زُلْفٰى ط اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيْ مَا هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ۵ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ

مَنْ هُوَ كٰذِبٌ كَفَّارٌ ③ لَوْ اَرَادَ اللّٰهُ اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا لَّاصْطَفٰى مِمَّا

يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ لا سُبْحٰنَهٗ ط هُوَ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ④ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ

وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ج يُكَوِّرُ الَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى الَّيْلِ

وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ط كُلٌّ يَّجْرِيْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ط اَلَا هُوَ الْعَزِيْزُ

الْغَفَّارُ ⑤ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَاَنْزَلَ

لَكُمْ مِّنَ الْاَنْعَامِ ثَمٰنِيَةَ اَزْوَاجٍ ط يَخْلُقُكُمْ فِيْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ خَلْقًا

مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِيْ ظُلُمٰتٍ ثَلٰثٍ ط ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ط لَآ اِلٰهَ

اِلَّا هُوَ ج فَاَنّٰى تُصْرَفُوْنَ ⑥

পরম করুণাময় ও অসীম দাতা আল্লাহ্‌র নামে শুরু—

(১) কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে। (২) আমি আপনার প্রতি এ কিতাব যথার্থরূপে নাযিল করেছি। অতএব আপনি নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ্‌র ইবাদত করুন। (৩) জেনে রাখুন, নিষ্ঠাপূর্ণ ইবাদত আল্লাহ্‌রই নিমিত্ত। যারা আল্লাহ্ ব্যতীত অপরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে রেখেছে এবং বলে যে, আমরা তাদের ইবাদত এ জন্যই করি, যেন তারা আমাদেরকে আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী করে দেয়। নিশ্চয় আল্লাহ্ তাঁদের মধ্যে তাদের পারস্পরিক বিরোধপূর্ণ বিষয়ের ফয়সালা করে দেবেন। আল্লাহ্ মিথ্যাবাদী কাফিরকে সৎপথে পরিচালিত করেন না। (৪) আল্লাহ্ যদি সন্তান গ্রহণ করার ইচ্ছা করতেন তবে তাঁর সৃষ্টির মধ্য থেকে যা কিছু ইচ্ছা মনোনীত করতেন, তিনি পবিত্র। তিনি আল্লাহ্, এক, পরাক্রমশালী। (৫) তিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবে। তিনি রাত্রিকে দিবস দ্বারা আচ্ছাদিত করেন এবং দিবসকে রাত্রি দ্বারা আচ্ছাদিত করেন এবং তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে কাজে নিযুক্ত করেছেন। প্রত্যেকেই বিচরণ করে নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত। জেনে রাখুন, তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল। (৬) তিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে একই ব্যক্তি থেকে। অতপর তা থেকে তার যুগল সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি তোমাদের জন্য আট প্রকার চতুষ্পদ জন্তু অবতীর্ণ করেছেন। তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের মাতৃগর্ভে পর্যায়ক্রমে একের পর এক ত্রিবিধ অন্ধকারে। তিনি আল্লাহ্, তোমাদের পালনকর্তা, সাম্রাজ্য তাঁরই। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। অতএব তোমরা কোথায় বিভ্রান্ত হচ্ছ?

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে। (পরাক্রমশালী হওয়ার দাবি ছিল এই যে, কেউ এর প্রতি মিথ্যারোপ করলে তাকে অনতিবিলম্বে শাস্তি দেবেন; কিন্তু যেহেতু তিনি প্রজ্ঞাময়ও বটে এবং অবকাশ দানের মাঝেই কল্যাণ রয়েছে, তাই শাস্তির ব্যাপারে অবকাশ দিয়ে রেখেছেন।) আমি যথাযথভাবে এ কিতাব আপনার প্রতি নাযিল করেছি। অতএব আপনি (কোরআনের শিক্ষা অনুযায়ী) নিষ্ঠাপূর্ণ বিশ্বাসসহ আল্লাহ্‌র ইবাদত করতে থাকুন (যেমন, এ পর্যন্ত করে এসেছেন। আপনার উপরও যখন তা ওয়াজিব, তখন অন্যদের উপর ওয়াজিব হবে না কেন? হে মানবকুল,) জেনে রাখ, (শিরক ও রিয়া থেকে) খাঁটি ইবাদত আল্লাহ্‌র প্রাপ্য। যারা (খাঁটি ইবাদত ছেড়ে) আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে (এবং বলে,) আমরা তো তাদের পূজা শুধু এ জন্যই করি, যাতে তারা আমাদেরকে আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী করে দেয় (অর্থাৎ আমাদের প্রয়োজনাদি অথবা ইবাদত আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে পেশ করে দেয়। যেমন, দুনিয়াতে মন্ত্রী ও পারিষদবর্গ করে থাকে।) নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদের (এবং মু'মিনদের) মধ্যে পারস্পরিক বিরোধপূর্ণ বিষয়ের (কার্যত) ফয়সালা (কিয়ামতের দিন) করে দেবেন। (তওহীদপন্থীকে জান্নাতে এবং শিরকপন্থীকে জাহান্নামে দাখিল করবেন। অর্থাৎ তারা না মানলে আপনি চিন্তাযুক্ত হবেন না, তাদের ফয়সালা সেখানে হবে। আপনি এতেও

আশ্চর্যান্বিত হবেন না যে, প্রমাণাদি সত্ত্বেও তারা সৎপথে আসছে না! কেননা) আল্লাহ্ তাকে সৎপথে আনেন না, যে (কথায়) মিথ্যাবাদী এবং (বিশ্বাসে) কাফির। (অর্থাৎ মুখে কুফরী কথাবার্তা এবং অন্তরে কুফরী বিশ্বাস রাখতে বদ্ধপরিকর ও সত্যান্বেষণে অনিচ্ছুক। তার এ হঠকারিতার কারণে আল্লাহ্ তা'আলাও তাকে সৎপথের তওফীক দেন না। যেহেতু কোন কোন মুশরিক ফেরেশতাগণকে আল্লাহ্র কন্যা বলে আখ্যা দিত, সুতরাং পরবর্তীতে তাদের উক্তি খণ্ডন করা হয়েছে যে,) যদি আল্লাহ্ তা'আলা (কাউকে সন্তান বানাতেন, তবে ইচ্ছা ব্যতীত যেহেতু কোন কিছু হয় না, তাই প্রথমে সন্তান করতে ইচ্ছা করতেন এবং যদি) কাউকে সন্তানরূপে গ্রহণ করার ইচ্ছা করতেন, তবে (আল্লাহ্ ব্যতীত সবই যেহেতু সৃষ্টি, তাই) অবশ্যই সৃষ্টির মধ্য থেকেই যাকে ইচ্ছা (এজন্য) মনোনীত করতেন। (এটা বাতিল। কেননা) তিনি (দোষত্রুটি থেকে) পবিত্র। (সৃষ্টির মধ্য থেকে সন্তান হওয়া দোষ। কাজেই সৃষ্টিকে সন্তান করা অসম্ভব। অসম্ভব কাজের ইচ্ছা করাও অসম্ভব। এভাবে প্রমাণিত হল যে,) তিনিই একক আল্লাহ্, (কার্যক্ষেত্রে তাঁর কোন শরীক নেই এবং) পরাক্রমশালী। (সম্ভাবনার ক্ষেত্রেও তার কোন শরীক নেই। কেননা তাঁর মতই পরাক্রমশালী কেউ থাকলে সম্ভাবনা থাকতে পারত, কিন্তু তা নেই। অতপর তওহীদের দলীল বর্ণিত হয়েছে---) তিনি (আসমান ও যমীনকে) যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন। তিনি রাত্রিকে (অর্থাৎ তার অন্ধকারকে) দিবসের উপর (অর্থাৎ তার আলোর উপর) আচ্ছাদিত করেন। (ফলে দিবস অদৃশ্য এবং রাত্রি দৃশ্য হয়ে যায়) এবং দিবসকে (অর্থাৎ তার আলোকে) রাত্রির উপর (অর্থাৎ তার অন্ধকারের উপর) তিনি আচ্ছাদিত করেন। (ফলে রাত্রি অদৃশ্য এবং দিবস দৃশ্য হয়।) তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে কাজে নিয়োজিত রেখেছেন। প্রত্যেকেই নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত বিচরণ করবে। জেনে রাখ, (এসব প্রমাণের পর তওহীদ অস্বীকার করলে শাস্তির আশংকা রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা শাস্তি দিতে সক্ষমও বটে। কেননা) তিনি পরাক্রমশালী, (কিন্তু অস্বীকারের পরেও স্বীকার করে নিলে অতীত অস্বীকারের কারণে শাস্তি হবে না। কেননা তিনি) ক্ষমাশীলও বটে। (এ বিবরণের মাধ্যমে তওহীদের প্রতি উৎসাহদান করা হল। উপরের প্রমাণগুলো ছিল প্রকৃতিগত। অতপর আত্মস্থিত প্রমাণাদি বর্ণনা করা হচ্ছে। এতে প্রসঙ্গক্রমে কিছু কিছু প্রাকৃতিক প্রমাণও এসে গেছে।) তিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে (অর্থাৎ আদম থেকে) সৃষ্টি করেছেন। অতপর তা থেকেই তার যুগল (অর্থাৎ বিবি হাওয়াকে) সৃষ্টি করেছেন। অতপর তাদের থেকে (সমস্ত মানুষ ছড়িয়ে দিয়েছেন।) তিনি তোমাদের (কল্যাণের) জন্য আট প্রকার (নর ও মাদী) চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন। (অষ্টম পারায় এসম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এগুলো অধিক উপকারী বিধায় এখানে বিশেষভাবে এগুলোর উল্লেখ করা হয়েছে। এটাই দিগন্তস্থিত প্রমাণ যা প্রসঙ্গক্রমে উল্লিখিত হয়েছে। কেননা ব্যক্তিসত্তার স্থায়িত্ব বর্ণনা প্রসঙ্গে এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অতপর মানবগোষ্ঠীর সৃষ্টি প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ) তিনি তোমাদেরকে মাতৃগর্ভে পর্যায়ক্রমে একের পর এক অবস্থার মধ্য দিয়ে সৃষ্টি করেন। (প্রথমে বীর্য, অতপর জমাট রক্ত, অতপর মাংসপিণ্ড এভাবে সৃষ্টিকার্য অব্যাহত থাকে। এই সৃষ্টি) তিন

অন্ধকারে সম্পন্ন হয়। (এক. পেটের অন্ধকার। দুই. গর্ভাশয়ের অন্ধকার এবং তিন. ভ্রূণকে জড়ানো ঝিল্লীর অন্ধকার। এসব পর্যায়ক্রমিক অবস্থা এবং একাধিক অন্ধকারে সৃষ্টি করা পরিপূর্ণ সক্ষমতা ও পরিপূর্ণ জ্ঞানের দলীল।) তিনিই আল্লাহ্. তোমাদের পালনকর্তা। সাম্রাজ্য তাঁরই। তিনি ব্যতীত কেউ ইবাদতের যোগ্য নয়। (এসব প্রমাণের পর সত্য থেকে) তোমরা কোথায় বিভ্রান্ত হচ্ছ ? (তওহীদ কবূল করা এবং শিরক পরিত্যাগ করা তোমাদের অবশ্য কর্তব্য।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

فَاعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ ۔ اَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ — دين : শব্দের অর্থ এখানে ইবাদত অথবা আনুগত্য। অর্থাৎ ধর্মের যাবতীয় বিধি-বিধান মেনে চলা। এর পূর্ববর্তী বাক্যে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সম্বোধন করে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্র ইবাদত ও আনুগত্যকে তাঁরই জন্য খাঁটি করুন, যাতে শিরক, রিয়া ও নাম-যশের নামগন্ধও না থাকে। এরই তাকীদার্থে দ্বিতীয় বাক্যে বলা হয়েছে যে, খাঁটি ইবাদত একমাত্র আল্লাহ্র জন্যই শোভনীয়। তিনি ব্যতীত অন্য কেউ এর যোগ্য নয়।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে আরয করলঃ ইয়া রসূলুল্লাহ্, আমি মাঝে মাঝে দান-খয়রাত করি অথবা কারও প্রতি অনুগ্রহ করি। এতে আমার নিয়ত আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টিও থাকে এবং এটাও থাকে যে, মানুষ আমার প্রশংসা করবে। রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেনঃ সে সত্তার কসম, যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, আল্লাহ্ তা'আলা এমন কোন বস্তু কবূল করেন না, যাতে অন্যকে শরীক করা হয়। অতপর তিনি প্রমাণস্বরূপ اَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ আয়াতখানি তেলাওয়াত করলেন।—(কুরতুবী)

নিষ্ঠা অনুপাতে আল্লাহ্র নিকট আমল গৃহীত হয়ঃ কোরআন পাকের অনেক আয়াত সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্র কাছে আমলের হিসাব গণনা দ্বারা নয়—ওজন দ্বারা হয়ে থাকে। وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ এবং উল্লিখিত আয়াত-সমূহের বক্তব্য এই যে, আল্লাহ্র কাছে আমলের মূল্যায়ন ও ওজন নিষ্ঠাপূর্ণ নিয়তের অনুপাতে হয়ে থাকে। বলা বাহুল্য, পূর্ণ ঈমান ব্যতিরেকে নিয়ত পূর্ণরূপে খাঁটি হতে পারে না। কেননা, পূর্ণ খাঁটি নিয়ত এই যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কাউকে লাভ-লোকসানের মালিক গণ্য করা যাবে না, নিজের কাজকর্মে কাউকে ক্ষমতাশালী মনে করা যাবে না এবং কোন ইবাদত ও আনুগত্যে অপরের কল্পনা ও ধ্যান করা যাবে না। অনিচ্ছাধীন জল্পনা-কল্পনা আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমা করে দেন।

যে সাহাবায়ে কিরাম মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রথম সারিতে অবস্থিত, তাঁদের আমল ও সাধনার পরিমাণ তেমন একটা বেশি দেখা যাবে না, কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাঁদের সামান্য আমল ও সাধনা অবশিষ্ট উম্মতের বড় বড় আমল ও সাধনার চেয়ে উচ্চতর ও শ্রেষ্ঠ তো তাঁদের পূর্ণ ঈমান ও পূর্ণ নিষ্ঠার কারণেই ছিল।

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَاۤءَ ۘ مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَآ اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى

এ হল আরবের মুশরিকদের অবস্থা। তখনকার দিনে সাধারণ মুশরিকরাও প্রায় এ বিশ্বাসই রাখত যে, আল্লাহ্ তা'আলাই সৃষ্টিকর্তা, মালিক এবং সব কিছুতে ক্ষমতাশালী। শয়তান তাদেরকে বিভ্রান্ত করলে তারা নিজেদের কল্পনা অনুযায়ী ফেরেশতাগণের আকার-আকৃতিতে মূর্তি-বিগ্রহ তৈরি করল। অতপর এই বিশ্বাস পোষণ করে নিল যে, এসব মূর্তি-বিগ্রহের প্রতি সম্মান ও ভক্তি প্রদর্শন করলে সে ফেরেশতাগণ সন্তুষ্ট হবে, যাদের আকৃতিতে মূর্তি-বিগ্রহ নির্মিত হয়েছে। ফেরেশতাগণ আল্লাহ্র নৈকট্যশীল। অথচ তারা জানত যে, এসব মূর্তি তাদেরই হাতের তৈরি। এদের কোন বুদ্ধি-জ্ঞান, চেতনা-চৈতন্য ও শক্তি-বল কিছুই নেই। তারা আল্লাহ্ তা'আলার দরবারকে দুনিয়ার রাজা-বাদশাহ্দের দরবারের মতই ধারণা করে নিয়েছিল। রাজদরবারের নৈকট্যশীল ব্যক্তি কারও প্রতি প্রসন্ন হলে রাজার কাছে সুপারিশ করে তাকেও রাজার নৈকট্যশীল করে দিতে পারে। তারা মনে করত, ফেরেশতাগণও রাজকীয় সভাসদবর্গের ন্যায় যে কারও জন্য সুপারিশ করতে পারে। কিন্তু তাদের এসব ধারণা শয়তানী, বিভ্রান্তি ও ভিত্তিহীন কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রথমত এসব মূর্তি বিগ্রহ ফেরেশতাগণের আকৃতির অনুরূপ নয়। হলেও আল্লাহ্র নৈকট্যশীল ফেরেশতাগণ নিজেদের পূজা-অর্চনায় কিছুতেই সন্তুষ্ট হতে পারে না। আল্লাহ্র কাছে অপছন্দনীয় এমন যে কোন বিষয়কে তারা স্বভাবগতভাবে ঘৃণা করে। এতদ্ব্যতীত তারা আল্লাহ্র দরবারে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে কোন সুপারিশ করতে পারে না যে পর্যন্ত না তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা কোন বিশেষ ব্যক্তির ব্যাপারে সুপারিশ করার অনুমতি দেন। নিম্নোক্ত কোরআনী আয়াতের অর্থ তাই ঃ

كَمْ مِّنْ مَّلَكٍ فِى السَّمٰوٰتِ لَا تُغْنِىْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ اَنْ

يَّاْذَنَ اللّٰهُ لِمَنْ يَّشَاۤءُ وَيَرْضٰى -

তৎকালীন মুশরিকরাও বর্তমান কাফিরদের চেয়ে উত্তম ছিল ঃ বর্তমান যুগের বস্তুবাদী কাফিররা আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্ব তো স্বীকার করেই না, উপরন্তু আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি সরাসরি ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে। ইউরোপ থেকে আমদানীকৃত কমিউ-নিজম ও ক্যাপিটালিজমের পারস্পরিক রঙ যত ভিন্ন ভিন্নই হোক না কেন, উভয় কুফরের মোদ্দাকথা এই যে, নাউযুবিল্লাহ 'খোদা' বলতে কিছুই নেই, আমরাই আমাদের ইচ্ছার

মালিক। আমাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার কেউ নেই। এ জঘন্যতম কুফর ও অকৃতজ্ঞতার ফলশ্রুতিতেই সমগ্র বিশ্ব থেকে শান্তি, স্বস্তি, স্থিতিশীলতা ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিদায় নিয়েছে। বর্তমান সুখ ও আরামের নতুন নতুন সাজসরঞ্জাম রয়েছে, কিন্তু সুখ নেই। চিকিৎসার আধুনিক যন্ত্রপাতি এবং গবেষণার প্রাচুর্য রয়েছে, কিন্তু রোগ-ব্যাধিরও এত আধিক্য, যা পূর্বে কোনকালে শোনা যায়নি। পাহারা চৌকি, পুলিশ ও গুপ্ত পুলিশ যন্ত্রতন্ত্র ছড়িয়ে থাকা সত্ত্বেও অপরাধের মাত্রা নিত্যদিনই বেড়ে চলেছে। চিন্তা করলে দেখা যায়, নতুন নতুন যন্ত্রপাতি এবং সুখ ও আরামের নব নব পদ্ধতিই মানব জাতির বিপদ ডেকে আনছে। কুফরের শাস্তি তো পরকালে সকল কাফিরের জন্যই চিরস্থায়ী জাহান্নাম। কিন্তু এ অন্ধ অকৃতজ্ঞতার কিছু শাস্তি দুনিয়াতেও ভোগ করতে হবে বৈ কি। যে আল্লাহ্‌র দেওয়া উপাদানসমূহ ব্যবহার করে তারা আকাশে আরোহণ করতে সাহসী হয়েছে, সে আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করা অন্ধ অকৃতজ্ঞতা নয় কি? انا فقدنا صاحب منزلنا فى داخل الكهف (আমরা গুহাভ্যন্তরে গৃহ স্বামীকে হারিয়ে ফেলেছি।)

لَوْ اَرَادَ اللّٰهُ اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا--যারা ফেরেশতাগণকে আল্লাহ্‌র সন্তান বলে আখ্যা দিত, তাদের এ ভ্রান্ত ধারণা নিরসনকল্পে অসম্ভবকে সম্ভব ধরে নেওয়ার পর্যায়ে বলা হয়েছে, যদি আল্লাহ্ তা'আলার কোন সন্তান হত, তবে তা তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত হওয়া অসম্ভব। কেননা, জবরদস্তি সন্তান তাঁর উপর চাপতে পারে না। যদি আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হত, তবে তাঁর সত্তা ব্যতীত সবই তো তাঁর সৃষ্ট, অতএব তাদের মধ্য থেকেই কাউকে সন্তানরূপে গ্রহণ করতেন। সন্তান ও সন্তান জন্মদাতা উভয়ের সমজাত হওয়া অত্যাবশ্যক। অথচ সৃষ্টি স্রষ্টার সমজাত হতে পারে না। তাই সৃষ্টিকে সন্তানরূপে গ্রহণ করা অসম্ভব।

تكوير--يُكَوِّرُ الَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ অর্থ এক বস্তুকে অপর বস্তুর উপর রেখে তাকে আচ্ছাদিত করে দেওয়া। কোরআন পাক দিবারাত্রির পরিবর্তনকে এখানে সাধারণের জন্য تكوير শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছে। রাত্রি আগমন করলে যেন দিনের আলোর উপর পর্দা রেখে দেওয়া হয় এবং দিনের আগমনে রাত্রির অন্ধকার যেন যবনিকার অন্তরালে চলে যায়।

চন্দ্র ও সূর্য উভয়ই গতিশীল: كُلٌّ يَّجْرِىْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى--এ থেকে জানা যায় যে, সূর্য ও চন্দ্র উভয়ই বিচরণ করে। সৌর বিজ্ঞান ও ভূ-তত্ত্বের বস্তুনিষ্ঠ গবেষণা কোরআন পাক অথবা যে কোন আসমানী গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় নয়। কিন্তু এ ব্যাপারে প্রসঙ্গক্রমে কোথাও কোন বিষয় বর্ণিত হলে তার উপর ঈমান রাখা ফরয। বৈজ্ঞানিকদের

প্রাচীন ও আধুনিক গবেষণা তো নিত্য পরিবর্তনশীল বিষয়; কিন্তু কোরআন পাকের তথ্যাবলী অপরিবর্তনীয়। আলোচ্য আয়াত এতটুকু ব্যক্ত করেছে যে, চন্দ্র ও সূর্য উভয়ই গতিশীল। এর উপর বিশ্বাস রাখা ফরয। এখন আমাদের সামনে সূর্যের উদয় ও অস্ত পৃথিবীর ঘূর্ণন দ্বারা হয় না, স্বয়ং সূর্যের ঘূর্ণন দ্বারা হয়, তা কোরআন পাক বর্ণনা করেনি। অভিজ্ঞতার আলোকে যা জানা যায়, তা মেনে নিতে আপত্তি নেই।

أَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ الْأَنْعَامِ—আয়াতে চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টিকে أَنْزَلَ শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে, যার অর্থ আকাশ থেকে নাযিল করা। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এগুলোর সৃষ্টিতে আকাশ থেকে অবতীর্ণ পানির প্রভাব অত্যধিক। তাই এগুলোও যেন আকাশ থেকেই অবতীর্ণ হয়েছে বলা যায়। মানুষের পোশাকের ক্ষেত্রেও কোরআন পাক এ শব্দ ব্যবহার করেছে। বলা হয়েছে—وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا—খনিজ পদার্থ লোহার ক্ষেত্রেও তাই বলা হয়েছে—وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ—সবগুলোর সারমর্মই এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় কুদরতে এগুলো সৃষ্টি করে মানুষকে দান করেছেন। —(কুরতুবী)

خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ— এতে মানব সৃষ্টির অন্তর্নিহিত আল্লাহ্র কুদরতের কিছু রহস্য উন্মোচন করা হয়েছে। প্রথমত আল্লাহ্র কুদরতে এটাও ছিল যে, তিনি মায়ের পেটে সন্তানকে একই সময়ে পূর্ণাঙ্গরূপে সৃষ্টি করতে পারতেন, কিন্তু উপযোগিতার তাগিদে এরূপ করেন নি, বরং خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ তথা পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করার পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। ফলে যে নারীর গর্ভে এই ক্ষুদ্র জগৎ সৃষ্টি হতে থাকে, সে ধীরে ধীরে এই বোঝা বহনে অভ্যস্ত হতে পারে। দ্বিতীয়ত এই অনুপম সুন্দর সৃষ্টির মধ্যে শত শত সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি এবং রক্ত ও প্রাণ সঞ্চালনের জন্য চুলের মত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শিরা-উপশিরা স্থাপন করা হয়। কিন্তু সাধারণ শিল্পীর মত একাজ কোন খোলা জায়গায় বৈদ্যুতিক আলোর সাহায্যে করা হয় না বরং তিনটি অন্ধকারের মধ্যে সম্পন্ন করা হয়, যেখানে কোন মানুষের পক্ষে কিছু সৃষ্টি করা তো দূরের কথা চিন্তা-কল্পনাও সেখানে পৌঁছার পথ পায় না।

فتبارك الله احسن الخالقين

إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ ۖ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ ۖ وَإِنْ

تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ

مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ
الصُّدُورِ ۝ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ
إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ
لِلَّهِ أَندَادًا لِّيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ ۚ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا ۖ إِنَّكَ
مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ۝ أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ
الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ
وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ۝ قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ
آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ ۚ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۗ
وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ ۗ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

(৭) যদি তোমরা অস্বীকার কর, তবে আল্লাহ্ তোমাদের থেকে বেপরওয়া। তিনি তাঁর বান্দাদের কাফির হয়ে পড়া পছন্দ করেন না। পক্ষান্তরে যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও, তবে তিনি তোমাদের জন্য তা পছন্দ করেন। একের পাপভার অন্যে বহন করবে না। অতপর তোমরা তোমাদের পালনকর্তার কাছে ফিরে যাবে। তিনি তোমাদেরকে তোমাদের কর্ম সম্বন্ধে অবহিত করবেন। নিশ্চয় তিনি অন্তরের বিষয় সম্পর্কেও অবগত। (৮) যখন মানুষকে দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করে, তখন সে একাগ্রচিত্তে তার পালনকর্তাকে ডাকে, অতপর তিনি যখন তাকে নিয়ামত দান করেন, তখন সে কষ্টের কথা বিস্মৃত হয়ে যায়, যার জন্য পূর্বে ডেকেছিল এবং আল্লাহ্র সমকক্ষ স্থির করে; যাতে করে অপরকে আল্লাহ্র পথ থেকে বিভ্রান্ত করে। বলুন, তুমি তোমার কুফর সহকারে কিছুকাল জীবনোপভোগ করে নাও। নিশ্চয় তুমি জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত। (৯) যে ব্যক্তি রাত্রিকালে সিজদার মাধ্যমে অথবা দাঁড়িয়ে ইবাদত করে, পরকালের আশংকা রাখে এবং তার পালনকর্তার রহমত প্রত্যাশা করে, সে কি তার সমান, যে এরূপ করে না? বলুন, যারা জানে এবং যারা জানে না, তারা কি সমান হতে পারে? চিন্তাভাবনা কেবল তারাই করে, যারা বুদ্ধিমান। (১০) বলুন, হে আমার বিশ্বাসী বান্দাগণ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর। যারা এ দুনিয়াতে

সৎকাজ করে, তাদের জন্য রয়েছে পুন্য। আল্লাহ্‌র পৃথিবী প্রশস্ত। যারা সবরকারী, তারাই তাদের পুরস্কার পায় অগণিত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(হে মানবকূল! তোমরা কুফর ও শিরকের অসারতা শুনলে, এরপর) যদি তোমরা কুফর কর, (শিরকও এর অন্তর্ভুক্ত) তবে (তাতে) আল্লাহ্ তা'আলা (কোন রূপ ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না। কেননা, তিনি) তোমাদের (এবং তোমাদের ইবাদতের) মুখাপেক্ষী নন। (তোমরা তওহীদ ও ইবাদত অবলম্বন না করলে তাঁর কোন ক্ষতি নেই। আর একথা অতি নিশ্চিত যে,) তিনি তাঁর বান্দাদের কুফর পছন্দ করেন না। (কেননা এতে বান্দাদের ক্ষতি হয়।) যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও, (যার প্রধান লক্ষণ হল ঈমান) তবে (তাতে) তার কোন লাভ নেই, কিন্তু যেহেতু এতে তোমাদের লাভ হয়, (তাই) তিনি তোমাদের জন্য তা পছন্দ করেন। (যেহেতু আমার নীতি এই যে,) একের পাপভার অন্যে বহন করবে না, (তাই কুফর করে এরূপ মনে করো না যে, তোমার কুফর অপরের আমলনামায় কোন কারণে লিখিত হয়ে যাবে এবং তুমি নির্দোষ হয়ে যাবে। যেমন, অপরের অনুসারী হওয়ার কারণে অথবা অপরে তা বহন করার ওয়াদা করার কারণে। কোন কোন লোক বলত ঃ وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ—মোটকথা, এরূপ হবে না বরং তোমার কুফর তোমার আমলনামায়ই লেখা হবে।) অতপর তোমরা তোমাদের পালনকর্তার কাছে ফিরে যাবে। তিনি তোমাদেরকে তোমাদের কর্ম সম্বন্ধে অবহিত করবেন। (এবং শাস্তি দিবেন। সুতরাং কিয়ামত হবে না বলে তোমাদের ধারণাও ভ্রান্ত।) তিনি অন্তরের বিষয়াদি সম্পর্কে অবগত। (সুতরাং এরূপ ধারণাও মিথ্যা যে, তিনি হয়তো তোমাদের কুফর সম্পর্কে অবগত নন। হাদীসে আছে কোন কোন লোকের মধ্যে এরূপ আলোচনা হয় যে, জানি না আল্লাহ্ আমাদের কথাবার্তা শুনেন কিনা। অতপর এ সম্পর্কে নানা জনে নানা মত প্রকাশ করে। এরই প্রেক্ষিতে وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ---আয়াত নাযিল হয়।) যখন (মুশরিক) লোকদেরকে দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করে, তখন তারা তার (সত্যিকার) পালনকর্তাকে একনিষ্ঠভাবে ডাকে (এবং অন্য সব উপাস্যকে ভুলে যায়।) অতপর যখন তিনি তাকে নিজের পক্ষ থেকে নিয়ামত (শান্তি ও সুখ) দান করেন, তখন সে কষ্টের বিষয় ভুলে যায়, যার (অর্থাৎ যা অপসারিত করার) জন্যই পূর্বে (আল্লাহ্‌কে) ডেকেছিল এবং আল্লাহ্‌র অংশীদার স্থির করে, যাতে (নিজে তো বিভ্রান্ত আছেই, এছাড়া) অপরকেও আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিভ্রান্ত করে। (সে যদি পূর্বের দুঃখকষ্ট বিস্মৃত না হত, তবে খাঁটি তওহীদপন্থী হয়ে যেত। এ হল মুশরিকের নিন্দা। অতপর শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে ঃ) আপনি (এ ধরনের লোকদেরকে) বলে দিন, তুমি তোমার কুফরের স্বাদ কিছুকাল ভোগ করে নাও। (অতপর নিশ্চয় তুমি জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। অতপর তওহীদ পন্থীদের প্রশংসা করে

সুসংবাদ দেওয়া হয়েছেঃ) যে ব্যক্তি (উপরোক্ত মুশরিকের বিপরীতে) রাত্রিকালে (যা সাধারণত গাফলতির সময়) সিজদা ও দণ্ডায়মান (অর্থাৎ নামাযরত) অবস্থায় ইবাদত করে (এবং অন্তরে) পরকালের আশংকা রাখে এবং তার পালনকর্তার রহমত প্রত্যাশা করে, (এমন ব্যক্তিও উপরোক্ত মুশরিকদের সমান হতে পারে কি? কখনও নয়। বরং 'কানেত' তথা নিয়মিত ইবাদতকারী এবং আল্লাহ্কে যে ভয় করে এবং তার কাছ থেকেই রহমত প্রত্যাশা করে সে প্রশংসার যোগ্য। পক্ষান্তরে যে মুশরিক স্বার্থ উদ্ধারের পর নিষ্ঠা পরিহার করে সে নিন্দার যোগ্য। আর যেহেতু এভাবে ইবাদত পরিহার করাকে কাফিররা নিন্দনীয় বলে মনে করত না, তাই এ পার্থক্যের কারণে প্রশংসা ও নিন্দার হুকুম সম্পর্কে তাদের সন্দেহ হতে পারত। কাজেই পরবর্তীতে অধিকতর প্রকৃষ্টভাবে প্রমাণ করা হচ্ছে যে, হে পয়গম্বর!) আপনি (তাদেরকে এভাবে) বলে দিন যে, জ্ঞানী ও মূর্খ কি সমান হতে পারে? (মূর্খতাকে যেহেতু সবাই নিন্দনীয় মনে করে, তাই এর উত্তরে তারা বলবে, যে জানে না, সে নিন্দার্হ। যদিও এ বর্ণনা থেকে কুফর ও কাফিরের নিন্দার যোগ্য হওয়া এবং ঈমান ও মু'মিনের প্রশংসার যোগ্য হওয়া প্রমাণিত হয়ে গেছে, তথাপি) উপদেশ তারাই গ্রহণ করে, যারা (সুস্থ) বুদ্ধির অধিকারী। (অতএব, আপনি আনুগত্যের প্রতি উৎসাহিত করার জন্য মু'মিনদেরকে আমার পক্ষ থেকে) বলে দিন, হে আমার বিশ্বাসী বান্দাগণ, তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর (অর্থাৎ সদাসর্বদা তাঁর আনুগত্য কর এবং নাফরমানী থেকে বেঁচে থাক। এগুলো আল্লাহ্ ভীতির শাখা। অতপর এর ফলাফল বর্ণিত হয়েছেঃ) যারা দুনিয়াতে সৎকাজ করে, তাদের জন্য রয়েছে প্রতিদান। (পরকালে তো অবশ্যই, আন্তরিক সুখ অনিবার্য এবং কখনও বাহ্যিক সুখও।) নিজ দেশে সৎকাজ করার পথে বাধা থাকলে হিজরত করে অন্যত্র চলে যাও। (কেননা,) আল্লাহ্র পৃথিবী সুবিস্তীর্ণ। (যদি দেশ ত্যাগে কষ্ট অনুভব কর, তবুও অন্তরে দৃঢ়তা পোষণ কর। কেননা, ধর্মের কাজে) দৃঢ়তা পোষণকারীরা তাদের পুরস্কার পাবে অগণিত। (এর মাধ্যমে আনুগত্যের প্রতি উৎসাহিত করা হল।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ—অর্থাৎ তোমাদের ঈমান দ্বারা আল্লাহ্র কোন উপকার হয় না এবং কুফর দ্বারাও কোন ক্ষতি হয় না। সহীহ্ মুসলিমের হাদীসে আছে, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, হে আমার বান্দারা, যদি তোমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী লোকগণ এবং জিন ও মানব সবাই চূড়ান্ত পাপাচারে লিপ্ত হয়ে যায়, তবুও আমার রাজত্ব বিন্দু পরিমাণও হ্রাস পায় না—(ইবনে কাসীর)

وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ—অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদের কুফর পছন্দ করেন না। এখানে رضاء শব্দের অর্থ মহব্বত করা অথবা আপত্তি ব্যতিরেকে

কোন কাজের ইচ্ছা করা। এর বিপরীতে سخط শব্দ ব্যবহৃত হয়, যার অর্থ কোন কিছুকে অপছন্দ করা অথবা আপত্তিকর সাব্যস্ত করা যদিও তার সাথে ইচ্ছাও জড়িত থাকে।

আহলে সুন্নত ওয়াল জমা'আতের বিশ্বাস এই যে, দুনিয়াতে কোন ভাল অথবা মন্দ কাজ, ঈমান অথবা কুফর আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা ব্যতিরেকে অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না। তাই প্রত্যেকটি কাজের অস্তিত্ব লাভের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা শর্ত। তবে আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি ও পছন্দ কেবল ঈমান ও ভাল কাজের সাথেই সম্পৃক্ত। কুফর, শিরক ও পাপাচার তিনি পছন্দ করেন না। শায়খুল ইসলাম নভভী 'উসুল ও যাওয়াবেত' গ্রন্থে লিখেছেন :

مذهب اهل الحق الايمان بالقدر و اثباته وان جميع الكائنات خيرها وشرها بقضاء الله و قدره و هو مريدلها كلها و يكره المعاصى مع انه تعالى مريد لها لحكمة يعلمها - جل و علا -

সত্যপন্থীদের মযহাব তকদীরে বিশ্বাস করা। আরও এই যে, ভাল-মন্দ সমস্ত সৃষ্ট বস্তু আল্লাহ্র আদেশ ও তকদীর দ্বারা অস্তিত্ব লাভ করে এবং আল্লাহ্ তা'আলা এগুলো সৃষ্টির ইচ্ছাও করেন। কিন্তু তিনি পাপাচারকে অপছন্দ করেন যদিও কোন উপযোগিতার কারণে এসব পাপাচার সৃষ্টির ইচ্ছা করেন। এই উপযোগিতা কি, তা তিনিই জানেন। ---(রূহুল মা'আনী)

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ---এই বাক্যের পূর্বে কাফিরদেরকে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনে কুফর ও পাপাচারের স্বাদ উপভোগ করে নাও। অবশেষে তোমরা জাহান্নামের ইন্ধন হবে। এর পর এ বাক্যে অনুগত মু'মিনের কথা বর্ণনা করা হয়েছে এবং একে أَمَّنْ প্রশ্নবোধক শব্দ দ্বারা শুরু করা হয়েছে। তফসীরবিদগণ বলেন, এর পূর্বে একটি বাক্য উহ্য রয়েছে, অর্থাৎ কাফিরকে বলা হবে---তুমি উত্তম, না সে অনুগত মু'মিন বান্দা উত্তম, যার কথা এখন উল্লেখ করা হবে? قانت শব্দের কয়েক রকম তরজমা করা হয়েছে। হযরত ইবনে মসউদ (রা) বলেন, এর অর্থ আনুগত্যশীল। শব্দটি যখন বিশেষভাবে নামাযের ক্ষেত্রে বলা হয়, যেমন قُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ---তখন এর অর্থ হবে সে ব্যক্তি, যে নামাযে দৃষ্টি নত রাখে এবং এদিক-সেদিক দেখে না, নিজের কোন অঙ্গ অথবা কাপড় নিয়ে খেলা করে না এবং দুনিয়ার কোন বিষয় ইচ্ছাকৃতভাবে নামাযে স্মরণ করে না। ভুল ও অনিচ্ছাকৃত কল্পনা এর পরিপন্থী নয়।---(কুরতুবী)

انَاءَ اللَّيْلِ—এর অর্থ রাত্রির প্রহরসমূহ। অর্থাৎ রাত্রির শুরুভাগ, মধ্যবর্তী ও শেষাংশ। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি হাশরের ময়দানে সহজ হিসাব কামনা করে, তার উচিত হবে আল্লাহ্ যেন তাকে রাত্রির অন্ধকারে সিজদারত ও দাঁড়ানো অবস্থায় পান। তার মধ্যে পরকালের চিন্তা এবং রহমতের প্রত্যাশাও থাকা দরকার। কেউ কেউ মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময়কেও اناءالليل বলেছেন।---(কুরতুবী)

وَاَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةٌ---এর পূর্বের বাক্যে সৎকাজের নির্দেশ রয়েছে। এতে কেউ আপত্তি করতে পারত যে, আমি যে শহরে অথবা রাষ্ট্রে বাস করছি কিংবা যে পরিবেশে আটকে আছি তা সৎকাজের প্রতিবন্ধক। এর জওয়াব এ বাক্যে দেওয়া হয়েছে যে, কোন বিশেষ রাষ্ট্র কিংবা শহর অথবা বিশেষ পরিবেশ থেকে যদি শরীয়তের হুকুম-আহকাম পালন করা দুষ্কর হয়, তবে তা ত্যাগ করা উচিত, আল্লাহ্র পৃথিবী সুপ্রশস্ত। সুতরাং আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধ পালনের উপযোগী কোন স্থানে ও পরিবেশে গিয়ে বসবাস করা দরকার। এতে অনুপযুক্ত পরিবেশে থেকে হিজরত করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। হিজরতের বিস্তারিত বিধি-বিধান সূরা নিসায় বর্ণিত হয়েছে ঃ

اِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ—بِغَيْرِ حِسَابٍ---অর্থ সবরকারীদের সওয়াব কোন নির্ধারিত পরিমাণে নয়---অপরিসীম ও অগণিত দেওয়া হবে। হাদীসে তাই বর্ণিত হয়েছে। কেউ কেউ بِغَيْرِ حِسَابٍ--এর অর্থ বর্ণনা করেছেন যে, দুনিয়াতে কারও কাছে কারও কোন প্রাপ্য থাকলে তাকে নিজের প্রাপ্য দাবি করে আদায় করতে হয়। কিন্তু আল্লাহ্র কাছে দাবি ব্যতিরেকেই সবরকারীরা তাদের সওয়াব পাবে।

হযরত আনাসের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, কিয়ামতের দিন ইনসাফের দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করা হবে। দাতাগণ আগমন করলে তাদের দান খয়রাত ওযন করে সে হিসাবে পূর্ণ সওয়াব দান করা হবে। এমনিভাবে নামায, হজ্জ ইত্যাদি ইবাদতকারীদের ইবাদত মেপে তাদেরকে প্রতিদান দেওয়া হবে। অতপর বালা-মুসিবতে সবর-কারীরা আগমন করলে তাদের জন্য কোন ওযন ও মাপ হবে না, বরং তাদেরকে অপরিমিত ও অগণিত সওয়াব দেওয়া হবে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

اِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ---ফলে যাদের পার্থিব জীবন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে অতিবাহিত হয়েছে, তারা বাসনা প্রকাশ করবে---হায়, দুনিয়াতে আমাদের দেহ কাঁচির সাহায্যে কর্তিত হলে আজ আমরাও সবরের এমনি প্রতিদান পেতাম!

ইমাম মালিক (র) এ আয়াতে صابرين--এর অর্থ নিয়েছেন যারা দুনিয়াতে বিপদাপদ ও দুঃখ-কষ্টে সবর করে। কেউ কেউ বলেন, যারা পাপকাজ থেকে সংযম অবলম্বন করে, আয়াতে তাদেরকে صابرون বলা হয়েছে। কুরতুবী বলেন, صابر শব্দকে অন্য কোন শব্দের সাথে সংযুক্ত না করে ব্যবহার করলে তার অর্থ হয় পাপ-কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখার কষ্ট সহ্যকারী। পক্ষান্তরে বিপদাপদে সবরকারীর অর্থে ব্যবহার করা হলে তার সাথে সে বিপদও সংযুক্ত হয়ে উল্লেখিত হয়। যেমন বলা হয়---صابر على كذا অর্থাৎ অমুক বিপদে সবরকারী।

قُلْ إِنِّيٓ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ﴿١١﴾ وَأُمِرْتُ
لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿١٢﴾ قُلْ إِنِّيٓ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي
عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٣﴾ قُلِ ٱللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهُۥ دِينِي ﴿١٤﴾
فَٱعْبُدُوا۟ مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِۦ ۗ قُلْ إِنَّ ٱلْخَٰسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا۟
أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۗ أَلَا ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ ﴿١٥﴾
لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ ٱلنَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ۚ ذَٰلِكَ يُخَوِّفُ
ٱللَّهُ بِهِۦ عِبَادَهُۥ ۚ يَٰعِبَادِ فَٱتَّقُونِ ﴿١٦﴾ وَٱلَّذِينَ ٱجْتَنَبُوا۟ ٱلطَّٰغُوتَ
أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ لَهُمُ ٱلْبُشْرَىٰ ۚ فَبَشِّرْ عِبَادِ ﴿١٧﴾
ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُۥ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ
هَدَىٰهُمُ ٱللَّهُ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمْ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَٰبِ ﴿١٨﴾ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ
ٱلْعَذَابِ ۗ أَفَأَنتَ تُنقِذُ مَن فِى ٱلنَّارِ ﴿١٩﴾ لَٰكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا۟ رَبَّهُمْ
لَهُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ ۙ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ ۖ وَعْدَ
ٱللَّهِ ۗ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِيعَادَ ﴿٢٠﴾

(১১) বলুন, আমি নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ্‌র ইবাদত করতে আদিষ্ট হয়েছি। (১২) আরও আদিষ্ট হয়েছি, সর্ব প্রথম নির্দেশ পালনকারী হওয়ার জন্য। (১৩) বলুন, আমি আমার পালনকর্তার অবাধ্য হলে এক মহা দিবসের শাস্তির ভয় করি। (১৪) বলুন, আমি নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ্ তা'আলারই ইবাদত করি। (১৫) অতএব তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যার ইচ্ছা তার ইবাদত কর। বলুন, কিয়ামতের দিন তারাই বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হবে, যারা নিজেদের ও পরিবারবর্গের তরফ থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। জেনে রাখ, এটাই সুস্পষ্ট ক্ষতি। (১৬) তাদের জন্য উপর দিক থেকে এবং নিচের দিক থেকে আগুনের মেঘমালা থাকবে। এ শাস্তি দ্বারা আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদেরকে সতর্ক করেন যে, হে আমার বান্দাগণ, আমাকে ভয় কর। (১৭) যারা শয়তানী শক্তির পূজা-অর্চনা থেকে দূরে থাকে এবং আল্লাহ্ অভিমুখী হয়, তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ। অতএব সুসংবাদ দিন আমার বান্দাদেরকে, (১৮) যারা মনোনিবেশ সহকারে কথা শুনে, অতপর যা উত্তম তার অনুসরণ করে। তাদেরকেই আল্লাহ্ সৎপথ প্রদর্শন করেন এবং তারাই বুদ্ধিমান। (১৯) যার জন্য শাস্তির হুকুম অবধারিত হয়ে গেছে আপনি কি সে জাহান্নামীকে মুক্ত করতে পারবেন? (২০) কিন্তু যারা তাদের পালন-কর্তাকে ভয় করে, তাদের জন্য নির্মিত রয়েছে প্রাসাদের উপর প্রাসাদ। এগুলোর তলদেশে নদী প্রবাহিত। আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতির খেলাফ করেন না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি বলে দিন, আমি (আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে) আদিষ্ট হয়েছি যেন খাঁটিভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদত করি (অর্থাৎ তাতে যেন শিরকের নামগন্ধও না থাকে)। আমি (আরও) আদিষ্ট হয়েছি, (এ উম্মতের সমস্ত লোকের মাঝে যেন) আমিই হই সর্ব প্রথম মুসলমান (ইসলামকে সত্য জ্ঞানকারী)। (বলাবাহুল্য, বিধি-বিধান কবূল করার ব্যাপারে পয়গম্বরের সর্বাগ্রবর্তী হওয়া জরুরী।) আপনি (আরও) বলে দিন, যদি আমি আমার পালনকর্তার অবাধ্য হই, তবে আমি এক মহা দিবসের (অর্থাৎ কিয়া-মতের) শাস্তির আশংকা করি। আপনি (আরও) বলে দিন, (আমাকে যা আদেশ করা হয়েছে, আমি তাই পালন করছি, সেমতে) আমি নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ্ তা'আলারই ইবাদত করি (এতে শিরকের নামগন্ধ নেই)। অতএব (এর দাবি এই যে, তোমরাও এরূপ খাঁটি ইবাদত কর। কিন্তু তোমরা যদি তা না মান, তবে) তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যার ইচ্ছা তার ইবাদত করতে পার। (কিয়ামতের দিন এর স্বাদ বুঝতে পাবে।) আপনি (আরও) বলে দিন, সে ব্যক্তিরাই ক্ষতিগ্রস্ত যারা নিজের ও পরি-বারবর্গের তরফ থেকে কিয়ামতের দিন ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (অর্থাৎ নিজের পক্ষ থেকেও কোন উপকার পাবে না এবং পরিবারবর্গের তরফ থেকেও না। কেননা পরিবারবর্গ তাদেরই মত পথভ্রষ্ট হলে তারাও আযাবে থাকবে। এমতাবস্থায় অপরের কি উপ-কার করতে পারবে? যদি তারা খাঁটি মু'মিন হয়ে জান্নাতে থাকে, তাহলেও তারা কাফিরদের জন্য সুপারিশ করে উপকার করতে পারবে না।) মনে রেখো, এটাই

সুস্পষ্ট ক্ষতি। তাদের জন্য উপর দিক থেকে এবং নিচের দিক থেকে পরিবেষ্টনকারী অগ্নিশিখা থাকবে। এ শাস্তি দ্বারা আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদেরকে সতর্ক করেন (এবং এ থেকে আত্মরক্ষার উপায় বর্ণনা করেন)। অতএব হে আমার বান্দারা, আমাকে (অর্থাৎ আমার শাস্তিকে) ভয় কর। (এ হচ্ছে কাফির-মুশরিকদের অবস্থা।) যারা শয়তানী শক্তির পূজা থেকে দূরে থাকে, (শয়তানের পূজা অর্থ শয়তানের আনুগত্য করা।) এবং সর্বতোভাবে আল্লাহ্ অভিমুখী হয়, তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ। অতএব আপনি আমার বান্দাদেরকে সুসংবাদ দিন, যারা মনোযোগ দিয়ে (আল্লাহ্র) কথা শুনে, অতপর যা উত্তম (আল্লাহ্র কথা সবই উত্তম।) তার অনুসরণ করে, তাদেরকেই আল্লাহ্ সৎপথ প্রদর্শন করেন এবং তারাই বুদ্ধিমান। (তাদেরকে কিসের সুসংবাদ দিতে হবে, তার বর্ণনা لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا আয়াতে রয়েছে মধ্যস্থলে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সান্ত্বনা দানের জন্য বলা হয়েছে ঃ) যার জন্য (তকদীর-গতভাবে) শাস্তির আদেশ অবধারিত হয়ে গেছে, আপনি কি (আল্লাহ্র জানা) সেই জাহান্নামীকে (জাহান্নামের কারণাদি থেকে) রক্ষা করতে পারেন? (অর্থাৎ যে জাহান্নামে যাবে, তাকে চেষ্টা করেও ফিরানো যাবে না। অতএব তাদের জন্য দুঃখ করা অর্থহীন। কিন্তু যারা এমন যে, তাদের জন্য শাস্তির আদেশ অবধারিত হয়নি। ফলে আপনার কাছে আদেশ নিষেধ শুনে তারা) তাদের পালনকর্তাকে ভয় করে, তাদের জন্য রয়েছে (জান্নাতের) প্রাসাদ, যার উপরে আরও প্রাসাদ নির্মিত রয়েছে। এগুলোর পাদদেশে নদী প্রবাহিত। আল্লাহ্ এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আল্লাহ্ ওয়াদার খিলাফ করেন না। (উপরে فَبَشِّرْ عِبَادِ বলে যে সুসংবাদ দানের আদেশ দেওয়া হয়েছিল, এটাও সে একই বিষয়বস্তু।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ

এ আয়াতের তফসীরে তফসীরবিদগণের উক্তি বিভিন্নরূপ। ইবনে কাসীর কর্তৃক গৃহীত উক্তি তফসীরের সারসংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। তা এই যে, এখানে قول অর্থ আল্লাহ্র কালাম কোরআন অথবা তৎসহ রসূলের শিক্ষাসমূহ। এগুলো সবই উত্তম। তাই স্থানোপযোগী বাহ্যিক বাক্য এরূপ ছিল ঃ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَهُ

কিন্তু এ স্থলে احسن শব্দটি যোগ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তারা কোরআন ও রসূলের শিক্ষাসমূহের অনুসরণ চক্ষু বন্ধ করে করেনি। মূর্খরা তাই করে। তারা কারও কথা শুনে হিতাহিত বিবেচনা না করেই তার অনুসরণ শুরু করে দেয়। বরং তারা আল্লাহ্ ও রসূলের কথাকে সত্য ও উত্তম দেখার পর তার অনুসরণ করেছে। এর ফলশ্রুতিতে আয়াতের শেষাংশে তাদেরকে اولوا الالباب তথা বোধশক্তি সম্পন্ন খেতাব দেওয়া হয়েছে। এর দৃষ্টান্ত কোরআনের মধ্যেই তওরাত সম্পর্কে হযরত মূসা (আ)-কে প্রদত্ত আদেশের ভেতরে রয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

خُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا—এতেও احسن বলে সমগ্র তওরাত ও তার বিধি-বিধান বোঝানো হয়েছে। আলোচ্য আয়াতেও তেমনি قول অর্থ কোরআন এবং اتباع احسن অর্থ সমগ্র কোরআনের অনুসরণ। পরবর্তী এক আয়াতে একেই احسن الحديث বলা হয়েছে। এই তফসীর অনুযায়ী কেউ কেউ আরও বলেন যে, কোরআন পাকেও অনেক حسن (ভাল) ও احسن (উত্তম) শ্রেণীর বিধান রয়েছে। উদাহরণত প্রতিশোধ নেওয়া ও ক্ষমা করা উভয়টি জায়েয, কিন্তু ক্ষমা করা উত্তম ও শ্রেয় বলা হয়েছে—وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ—অনেক ব্যাপারে কোরআন মানুষকে বৈধ দু'টি পন্থার যে কোন একদিক অবলম্বন করার ক্ষমতা দিয়েছে। কিন্তু তন্মধ্যে একটি পন্থাকে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ বলেছে; যেমন, وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى—অনেক ব্যাপারে স্বাধীনতা দিয়েছে, কিন্তু বাধ্যবাধকতার উপর আমল করাকে উত্তম বলা হয়েছে। অতএব আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়াচ্ছে এই যে, এসব লোক কোরআনের সাবধানতার বিধানও শুনে বাধ্যবাধকতাও শুনে; কিন্তু অনুসরণ করে বাধ্যবাধকতার উপর এবং احسن ও حسن শ্রেণীর দু'পন্থার মধ্য থেকে احسن—কে অবলম্বন করে।

অনেক তফসীরবিদ এক্ষেত্রে قول-এর অর্থ নিয়েছেন সাধারণ মানুষের কথা-বার্তা। এতে তওহীদ, শিরক, কুফর, ইসলাম, সত্য, মিথ্যা ইত্যাদি সব রকম কথাবার্তাই অন্তর্ভুক্ত। এ তফসীর অনুযায়ী আয়াতের অর্থ এই যে, যারা কাফির, মু'মিন, সত্য-মিথ্যা ও ভাল-মন্দ নির্বিশেষে সব কথাই শুনে, কিন্তু অনুসরণ উত্তমটিরই করে, তওহীদ ও শিরকের কথা শুনে তওহীদের অনুসরণ করে এবং সত্য ও মিথ্যা

কথা শুনে সত্যের অনুসরণ করে। সত্যেরও বিভিন্ন স্তর থাকলে সর্বোত্তম স্তরের অনুসরণ করে। এ কারণেই তাদেরকে দু'টি বিশেষণে বিশেষিত করা হয়েছে। এক هَدٰىهُمُ اللّٰهُ অর্থাৎ তাদেরকে আল্লাহ্ হিদায়েত দান করেছেন, ফলে বিভিন্ন প্রকার কথা শুনে বিভ্রান্ত হয় না। দুই— اُولٰٓئِكَ هُمْ اُولُوا الْاَلْبَابِ —অর্থাৎ তারাই বুদ্ধিমান। বস্তুত ভাল-মন্দ ও সত্য-মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করাই বুদ্ধির কাজ।

তাই বলা হয়েছে যে, আলোচ্য আয়াত আমর ইবনে নুফায়েল, আবূ যর গিফারী ও সালমান ফারসী (রা) প্রমুখ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। আমর ইবনে নুফায়েল জাহেলিয়াত যুগেও শিরক ও মূর্তি পূজাকে ঘৃণা করতেন। আবূ যর গিফারী ও সালমান ফারসী মুশরিক, ইহুদী, খৃস্টান ইত্যাদি ধর্মাবলম্বীদের কথাবার্তা শুনে ও তাদের রীতি-নীতি আচার-আচরণ পরখ করার পর ইসলামকেই গ্রহণ করেছেন।—(কুরতুবী)

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَسَلَكَهٗ يَنَابِيْعَ فِى الْاَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهٖ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰىهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهٗ حُطَامًا ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِاُولِى الْاَلْبَابِ ﴿٢١﴾ اَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ فَهُوَ عَلٰى نُوْرٍ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ فَوَيْلٌ لِّلْقٰسِيَةِ قُلُوْبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ؕ اُولٰٓئِكَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٢٢﴾ اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتٰبًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِىَ ۖ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُوْدُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ۚ ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُوْدُهُمْ وَقُلُوْبُهُمْ اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِىْ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ ﴿٢٣﴾

(২১) তুমি কি দেখনি যে, আল্লাহ্ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন, অতপর সে পানি যমীনের ঝর্ণাসমূহে প্রবাহিত করেছেন। এরপর তদ্দ্বারা বিভিন্ন রঙের ফসল উৎপন্ন করেন, অতপর তা শুকিয়ে যায়, ফলে তোমরা তা পীতবর্ণ দেখতে পাও। এরপর আল্লাহ্ তাকে খড়-কুটায় পরিণত করে দেন। নিশ্চয় এতে বুদ্ধিমানদের জন্য উপদেশ রয়েছে। (২২) আল্লাহ্ যার বক্ষ ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, অতপর সে তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে আগত আলোর মাঝে রয়েছে, সে কি তার

সমান, যে এরূপ নয়ঃ যাদের অন্তর আল্লাহ্‌র স্মরণের ব্যাপারে কঠোর, তাদের জন্য দুর্ভোগ। তারা সুস্পষ্ট গোমরাহীতে রয়েছে। (২৩) আল্লাহ্ উত্তম বাণী তথা কিতাব নাযিল করেছেন, যা সামঞ্জস্যপূর্ণ, পুনঃ পুনঃ পঠিত। এতে তাদের লোম কাঁটা দিয়ে উঠে চামড়ার উপর, যারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করে, এরপর তাদের চামড়া ও অন্তর আল্লাহ্‌র স্মরণে বিনম্র হয়। এটাই আল্লাহ্‌র পথনির্দেশ, এর মাধ্যমে আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা পথপ্রদর্শন করেন। আর আল্লাহ্ যাকে গোমরাহ্ করেন, তার কোন পথপ্রদর্শক নেই।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(হে সম্বোধিত ব্যক্তি,) তুমি কি এ বিষয়টি লক্ষ্য করনি যে, আল্লাহ্ তা'আলা আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন, অতপর তাকে যমীনের রন্ধ্রে (অর্থাৎ সেসব অংশে) পৌঁছিয়ে দেন (যেখান থেকে পানি নির্গত হয়ে কূপ ও ঝর্ণার আকারে বের হয়ে আসে।) তারপর (যখন তা নির্গত হয়, তখন) তদ্দ্বারা শস্য উৎপন্ন করেন যা বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। তারপর সে শস্যসমূহ সম্পূর্ণ শুকিয়ে যায়। ফলে তোমরা সেগুলোকে পীত বর্ণের দেখতে পাও। অতপর (আল্লাহ্ তা'আলা) সেগুলোকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেন। এ (বিষয়গুলোতে) বুদ্ধিমানদের জন্য বিরাট শিক্ষা রয়েছে (যে, হুবহু এমনি অবস্থা মানুষের পার্থিব জীবনের। অর্থাৎ নিঃশেষ হয়ে যাওয়া। কাজেই এতে নিবিষ্ট হয়ে গিয়ে অনন্ত সুখ-স্বস্তি থেকে বঞ্চিত থাকা এবং সীমাহীন বিপদ মাথায় চাপিয়ে নেওয়া নিতান্তই বোকামীর কাজ। যদিও আমাদের বর্ণনা যথেষ্ট অলঙ্কারপূর্ণ, কিন্তু তবুও শ্রোতাদের মধ্যে পারস্পরিক বিপুল পার্থক্য রয়েছে।) কাজেই যার বুক ইসলামের জন্য (অর্থাৎ ইসলাম কবুল করার জন্য) আল্লাহ্ তা'আলা খুলে দিয়েছেন (অর্থাৎ ইসলামের মূল বিষয়ে তার নিশ্চিত বিশ্বাস হয়ে গেছে) এবং সে স্বীয় পরওয়ারদিগারের (দেওয়া) নূর (অর্থাৎ হিদায়েতের দাবির) উপর (চলতে) রয়েছে (অর্থাৎ বিশ্বাস স্থাপন করার পর সেমতে কাজ করতে শুরু করেছে) সে এবং সংকীর্ণহৃদয় ব্যক্তিরা কি সমান (যাদের কথা পরে বলা হচ্ছে)? সুতরাং যে সমস্ত লোকের অন্তর আল্লাহ্‌র যিকর দ্বারা (যাতে হুকুম-আহ্‌কাম ও ভীতি প্রদর্শন প্রভৃতি সবই অন্তর্ভুক্ত) প্রভাবিত হয় না (অর্থাৎ যারা ঈমান আনে না) তাদের জন্য (কিয়ামতে) রয়েছে বড়ই মন্দ পরিণতি। (আর দুনিয়াতেও) এরা প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় (বন্দী) রয়েছে। (পরবর্তীতে উল্লিখিত 'নূর' ও 'যিক্‌র'-এর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ) আল্লাহ্ তা'আলা বড়ই উত্তম কালাম (অর্থাৎ কোর-আন) অবতীর্ণ করেছেন যা এমন এক কিতাব যে, (গঠনের অনন্যতা এবং অর্থের যথার্থতার দিক দিয়ে) পারস্পারিক সামঞ্জস্যপূর্ণ (এবং যার ভেতরে মানুষের বোঝার জন্য এমন প্রয়োজনীয় কিছু বিষয় রয়েছে যা) বারবার পুনরাবৃত্ত হয়েছে। (যেমন, আল্লাহ্ বলেছেনঃ --وَلَقَدْ صَرَّفْنَا যাতে উপকারিতা, তাকীদ এবং দাবি প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে প্রতিটি ক্ষেত্রে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির হৃদয়ের বিশেষ বিশেষ অনুরাগের প্রতিও

লক্ষ্য রাখা হয়েছে; শুধু পুনরাবৃত্তিই উদ্দেশ্য নয়। আর এর 'মাসানী' হওয়া অর্থাৎ বার বার পুনরাবৃত্ত হওয়াই এর প্রমাণ যে, এটি পথপ্রদর্শকও বটে।) যদ্দ্বারা সেসব লোকের শরীর কেঁপে উঠে যারা নিজেদের পালনকর্তাকে ভয় করে। (এটি ইঙ্গিত হল ভয়ের, যদিও তা অন্তরে হয়; শরীরে তার কোন প্রতিক্রিয়া হয় না এবং সে ভয় জ্ঞান ও ঈমানগত হয়, প্রকৃতি ও স্বভাবগত হয় না।) তারপর তাদের দেহ ও অন্তর বিনম্র হয়ে আল্লাহ্‌র যিক্‌রের (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কিতাবের উপর আমল করার) প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যায়। (অর্থাৎ ভীত হয়ে দৈহিক ও আন্তরিক আমলসমূহ আনুগত্য ও বিনম্রতার সাথে সম্পাদন করে। এবং) এটি (কোরআন) হল আল্লাহ্‌র হিদায়েত। যাকে তিনি ইচ্ছা করেন তার জন্য একে হিদায়েত লাভের উপায় করে দেন। (যেমন, এই মাত্র ভীত লোকদের অবস্থা শোনানো হল।) আর আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করতে চান কেউ তার পথপ্রদর্শক নেই।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

فَسَلَكَهٗ يَنَابِيْعَ فِى الْاَرْضِ—يَنَابِيْع শব্দটি يَنْبُوْع-এর বহুবচন। অর্থ ভূমি থেকে নির্গত ঝর্ণা। উদ্দেশ্য এই যে, আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করাই এক বড় নিয়ামত, কিন্তু একে ভূগর্ভে সংরক্ষিত করার ব্যবস্থা না করা হলে মানুষ তদ্দ্বারা কেবল বৃষ্টির দিনে অথবা এর অব্যবহিত পরে কয়েকদিন উপকৃত হতে পারত। অথচ পানির অপর নাম জীবন। পানি ব্যতীত মানুষ একদিনও বাঁচতে পারে না। তাই আল্লাহ্ তা'আলা কেবল এ নিয়ামত নাযিল করেই ক্ষান্ত হন নি, একে সংরক্ষিত করার জন্যও বিস্ময়কর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। কিছু পানি তো ভূমির গর্তে, চৌবাচ্চায় ও পুকুরসমূহে সংরক্ষিত হয়ে যায় এবং অনেক বড় ভাণ্ডারকে বরফে পরিণত করে পর্বতের চূড়ায় তুলে রাখা হয়। ফলে পানি পঁচে যাওয়ার ও দূষিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। অতপর সে বরফ আস্তে আস্তে গলে পর্বতের শিরা-উপশিরার পথে ভূমিতে নেমে আসে এবং স্থানে স্থানে ঝর্ণার আকারে আপনা-আপনি নির্গত হয়। এরপর নদীনালার আকার ধারণ করে সমতল ভূমিতে প্রবাহিত হতে থাকে।

এই পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার পূর্ণ বিবরণ কোরআনে পাকে সূরায়ে মু'মিনুনের فَاَسْكَنّٰهُ فِى الْاَرْضِ وَاِنَّا عَلٰى ذَهَابٍۢ بِهٖ لَقٰدِرُوْنَ আয়াতের তফসীরে বর্ণনা করা হয়েছে।

مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُهٗ ফসল উৎপন্ন হওয়ার সময় এবং পাকার সময় তার উপর বিভিন্ন রঙ বিবর্তিত হতে থাকে। যেহেতু সব রঙই বিবর্তনশীল ও নিত্যনতুন তাই

مختلفا শব্দটিকে ব্যাকরণিক নিয়মে حال (বর্তমানকাল বাচক) প্রয়োগ করে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب — অর্থাৎ পানি বর্ষণ, তাকে সংরক্ষিত করে মানুষের কাজে লাগানো, তদ্দ্বারা নানা রকমের উদ্ভিদ ও বৃক্ষ উৎপন্ন করা, বৃক্ষের উপর দিয়ে বিভিন্ন রঙের বিবর্তনের পর তা শুকিয়ে খাদ্যশস্য আলাদা এবং ভূষি আলাদা হওয়া এসব বিষয়ের মধ্যে বুদ্ধিমানদের জন্য অনেক উপদেশ রয়েছে। এগুলো আল্লাহ্র মহান কুদরত ও প্রজ্ঞার দলীল। এগুলো দেখে মানুষ নিজের সৃষ্টির রহস্যও অবগত হতে পারে, যা স্রষ্টাকে চিনার ও জানার উপায় হতে পারে।

أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه - شرح-এর শাব্দিক অর্থ উন্মুক্ত করা, ছড়ানো ও প্রশস্ত করা। বক্ষ উন্মোচনের অর্থ অন্তরের প্রশস্ততা। এর উদ্দেশ্য অন্তরে এরূপ যোগ্যতা থাকা যে, আল্লাহ্র সৃষ্টিগত নিদর্শনা-বলী—আকাশ, পৃথিবী ও মানব সৃষ্টি ইত্যাদিতে চিন্তা-ভাবনা করে শিক্ষা ও উপকার লাভ করতে পারে এবং অবতীর্ণ কিতাব ও বিধি-বিধানে চিন্তা-ভাবনা করে লাভবান হতে পারে। এর বিপরীতে আসে অন্তরের সংকীর্ণতা (قساوت قلب) কোরআনের يجعل صدره ضيقا حرجا আয়াতে এবং এস্থলের للقاسية قلوبهم আয়াতে বক্ষ উন্মোচনের বিপরীত অবস্থা বর্ণিত হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের সামনে أفمن شرح الله صدره আয়াতখানি তিলাওয়াত করলে আমরা شرح صدر তথা বক্ষ উন্মোচনের অর্থ জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেনঃ ঈমানের নূর মানুষের অন্তরে প্রবেশ করলে অন্তর প্রশস্ত হয়ে যায়। ফলে আল্লাহ্র বিধি-বিধান হৃদয়ঙ্গম করা এবং সে অনুযায়ী আমল করা তার পক্ষে সহজ হয়ে যায়। আমরা আরয করলাম। ইয়া রসূলাল্লাহ্ এর লক্ষণ কি? তিনি বললেনঃ

الانابة الى دار الخلود و التجافى عن دار الغرور و التاهب للموت قبل نزوله

এর লক্ষণ হচ্ছে, চিরস্থায়ী বাসস্থানের প্রতি অনুরাগী হওয়া, ধোকার বাসস্থান (অর্থাৎ দুনিয়ার আনন্দ-কোলাহল) থেকে দূরে সরে থাকা এবং মৃত্যু আসার পূর্বেই মৃত্যুর প্রস্তুতি গ্রহণ করা——(রূহুল মা'আনী)

আলোচ্য আয়াতটি أَفَمَن প্রশ্নবোধক শব্দ দিয়ে শুরু করা হয়েছে। এর অর্থ এই যে, যে ব্যক্তির অন্তর ইসলামের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে এবং সে তার পালনকর্তার তরফ থেকে আগত নূরের আলোকে কর্ম সম্পাদন করে, সে কি সে ব্যক্তির সমান, যে সংকীর্ণ অন্তর ও কঠোরপ্রাণ? এর বিপরীতে কঠোরপ্রাণ ব্যক্তির উল্লেখ পরবর্তী আয়াতে করা হয়েছে।

فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم — قسا و ة শব্দের অর্থ কঠোরপ্রাণ হওয়া, কারও প্রতি দয়ার্দ্র না হওয়া। অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র যিকির ও বিধানাবলী থেকে কোন প্রভাব কবুল করে না।

اللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ — এর পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার প্রিয় বান্দাদের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছিল يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ - এ আয়াতে বলে দেওয়া হয়েছে যে, সমগ্র কোরআনই أحسن الحديث তথা উত্তম বাণী। حديث—এর শাব্দিক অর্থ এমন কথা অথবা কাহিনী, যা বর্ণনা করা হয়। কোরআনকে 'উত্তম বাণী' বলে আখ্যায়িত করার মর্ম এই যে, মানুষ যা কিছু বলে, তন্মধ্যে উত্তম বাণী হচ্ছে কোরআন। অতপর কোরআনের কতিপয় বিশেষণ উল্লেখ করা হয়েছে---১. مُتَشَابِهًا -এর অর্থ কোরআনের বিষয়বস্তু পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ। এর এক আয়াতের ব্যাখ্যা ও সত্যায়ন অন্য আয়াত দ্বারা হয়। এতে পরস্পর বিরোধিতা নেই। ২. مَثَانِيَ- এটা مثنى--এর বহুবচন। অর্থাৎ কোরআনে একই বিষয়বস্তু বারবার ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে তা অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। ৩. تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ অর্থাৎ যারা আল্লাহ্র মাহাত্ম্যে ভীত, কোরআন পাঠ করে তাদের দেহের লোম শিউরে উঠে। ৪. ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللهِ অর্থাৎ কোরআন তিলাওয়াতের প্রভাবে কখনও আযাবের কথা শুনে দেহের লোম শিউরে উঠে এবং কখনও রহমত ও মাগফিরাতের বর্ণনা শুনে দেহ ও অন্তর সবই আল্লাহ্র স্মরণে

নরম হয়ে যায়। হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রা) বলেন, সাহাবায়ে কিরামের সাধারণ অবস্থা তাই ছিল। তাঁদের সামনে কোরআন পাঠ করা হলে তাঁদের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হয়ে যেত এবং দেহের লোম শিউরে উঠত।—(কুরতুবী)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ আল্লাহ্র ভয়ে যে বান্দার লোম শিউরে উঠে, আল্লাহ্ তার দেহকে আগুনের জন্য হারাম করে দেন।——(কুরতুবী)

أَفَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوٓءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ وَقِيلَ لِلظّٰلِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿٢٤﴾ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتٰىهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٥﴾ فَأَذَاقَهُمُ اللّٰهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۖ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ أَكْبَرُ ۘ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٧﴾ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٢٨﴾

---

(২৪) যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন তার মুখ দ্বারা অশুভ আযাব ঠেকাবে এবং এরূপ জালিমদেরকে বলা হবে, তোমরা যা করতে, তার স্বাদ আস্বাদন কর,—সে কি তার সমান, যে এরূপ নয়? (২৫) তাদের পূর্ববর্তীরাও মিথ্যারোপ করেছিল, ফলে তাদের কাছে আযাব এমনভাবে আসল যা, তারা কল্পনাও করত না। (২৬) অতপর আল্লাহ্ তাদেরকে পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনার স্বাদ আস্বাদন করালেন, আর পরকালের আযাব হবে আরও গুরুতর—যদি তারা জানত! (২৭) আমি এ কোরআনে মানুষের জন্য সব দৃষ্টান্তই বর্ণনা করেছি, যাতে তারা অনুধাবন করে; (২৮) আরবী ভাষার এ কোরআন বক্রতামুক্ত, যাতে তারা সাবধান হয়ে চলে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যে ব্যক্তি নিজের মুখকে কিয়ামতের দিন কঠোর আযাবের ঢাল করে দেবে, এরূপ জালিমদেরকে বলা হবে যে, তোমরা যা করতে, (এখন) তার স্বাদ আস্বাদন কর। সে কি তার সমান হতে পারে, যে এরূপ নয়? (কাফিররা যেন এসব আযাব অস্বীকার না করে। কেননা,) তাদের পূর্ববর্তীরাও (সত্যকে)-মিথ্যা বলেছিল, ফলে তাদের কাছে আযাব এমনভাবে এসেছিল, যা তারা কল্পনাও করত না। আল্লাহ্

তাদের পার্থিব জীবনেও লাঞ্ছনার স্বাদ আস্বাদন করিয়েছেন। (ভূগর্ভে বিলীন হওয়া, মুখমণ্ডল বিকৃত হওয়া, আকাশ থেকে প্রস্তর বর্ষণ ইত্যাদি আযাবের মাধ্যমে তারা দুনিয়াতে লাঞ্ছিত হয়েছে।) আর পরকালের আযাব (হবে) আরও গুরুতর—যদি তারা জানত। (উপরে أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ— আয়াতে বলা হয়েছিল যে, কোরআন শুনে কেউ প্রভাবান্বিত হয় এবং কেউ হয় না। পরের আয়াতে বলা হয়েছে যে, যারা প্রভাবান্বিত হয় না, তাদের মধ্যে যোগ্যতা ও প্রতিভার অভাব রয়েছে। নতুবা কোরআন সবার জন্যই সমান প্রভাবশালী। এতে কোন ত্রুটি নেই।) আমি মানুষের (হিদায়েতের) জন্য এ কোরআনে সর্বপ্রকার (জরুরী) বিষয়বস্তু বর্ণনা করেছি, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। (এর অবস্থা এই যে,) এটা আরবী ভাষার কোরআন, এতে সামান্যও বক্রতা নেই যাতে তারা (এসব সত্য ও পরিষ্কার বিষয়বস্তু শুনে) ভয় করে। (হিদায়েতনামা হওয়ার জন্য অত্যাবশ্যকীয় গুণাবলী কোরআনে সন্নিবেশিত রয়েছে। এর বিষয়বস্তু সত্য ও সুস্পষ্ট। এর ভাষাও আরবী, যা আরবের লোকেরা প্রত্যক্ষভাবে বুঝতে সক্ষম। এরপর তাদের মাধ্যমে অন্যদের পক্ষেও বোঝা সহজ। মোটকথা, এই হিদায়েতগ্রন্থে কোন ত্রুটি নেই। কারও মধ্যে কবুল করার যোগ্যতা না থাকলে তার কি প্রতিকার।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ—এতে জাহান্নামের ভয়াবহতার বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। দুনিয়াতে মানুষের অভ্যাস এই যে, কোন কষ্টদায়ক বিষয়ের সম্মুখীন হলে মানুষ তার মুখমণ্ডলকে বাঁচানোর জন্য হাত ও পা-কে ঢালরূপে ব্যবহার করে। কিন্তু জাহান্নামীরা হাত-পায়ের দ্বারা প্রতিরক্ষা করতে সক্ষম হবে না। তাদের আযাব সরাসরি তাদের মুখমণ্ডলে পতিত হবে। সে প্রতিরক্ষা করতে চাইলে মুখমণ্ডলকেই ঢাল বানাতে পারবে। কেননা তাকে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। —(নাউযুবিল্লাহ্)

তফসীরবিদ 'আতা ইবনে যায়েদ বলেন, জাহান্নামীকে জাহান্নামে হাত-পা বেঁধে হিঁচড়ে নিক্ষেপ করা হবে।—(কুরতুবী)

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ۚ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٩﴾ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ﴿٣٠﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ﴿٣١﴾ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ

جَآءَهٗ ؕ اَلَيْسَ فِیْ جَهَنَّمَ مَثْوًی لِّلْكٰفِرِيْنَ ۝ وَالَّذِیْ جَآءَ بِالصِّدْقِ

وَصَدَّقَ بِهٖۤ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ۝ لَهُمْ مَّا يَشَآءُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ ذٰلِكَ

جَزٰٓؤُا الْمُحْسِنِيْنَ ۝ لِيُكَفِّرَ اللّٰهُ عَنْهُمْ اَسْوَاَ الَّذِیْ عَمِلُوْا وَيَجْزِيَهُمْ اَجْرَهُمْ

بِاَحْسَنِ الَّذِیْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

(২৯) আল্লাহ্ এক দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন ঃ একটি লোকের উপর পরস্পর-বিরোধী অনেক কয়জন মালিক রয়েছে, আরেক ব্যক্তির প্রভু মাত্র একজন---তাদের উভয়ের অবস্থা কি সমান? সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র। কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না। (৩০) নিশ্চয় তোমারও মৃত্যু হবে এবং তাদেরও মৃত্যু হবে। (৩১) অতপর কিয়ামতের দিন তোমরা সবাই তোমাদের পালনকর্তার সামনে কথা কাটাকাটি করবে। (৩২) যে ব্যক্তি আল্লাহ্র বিরুদ্ধে মিথ্যা বলে এবং তার কাছে সত্য আগমন করার পর তাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে, তার চেয়ে অধিক জালিম আর কে হবে? কাফিরদের বাসস্থান জাহান্নামে নয় কি? (৩৩) যারা সত্য নিয়ে আগমন করেছে এবং সত্যকে সত্য মেনে নিয়েছে; তারাই তো আল্লাহ্ভীরু। (৩৪) তাদের জন্য পালনকর্তার কাছে তাই রয়েছে, যা তারা চাইবে। এটা সৎকর্মীদের পুরস্কার, (৩৫) যাতে আল্লাহ্ তাদের মন্দ কর্মসমূহ মার্জনা করেন এবং তাদের উত্তম কর্মের পুরস্কার তাদেরকে দান করেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আল্লাহ্ তা'আলা (তওহীদপন্থী ও মুশরিক সম্পর্কে) একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন; এক (গোলাম) ব্যক্তিতে কয়েকজন অংশীদার, যারা পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন, আরেক ব্যক্তি পুরোপুরি একজনেরই (গোলাম)—তাদের উভয়ের অবস্থা কি সমান? (বলা-বাহুল্য, উভয়ে সমান নয়; প্রথম ব্যক্তি বিপদগ্রস্ত। সে বুঝে উঠতে পারে না যে, কোন্ প্রভুর আদেশ মানবে এবং কোন্ প্রভুর আদেশ মানবে না। দ্বিতীয় ব্যক্তি আরামে রয়েছে। তার সম্পর্ক এক প্রভুর সাথেই। সুতরাং প্রথমোক্ত ব্যক্তি মুশরিক। সে সর্বদা দোদুল্যমান অবস্থায় থাকে। কখনও আল্লাহ্র দিকে এবং কখনও মূর্তি-বিগ্রহের দিকে ছুটাছুটি করে। মূর্তিদের মধ্যেও একেকে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে না, কখনও এক মূর্তির আবার কখনও অন্য মূর্তির পূজা করে। কাফিররাও উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তর এছাড়া দিতে পারবে না যে, অনেক প্রভুর যৌথ গোলামের শুধু বিপদই বিপদ। তাই তাদের জন্য দলীল পূর্ণ হয়ে গেছে। দলীলের এই পূর্ণতার কারণে বলা হয়েছে 'আলহামদু লিল্লাহ্' সত্য প্রমাণিত হয়ে গেছে। কিন্তু এর পরও তারা কবুল করে না।

কেননা, তাদের অধিকাংশই বোঝে না (এবং বোঝার ইচ্ছাও করে না। অতপর কিয়ামতের সর্বশেষ ফয়সালার উল্লেখ করা হয়েছে। এ ফয়সালা থেকে কেউ গা বাঁচাতে পারবে না। মৃত্যু হলো পরকালে পৌঁছার ভূমিকা ও পথ। তাই আগে মৃত্যুর প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, হে পয়গম্বর, যদি তারা দুনিয়াতে কোন ফয়সালা না মানে, তবে আপনি চিন্তিত হবেন না। দুনিয়া থেকে) আপনিও মৃত্যুবরণ করবেন এবং তারাও মৃত্যুবরণ করবে। অতপর কিয়ামতের দিন তোমরা (উভয় পক্ষ) তোমাদের পালনকর্তার সামনে (নিজ নিজ) মোকদ্দমা পেশ করবে। (তখন কার্যত ফয়সালা হয়ে যাবে। পরবর্তী فَمَنْ أَظْلَمُ আয়াতে এর বর্ণনা রয়েছে। ফয়সালা হবে এই যে, মূর্তি উপাসকরা জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে এবং সত্যপন্থীরা মহা পুরস্কারে পুরস্কৃত হবে। বলা বাহুল্য,) যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মিথ্যা বলে (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সাথে অন্যকেও শরীক করে) এবং সত্য (অর্থাৎ কোরআন) তার কাছে (রসূলের মাধ্যমে) আসার পরও তাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে, তার চেয়ে অধিক জালিম (ও অসত্যের পূজারী) আর কে হবে? (সে যে জালিম এবং আযাবের যোগ্য, তা বলাই বাহুল্য। বস্তুত বড় আযাব হচ্ছে জাহান্নামের আযাব। অতএব) এহেন কাফিরদের আবাসস্থল (কিয়ামতের দিন) জাহান্নামে নয় কি? (পক্ষান্তরে) যারা সত্য নিয়ে (আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অথবা রসূলের পক্ষ থেকে মানুষের কাছে) আগমন করেছে এবং (নিজেরাও) সত্যকে সত্য হিসাবে মেনে নিয়েছে, (অর্থাৎ যারা সত্যবাদী এবং সত্যায়নকারী যেমন প্রথমোক্তরা মিথ্যাবাদী এবং মিথ্যা সাব্যস্তকারী ছিল) তারাই আল্লাহ্‌ভীরু। (তাদের ফয়সালা এই যে,) তাদের জন্য তাদের পালনকর্তার কাছে তাই রয়েছে যা তারা চাইবে। এটা সৎকর্মীদের পুরস্কার, (এজন্য), যাতে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মন্দকর্মসমূহ মার্জনা করেন এবং তাদের উত্তম কর্মের বিনিময়ে তাদেরকে সওয়াব দান করেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ—যে ভবিষ্যৎকালে মরবে, তাকে مَيِّتٌ এবং যে অতীত কালে মরে গেছে, তাকে مَيْتٌ বলা হয়। আলোচ্য আয়াতে রসূলে করীম (সা)-কে উদ্দেশ করে বলা হয়েছে, আপনিও মৃত্যুবরণ করবেন এবং আপনার শত্রু মিত্র সবাই মৃত্যুবরণ করবে। এরূপ বলার উদ্দেশ্য সবাইকে পরকাল চিন্তায় মনোযোগী করা এবং পরকালের কাজে আত্মনিয়োগে উৎসাহিত করা। প্রসঙ্গত একথাও বলে দেওয়া উদ্দেশ্য যে, সৃষ্টির সেরা এবং পয়গম্বরকুলের মধ্যমণি হওয়া সত্ত্বেও রসূলুল্লাহ্ (সা) মৃত্যুর আওতাবহির্ভূত নন, যাতে তাঁর ইন্তিকালের পর মানুষের মধ্যে এ বিষয়ে বিরোধ সৃষ্টি না হয়।—(কুরতুবী)

হাশরের আদালতে মযলুমের হক কিরূপে আদায় করা হবে? ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ—হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এখানে اِنَّكُمْ শব্দের মধ্যে মু'মিন, কাফির, মুসলমান, জালিম ও মযলুম সবাই অন্তর্ভুক্ত। তারা সবাই নিজ নিজ মোকদ্দমা আল্লাহ্ তা'আলার আদালতে দায়ের করবে এবং আল্লাহ্ তা'আলা জালিমকে মযলুমের হক দিতে বাধ্য করবেন। বুখারীতে বর্ণিত হযরত আবূ হুরায়রার রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র ধরন বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, কারও যিম্মায় কারও কোন হক থাকলে তার উচিত দুনিয়াতেই তা আদায় করা অথবা ক্ষমা নিয়ে মুক্ত হয়ে যাওয়া। কেননা, পরকালে দীনার-দেরহাম থাকবে না যে, তা দিয়ে হক আদায় করা যাবে। সেখানে জালিম ব্যক্তির কিছু সৎকর্ম থাকলে তা জুলুমের পরিমাণে তার কাছ থেকে নিয়ে মযলুম ব্যক্তিকে দিয়ে দেওয়া হবে। তার কাছে কোন সৎকর্ম না থাকলে মযলুমের গোনাহ্ তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হবে।

সহীহ্ মুসলিমে আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) এক দিন সাহাবায়ে কিরামকে প্রশ্ন করলেন, তোমরা কি জান, নিঃস্ব কে? তাঁরা আরয করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্, আমরা তো তাকেই নিঃস্ব মনে করি, যার কাছে নগদ অর্থ-কড়ি এবং প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র নেই। তিনি বললেনঃ আমার উম্মতের মধ্যে সত্যিকার নিঃস্ব সে ব্যক্তি, যে কিয়ামতের দিন অনেক নামায, রোযা ও হজ্জ-যাকাত ইত্যাদি নিয়ে উপস্থিত হবে, কিন্তু দুনিয়াতে সে কাউকে গালি দিয়েছিল, কারও বিরুদ্ধে অপবাদ রটনা করেছিল, কারও অর্থ-কড়ি অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করেছিল, কাউকে হত্যা করেছিল এবং কাউকে প্রহার করে দুঃখ দিয়েছিল—এসব মযলুম সবাই আল্লাহ্র সামনে তাদের যুলুমের প্রতিকার দাবি করবে।—ফলে তার সৎকর্মসমূহ তাদের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া হবে। যদি তার সৎকর্ম নিঃশেষ হয়ে যায় এবং মযলুমের হক অবশিষ্ট থাকে তবে মযলুমের গোনাহ্ তার ঘাড়ে চাপিয়ে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। অতএব এ ব্যক্তি সবকিছু থাকা সত্ত্বেও কিয়ামতে নিঃস্ব হয়ে যাবে। সেই প্রকৃত নিঃস্ব।

তিবরানীতে বর্ণিত আবূ আইয়্যুব আনসারীর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলার আদালতে সর্বপ্রথম স্বামী ও স্ত্রীর মোকদ্দমা পেশ হবে। সেখানে জিহবা কথা বলবে না, বরং স্ত্রীর হাত-পা সাক্ষ্য দেবে যে, সে তার স্বামীর প্রতি কি কি দোষ আরোপ করত। এমনিভাবে স্বামীর হাত-পা সাক্ষ্য দেবে সে কিভাবে তার স্ত্রীর উপর নির্যাতন চালাত। অতপর প্রত্যেকের সামনে তার চাকর-চাকরানী উপস্থিত হবে এবং তাদের অভিযোগের ফয়সালা করা হবে। এরপর বাজারের যে সব লোকের সাথে তার কাজ-কারবার ও লেনদেন ছিল, তারা উপস্থিত হবে। সে কারও প্রতি জুলুম করে থাকলে তাকে তার হক দিতে বাধ্য করা হবে।

জুলুম ও হকের বিনিময়ে সবরকম আমল দেওয়া হবে কিন্তু ঈমান দেওয়া হবে না : তফসীরে মযহারীতে লিখিত আছে, মযলুমের হকের বিনিময়ে জালিমের আমল দেওয়ার অর্থ এই যে, ঈমান ব্যতীত অন্যান্য আমল দেওয়া হবে। কেননা, সব জুলুমই কর্মগত গোনাহ্—কুফর নয়। কর্মগত গোনাহ্সমূহের শাস্তি হবে সীমিত। কিন্তু ঈমান একটি অসীম আমল, এর পুরস্কারও অসীম। অর্থাৎ চিরকাল জান্নাতে বসবাস করা; যদিও তা গোনাহের শাস্তি ভোগ করা এবং কিছুকাল জাহান্নামে অবস্থান করার পরে হয়। এর সারমর্ম এই যে, জালিমের ঈমান ব্যতীত সব সৎকর্মই যখন নিঃশেষ হয়ে যাবে কেবল ঈমান বাকী থাকবে, তখন তার কাছ থেকে তা ছিনিয়ে নেওয়া হবে না, বরং মযলুমদের গোনাহ্ তার উপর চাপিয়ে হক আদায় করা হবে। ফলে সে গেনাহের শাস্তি ভোগ করার পর অবশেষে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং অনন্তকাল সেখানে থাকবে। মযহারীর বর্ণনা মতে ইমাম বায়হাকীও তাই বলেছেন।

اَلَّذِىْ جَآءَ بِالصِّدْقِ এবং كَذَّبَ بِالصِّدْقِ এ দু'জায়গায় صِدْق-এর অর্থ রসূলুল্লাহ্ (সা) আনীত শিক্ষাসমূহ, তা কোরআনই হোক অথবা হাদীস হোক। صَدَّقَ بِهٖ বাক্যে এর সত্যায়নকারী সব মু'মিন-মুসলমানই অন্তর্ভুক্ত।

اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهٗ ۖ وَيُخَوِّفُوْنَكَ بِالَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ
فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ ﴿٣٦﴾ وَمَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ مُّضِلٍّ ۗ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِعَزِيْزٍ ذِى
انْتِقَامٍ ﴿٣٧﴾ وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ۚ قُلْ
اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَنِيَ اللّٰهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كٰشِفٰتُ
ضُرِّهٖٓ اَوْ اَرَادَنِيْ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكٰتُ رَحْمَتِهٖ ۚ قُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ ۖ
عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ﴿٣٨﴾ قُلْ يٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّيْ عَامِلٌ ۚ
فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿٣٩﴾ مَنْ يَّاْتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ﴿٤٠﴾
اِنَّآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ ۚ فَمَنِ اهْتَدٰى فَلِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ
ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَمَآ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ ﴿٤١﴾

(৩৬) আল্লাহ্ কি তাঁর বান্দার পক্ষে যথেষ্ট নন? অথচ তারা আপনাকে আল্লাহ্র পরিবর্তে অন্য উপাস্যদের ভয় দেখায়। আল্লাহ্ যাকে গোমরাহ্ করেন, তার কোন পথপ্রদর্শক নেই। (৩৭) আর আল্লাহ্ যাকে পথপ্রদর্শন করেন, তাকে পথভ্রষ্টকারী কেউ নেই। আল্লাহ্ কি পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী নন? (৩৮) যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, আসমান ও যমীন কে সৃষ্টি করেছে? তারা অবশ্যই বলবে---আল্লাহ্। বলুন, তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি আল্লাহ্ আমার অনিষ্ট করার ইচ্ছা করেন, তবে তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত যাদেরকে ডাক, তারা কি সে অনিষ্ট দূর করতে পারবে? অথবা তিনি আমার প্রতি রহমত করার ইচ্ছা করলে তারা কি সে রহমত রোধ করতে পারবে? বলুন, আমার পক্ষে আল্লাহ্ই যথেষ্ট। নির্ভরকারীরা তাঁরই উপর নির্ভর করে। (৩৯) বলুন, হে আমার কওম, তোমরা তোমাদের জায়গায় কাজ কর, আমিও কাজ করছি। সত্বরই জানতে পারবে (৪০) কার কাছে অবমাননা-কর আযাব এবং চিরস্থায়ী শাস্তি নেমে আসে। (৪১) আমি আপনার প্রতি সত্য ধর্মসহ কিতাব নাযিল করেছি মানুষের কল্যাণকল্পে। অতপর যে সৎপথে আসে, সে নিজের কল্যাণের জন্যই আসে, আর যে পথভ্রষ্ট হয়, সে নিজেরই অনিষ্টের জন্য পথভ্রষ্ট হয়। আপনি তাদের জন্য দায়ী নন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আল্লাহ্ তা'আলা কি তাঁর বান্দার [অর্থাৎ বিশেষভাবে মোহাম্মদ (সা)-এর হিফাযতের] জন্য যথেষ্ট নন? (অর্থাৎ তিনি তো সবার হিফাযতের জন্যই যথেষ্ট। এমতাবস্থায় তাঁর প্রিয় বান্দার হিফাযতের জন্য যথেষ্ট হবেন না কেন?) বস্তুত তারা (এমন নির্বোধ যে, খোদায়ী হিফাযতের ব্যাপারে অজ্ঞ সেজে) আপনাকে আল্লাহ্ ব্যতীত মিথ্যা উপাস্যদের ভয় দেখায়। (অথচ তারা নিষ্প্রাণ ও অক্ষম। সক্ষম হলেও আল্লাহ্র মুকাবিলায় অক্ষমই হত। আসল ব্যাপার এই যে,) আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তার কোনও পথ প্রদর্শক নেই, আর আল্লাহ্ যাকে পথপ্রদর্শন করেন তাকে পথভ্রষ্টকারী কেউ নেই। (অতপর আল্লাহ্র কুদরত বর্ণনা করে তাদের নির্বুদ্ধিতা প্রকাশ করা হয়েছে যে,) আল্লাহ্ কি (তাদের মতে) পরাক্রমশালী (ও) প্রতিশোধ গ্রহণকারী নন? (কাজেই আপনাকে ভয় দেখানো নির্বুদ্ধিতা নয় তো কি? আশ্চর্যের বিষয় যে, আল্লাহ্র কুদরত তারাও স্বীকার করে। সেমতে) আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন যে; আসমান ও যমীন কে সৃষ্টি করেছে? তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ্। (তাই) আপনি (তাদেরকে) বলুন, (তোমরা যখন আল্লাহ্কে একক স্রষ্টা স্বীকার কর, তখন) তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি আল্লাহ্ আমাকে কোন কষ্ট দেওয়ার ইচ্ছা করেন, তবে আল্লাহ্ ব্যতীত তোমরা যাদের পূজা কর তারা কি সে কষ্ট দূর করতে পারবে? অথবা তিনি যদি আমার প্রতি রহমত করার ইচ্ছা করেন, তবে তারা কি সে রহমত রোধ করতে পারবে? (এতে আল্লাহ্র কুদরত প্রমাণিত হয়ে গেল।) আপনি বলুন, (এতে প্রমাণিত হল যে,) আমার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট। নির্ভরকারীরা তাঁরই

উপর নির্ভর করে। (তাই আমিও তাঁরই উপর নির্ভর ও ভরসা করি এবং তোমাদের বিরোধিতা ও শত্রুতার আদৌ পরওয়া করি না। যেহেতু তারা এসব কথা শুনেও তাদের ভ্রান্ত ধারণায় অটল, তাই আপনাকে সর্বশেষ জওয়াব এই শেখানো হচ্ছে যে,) আপনি বলুন, (যদি এতেও তোমরা না মান, তবে তোমরাই জান,) তোমরা তোমাদের অবস্থায় কাজ করে যাও, আমিও (নিজের মতে) কাজ করছি। (অর্থাৎ তোমরা যখন মিথ্যা পথ ত্যাগ করছ না, তখন আমি সত্য পথ ত্যাগ করব কেন? সত্বরই, তোমরা জানতে পারবে সে ব্যক্তি কে, যার কাছে (দুনিয়াতে) অবমাননাকর আযাব আসে এবং (মৃত্যুর পর) চিরস্থায়ী শাস্তি নেমে আসবে। [সেমতে দুনিয়াতে বদর যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে তারা শাস্তি পেয়েছে। এরপর পরকালে আসবে চিরস্থায়ী আযাব। এপর্যন্ত রসূলুল্লাহ (সা)-কে শত্রুদের ভীতি প্রদর্শন থেকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে অতপর কাফির ও সাধারণ মানুষের প্রতি মহত্ত্ববোধের কারণে তাদের কুফর ও অস্বীকার দেখে তিনি যে ব্যথা অনুভব করতেন, সেদিকে লক্ষ্য করে সান্ত্বনা দেওয়া হচ্ছেঃ] আমি আপনার প্রতি সত্যসহ এ কিতাব (মানুষের কল্যাণের) জন্য নাযিল করেছি। (আপনার কর্তব্য শুধু একে পৌঁছানো। এরপর) যে ব্যক্তি সৎপথে আসবে, সে নিজের কল্যাণের জন্যই আসবে, আর যে পথভ্রষ্ট হবে, সে নিজেরই অনিষ্টের জন্য পথভ্রষ্ট হবে। আপনি তাদের উপর (এমন) তত্ত্বাবধায়ক নন (যে, তাদের পথভ্রষ্টতার কৈফিয়ত আপনার কাছে তলব করা হবে। সুতরাং আপনি তাদের পথভ্রষ্টতা দেখে চিন্তিত হবেন কেন?)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

أَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهٗ —কাফিররা একবার রসূলুল্লাহ্ (সা) ও সাহাবায়ে কিরামকে একথা বলে ভয় দেখিয়েছিল যে, যদি আপনি আমাদের প্রতিমাদের প্রতি বে-আদবী প্রদর্শন করেন, তবে তাদের কোপানল থেকে আপনাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না; তাদের প্রভাব খুব সাংঘাতিক। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং জওয়াবে বলা হয় যে, আল্লাহ্ কি তাঁর বান্দার পক্ষে যথেষ্ট নন?

সেজন্যই কোন কোন তফসীরবিদ এখানে বান্দার অর্থ নিয়েছেন বিশেষ বান্দা অর্থাৎ রসূলুল্লাহ্ (সা)। তফসীরের সার-সংক্ষেপে এ অর্থই অবলম্বন করা হয়েছে। অন্য তফসীরবিদগণ বলেন যে, এখানে যে-কোন বান্দা বোঝানো হয়েছে। এ আয়াতের অপর এক কিরআত عِبَادَهٗ বর্ণিত আছে। এ কিরাআত দ্বিতীয় তফসীরের সমর্থক। বিষয়বস্তু সর্বাবস্থায় ব্যাপক অর্থাৎ আল্লাহ্ তাঁর প্রত্যেক বান্দার জন্যই যথেষ্ট।

শিক্ষা ও উপদেশঃ وَيُخَوِّفُوْنَكَ بِالَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ —অর্থাৎ কাফিররা

আপনাকে তাদের মিথ্যা উপাস্যদের কোপানলের ভয় দেখায়। এ আয়াত পাঠ করে পাঠকবর্গ সাধারণত মনে করে যে, এটা আর কি, এতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রতি কাফিরদের হুমকি বর্ণনা করা হয়েছে মাত্র। তারা এ বিষয়টি অনুধাবন করতে চেষ্টা করে না যে, এতে আমাদের জন্য কি পথনির্দেশ রয়েছে। অথচ সুস্পষ্ট ব্যাপার এই যে, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে ভয় দেখিয়ে বলে, তুমি অমুক হারাম অথবা পাপ-কাজ না করলে তোমার উর্ধ্বতন কর্মকর্তা অথবা শাসকশ্রেণী তোমার প্রতি রাগান্বিত হবেন এবং তোমার ক্ষতি করবেন, এরূপ ভীতি প্রদর্শনকারী ব্যক্তিও এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত, যদিও সে মুসলমান হয়। আমাদের সমাজে এরূপ ঘটনার ব্যাপক প্রচলন রয়েছে। অধিকাংশ চাকরির ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র বিধানাবলী অমান্য করবে, না অফিসার বর্গের কোপানলের শিকার হবে, এরূপ টানা-পড়েনের সম্মুখীন হতে হয়। আলোচ্য আয়াত তাদের সবাইকে নির্দেশ দিচ্ছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা কি তোমাদের হিফাযতের জন্য যথেষ্ট নন? তোমরা খাঁটিভাবে আল্লাহ্‌র জন্য গোনাহ্ না করার সংকল্প করলে এবং আল্লাহ্‌র বিধানাবলীর বিপক্ষে কোন শাসক ও কর্মকর্তার রক্তচক্ষুর পরওয়া না করলে আল্লাহ্‌র সাহায্য তোমাদের সাথে থাকবে। বেশির চেয়ে বেশি চাকরি নষ্ট হয়ে গেলেও আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জীবিকার অন্য ব্যবস্থা করে দেবেন। নিজেই এ ধরনের চাকরি ছেড়ে দেওয়ার চেষ্টায় থাকা মুসলমানের কর্তব্য। কোন উপযুক্ত জায়গা পেয়ে গেলে অনতিবিলম্বে এ ধরনের চাকুরী ত্যাগ করা উচিত।

اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِيْ لَمْ تَمُتْ فِيْ مَنَامِهَا ۚ فَيُمْسِكُ
الَّتِيْ قَضٰى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْاُخْرٰٓى اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ
لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿٤٢﴾ اَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ شُفَعَآءَ ۭ قُلْ اَوَلَوْ
كَانُوْا لَا يَمْلِكُوْنَ شَيْـًٔا وَّلَا يَعْقِلُوْنَ ﴿٤٣﴾ قُلْ لِّلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعًا ۭ لَهٗ مُلْكُ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٤٤﴾ وَاِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَحْدَهُ اشْمَاَزَّتْ
قُلُوْبُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ ۚ وَاِذَا ذُكِرَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖٓ اِذَا
هُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ ﴿٤٥﴾

---

(৪২) আল্লাহ্ মানুষের প্রাণ হরণ করেন তার মৃত্যুর সময়, আর যে মরে না, তার নিদ্রাকালে। অতপর যার মৃত্যু অবধারিত করেন, তার প্রাণ ছাড়েন না এবং অন্যদের ছেড়ে দেন এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্য

নিদর্শনাবলী রয়েছে। (৪৩) তারা কি আল্লাহ্ ব্যতীত সুপারিশকারী গ্রহণ করেছে? বলুন তাদের কোন এখতিয়ার না থাকলেও এবং তারা না বুঝলেও? (৪৪) বলুন, সমস্ত সুপারিশ আল্লাহ্‌রই ক্ষমতাধীন, আসমান ও যমীনে তাঁরই সাম্রাজ্য। অতপর তাঁরই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। (৪৫) যখন খাঁটিভাবে আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করা হয়, তখন যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, তাদের অন্তর সংকুচিত হয়ে যায়, আর যখন আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য উপাস্যদের নাম উচ্চারণ করা হয়, তখন তারা আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আল্লাহ্ তা'আলাই হরণ (অর্থাৎ নিষ্ক্রিয়) করেন (সেসব) প্রাণ, (যাদের মৃত্যুর সময় এসে গেছে।) তাদের মৃত্যুর সময় পুরোপুরিভাবে জীবনাবসান ঘটিয়ে আর যাদের মৃত্যু আসেনি তাদের প্রাণও হরণ করেন তাদের নিদ্রার সময়। (এই প্রাণ সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় করা হয় না, এক প্রকার জীবন বাকী থাকে; কিন্তু উপলব্ধি থাকে না। মৃত্যুতে জীবন ও উপলব্ধি উভয়ই শেষ হয়ে যায়।) অতপর যার মৃত্যু অবধারিত করেন, তার প্রাণ আটকিয়ে রাখেন। (অর্থাৎ দেহে ফিরে আসতে দেন না) এবং অন্য প্রাণ (যা নিদ্রার কারণে নিষ্ক্রিয় ছিল এবং যার মৃত্যুর সময় এখনও আসেনি, তাকে) এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ছেড়ে দেন। (ফলে সে দেহে ফিরে এসে পূর্বের মত কাজকর্ম করতে পারে।) এতে (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র এ কর্মকাণ্ডে) চিন্তাশীল লোকদের জন্য (আল্লাহ্‌র কুদরত ও এককভাবে সমগ্র জগৎ পরিচালনার) নিদর্শনাবলী রয়েছে, (যদ্দ্বারা তওহীদ প্রমাণিত হয়।) তারা কি (তওহীদের এমন সুস্পষ্ট প্রমাণাদি সত্ত্বেও) আল্লাহ্ ব্যতীত অপরকে (উপাস্য) স্থির করেছে, যারা (তাদের) সুপারিশ করবে? (মুশরিকরা তাদের প্রতিমা সম্পর্কে বলত : هٰؤُلَاءِ شُفَعَاءُنَا عِنْدَ اللّٰهِ) আপনি বলুন, যদিও তারা (অর্থাৎ তোমাদের মনগড়া সুপারিশকারীরা) কিছুই ক্ষমতা রাখে না এবং কিছুই বোঝে না? (তবুও কি তোমরা মনে করতে থাকবে যে, তারা তোমাদের সুপারিশ করবে? তোমরা কি এতটুকুও জান না যে, সুপারিশ করার জন্য জ্ঞান ও উপযুক্ত ক্ষমতা থাকা অপরিহার্য যা তাদের মধ্যে অনুপস্থিত? এখানে মুশরিকরা বলতে পারত যে, প্রস্তর নির্মিত এসব মূর্তি আমাদের উদ্দেশ্য নয়, বরং এগুলো ফেরেশতা অথবা জিনদের প্রতিকৃতি। তারা তো প্রাণশীল এবং ক্ষমতা ও জ্ঞানের অধিকারী। তাই এর জওয়াব শেখানো হয়েছে যে,) আপনি (আরও) বলুন, সমস্ত সুপারিশ আল্লাহ্ তা'আলারই ক্ষমতাধীন (তাঁর অনুমতি ছাড়া কোন ফেরেশতা অথবা মানুষের পক্ষে কারও জন্য সুপারিশ করার সাধ্য নেই। আল্লাহ্ তা'আলার অনুমতির জন্য দু'টি শর্ত রয়েছে। এক—যে সুপারিশ করবে সে আল্লাহ্‌র প্রিয়জন হবে। দুই—যার জন্য সুপারিশ করবে, তার ক্ষমাযোগ্য হতে হবে। মুশরিকদের প্রতিমা যদি জিন ও শয়তানের প্রতিকৃতি হয়, তবে অনুমতি লাভের উভয় শর্তই অনুপস্থিত।

সুপারিশকারী জ্বিন ও শয়তান আল্লাহ্‌র প্রিয়জন নয় এবং মুশরিকরাও ক্ষমাযোগ্য নয়। পক্ষান্তরে যদি তাদের মূর্তি ফেরেশতা অথবা পয়গম্বরগণের প্রতিকৃতি হয়, তবে প্রথম শর্ত উপস্থিত থাকলেও দ্বিতীয় শর্ত অনুপস্থিত। কারণ, মুশরিকদের মধ্যে ক্ষমা পাওয়ার যোগ্যতা নেই। অতপর বলা হয়েছে, আল্লাহ্‌র শান এই যে,) আসমান ও যমীনের রাজত্ব তাঁরই; অতপর তাঁরই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। (তাই সবকিছু ছেড়ে তাঁকেই ভয় কর, তাঁরই ইবাদত কর। কাফির ও মুশরিকদের অবস্থা এই যে,) যখন এককভাবে শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র আলোচনা করা হয়, (বলা হয় যে, তিনি এককভাবে সমগ্র বিশ্বের ভালমন্দের সর্বময় মালিক) তখন যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, তাদের অন্তর সংকুচিত হয়ে যায়, আর যখন আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য উপাস্যদের আলোচনা করা হয় (এককভাবে অথবা আল্লাহ্‌র আলোচনার সাথে সংযুক্ত করে) তখন তারা আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

মৃত্যু ও নিদ্রাকালীন প্রাণ হরণের পার্থক্য ঃ اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِىْ لَمْ تَمُتْ فِىْ مَنَامِهَا

تَوَفِّى-এর শাব্দিক অর্থ লওয়া ও করায়ত্ত করা। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, প্রাণীদের প্রাণ সর্বাবস্থায় ও সর্বক্ষণই আল্লাহ্ তা'আলার আয়ত্তাধীন। তিনি যখন ইচ্ছা তা হরণ করতে ও ফিরিয়ে নিতে পারেন। আল্লাহ্ তা'আলার এ কুদরত প্রত্যেক প্রাণীই প্রত্যহ দেখে ও অনুভব করে। নিদ্রার সময় তার প্রাণ আল্লাহ্ তা'আলার এক প্রকার করায়ত্তে চলে যায় এবং জাগ্রত হওয়ার পর ফিরে পায়। অবশেষে এমন এক সময় আসবে, যখন তা সম্পূর্ণ করায়ত্ত হয়ে যাবে এবং ফিরে পাওয়া যাবে না।

তফসীরে মযহারীতে আছে, প্রাণ হরণ করার অর্থ তার সম্পর্ক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া। কখনও বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সব দিক দিয়ে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়, এরই নাম মৃত্যু। আবার কখনও শুধু বাহ্যিকভাবে বিচ্ছিন্ন করা হয়। অভ্যন্তরীণভাবে যোগাযোগ থাকে। এর ফলে কেবল বাহ্যিকভাবে জীবনের লক্ষণ, চেতনা ও ইচ্ছাভিত্তিক নড়াচড়ার শক্তি বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয় এবং অভ্যন্তরীণ দিক দিয়ে দেহের সাথে প্রাণের সম্পর্ক বাকী থাকে। ফলে সে শ্বাস গ্রহণ করে ও জীবিত থাকে। এটা এভাবে করা হয় যে, মানুষের প্রাণকে 'আলমে মিছাল' অধ্যয়নের দিকে নিবিষ্ট করে এ জগৎ থেকে বিমুখ ও নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হয়, যাতে মানুষ পরিপূর্ণ আরাম লাভ করতে পারে। যখন অভ্যন্তরীণ সম্পর্কও বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়, তখন দেহের জীবন সম্পূর্ণরূপে খতম হয়ে যায়।

আলোচ্য আয়াতে تَوَفِّى শব্দটি উপরোক্ত উভয় প্রকার প্রাণ হরণের অর্থকেই অন্তর্ভুক্ত করে। মৃত্যু ও নিদ্রার উপরোক্ত পার্থক্যের সমর্থন হযরত আলী (রা)-এর এক উক্তি থেকেও পাওয়া যায়। তিনি বলেন, "নিদ্রার সময় মানুষের প্রাণ তার দেহ থেকে বের হয়ে যায়, কিন্তু প্রাণের একটি রেশ দেহে বাকী থাকে। ফলে মানুষ জীবিত থাকে। এ রেশের মাধ্যমেই সে স্বপ্ন দেখে। এ স্বপ্ন আলমে মিছালের দিকে প্রাণের নিবিষ্ট থাকা অবস্থায় দেখা হলে তা সত্য স্বপ্ন হয় এবং সেদিক থেকে দেহের দিকে ফিরে আসার সময় দেখলে তাতে শয়তানের কারসাজি শামিল হয়ে যায়। ফলে সেটা সত্য স্বপ্ন থাকে না।" তিনি আরও বলেন, "নিদ্রাবস্থায় প্রাণ দেহ থেকে বেরিয়ে যায়; কিন্তু জাগরণের সময় এক নিমেষের চেয়েও কম সময়ে দেহে ফিরে আসে।"

قُلِ اللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ عٰلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ تَحْكُمُ
بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْ مَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿۴۶﴾ وَلَوْ اَنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَا فِي
الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَّمِثْلَهٗ مَعَهٗ لَافْتَدَوْا بِهٖ مِنْ سُوْٓءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ
وَبَدَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مَا لَمْ يَكُوْنُوْا يَحْتَسِبُوْنَ ﴿۴۷﴾ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا
كَسَبُوْا وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿۴۸﴾ فَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا
ثُمَّ اِذَا خَوَّلْنٰهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ اِنَّمَآ اُوْتِيْتُهٗ عَلٰى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ
وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۴۹﴾ قَدْ قَالَهَا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَآ اَغْنٰى
عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿۵۰﴾ فَاَصَابَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا كَسَبُوْا وَالَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْ
هٰٓؤُلَآءِ سَيُصِيْبُهُمْ سَيِّاٰتُ مَا كَسَبُوْا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ﴿۵۱﴾ اَوَلَمْ يَعْلَمُوْٓا اَنَّ
اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿۵۲﴾

(৪৬) বলুন, হে আল্লাহ্, আসমান ও যমীনের স্রষ্টা, দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী, আপনিই আপনার বান্দাদের মধ্যে ফয়সালা করবেন যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করত। (৪৭) যদি গোনাহ্গারদের কাছে পৃথিবীর সবকিছু থাকে এবং তার সাথে সমপরিমাণ আরও থাকে, তবে অবশ্যই তারা কিয়ামতের দিন সে সবকিছুই নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য মুক্তিপণ হিসেবে দিয়ে দেবে। অথচ তারা দেখতে পাবে, আল্লাহ্র পক্ষ

থেকে এমন শাস্তি, যা তারা কল্পনাও করত না। (৪৮) আর দেখবে, তাদের দুষ্কর্ম-সমূহ এবং যে বিষয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত, তা তাদেরকে ঘিরে নেবে। (৪৯) মানুষকে যখন দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করে, তখন সে আমাকে ডাকতে শুরু করে. এরপর আমি যখন তাকে আমার পক্ষ থেকে নিয়ামত দান করি তখন সে বলে এটা তো আমি পূর্বের জানা মতেই প্রাপ্ত হয়েছি। অথচ এটা এক পরীক্ষা কিন্তু তাদের অধিকাংশই বোঝে না। (৫০) তাদের পূর্ববর্তীরাও তাই বলত অতপর তাদের কৃতকর্ম তাদের কোন উপকারে আসেনি। (৫১) তাদের দুষ্কর্ম তাদেরকে বিপদে ফেলেছে. এদের মধ্যেও যারা পাপী, তাদেরকেও অতিসত্বর তাদের দুষ্কর্ম বিপদে ফেলবে। তারা তা প্রতিহত করতে সক্ষম হবে না। (৫২) তারা কি জানেনি যে, আল্লাহ্ যার জন্য ইচ্ছা রিযিক বৃদ্ধি করেন এবং পরিমিত দেন। নিশ্চয় এতে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি (তাদের শত্রুতায় চিন্তিত হবেন না এবং আল্লাহ্‌র কাছে দোয়ায়) বলুন হে আল্লাহ্, আসমান ও যমীনের স্রষ্টা, অদৃশ্য ও দৃশ্যের জ্ঞানী, আপনিই (কিয়ামতের দিন) আপনার বান্দাদের মধ্যে ফয়সালা করবেন যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করত। (অর্থাৎ আপনি তাদের ব্যাপার আল্লাহ্ তা'আলার কাছে সমর্পণ করুন। তিনি নিজে কার্যত ফয়সালা করে দেবেন। এই ফয়সালার সময় ও অবস্থা এই হবে যে,) যদি যুলুম (অর্থাৎ শিরক ও কুফর)-কারীদের কাছে পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু-সামগ্রী থাকে এবং তার সাথে সমপরিমাণ আরও থাকে, তবে অবশ্যই তারা তা কিয়ামতের দিন শোচনীয় আযাব থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য (নির্দ্বিধায়) দিয়ে দেবে, (যদিও তা কবূল করা হবে না, যেমন সূরা মায়েদায় আছে—مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ) আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তারা এমন ব্যাপারের সম্মুখীন হবে, যা তারা কল্পনাও করত না। (কেননা, প্রথমত তারা পরকাল অস্বীকার করত, এরপরও দাবি করত যে, সেখানেও তারা সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ করবে। তখন) তারা দেখতে পাবে তাদের যাবতীয় দুষ্কর্ম এবং যে (শাস্তির) বিষয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত, তা তাদেরকে পরিবেষ্টন করে নেবে। (মুশরিক তো মিথ্যা উপাস্যদের আলোচনায় সন্তুষ্ট এবং কেবল আল্লাহ্‌র আলোচনায় অসন্তুষ্ট থাকে, কিন্তু) যখন (মুশরিক) লোককে কোন দুঃখকষ্ট স্পর্শ করে, তখন (যাদের আলোচনায় সন্তুষ্ট থাকত, তাদের সবাইকে ছেড়ে) আমাকেই ডাকতে শুরু করে। অতপর আমি যখন তাকে আমার পক্ষ থেকে কোন নিয়ামত দান করি, তখন (সে তওহীদে কায়েম থাকে না, যার সত্যতা তার নিজের স্বীকা-রোক্তি দ্বারাই প্রমাণিত হয়েছিল। সেমতে সে এই নিয়ামতকে আল্লাহ্‌র নিয়ামত বলে না, বরং) বলে, এটা তো আমি (আমার) পূর্ব জানামতেই প্রাপ্ত হয়েছি। (এভাবে সে পূর্বের ন্যায় শিরকে ফিরে যায় এবং মিথ্যা উপাস্যদের পূজায় লেগে

যায়। অতপর আল্লাহ্ তার উক্তি খণ্ডন করে বলেন যে, এটা তার নিজের তদ্বিরের ফলশ্রুতি নয়,) বরং এটা (অর্থাৎ মানুষের জন্য আল্লাহ্ প্রদত্ত নিয়ামত) একটা পরীক্ষা। (আল্লাহ্ দেখতে চান যে, নিয়ামত পেয়ে মানুষ তাকে ভুলে গিয়ে কুফরীতে লিপ্ত হয়ে পড়ে, নাকি তাকে স্মরণ করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।) কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা বোঝে না। (তাই একে নিজের তদ্বিরের ফলশ্রুতি বলে এবং শিরকে লিপ্ত হয়।) তাদের (কোন কোন) পূর্ববর্তীরাও একথা বলত (যেমন, কারূন বলেছিল, إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِي—নমরূদ, ফেরাউনও কোন নিয়ামতকে আল্লাহ্‌র নিয়ামত বলত না। উপার্জিত ও ইচ্ছাধীন নয়, এমন নিয়ামতকে তারা ঘটনাচক্রের দিকে এবং উপার্জিত ও ইচ্ছাধীন নিয়ামতকে কৌশল ও জ্ঞানগরিমার সাথে সম্পৃক্ত করত।) অতপর তাদের কর্মতৎপরতা তাদের কোনই কাজে আসেনি (এবং আযাব থেকে রক্ষা করতে পারেনি)। তাদের দুষ্কর্ম তাদেরকে বিপদেই ফেলেছে (এবং তারা শাস্তিপ্রাপ্ত হয়েছে। বর্তমান যুগের লোকেরাও যেন মনে না করে যে, যা হওয়ার ছিল পূর্ববর্তীদের সাথেই হয়ে গেছে, বরং) তাদের মধ্যেও যারা যালিম, তাদেরকেও অতিসত্বর তাদের দুষ্কর্ম বিপদে ফেলবে। তারা (আল্লাহ্ তা'আলাকে) প্রতিহত করতে পারবে না। (সেমতে বদর যুদ্ধে তাদের যথেষ্ট শাস্তি হয়েছে। যারা আল্লাহ্‌র নিয়ামতকে নিজেদের তদ্বিরের ফলশ্রুতি মনে করে, অতপর তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ তারা কি (অবস্থাদি দেখে) জানেনি যে, আল্লাহ্ তা'আলাই যার জন্য ইচ্ছা রিযিক বৃদ্ধি করেন এবং তিনিই (যার জন্য ইচ্ছা) তা হ্রাস করেন। এতে (চিন্তা করলে) বিশ্বাসী লোকদের জন্য (এ বিষয়ের) নিদর্শনাবলী রয়েছে (যে, তিনিই রিযিক বৃদ্ধি করেন এবং হ্রাস করেন—তদ্বির সত্যিকার কর্তা নয়। সুতরাং এসব নিদর্শন নিয়ে যারা চিন্তা-ভাবনা করবে, সে তদ্বিরকে সবকিছু মনে করবে না, তওহীদে বিশ্বাসী হবে এবং সুখে ও দুঃখে তার কথা ও কাজ পরস্পরবিরোধী হবে না।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ—সহীহ্ মুসলিমের রেওয়ায়েতে হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাজ্জুদের নামায কিসের দ্বারা শুরু করতেন? তিনি বললেন, তিনি যখন তাহাজ্জুদের জন্য উঠতেন, তখন এ দোয়া পাঠ করতেনঃ

اَللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَاِسْرَافِيْلَ فَاطِرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ

عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ

اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى

صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ -

হযরত সায়ীদ ইবনে জুবায়ের (র) বলেন, আমি কোরআন পাকের এমন এক আয়াত জানি, যা পাঠ করে দোয়া করলে সে দোয়া কবুল হয়। অতপর তিনি এ আয়াত পাঠ করলেনঃ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ —(কুরতুবী)

وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ —হযরত সুফিয়ান সওরী (র) এ আয়াত পাঠ করে বললেন, ধ্বংস হোক লোক দেখানো ইবাদতকারীরা, ধ্বংস হোক লোক দেখানো ইবাদতকারীরা, এ আয়াত তাদের সম্পর্কেই, যারা দুনিয়াতে মানুষকে দেখানোর জন্য সৎকর্ম করত এবং লোকেরাও তাদেরকে সৎ মনে করত। তারা ধোঁকায় ছিল যে, এসব সৎকর্ম পরকালে তাদের মুক্তির উপায় হবে। কিন্তু এগুলোতে যেহেতু নিষ্ঠা ছিল না, তাই আল্লাহ্‌র কাছে এরূপ সৎকর্মের কোন পুরস্কার ও সওয়াব নেই। ফলে পরকালে তাদের ধারণার বিপরীতে শাস্তি হতে থাকবে। —(কুরতুবী)

সাহাবায়ে কিরামের পারস্পরিক বাদানুবাদ সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ পথনির্দেশঃ হযরত রবী ইবনে খাইসমকে কেউ হযরত হোসাইন (রা)-এর শাহাদত সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি এক দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ আয়াতখানি তিলাওয়াত করলেন, অতপর বললেনঃ সাহাবায়ে কিরামের পারস্পরিক মতবিরোধ সম্পর্কে যখন তোমার মনে খট্‌কা দেখা দেয়, তখন এ আয়াত পাঠ করে নিও। রুহুল মা'আনী এই ঘটনা বর্ণনা করে বলেনঃ এটি একটি বিরাট আদব ও শিক্ষা। এটা সদাসর্বদা মনে রাখা উচিত।

قُلْ يَٰعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ

اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٥٣﴾ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ

رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ ﴿٥٤﴾
وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ
بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿٥٥﴾ أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَىٰ عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ
فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ ﴿٥٦﴾ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي
لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿٥٧﴾ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي
كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٨﴾ بَلَىٰ قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا
وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٥٩﴾ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا
عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٦٠﴾ وَيُنَجِّي
اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦١﴾

(৫৩) বলুন, হে আমার বান্দাগণ যারা নিজেদের উপর যুলুম করেছ তোমরা আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ্ সমস্ত গোনাহ্ মাফ করেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (৫৪) তোমরা তোমাদের পালনকর্তার অভিমুখী হও এবং তাঁর আজ্ঞাবহ হও তোমাদের কাছে আযাব আসার পূর্বে। এরপর তোমরা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না; (৫৫) তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ উত্তম বিষয়ের অনুসরণ কর তোমাদের কাছে অতর্কিতে ও অজ্ঞাতসারে আযাব আসার পূর্বে, (৫৬) যাতে কেউ না বলে, হায়, হায়, আল্লাহ্ সকাশে আমি কর্তব্যে অবহেলা করেছি এবং আমি ঠাট্টা-বিদ্রূপকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। (৫৭) অথবা না বলে, আল্লাহ্ যদি আমাকে পথপ্রদর্শন করতেন, তবে অবশ্যই আমি পরহেযগারদের একজন হতাম। (৫৮) অথবা আযাব প্রত্যক্ষ করার সময় না বলে, যদি কোনরূপে একবার ফিরে যেতে পারি, তবে আমি সৎকর্ম-পরায়ণ হয়ে যাব। (৫৯) হ্যাঁ, তোমার কাছে আমার নির্দেশ এসেছিল; অতপর তুমি তাকে মিথ্যা বলেছিলে, অহংকার করেছিলে এবং কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিলে। (৬০) যারা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, কিয়ামতের দিন আপনি তাদের মুখ কাল দেখবেন। অহংকারীদের আবাসস্থল জাহান্নামে নয় কি? (৬১) আর যারা শিরক থেকে বেঁচে থাকত, আল্লাহ্ তাদেরকে সাফল্যের সাথে মুক্তি দেবেন, তাদেরকে অনিষ্ট স্পর্শ করবে না এবং তারা চিন্তিতও হবে না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি (প্রশ্নকারীদের জওয়াবে আমার একথা) বলে দিন, হে আমার বান্দাগণ. যারা (কুফর ও শিরক করে) নিজেদের উপর যুলুম করেছ, তোমরা আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না (এবং এরূপ মনে করো না যে, ঈমান আনার পর অতীত কুফর ও শিরকের হিসাব নেওয়া হবে। এমন নয়, বরং) নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা (ইসলামের বরকতে) সমস্ত (অতীত) গোনাহ্ (কুফর ও শিরক হলেও) মাফ করে দেবেন। বাস্তবিক তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (ক্ষমার এ শর্ত কুফর থেকে তওবা করা ও ইসলাম গ্রহণ করা। তাই) তোমরা (তওবা করার জন্য) তোমাদের পালন-কর্তার অভিমুখী হও এবং (ইসলাম গ্রহণ করার ব্যাপারে) তাঁর আজ্ঞাবহ হও (ইসলাম গ্রহণ না করা অবস্থায়) তোমাদের কাছে আযাব আসার পূর্বে। তখন (কারও পক্ষ থেকে) তোমরা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না। (অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণ করলে কুফর ও শিরক সবই মাফ হয়ে যাবে এবং ইসলাম গ্রহণ না করলে কুফর ও শিরকের কারণে আযাব আসবে, যা প্রতিহত করা যাবে না। অতএব তোমাদের উচিত যে,) তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে আগত উত্তম বিধানাবলী মেনে চল, তোমাদের কাছে অতর্কিতে ও অজ্ঞাতসারে পর-কালের আযাব আসার পূর্বে। ('অতর্কিতে' বলার এক কারণ এই যে, প্রথম ফুঁকের পর সব প্রাণ অজ্ঞান হয়ে যাবে, অতপর দ্বিতীয় ফুঁকের পর হঠাৎ আযাব অনুভূত হতে থাকবে। দ্বিতীয় কারণ এই যে, আযাব আসার পূর্বে আযাবের স্বরূপ সম্পর্কিত কোন ধারণাই থাকবে না। কাজেই ধারণার বিপরীতে আযাব আসাকেই 'অতর্কিতে' বলে প্রকাশ করা হয়েছে। উপরোক্ত আদেশ দেওয়ার কারণ) যাতে (কাল কিয়ামতে) কেউ (একথা) না বলে যে, হায়, আমি আল্লাহ্ সকাশে আমার কর্তব্যে অবহেলা করেছি। আমি তো ঠাট্টা-বিদ্রূপকারীদেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলাম অথবা (এমন) না বলে যে, আল্লাহ্ যদি (দুনিয়াতে) আমাকে পথপ্রদর্শন করতেন, তবে আমিও পরহেযগারদের একজন হতাম। (কিন্তু আমি পথপ্রদর্শন থেকেই বঞ্চিত ছিলাম, তাই এ ত্রুটি ও অবহেলা হয়েছে। অতএব আমি ক্ষমার যোগ্য।) অথবা কেউ আযাব প্রত্যক্ষ করে (যেন) না বলে যে, যদি কোনরূপে একবার পৃথিবীতে ফিরে যেতে পারি, তবে আমি সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। (দ্বিতীয় উক্তির জওয়াবে বলা হয়েছে ঃ) হ্যাঁ, তোমার কাছে আমার আয়াতসমূহ পৌঁছেছিল, কিন্তু তুমি সেগুলোকে মিথ্যা বলেছিলে, (এবং সে মিথ্যা বলা কোন সন্দেহবশত ছিল না; বরং) তুমি অহংকার করেছিলে এবং (পরেও ঠিক হওনি; বরং) কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিলে। (কাজেই এখন একথা বলা ঠিক নয় যে, তোমাকে পথপ্রদর্শন করা হয়নি। অতপর কাফির এবং কুফর থেকে তওবাকারী উভয়ের শাস্তি ও প্রতিদান সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে।) আপনি কিয়ামতের দিন তাদের মুখ কাল দেখবেন যারা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করে (অর্থাৎ আল্লাহ্ যা করতে বলেননি, যেমন কুফর ও শিরক—তা আল্লাহ্ করতে বলেছেন বলে এবং আল্লাহ্ যা করতে বলেছেন, যেমন, কোরআনের আদেশ-নিষেধ, তা আল্লাহ্ করতে বলেননি বলে।) এসব অহংকারীর আবাসস্থল কি জাহান্নাম নয়?

আর যারা (কুফর ও শিরক থেকে) বেঁচে থাকত, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে সাফল্যের সাথে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করবেন। তাদেরকে (সামান্য অনিষ্টও) স্পর্শ করবে না এবং তারা চিন্তিতও হবে না। (কেননা জান্নাতে চিন্তা নেই।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوا—হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, কিছু লোক ছিল, যারা অন্যায় হত্যা করেছিল এবং অনেক করেছিল। আরও কিছু লোক ছিল, যারা ব্যভিচার করেছিল এবং অনেক করেছিল। তারা এসে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে আরয করলঃ আপনি যে ধর্মের দাওয়াত দেন, তা তো খুবই উত্তম, কিন্তু চিন্তার বিষয় হল এই যে, আমরা অনেক জঘন্য গোনাহ্ করে ফেলেছি। আমরা যদি ইসলাম গ্রহণ করি, তবে আমাদের তওবা কবুল হবে কি? এর পরিপ্রেক্ষিতেই আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়।—(কুরতুবী)

তাই আয়াতের বিষয়বস্তুর সারমর্ম এই যে, মৃত্যুর পূর্বে প্রত্যেক বড় গোনাহ্ এমনকি শিরক ও কুফর থেকে তওবা করলেও তওবা কবুল হয়। সত্যিকার তওবা দ্বারা সবরকম গোনাহ্ই মাফ হতে পারে। তাই আল্লাহ্র রহমত থেকে কারও নিরাশ হওয়া উচিত নয়।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) বলেন, এই আয়াতটি গোনাহ্গারদের জন্য কোরআনের সর্বাধিক আশাব্যঞ্জক আয়াত। কিন্তু হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেনঃ اِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلٰى ظُلْمِهِمْ—আয়াতই হল সর্বাধিক আশার আয়াত।

وَاتَّبِعُوْا اَحْسَنَ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ—এখানে 'উত্তম অবতীর্ণ বিষয়' বলে কোরআনকে বোঝানো হয়েছে। সমগ্র কোরআনই উত্তম। একে এদিক দিয়েও উত্তম বলা যায় যে, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তওরাত, ইঞ্জীল, যবুর ইত্যাদি যত কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে, তন্মধ্যে উত্তম ও পূর্ণতম কিতাব হচ্ছে কোরআন।—(কুরতুবী)

اَنْ تَقُوْلَ نَفْسٌ يَّا حَسْرَتٰى ------- مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ—এই তিনটি আয়াতে সে বিষয়বস্তুরই ব্যাখ্যা ও তাকীদ করা হয়েছে, যা পূর্বেকার তিন আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। তা এই যে, কোন বৃহত্তম অপরাধী, কাফির, পাপাচারীরও আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হওয়া উচিত নয়। তওবা করলে আল্লাহ্ তার সমস্ত অতীত গোনাহ্ মাফ করে দেন। কিন্তু একথা ভুলে গেলে চলবে না যে, তওবার সময় হল মৃত্যুর

পূর্বে। মৃত্যুর পরে কিয়ামতের দিন কেউ তওবা করলে অথবা অনুতপ্ত হলে তাতে কোন উপকার হবে না।

কোন কোন কাফির ও পাপাচারী কিয়ামতের দিন বিভিন্ন বাসনা প্রকাশ করবে। কেউ অনুতাপ করে বলবে, হায়, আমি আল্লাহ্‌র আনুগত্যে কেন শৈথিল্য করেছিলাম! কেউ সেখানেও তকদীরের উপর দোষ চাপিয়ে আত্মরক্ষা করতে চাইবে। সে বলবে, যদি আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে পথপ্রদর্শন করতেন, তবে আমিও মুত্তাকীদের অন্তর্ভুক্ত থাকতাম। কিন্তু আল্লাহ্ পথপ্রদর্শন না করলে আমি কি করব? কেউ বাসনা করবে যে, আমাকে পুনরায় দুনিয়াতে পাঠিয়ে দিলে আমি পাকাপোক্ত মুসলমান হয়ে যাব এবং আল্লাহ্‌র বিধানাবলী পুরোপুরি মেনে চলব। কিন্তু তখনকার এসব অনুতাপ ও বাসনা কোন কাজেই আসবে না।

উপরোক্ত তিন রকম বাসনা তিন ধরনের লোকদেরও হতে পারে এবং একই দলের পক্ষ থেকেও হতে পারে। তারা একের পর এক করে তিন রকম বাসনাই ব্যক্ত করবে। কেননা সর্বশেষ বাসনা, যাতে পুনরায় দুনিয়াতে ফিরে আসার আশা প্রকাশ করা হয়েছে, এটা আযাব প্রত্যক্ষ করার পরেই হবে। এতে বাহ্যত জানা যায় যে, পূর্বোক্ত দু'টি বাসনা আযাব প্রত্যক্ষ করার পূর্বেকার। কিয়ামতের দিন শুরুতেই তারা নিজেদের কর্মের ত্রুটি-বিচ্যুতি স্মরণ করে বলবে ঃ يٰحَسْرَتٰى عَلٰى مَا فَرَّطْتُ فِىْ جَنْۢبِ اللّٰهِ- এরপর ওযর ও বাহানা করে বলবে, আল্লাহ্ হিদায়েত করলে আমরাও অনুগত মুত্তাকী হয়ে যেতাম। কাজেই আমাদের কি দোষ! এরপর আযাব প্রত্যক্ষ করে বাসনা করবে, আমাদেরকে যদি পুনরায় দুনিয়াতে পাঠিয়ে দেওয়া হত! আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য তিনটি আয়াতে বলে দিয়েছেন, আল্লাহ্‌র মাগফিরাত ও রহমত খুব বিস্তৃত; কিন্তু তা লাভ করতে হলে মৃত্যুর পূর্বে তওবা করতে হবে। আমি এখনই বলে দিচ্ছি--মৃত্যুর পরে যেন তোমরা পরিতাপ না কর এবং এ ধরনের অনর্থক বাসনা প্রকাশ না কর।

بَلٰى قَدْ جَاءَتْكَ اٰيٰتِىْ فَكَذَّبْتَ بِهَا—আল্লাহ্ তা'আলা হিদায়েত করলে আমরা পরহিযগার হয়ে যেতাম----এখানে কাফিরদের এ উক্তির জওয়াব দেওয়া হয়েছে। এর সারকথা এই যে, আল্লাহ্ পুরোপুরিই হিদায়েত করেছিলেন এবং কিতাব ও আয়াত প্রেরণ করেছিলেন। তবে হিদায়েত করার পর কাউকে আনুগত্যে বাধ্য করেন নি, বরং সত্য ও মিথ্যা যে কোন পথ অবলম্বন করার ক্ষমতা দিয়েছিলেন। এটাই ছিল বান্দার পরীক্ষা। এর উপরই ছিল তার সাফল্য ও ব্যর্থতা নির্ভরশীল। সে স্বেচ্ছায় গোমরাহীর পথ অবলম্বন করেছে, তজ্জন্য সে নিজেই দায়ী।

اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ ﴿٦٢﴾ لَهٗ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿٦٣﴾ قُلْ اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَاْمُرُوْٓنِّيْٓ
اَعْبُدُ اَيُّهَا الْجٰهِلُوْنَ ﴿٦٤﴾ وَلَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ
اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٦٥﴾ بَلِ اللّٰهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِّنَ
الشّٰكِرِيْنَ ﴿٦٦﴾ وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهٗ يَوْمَ
الْقِيٰمَةِ وَالسَّمٰوٰتُ مَطْوِيّٰتٌۢ بِيَمِيْنِهٖ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٦٧﴾

(৬২) আল্লাহ্ সবকিছুর স্রষ্টা এবং তিনি সবকিছুর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। (৬৩) আসমান ও যমীনের চাবি তাঁরই নিকট। যারা আল্লাহ্র আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। (৬৪) বলুন, হে মূর্খরা, তোমরা কি আমাকে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের ইবাদত করতে আদেশ করছ? (৬৫) আপনার প্রতি এবং আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি প্রত্যাদেশ হয়েছে, যদি আল্লাহ্র শরীক স্থির করেন, তবে আপনার কর্ম নিষ্ফল হবে এবং আপনি ক্ষতিগ্রস্তদের একজন হবেন। (৬৬) বরং আল্লাহ্রই ইবাদত করুন এবং কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত থাকুন। (৬৭) তারা আল্লাহ্কে যথার্থরূপে বুঝেনি। কিয়ামতের দিন গোটা পৃথিবী থাকবে তাঁর হাতের মুঠোতে এবং আসমানসমূহ ভাঁজ করা অবস্থায় থাকবে তাঁর ডান হাতে। তিনি পবিত্র। আর এরা যাকে শরীক করে, তা থেকে তিনি অনেক ঊর্ধ্বে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আল্লাহ্ই সবকিছুর স্রষ্টা এবং তিনিই সবকিছুর রক্ষক। আকাশ ও পৃথিবীর চাবি তাঁরই আয়ত্তে। (অর্থাৎ এগুলোর স্রষ্টাও তিনি এবং রক্ষকও তিনি। وكيل শব্দের ভাবার্থ তাই। সবকিছুর নিয়ন্ত্রণও তাঁরই কাজ। এটা لَهٗ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ এর ভাবার্থ। কেননা যার হাতে ভাণ্ডারের চাবি থাকে, স্বভাবত সেই তার নিয়ন্ত্রণের মালিক হয়ে থাকে। সমস্ত সৃষ্ট জগতের স্রষ্টাও যখন তিনিই, তখন ইবাদতও শুধু তাঁরই হওয়া উচিত এবং শাস্তি ও প্রতিদানের মালিকও তাঁরই হওয়া উচিত। এটাই তওহীদের সারমর্ম। আল্লাহ্র এসব ক্ষমতা মুশরিকরাও স্বীকার করত। সুতরাং তাদের কর্তব্য ছিল তওহীদকে মেনে নেওয়া। তাই বলা হয়েছে ঃ) যারা (এরপরও) আল্লাহ্র (তওহীদ, প্রতিদান ও শাস্তির বিষয়বস্তু সম্বলিত) আয়াতসমূহ মানে না,

তারা খুব ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (তারা নিজেরা তো কুফর ও শিরকে জড়িত ছিলই, এখন তাদের সাহস এত বেড়েছে যে, আপনাকেও তাদের ধর্মে নেওয়ার জন্য বলে। অতএব) আপনি বলে দিন, হে মূর্খের দল, (তওহীদ সপ্রমাণ ও শিরক বাতিল হওয়ার পরও) তোমরা কি আমাকে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের ইবাদত করতে আদেশ কর? (আপনি কুফর ও শিরক কিরূপে করতে পারেন, যখন) আপনার প্রতি ও আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি প্রেরণ করা হয়েছে যে, (প্রত্যেক উম্মতকে বলে দিন,) যদি তুমি আল্লাহ্র সাথে শরীক স্থির কর, তবে তোমার কর্ম নিষ্ফল হবে এবং তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (কাজেই কখনও শিরক করো না) বরং আল্লাহ্রই ইবাদত কর এবং তাঁরই কৃতজ্ঞ থাক। (অতএব মুশরিকরা যে আপনার কাছে শিরক আশা করে এটা বোকামি নয় তো কি? পরিতাপের বিষয়) তারা আল্লাহ্র মাহাত্ম্য ও সম্মান বুঝেনি যেমন বোঝা উচিত ছিল। সমগ্র পৃথিবী তাঁরই মুঠিতে থাকবে কিয়ামতের দিন এবং সমগ্র আকাশ ভাঁজ করা অবস্থায় তাঁর ডান হাতে থাকবে। তিনি তাদের শিরক থেকে পবিত্র ও উর্ধ্বে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

لَهٗ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ—مقاليد শব্দটি مقلاد অথবা مقليد-এর বহুবচন। অর্থ তালার চাবি। কেউ কেউ বলেন, শব্দটি আসলে ফারসী থেকে আরবীতে রূপান্তরিত করা হয়েছে। ফারসীতে চাবিকে كليد বলা হয়। আরবী রূপান্তর করে প্রথমে একে اقليد করা হয়েছে। এরপর এর বহুবচন مقاليد ব্যবহৃত হয়েছে।---(রূহুল মা'আনী) চাবি কারও হাতে থাকা তার মালিক ও নিয়ন্ত্রক হওয়ার লক্ষণ। তাই আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়ায় এই যে, আকাশে ও পৃথিবীতে লুক্কায়িত সকল ভাণ্ডারের চাবি আল্লাহ্র হাতে। তিনিই এগুলোর রক্ষক, তিনিই নিয়ন্ত্রক, যখন ইচ্ছা যাকে ইচ্ছা, যে পরিমাণ ইচ্ছা দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা দান করেন না। হাদীস শরীফে

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ—এই কলেমাকে আকাশ ও পৃথিবীর চাবি বলা হয়েছে।

এর সারমর্ম এই যে, যে ব্যক্তি সকাল-বিকাল এ কলেমা পাঠ করে, তাকে আল্লাহ্ তা'আলা আকাশ ও পৃথিবীর ভাণ্ডারসমূহের নিয়ামত দান করেন। ইবনে জওযী এ ধরনের রেওয়ায়েতকে মনগড়া বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু অন্যান্য হাদীসবিদ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন, যা আমলের ফযীলতে ধর্তব্য হতে পারে।---(রূহুল মা'আনী)

وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَالسَّمٰوٰتُ مَطْوِيّٰتٌۢ بِيَمِيْنِهٖ

কিয়ামতের দিন পৃথিবী আল্লাহ্‌র মুঠোতে থাকবে এবং আকাশ ভাঁজ করা অবস্থায় তার ডান হাতে থাকবে। পূর্ববর্তী আলিমগণের মতে আক্ষরিক অর্থেই এমনটি হবে। কিন্তু আয়াতের বিষয়বস্তু متشابهات-এর অন্তর্ভুক্ত, যার স্বরূপ আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেউ জানে না। এর স্বরূপ জানার চেষ্টা করাও সাধারণ লোকের জন্য নিষিদ্ধ। বিশ্বাস করতে হবে যে, আল্লাহ্‌র যা উদ্দেশ্য তা সত্য ও বিশুদ্ধ। এ আয়াতের বাহ্যিক ভাষা থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলার 'মুঠি' ও 'ডান হাত' আছে। এগুলো দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, অথচ আল্লাহ্ তা'আলা দেহ ও দেহত্ব থেকে পবিত্র ও মুক্ত। তাই আয়াতের উপসংহারে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এগুলোকে নিজেদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আলোকে বুঝতে চেষ্টা করো না। আল্লাহ্ এগুলো থেকে পবিত্র। سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ

পরবর্তী আলিমগণ আলোচ্য আয়াতকে দৃষ্টান্ত ও রূপক সাব্যস্ত করে এর অর্থ করেছেন যে, 'এ বস্তু আমার মুঠিতে ও ডান হাতে' এরূপ বলে রূপক ভঙ্গিতে বোঝানো হয় যে, বস্তুটি পূর্ণরূপে আমার করায়ত্ত ও নিয়ন্ত্রণাধীন। আয়াতে তাই বোঝানো হয়েছে।

وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَآءَ اللّٰهُ ؕ ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ اُخْرٰى فَاِذَا هُمْ قِيَامٌ يَّنْظُرُوْنَ ﴿٦٨﴾ وَاَشْرَقَتِ الْاَرْضُ بِنُوْرِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتٰبُ وَجِايْٓءَ بِالنَّبِيّٖنَ وَالشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿٦٩﴾ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ اَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ﴿٧٠﴾ وَسِيْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى جَهَنَّمَ زُمَرًا ؕ حَتّٰٓى اِذَا جَآءُوْهَا فُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَآ اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ؕ قَالُوْا بَلٰى وَلٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ﴿٧١﴾ قِيْلَ ادْخُلُوْٓا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ

خَٰلِدِينَ فِيهَا ۖ فَبِئْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ۝ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا۟ رَبَّهُمْ
إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًا ۖ حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَٰبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا
سَلَٰمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَٱدْخُلُوهَا خَٰلِدِينَ ۝ وَقَالُوا۟ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى صَدَ
قَنَا وَعْدَهُۥ وَأَوْرَثَنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآءُ ۖ فَنِعْمَ
أَجْرُ ٱلْعَٰمِلِينَ ۝ وَتَرَى ٱلْمَلَٰٓئِكَةَ حَآفِّينَ مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرْشِ
يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ۖ وَقُضِىَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَقِيلَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ۝

(৬৮) শিংগায় ফুঁক দেওয়া হবে, ফলে আসমান ও যমীনে যারা আছে সবাই বেহুঁশ হয়ে যাবে, তবে আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা করেন। অতপর আবার শিংগায় ফুঁক দেওয়া হবে, তৎক্ষণাৎ তারা দণ্ডায়মান হয়ে দেখতে থাকবে। (৬৯) পৃথিবী তার পালনকর্তার নূরে উদ্ভাসিত হবে, আমলনামা স্থাপন করা হবে, পয়গম্বরগণ ও সাক্ষী-গণকে আনা হবে এবং সকলের মধ্যে ন্যায়বিচার করা হবে---তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না। (৭০) প্রত্যেকে যা করেছে, তার পূর্ণ প্রতিফল দেওয়া হবে। তারা যা কিছু করে, সে সম্পর্কে আল্লাহ্ সম্যক অবগত। (৭১) কাফিরদেরকে জাহান্নামের দিকে দলে দলে হাঁকিয়ে নেওয়া হবে। তারা যখন সেখানে পেঁৗছবে, তখন তার দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হবে এবং জাহান্নামের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্য থেকে পয়গম্বর আসেনি, যারা তোমাদের কাছে তোমাদের পালনকর্তার আয়াতসমূহ আবৃত্তি করত এবং সতর্ক করত এ দিনের সাক্ষাতের ব্যাপারে? তারা বলবে, হ্যাঁ, কিন্তু কাফিরদের প্রতি শাস্তির হুকুমই বাস্তবায়িত হয়েছে। (৭২) বলা হবে, তোমরা জাহান্নামের দরজা দিয়ে প্রবেশ কর, সেখানে চিরকাল অবস্থানের জন্য। কত নিকৃষ্ট অহংকারীদের আবাসস্থল। (৭৩) যারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করত, তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা উন্মুক্ত দরজা দিয়ে জান্নাতে পেঁৗছাবে এবং জান্নাতের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, তোমাদের প্রতি সালাম, তোমরা সুখে থাক, অতপর সদাসর্বদা বসবাসের জন্য তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর। (৭৪) তারা বলবে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র, যিনি আমাদের প্রতি তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করেছেন এবং আমাদেরকে এ ভূমির উত্তরাধিকারী করেছেন। আমরা জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা বসবাস করব। মেহনতকারীদের পুরস্কার কতই চমৎকার! (৭৫) আপনি ফেরেশতাগণকে দেখবেন, তারা আরশের চার পাশ ঘিরে তাদের পালনকর্তার পবিত্রতা ঘোষণা করছে। তাদের সবার মাঝে ন্যায় বিচার করা হবে। বলা হবে, সমস্ত প্রশংসা বিশ্বপালক আল্লাহ্র।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(উল্লিখিত কিয়ামতের দিন) শিংগায় ফুঁক দেওয়া হবে, ফলে আসমান ও যমীনের সবাই বেহুঁশ হয়ে যাবে। (অতপর জীবিতরা মরে যাবে এবং মৃতদের রূহ্ বেহুঁশ হয়ে যাবে।) কিন্তু আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা করবেন (সে বেহুঁশ হওয়া ও মরে যাওয়া থেকে মুক্ত থাকবে)। অতপর আবার শিংগায় ফুঁক দেওয়া হবে---তৎক্ষণাৎ সবাই (জ্ঞানপ্রাপ্ত হয়ে দেহের সাথে আত্মার সংযোগ হয়ে কবর থেকে) দণ্ডায়মান হয়ে (চতুর্দিকে) দেখতে থাকবে। (অত্যাশ্চর্য ঘটনা ঘটলে স্বভাবত যেরূপ হয়। অতপর আল্লাহ্ তা'আলা হিসাবের জন্য তাঁর উপযুক্ত শান অনুযায়ী বিরাজমান হবেন এবং) যমীন তার পালনকর্তার নূরে উদ্ভাসিত হবে, (সবার) আমলনামা (প্রত্যেকের সামনে) স্থাপন করা হবে এবং পয়গম্বরগণ ও সাক্ষিগণকে উপস্থিত করা হবে (সাক্ষীর অর্থ ব্যাপক। এতে পয়গম্বর, ফেরেশতা, উম্মতে-মোহাম্মদী এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রভৃতি সবই অন্তর্ভুক্ত।) এবং সবার মাঝে (আমলঅনুযায়ী) ন্যায়বিচার করা হবে; তাদের উপর জুলুম করা হবে না। (অর্থাৎ কোন সৎকর্ম গোপন করা হবে না এবং কোন পাপকর্ম বাড়িয়ে দেখানো হবে না।) প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের পূর্ণ প্রতিফল দেওয়া হবে। (সৎকর্মের প্রতিফল পূর্ণ হওয়ার উদ্দেশ্য হল প্রতিফল হ্রাস না করা এবং পাপকর্মের প্রতিফল পূর্ণ হওয়ার মানে তাতে বৃদ্ধি না করা।) তিনি সমস্তের কাজকর্ম সম্পর্কে সম্যক অবগত। (সুতরাং প্রত্যেককে তদনুযায়ী প্রতিফল দেওয়া তাঁর পক্ষে কঠিন নয়। প্রতিফল এই যে,) যারা কাফির, তাদেরকে দলে দলে জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে (ধাক্কা মেরে মেরে লাঞ্ছনার সাথে) নিয়ে যাওয়া হবে। (কুফরের প্রকার ও স্তর বিভিন্ন হওয়ার কারণে দলে দলে ভাগ করে নেওয়া হবে। এক এক প্রকার কাফিরদের এক একটি দল হবে।) যখন তারা জাহান্নামের কাছে পেঁৗছাবে, তখন দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হবে এবং তাদেরকে জাহান্নামের রক্ষী (ফেরেশতা)-গণ (ভর্ৎসনা করে) বলবে, তোমাদের কাছে কি তোমাদেরই মধ্য থেকে (যাতে তোমাদের জন্য উপকার লাভ কঠিন না হয়) পয়গম্বর আসেনি, যারা তোমাদেরকে তোমাদের পালনকর্তার আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনাত এবং তোমাদেরকে এ দিনের সাক্ষাতের ব্যাপারে সতর্ক করত? কাফিররা বলবে, হ্যাঁ' (পয়গম্বর এসেছিলেন এবং সতর্কও করেছিলেন,) কিন্তু আযাবের ওয়াদা কাফিরদের প্রতি পূর্ণ হয়ে গেছে (এটা ওযরখাহী নয়; বরং স্বীকারোক্তি যে, সতর্ক করা সত্ত্বেও আমরা কুফর করেছি। ফলে আমরা কাফিরদের জন্য প্রতিশ্রুত শাস্তির সম্মুখীন হয়েছি। বাস্তবিকই আমরা অপরাধী। অতপর) বলা হবে, (অর্থাৎ ফেরেশতাগণ বলবে---) জাহান্নামের দরজা দিয়ে প্রবেশ কর এবং চিরকাল এখানে থাক। (আল্লাহ্‌র বিধানাবলীর ব্যাপারে) অহংকারীদের আবাসস্থল কত নিকৃষ্ট। (এরপর তাদেরকে জাহান্নামে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে। অন্য এক আয়াতে আছে عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤْصَدَةٌ) আর যারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করত (এর প্রথম স্তর ঈমান এবং পরবর্তীতে আরও বহু

স্তর রয়েছে—) তাদেরকে (আল্লাহ্ ভীতির স্তর অনুযায়ী) দলে দলে জান্নাতের দিকে (উৎসাহভরে দ্রুত) নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা জান্নাতের (পূর্ব থেকে) উন্মুক্ত দরজার কাছে গিয়ে পৌঁছাবে (যাতে প্রবেশ বিলম্ব না হয়। সম্মানিত মেহমানদের জন্য পূর্ব থেকেই দরজা খোলা রাখা হয়—অন্য আয়াতে আছে— مُفَتَّحَةً لَّهُمُ الْاَبْوَابُ) এবং জান্নাতের রক্ষী (ফেরেশতা)-রা তাদেরকে (অভ্যর্থনা জানাতে গিয়ে) বলবে, আস্‌সালামু আলাইকুম, তোমরা সুখে থাক। অতএব এতে (জান্নাতে) চিরকাল বসবাসের জন্য প্রবেশ কর। তারা (তখন প্রবেশ করবে। প্রবেশ করে) বলবে, আল্লাহ্‌র লাখো শুকরিয়া যিনি আমাদের প্রতি তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করেছেন এবং আমাদেরকে এই ভূমির অধিবাসী করেছেন। আমরা জান্নাতে যথা ইচ্ছা বাস করব। (অর্থাৎ প্রত্যেকেই প্রশস্ত জায়গা পেয়েছি। খুব স্বচ্ছন্দে চলাফের করা যাবে। বসবাস তো নিজের জায়গাতেই হবে, ভ্রমণ ইত্যাদি অন্য জান্নাতীর জায়গাও হবে। মোটকথা,) সৎকর্ম পরায়ণদের পুরস্কার কতই চমৎকার! (এ বাক্য জান্নাতীদেরও হতে পারে, আল্লাহ্ তা'আলারও হতে পারে।) আপনি ফেরেশতাগণকে দেখবেন যে, (হিসাবের এজলাসে অবতরণের সময়) আরশের চারপাশ ঘিরে তাদের পালনকর্তার পবিত্রতা ঘোষণা করছে। সমস্ত বান্দার মধ্যে ন্যায়বিচার করা হবে। (এই সুবিচারের কারণে চতুর্দিক থেকে প্রশংসাধ্বনি উত্থিত হবে এবং) বলা হবে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য, যিনি বিশ্বজগতের পালনকর্তা। (তিনিই চমৎকার এ ফয়সালা করেছেন। অতপর এ ধন্যবাদসূচক ধ্বনির মধ্যে দরবার সমাপ্ত হয়ে যাবে।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

صعق —فَصَعِقَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ

এর শাব্দিক অর্থ বেহুঁশ হওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, প্রথমে বেহুঁশ হবে, অতপর মারা যাবে। যারা পূর্বেই মৃত, তাদের আত্মা বেহুঁশ হয়ে যাবে।—(বয়ানুল কোরআন)

اِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ —দুররে মনসুরের রেওয়ায়েত অনুযায়ী এই ব্যতিক্রমের মধ্যে চার ফেরেশতা—জিবরাঈল, মিকাঈল, ইসরাফীল ও আযরাঈল এবং কোন কোন রেওয়ায়েত অনুযায়ী আরশ বহনকারী ফেরেশতাগণও অন্তর্ভুক্ত। তাদের ব্যতিক্রমের অর্থ এই যে, শিংগা ফুঁকের প্রভাবে তাদের মৃত্যু হবে না। কিন্তু পরে তারাও মারা যাবে। আল্লাহ্ ব্যতীত তখন কেউ জীবিত থাকবে না। ইবনে কাসীর এ ব্যাখ্যাই অবলম্বন করেছেন। তিনি বলেন, তাদের মধ্যেও সবশেষে আযরাঈলের মৃত্যু হবে। সূরা নমলেও এ ধরনের এক আয়াত বর্ণিত রয়েছে। সেখানে صعق—এর পরিবর্তে فزع শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। সেখানেও এর কিছু বিবরণ উল্লেখ করা হয়েছে।

وَجِيْئَ بِالنَّبِيِّيْنَ وَالشُّهَدَاءِ —অর্থাৎ হাশরের ময়দানে হিসাব-নিকাশের সময় সমস্ত পয়গম্বরও উপস্থিত থাকবেন এবং অন্যান্য সাক্ষীও উপস্থিত থাকবে। সাক্ষিগণের এ তালিকায় স্বয়ং পয়গম্বরগণও থাকবেন। যেমন, এক আয়াতে আছে—وَجِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ —ফেরেশতাগণও থাকবে। যেমন, কোরআনে আছে—مَعَهَا سَائِقٌ وَّشَهِيْدٌ — -উম্মতে মোহাম্মদীও থাকবে। যেমন, এক আয়াতে বলা হয়েছে, وَتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ এবং স্বয়ং মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও থাকবে। যেমন, কোরআনে বলা হয়েছে : وَتُكَلِّمُنَا اَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ —

نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ —উদ্দেশ্য এই যে, জান্নাতীদের নিজেদের প্রাসাদ ও বাগবাগিচা তো থাকবেই, উপরন্তু তাদেরকে অন্য জান্নাতীদের কাছে সাক্ষাৎ ও বেড়ানোর জন্য গমন করার অনুমতিও দেওয়া হবে।---(তিবরানী) আবু-নয়ীম ও জিয়ার এক রেওয়ায়েতে হযরত আয়েশা (রা) বলেন : এক ব্যক্তি রসূলে করীম (সা)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে আরয করল, ইয়া রসূলাল্লাহ্! আপনার প্রতি আমার ভালবাসা এত সুগভীর যে, বাড়িতে গেলেও আপনাকেই স্মরণ করি এবং পুনরায় আপনার কাছে ফিরে না আসা পর্যন্ত আমি ধৈর্য ধরতে পারি না। কিন্তু যখন আমি আমার মৃত্যু ও আপনার ওফাতের কথা স্মরণ করি, তখন বিমর্ষ হয়ে পড়ি। কারণ মৃত্যুর পর আপনি তো জান্নাতে পয়গম্বরগণের সাথে উচ্চাসনে আসীন থাকবেন, আর আমি জান্নাতে গেলেও নিম্নস্তরেই স্থান পাব। কাজেই আমার চিন্তা এই যে, আপনাকে কিরূপে দেখব? রসূলুল্লাহ্ (সা) তার কথা শুনে কোন জওয়াব দিলেন না। অবশেষে জিবরাঈল নিম্নোক্ত আয়াত নিয়ে আগমন করলেন :

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاۤءِ وَالصّٰلِحِيْنَ وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا -

এই আয়াতে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ ও রসূলের আনুগত্য করতে থাকলে মুসলমানগণ পয়গম্বর ও সিদ্দীক প্রমুখের সঙ্গেই থাকবে। আর আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, তারা উচ্চস্তরে গমনাগমনেরও অনুমতি লাভ করবে।

—الحقنا الله بهم بمنه وكرمه

সূরা মু'মিন

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত ৮৫, রুকু ৯

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

حٰمٓ ۝١ تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ۝٢ غَافِرِ الذَّنْۢبِ
وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ ذِى الطَّوْلِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اِلَيْهِ
الْمَصِيْرُ ۝٣ مَا يُجَادِلُ فِيْٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ اِلَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَلَا يَغْرُرْكَ
تَقَلُّبُهُمْ فِى الْبِلَادِ ۝٤ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّالْاَحْزَابُ مِنْۢ بَعْدِهِمْ
وَهَمَّتْ كُلُّ اُمَّةٍۢ بِرَسُوْلِهِمْ لِيَاْخُذُوْهُ وَجٰدَلُوْا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوْا
بِهِ الْحَقَّ فَاَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ۝٥ وَكَذٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ
عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّهُمْ اَصْحٰبُ النَّارِ ۝٦ اَلَّذِيْنَ يَحْمِلُوْنَ الْعَرْشَ وَمَنْ
حَوْلَهٗ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَّعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِيْنَ تَابُوْا وَاتَّبَعُوْا
سَبِيْلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ۝٧ رَبَّنَا وَاَدْخِلْهُمْ جَنّٰتِ عَدْنِ ِۨ الَّتِيْ
وَعَدْتَّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ اِنَّكَ اَنْتَ
الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝٨ وَقِهِمُ السَّيِّاٰتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّاٰتِ يَوْمَىِٕذٍ فَقَدْ
رَحِمْتَهٗ وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝٩

পরম করুণাময় ও অসীম দয়াবান আল্লাহ্র নামে শুরু ঃ

(১) হা-মীম----(২) কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে, যিনি পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ, (৩) পাপ ক্ষমাকারী, তওবা কবূলকারী, কঠোর শাস্তিদাতা ও সামর্থ্যবান। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তাঁরই দিকে হবে প্রত্যাবর্তন। (৪) কাফিররাই কেবল আল্লাহ্র আয়াত সম্পর্কে বিতর্ক করে। কাজেই নগরীসমূহে তাদের বিচরণ যেন আপনাকে বিভ্রান্তিতে না ফেলে। (৫) তাদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায় মিথ্যারোপ করেছিল; আর তাদের পরে অন্য অনেক দলও। প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ পয়গম্বরকে আক্রমণ করার ইচ্ছা করেছিল এবং তারা মিথ্যা বিতর্কে প্রবৃত্ত হয়েছিল, যেন সত্যধর্মকে ব্যর্থ করে দিতে পারে। অতপর আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম। কেমন ছিল আমার শাস্তি! (৬) এভাবে কাফিরদের বেলায় আপনার পালনকর্তার এ বাক্য সত্য হল যে, তারা জাহান্নামী। (৭) যারা আরশ বহন করে এবং যারা তার চারপাশে আছে, তারা তাদের পালনকর্তার সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করে, তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং মু'মিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে বলে, হে আমাদের পালনকর্তা, আপনার রহমত ও জ্ঞান সবকিছুতে পরিব্যাপ্ত। অতএব যারা তওবা করে এবং আপনার পথে চলে, তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করুন। (৮) হে আমাদের পালনকর্তা, আর তাদেরকে দাখিল করুন চিরকাল বসবাসের জান্নাতে, যার ওয়াদা আপনি তাদেরকে দিয়েছেন এবং তাদের বাপ-দাদা, পতি-পত্নী ও সন্তানদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করে তাদেরকে। নিশ্চয় আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (৯) এবং আপনি তাদেরকে অমঙ্গল থেকে রক্ষা করুন। আপনি যাকে সেদিন অমঙ্গল থেকে রক্ষা করবেন, তার প্রতি অনুগ্রহই করবেন। এটাই মহা সাফল্য।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হা-মীম-(এর অর্থ আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন।) এ কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে, যিনি পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ, পাপ ক্ষমাকারী, তওবা কবূলকারী, কঠোর শাস্তিদাতা, সামর্থ্যবান, তিনি ব্যতীত উপাস্য নেই। তাঁরই (দিকে সবাইকে) প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (সুতরাং কোরআন পাক ও তওহীদের ব্যাপারে বিতর্ক করা উচিত নয়। কিন্তু এর পরেও) আল্লাহ্র আয়াত (অর্থাৎ তওহীদসম্বলিত কোরআন) সম্পর্কে কেবল তারাই বিতর্ক করে, যারা (এতে) অবিশ্বাসী। (তাদের এই অবিশ্বাসের কারণে তাদেরকে শাস্তি দেওয়াই উচিত ছিল কিন্তু ত্বরিত শাস্তি না দেওয়ার উদ্দেশ্য তাদেরকে কিছুদিন অবকাশ দেওয়া।) অতএব তাদের নগরীসমূহে (অবাধে সাংসারিক কাজ-কারবারের জন্য) বিচরণ যেন আপনাকে ধোঁকা না দেয়। (এতে আপনি মনে করবেন না যে, তারা এমনিভাবে শাস্তি ও আযাব থেকে বেঁচে থাকবে এবং আরামে দিন কাটাবে। তাদের ধরপাকড় অবশ্যই হবে দুনিয়া ও

পরকাল উভয় জায়গায়ই, কিংবা শুধু পরকালে। সেমতে) তাদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায় এবং পরবর্তী অন্যান্য দলও (যেমন আদ, সামূদ ইত্যাদি সত্যধর্মের প্রতি) মিথ্যারোপ করেছিল। প্রত্যেক সম্প্রদায় (অর্থাৎ তাদের মধ্যে যারা মু'মিন ছিল না, তারা) নিজ নিজ পয়গম্বরকে আক্রমণ করার সংকল্প করেছিল (আক্রমণ করে হত্যা করতে চেয়েছিল।) এবং তারা মিথ্যা বিতর্কে প্রবৃত্ত হয়েছিল, যেন সত্যকে বানচাল করে দিতে পারে। অতপর আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম। দেখুন আমার শাস্তি কেমন হয়েছে! (দুনিয়াতে যেমন তাদের শাস্তি হয়েছে) এমনিভাবে কাফিরদের বেলায় আপনার পালনকর্তার এ বাক্য সত্য হল যে, তারা (পরকালে) জাহান্নামী হবে। (অর্থাৎ ইহকালেও শাস্তি হয়েছে, পরকালেও হবে। এমনিভাবে কুফরের কারণে বর্তমান যুগের কাফিরদেরও ধরপাকড় হবে উভয় জাহানে অথবা পরকালে। পক্ষান্তরে তওহীদপন্থী ও মু'মিন সম্প্রদায় এত সম্মানিত যে, নৈকট্যশীল ফেরেশতাগণ তাদের জন্য দোয়া ও ক্ষমা প্রার্থনায় মশগুল থাকে। এটা এ বিষয়ের আলামত যে, তারা একাজের জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আদিষ্ট। কারণ, তাদের নিয়ম এই যে, يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ তারা কেবল আদিষ্ট কাজই করে। এতে করে প্রমাণিত হয় যে, মু'মিনগণ আল্লাহ্‌র প্রিয়পাত্র। বলা হয়েছেঃ) আরশ বহনকারী ফেরেশতাগণ এবং আরশের চারপাশে অবস্থানকারী ফেরেশতাগণ তাদের পালনকর্তার প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করে, তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং মু'মিনদের জন্য (এভাবে) দোয়া ও ক্ষমা প্রার্থনা করে যে, হে আমাদের পালনকর্তা, আপনার (ব্যাপক) রহমত ও জ্ঞান সবকিছুতেই পরিব্যাপ্ত (সুতরাং মু'মিনদের প্রতি যে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে রহমত হবে---তাদের এ ঈমান আপনার জানাও আছে।) সুতরাং যারা (কুফর ও শিরক থেকে) তওবা করে এবং আপনার পথে চলে, তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং তাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করুন---হে আমাদের পালনকর্তা, এবং (জাহান্নাম থেকে রক্ষা করে) তাদেরকে চিরকাল বস-বাসের জান্নাতে দাখিল করুন, যার ওয়াদা আপনি তাদেরকে দিয়েছেন! তাদের পিতা-মাতা, পতি-পত্নী ও সন্তানদের মধ্যে যারা (জান্নাতের) উপযুক্ত (অর্থাৎ মু'মিন তারা এসব মু'মিনের সমপর্যায়ের না হলেও) তাদেরকেও দাখিল করুন। নিশ্চয় আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (তাদের জন্য আরও দোয়া এই যে,) তাদেরকে (কিয়ামতের দিন সর্বপ্রকার) অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন (যেমন, হাশরের ময়দানের অস্থিরতা)। আপনি যাকে সেদিন অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবেন, তার প্রতি (বিরাট) অনুগ্রহ করবেন। এটাই (অর্থাৎ মাগফিরাত, সর্বপ্রকার আযাব থেকে হিফাযত ও জান্নাতে প্রবেশ) মহা সাফল্য। (সুতরাং আপনার মু'মিন বান্দাদেরকে এ থেকে বঞ্চিত রাখবেন না)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরার বৈশিষ্ট্য ও ফযীলতঃ এখান থেকে সূরা আহকাফ পর্যন্ত সাতটি সূরা 'হা-মীম' বর্ণযোগে শুরু হয়েছে। এগুলোকে 'আল-হা-মীম' অথবা 'হাওয়ামীম' বলা

হয়। হযরত ইবনে মসউদ (রা) বলেন, আল-হা-মীম কোরআনের রেশমী বস্ত্র, অর্থাৎ সৌন্দর্য। মুসইর ইবনে কেদাম বলেন, এগুলোকে عرائس অর্থাৎ নববধূ বলা হয়। হযরত ইবনে আব্বাস বলেন, প্রত্যেক বস্তুর একটি নির্যাস থাকে, কোরআনের নির্যাস হল আল-হা-মীম অথবা হাওয়ামীম।----(ফাযায়েলুল কোরআন)

হযরত আব্দুল্লাহ্ (রা) কোরআনের একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, এক ব্যক্তি পরিবার-পরিজনের বসবাসের জন্য জায়গার খোঁজে বের হল। সে এক শস্য-শ্যামল প্রান্তর দেখে খুব আনন্দিত হল। সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে সে হঠাৎ উর্বর বাগ-বাগিচাও দেখতে পেল। এগুলো দেখে সে বলতে লাগল, আমি তো বৃষ্টির প্রথম শ্যামলা দেখেই বিস্ময় বোধ করছিলাম, এটা তো আরও বিস্ময়কর। এখন বুঝুন, প্রথম শ্যামলের উদাহরণ হল সাধারণ কোরআন। আর উর্বর বাগবাগিচা হল আল-হামীম। হযরত ইবনে মসউদ (রা) এ কারণেই বলেন, আমি যখন কোরআন তিলাওয়াত করতে করতে আল-হামীমে পৌঁছি, তখন এতে আমার চিত্ত যেন বিনোদিত হয়ে উঠে।

বিপদাপদ থেকে হিফাযত ঃ মসনদে বাযযারে আবূ হুরায়রা (রা)-র রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, যে ব্যক্তি দিনের শুরুতে আয়াতুল কুরসী এবং সূরা মু'মিনের প্রথম তিন আয়াত اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ পর্যন্ত পাঠ করবে সে সেদিন যে কোন কষ্ট ও অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকবে।---(ইবনে কাসীর)

শত্রু থেকে হিফাযত ঃ আবূ দাঊদ ও তিরমিযীতে হযরত মুহাল্লাব ইবনে আবূ সফরাহ্ (রা)-এর সনদে রসূলুল্লাহ্ (সা) কোন এক জিহাদে রাত্রিকালীন হিফাযতের জন্য বলেছিলেন, রাত্রিতে তোমরা আক্রান্ত হলে حٰمٓ لَا يُنْصَرُوْنَ পড়ে নিও। অর্থাৎ হা-মীম শব্দ দ্বারা দোয়া করতে হবে যে, শত্রুরা সফল না হোক। কোন কোন রেওয়ায়েতে حٰمٓ لَا يُنْصَرُوْا (নুন ব্যতিরেকে) বর্ণিত আছে। এর অর্থ এই যে, তোমরা হা-মীম বললে শত্রুরা সফল হবে না। এ থেকে জানা গেল যে, হা-মীম শত্রু থেকে হিফাযতের দুর্গ।---(ইবনে কাসীর)

একটি বিস্ময়কর ঘটনা ঃ হযরত সাবেত বেনানী (র) বলেন, দু'রাক'আত নামায পড়ার জন্য আমি একটি বাগানে গেলাম এবং নামাযের পূর্বে সূরা মু'মিনের اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ পর্যন্ত তিন আয়াত পাঠ করলাম। হঠাৎ দেখি এক ব্যক্তি আমার পেছনে সাদা একটি খচ্চরে সওয়ার হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার দেহে ছিল এয়ামনী

পোশাক। লোকটি আমাকে বলল, যখন তুমি غَافِرِ الذَّنْبِ পড় তখন তার সাথে এই দোয়াও পাঠ করো يَا غَافِرَ الذَّنْبِ اِغْفِرْلِيْ—অর্থাৎ হে পাপ ক্ষমাকারী আমাকে ক্ষমা করুন, যখন قَابِلِ التَّوْبِ পড়, তখন এর সাথে এই দোয়া পাঠ করো يَا قَابِلَ التَّوْبِ اِقْبَلْ تَوْبَتِيْ—অর্থাৎ হে তওবাকবুলকারী, আমার তওবা কবুল করুন, যখন شَدِيْدِ الْعِقَابِ পড়, তখন এর সাথে এই দোয়া পাঠ করো يَا شَدِيْدَ الْعِقَابِ لَا تُعَاقِبْنِيْ—অর্থাৎ হে কঠোর শাস্তিদাতা, আমাকে শাস্তি দেবেন না এবং যখন ذِى الطَّوْلِ পড়, তখন এর সাথে এ দোয়া পাঠ করো يَا ذَا الطَّوْلِ طُلْ عَلَىَّ بِخَيْرٍ অর্থাৎ হে অনুগ্রহকারী, আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন।

সাবেত বেনানী বলেন, এ উপদেশ শোনার পর আমি সেদিকে তাকিয়ে তাকে দেখতে পেলাম না। আমি তার খোঁজে বাগানের দরজায় এসে লোকজনকে জিজ্ঞেস করলাম, কোন এয়ামনী পোশাক পরিহিত ব্যক্তি এ পথে গিয়েছে কি? সবাই বলল, আমরা এমন কোন লোক দেখিনি। সাবেত বেনানীর অন্য এক রেওয়ায়েতে আরও আছে, লোকদের ধারণা যে, তিনি হযরত ইলিয়াস (আ) ছিলেন। অবশ্য অন্য রেওয়ায়েতে এর উল্লেখ নেই।— (ইবনে কাসীর)

সমাজ সংস্কারে এসব আয়াতের প্রভাব এবং সংস্কারকদের জন্য হযরত উমর ফারুকের এক মহান নির্দেশঃ ইবনে কাসীর ইবনে আবী হাতেমের সনদে বর্ণনা করেন, সিরিয়ার জনৈক প্রভাবশালী শক্তিধর ব্যক্তি হযরত উমর ফারুক (রা)-এর নিকট আসা-যাওয়া করত। কিছুদিন পর্যন্ত তার আগমন বন্ধ থাকায় তিনি লোকদের কাছে তার অবস্থা জিজ্ঞেস করলেন। লোকেরা বলল, আমিরুল মু'মিনীন, তার কথা বলবেন না, সে তো মদ্য পান করে বিভোর হয়ে থাকে।

অতপর খলীফা তার সচিবকে ডেকে বললেন, তার কাছে এ চিঠি লিখ---

من عمر ابن الخطاب الى فلان بن فلان سلام عليك فانى احمد اليك الله الذى لا اله الا هو غافر الذنب و قابل التوب شديد العقاب ذالطول لا اله الا هو اليه المصير -

অর্থাৎ উমর ইবনে খাত্তাবের পক্ষ থেকে অমুকের পুত্র অমুকের নামে----তোমার প্রতি সালাম। অতপর আমি তোমার জন্য সে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করি, যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি পাপ ক্ষমাকারী, তওবা কবূলকারী, কঠোর শাস্তিদাতা এবং বড় সামর্থ্যবান। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

অতপর তিনি মজলিসে উপস্থিত লোকদেরকে বললেন, সবাই মিলে তার জন্য দোয়া কর, যেন আল্লাহ্ তা'আলা তার মন ফিরিয়ে দেন এবং তার তওবা কবুল হয়। তিনি দূতের হাতে চিঠি দিয়ে নির্দেশ দিলেন যে, লোকটির নেশার ঘোর না কাটা পর্যন্ত তার হাতে চিঠি দিও না এবং অন্য কারো কাছেও দিও না। লোকটি খলীফার চিঠি পেয়ে তা পাঠ করল এবং চিন্তা করতে লাগল, এতে আমাকে শাস্তির ভয়ও দেখানো হয়েছে এবং ক্ষমা করারও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। অতপর সে কান্না শুরু করল এবং এমন তওবা করল যে, জীবনে কখনও আর মদের কাছেও গেল না।

হযরত উমর ফারুক (রা) এই প্রতিক্রিয়ার সংবাদ পেয়ে বললেন, এ ধরনের ব্যাপারে তোমাদের এমনি করা উচিত। যখন কোন মুসলমান ভাই ভ্রান্তিতে পতিত হয়, তখন তাকে ঠিক পথে আনার চিন্তা করো না, তাকে আল্লাহ্‌র রহমতের ভরসা দাও এবং আল্লাহ্‌র কাছে তার তওবার জন্য দোয়া কর। তোমরা তার বিপক্ষে শয়তানের সাহায্যকারী হয়ো না। অর্থাৎ তাকে গালমন্দ করে অথবা রাগান্বিত করে যদি দীন থেকে আরও দূরে সরিয়ে দাও, তবে তাই হবে শয়তানের সাহায্য। ---(ইবনে কাসীর)

যারা সমাজ সংস্কার তথা তবলীগ ও দাওয়াতের কাজ করে, তাদের জন্য এ কাহিনীর মধ্যে মূল্যবান নির্দেশ এই যে, যে ব্যক্তিকে সংশোধন করা উদ্দেশ্য থাকে, তার জন্য নিজেও দোয়া কর, এরপর কৌশলে তাকে ঠিক পথে আন। তাকে উত্তেজিত করলে কোন ফায়দা তো হবেই না; বরং শয়তানকে সাহায্য করা হবে। শয়তান তাকে আরও পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত করে দেবে। এখন আয়াতসমূহের তফসীর দেখুন ঃ

حم ।

حم —কোন কোন তফসীরবিদ বলেন, এটা আল্লাহ্‌র নাম। কিন্তু পূর্ববর্তী ইমামগণের মতে এসব খণ্ডিত শব্দগুলোই متشابهات যার অর্থ একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন অথবা এগুলো আল্লাহ্ ও রসূলের মধ্যকার কোন গোপন সংকেত।

غَافِرِ الذَّنْبِ—পাপ ক্ষমাকারী ও قَابِلِ التَّوْبِ—তওবা কবুলকারী—এ দু'টি শব্দ অর্থের দিক দিয়ে এক হলেও আলাদা আলাদা আনা হয়েছে। কারণ, প্রথমোক্ত শব্দ দ্বারা ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য যে, আল্লাহ্ তা'আলা তওবা ব্যতিরেকেও বান্দার পাপ ক্ষমা করতে সক্ষম এবং তওবাকারীদেরকে ক্ষমা করা তাঁর একটি গুণ।

ذِى الطَّوْلِ -এর শাব্দিক অর্থ প্রশস্ততা ও ধনাঢ্যতা কিন্তু সামর্থ্য এবং কৃপা ও অনুগ্রহের অর্থেও ব্যবহৃত হয়।—(মাযহারী)

مَا يُجَادِلُ فِىْ اٰيَاتِ اللّٰهِ اِلَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا—এই আয়াত কোরআন সম্পর্কে বিতর্ককে কুফর সাব্যস্ত করেছে। রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

ان جدالا فى القران كفر—অর্থাৎ কোরআন সম্পর্কে কোন কোন বিতর্ক কুফর। —(মাযহারী)

এক হাদীসে আছে, একদিন রসূলুল্লাহ্ (সা) দু'ব্যক্তিকে কোরআনের কোন এক আয়াত সম্পর্কে বাকবিতণ্ডা করতে শুনে ক্রোধান্বিত হয়ে বাইরে চলে আসেন। তখন তাঁর মুখমণ্ডলে ক্রোধের চিহ্ন পরিস্ফুট ছিল। তিনি বললেন, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতরা এ কারণেই ধ্বংস হয়ে গেছে। তারা আল্লাহ্র কিতাব সম্পর্কে বাকবিতণ্ডা শুরু করে দিয়েছিল।—(মাযহারী)

উপরোক্ত বিতর্কের অর্থ কোরআনের আয়াতে খুঁত বের করা, অনর্থক সন্দেহ সৃষ্টি করে তাতে বাকবিতণ্ডা করা অথবা কোন আয়াতের এরূপ অর্থ করা, যা অন্য আয়াত ও সুন্নতের পরিপন্থী। এটা কোরআন বিকৃত করার নামান্তর। নতুবা কোন অস্পষ্ট অথবা সংক্ষিপ্ত বাক্যের অর্থ খোঁজা, দুর্বোধ্য বাক্যের সমাধান অন্বেষণ করা অথবা কোন আয়াত থেকে বিধানাবলী চয়ন করার কাজে পারস্পরিক আলোচনা-গবেষণা করা উপরোক্ত বিতর্কের অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং এটা পুণ্যকাজ। —(বায়যাভী, কুরতুবী, মাযহারী)

فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِى الْبِلَادِ—কোরায়শরা শীতকালে এয়ামনে এবং গ্রীষ্মকালে সিরিয়ায় বাণিজ্যিক সফরে যেত। বায়তুল্লাহ্র সেবক হওয়ার সুবাদে সমগ্র আরবে তাদের সম্মান ও সুখ্যাতি ছিল। ফলে তারা নিরাপদে সফর করত এবং অগাধ বাণিজ্যিক মুনাফা অর্জন করত। এর মাধ্যমেই তাদের ধনাঢ্যতা ও রাজনৈতিক প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইসলাম ও রসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রতি বিরোধিতা

সত্ত্বেও তাদের এই সুখ্যাতি ও প্রভাব কায়েম থাকা তাদের জন্য গর্ব ও অহংকারের বিষয় ছিল। তারা বলত, আমরা আল্লাহ্‌র কাছে অপরাধী হলে এসব নিয়ামত ও ধনৈশ্বর্য ছিনিয়ে নেওয়া হত। এই পরিস্থিতির কারণে কিছুসংখ্যক মুসলমানের মাঝেও সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ার আশংকা ছিল। তাই আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলা বিশেষ তাৎপর্য ও কল্যাণের ভিত্তিতে তাদেরকে সাময়িক অবকাশ দিয়ে দেখেছেন। এতে আপনি অথবা মুসলমানরা যেন ধোঁকায় না পড়েন। সাময়িক অবকাশের পর তারা আযাবে পতিত হবে এবং বর্তমান প্রভাব-প্রতিপত্তি ধ্বংস হয়ে যাবে। বস্তুত বদর যুদ্ধে এর সূচনা হয়ে মক্কা বিজয় পর্যন্ত ছয় বছরে কোরাইশদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও রাজনৈতিক কাঠামো সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়ে যায়।

اَلَّذِيْنَ يَحْمِلُوْنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهٗ —আরশ বহনকারী ফেরেশতা বর্তমানে চারজন এবং কিয়ামতের দিন আটজন হয়ে যাবে। আরশের চারপাশে কত ফেরেশতা আছে, তার সংখ্যা আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে তাদের সারির সংখ্যা লাখো বর্ণিত আছে। তাদেরকে 'কাররুবী' বলা হয়। তারা সবাই আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্যশীল ফেরেশতা। তাই আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, এ ফেরেশতাগণ মু'মিনদের জন্য বিশেষত যারা গোনাহ্ থেকে তওবা করে এবং শরীয়তের পথে চলে, তাদের জন্য বিভিন্ন দোয়া করেন। এটা হয় আল্লাহ্ তা'আলার আদেশের কারণে, না হয় তাদের স্বভাব ও অভ্যাসই আল্লাহ্‌র নেক বান্দাদের জন্য দোয়ায় মশগুল থাকা। এ কারণেই হযরত মুতরিফ ইবনে আবদুল্লাহ্ বলেন, আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্যে মু'মিনদের সর্বাধিক হিতাকাঙ্ক্ষী আল্লাহ্‌র ফেরেশতাগণ। মু'মিনদের জন্য তাঁরা দোয়া করেন যে, তাদেরকে ক্ষমা করা হোক, জাহান্নাম থেকে রক্ষা করা হোক এবং চিরস্থায়ী জান্নাতে দাখিল করা হোক। এতদসঙ্গে তারা এ দোয়াও করেন—

وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ —অর্থাৎ তাদের বাপ-দাদা, পতি-পত্নী ও সন্তান-সন্ততির মধ্যে যারা মাগফিরাতের যোগ্য অর্থাৎ যারা ঈমান সহকারে মৃত্যুবরণ করেছে, তাদেরকেও এদেরই সাথে জান্নাতে দাখিল করুন।

এ থেকে জানা গেল যে, মুক্তির জন্য ঈমান শর্ত। ঈমানের পর অন্যান্য সৎকর্মে মুসলমানদের বাপ-দাদা, পতি-পত্নী ও সন্তানগণ নিম্ন স্তরের হলেও আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ তাদের পূর্বপুরুষগণকেও জান্নাতে তাদের স্তরেই স্থান দেবেন, যাতে তাদের আনন্দ ও সন্তুষ্টি পূর্ণ হয়। কোরআন পাকের অন্য আয়াতে বলা হয়েছে : وَاَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ

হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রা) বলেন, মু'মিন জান্নাতে পেঁৗছে তার পিতা, পুত্র, ভাই প্রমুখ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে যে, তারা কোথায়? তাকে বলা হবে, তারা

তোমার মত আমল করেনি (তাই তারা এখানে পেঁছিতে পারবে না)। মু'মিন বলবে, আমি যে আমল করেছি, তা কেবল নিজের জন্যই করিনি---তাদের জন্যও করেছি। এরপর তাদেরকেও জান্নাতে দাখিল করার আদেশ হবে।--- (ইবনে-কাসীর)

এ রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করে তফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে, এটা সাহাবীর উক্তি হলেও রসূলুল্লাহ্ (সা)-র উক্তির পর্যায়ভুক্ত। এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, আয়াতে যে صلاحيت তথা যোগ্যতার শর্ত আরোপ করা হয়েছে, তার অর্থ শুধু ঈমান---আমলসহ ঈমান নয়।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَّقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ ۝ قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ ۝ ذَٰلِكُم بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ ۖ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا ۚ فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ ۝

(১০) যারা কাফির তাদেরকে উচ্চৈস্বরে বলা হবে, তোমাদের নিজেদের প্রতি তোমাদের আজকের এ ক্ষোভ অপেক্ষা আল্লাহ্র ক্ষোভ অধিক ছিল, যখন তোমাদেরকে ঈমান আনতে বলা হয়েছিল, অতপর তোমরা কুফরী করেছিলে। (১১) তারা বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা! আপনি আমাদেরকে দু'বার মৃত্যু দিয়েছেন এবং দু'বার জীবন দিয়েছেন। এখন আমাদের অপরাধ স্বীকার করছি। অতপর এখনও নিষ্কৃতির কোন উপায় আছে কি? (১২) তোমাদের এ বিপদ এ কারণে যে, যখন এক আল্লাহ্কে ডাকা হত, তখন তোমরা কাফির হয়ে যেতে, আর যখন তাঁর সাথে শরীককে ডাকা হত, তখন তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করতে। এখন আদেশ তাই, যা আল্লাহ্ করবেন, যিনি সর্বোচ্চ, মহান।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যারা কাফির, [তারা জাহান্নামে গিয়ে যখন তাদের শিরক ও কুফরের জন্য পরিতাপ করবে এবং নিজেদের প্রতি ভীষণ ঘৃণা লাগবে এমনকি, ক্ষোভের আতিশয্যে তাদের হাতের আঙ্গুল কামড়াতে থাকবে, (দুররে-মনছুর) তখন] তাদেরকে উচ্চৈস্বরে

বলা হবে, তোমাদের নিজেদের প্রতি তোমাদের ক্ষোভ অপেক্ষা আল্লাহ্‌র ক্ষোভ অধিক ছিল, যখন (দুনিয়াতে) তোমাদেরকে ঈমান আনতে বলা হয়েছিল, অতপর (বলার পর) তোমরা তা মানতে না। (এরূপ বলার উদ্দেশ্য তাদের পরিতাপ ও অনুশোচনা আরও বাড়িয়ে তোলা।) তারা বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা, (আমরা পুনরুজ্জীবন অস্বীকার করতাম। এখন আমরা আমাদের ভুল বুঝতে পেরেছি। সেমতে দেখে নিয়েছি যে,) আপনি আমাদেরকে দু'বার মৃত অবস্থায় রেখেছেন (জন্মের পূর্বে আমরা প্রাণহীন বস্তুর আকারে ছিলাম এবং এই পরজগতে আসার পূর্বে দ্বিতীয়বার মৃত হয়েছিলাম) এবং দু'বার জীবন দিয়েছেন। (এক---ইহকালের জীবন, দ্বিতীয় পরকালের বর্তমান জীবন। এই চার অবস্থার মধ্যে কাফিররা কেবল পরকালের জীবন অস্বীকার করত, কিন্তু অবশিষ্ট তিন অবস্থা নিশ্চিত ছিল বিধায় সেগুলো উল্লেখ করা হয়েছে। এই স্বীকারোক্তির উদ্দেশ্য ছিল এই যে, এখন চতুর্থ অবস্থাও পূর্বের তিন অবস্থার ন্যায় নিশ্চিত হয়ে গেছে,) কাজেই আমরা আমাদের অপরাধ স্বীকার করছি, (যার মধ্যে মূল অপরাধ ছিল পুনরুজ্জীবন অস্বীকার করা। বাকীগুলো ছিল এরই শাখা-প্রশাখা।) এখন (এখান থেকে) বের হওয়ার কোন উপায় আছে কি (যাতে দুনিয়াতে ফিরে গিয়ে এসব ভুলের ক্ষতিপূরণ করে নিতে পারি? জওয়াবে বলা হবে, তোমাদের বের হওয়ার কোন পথ নেই। চিরকাল এখানেই থাকতে হবে।) এটা এ কারণে যে, যখন এক আল্লাহ্‌কে ডাকা হত, (অর্থাৎ তওহীদের আলোচনা হত,) তখন তোমরা তা অস্বীকার করতে, আর যখন তাঁর সাথে শরীক করা হত, তখন তোমরা মেনে নিতে। তাই এটা আল্লাহ্‌র ফয়সালা (হয়েছে) যিনি সর্বোচ্চ, মহান। (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সমুচ্চতা ও মহত্ত্বের দিক দিয়ে যেহেতু এটা মহা অপরাধ ছিল, তাই পরিণামে শাস্তিও তেমনি হয়েছে অর্থাৎ চিরস্থায়ী জাহান্নাম)।

هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا ۚ وَمَا يَتَذَكَّرُ
إِلَّا مَنْ يُنِيبُ ﴿١٣﴾ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ
﴿١٤﴾ رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ
مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ ﴿١٥﴾ يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ ۖ لَا يَخْفَىٰ عَلَى
اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ ۚ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ۖ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿١٦﴾ الْيَوْمَ
تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ۚ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١٧﴾
وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ ۚ

مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمٍ وَّلَا شَفِيْعٍ يُّطَاعُ ﴿١٨﴾ يَعْلَمُ خَآئِنَةَ الْاَعْيُنِ
وَمَا تُخْفِي الصُّدُوْرُ ﴿١٩﴾ وَاللّٰهُ يَقْضِيْ بِالْحَقِّ ۭ وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ
دُوْنِهٖ لَا يَقْضُوْنَ بِشَيْءٍ ۭ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ﴿٢٠﴾ اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا
فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ كَانُوْا مِنْ قَبْلِهِمْ ۭ كَا
نُوْا هُمْ اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَّ اٰثَارًا فِي الْاَرْضِ فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ ۭ
وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ وَّاقٍ ﴿٢١﴾ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانَتْ تَّاْتِيْهِمْ
رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَكَفَرُوْا فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ ۭ اِنَّهٗ قَوِيٌّ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢٢﴾

(১৩) তিনিই তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলী দেখান এবং তোমাদের জন্য আকাশ থেকে নাযিল করেন রুযী। চিন্তাভাবনা তারাই করে, যারা আল্লাহ্‌র দিকে রুজু থাকে। (১৪) অতএব তোমরা আল্লাহ্‌কে খাঁটি বিশ্বাস সহকারে ডাক যদিও কাফিররা তা অপছন্দ করে। (১৫) তিনিই সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারী, আরশের মালিক, তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা তত্ত্বপূর্ণ বিষয়াদি নাযিল করেন, যাতে সে সাক্ষাতের দিন সম্পর্কে সকলকে সতর্ক করে। (১৬) যেদিন তারা বের হয়ে পড়বে, আল্লাহ্‌র কাছে তাদের কিছুই গোপন থাকবে না। আজ রাজত্ব কার? এক প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ্‌র। (১৭) আজ প্রত্যেকেই তার কৃতকর্মের প্রতিদান পাবে। আজ জুলুম নেই। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। (১৮) আপনি তাদেরকে আসন্ন দিন সম্পর্কে সতর্ক করুন, যখন প্রাণ কণ্ঠাগত হবে, দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হবে। পাপিষ্ঠদের জন্য কোন বন্ধু নেই এবং সুপারিশকারীও নেই, যার সুপারিশ গ্রাহ্য হবে। (১৯) চোখের চুরি এবং অন্তরের গোপন বিষয় তিনি জানেন। (২০) আল্লাহ্‌ ফয়সালা করেন সঠিক-ভাবে, আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তারা যাদেরকে ডাকে, তারা কিছুই ফয়সালা করে না। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সবকিছু শুনেন, সবকিছু দেখেন। (২১) তারা কি দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করে না, যাতে দেখত তাদের পূর্বসূরিদের কি পরিণাম হয়েছে? তাদের শক্তি ও কীর্তি পৃথিবীতে এদের অপেক্ষা অধিকতর ছিল। অতপর আল্লাহ্‌ তাদেরকে তাদের গোনাহের কারণে ধৃত করেছিলেন এবং আল্লাহ্‌ থেকে তাদেরকে রক্ষাকারী কেউ হয়নি। (২২) এর কারণ এই যে, তাদের কাছে তাদের রসূলগণ সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে আগমন করত, অতপর তারা কাফির হয়ে যায়, তখন আল্লাহ্‌ তাদের ধৃত করেন। নিশ্চয় তিনি শক্তিধর, কঠোর শাস্তিদাতা।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তিনিই তোমাদেরকে (স্বীয় কুদরতের) নিদর্শনাবলী দেখান, (যাতে তদ্দ্বারা তোমরা তওহীদ সপ্রমাণ কর।) আর (তিনিই) আকাশ থেকে তোমাদের জন্য রিযিক প্রেরণ করেন (অর্থাৎ বৃষ্টি প্রেরণ করেন এবং সে বৃষ্টি থেকে রিযিক উৎপন্ন হয়। এটাও উল্লিখিত নিদর্শনাবলীরই অন্তর্ভুক্ত। এসব নিদর্শন থেকে) শুধু সে-ই উপদেশ গ্রহণ করে যে (আল্লাহ্র দিকে) রুজু (করার ইচ্ছা) করে। (কেননা, রুজুর ইচ্ছা থেকে চিন্তাভাবনার ভাগ্য হয়, যদ্দ্বারা আল্লাহ্ পর্যন্ত পেঁাছা যায়। যখন তওহীদের প্রমাণাদি প্রতিষ্ঠিত রয়েছে---) অতএব তোমরা আল্লাহ্কে খাঁটি বিশ্বাস (অর্থাৎ তওহীদ) সহকারে ডাক (এবং মুসলমান হয়ে যাও) যদিও কাফিররা তা অপছন্দ করে। (তাদের পরওয়া করো না। কেননা,) তিনি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন এবং আরশের মালিক, তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা ওহী অর্থাৎ তাঁর প্রত্যাদেশ প্রেরণ করেন, যাতে সে (ওহীপ্রাপ্ত ব্যক্তি মানুষকে) সমবেত হওয়ার দিন (অর্থাৎ কিয়ামতের দিন) সম্পর্কে সতর্ক করে, যেদিন সবাই (আল্লাহ্র) সামনে এসে উপস্থিত হবে। সেদিন আল্লাহ্র কাছে তাদের কিছুই গোপন থাকবে না। আজকের দিনে কার সাম্রাজ্য? (সাম্রাজ্য হবে) আল্লাহ্র যিনি একান্ত পরাক্রান্ত। আজ প্রত্যেকেই তার কৃতকর্মের প্রতিদান পাবে। আজ (কারও প্রতি) জুলুম হবে না। আল্লাহ্ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। (তাই) আপনি তাদেরকে এক আসন্ন বিপদের দিন (অর্থাৎ কিয়ামতের দিন) সম্পর্কে সতর্ক করুন, যখন কলিজা ওষ্ঠাগত হবে, (দুঃখের আতিশয্যে) দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হবে। (সেদিন) জালিম (অর্থাৎ কাফির)-দের এমন কোন বন্ধু হবে না এবং সুপারিশকারীও হবে না, যার কথা গ্রাহ্য হয়। তিনি দৃষ্টির চুরি এবং অন্তরের গোপন বিষয় জানেন (যা অন্য কেউ জানে না। উদ্দেশ্য এই যে, তিনি বান্দার সমস্ত প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য কাজকর্ম জানেন, যেসব কাজকর্মের উপর শাস্তি ও প্রতিদান নির্ভরশীল)। সঠিকভাবে ফয়সালা করবেন; আর আল্লাহ্র পরিবর্তে তারা যাদেরকে ডাকে, তারা কিছুই ফয়সালা করতে পারে না। (কেননা) আল্লাহ্ সবকিছু শুনেন, সবকিছু দেখেন। (এমনিভাবে আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ণতার যাবতীয় গুণে গুণান্বিত, আর তাদের মিথ্যা উপাস্যদের কোন গুণই নেই। তাই আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ ফয়সালা করতে সক্ষমও নয়। তারা সুস্পষ্ট প্রমাণাদি সত্ত্বেও অস্বীকার করে,) তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে দেখেনি যে, তাদের পূর্বসূরি কাফিরদের (কুফরের কারণে) কি পরিণতি হয়েছে? তারা শক্তি-সামর্থ্য এবং পৃথিবীতে ছেড়ে যাওয়া (দালান-কোঠা, বাগ-বাগিচা ইত্যাদি) নিদর্শনাদির দিক দিয়ে তাদের (বর্তমানদের) অপেক্ষা অধিক ছিল, অতপর তাদের গোনাহ্র কারণে আল্লাহ্ তাদেরকে ধৃত করলেন (অর্থাৎ তাদের উপর আযাব নাযিল করলেন) এবং আল্লাহ্র (আযাবের) কবল থেকে তাঁদেরকে রক্ষাকারী কেউ হয়নি। এর (অর্থাৎ এ পাকড়াও করার) কারণ এই যে, তাদের কাছে তাদের রসূলগণ সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে আসতেন কিন্তু তারা তা মানত না, তখন আল্লাহ্ তাদেরকে ধৃত করেন। নিশ্চয় তিনি মহাশক্তিশালী, কঠোর শাস্তিদাতা।

(বর্তমান কাফিরদের মধ্যেও আযাবের সে সব কারণ বিদ্যমান রয়েছে। অতএব তারা আযাব থেকে কেমন করে বাঁচাতে পারবে)?

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

رَفِيْعُ الدَّرَجَاتِ—কেউ কেউ دَرَجَاتِ-এর অর্থ করেছেন গুণাবলী। অতএব رَفِيْعُ الدَّرَجَاتِ--এর অর্থ তাঁর পূর্ণত্বের গুণাবলী সর্বাধিক উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন। ইবনে-কাসীর একে বাহ্যিক আঙ্গিকে রেখে বলেছেন, যে, এর অর্থ 'তাঁর মহান আরশ সমুচ্চ'। আল্লাহ্‌র আরশ সমস্ত পৃথিবী ও আকাশসমূহে পরিব্যাপ্ত এবং সবার ছাদ স্বরূপ উচ্চ। সূরা মা'আরিজে বলা হয়েছে ঃ

مِنَ اللّٰهِ ذِى الْمَعَارِجِ تَعْرُجُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ اِلَيْهِ فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ۔

এ আয়াত সম্পর্কে ইবনে-কাসীরের গবেষণাপ্রসূত অভিমত এই যে, আয়াতে উল্লিখিত পঞ্চাশ হাজার বছরের পরিমাণ হল সে দূরত্বের বিশ্লেষণ যা মাটির সপ্তম স্তর থেকে আরশ পর্যন্ত রয়েছে। তাঁর মতে এ ব্যাখ্যা বহুসংখ্যক পূর্ববর্তী ও পরবর্তী তফসীর-বিদের কাছে অগ্রগণ্য। তিনি আরও বর্ণনা করেন যে, অনেক আলিমের মতে আল্লাহ্‌র আরশ একটি লাল ইয়াকূত প্রস্তর দ্বারা নির্মিত, যার ব্যাস পঞ্চাশ হাজার বছরের দূরত্বের সমান। এমনিভাবে তার উচ্চতা মাটির সপ্তম স্তর থেকে পঞ্চাশ হাজার বছরের দূরত্বের সমান। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন ঃ رَفِيْعُ الدَّرَجَاتِ--এর অর্থ আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিন মুত্তাকীদের মর্যাদা বৃদ্ধিকারী। যেমন, কোরআনের অন্যান্য আয়াতও এর সাক্ষ্য বহন করে। এক আয়াতে আছে ঃ نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَآءُ অন্য এক আয়াতে আছে ঃ — هُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ اللّٰهِ

بَارِزُوْنَ—يَوْمَ هُمْ بَارِزُوْنَ لَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنْهُمْ-এর মর্ম এই যে, হাশরের ময়দানকে যেহেতু একটি সমতল ভূমিতে পরিণত করে দেওয়া হবে, যাতে কোন পাহাড়, গর্ত অথবা দালান-কোঠা ও বৃক্ষের আড়াল থাকবে না, তাই সবাই উন্মুক্ত ময়দানে দৃষ্টির সামনে থাকবে।

لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ---উল্লিখিত আয়াতসমূহে এ বাক্যটি يَوْمَ التَّلَاقِ ও يَوْمَ هُمْ بَارِزُوْنَ--এর পরে এসেছে। বলা বাহুল্য يوم التلاق তথা সাক্ষাত ও সমাবেশের দিন দ্বিতীয় ফুঁকের পরে হবে। এমনিভাবে يوم هم بارزون এর ঘটনাও তখন হবে, যখন দ্বিতীয় ফুঁৎকারের পরে নতুন ভূপৃষ্ঠ সমতল করে দেওয়া হবে যাতে কোন আড়াল থাকবে না। এর পরে لمن الملك বাক্যটি আনার কারণে বাহ্যত বোঝা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলার এ বাণী দ্বিতীয় ফুঁকের মাধ্যমে সব কিছু পুনরুজ্জীবিত হওয়ার পরে বাস্তবায়িত হবে। কুরতুবী এর সমর্থনে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদের একটি হাদীস পেশ করেছেন। হাদীসটি এই ঃ সমস্ত মানুষ এমন এক পরিষ্কার ভূ-খণ্ডে একত্রিত হবে, যাতে কেউ কোন গোনাহ্ করেনি। তখন আল্লাহ্র আদেশে এক ঘোষক ঘোষণা করবে ঃ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ (আজকের দিনে রাজত্ব কার?) মু'মিন-কাফির নির্বিশেষে সবাই এর জওয়াবে বলবে لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ মু'মিনরা তো তাদের বিশ্বাস ও আকীদা অনুযায়ী আনন্দ ও হৃষ্টচিত্তে একথা বলবে। কিন্তু কাফিররা বাধ্য হয়ে দুঃখ সহকারে একথা স্বীকার করবে।

কিন্তু অন্য কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা এ উক্তি তখন করবেন, যখন প্রথম ফুঁকের পর সমগ্র সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে যাবে এবং জিবরাঈল, মীকাঈল, ইস্রাফীল ও আজরাঈল প্রমুখ নৈকট্যশীল ফেরেশতাও মৃত্যু-বরণ করবেন এবং এক আল্লাহ্র সত্তা ব্যতীত কোন কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। এই পরিবেশে আল্লাহ্ বলবেন, "আজকের দিনে রাজত্ব কার?" তখন যেহেতু কোন জওয়াবদাতা থাকবে না, তাই আল্লাহ্ নিজেই জওয়াব দেবেন ঃ "প্রবল পরাক্রান্ত এক আল্লাহ্র।" হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন, এতে আল্লাহ্ তা'আলাই প্রশ্নকারী এবং জওয়াবদাতাও তিনিই। মুহাম্মদ ইবনে কা'ব কুরাযীও তাই বলেন। হযরত আবু হুরায়রা (রা) ও ইবনে উমর (রা)-এর এ হাদীস থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায়---কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র পৃথিবীকে বাম হাতে এবং সমগ্র আসমানসমূহকে ডান হাতে গুটিয়ে বলবেন ঃ أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ الْجَبَّارُوْنَ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُوْنَ অর্থাৎ আমিই বাদশাহ্ ও প্রভু, আজ প্রতাপশালী ও অহংকারীরা কোথায়? তফসীর দুররে মনসূরে উল্লিখিত দু'টি রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করার পর বলা হয়েছে---এ প্রশ্নটি উপরোক্ত একবার প্রথম ফুৎকারের সময় এবং আর একবার দ্বিতীয় ফুৎকারের সময় দু'বারই হয়তো উচ্চারিত হবে। বয়ানুল কোরআনে বলা

হয়েছে, দু'বার মেনে নেওয়ার উপরই কোরআন পাকের তফসীর নির্ভরশীল নয়, বরং এটা সম্ভবপর যে, উল্লিখিত আয়াতে প্রথম ফুঁকের পরবর্তী ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। তখন সবাইকে উপস্থিত ধরে নিয়ে এই কলেমা বলা হবে।

يَعْلَمُ خَآئِنَةَ الْاَعْيُنِ অপরের অলক্ষ্যে পর-নারীর প্রতি কামদৃষ্টিতে তাকানো এবং কাউকে দেখে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়া অথবা অন্যে অনুভব করতে পারে না এমন-ভাবে তাকানো এগুলোই দৃষ্টির চুরি। আল্লাহ্ তা'আলার কাছে এগুলো গোপন নয়, দেদীপ্যমান।

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَا وَ سُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ﴿٢٣﴾ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ
وَقَارُوْنَ فَقَالُوْا سٰحِرٌ كَذَّابٌ ﴿٢٤﴾ فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا
اقْتُلُوْٓا اَبْنَآءَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ وَاسْتَحْيُوْا نِسَآءَهُمْ ۗ وَمَا كَيْدُ الْكٰفِرِيْنَ
اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ ﴿٢٥﴾ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُوْنِيْٓ اَقْتُلْ مُوْسٰى وَلْيَدْعُ رَبَّهٗ ۚ
اِنِّيْٓ اَخَافُ اَنْ يُّبَدِّلَ دِيْنَكُمْ اَوْ اَنْ يُّظْهِرَ فِي الْاَرْضِ الْفَسَادَ ﴿٢٦﴾
وَقَالَ مُوْسٰٓى اِنِّيْ عُذْتُ بِرَبِّيْ وَرَبِّكُمْ مِّنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ
الْحِسَابِ ﴿٢٧﴾ وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ ۖۗ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ اِيْمَانَهٗٓ
اَتَقْتُلُوْنَ رَجُلًا اَنْ يَّقُوْلَ رَبِّيَ اللّٰهُ وَقَدْ جَآءَكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ مِنْ
رَّبِّكُمْ ۗ وَاِنْ يَّكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهٗ ۚ وَاِنْ يَّكُ صَادِقًا يُّصِبْكُمْ
بَعْضُ الَّذِيْ يَعِدُكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ﴿٢٨﴾
يٰقَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظٰهِرِيْنَ فِي الْاَرْضِ ۫ فَمَنْ يَّنْصُرُنَا
مِنْۢ بَاْسِ اللّٰهِ اِنْ جَآءَنَا ۗ قَالَ فِرْعَوْنُ مَآ اُرِيْكُمْ اِلَّا مَآ اَرٰى وَ مَآ
اَهْدِيْكُمْ اِلَّا سَبِيْلَ الرَّشَادِ ﴿٢٩﴾ وَقَالَ الَّذِيْٓ اٰمَنَ يٰقَوْمِ اِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ
مِّثْلَ يَوْمِ الْاَحْزَابِ ﴿٣٠﴾ مِثْلَ دَاْبِ قَوْمِ نُوْحٍ وَّعَادٍ وَّثَمُوْدَ وَالَّذِيْنَ

مِنْۢ بَعْدِهِمْ ۚ وَمَا اللّٰهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ ﴿٣١﴾ وَيٰقَوْمِ اِنِّيْۤ اَخَافُ عَلَيْكُمْ
يَوْمَ التَّنَادِ ﴿٣٢﴾ يَوْمَ تُوَلُّوْنَ مُدْبِرِيْنَ ۚ مَا لَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ ۚ
وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ ﴿٣٣﴾ وَلَقَدْ جَآءَكُمْ يُوْسُفُ مِنْ
قَبْلُ بِالْبَيِّنٰتِ فَمَا زِلْتُمْ فِيْ شَكٍّ مِّمَّا جَآءَكُمْ بِهٖ ۗ حَتّٰۤى اِذَا هَلَكَ
قُلْتُمْ لَنْ يَّبْعَثَ اللّٰهُ مِنْۢ بَعْدِهٖ رَسُوْلًا ۗ كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ
هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابُ ﴿٣٤﴾ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْۤ اٰيٰتِ اللّٰهِ بِغَيْرِ سُلْطٰنٍ
اَتٰهُمْ ۗ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ وَعِنْدَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۗ كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى
كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ﴿٣٥﴾ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يٰهَامٰنُ ابْنِ لِيْ
صَرْحًا لَّعَلِّيْۤ اَبْلُغُ الْاَسْبَابَ ﴿٣٦﴾ اَسْبَابَ السَّمٰوٰتِ فَاَطَّلِعَ اِلٰۤى اِلٰهِ
مُوْسٰى وَاِنِّيْ لَاَظُنُّهٗ كَاذِبًا ۗ وَكَذٰلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوْٓءُ عَمَلِهٖ وَصُدَّ
عَنِ السَّبِيْلِ ۗ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ اِلَّا فِيْ تَبَابٍ ﴿٣٧﴾ وَقَالَ الَّذِيْۤ
اٰمَنَ يٰقَوْمِ اتَّبِعُوْنِ اَهْدِكُمْ سَبِيْلَ الرَّشَادِ ﴿٣٨﴾ يٰقَوْمِ اِنَّمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ
الدُّنْيَا مَتَاعٌ ۘ وَّاِنَّ الْاٰخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ﴿٣٩﴾ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا
يُجْزٰۤى اِلَّا مِثْلَهَا ۚ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ
مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُوْنَ فِيْهَا بِغَيْرِ
حِسَابٍ ﴿٤٠﴾ وَيٰقَوْمِ مَا لِيْۤ اَدْعُوْكُمْ اِلَى النَّجٰوةِ وَتَدْعُوْنَنِيْۤ اِلَى
النَّارِ ﴿٤١﴾ تَدْعُوْنَنِيْ لِاَكْفُرَ بِاللّٰهِ وَاُشْرِكَ بِهٖ مَا لَيْسَ لِيْ بِهٖ عِلْمٌ ۘ
وَّاَنَا اَدْعُوْكُمْ اِلَى الْعَزِيْزِ الْغَفَّارِ ﴿٤٢﴾ لَا جَرَمَ اَنَّمَا تَدْعُوْنَنِيْۤ

اِلَيْهِ لَيْسَ لَهٗ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْاٰخِرَةِ وَاَنَّ مَرَدَّنَآ اِلَى اللّٰهِ وَاَنَّ الْمُسْرِفِيْنَ هُمْ اَصْحٰبُ النَّارِ ۝ فَسَتَذْكُرُوْنَ مَآ اَقُوْلُ لَكُمْ ۗ وَاُفَوِّضُ اَمْرِيْٓ اِلَى اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ ۝ فَوَقٰىهُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِ مَا مَكَرُوْا وَحَاقَ بِاٰلِ فِرْعَوْنَ سُوْٓءُ الْعَذَابِ ۝ اَلنَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَّعَشِيًّا ۚ وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ ۗ اَدْخِلُوْٓا اٰلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ ۝

(২৩) আমি আমার নিদর্শনাবলী ও স্পষ্ট প্রমাণসহ মূসাকে প্রেরণ করেছি (২৪) ফেরাউন, হামান ও কারূনের কাছে, অতপর তারা বলল, সে তো যাদুকর, মিথ্যা-বাদী। (২৫) অতপর মূসা যখন আমার কাছ থেকে সত্যসহ তাদের কাছে পৌঁছাল, তখন তারা বলল, যারা তার সঙ্গী হয়ে বিশ্বাস স্থাপন করেছে, তাদের পুত্র-সন্তানদেরকে হত্যা কর, আর তাদের নারীদেরকে জীবিত রাখ। কাফিরদের চক্রান্ত ব্যর্থই হয়েছে। (২৬) ফেরাউন বলল, তোমরা আমাকে ছাড়, মূসাকে হত্যা করতে দাও, ডাকুক সে তার পালনকর্তাকে! আমি আশংকা করি যে, সে তোমাদের ধর্ম পরিবর্তন করে দেবে অথবা সে দেশময় বিপর্যয় সৃষ্টি করবে। (২৭) মূসা বলল, যারা হিসাব দিবসে বিশ্বাস করে না এমন প্রত্যেক অহংকারী থেকে আমি আমার ও তোমাদের পালনকর্তার আশ্রয় নিয়ে নিয়েছি। (২৮) ফেরাউন গোত্রের এক মু'মিন ব্যক্তি, যে তার ঈমান গোপন রাখত, সে বলল, তোমরা কি একজনকে এজন্যে হত্যা করবে যে সে বলে, আমার পালনকর্তা আল্লাহ্, অথচ সে তোমাদের পালনকর্তার নিকট থেকে স্পষ্ট প্রমাণ-সহ তোমাদের নিকট আগমন করেছে? যদি সে মিথ্যাবাদী হয়, তবে তার মিথ্যা-বাদিতা তার উপরই চাপবে, আর যদি সে সত্যবাদী হয়, তবে সে যে শাস্তির কথা বলছে তার কিছু না কিছু তোমাদের উপর পড়বেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সীমালংঘন-কারী, মিথ্যাবাদীকে পথ প্রদর্শন করেন না। (২৯) হে আমার কওম, আজ এদেশে তোমাদেরই রাজত্ব, দেশময় তোমরাই বিচরণ করছ; কিন্তু আমাদের আল্লাহ্র শাস্তি এসে গেলে কে আমাদেরকে সাহায্য করবে? ফেরাউন বলল, আমি যা বুঝি, তোমা-দেরকে তাই বোঝাই, আর আমি তোমাদেরকে মঙ্গলের পথই দেখাই। (৩০) সে মু'মিন ব্যক্তি বলল ঃ হে আমার কওম, আমি তোমাদের জন্য পূর্ববর্তী সম্প্রদায়-সমূহের মতই বিপদসঙ্কুল দিনের আশংকা করি। (৩১) যেমন, কওমে নূহ, আদ, সামূদ ও তাদের পরবর্তীদের অবস্থা হয়েছিল। আল্লাহ্ বান্দাদের প্রতি কোন জুলুম

করার ইচ্ছা করেন না। (৩২) হে আমার কওম, আমি তোমাদের জন্য প্রচণ্ড হাঁক-ডাকের দিনের আশংকা করি, (৩৩) যেদিন তোমরা পেছনে ফিরে পলায়ন করবে; কিন্তু আল্লাহ্ থেকে তোমাদেরকে রক্ষাকারী কেউ থাকবে না। আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তার কোন পথপ্রদর্শক নেই। (৩৪) ইতিপূর্বে তোমাদের কাছে ইউসুফ সুস্পষ্ট প্রমাণাদিসহ আগমন করেছিল, অতপর তোমরা তার আনীত বিষয়ে সন্দেহই পোষণ করতে। অবশেষে যখন সে মারা গেল, তখন তোমরা বলতে শুরু করলে, আল্লাহ্ ইউসুফের পরে আর কাউকে রসূলরূপে পাঠাবেন না। এমনিভাবে আল্লাহ্ সীমালংঘনকারী, সংশয়ী ব্যক্তিকে পথভ্রষ্ট করেন। (৩৫) যারা নিজেদের কাছে আগত কোন দলীল ছাড়াই আল্লাহ্র আয়াত সম্পর্কে বিতর্ক করে, তাদের এ কাজ আল্লাহ্ ও মু'মিনদের কাছে খুবই অসন্তোষজনক। এমনিভাবে আল্লাহ্ প্রত্যেক অহংকারী-স্বৈরাচারী ব্যক্তির অন্তরে মোহর এঁটে দেন। (৩৬) ফেরাউন বলল, হে হামান, তুমি আমার জন্য একটি সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ কর, হয়তো আমি পথে পৌঁছে যেতে পারব (৩৭) আকাশের পথে, অতপর উঁকি মেরে দেখব মূসার আল্লাহ্কে। বস্তুত আমি তো তাকে মিথ্যাবাদীই মনে করি। এভাবেই ফেরাউনের কাছে সুশোভিত করা হয়েছিল তার মন্দ কর্মকে এবং সোজা পথ থেকে তাকে বিরত রাখা হয়েছিল। ফেরাউনের চক্রান্ত ব্যর্থ হওয়ারই ছিল। (৩৮) মু'মিন লোকটি বলল: হে আমার কওম, তোমরা আমার অনুসরণ কর। আমি তোমাদেরকে সৎপথ প্রদর্শন করব। (৩৯) হে আমার কওম, পার্থিব এ জীবন তো কেবল উপভোগের বস্তু, আর পরকাল হচ্ছে স্থায়ী বসবাসের গৃহ। (৪০) যে মন্দ কর্ম করে, সে কেবল তার অনুরূপ প্রতিফল পাবে, আর যে পুরুষ অথবা নারী মু'মিন অবস্থায় সৎকর্ম করে তারাই জান্নাতে প্রবেশ করবে। তথায় তাদেরকে বে-হিসাব রিযিক দেওয়া হবে। (৪১) হে আমার কওম, ব্যাপার কি, আমি তোমাদেরকে দাওয়াত দেই মুক্তির দিকে, আর তোমরা আমাকে দাওয়াত দাও জাহান্নামের দিকে। (৪২) তোমরা আমাকে দাওয়াত দাও, যাতে আমি আল্লাহ্কে অস্বীকার করি এবং তাঁর সাথে শরীক করি এমন বস্তুকে, যার কোন প্রমাণ আমার কাছে নেই। আমি তোমাদেরকে দাওয়াত দেই পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল আল্লাহ্র দিকে। (৪৩) এতে সন্দেহ নেই যে তোমরা আমাকে যার দিকে দাওয়াত দাও, ইহকালে ও পরকালে তার কোন দাওয়াত নেই! আমাদের প্রত্যাবর্তন আল্লাহ্র দিকে এবং সীমালংঘনকারীরাই জাহান্নামী। (৪৪) আমি তোমাদেরকে যা বলছি, তোমরা একদিন তা স্মরণ করবে। আমি আমার ব্যাপার আল্লাহ্র কাছে সমর্পণ করছি। নিশ্চয় বান্দারা আল্লাহ্র দৃষ্টিতে রয়েছে। (৪৫) অতপর আল্লাহ্ তাকে তাদের চক্রান্তের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করলেন এবং ফেরাউন গোত্রকে শোচনীয় আযাব গ্রাস করল। (৪৬) সকালে ও সন্ধ্যায় তাদেরকে আগুনের সামনে পেশ করা হয় এবং যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন আদেশ করা হবে ফেরাউন গোত্রকে, কঠিনতর আযাবে দাখিল কর।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি আমার বিধানাবলী ও স্পষ্ট প্রমাণ (অর্থাৎ মু'জিযা) দিয়ে মূসা (আ)-কে ফেরাউন, হামান ও কারূনের কাছে পাঠিয়েছি। অতপর তারা (অথবা তাদের কেউ কেউ) বলল ঃ সে তো যাদুকর (ও) ভণ্ড। [মু'জিযার ক্ষেত্রে যাদুকর এবং নবুয়ত দাবি ও বিধিবিধানের ক্ষেত্রে ভণ্ড বলল। কারূন ছিল বনী ইসরাইলের একজন এবং বাহ্যত ঈমানদার। কিন্তু সম্ভবত সে মুনাফিক ছিল---প্রকৃত মু'মিন ছিল না। তাই সে মূসা (আ)-কে যাদুকর ও ভণ্ড বলত। এটাও সম্ভবপর যে, কেবল ফেরাউন ও হামানই একথা বলত।] অতপর মূসা (আ) যখন আমার পক্ষ থেকে সত্য ধর্মসহ সাধারণের প্রতি আগমন করল, (এবং তাতে কেউ কেউ মুসলমানও হয়ে গেল), তখন তারা (পরামর্শ হিসাবে) বলল যারা তার সঙ্গী হয়ে বিশ্বাস স্থাপন করেছে, তাদের পুত্র-সন্তানদেরকে হত্যা করে দাও (যাতে তাদের দল ও শক্তিবৃদ্ধি না হয়। কারণ তাতে করে সাম্রাজ্যের পতনের আশংকা রয়েছে, কিন্তু নারী-দের তরফ থেকে এমন আশংকা নেই। এ ছাড়া গৃহকর্মের জন্য তাদের প্রয়োজন আছে, তাই) তাদের নারীদেরকে জীবিত রাখ। (মোটকথা, তারা মূসা (আ)-র প্রবল হয়ে যাবার আশংকায় তাকে প্রতিহত করার জন্য এ ব্যবস্থা গ্রহণ করল।) কাফিরদের এই চক্রান্ত ব্যর্থই হয়েছে। [সেমতে অবশেষে মূসা (আ)-বিজয়ী হন। বনী ইসরাইল-দের নবজাত পুত্রসন্তানদের হত্যার নির্দেশটি মূসা (আ)-র জন্মের পূর্বে দেওয়া হয়েছিল, যার ফলে তাকে দরিয়ায় নিক্ষেপ করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল এবং আল্লাহ্ তা'আলা এই শিশুর লালন-পালন স্বয়ং ফেরাউনের গৃহেই সম্পন্ন করেন। আয়াতে বর্ণিত এ পুত্র হত্যার দ্বিতীয় নির্দেশ মূসা (আ)-র জন্ম ও নবুয়ত লাভের পর তখন জারি করা হয়েছিল, যখন তার মু'জিযা দেখে ফেরাউনের বংশধররা তাঁর দল ও শক্তি-বৃদ্ধির আশংকায় সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ বিপন্ন দেখতে পায়। অবশ্য একথা কোন রেওয়ায়েতে পাওয়া যায়নি যে, তখন এই হত্যার আদেশ কার্যকর হয়েছিল কি না। এরপর স্বয়ং মূসা (আ)-কে হত্যা করার ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা হল।] ফেরাউন (সভাসদদেরকে) বলল, আমাকে অনুমতি দাও, আমি মূসা (আ)-কে হত্যা করব। সে ডাকুক তার পালনকর্তাকে (সাহায্যের জন্য)! আমি আশংকা করছি যে, সে তোমাদের ধর্ম পরিবর্তন করে দেবে অথবা দেশময় বিপর্যয় সৃষ্টি করবে। (একটি ধর্মীয় ক্ষতি, অপরটি পার্থিব ক্ষতি। সভাসদরা হয়তো দেশের স্বার্থের পরিপন্থী মনে করে মূসা (আ)-কে হত্যা করার অনুমতি দিতে ইতস্তত করছিল, তাই ফেরাউন "আমাকে অনুমতি দাও" বলেছিল। অথবা জনগণকে একথা বোঝাবার জন্য বলেছিল যে, এ পর্যন্ত মূসা (আ)-কে হত্যা না করার কারণ উপদেষ্টাদের বাধা দান। অথচ বাস্তবে হত্যা করার দুঃসাহস স্বয়ং ফেরাউনেরও ছিল না। কেননা, বিভিন্ন মু'জিযা দেখে সে-ও আন্তরিকভাবে বিশ্বাসী হয়ে গিয়েছিল। তাই সে হত্যা করলে কোন আসমানী গযবে পতিত হওয়ার আশংকা করছিল। কিন্তু নিজের খুনের পাপ সভাসদদের ঘাড়ে চাপানোর জন্য

উপরোক্ত কথাটি বলেছিল। এমনিভাবে 'সে ডাকুক তার পালনকর্তাকে' কথাটিও জনগণের কাছে আস্ফালন প্রকাশার্থ বলেছিল, যদিও সে ভেতরে ভেতরে ভয়ে কাঁপছিল।) মূসা [(আ) একথা মুখোমুখি অথবা পরোক্ষভাবে শুনে] বললেন, আমি আমার ও তোমাদের (অর্থাৎ সকলের) পালনকর্তার শরণাপন্ন হচ্ছি এমন প্রত্যেক অহংকারীর অনিষ্ট থেকে, যে হিসাব দিবসে বিশ্বাস করে না। (তাই সত্যের মুকাবিলা করে। মজলিসে) ফেরাউন পরিবারের এক মু'মিন ব্যক্তি ছিল। সে (এ পর্যন্ত) তার ঈমান গোপন রাখত, (পরামর্শ শুনে) সে বলল, তোমরা কি একজনকে (কেবল) এ কারণে হত্যা করবে যে, সে বলে, 'আমার পালনকর্তা আল্লাহ্।' অথচ সে তোমাদের পালনকর্তার নিকট থেকে (আপন দাবির স্বপক্ষে) স্পষ্ট প্রমাণসহ আগমন করেছে? (অর্থাৎ সে নবুয়ত দাবির সত্যতা প্রতিপন্নকারী মু'জিযা প্রদর্শন করে। এমতাবস্থায় তার বিরোধিতা করে তাকে হত্যা করার পরিকল্পনা করা খুবই অশোভন।) আর ধরে নাও যদি সে মিথ্যাবাদী হয়, তবে তার মিথ্যাবাদিতার জন্য সে-ই দায়ী হবে, (এবং আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সে নিজেই লাঞ্ছিত হবে---হত্যা করার প্রয়োজন নেই।) আর যদি সে সত্যবাদী হয়, তবে যেসব ভবিষ্যদ্বাণী করছে, (অর্থাৎ ঈমান না আনলে আযাব হবে) তার কিছু না কিছু তোমাদের উপর (অবশ্যই) পতিত হবে। (এমতাবস্থায় তাকে হত্যা করলে আরও বেশি বিপদ ডেকে আনা হবে। সারকথা, তার মিথ্যাবাদিতার ক্ষেত্রে তাকে হত্যা করা বৃথা। আর সত্যবাদিতার ক্ষেত্রে তাকে হত্যা করা ক্ষতিকর। নিয়ম এই যে,) আল্লাহ্ সীমালংঘনকারী, মিথ্যাবাদীর অভীষ্ট পূর্ণ করেন না। [অর্থাৎ ক্ষণকালের জন্য তার প্রভাব বিস্তার সম্ভব হলেও পরিণামে তার ব্যর্থতা সুনিশ্চিত। সুতরাং মূসা (আ) মিথ্যাবাদী হলে তাকে ধ্বংস না করা মানুষকে সন্দেহে ও বিভ্রান্তিতে পতিত করার নামান্তর হবে' আল্লাহ্ তা'আলা এরূপ করতে পারেন না। তাই আল্লাহ্র কাছে তার পরাভূত ও লাঞ্ছিত হওয়া জরুরী। সুতরাং তাকে হত্যা করার প্রয়োজন কি? পক্ষান্তরে তিনি সত্যবাদী হলে তোমরা নিশ্চিতই মিথ্যাবাদী এবং মিথ্যাবাদিতার সীমালংঘনকারী। এরূপ ব্যক্তি সফলকাম হতে পারে না। সুতরাং তোমরা তাকে হত্যা করতে সফল হবে না। সর্বাবস্থায় তাকে হত্যা না করাই প্রতিপন্ন হয়। এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, তাহলে কি কোন দুষ্কৃতকারীকেই হত্যা করা যাবে না? জওয়াব এই যে, যেখানে সত্যবাদী হওয়া অথবা মিথ্যাবাদী হওয়া সন্দেহাতীত নয়, সেখানেই একথা প্রযোজ্য। যেক্ষেত্রে অকাট্য প্রমাণ দ্বারা মিথ্যাবাদিতা প্রমাণিত, সেখানে প্রযোজ্য নয়। তবে মূসা (আ) যে সত্যবাদী, এ বিষয়ে মু'মিন লোকটির পূর্ণ বিশ্বাস ছিল; কিন্তু জনসাধারণকে চিন্তা-ভাবনায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য সে এভাবে কথা বলেছিল। এরপরও এই হত্যা থেকে নিবৃত্ত রাখার বিষয়ই বর্ণিত হয়েছে।] হে আমার ভাইয়েরা, আজ তো তোমাদেরই রাজত্ব, এদেশে তোমরাই শাসক; কিন্তু আল্লাহ্র শাস্তি এসে গেলে কে আমাদেরকে সাহায্য করবে? ফেরাউন (একথা শুনে) বলল, আমি যা বুঝি, তোমাদেরকে তাই বোঝাব (যে, তার হত্যাই সমীচীন।) আর আমি তোমাদেরকে কল্যাণের পথই দেখাই। মু'মিন ব্যক্তি (নরম উপদেশে কাজ হবে না দেখে হুমকি ও ভীতি প্রদর্শনের পথ অবলম্বন করে) বলল,

ভাইসব, আমি তোমাদের জন্য পূর্ববর্তী সম্প্রদায়সমূহের অনুরূপ দুর্দিনের আশংকা করছি। যেমন, কওমে নূহ, আদ, সামূদ ও তাদের পরবর্তীদের অবস্থা হয়েছিল। আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাদের প্রতি কোন জুলুম করার ইচ্ছা করেন না। (কিন্তু তোমরা মন্দ কাজ করলে তার শাস্তি অবশ্যই ভোগ করবে। এটা ইহলৌকিক আযাবের ভয় প্রদর্শন, অতপর পারলৌকিক আযাবের ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে---) ভাইসব, তোমাদের জন্য প্রচণ্ড হাঁক-ডাকের দিনের আশংকা করি (অর্থাৎ সেদিন বিরাট বিরাট ঘটনা ঘটবে। একে অপরকে বেশি পরিমাণে ডাকাডাকি করা বিরাট ঘটনার মধ্যে থাকে। সেদিন সর্বপ্রথম শিংগা ফুঁকার আওয়াজ হবে। এতে সব মৃত জীবিত হবে। আল্লাহ্ বলেন ঃ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيْبٍ يَوْمَ يَسْمَعُوْنَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ আরেক ডাক হবে হিসাবের জন্য। আল্লাহ্ বলেন ঃ يَوْمَ نَدْعُوْا كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ---(আরেক ডাকাডাকি হবে জান্নাতী ও জাহান্নামীদের মধ্যে। আল্লাহ্ বলেন ঃ وَنَادٰى اَصْحَابُ الْاَعْرَافِ---وَنَادٰى اَصْحَابُ الْجَنَّةِ وَنَادٰى اَصْحَابُ النَّارِ---অবশেষে মৃত্যুকে দুম্বার আকৃতিতে যবেহ করার সময় হবে এক ডাক। হাদীসে আছে ঃ يَا اَهْلَ الْجَنَّةِ خُلُوْدٌ لَا مَوْتَ وَيَا اَهْلَ النَّارِ خُلُوْدٌ لَا مَوْتَ) যেদিন তোমরা (হিসাবের জায়গা থেকে) পেছন ফিরে (জাহান্নামের দিকে) প্রত্যাবর্তন করবে, (তখন) আল্লাহ্ (অর্থাৎ তাঁর আযাব) থেকে তোমাদেরকে রক্ষাকারী কেউ থাকবে না। (কাজেই এখনই তোমাদের হেদায়েত কবুল করা উচিত ছিল, কিন্তু) আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তার কোন পথপ্রদর্শক নেই। ইতিপূর্বে তোমাদের কাছে ইউসুফ (আ) তওহীদ ও নবুয়তের) স্পষ্ট প্রমাণাদি সহ আগমন করেছিলেন (অর্থাৎ তোমাদের পূর্বপুরুষ কিবতী সম্প্রদায়ের কাছে এসেছিলেন, যাদের খবর ব্যক্তি পরম্পরায় তোমাদের কাছে পেঁৗছেছে।) অতপর তোমরা তাঁর আনীত বিষয়ে সন্দেহই করেছিলে। অবশেষে যখন তিনি লোকান্তরিত হলেন, তখন তোমরা বলতে শুরু করলে, আল্লাহ্ ইউসুফের পর আর কাউকে রসূল রূপে প্রেরণ করবেন না। (দুষ্টামির ছলে একথা বলা হয়েছিল। অর্থাৎ প্রথমত ইউসুফও রসূল ছিলেন না। থাকলেও আমরা একজনকে যখন মানিনি তখন আল্লাহ্ বলবেন, আরেক জনকে পাঠিয়ে কি লাভ। ফলে ব্যাপার চিরতরে চুকে গেছে। এর আসল উদ্দেশ্য রিসালত অস্বীকার করা। এ ব্যাপারে তোমরা যেমন ভ্রান্ত) এমনিভাবে আল্লাহ্

তা'আলা সীমালংঘনকারী ও সংশয়ীদেরকে ভ্রান্তিতে ফেলে রাখেন। যারা নিজেদের কাছে আগত কোন দলীল ব্যতিরেকে আল্লাহ্‌র আয়াত সম্পর্কে বিতর্ক করে, তাদের এ কাজ আল্লাহ্ ও মু'মিনদের কাছে খুবই অসন্তোষজনক (তোমাদের অন্তরে যেমন মোহর এঁটে দিয়েছেন)। এমনিভাবে আল্লাহ্ প্রত্যেক অহংকারী, স্বৈরাচারী ব্যক্তি'র অন্তরে মোহর এঁটে দেন। (ফলে তাদের মধ্যে সত্যকে অনুধাবন করার অবকাশ থাকে না। ফেরাউন পরিবারের মু'মিন ব্যক্তি'র এই বিবৃতির ফলে তার ঈমান আর গোপন থাকেনি) ফেরাউন (এই অকাট্য বিবৃতির জওয়াব দানে অক্ষম হয়ে পূর্ববৎ মূর্খতা অনুযায়ী দলীল কায়েম করার জন্য হামানকে) বলল, হে হামান! তুমি আমার জন্য একটি সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ কর। (আমি তাতে আরোহণ করে দেখব) হয়তো (এভাবে) আমি আকাশে যাওয়ার পথে পৌঁছে যেতে পারব, অতপর (সেখানে গিয়ে) মূসার আল্লাহ্‌কে দেখব। আর আমি তো তাকে (তার দাবিতে) মিথ্যাবাদীই মনে করি। এমনিভাবে ফেরাউনের কাছে সুশোভিত করে দেওয়া হয়েছিল, তার (অন্যান্য) মন্দ কর্মকেও এবং সোজা পথ থেকে সে বিরত হয়েছিল। [সে মূসা (আ)-র মুকাবিলায় অনেক চক্রান্ত করেছিল, কিন্তু] ফেরাউনের সমস্ত চক্রান্তই ব্যর্থ হয়েছে। (কোনটিই সফল হয়নি)। মু'মিন লোকটি (সদুত্তর দানে ফেরাউনকে অক্ষম দেখে পুনশ্চ) বলল, ভাইসব, তোমরা আমার অনুসরণ কর। আমি তোমাদেরকে সৎপথ প্রদর্শন করব। (অর্থাৎ ফেরাউন প্রদর্শিত পথ সৎপথ ও হেদায়েত নয়; বরং আমি যে পথের সন্ধান দিচ্ছি, তা-ই সৎপথ।) ভাইসব, এই পার্থিব জীবন ক্ষণস্থায়ী। আর পরকাল স্থায়ী বসবাসের জায়গা। (সেখানে প্রতিফল দেওয়ার রীতি এই যে) যে মন্দ কর্ম করে, সে কেবল তার অনুরূপ প্রতিফল পায়, আর যে পুরুষ অথবা নারী মু'মিন অবস্থায় সৎকর্ম করে তারাই জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর সেখানে তাদেরকে বেহিসাব রিযিক দেওয়া হবে। (এই বিবৃতিদানের সময় মু'মিন ব্যক্তি অনুভব করল যে, প্রতিপক্ষ তার কথায় বিস্ময়বোধ করছে এবং তার কথা মেনে নেয়ার পরিবর্তে তাকেই কুফরের দিকে নিয়ে যেতে চায়। তাই সে আরও বলল) ভাইসব, ব্যাপার কি, আমি তো তোমাদেরকে দাওয়াত দেই মুক্তি'র দিকে; আর তোমরা আমাকে দাওয়াত দাও জাহান্নামের দিকে। তোমরা আমাকে দাওয়াত দাও, যাতে আমি আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করি এবং এমন বস্তুকে তার সাথে শরীক করি, যার (শরীক হওয়ার) কোন দলীল আমার কাছে নেই। আমি তো তোমাদেরকে দাওয়াত দেই পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল আল্লাহ্‌র দিকে। স্বতঃসিদ্ধ যে, তোমরা আমাকে যার দিকে দাওয়াত দাও, সে (কোন জাগতিক অভাব পূরণের জন্য) দুনিয়াতেও ডাকার যোগ্য নয় এবং (আযাব দূর করার জন্য) পরকালেও (ডাকার যোগ্য নয়।) (নিশ্চিত যে,) আমাদের প্রত্যাবর্তন আল্লাহ্‌র দিকে; আর যারা (দাসত্বের) সীমালংঘন করে, (যেমন মুশরিক) তারা সবাই জাহান্নামী। (এখন তো আমার কথা তোমাদের মনে ভাল লাগে না, কিন্তু) ভবিষ্যতে একদিন তোমরা আমার কথা স্মরণ করবে। (মু'মিন ব্যক্তি পূর্ব থেকেই আশংকা করছিল যে, এই উপদেশের কারণে তারা তার বিরোধী হয়ে যাবে এবং নির্যাতন করবে। তাই সে আরও বলল,) আমি আমার ব্যাপার

আল্লাহ্র কাছে সোপর্দ করছি। আল্লাহ্ তা'আলা সব বান্দার (নিজেই) রক্ষক। (আমি তোমাদেরকে মোটেই ভয় করি না)। অতপর আল্লাহ্ তা'আলা তাকে (মু'মিন ব্যক্তিকে) তাদের চক্রান্তের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করলেন (সেমতে সে তাদের নির্যাতন থেকে রক্ষা পেল। হযরত কাতাদাহ্ বলেন, তাকেও মূসা (আ)-র সাথে নিমজ্জিত হওয়া থেকে রক্ষা করা হয়। ---(দুররে মনসূর) এবং ফেরাউন গোত্রকে (ফেরাউন সহ) শোচনীয় আযাব গ্রাস করল। (তা এই যে,) সকাল-সন্ধ্যায় তাদেরকে আগুনের সামনে পেশ করা হয় (এবং বলা হয়, তোমাদেরকে কিয়ামতের দিন এতে দাখিল করা হবে) এবং যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন আদেশ করা হবে, ফেরাউন গোত্রকে (ফেরাউনসহ) কঠিনতর আযাবে দাখিল কর।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ফেরাউন বংশীয় মু'মিন ঃ উপরে স্থানে স্থানে তওহীদ ও রিসালত অস্বীকারকারীদের প্রতি শাস্তিবাণী উচ্চারণ প্রসঙ্গে কাফিরদের বিরোধিতা ও হঠকারিতা উল্লিখিত হয়েছে। এর ফলে স্বভাবগত কারণে রসূলুল্লাহ্ (সা) দুঃখিত ও চিন্তান্বিত হতেন। তাঁর সান্ত্বনার জন্য উপরোক্ত প্রায় দু'রুকূতে হযরত মূসা (আ) ও ফেরাউনের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এতে ফেরাউন ও ফেরাউন গোত্রের সাথে একজন মহৎ ব্যক্তির দীর্ঘ কথোপকথন উক্ত হয়েছে, যিনি ফেরাউন গোত্রের একজন হওয়া সত্ত্বেও মূসা (আ)-র মু'জিযা দেখে ঈমান এনেছিলেন। কিন্তু উপযোগিতার পরিপ্রেক্ষিতে নিজের ঈমান তখন পর্যন্ত গোপন রেখেছিলেন। কথোপকথনের সময় তার ঈমানও জনসমক্ষে প্রকাশিত হয়ে পড়ে।

মুকাতিল, সুদ্দী, হাসান বসরী প্রমুখ তফসীরবিদ বলেন, ইনি ফেরাউনের চাচাত ভাই ছিলেন। কিবতী হত্যার ঘটনায় যখন ফেরাউনের দরবারে মূসা (আ)-কে পাল্টা হত্যা করার পরামর্শ চলছিল, তখন তিনিই শহরের এক প্রান্ত থেকে দৌড়ে এসে মূসা (আ)-কে অবহিত করেছিলেন এবং মিসরের বাইরে চলে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। সূরা কাসাসে এ ঘটনা বর্ণনা করে বলা হয়েছে ঃ

وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ

এই মু'মিন ব্যক্তির নাম কেউ কেউ 'হাবীব' বলেছেন। প্রকৃতপক্ষে হাবীব সেই ব্যক্তির নাম, যার কাহিনী সূরা ইয়াসীনে ব্যক্ত হয়েছে। সোহায়লীর মতে এই মু'মিন ব্যক্তির নাম 'শামআন'। কেউ কেউ তার নাম 'হিযকীল' বলেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস থেকে তাই বর্ণিত আছে।

এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, সিদ্দীক কয়েকজন মাত্র। একজন সূরা ইয়াসীনে বর্ণিত হাবীব নাজ্জার, দ্বিতীয় ফেরাউন বংশীয় মু'মিন ব্যক্তি এবং তৃতীয় হযরত আবু বকর (রা)। ইনি সবার শ্রেষ্ঠ।---(কুরতুবী)

يَكْتُمُ اِيْمَانَهٗ —এ থেকে জানা গেল যে, কেউ জনসমক্ষে তার ঈমান প্রকাশ না করলে এবং অন্তরে পাকাপোক্ত বিশ্বাস পোষণ করলে সে মু'মিন বলে গণ্য হবে। কিন্তু কোরআন---হাদীস থেকে প্রমাণিত আছে যে, ঈমান মকবুল হওয়ার জন্য কেবল অন্তরের বিশ্বাসই যথেষ্ট নয়; বরং মুখে স্বীকার করা শর্ত। মৌখিক স্বীকারোক্তি না করা পর্যন্ত কেউ মু'মিন হবে না। তবে জনসমক্ষে ঘোষণা করা জরুরী নয়। এর প্রয়োজন কেবল এজন্য যে, মানুষ যে পর্যন্ত তার ঈমান সম্বন্ধে জানতে না পারবে, সে পর্যন্ত তার সাথে মুসলমানসুলভ ব্যবহার করতে পারবে না।---(কুরতুবী)

ফেরাউন গোত্রের মু'মিন ব্যক্তি তার কথোপকথনে ফেরাউন ও ফেরাউন পরি-বারকে বিভিন্ন ভঙ্গিতে সত্য ও ঈমানের দিকে দাওয়াত দেন এবং তাদেরকে মূসা-হত্যার প্রচেষ্টা থেকেও বিরত রাখেন।

يَا قَوْمِ اِنِّىْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ — تنا د এটা تنا دى-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। অর্থ একে অপরকে ডাক দেয়া। কিয়ামতের দিন প্রচণ্ড ডাকাডাকি হবে বলে একে يوم التنا د বলা হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমরের রেওয়া-য়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, কিয়ামতের দিন জনৈক ঘোষক ঘোষণা করবে, যারা আল্লাহ্ বিরোধী, তারা দণ্ডায়মান হোক। এতে তকদীর অস্বীকারকারীদেরকে বোঝানো হবে। অতপর জান্নাতীরা জাহান্নামীদেরকে এবং জাহান্নামীরা জান্নাতী ও আ'রাফবাসীদেরকে ডেকে কথাবার্তা বলবে। তখন প্রত্যেক ভাগ্যবান ও হতভাগার নাম পিতার নামসহ ডেকে ফলাফল ঘোষণা করা হবে যে, অমুকের পুত্র অমুক ভাগ্যবান ও সফলকাম হয়েছে। এরপর সে কোনদিন হতভাগা হবে না এবং অমুকের পুত্র অমুক হতভাগ্য হয়েছে, অতপর সে কখনো ভাগ্যবান হবে না। (মাযহারী) মসনদে বাযযার ও বায়হাকীতে বর্ণিত হযরত আনাসের রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের এই ঘোষণা আমল ওজনের পর হবে।

হযরত আবূ হাযেম আ'রাজ (রা) নিজেকে সম্বোধন করে বলতেন, হে আ'রাজ, কিয়ামতের দিন ঘোষণা হবে অমুক প্রকার পাপী দণ্ডায়মান হোক---তুমি তাদের সাথে দণ্ডায়মান হবে। আবার ঘোষণা হবে অমুক প্রকার পাপী দণ্ডায়মান হোক---তুমি তাদের সাথেও দণ্ডায়মান হবে। আরও ঘোষণা হবে অমুক প্রকার পাপী দণ্ডায়-মান হোক---তুমি তখনও দণ্ডায়মান হবে। আমি মনে করি প্রত্যেক গোনাহের ঘোষণার সময় তোমাকে দণ্ডায়মান হতে হবে। কারণ, তুমি সর্বপ্রকার গোনাহ্ই সঞ্চয় করে রেখেছ।---(মাযহারী)

يَوْمَ تُوَلُّوْنَ مُدْبِرِيْنَ—অর্থাৎ তোমরা যখন পেছনে ফিরে প্রত্যাবর্তন করবে। তফসীরের সারসংক্ষেপে বলা হয়েছে যে, অপরাধীদেরকে হিসাবের জায়গা থেকে যখন জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে, এটা তখনকার অবস্থার বর্ণনা। এর সারমর্ম এই যে, উপরে يوم التناد—এর তফসীরে উল্লিখিত ঘোষণাবলী সমাপ্ত হওয়ার পর তাদেরকে হিসাবের জায়গা থেকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে।

কোন কোন তফসীরবিদের মতে এটা দুনিয়াতে প্রথম ফুঁকের সময়কার অবস্থা। যখন প্রথম ফুঁক দেওয়া হবে এবং পৃথিবী বিদারিত হবে, তখন মানুষ এদিক-ওদিক দৌড়ে পালাতে চাইবে, কিন্তু চতুর্দিকে ফেরেশতাদের পাহারা থাকবে, পলায়নের কোন পথ থাকবে না। তাদের মতে يوم التناد বলতে প্রথম ফুঁকের সময় বোঝানো হয়েছে। তখন চতুর্দিক থেকে আর্ত চীৎকার শোনা যাবে। হযরত ইবনে আব্বাস ও যাহ্‌হাক থেকে বর্ণিত আয়াতের অপর কিরাত يَوْمُ التَّنَادِّ থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায়। এটা نَدَّ ধাতু থেকে উদ্‌গত, যার অর্থ পলায়ন করা। এ তফসীর অনুযায়ী يوم التناد-এর অর্থও পলায়নের দিন এবং تُوَلُّوْنَ مُدْبِرِيْنَ-এরই ব্যাখ্যা।

তফসীরে মাযহারীতে উদ্ধৃত হযরত আবু হুরায়রা (রা)-র এক দীর্ঘ হাদীসে কিয়ামতের দিন তিন ফুঁকের উল্লেখ আছে। প্রথম ফুঁকের ফলে সমগ্র সৃষ্টির মাঝে ব্যস্ততা, অস্থিরতা ও ব্যাকুলতা দেখা দেবে। একে 'নফখায়ে ফাযা' বলা হয়। দ্বিতীয় ফুঁকের ফলে সবাই বেঁহুশ হয়ে মারা যাবে। একে 'নফখায়ে ছা'ক' বলা হয়। তৃতীয় ফুঁকের ফলে সবাই পুনরুজ্জীবিত হবে। একে 'নফখায়ে নশর' বলা হয়। প্রথম ফুঁকই দীর্ঘায়িত হয়ে দ্বিতীয় ফুঁকে পরিণত হবে। কাজেই উভয়ের সমষ্টি-কেই সাধারণভাবে প্রথম ফুঁক বলা হয়ে থাকে। এ হাদীসেও নফখায়ে ফাযা'র সময় লোকজনের এদিক-ওদিক পলায়নের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে وهو الذى يقول الله يوم التناد ফলে জানা গেল যে, আয়াতে يوم التناد বলে প্রথম ফুঁকের সময় মানুষের এদিক-ওদিক ব্যাকুল ছুটাছুটি বোঝানো হয়েছে। والله اعلم

كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ—অর্থাৎ ফেরাউন ও হামানের অন্তর যেমন মূসা (আ) ও মু'মিন ব্যক্তির উপদেশে প্রভাবান্বিত হয়নি,

এমনিভাবে আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক উদ্ধত, স্বৈরাচারীর অন্তরে মোহর এঁটে দেন। ফলে তাতে ঈমানের নূর প্রবেশ করে না এবং সে ভাল-মন্দের পার্থক্য করতে পারবে না। আয়াতে متكبر ও جبار শব্দদ্বয়কে قلب-এর বিশেষণ করা হয়েছে। কারণ, সকল নৈতিকতা ও ক্রিয়াকর্মের উৎস হচ্ছে অন্তর। অন্তর থেকেই ভালমন্দ কর্ম জন্ম লাভ করে। এ কারণেই হাদীসে বলা হয়েছে, মানুষের দেহে একটি মাংসপিণ্ড (অর্থাৎ অন্তর) এমন আছে, যা ঠিক থাকলে সমগ্র দেহ ঠিক থাকে এবং যা নষ্ট হলে সমগ্র দেহ নষ্ট হয়ে যায়। (কুরতুবী)

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا—এর বাহ্যিক অর্থ এই যে, ফেরাউন তার মন্ত্রী হামানকে আদেশ দিল যে, একটি গগনচুম্বী সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ কর। আমি এতে আরোহণ করে আল্লাহ্‌কে দেখে নিতে চাই। বলা বাহুল্য, এরূপ বোকাসুলভ পরিকল্পনা কোন স্বল্প বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তিও করতে পারে না। মিসর সাম্রাজ্যের অধিপতি ফেরাউন যদি বাস্তবিকই এরূপ পরিকল্পনা করে থাকে, তবে এটা তার চরম বোকামি ও নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। মন্ত্রীবর যদি এই আদেশ পালন করে থাকে, তবে এটা 'হবু রাজার গবুমন্ত্রীরই' বাস্তব প্রতিচ্ছবি। কিন্তু কোন রাজ্যাধিপতির তরফ থেকে এরূপ বোকাসুলভ পরিকল্পনা আশা করা যায় না। তাই কোন কোন তফসীরবিদ বলেন, এটা ফেরাউনও জানত যে, যত উচ্চ প্রাসাদই নির্মাণ করা হোক না কেন, তা আকাশ পর্যন্ত পেঁৗছতে পারে না। কিন্তু সে লোকজনকে বোকা বানানো ও দেখানোর জন্য এ কাণ্ড করেছিল। কোন সহীহ্ ও শক্তিশালী রেওয়ায়েত থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, এরূপ কোন আকাশচুম্বী প্রাসাদ নির্মিত হয়েছিল। কুরতুবী বর্ণনা করেন যে, এই সুউচ্চ নির্মাণ কাজ শুরু করা হয়েছিল, যা উচ্চতায় পেঁৗছা মাত্রই বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল।

আমার শ্রদ্ধেয় পিতা মাওলানা মোহাম্মদ ইয়াসীন সাহেব তাঁর ওস্তাদ দারুল উলুম দেওবন্দের প্রথম প্রধান শিক্ষক মাওলানা এয়াকুব সাহেব (রা)-এর এই উক্তি বর্ণনা করেছেন যে, এ উচ্চ প্রাসাদ বিধ্বস্ত হওয়ার জন্য কোন আসমানী আযাব আসা জরুরী নয়। বরং প্রত্যেক নির্মাণের উচ্চতা তার ভিত্তির সহন ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল। তাই যত গভীর ভিত্তিই রাখা হোক না কেন, তা এক সীমা পর্যন্তই গভীর হবে। নির্মাণ কাজের উচ্চতা যদি এই সীমা ছাড়িয়ে যায়, তবে তা বিধ্বস্ত হওয়া অপরিহার্য। এতে করে ফেরাউন ও হামানের আরও একটি নির্বুদ্ধিতা প্রমাণিত হয়েছে।

فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ

এটা স্বগোত্রকে সত্যের দিকে আহবান করার উদ্দেশে মু'মিন ব্যক্তির সর্বশেষ বাক্য। এতে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আজ তোমরা আমার কথায় কর্ণপাত করছ না, কিন্তু

আযাব যখন তোমাদেরক গ্রাস করবে, তখন আমার কথা স্মরণ করবে। তবে সে স্মরণ নিষ্ফল হবে। এই দীর্ঘ কথোপকথন, উপদেশ ও দাওয়াতের ফলে যখন মু'মিন ব্যক্তির ঈমান জনসমক্ষে প্রকাশ হয়ে পড়ল, তখন তিনি ভাবনায় পড়লেন যে, তারা তার প্রতি নির্যাতন চালানোর চেষ্টা করবে। তাই বললেন, আমি আমার ব্যাপার আল্লাহ্র কাছে সোপর্দ করছি। তিনি তাঁর বান্দাদের রক্ষক। মুকাতিল বলেন, তাঁর ধারণা অনুযায়ী ফেরাউন গোত্রের লোকেরা তাঁর প্রতি নির্যাতনে তৎপর হলে তিনি পাহাড়ের দিকে পালিয়ে তাদের নাগালের বাইরে চলে যান। পরবর্তী আয়াতে তা এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

فَوَقَاهُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوْا وَحَاقَ بِاٰلِ فِرْعَوْنَ سُوْٓءُ الْعَذَابِ

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ফেরাউন গোত্রের ষড়যন্ত্রের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করলেন এবং খোদ ফেরাউন গোত্রকে কঠোর আযাব গ্রাস করে নিল। মু'মিন ব্যক্তিকে রক্ষা করার বিশদ বিবরণ কোরআন পাকে উল্লিখিত হয়নি। কিন্তু ভাষাদৃষ্টে জানা যায় যে, ফেরাউন গোত্র তাকে হত্যা করার ও কষ্ট দেয়ার জন্য অনেক ষড়যন্ত্র করেছিল। ফেরাউন গোত্র যখন সলিল সমাধি লাভ করল, তখন এই মু'মিন বান্দাকে মূসা (আ)-র সাথে রক্ষা করা হয়। এরপর পরকালের মুক্তি তো বলাই বাহুল্য।

اَلنَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَّعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ اَدْخِلُوْٓا اٰلَ فِرْعَوْنَ

اَشَدَّ الْعَذَابِ —এ আয়াতের তফসীরে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা) বলেন, ফেরাউন গোত্রের আত্মাসমূহকে কাল পাখীর আকৃতিতে প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যা দু'বার জাহান্নামের সামনে হাজির করা হয় এবং জাহান্নামকে দেখিয়ে বলা হয়, এটা তোমাদের আবাসস্থল।—(মাযহারী)

বুখারী ও মুসমিলে বর্ণিত হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, তোমাদের মধ্যে কেউ মারা গেলে তাকে কবর জগতে সকাল-সন্ধ্যা সে স্থান দেখানো হয়, যেখানে কিয়ামতের হিসাব-নিকাশের পর সে পৌঁছবে। সে স্থান দেখিয়ে প্রত্যহ তাকে বলা হয়, তুমি অবশেষে এখানে পৌঁছবে। কেউ জান্নাতী হলে তাকে জান্নাতের স্থান এবং জাহান্নামী হলে জাহান্নামের স্থান দেখানো হয়।

কবরের আযাব ঃ কবরের আযাব যে সত্য, উপরোক্ত আয়াত তার প্রমাণ। এছাড়া অনেক মুতাওয়াতির হাদীস এবং 'উম্মতের ইজমা' এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়।

وَاِذْ يَتَحَآجُّوْنَ فِى النَّارِ فَيَقُوْلُ الضُّعَفٰٓؤُا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا

كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ ۝ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ ۝ وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ ۝ قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ۖ قَالُوا بَلَىٰ ۚ قَالُوا فَادْعُوا ۗ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ۝

(৪৭) যখন তারা জাহান্নামে পরস্পর বিতর্ক করবে, অতপর দুর্বলরা অহংকারী-দেরকে বলবে, আমরা তোমাদের অনুসারী ছিলাম। তোমরা এখন জাহান্নামের আগুনের কিছু অংশ আমাদের থেকে নিবৃত্ত করবে কি? (৪৮) অহংকারীরা বলবে, আমরা সবাই তো জাহান্নামে আছি। আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের ফয়সালা করে দিয়েছেন। (৪৯) যারা জাহান্নামে আছে, তারা জাহান্নামের রক্ষীদেরকে বলবে, তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে বল, তিনি যেন আমাদের থেকে একদিনের আযাব লাঘব করে দেন। (৫০) রক্ষীরা বলবে, তোমাদের কাছে কি সুস্পষ্ট প্রমাণাদিসহ তোমাদের রসূল আসেননি? তারা বলবে, হ্যাঁ। রক্ষীরা বলবে, তবে তোমরাই দোয়া কর। বস্তুত কাফিরদের দোয়া নিষ্ফলই হয়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(সে সময়টিও লক্ষণীয়,) যখন কাফিররা জাহান্নামে পরস্পর বিতর্ক করবে এবং হীন লোকেরা (অর্থাৎ অনুসারীরা) উচ্চশ্রেণীর লোকদের (অর্থাৎ অনুসৃত-দেরকে) বলবে, আমরা (দুনিয়াতে) তোমাদের অনুসারী ছিলাম। তোমরা কি এখন আমাদের থেকে জাহান্নামের কোন অংশ নিবৃত্ত করতে পার? (অর্থাৎ দুনিয়াতে যখন তোমরা আমাদেরকে অনুসারী করে রেখেছিলে, তখন আজ আমাদেরকে কিছু সাহায্য করা উচিত নয় কি?) উচ্চশ্রেণীর লোকেরা বলবে, আমরা সকলেই জাহান্নামে আছি। (অর্থাৎ আমরা আমাদের আযাবই হ্রাস করতে পারি না, তোমাদের আযাব কিরূপে নিবৃত্ত করব?) আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদের মধ্যে (চূড়ান্ত) ফয়সালা করে দিয়েছেন। (এখন এর বিপরীত করার সাধ্য কার?)

(অতপর ছোট বড়, অনুসারী ও অনুসৃত) যত লোক জাহান্নামে থাকবে, তারা (সবাই মিলে) জাহান্নামের রক্ষী ফেরেশতাগণকে (অনুরোধের সুরে) বলবে, তোমরাই তোমাদের পালনকর্তার কাছে দোয়া কর, তিনি যেন কোন দিন আমাদের থেকে আযাব

লাঘব করেন! (অর্থাৎ আযাব সম্পূর্ণ রহিত হবে অথবা চিরতরে কম হয়ে যাবে---এরূপ আশা তো নেই, কমপক্ষে একদিনের ছুটি পেলেও তো চলে।) ফেরেশতারা বলবে, (বল তো) তোমাদের কাছে কি তোমাদের পয়গম্বরগণ স্পষ্ট প্রমাণাদিসহ আসেননি (এবং জাহান্নাম থেকে আত্মরক্ষার উপায় বলেননি)? জাহান্নামীরা বলবে, হ্যাঁ (এসে-ছিলেন, কিন্তু আমরা তাঁদের কথা মানিনি بَلٰى قَدْ جَاءَنَا نَذِيْرٌ فَكَذَّبْنَا) ---ফেরেশতারা বলবে, তবে (আমরা তোমাদের জন্য দোয়া করতে পারি না। কারণ, আমাদেরকে কাফিরদের জন্য দোয়া করার অনুমতি দেয়া হয়নি।) তোমরাই (মনে চাইলে) দোয়া কর। (অবশ্য তোমাদের দোয়াও ফলদায়ক হবে না। কেননা,) কাফিরদের দোয়া (পরকালে) নিষ্ফলই হবে। (কারণ, পরকালে ঈমান ব্যতীত কোন দোয়া কবুল হতে পারে না। ঈমানের স্থান দুনিয়াতেই ছিল, যা তোমরা হারিয়ে ফেলেছ। 'পরকালে' বলার ফায়দা এই যে, দুনিয়াতে কাফিরদের দোয়াও কবুল হতে পারে, যেমন সর্ববৃহৎ কাফির ইবলীসের কিয়ামত পর্যন্ত জীবিত থাকার সর্ববৃহৎ দোয়া কবুল হয়েছে)।

إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُوْمُ

الْأَشْهَادُ ۝ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظّٰلِمِيْنَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ

سُوْءُ الدَّارِ ۝ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْهُدٰى وَأَوْرَثْنَا بَنِيْٓ إِسْرَآءِيْلَ

الْكِتٰبَ ۝ هُدًى وَّذِكْرٰى لِأُولِي الْأَلْبَابِ ۝ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ

اللّٰهِ حَقٌّ وَّاسْتَغْفِرْ لِذَنْۢبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ۝

إِنَّ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ بِغَيْرِ سُلْطٰنٍ أَتٰىهُمْ إِنْ فِيْ

صُدُوْرِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَّا هُمْ بِبَالِغِيْهِ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ إِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ

الْبَصِيْرُ ۝ لَخَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلٰكِنَّ

أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ۵ وَالَّذِيْنَ

اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَلَا الْمُسِيْٓءُ قَلِيْلًا مَّا تَتَذَكَّرُوْنَ ۝ إِنَّ

السَّاعَةَ لَاٰتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيْهَا وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٥٩﴾ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ۭ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دٰخِرِيْنَ ﴿٦٠﴾

(৫১) আমি সাহায্য করব রসূলগণকে ও মু'মিনগণকে পার্থিব জীবনে ও সাক্ষীদের দণ্ডায়মান হওয়ার দিবসে। (৫২) সেদিন জালিমদের ওযর-আপত্তি কোন উপকারে আসবে না, তাদের জন্য থাকবে অভিশাপ এবং তাদের জন্য থাকবে মন্দ গৃহ। (৫৩) নিশ্চয় আমি মূসাকে হেদায়েত দান করেছিলাম এবং বনী ইসরাঈলকে কিতাবের উত্তরাধিকারী করেছিলাম। (৫৪) বুদ্ধিমানদের জন্য উপদেশ ও হেদায়েতস্বরূপ। (৫৫) অতএব আপনি সবর করুন। নিশ্চয় আল্লাহ্র ওয়াদা সত্য। আপনি আপনার গোনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং সকাল-সন্ধ্যায় আপনার পালনকর্তার প্রশংসাসহ পবিত্রতা বর্ণনা করুন। (৫৬) নিশ্চয় যারা আল্লাহ্র আয়াত সম্পর্কে বিতর্ক করে তাদের কাছে আগত কোন দলীল ব্যতিরেকে, তাদের অন্তরে আছে কেবল আত্মম্ভরিতা, যা অর্জনে তারা সফল হবে না। অতএব আপনি আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় তিনি সবকিছু শুনেন, সবকিছু দেখেন। (৫৭) মানুষের সৃষ্টি অপেক্ষা নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের সৃষ্টি কঠিনতর। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ বোঝে না। (৫৮) অন্ধ ও চক্ষুষ্মান সমান নয়, আর যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে এবং কুকর্মী। তোমরা অল্পই অনুধাবন করে থাক। (৫৯) কিয়ামত অবশ্যই আসবে, এতে সন্দেহ নেই; কিন্তু অধিকাংশ লোক বিশ্বাস স্থাপন করে না। (৬০) তোমাদের পালনকর্তা বলেন, তোমরা আমাকে ডাক, আমি সাড়া দেব। যারা আমার ইবাদতে অহংকার করে তারা সত্বরই জাহান্নামে দাখিল হবে লাঞ্ছিত হয়ে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি আমার পয়গম্বরগণকে ও মু'মিনগণকে পার্থিব জীবনেও সাহায্য করি [যেমন, উপরে মূসা (আ)-র ঘটনা থেকে জানা গেল।] এবং সেদিনও, (যেদিন (আমলনামা লেখক) সাক্ষ্যদাতা ফেরেশতাগণ (সাক্ষ্যদানের জন্য) দণ্ডায়মান হবে। (তারা সেদিন সাক্ষ্য দেবে যে, রসূলগণ প্রচারকার্য সমাধা করেছেন এবং কাফিররা মিথ্যারোপ করেছে। এখানে কিয়ামতের দিন বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ) যেদিন জালিমদের (অর্থাৎ কাফিরদের) ওযর-আপত্তি কোন উপকার দেবে না। (অর্থাৎ প্রথমত কোন ওযর-আপত্তি ধর্তব্য হবে না, আর যদি হয়ও, তবে তা উপকারী হবে না।) তাদের জন্য থাকবে অভিশাপ এবং তাদের জন্য থাকবে দুর্ভোগ। (এভাবে আপনি ও আপনার অনুসারীরা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে এবং শত্রুরা লাঞ্ছিত ও পরাভূত হবে।

কাজেই আপনি আশ্বস্ত হোন। আপনার পূর্বে) আমি মূসা (আ)-কে হেদায়েতনামা (অর্থাৎ তওরাত) দান করেছিলাম এবং বনী ইসরাঈলকে (সেই) কিতাবের উত্তরাধিকারী করেছিলাম, তা ছিল (সুস্থ) বিবেকবানদের জন্য হেদায়েত ও উপদেশ। [বিবেকহীনরা তা দ্বারা উপকৃত হয়নি। এমনিভাবে আপনিও মূসা (আ)-র ন্যায় রিসালত ও ওহীর অধিকারী এবং আপনার অনুসারীরাও বনী ইসরাঈলদের মত আপনার কিতাবের ধারক ও বাহক। বনী ইসরাঈলের মধ্যে বিবেকবানরা যেমন অনুসারী ছিল এবং বিবেকহীনরা অস্বীকারকারী ও বিরোধী ছিল, তেমনি আপনার উম্মতের মধ্যেও উভয় প্রকার লোক আছে।] অতএব (এ থেকেও) আপনি (সান্ত্বনা লাভ করুন এবং কাফিরদের উৎপীড়নে) সবর করুন। নিশ্চয় (উপরে لننصر আয়াতে বর্ণিত) আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য। (যদি পূর্ণ সবরে ত্রুটি হয়ে যায়, যা শরীয়তের আইনে গোনাহ্ না হলেও আপনার উচ্চ মর্যাদার দিক দিয়ে ক্ষতিপূরণ জরুরী হওয়ার ব্যাপারে গোনাহেরই অনুরূপ, তবে তা পূরণ করে নিন। পূরণ এই যে,) আপনি আপনার (সেই) গোনাহের জন্য, (যাকে রূপক অর্থে গোনাহ্ বলে দেওয়া হয়েছে) ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং (এমন কাজে ব্যাপৃত থাকুন, যা দুঃখজনক বিষয়াদি থেকে মনকে ফিরিয়ে রাখে। সেই কাজ এই যে,) সকাল সন্ধ্যায় (অর্থাৎ সর্বদা) আপনার পালনকর্তার প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করুন। (এ পর্যন্ত সান্ত্বনা সম্পর্কে বলা হল। অতপর বিতর্ককারী কাফিরদের জওয়াব দেওয়া হচ্ছে,) নিশ্চয় যারা আল্লাহ্‌র আয়াত সম্পর্কে বিতর্ক করে তাদের কাছে আগত কোন দলীল ব্যতিরেকে (তাদের কাছে বিতর্কের কারণ হতে পারে, এরূপ কোন সন্দেহযুক্ত বিষয় নেই; বরং) তাদের অন্তরে আছে কেবল আত্মম্ভরিতা, যা অর্জনে তারা কখনও সফল হবে না। (তারা নিজেদেরকে বড় মনে করে, ফলে অন্যের অনুসরণ করতে লজ্জাবোধ করে। তারা অন্যদেরকে তাদের অনুসারী করার দুরাকাঙ্ক্ষা পোষণ করে, কিন্তু তাদের এই বাসনা পূর্ণ হবে না; বরং সত্বরই অপমানিত ও লাঞ্ছিত হবে। সে মতে বদর ইত্যাদি যুদ্ধে তারা মুসলমানদের হাতে পরাভূত হয়েছে।) অতএব (তারা যখন বড়ত্বের অভিলাষী, তখন আপনার প্রতি হিংসা ও শত্রুতা সবকিছুই করবে, কিন্তু) আপনি (শঙ্কিত হবেন না বরং তাদের অনিষ্ট থেকে) আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় তিনি সবকিছু শুনেন, সবকিছু দেখেন। (এসব গুণে গুণান্বিত হওয়ার কারণে তিনি আশ্রিতদেরকে নিরাপদ রাখবেন। এটা ছিল আপনাকে রসূল মেনে নেওয়ার ব্যাপারে তাদের বিতর্ক। অতপর কিয়ামত সম্পর্কে তাদের বিতর্ক উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ মানুষের পুনরুজ্জীবন অস্বীকারকারীরা খুবই নির্বোধ, কেননা,) নিশ্চয়ই মানুষকে (পুনরায়) সৃষ্টি করা অপেক্ষা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলকে (নতুনভাবে) সৃষ্টি করা কঠিনতর কাজ। (যেমন কঠিন কাজের সামর্থ্য প্রমাণিত, তখন সহজ কাজের তো কথাই নেই। সপ্রমাণের জন্য এ দলীল যথেষ্ট।) কিন্তু অধিকাংশ মানুষ (এতটুকু বিষয়) বোঝে না। (কেননা, তারা চিন্তাই করে না। কেউ কেউ চিন্তা করে, বোঝে এবং মানেও। এমনিভাবে যারা কোরআন শুনে, তারাও দু'দলে বিভক্ত---একদল বোঝে এবং মানে। তারা চক্ষুষ্মান ও মু'মিন। অপর দল বোঝে না

এবং মানে না। তারা অন্ধের ন্যায় এবং কুকর্মী। এই উভয় প্রকার লোক, অর্থাৎ (এক) চক্ষুষ্মান ও (দুই) অন্ধ এবং (এক) যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সৎকর্ম করেছে ও (দুই) যারা কুকর্মী---তারা পরস্পর সমান নয়। [এতে সব রকম মানুষ আছে বলে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে এবং সবাইকে সমান রাখা হবে না বলে কাফিরদের প্রতি কিয়ামতের শাস্তিবাণীও উচ্চারণ করা হয়েছে। অতপর **যারা অন্ধের ন্যায় ও কুকর্মী, তাদেরকে শাসানো হয়েছে যে,**) তোমরা অল্পই বুঝে থাক। (বুঝলে অন্ধ ও কুকর্মী থাকতে না। কিয়ামত সম্পর্কে বিতর্কের খবর দিয়ে অতপর কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার খবর দেওয়া হয়েছে যে,] কিয়ামত অবশ্যই আসবে, এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু অধিকাংশ লোক (এর প্রমাণাদিতে চিন্তা-ভাবনা না করার কারণে একে) মানে না। (তওহীদ সম্পর্কেও তাদের বিতর্ক ছিল। ফলে আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করত। অতপর এ সম্পর্কে বলা হয়েছে,) তোমাদের পালনকর্তা বলেন, (অভাব-অনটন মেটানোর জন্য অপরকে ডেকো না; বরং) আমাকে ডাক। আমি (অসমীচীন প্রার্থনা ব্যতীত) তোমাদের (প্রত্যেক) প্রার্থনা কবূল করব। (দোয়া সম্পর্কে কোরআনের فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ আয়াতের অর্থ তাই যে, অসমীচীন দোয়া কবূল করা হবে না।) যারা (একমাত্র) আমার ইবাদত থেকে (দোয়াসহ) অহংকার ভরে অপরকে ডাকে (ও তার ইবাদত করে অর্থাৎ শিরক করে,) তারা সত্বরই লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে দাখিল হবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا—এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার ওয়াদা রয়েছে যে, তিনি তাঁর রসূল ও মু'মিনগণকে সাহায্য করেন ইহকালেও এবং পরকালেও। বলা বাহুল্য, এ সাহায্য কেবল শত্রুদের বিরুদ্ধেই সীমিত। অধিকাংশ পয়গম্বরের ক্ষেত্রে এর বাস্তবতা বর্ণনাসাপেক্ষ নয়। কিন্তু কোন কোন পয়গম্বর যেমন, ইয়াহইয়া, যাকারিয়া ও শোয়ায়েব (আ)-কে শত্রুরা শহীদ করেছে এবং কতককে দেশান্তরিত করেছে যেমন, ইবরাহীম ও খাতামুল আম্বিয়া মুহাম্মদ (সা)। তাঁদের ক্ষেত্রে আয়াতে বর্ণিত সাহায্যের ব্যাপারে সন্দেহ হতে পারে।

ইবনে কাসীর ইবনে জরীরের বরাত দিয়ে এর জওয়াব দেন যে, আয়াতে বর্ণিত সাহায্যের অর্থ শত্রুর কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ তা পয়গম্বরগণের বর্তমানে তাঁহাদেরই হাতে হোক, কিংবা তাঁদের ওফাতের পরে হোক। এর অর্থ কোনরূপ ব্যতিক্রম ছাড়াই সমস্ত পয়গম্বর ও মু'মিনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। পয়গম্বর-হত্যাকারীদের আযাব ও দুর্দশার বর্ণনা দ্বারা ইতিহাসের পাতা পরিপূর্ণ। হযরত ইয়াহইয়া, যাকারিয়া ও শোয়ায়েব (আ)-এর হত্যাকারীদের উপর বহিঃশত্রু চাপিয়ে দেয়া হয়েছে, যারা তাদেরকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করে হত্যা করেছে। নমরূদকে আযাব দেওয়া হয়েছে। ঈসা (আ)-র

শত্রুদের উপর আল্লাহ্ তা'আলা রোমকদের চাপিয়ে দেন। তারা তাদেরকে লাঞ্ছিত করেছে। কিয়ামতের প্রাক্কালে আল্লাহ্ তাঁকে শত্রুদের উপর প্রবল করবেন। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র শত্রুদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের হাতেই পরাভূত করেছেন। তাদের বড় বড় সরদার নিহত হয়েছে, কিছু বন্দী হয়েছে এবং অবশিষ্টরা মক্কা বিজয়ের দিন গ্রেফতার হয়েছে। অবশ্য রসূলুল্লাহ্ (সা) তাদেরকে মুক্ত করে দিয়েছেন। তাঁর ধর্মই জগতের সমস্ত ধর্মের উপর প্রাধান্য বিস্তার করেছে এবং তাঁর জীবদ্দশায়ই সমগ্র আরব উপদ্বীপে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

يَوْمَ يَقُومُ الْاَشْهَادُ—যেদিন সাক্ষীরা দণ্ডায়মান হবে অর্থাৎ কিয়ামতের দিন। সেখানে পয়গম্বর ও মু'মিনগণের জন্য আল্লাহ্র সাহায্য বিশেষভাবে প্রকাশ লাভ করবে।

اِنْ فِىْ صُدُوْرِهِمْ اِلَّا كِبْرٌ مَّا هُمْ بِبَالِغِيْهِ—অর্থাৎ তারা আল্লাহ্র আয়াত সম্পর্কে কোন দলীল-প্রমাণ ব্যতিরেকে বিতর্ক করে। উদ্দেশ্য, এ ধর্মকে অস্বীকার করা। এর কারণ এছাড়া কিছুই নয় যে, তাঁদের অন্তরে অহংকার রয়েছে। তারা বড়ত্ব চায় এবং নির্বুদ্ধিতাবশত মনে করে যে, তাদের ধর্মে কায়েম থাকলেও এ বড়ত্ব অর্জিত হতে পারে। এ ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করলে তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা ক্ষুণ্ণ হবে। কোরআন পাক বলে দিয়েছে যে, ইসলাম গ্রহণ করা ব্যতীত তারা তাদের কল্পিত বড়ত্ব ও নেতৃত্ব লাভ করতে পারবে না।—(কুরতুবী)

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِىْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِىْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دٰخِرِيْنَ -

দোয়ার স্বরূপ : দোয়ার শাব্দিক অর্থ ডাকা, অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিশেষ কোন প্রয়োজনে ডাকার অর্থে ব্যবহৃত হয়। কখনও যিকিরকেও দোয়া বলা হয়। উম্মতে মুহাম্মদীয়ার বিশেষ সম্মানের কারণে এই আয়াতে তাদেরকে দোয়া করার আদেশ করা হয়েছে এবং তা কবূল করার ওয়াদা করা হয়েছে। যারা দোয়া করে না, তাদের জন্য শাস্তিবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে।

কা'বে আহবার থেকে বর্ণিত আছে, পূর্ব যুগে কেবল পয়গম্বরগণকেই বলা হত, দোয়া করুন; আমি কবূল করব। এখন এই আদেশ সকলের জন্য ব্যাপক করে দেওয়া হয়েছে এবং এটা উম্মতে মুহাম্মদীরই বৈশিষ্ট্য।—(ইবনে কাসীর)

এ আয়াতের তফসীরে নো'মান ইবনে বশীর বর্ণিত রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, ان الدعاء هو العبادة অর্থাৎ দোয়াই ইবাদত। অতপর তিনি আলোচ্য আয়াত তিলাওয়াত করেন।---(ইবনে কাসীর)

তফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে, আরবী ব্যাকরনিক নিয়মে ان الدعاء هو العبادة বাক্যের এক অর্থ এরূপ হতে পারে যে, ইবাদতেরই নাম দোয়া। অর্থাৎ প্রত্যেক দোয়াই ইবাদত। দ্বিতীয় অর্থ এরূপও হতে পারে যে, প্রত্যেক ইবাদতই দোয়া। এখানে অর্থ এই যে, শাব্দিক অর্থের দিক দিয়ে দোয়া ও ইবাদত যদিও পৃথক কিন্তু উভয়ের ভাবার্থ এক। অর্থাৎ প্রত্যেক দোয়াই ইবাদত এবং প্রত্যেক ইবাদতই দোয়া। কারণ এই যে, ইবাদত বলা হয় কারও সামনে চূড়ান্ত দীনতা অবলম্বন করাকে। বলা বাহুল্য, নিজেকে কারও মুখাপেক্ষী মনে করে তার সামনে সওয়ালের হস্ত প্রসারিত করা বড় দীনতা যা ইবাদতের অর্থ। এমনিভাবে প্রত্যেক ইবাদতের সারমর্মও আল্লা-হ্র কাছে মাগফিরাত ও জান্নাত তলব করা এবং ইহকাল ও পরকালের নিরাপত্তা প্রার্থনা করা। এ কারণেই এক হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ্ বলেন, যে ব্যক্তি আমার হামদ ও প্রশংসায় এমন মশগুল হয় যে, নিজের প্রয়োজন চাওয়ারও অবসর পায় না, আমি তাকে যারা চায়, তাদের চেয়ে বেশি দেব। (অর্থাৎ তার অভাব পূরণ করে দেব।) তিরমিযী ও মুসলিমের রেওয়ায়েতে আছে ঃ

من شغله القران عن ذكرى ومسئلتى اعطيته افضل ما اعطى السائلين অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোরআন তেলাওয়াতে এমনিভাবে মশগুল হয় যে, আমার কাছে প্রয়োজন চাওয়ারও সময় পায় না, আমি তাকে যারা চায়, তাদের চেয়ে বেশি দেব। এ থেকে বোঝা গেল যে, প্রত্যেক ইবাদতই দোয়ার মত ফায়দা দেয়।

আরাফাতের হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, আরাফাতে আমার দোয়াও পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের দোয়া এই কলেমা ঃ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ----এতে ইবাদত ও যিকিরকে দোয়া বলা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে দোয়া অর্থে ইবাদত বর্জনকারীকে জাহান্নামের শাস্তিবাণী শোনানো হয়েছে যদি সে অহংকারবশত বর্জন করে। কেননা অহংকারবশত দোয়া বর্জন করা কুফরের লক্ষণ। তাই সে জাহান্নামের যোগ্য হয়ে যায়। নতুবা সাধারণ দোয়া ফরয বা ওয়াজিব নয়। দোয়া না করলে গোনাহ হয় না। তবে দোয়া করা সমস্ত আলিমের মতে মোস্তাহাব ও উত্তম এবং হাদীস অনুযায়ী বরকত লাভের কারণ।---(মাযহারী)

দোয়ার ফযীলত ঃ রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, আল্লাহ্র কাছে দোয়া অপেক্ষা অধিক সম্মানিত কোন বিষয় নেই।---(তিরমিযী)

তিনি আরও বলেন, الدعاء مخ العبادة দোয়া ইবাদতের মগজ।---(তিরমিযী)

অন্য এক হাদীসে আছে, আল্লাহ্ তা'আলার কাছে অনুগ্রহ প্রার্থনা কর। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা যাঞ্চা ও প্রার্থনা পছন্দ করেন। অভাব-অনটনের সময় সচ্ছলতার জন্য দোয়া করে রহমত প্রাপ্তির জন্য অপেক্ষা করা সর্ববৃহৎ ইবাদত।---(তিরমিযী)

অন্য এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র কাছে তার প্রয়োজন প্রার্থনা করে না, আল্লাহ্ তার প্রতি রুষ্ট হন।---(তিরমিযী)

তফসীরে মাযহারীতে এসব রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে যে, দোয়া না করার কারণে আল্লাহ্র গযবের হুমকি তখন প্রযোজ্য যখন কেউ নিজেকে বড় ও বেপরওয়া মনে করে দোয়া ত্যাগ করে। إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ আয়াত থেকে তাই প্রামাণিত হয়।

রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, তোমরা দোয়া করতে অপারক হয়ো না; কেননা দোয়াসহ কেউ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না।---(ইবনে হাব্বান)

এক হাদীসে আছে, দোয়া মু'মিনের হাতিয়ার, ধর্মের স্তম্ভ এবং আকাশ ও পৃথিবীর নূর।---(হাকিম)

অন্য এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, যার জন্য দোয়ার দ্বার উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়, তার জন্য রহমতের দ্বার উন্মুক্ত করা হয়। নিরাপত্তা প্রার্থনা করা অপেক্ষা কোন পছন্দনীয় দোয়া আল্লাহ্র কাছে করা হয়নি।---(তিরমিযী) عافية তথা 'নিরাপত্তা' শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থবহ। এতে অনিষ্ট থেকে হিফাযত ও প্রত্যেক অভাব-অনটন পূরণই অন্তর্ভুক্ত।

কোন গোনাহ্ অথবা সম্পর্কচ্ছেদের দোয়া করা হারাম। এরূপ দোয়া কবুলও হয় না।

দোয়া কবুলের ওয়াদা ঃ উপরোক্ত আয়াতে ওয়াদা রয়েছে যে, বান্দা আল্লাহ্র কাছে যে দোয়া করে, তা কবূল হয়। কিন্তু মানুষ মাঝে মাঝে দোয়া কবূল না হওয়াও প্রত্যক্ষ করে। এর জওয়াবে আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, মুসলমান আল্লাহ্র কাছে যে দোয়াই করে, আল্লাহ্ তা দান করেন, যদি তা কোন গোনাহ্ অথবা সম্পর্কচ্ছেদের দোয়া না হয়। দোয়া কবূল হওয়ার উপায় তিনটি---তন্মধ্যে কোন না কোন উপায়ে দোয়া কবুল হয়। এক. যা চাওয়া হয়, তাই পাওয়া। দুই. প্রার্থিত বিষয়ের পরিবর্তে পরকালের কোন সওয়াব ও পুরস্কার দান করা এবং

তিন. প্রার্থিত বিষয় না পাওয়া। কিন্তু কোন সম্ভাব্য আপদ-বিপদ সরে যাওয়া। ---(মাযহারী)

দোয়া কবূলের শর্ত ঃ উপরোক্ত আয়াতে বাহ্যত কোন শর্ত উল্লেখ নেই। এমন কি মুসলমান হওয়াও দোয়া কবূলের শর্ত নয়। কাফির ব্যক্তির দোয়াও আল্লাহ্ তা'আলা কবূল করেন। ইবলীস কিয়ামত পর্যন্ত জীবিত থাকার দোয়া করেছিল। আল্লাহ্ তা'আলা তা কবূল করেছেন। দোয়ার জন্য কোন সময় এবং ওযূ শর্ত নয়। তবে নির্ভরযোগ্য হাদীসসমূহে কোন কোন বিষয়কে দোয়া কবূলের পথে বাধা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এসব বিষয় থেকে বেঁচে থাকা জরুরী। হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-র রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, কোন কোন লোক খুব সফর করে এবং আকাশের দিকে হাত তুলে 'ইয়া রব' ইয়া রব' বলে দোয়া করে; কিন্তু তাদের পানাহার ও পোশাক-পরিচ্ছদ হারাম পন্থায় অর্জিত। এমতাবস্থায় তাদের দোয়া কিরূপে কবূল হবে?---(মুসলিম)

এমনিভাবে অসাবধান, বেপরওয়া ও অনামনস্কভাবে দোয়ার বাক্যাবলী উচ্চারণ করলে তাও কবূল হয় না বলেও হাদীসে বর্ণিত আছে---(তিরমিযী)।

اَللّٰهُ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ ۝٦١ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۘ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۡ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ۝٦٢ كَذٰلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِيْنَ كَانُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ ۝٦٣ اَللّٰهُ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ قَرَارًا وَّالسَّمَاۗءَ بِنَاۗءً وَّصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ۭ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ ښ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۝٦٤ هُوَ الْحَيُّ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۭ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝٦٥ قُلْ اِنِّىْ نُهِيْتُ اَنْ اَعْبُدَ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَمَّا جَاۗءَنِيَ الْبَيِّنٰتُ مِنْ رَّبِّيْ ۡ وَاُمِرْتُ اَنْ اُسْلِمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝٦٦ هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا

ثُمَّ لِتَبْلُغُوٓا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا ۚ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ مِن قَبْلُ ۖ وَلِتَبْلُغُوٓا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾ هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ ۖ فَإِذَا قَضَىٰٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ﴿٦٨﴾

(৬১) তিনিই আল্লাহ্ যিনি রাত সৃষ্টি করেছেন তোমাদের বিশ্রামের জন্যে এবং দিবসকে করেছেন দেখার জন্যে। নিশ্চয় আল্লাহ্ মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না। (৬২) তিনি আল্লাহ্, তোমাদের পালনকর্তা, সবকিছুর স্রষ্টা। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। অতএব তোমরা কোথায় বিভ্রান্ত হচ্ছ ? (৬৩) এমনিভাবে তাদেরকে বিভ্রান্ত করা হয়, যারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে। (৬৪) আল্লাহ্ পৃথিবীকে করেছেন তোমাদের জন্য বাসস্থান, আকাশকে করেছেন ছাদ এবং তিনি তোমাদেরকে আকৃতি দান করেছেন, অতপর তোমাদের আকৃতি সুন্দর করেছেন এবং তিনি তোমাদেরকে দান করেছেন পরিচ্ছন্ন রিযিক। তিনি আল্লাহ্, তোমাদের পালনকর্তা। বিশ্বজগতের পালনকর্তা, আল্লাহ্ বরকতময়। (৬৫) তিনি চিরঞ্জীবী, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। অতএব তাঁকে ডাক—তাঁর খাঁটি ইবাদতের মাধ্যমে। সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের পালনকর্তা আল্লাহ্‌র। (৬৬) বলুন, যখন আমার কাছে আমার পালনকর্তার পক্ষ থেকে স্পষ্ট প্রমাণাদি এসে গেছে, তখন আল্লাহ্ ব্যতীত তোমরা যার পূজা কর, তার ইবাদত করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে। আমাকে আদেশ করা হয়েছে বিশ্ব পালনকর্তার অনুগত থাকতে। (৬৭) তিনিই তো তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মাটির দ্বারা, অতপর শুক্রবিন্দু দ্বারা, অতপর জমাট রক্ত দ্বারা, অতপর তোমাদেরকে বের করেন শিশুরূপে, অতপর তোমরা যৌবনে পদার্পণ কর, অতপর বার্ধক্যে উপনীত হও। তোমাদের কারও কারও এর পূর্বেই মৃত্যু ঘটে এবং তোমরা নির্ধারিতকালে পৌঁছ এবং তোমরা যাতে অনুধাবন কর। (৬৮) তিনিই জীবিত করেন এবং মৃত্যু দেন। যখন তিনি কোন কাজের আদেশ করেন, তখন একথাই বলেন, 'হয়ে যা'—তা হয়ে যায়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আল্লাহ্ যিনি তোমাদের (উপকারের) জন্য রাত্রি সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা তাতে বিশ্রাম কর, তিনিই দিবসকে (দেখার জন্য) উজ্জ্বল করেছেন (যাতে তোমরা অবাধে জীবিকা অর্জন কর)। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের প্রতি খুব অনুগ্রহশীল (তিনি তাদের উপযোগিতার প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন); কিন্তু অধিকাংশ মানুষ (এসব নিয়ামতের) কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না (বরং উল্টা শিরক) করে। তিনি আল্লাহ্, তোমাদের পালনকর্তা, (তারা নয়, যাদেরকে তোমরা মনগড়া তৈরি করে রেখেছ।)

তিনি সর্বকিছুর স্রষ্টা। তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। (তওহীদ প্রমাণিত হওয়ার পর) তোমরা কোথায় (শিরক করে) উল্টা দিকে যাচ্ছ? (তোমাদেরই কথা কি, তোমরা যেমন বিদ্বেষ ও হঠকারিতাবশত উল্টা দিকে যাচ্ছে,) এমনিভাবে (পূর্ববর্তী) তারাও উল্টা চলত, যারা আল্লাহ্‌র (সৃষ্টিগত ও আইনগত) নিদর্শনা-বলীকে অস্বীকার করত। আল্লাহ্‌ই পৃথিবীকে তোমাদের জন্য বাসস্থান করেছেন এবং আকাশকে (উপরে) ছাদ (সদৃশ) করেছেন। তিনি তোমাদের আকৃতি গঠন করে চমৎকার আকৃতি করেছেন। (সেমতে মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সমান কোন প্রাণীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুসমঞ্জস নয়। এটা প্রত্যক্ষ ও স্বীকৃত।) তিনি তোমাদেরকে উৎকৃষ্ট বস্তু আহারের জন্য দিয়েছেন। (সুতরাং) তিনি আল্লাহ্ তোমাদের পালনকর্তা, অতপর উচ্চ মর্যাদাবান আল্লাহ্, যিনি সারাবিশ্বের পালনকর্তা। তিনি চিরঞ্জীব। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। অতএব তোমরা (সকলেই) খাঁটি বিশ্বাস সহকারে তাঁকে ডাক (এবং শিরক করো না)। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি বিশ্ব পালনকর্তা। আপনি (মুশরিকদের উদ্দেশে) বলুন, যখন আমার কাছে আমার পালনকর্তার পক্ষ থেকে (যুক্তিভিত্তিক ও ইতিহাসভিত্তিক) স্পষ্ট প্রমাণাদি এসে গেছে, তখন আল্লাহ্ ব্যতীত তোমরা যার পূজা কর, তার ইবাদত করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে। (উদ্দেশ্য এই যে, আমাকে শিরক করতে নিষেধ করা হয়েছে।) আমাকে আদেশ করা হয়েছে (একমাত্র) বিশ্ব পালনকর্তার সামনে (ইবাদতে) মাথা নত রাখতে। (উদ্দেশ্য এই যে, আমি তওহীদ মেনে নিতে আদিষ্ট হয়েছি।) তিনিই তোমাদেরকে (অর্থাৎ তোমাদের আদি পুরুষদেরকে) মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, অতপর (তার বংশধরকে) বীর্য দ্বারা, অতপর জমাট রক্ত দ্বারা, অতপর তোমাদেরকে শিশুরূপে (মায়ের গর্ভ থেকে) বের করেন, অতপর (তোমাদেরকে জীবিত রাখেন,) যাতে তোমরা যৌবনে পদার্পণ কর, অতপর (তোমাদেরকে আরও জীবিত রাখেন) যাতে তোমরা বার্ধক্যে উপনীত হও। তোমাদের কেউ কেউ (যৌবনে ও বার্ধক্যে পেঁছার) পূর্বেই মারা যায় এবং (তোমাদের প্রত্যেককেই এক বিশেষ বয়স দেন,) যাতে তোমরা সবাই (নিজ নিজ) নির্ধারিত কালে পেঁছ এবং (এসব কাজ এজন্য করেছেন,) যাতে তোমরা (এসব বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করে আল্লাহ্‌র তওহীদকে) অনুধাবন কর। তিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান। তিনি যখন কোন কাজ (অকস্মাৎ) পূর্ণ করতে চান, তখন এতটুকু বলে দেন, 'হয়ে যা'। তা হয়ে যায়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

উল্লিখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ্‌র নিয়ামত ও পরিপূর্ণ শক্তি-সামর্থ্যের কতিপয় নিদর্শন পেশ করে তওহীদের দাওয়াত দেওয়া হয়েছে।

جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا---চিন্তা করুন, নিদ্রা

কত বড় নিয়ামত! আল্লাহ্ তা'আলা সকল শ্রেণীর মানুষ বরং জন্তু-জানোয়ারকে পর্যন্ত স্বভাবগতভাবে নিদ্রার একটি সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। সে সময়টিকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে নিদ্রার উপযোগী করে দিয়েছেন। এখন রাত্রিবেলায় নিদ্রা আসা সকলেরই স্বভাব ও মজ্জায় পরিণত করে দেওয়া হয়েছে। নতুবা মানুষ কাজ-কারবারের জন্য যেমন নিজ নিজ স্বভাব ও সুযোগ-সুবিধা অনুযায়ী সময় নির্দিষ্ট করে, নিদ্রাও যদি তেমনি ইচ্ছাধীন ব্যাপার হত এবং প্রত্যেকেই বিভিন্ন সময়ে নিদ্রার পরিকল্পনা করত, তবে নিদ্রিতরাও নিদ্রার সুখ পেত না এবং জাগ্রতদেরও কাজ কারবারের শৃংখলা বজায় থাকত না। কারণ, মানুষের প্রয়োজন পারস্পরিক জড়িত থাকে! বিভিন্ন সময়ে নিদ্রা গেলে জাগ্রতদের সেই কাজ, যা নিদ্রিতদের সাথে জড়িত, বিঘ্নিত হয়ে যেত এবং নিদ্রিতদের সেই কাজও পণ্ড হয়ে যেত, যা জাগ্রতদের সাথে জড়িত। যদি কেবল মানুষের নিদ্রার সময় নির্দিষ্ট থাকত এবং জন্তু--জানোয়ারের নিদ্রার সময় ভিন্ন হত তবুও মানুষের কাজের শৃংখলা বিঘ্নিত হত।

وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ——মানুষের আকৃতিকে আল্লাহ্ তা'আলা সকল থেকে স্বতন্ত্র ও উৎকৃষ্ট করে গঠন করেছেন। তাকে চিন্তা ও হৃদয়ঙ্গম করার শক্তি দিয়েছেন। সে হস্ত-পদ দ্বারা বিভিন্ন প্রকার বস্তু ও শিল্পসামগ্রী তৈরি করে নিজের সুখের ব্যবস্থা করে নেয়। তার পানাহারও সাধারণ জন্তু-জানোয়ার থেকে স্বতন্ত্র। জন্তু-জানোয়াররা মুখে ঘাস খায় ও পান করে আর মানুষ হাতের সাহায্যে করে। সাধারণ জন্তু-জানোয়ারের খাদ্য এক জাতীয়, কেউ শুধু মাংস খায়, কেউ ঘাস ও লতা-পাতা খায়। কিন্তু মানুষ তার খাদ্যকে বিভিন্ন প্রকার বস্তু, ফল-মূল, তরি-তরকারি, গোশত ও মসলা দ্বারা মুখরোচক ও স্বাদযুক্ত করে খায়! এক এক ফল দ্বারা রকমারি খাদ্য——আচার, মুরব্বা ও চাটনী তৈরী করে খায়।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ ﴿٦٩﴾
الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٧٠﴾
إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ ﴿٧١﴾ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي
النَّارِ يُسْجَرُونَ ﴿٧٢﴾ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿٧٣﴾ مِنْ
دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُو مِنْ قَبْلُ شَيْئًا كَذَٰلِكَ
يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ ﴿٧٤﴾ ذَٰلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ
الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ ﴿٧٥﴾ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ

فِيهَا ۚ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٧٦﴾ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۚ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿٧٧﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ۗ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ ﴿٧٨﴾

(৬৯) আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা আল্লাহ্‌র আয়াত সম্পর্কে বিতর্ক করে, তারা কোথায় ফিরছে? (৭০) যারা কিতাবের প্রতি এবং যে বিষয় দিয়ে আমি পয়গম্বরগণকে প্রেরণ করেছি, সে বিষয়ের প্রতি মিথ্যারোপ করে। অতএব সত্বরই তারা জানতে পারবে, (৭১) যখন বেড়ি ও শৃঙ্খল তাদের গলদেশে পড়বে। তাদেরকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে (৭২) ফুটন্ত পানিতে, অতপর তাদেরকে আগুনে জ্বালানো হবে (৭৩) অতপর তাদেরকে বলা হবে, কোথায় গেল যাদেরকে তোমরা শরীক করতে (৭৪) আল্লাহ্ ব্যতীত? তারা বলবে, তারা আমাদের কাছ থেকে উধাও হয়ে গেছে; বরং আমরা তো ইতিপূর্বে কোন কিছুর পূজাই করতাম না। এমনিভাবে আল্লাহ্ কাফির-দেরকে বিভ্রান্ত করেন। (৭৫) এটা এ কারণে যে, তোমরা দুনিয়াতে অন্যায়ভাবে আনন্দ উল্লাস করতে এবং এ কারণে যে, তোমরা ঔদ্ধত্য করতে। (৭৬) প্রবেশ কর তোমরা জাহান্নামের দরজা দিয়ে সেখানে চিরকাল বসবাসের জন্য। কত নিকৃষ্ট দাম্ভিকদের আবাসস্থল! (৭৭) অতএব আপনি সবর করুন। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য। অতপর আমি কাফিরদেরকে যে শাস্তির ওয়াদা দেই, তার কিয়দংশ যদি আপনাকে দেখিয়ে দেই অথবা আপনার প্রাণ হরণ করে নেই, সর্বাবস্থায় তারা তো আমারই কাছে ফিরে আসবে। (৭৮) আমি আপনার পূর্বে অনেক রসূল প্রেরণ করেছি, তাদের কারও কারও ঘটনা আপনার কাছে বিবৃত করেছি এবং কারও কারও ঘটনা আপনার কাছে বিবৃত করিনি। আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কোন নিদর্শন নিয়ে আসা কোন রসূলের কাজ নয়। যখন আল্লাহ্‌র আদেশ আসবে, তখন ন্যায়সঙ্গত ফয়সালা হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে মিথ্যাপন্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা আল্লাহ্‌র আয়াত সম্পর্কে বিতর্ক করে, তারা (সত্য থেকে) কোথায় ফিরছে? যারা কিতাবের প্রতি এবং যে বিষয় দিয়ে আমি পয়গম্বরগণকে প্রেরণ করেছি, সে বিষয়ের প্রতি মিথ্যারোপ করে। (এতে

কিতাব, বিধানাবলী ও মু'জিযা সব অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কেননা, আরবের মুশরিকরা অন্য কোন পয়গম্বরকেও মানতো না।) অতএব সত্বরই (অর্থাৎ কিয়ামতে) তারা জানতে পারবে, যখন বেড়ি তাদের গলদেশে থাকবে এবং (বেড়ি) শৃংখল (যুক্ত হবে, শৃংখলের অপর প্রান্ত ফেরেশতাদের হাতে থাকবে। এসব শৃংখল দ্বারা) তাদেরকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে ফুটন্ত পানিতে, অতপর তাদেরকে আগুনে পোড়ানো হবে। অতপর তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে, কোথায় গেল আল্লাহ্ ব্যতীত সেই উপাস্য-গুলো, যাদেরকে তোমরা শরীক করতে? (অর্থাৎ তারা তোমাদের সাহায্য করে না কেন?) তারা বলবে, তারা তো আমাদের কাছ থেকে উধাও হয়ে গেছে, বরং (সত্য কথা এই যে,) আমরা ইতিপূর্বে (দুনিয়াতে যে প্রতিমা পূজা করতাম, এখন জানা গেল যে,) আমরা কোন কিছুর পূজা করতাম না। (অর্থাৎ বোঝা গেল যে, তারা কোন বস্তুসত্তা ছিল না। ভুল ফুটে উঠলে এ ধরনের কথা বলা হয়। অর্থাৎ যখন কোন কাজের ফলই অর্জিত হয় না, তখন মনে করা উচিত যে, সবই কাজই হয়নি) আল্লাহ্ এমনিভাবে কাফিরদেরকে বিভ্রান্ত করেন। (যে বিষয়ের কোন বস্তুসত্তা না হওয়া এবং অনুপকারী হওয়ার কথা তারা নিজেরাই পরকালে স্বীকার করবে, আজ ইহকালে তারা তারই পূজায় মশগুল রয়েছে। বলা হবে,) এটা (অর্থাৎ এই শাস্তি) এ কারণে যে, তোমরা দুনিয়াতে অন্যায়ভাবে আনন্দ-উল্লাস করতে এবং এ কারণে যে, তোমরা ঔদ্ধত্য করতে। (এর আগে তাদেরকে আদেশ করা হবে,) প্রবেশ কর জাহান্নামের দরজা দিয়ে (এবং) চিরকাল এখানে থাক। কত নিকৃষ্ট দাম্ভিকদের আবাসস্থল! (তাদের কাছ থেকে যখন এভাবে প্রতিশোধ নেয়া হবে, তখন) আপনি সবর করুন (কিছুদিন)। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য। অতপর আমি কাফির-দেরকে যে শাস্তির (সর্বাবস্থায়) ওয়াদা দেই (যে, কুফর করলে আযাব হবে) তার কিয়দংশ যদি আপনাকে দেখিয়ে দেই (অর্থাৎ আপনার জীবদ্দশায় তাদের উপর কিছু আযাব নাযিল হয়,) অথবা (নাযিল হওয়ার পূর্বেই) আমি আপনার প্রাণ হরণ করি (পরবর্তীতে আযাব নাযিল হোক বা না হোক)---সর্বাবস্থায় তারা তো আমারই কাছে ফিরে আসবে। (তখন নিশ্চিতরূপেই তাদের উপর আযাব নাযিল হবে। একথা স্মরণ করেও সান্ত্বনা লাভ করুন যে,) আমি আপনার পূর্বে অনেক রসূল প্রেরণ করেছি, তাঁদের কারও কারও কাহিনী আপনার কাছে (সংক্ষেপে অথবা বিস্তারিত) বিবৃত করেছি এবং কারও কারও কাহিনী বিবৃত করিনি। (এতটুকু বিষয় সকলের মধ্যেই অভিন্ন যে,) কোন রসূল দ্বারা এটা হতে পারেনি যে, আল্লাহ্‌র অনুমতি ছাড়া কোন মু'জিযা নিয়ে আসেন (এবং উম্মতের প্রত্যেক আবদার পূর্ণ করবে। কেউ কেউ এ কারণেও তাদের প্রতি মিথ্যারোপ করেছে। এমনিভাবে মুশরিকরা আপনার প্রতিও মিথ্যারোপ করে। কাজেই আপনি সান্ত্বনা রাখুন এবং সবর করুন।) অতপর যখন (আযাব নাযিল হওয়া সম্পর্কিত) আল্লাহ্‌র আদেশ আসবে, (ইহকালে হোক কিংবা পরকালে) তখন ন্যায়সঙ্গত (কার্যগত) ফয়সালা হয়ে যাবে। তখন মিথ্যা-পন্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

يُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ—এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, জাহান্নামীদেরকে প্রথমে حَمِيم অর্থাৎ ফুটন্ত পানিতে ও পরে جَحِيم অর্থাৎ জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এ থেকে আরও জানা যায় যে, حَمِيم জাহান্নামের বাইরের কোন স্থান, যার ফুটন্ত পানি পান করানোর জন্য জাহান্নামীদেরকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হবে। সূরা সাফ্ফাতের আয়াত ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ—থেকেও তাই জানা যায়। কোন কোন আয়াত থেকে জানা যায় যে, حَمِيم ও جَحِيم একই স্থান এবং حَمِيم এর মধ্যেই جَحِيم অবস্থিত। আয়াতটি এই—

هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ

এতে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, হামীমও জাহান্নামের অভ্যন্তরে অবস্থিত।

চিন্তা করলে জানা যায় যে, এতদুভয়ের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। জাহান্নামেরই অনেক স্তরে বিভিন্ন প্রকার আযাব থাকবে। এর মধ্যে এক স্তর হামীম অর্থাৎ ফুটন্ত পানিরও থাকবে। স্বতন্ত্র ও আলাদা হওয়ার কারণে একে জাহান্নামের বাইরেও বলা যায় এবং জাহান্নামেরই এক স্তর হওয়ার কারণে একে জাহান্নামও বলা যায়। ইবনে-কাসীর বলেন, জাহান্নামীদেরকে শৃঙ্খলিত অবস্থায় কখনও টেনে হামীমে এবং কখনও জাহীমে নিক্ষেপ করা হবে।

قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا—অর্থাৎ জাহান্নামে পৌঁছে মুশরিকরা বলবে—আমাদের উপাস্য প্রতিমা ও শয়তান আজ উধাও হয়ে গেছে। অর্থাৎ আমাদের দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না যদিও তারা জাহান্নামের কোন কোণে পড়ে আছে। তারাও যে জাহান্নামেই থাকবে, এ সম্পর্কে অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ

فرح—بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ

এর অর্থ আনন্দিত ও উল্লসিত হওয়া এবং مرح এর অর্থ দম্ভ করা, অর্থ সম্পদের অহংকারী হয়ে অপরের অধিকার খর্ব করা। مرح সর্বাবস্থায় নিন্দনীয় ও হারাম। পক্ষান্তরে فرح অর্থাৎ আনন্দ যদি ধনসম্পদের নেশায় আল্লাহ্‌কে ভুলে গোনাহ্‌র কাজ

দ্বারা হয়, তবে হারাম ও নাজায়েয। আলোচ্য আয়াতে এই আনন্দই বোঝানো হয়েছে। কারূনের কাহিনীতেও فرح এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। বলা হয়েছে---

لَا تَفْرَحْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِيْنَ---অর্থাৎ আনন্দ-উল্লাস করো না। আল্লাহ্ তা'আলা আনন্দ-উল্লাসকারীদেরকে পছন্দ করেন না। আনন্দ-উল্লাসের আরেক স্তর হল পার্থিব নিয়ামত ও সুখকে আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ ও দান মনে করে তজ্জন্যে আনন্দ প্রকাশ করা। এটা জায়েয, মুস্তাহাব বরং আদিষ্ট কর্তব্য। এ আনন্দ সম্পর্কে কোরআন বলে, فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا---অর্থাৎ এ কারণে তাদের আনন্দিত হওয়া উচিত। আলোচ্য আয়াতে مرح-কে সর্বাবস্থায় আযাবের কারণ বলা হয়েছে এবং فرح-এর সাথে بغير الحق কথাটি যুক্ত করে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, অন্যায় ও অবৈধ ভোগের মাধ্যমে আনন্দ করা হারাম এবং ন্যায় ও বৈধ ভোগের কারণে কৃতজ্ঞতাস্বরূপ আনন্দিত হওয়া ইবাদত ও সওয়াবের কাজ।

فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ فَاِمَّا نُرِيَنَّكَ---এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) সানন্দে কাফিরদের আযাবের অপেক্ষা করছিলেন। তাই তাঁর সান্ত্বনার জন্য আয়াতে বলা হয়েছে, আপনি সবর করুন। আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদের আযাবের ব্যাপারে যে ওয়াদা করেছেন, তা অবশ্যই পূর্ণ হবে---আপনার জীবদ্দশায় অথবা ওফাতের পরে। কাফিরদের আযাবের অপেক্ষা করা বাহ্যত 'রহমাতুল্লিল আলামীন' (বিশ্বজগতের জন্য রহমত) গুণের পরিপন্থী। কিন্তু অপরাধীদেরকে শাস্তি দেওয়ার লক্ষ্য যদি নির্যাতিত-নিরাপরাধ মু'মিনদেরকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়, তবে অপরাধীদেরকে সাজা দেওয়া দয়া ও অনুকম্পার পরিপন্থী নয়। কোন অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া কারও মতেই দয়ার পরিপন্থীরূপে গণ্য হয় না।

اَللّٰهُ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَنْعَامَ لِتَرْكَبُوْا مِنْهَا وَمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ﴿٧٩﴾ وَلَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوْا عَلَيْهَا حَاجَةً فِىْ صُدُوْرِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُوْنَ ﴿٨٠﴾ وَيُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ ۖ فَاَىَّ اٰيٰتِ اللّٰهِ تُنْكِرُوْنَ ﴿٨١﴾ اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوْٓا اَكْثَرَ مِنْهُمْ وَاَشَدَّ قُوَّةً وَّاٰثَارًا فِى الْاَرْضِ

فَمَآ اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۝ فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَرِحُوْا بِمَا عِنْدَهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝ فَلَمَّا رَاَوْا بَاْسَنَا قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهٖ مُشْرِكِيْنَ ۝ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ اِيْمَانُهُمْ لَمَّا رَاَوْا بَاْسَنَا ؕ سُنَّتَ اللّٰهِ الَّتِيْ قَدْ خَلَتْ فِيْ عِبَادِهٖ ۚ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكٰفِرُوْنَ ۝

(৭৯) আল্লাহ্ তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন, যাতে কোন কোনটিকে বাহন হিসাবে ব্যবহার কর এবং কোন কোনটিকে ভক্ষণ কর। (৮০) তাতে তোমাদের জন্য অনেক উপকারিতা রয়েছে। আর এজন্যে সৃষ্টি করেছেন ; যাতে সেগুলোতে আরোহণ করে তোমরা তোমাদের অভীষ্ট প্রয়োজন পূর্ণ করতে পার। এগুলোর উপর এবং নৌকার উপর তোমরা বাহিত হও। (৮১) তিনি তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলী দেখান। অতএব তোমরা আল্লাহ্র কোন্ কোন্ নিদর্শনকে অস্বীকার করবে? (৮২) তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি? করলে দেখত, তাদের পূর্ববর্তীদের কি পরিণাম হয়েছে। তারা তাদের চেয়ে সংখ্যায় বেশি এবং শক্তি ও কীর্তিতে অধিক প্রবল ছিল, অতপর তাদের কর্ম তাদেরকে কোন উপকার দেয়নি। (৮৩) তাদের কাছে যখন তাদের রসূলগণ স্পষ্ট প্রমাণাদিসহ আগমন করেছিল, তখন তারা নিজেদের জ্ঞানগরিমার দম্ভ প্রকাশ করেছিল। তারা যে বিষয় নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছিল, তাই তাদেরকে গ্রাস করে নিয়েছিল। (৮৪) তারা যখন আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল, তখন বলল, আমরা এক আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস করলাম এবং যাদেরকে শরীক করতাম, তাদেরকে পরিহার করলাম। (৮৫) অতপর তাদের এ ঈমান তাদের কোন উপকারে আসল না যখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করল। আল্লাহ্র এ নিয়মই পূর্ব থেকে তাঁর বান্দাদের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে। সেক্ষেত্রে কাফিররা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আল্লাহ্ই তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন, যাতে এর কোন কোনটিতে আরোহণ কর এবং কোন কোনটি আহারও কর। এগুলোতে তোমাদের আরও অনেক উপকারিতা রয়েছে (যেমন এদের লোম ও পশম কাজে লাগে,) আর এজন্য সৃষ্টি করেছেন, যাতে সেগুলোতে সওয়ার হয়ে তোমরা তোমাদের অভীষ্ট প্রয়োজন পূর্ণ করতে পার (যেমন, কারও সাথে সাক্ষাতের জন্য যাওয়া, ব্যবসায়ের জন্য যাওয়া ইত্যাদি। সওয়ার হওয়ার জন্য এগুলোরই বিশেষত্ব কি, বরং) এগুলোর উপর এবং

নৌকার উপরও তোমরা বাহিত হও। তিনি তোমাদেরকে (এগুলো ছাড়া আরও কুদরতের) নিদর্শনাবলী দেখান। (সেমতে প্রত্যেক সৃষ্ট বস্তুই তাঁর সৃষ্টির এক নিদর্শন।) অতএব তোমরা আল্লাহ্র কোন্ কোন্ নিদর্শনকে অস্বীকার করবে? (তারা যে প্রমাণাদি সত্ত্বেও তওহীদ অস্বীকার করে, তারা কি শিরকের শাস্তি সম্পর্কে জ্ঞাত নয়?) তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি? করলে দেখত, তাদের পূর্ববর্তী (মুশরিক)-দের কি পরিণাম হয়েছে, অথচ তারা তাদের চেয়ে সংখ্যায়ও বেশি ছিল এবং শক্তিতে ও কীর্তিতেও (যেমন, দালানকোঠা ইত্যাদি) অধিক প্রবল ছিল। অতপর তাদের কোন কর্ম তাদেরকে কোন উপকার দেয়নি (এবং তারা আযাব থেকে বাঁচতে পারেনি) তাদের কাছে যখন তাদের রসূলগণ স্পষ্ট প্রমাণাদিসহ আগমন করেছিল, তখন তারা নিজেদের (জীবিকা উপার্জন সম্পর্কিত) জ্ঞান-গরিমার ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করেছিল। (অর্থাৎ জীবিকাকে লক্ষ্য মনে করে তৎসম্পর্কিত জ্ঞান-গরিমা নিয়েই মগ্ন ছিল এবং পরকাল অস্বীকার করেছিল। যারা পরকাল অন্বেষণ করত, তাদেরকে তারা উন্মাদ বলত এবং শাস্তির কথা শুনলে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত) তারা যে (শাস্তির) বিষয় নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত, তাই (অর্থাৎ সে শাস্তিই) তাদেরকে গ্রাস করে নিল। তারা যখন আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল, তখন বলল, (এখন) আমরা এক আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম এবং যাদেরকে শরীক করতাম, তাদের সবাইকে অস্বীকার করলাম। অতপর তাদের এ ঈমান তাদের কোন উপকারে আসল না, যখন তারা আমার আযাব প্রত্যক্ষ করল। (কারণ, এটা ছিল নিরুপায় অবস্থার ঈমান। বান্দা ইচ্ছাধীন ঈমানে আদিষ্ট।) আল্লাহ্র এ নিয়মই বান্দাদের মধ্যে পূর্ব থেকে প্রচলিত রয়েছে। সেক্ষেত্রে (অর্থাৎ সেখানে ঈমান উপকারী হয় না,) কাফিররা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। (সুতরাং মক্কার মুশরিকদেরও এটা বুঝে ভীত হওয়া উচিত! তাদের বেলায়ও তাই হবে। তখন ক্ষতিপূরণের কোন পথ থাকবে না।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ — অর্থাৎ এই অপরিণামদর্শী কাফিরদের কাছে যখন আল্লাহ্র পয়গম্বরগণ তওহীদ ও ঈমানের স্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে আগমন করলেন তখন তারা নিজেদের জ্ঞান-গরিমাকে, পয়গম্বরগণের জ্ঞান অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ও সত্য মনে করে পয়গম্বরগণের উক্তি খণ্ডনে প্রবৃত্ত হল। কাফিররা যে জ্ঞান নিয়ে গর্বিত ছিল, সেটা হয় তাদের নিরেট মূর্খতা ছিল, অর্থাৎ তারা সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য মনে করে একেই জ্ঞান-গরিমারূপে আখ্যায়িত করেছিল, না হয় এর অর্থ ছিল পার্থিব ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পকর্মের জ্ঞান। এতে বাস্তবিকই তারা পারদর্শী ছিল। গ্রীক দার্শনিকদের 'ইলাহিয়্যাত' সম্পর্কিত অধিকাংশ জ্ঞান ও গবেষণা প্রথমোক্ত নিরেট মূর্খ শ্রেণীর জ্ঞান-গরিমার দৃষ্টান্ত। তাদের এসব জ্ঞানের কোন দলীল নেই। এগুলোকে জ্ঞান বলা জ্ঞানের অবমাননা বৈ নয়। কাফিরদের পার্থিব জ্ঞানের উল্লেখ

কোরআন পাক সূরা রূমে এভাবে করেছে :— يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غَافِلُوْنَ ----অর্থাৎ তারা পার্থিব জীবন ও তার উপকার অর্জনের বিষয়ে তো কিছু জানে-বোঝে ; কিন্তু পরকাল সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ও উদাসীন, যেখানে অনন্তকাল থাকতে হবে এবং যেখানকার সুখ ও দুঃখ চিরস্থায়ী। আলোচ্য আয়াতেও যদি দুনিয়ার বাহ্যিকজ্ঞান অর্থ নেওয়া হয়, তবে উদ্দেশ্য এই যে, তারা যেহেতু কিয়ামত ও পরকাল অস্বীকার করে এবং পরকালের সুখ ও কষ্ট সম্পর্কে অজ্ঞ উদাসীন, তাই নিজেদের বাহ্যিক জ্ঞানে আনন্দিত ও বিভোর হয়ে পয়গম্বরগণের জ্ঞানের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে না।-----(মাযহারী)

فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ اِيْمَانُهُمْ —-অর্থাৎ আযাব সম্মুখে আসার পর তারা ঈমান আনছে। এসময়কার ঈমান আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণীয় ও ধর্তব্য নয়। হাদীসে আছে :

--অর্থাৎ মুমূর্ষু অবস্থা ও মৃত্যু কষ্ট শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার তওবা কবুল করেন। মৃত্যু কষ্ট শুরু হলে পর তওবা করলে কবুল হয় না। এমনিভাবে আসমানী আযাব সামনে এসে যাওয়ার পর কারও তওবা ও ঈমান কবুল হয় না।

اللهم انا نسئلك العفو والعافية والتوبة قبل الموت واليسر والمعافاة عند الموت والمغفرة والرحمة بعد الموت ببركة ال حم وصلى الله تعالى على النبى الكريم -

সূরা হা—মীম সিজদাহ

মক্কায় অবতীর্ণ, ৫৪ আয়াত, ৬ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

حٰمٓ ○ تَنْزِيْلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○ كِتٰبٌ فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ○ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ۚ فَاَعْرَضَ اَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ ○ وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا فِيْٓ اَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُوْنَآ اِلَيْهِ وَفِيْٓ اٰذَانِنَا وَقْرٌ وَّمِنْۢ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ اِنَّنَا عٰمِلُوْنَ ○ قُلْ اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰٓى اِلَيَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَاسْتَقِيْمُوْٓا اِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوْهُ ۗ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِيْنَ ○ الَّذِيْنَ لَا يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ○ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ○

পরম করুণাময় ও অসীম দাতা আল্লাহ্‌র নামে শুরু—

(১) হা—মীম, (২) এটা অবতীর্ণ পরম করুণাময়, দয়ালুর পক্ষ থেকে। (৩) এটা কিতাব, এর আয়াতসমূহ বিশদভাবে বিবৃত আরবী কোরআনরূপে জ্ঞানী লোকদের জন্য, (৪) সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে, অতপর তাদের অধিকাংশই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তারা শুনে না। (৫) তারা বলে, আপনি যে বিষয়ের দিকে আমাদেরকে দাওয়াত দেন, সে বিষয়ে আমাদের অন্তর আবরণে আবৃত, আমাদের কর্ণে আছে বোঝা এবং আমাদের ও আপনার মাঝখানে আছে অন্তরাল। অতএব আপনি আপনার কাজ করুন এবং আমরা আমাদের কাজ করি। (৬) বলুন, আমিও তোমাদের মতই মানুষ, আমার প্রতি ওহী আসে যে, তোমাদের মাবুদ একমাত্র মাবুদ, অতএব

তাঁর দিকেই সোজা হয়ে থাক এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। আর মুশরিকদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ, (৭) যারা যাকাত দেয় না এবং পরকালকে অস্বীকার করে। (৮) নিশ্চয় যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, তাদের জন্য রয়েছে অফুরন্ত পুরস্কার।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হা—মীম (এর অর্থ আল্লাহ্ তা'আলা জানেন।) এই কালাম পরম করুণাময় দয়ালুর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। এটা এমন এক কিতাব, যার আয়াতসমূহ পরিষ্কার বিবৃত অর্থাৎ এমন কোরআন, যা আরবী (ভাষায়) লিপিবদ্ধ (যাতে প্রত্যক্ষভাবে আরবের লোকেরা সহজে বোঝে নেয়), এমন লোকদের জন্য (উপকারী) যারা বিজ্ঞ। (অর্থাৎ যদিও সবাই এর সম্বোধনের পাত্র, কিন্তু উপকৃত তারাই হয়, যারা বুদ্ধি ও জ্ঞানের অধিকারী। কোরআন এমন লোকদের জন্য) সুসংবাদদাতা এবং (অমান্যকারীদের জন্য) সতর্ককারী। অতপর (সকলেরই এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত ছিল; কিন্তু) অধিকাংশ লোক মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তারা শুনেই না। (যখন আপনি তাদেরকে শোনান, তখন) তারা বলে, আপনি যে বিষয়ের দিকে আমাদেরকে দাওয়াত দেন, সে বিষয়ে আমাদের অন্তর আবরণে আবৃত (অর্থাৎ আপনার কথা আমাদের বুঝে আসে না), আমাদের কানে ছিপি আঁটা রয়েছে এবং আমাদের ও আপনার মাঝখানে আছে অন্তরাল। অতএব আপনি আপনার কাজ করুন এবং আমরা আমাদের কাজ করি। (অর্থাৎ আমরা কবুল করব—এরূপ আশা করবেন না। আমরা আমাদের কর্মপন্থা ত্যাগ করব না।) আপনি বলে দিন, (তোমাদেরকে ঈমান আনতে বাধ্য করার শক্তি আমার নেই, কেননা,) আমিও তোমাদেরই মত মানুষ, (আল্লাহ্ নই যে, তোমাদের অন্তর পাল্টে দেব। তবে আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে এই স্বাতন্ত্র্য দান করেছেন যে,) আমার প্রতি ওহী আসে যে, তোমাদের মাবুদ একমাত্র মাবুদ। (চিন্তা করলে প্রত্যেকেই এ ওহীর সত্যতা ও যৌক্তিকতা বুঝতে পারে। মু'জিযার মাধ্যমে আমার নবুয়ত ও ওহী প্রমাণিত হওয়ার পর তা মেনে নেওয়া প্রত্যেকের উপর ফরয। তোমাদের না মানার কোন কারণ নেই। অবশ্যই মেনে নাও।) অতএব তাঁর (সত্য মাবুদের) দিকেই সোজা হয়ে থাক (অর্থাৎ অন্য কারও ইবাদতের দিকে মনোযোগ দিও না) এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। (অর্থাৎ অতীত শিরক থেকে তওবা কর এবং ভুলের জন্য ক্ষমা চাও) আর মুশরিকদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ, যারা (নবুয়তের প্রমাণাদি দেখা এবং তওহীদের প্রমাণাদি শোনা সত্ত্বেও নিজেদের মিথ্যা ধর্মমত পরিত্যাগ করে না) এবং যাকাত প্রদান করে না এবং তারা পরকালকে অস্বীকার করে। (তাদের বিপরীতে) যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে তাদের জন্য (পরকালে) অফুরন্ত পুরস্কার রয়েছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পারস্পরিক স্বাতন্ত্র্যের জন্যে 'আল-হা-মীম' অথবা 'হাওয়ামীম' নামক সাতটি সূরার নামের সাথে আরও কিছু শব্দ সংযোজন করা হয়। উদাহরণত সূরা মু'মিনের হামীমকে 'হা-মীম আল মু'মিন' এবং আলোচ্য সূরার হা-মীমকে 'হা---মীম আস্-সিজদাহ' অথবা হা-মীম ফুসসিলাত'ও বলা হয়। এ সূরার এ দু'টি নাম সুবিদিত।

এ সূরার প্রথম সম্বোধনের পাত্র আরবের কোরাইশ গোত্র, তাদের সামনে কোরআন নাযিল হয়েছে এবং তাদের ভাষায় নাযিল হয়েছে। তারা কোরআনের অলৌকিকতা প্রত্যক্ষ করেছে এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-র অসংখ্য মু'জিযা দেখেছে। এতদসত্ত্বেও তারা কোরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং হৃদয়ঙ্গম করা দূরের কথা শ্রবণ করাও পছন্দ করেনি। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র শুভেচ্ছামূলক উপদেশের জওয়াবে অবশেষে তারা বলে দিয়েছে, আপনার কথাবার্তা আমাদের বুঝে আসে না, আমাদের অন্তর এগুলো কবূল করে না এবং আমাদের কানও এগুলো শুনতে প্রস্তুত নয়। আপনার ও আমাদের মাঝখানে অন্তরাল আছে। সুতরাং এখন আপনি আপনার কাজ করুন এবং আমাদেরকে আমাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দিন।

সূরার প্রথম পাঁচ আয়াতের ভাবার্থ তাই। এসব আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বিশেষভাবে কোরাইশকে উদ্দেশ করে বলেছেন, কোরআন আরবী ভাষায় তোমাদের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে, যাতে এর বিষয়বস্তু বুঝতে তোমাদের বেগ পেতে না হয়। এতদসঙ্গে কোরআনের তিনটি বিশেষণ উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম فُصِّلَتْ آيَاتُهُ--تفصيل এর আসল অর্থ বিষয়বস্তুকে পৃথক পৃথকভাবে বিবৃত করা, এখানে উদ্দেশ্য খুলে খুলে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা---পৃথকভাবে হোক কিংবা একত্রে। কোরআন পাকের আয়াত-সমূহে বিধানাবলী, কাহিনী, বিশ্বাস, মিথ্যাপন্থীদের খণ্ডন ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়বস্তু আলাদা আলাদাও বর্ণিত হয়েছে এবং প্রত্যেক বিষয়বস্তুকে উদাহরণ দ্বারা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। কোরআন পাকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিশেষণ সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী। অর্থাৎ যারা মেনে চলে, তাদেরকে চিরস্থায়ী সুখের সুসংবাদ এবং যারা মেনে চলে না, তাদেরকে অনন্ত আযাব সম্পর্কে সতর্ক করে।

এসব বিশেষণ বর্ণনা করে পরিশেষে لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ বলা হয়েছে। অর্থাৎ কোরআন পাকের আরবী ভাষায় নাযিল হওয়া, স্পষ্ট ও পরিষ্কার হওয়া এবং সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হওয়া এসব বিষয় তাদের জন্য উপকারী হতে পারে, যারা চিন্তা-ভাবনা ও হৃদয়ঙ্গম করার ইচ্ছা করে। কিন্তু আরব কোরাইশরা এসব সত্ত্বেও কোরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে---হৃদয়ঙ্গম করা দূরের কথা, শোনাও পছন্দ করেনি। فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ ---আয়াতে তাই উল্লিখিত হয়েছে।

রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সামনে কাফিরদের একটি প্রস্তাব ঃ আলোচ্য সূরায় কোরাইশ কাফিরদেরকে প্রত্যক্ষভাবে সম্বোধন করা হয়েছে। তারা কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার পর প্রাথমিক যুগে বলপূর্বক ইসলামী আন্দোলনকে নস্যাৎ করার এবং রসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর প্রতি বিশ্বাসীদেরকে নানাভাবে নির্যাতনের মাধ্যমে ভীত-সন্ত্রস্ত করার প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। কিন্তু ইসলাম তাদের মর্জির বিপরীতে দিন দিন সমৃদ্ধ ও শক্তিশালীই হয়েছে। প্রথমে উমর ইবনে খাত্তাবের ন্যায় অসমসাহসী বীর পুরুষ ইসলামে দাখিল হন। অতপর সর্বজন স্বীকৃত কোরাইশ সরদার হামযা মুসলমান হয়ে যান। ফলে কোরাইশ কাফিররা ভীতি প্রদর্শনের পথ পরিত্যাগ করে প্রলোভন ও প্ররোচনার মাধ্যমে ইসলামের অগ্রযাত্রা ব্যাহত করার কৌশল চিন্তা করতে শুরু করে। এমনি ধরনের এক ঘটনা হাফেয ইবনে কাসীর মসনদে বাযযার, আবূ ইয়া'লা ও বগভীর রেওয়ায়েত থেকে উদ্ধৃত করেছেন। এসব রেওয়ায়েতে কিছু কিছু পার্থক্য থাকায় ইবনে কাসীর বগভীর রেওয়ায়েতকে সর্বাধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ ও বাস্তবের নিকটবর্তী সাব্যস্ত করেছেন। এ সবের পর মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকের কিতাব 'আসসীরত' থেকে ঘটনাটি উদ্ধৃত করে একে সব রেওয়ায়েতের উপর অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তাই এ স্থলে ঘটনাটি ইবনে ইসহাকের বর্ণনা অনুযায়ী উদ্ধৃত করা হচ্ছে।

ইবনে ইসহাকের বর্ণনামতে মোহাম্মদ ইবনে কা'ব কুরাযী বলেন, আমার কাছে রেওয়ায়েত পৌঁছেছে যে, কোরাইশ সরদার ওতবা ইবনে রবীয়া একদিন একদল কোরাইশসহ মসজিদে হারামে উপবিষ্ট ছিল। অপরদিকে রসূলুল্লাহ্ (সা) মসজিদের এক কোণে একাকী বসেছিলেন। ওতবা তার সঙ্গীদেরকে বলল, তোমরা যদি মত দাও, তবে আমি মুহাম্মদের সাথে কথাবার্তা বলি। আমি তার সামনে কিছু লোভ-নীয় বস্তু পেশ করব। যদি সে কবূল করে, তবে আমরা সেসব বস্তু তাকে দিয়ে দেব—যাতে সে আমাদের ধর্মের বিরুদ্ধে প্রচারাভিযান থেকে নিবৃত্ত হয়। এটা তখনকার ঘটনা, যখন হযরত হামযা (রা) মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন এবং ইসলামের শক্তি দিন দিন বেড়ে চলছিল। ওতবার সঙ্গীরা সমস্বরে বলে উঠল, হে আবুল ওলীদ, (ওতবার ডাক নাম) আপনি অবশ্যই তার সাথে আলাপ করুন।

ওতবা সেখান থেকে উঠে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে গেল এবং কথাবার্তা শুরু করল ঃ প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র! আপনি জানেন, কোরাইশ বংশে আপনার অসাধারণ মর্যাদা ও সম্মান রয়েছে। আপনার বংশ সুদূর বিস্তৃত এবং আমরা সবাই আপনার কাছে সম্মানার্হ। কিন্তু আপনি জাতিকে এক গুরুতর সংকটে জড়িত করে দিয়েছেন। আপনার আনীত দাওয়াত জাতিকে বিভক্ত করে দিয়েছে, তাদেরকে বোকা ঠাওরিয়েছে, তাদের উপাস্য দেবতা ও ধর্মের গায়ে কলঙ্ক আরোপ করেছে এবং তাদের পূর্বপুরুষ-দেরকে কাফির আখ্যায়িত করেছে। এখন আপনি আমার কথা শুনুন। আমি কয়েকটি বিষয় আপনার সামনে পেশ করছি, যাতে আপনি কোন একটি পছন্দ করে নেন। রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, আবুল ওলীদ, বলুন আপনি কি বলতে চান। আমি শুনব।

আবুল ওলীদ বলল ঃ ভ্রাতুষ্পুত্র! যদি আপনার পরিচালিত আন্দোলনের উদ্দেশ্য ধনসম্পদ অর্জন করা হয়, তবে আমরা ওয়াদা করছি, আপনাকে কোরাইশ গোত্রের সেরা বিত্তশালী করে দেব। আর যদি শাসনক্ষমতা অর্জন করা লক্ষ্য হয়, তবে আমরা আপনাকে কোরাইশের প্রধান সরদার মেনে নেব এবং আপনার আদেশ ব্যতীত কোন কাজ করব না। আপনি রাজত্ব চাইলে আমরা আপনাকে রাজারূপেও স্বীকৃতি দেব। পক্ষান্তরে যদি কোন জিন অথবা শয়তান আপনাকে দিয়ে এসব কাজ করায় বলে আপনি মনে করেন এবং আপনি সেটাকে বিতাড়িত করতে অক্ষম হয়ে থাকেন তবে আমরা আপনার জন্য চিকিৎসক ডেকে আনব; সে আপনাকে এই কষ্ট থেকে উদ্ধার করবে। এর যাবতীয় ব্যয়ভার আমরাই বহন করব। কেননা, আমরা জানি, মাঝে মাঝে জিন অথবা শয়তান মানুষকে কাবু করে ফেলে এবং চিকিৎসার ফলে তা সেরে যায়।

ওতবার এই দীর্ঘ বক্তৃতা শুনে রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ আবুল ওলীদ! আপনার বক্তব্য শেষ হয়েছে কি? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, এবার আমার কথা শুনুন। সে বলল, অবশ্যই শুনব।

রসূলুল্লাহ্ (সা) নিজের পক্ষ থেকে কোন জওয়াব দেয়ার পরিবর্তে আলোচ্য সূরা ফুসসিলাত তিলাওয়াত করতে শুরু করে দিলেন। বাযযার ও বগভীর রেওয়ায়েতে আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) তিলাওয়াত করতে করতে যখন فَاِنْ اَعْرَضُوْا فَقُلْ اَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَّثَمُوْدَ—পর্যন্ত পেঁৗছলেন, তখন ওতবা তাঁর মুখে হাত রেখে দিল এবং বংশ ও আত্মীয়তার কসম দিয়ে বলল, আমার প্রতি দয়া করুন, আর পাঠ করবেন না। ইবনে ইসহাকের রেওয়ায়েতে আছে, রসূলুল্লাহ্ (সা) তিলাওয়াত শুরু করলে ওতবা চুপচাপ শুনতে থাকে এবং হাতের পিঠ পিছনে লাগিয়ে গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনে। রসূলুল্লাহ্ (সা) সিজদার আয়াতে পৌঁছে সিজদা করলেন এবং ওতবাকে বললেন ঃ আবুল ওলীদ! আপনি যা শুনবার শুনলেন। এখন আপনি যা ইচ্ছা করতে পারেন। ওতবা সেখান থেকে উঠে তার লোকজনের দিকে চলল। তারা দূর থেকে ওতবাকে দেখে পরস্পর বলতে লাগল, আল্লাহ্র কসম, আবুল ওলীদের মুখমণ্ডল বিকৃত দেখা যাচ্ছে। সে যে মুখ নিয়ে এখান থেকে গিয়েছিল, সে মুখ আর নেই। ওতবা মজলিসে পেঁৗছলে সবাই বলল, বলুন, কি খবর আনলেন। ওতবা বলল, খবর এই ঃ

اني سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط والله ما هو بالسحر ولا بالشعر ولا بالكهانة يا معشر قريش اطيعوني واجعلوها لي خلوا بين الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت

بنا ء فان تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم و ان يظهر على العرب فملكه ملككم و عزه عزكم و كنتم اسعد الناس به -

অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কসম! আমি এমন কালাম শুনেছি, যা জীবনে কখনও শুনিনি। আল্লাহ্‌র কসম, সেটা জাদু নয়, কবিতা নয় এবং অতীন্দ্রিয়বাদীদের শয়তান থেকে অর্জিত কথাও নয়। হে কোরাইশ সম্প্রদায়, তোমরা আমার কথা মেনে নাও এবং ব্যাপারটি আমার কাছে সোপর্দ কর। আমার মতে তোমরা তার মুকাবিলা ও তাঁকে নির্যাতন করা থেকে সরে আস এবং তাঁকে তাঁর কাজ করতে দাও। কেননা, তাঁর এই কালামের এক বিশেষ পরিণতি প্রকাশ পাবেই। তোমরা এখন অপেক্ষা কর। অবশিষ্ট আরবদের আচরণ দেখে যাও। যদি তারাই কোরাইশের সহযোগিতা ব্যতীত তাঁকে পরাভূত করে ফেলে, তবে বিনা শ্রমেই তোমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়ে যাবে। আর সে যদি সবার উপর প্রবল হয়ে যায়, তবে তার রাজত্ব হবে তোমাদেরই রাজত্ব ; তার ইয্‌যত হবে তোমাদেরই ইয্‌যত। তখন তোমরাই হবে তার সাফল্যের অংশীদার।

তার সঙ্গীরা তার একথা শুনে বলল, আবুল ওলীদ, তোমাকে তো মুহাম্মদ কথা দিয়ে জাদু করেছে। ওতবা বলল, আমারও অভিমত তাই। এখন তোমাদের যা মন চায়, তাই কর।

وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ —এ ক্ষেত্রে কাফিরদের তিনটি উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে। এক. আমাদের অন্তরে পর্দা পড়ে আছে, ফলে আমরা আপনার কথা বুঝতে পারি না। দুই. আমাদের কান বধির, ফলে আপনার কথা আমাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করে না এবং তিন. আমাদের ও আপনার মাঝখানে অন্তরাল রয়েছে। কোরআন এসব উক্তি নিন্দার ছলে উদ্ধৃত করেছে। ফলে এসব উক্তি ভ্রান্ত মনে হয়। কিন্তু অন্যত্র কোরআন নিজেই তাদের এরূপ অবস্থা বর্ণনা করেছে। সূরা আন'আমের আয়াতে আছে ঃ — وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا এমনি ধরনের আয়াত সূরা বনী-ইসরাইল ও সূরা কাহ্‌ফেও রয়েছে।

এর জওয়াব এই যে, কাফিরদের এরূপ বলার উদ্দেশ্য ছিল একথা বোঝানো যে, আমরা অক্ষম ও অপারক, আমাদের অন্তরে আবরণ, কানে ছিপি এবং আপনার ও আমাদের মধ্যে অন্তরাল আছে। এমতাবস্থায় আমরা কিরূপে আপনার কথা শুনব ও মানব? কোরআন তাদের অবস্থা বর্ণনা করে তাদেরকে অক্ষম ও অপারক সাব্যস্ত করেনি, বরং এর সারমর্ম এই যে, তাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ শ্রবণ করার ও বোঝাবার পূর্ণ যোগ্যতা ছিল, কিন্তু তারা যখন সেদিকে কর্ণপাত করল না এবং বোঝবার ইচ্ছাও করল না, তখন শাস্তিস্বরূপ তাদের উপর অমনোযোগীতা ও মূর্খতা চাপিয়ে

দেওয়া হয়েছে, তাও ইচ্ছা শক্তি ছিনিয়ে নিয়ে নয়, বরং এখনও তারা ইচ্ছা করলে শোনার ও বোঝার যোগ্যতা ফিরে আসবে।----(বয়ানুল কোরআন)

কাফিরদের অস্বীকার ও ঠাট্টা-বিদ্রূপের পয়গম্বরসুলভ জওয়াব ঃ কাফিররা তাদের অন্তরের উপর আবরণ ও কানে ছিপি থাকার কথা স্বীকার করে একথা বোঝায়নি যে, তারা বাস্তাবকই নির্বোধ ও বধির, বরং এটা ছিল এক প্রকার ঠাট্টা। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এই পাশবিক ঠাট্টা-বিদ্রূপের এ জওয়াব শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, আপনি তাদের মুকাবিলায় কোন কঠোর কথা বলবেন না, বরং বিনয়ের সাথে বলুন, আমি আল্লাহ্ নই যে, যা ইচ্ছা তাই করতে পারব, বরং আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ। পার্থক্য এই যে, আল্লাহ্ ওহী প্রেরণ করে আমাকে সৎপথ প্রদর্শন করেছেন এবং ওহীর সমর্থনে বিভিন্ন মু'জিযা দান করেছেন। এর ফলে তোমাদের উচিত ছিল আমার প্রতি বিশ্বাসী হওয়া। এখন আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি তোমরা ইবাদত ও আনুগত্যে একমাত্র আল্লাহ্র অভিমুখী হয়ে যাও এবং অতীত গোনাহের জন্য তওবা করে নাও।

শেষ বাক্যে সুসংবাদদান ও সতর্ককরণের উভয় দিক তাদের সামনে উপস্থাপন করে বলা হয়েছে, মুশরিকদের জন্য রয়েছে চরম দুর্ভোগ এবং মু'মিনদের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী সওয়াব। মুশরিকদের দুর্ভোগের কারণ এই উল্লেখ করা হয়েছে যে, لَا يُؤْتُونَ الزَّكٰوةَ----অর্থাৎ তারা যাকাত প্রদান করে না। এতে কয়েকটি প্রশ্ন দেখা দেয়। প্রথম এই যে, এই আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ, আর যাকাত ফরয হওয়ার আদেশ মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। অতএব ফরয হওয়ার পূর্বেই কাফিরদেরকে যাকাত প্রদান না করার অভিযোগে অভিযুক্ত করা কিরূপে সঙ্গত হয়েছে?

ইবনে-কাসীর এর জওয়াবে বলেন যে, আসলে যাকাত প্রাথমিক যুগেই নামাযের সাথে ফরয হয়ে গিয়েছিল। সূরা মুয্যাম্মিলের আয়াতে এর উল্লেখ আছে। কিন্তু নিসাবের বিবরণ এবং আদায় করার ব্যবস্থাপনা মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। কাজেই একথা বলা ঠিক নয় যে, মক্কায় যাকাত ফরয ছিল না।

কাফিররা ইসলামের শাখাগত কর্মসমূহ পালনে আদিষ্ট কি না ঃ দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, অনেক ফিকাহবিদের মতে কাফিররা ইসলামের শাখাগত কর্মসমূহ পালনে আদিষ্ট নয়; অর্থাৎ নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাতের বিধানাবলী তাদের প্রতি প্রযোজ্য হয় না। তাদের প্রতি আরোপিত আদেশ এই যে, তারা প্রথমে ঈমান গ্রহণ করুক। ঈমানের পরে ফরয কর্মসমূহের বিধান আসবে। অতএব তাদের উপর যখন যাকাতের আদেশ আরোপিত নয়, তখন এটা না করার কারণে তারা শাস্তির পাত্র হবে কেন?

জওয়াব এই যে, অনেক ফিকাহবিদের মতে কাফিররাও শাখাগত কর্মসমূহ পালনে আদিষ্ট। তাঁদের মতে আয়াতে কোন প্রশ্নই দেখা দেয় না। যারা কাফিরদেরকে

আদিষ্ট বলে গণ্য করেন না, তারা বলতে পারেন যে, আয়াতে যাকাত না দেয়ার কারণে নিন্দা করা হয়নি; বরং তাদের যাকাত না দেওয়ার ভিত্তি ছিল কুফর এবং যাকাত না দেওয়া কুফরেরই আলামত ছিল। তাই তাদেরকে শাসানোর সারমর্ম এই যে, তোমরা মু'মিন হলে যাকাত প্রদান করতে। তোমাদের দোষ মু'মিন না হওয়া। —(বয়ানুল কোরআন)

তৃতীয় প্রশ্ন এই যে, ইসলামী বিধানাবলীর মধ্যে নামায সর্বাগ্রে। এর উল্লেখ না করে বিশেষভাবে যাকাতের উল্লেখ করার রহস্য কি? কুরতুবী প্রমুখ এর জওয়াবে বলেন যে, কোরাইশ ছিল ধনাঢ্য সম্প্রদায়। দান-খয়রাত ও গরীবের সাহায্য করা তাদের বিশেষ গুণ ছিল। কিন্তু যারা মুসলমান হয়ে যেত, কোরাইশরা তাদেরকে পারিবারিক ও সামাজিক সাহায্য থেকেও বঞ্চিত করত। এর নিন্দা করার জন্যেই বিশেষভাবে যাকাতের উল্লেখ করা হয়েছে।

لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ—مَمْنُوْن শব্দের অর্থ বিচ্ছিন্ন। উদ্দেশ্য এই যে, মু'মিন ও সৎকর্মীদেরকে পরকালে স্থায়ী ও নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার দেওয়া হবে। কোন কোন তফসীরবিদ এর অর্থ এই করেছেন যে, মু'মিন ব্যক্তির অভ্যস্ত আমল কোন সময় কোন অসুস্থতা, সফর কিংবা অন্য কোন ওযরবশত তরক হয়ে গেলেও সে আমলের পুরস্কার ব্যাহত হয় না; বরং আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাগণকে আদেশ করেন, আমার বান্দা সুস্থ অবস্থায় অথবা অবসর সময়ে যে আমল নিয়মিত করত, তার ওযর অবস্থায় সে আমল না করা সত্ত্বেও তার আমলনামায় তা লিখে দাও। এ বিষয়বস্তুর হাদীস সহীহ্ বুখারীতে হযরত আবূ মূসা আশ'আরী থেকে, শরহুস্-সুন্নায় হযরত ইবনে ওমর ও আনাস (রা) থেকে এবং রাযীনে আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে।—(মাযহারী)

قُلْ اَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُوْنَ بِالَّذِىْ خَلَقَ الْاَرْضَ فِىْ يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُوْنَ
لَهٗٓ اَنْدَادًا ۭ ذٰلِكَ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِىَ مِنْ
فَوْقِهَا وَبٰرَكَ فِيْهَا وَقَدَّرَ فِيْهَآ اَقْوَاتَهَا فِىْٓ اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ ۭ
سَوَاۗءً لِّلسَّاۗىِٕلِيْنَ ۝ ثُمَّ اسْتَوٰٓى اِلَى السَّمَاۗءِ وَهِىَ دُخَانٌ فَقَالَ
لَهَا وَلِلْاَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا ۭ قَالَتَآ اَتَيْنَا طَاۗىِٕعِيْنَ ۝
فَقَضٰىهُنَّ سَبْعَ سَمٰوَاتٍ فِىْ يَوْمَيْنِ وَاَوْحٰى فِىْ كُلِّ سَمَاۗءٍ

أَمْرَهَا ۚ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ ۖ وَحِفْظًا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿١٢﴾

(৯) বলুন, তোমরা কি সে সত্তাকে অস্বীকার কর যিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন দু'দিনে এবং তোমরা কি তাঁর সমকক্ষ স্থির কর? তিনি তো সমগ্র বিশ্বের পালনকর্তা। (১০) তিনি পৃথিবীর উপরিভাগে অটল পর্বতমালা স্থাপন করেছেন, তাতে কল্যাণ নিহিত রেখেছেন এবং চার দিনের মধ্যে তাতে তার খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন--পূর্ণ হল জিজ্ঞাসুদের জন্য। (১১) অতপর তিনি আকাশের দিকে মনোযোগ দিলেন যা ছিল ধূম্রকুঞ্জ, অতপর তিনি তাকে ও পৃথিবীকে বললেন, তোমরা উভয়ে আস ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়। তারা বলল, আমরা স্বেচ্ছায় আসলাম। (১২) অতপর তিনি আকাশ মণ্ডলীকে দু'দিনে সপ্ত আকাশ করে দিলেন এবং প্রত্যেক আকাশে তার আদেশ প্রেরণ করলেন। আমি নিকটবর্তী আকাশকে প্রদীপমালা দ্বারা সুশোভিত ও সংরক্ষিত করেছি। এটা পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহ্‌র ব্যবস্থাপনা।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি (তাদেরকে) বলুন, তোমরা কি সে আল্লাহ্‌কে অস্বীকার কর, যিনি পৃথিবীকে (সুদূর বিস্তৃতি সত্ত্বেও) দু'দিনে (অর্থাৎ দু'দিনের সমপরিমাণ সময়ে) সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা কি তাঁর সমকক্ষ স্থির কর? তিনিই তো (আল্লাহ্ যার কুদরত জানা গেল,) সমগ্র বিশ্বের পালনকর্তা। তিনি পৃথিবীর উপরিভাগে পর্বত-মালা সৃষ্টি করেছেন, তাতে (অর্থাৎ পৃথিবীতে) কল্যাণ নিহিত রেখেছেন (যেমন উদ্ভিদ, জীবজন্তু ইত্যাদি) এবং তাতে (বসবাসকারীদের) খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন। (যেমন দেখা যায়, প্রত্যেক ভূখণ্ডের অধিবাসীদের উপযুক্ত আলাদা আলাদা খাদ্য রয়েছে। অর্থাৎ পৃথিবীতে সর্বপ্রকার খাদ্য ও ফলমূল সৃষ্টি করেছেন---কোথাও এক প্রকার; কোথাও অন্য প্রকার। এর ধারা সর্বদা অব্যাহত রয়েছে। এসব কাজ) চার দিনে (হয়েছে। দু'দিনে পৃথিবী এবং দু'দিনে পর্বত ইত্যাদি। এটা গণনায়) পূর্ণ হয়েছে জিজ্ঞাসুদের জন্য। (অর্থাৎ তাদের জন্য, সারা জগৎ সৃষ্টির অবস্থা ও দিনের পরিমাণ সম্পর্কে আপনাকে যারা জিজ্ঞাসা করে। ইহুদীরা এ জিজ্ঞাসা করেছিল।) অতপর তিনি (এগুলো সৃষ্টি করে) আকাশের দিকে (অর্থাৎ আকাশ নির্মাণের দিকে) মনোনিবেশ করলেন, যা ছিল ধূম্রকুঞ্জ (অর্থাৎ আকাশের উপকরণ ধূম্রের আকারে বিদ্যমান ছিল।) অতপর তিনি তাকে ও পৃথিবীকে বললেন, তোমরা উভয়ে (অর্থাৎ উভয়কে আমার অনুগত্যে অবশ্যই আসতে হবে, এখন তোমাদের ইচ্ছা,) খুশীতে আস অথবা অখুশীতে। উদ্দেশ্য এই যে, আমার অবধারিত বিধিবিধান তোমাদের মধ্যে প্রয়োগ হবে। তোমরা চাও বা না চাও, তা হবেই হবে। কিন্তু

তোমাদেরকে প্রদত্ত চেতনা ও অনুভূতির দিক দিয়ে তোমরা আমার বিধানাবলীকে আনন্দেও গ্রহণ করতে পার---সর্বাবস্থায় তা প্রয়োগ হবে। উদাহরণত মানুষের জন্য রোগ-ব্যাধি ও মৃত্যু একটি অবধারিত ব্যাপার। মানুষ একে এড়াতে পারে না। কিন্তু কোন কোন জ্ঞানী ব্যক্তি একে হাসিখুশী কবুল করে সবর ও শোকরের উপকারিতা অর্জন করে এবং কেউ কেউ নারাজ ও অসন্তুষ্ট থাকে---তিলে তিলে মৃত্যুবরণ করে। এখন তোমরা দেখ আমার বিধানাবলীতে সন্তুষ্ট থাকবে, না অসন্তুষ্ট? অবধারিত বিধানাবলী বলে আকাশ ও পৃথিবীর সেসব পরিবর্তন বোঝানো হয়েছে, যা কিয়ামত পর্যন্ত সংঘটিত হওয়ার ছিল। যেমন, ধূম্রকুঞ্জের আকারে বিদ্যমান আকাশের সপ্ত আকাশে পরিণত হওয়া একটি অবধারিত বিধান ছিল।) তারা বলল, আমরা সানন্দে (এ বিধানাবলীর জন্য) হাযির রয়েছি। অতপর তিনি আকাশকে দু'দিনে সপ্ত আকাশে পরিণত করলেন। (সপ্ত আকাশকেই ফেরেশতাদের দ্বারা আবাদ ও পূর্ণ করে দেওয়া হয়েছিল। তাই) প্রত্যেক আকাশে তার উপযুক্ত আদেশ (ফেরেশতাদের কাছে) প্রেরণ করলেন। (অর্থাৎ ফেরেশতাকে তার কাজ বলে দিলেন।) আমি নিকটবর্তী আকাশকে তারকারাজি দ্বারা সুশোভিত করেছি এবং (শয়তানকে আকাশের সংবাদ চুরি করা থেকে নিবৃত্ত করার জন্য) তাকে সংরক্ষিত করেছি। এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহ্র ব্যবস্থাপনা।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহে মুশরিকদেরকে তাদের শিরক ও কুফরের কারণে এক সাবলীল ভঙ্গিতে হুঁশিয়ার করা উদ্দেশ্য। এতে আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টিগুণ তথা বিরাটকায় আকাশ ও পৃথিবীকে অসংখ্য রহস্যের উপর ভিত্তিশীল করে সৃষ্টি করার বিশদ বিবরণ দিয়ে তাদেরকে এই বলে শাসানো হয়েছে যে, তোমরা এমন নির্বোধ যে, এমন মহান স্রষ্টা ও সর্বশক্তিমানের সাথেও অপরকে শরীক সাব্যস্ত কর? এমনি ধরনের হুঁশিয়ারি ও বিবরণ সূরা বাকারার তৃতীয় রুকূতে এভাবে উল্লিখিত হয়েছে:

كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ
ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ثُمَّ اسْتَوٰى
اِلَى السَّمَآءِ فَسَوّٰهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

সূরা বাকারার এসব আয়াতে সৃষ্টির দিন নির্দিষ্ট করা হয়নি এবং বিবরণও দেয়া হয়নি। আলোচ্য আয়াতসমূহে এগুলোও উল্লেখ করা হয়েছে।

আকাশ ও পৃথিবী কোন্‌টির পর কোন্‌টি এবং কোন্ কোন্ দিনে সৃজিত হয়েছে ঃ বয়ানুল কোরআনে হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র) বলেন, আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির বিষয় এমনিতে কোরআন পাকে সংক্ষেপে ও বিস্তারিতভাবে বহু জায়গায় বিবৃত হয়েছে, কিন্তু কোন্‌টির পরে কোন্‌টি সৃজিত হয়েছে, এর উল্লেখ সম্ভবত মাত্র তিন আয়াতে করা হয়েছে---এক. হা-মীম সিজদার আলোচ্য আয়াত, দুই. সূরা বাকারার উল্লিখিত আয়াত এবং তিন. সূরা নাযি'আতের নিম্নোক্ত আয়াত ঃ

ءَ اَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمِ السَّمَاءُ بَنٰهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوّٰهَا وَاَغْطَشَ لَيْلَهَا وَاَخْرَجَ ضُحٰهَا وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰهَا اَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعٰهَا وَالْجِبَالَ اَرْسٰهَا ـ

বাহ্য দৃষ্টিতে এসব বিষয়বস্তুর মধ্যে কিছু বিরোধও দেখা যায়। কেননা, সূরা বাকারা ও সূরা হা-মীম সিজদার আয়াত থেকে জানা যায় যে, আকাশের পূর্বে পৃথিবী সৃজিত হয়েছে এবং সূরা নাযি'আতের আয়াত থেকে এর বিপরীতে জানা যায় যে, আকাশ সৃজিত হওয়ার পরে পৃথিবী সৃজিত হয়েছে। সবগুলো আয়াত নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে আমার মনে হয় যে, প্রথমে পৃথিবীর উপকরণ সৃজিত হয়েছে। এমতাবস্থায়ই ধূম্র-কুঞ্জের আকারে আকাশের উপকরণ নির্মিত হয়েছে। এরপর পৃথিবীকে বর্তমান আকারে বিস্তৃত করা হয়েছে এবং এতে পর্বতমালা, বৃক্ষ ইত্যাদি সৃষ্টি করা হয়েছে। এরপর আকাশের তরল ধূম্রকুঞ্জের উপকরণকে সপ্ত আকাশে পরিণত করা হয়েছে। আশা করি সবগুলো আয়াতই এই বক্তব্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। বাকি প্রকৃত অবস্থা আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন।---(বয়ানুল কোরআন---সূরা বাকারা)

সহীহ্ বুখারীতে এ আয়াতের অধীনে হযরত ইবনে আব্বাস থেকে কতিপয় প্রশ্ন ও উত্তর বর্ণিত হয়েছে। তাতে হযরত ইবনে আব্বাস এ আয়াতের যে ব্যাখ্যা করেছেন, তাই মাওলানা থানভী (র) উপরে বর্ণনা করেছেন। ইবনে কাসীরে উদ্ধৃত এর ভাষা নিম্নরূপ ঃ

فسواهن فى يومين اخرين ثم دحى الارض ودحيها ان اخرج منها الماء والمرعى وخلق الجبال والرمال والجماد والاكام وما بينهما فى يومين اخرين ـ فذلك قول الله تعالى دحاها ـ

ইবনে কাসীর ইবনে জরীরের বরাত দিয়ে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে এ রেওয়ায়েতও উদ্ধৃত করেছেন ঃ

মদীনার ইহুদীরা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নিকট উপস্থিত হয়ে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীকে রোববার ও সোমবার, পর্বতমালা ও খনিজ দ্রব্যাদি মঙ্গলবার, উদ্ভিদ, ঝরনা, অন্যান্য বস্তুনিচয় ও জনশূন্য প্রান্তর বুধবার দিন সৃষ্টি করেন। এতে মোট চারদিন সময় লাগে। আলোচ্য سَوَاءً لِّلسَّائِلِينَ পর্যন্ত আয়াতে তাই বলা হয়েছে। অতপর বললেন, এবং বৃহস্পতিবার আকাশ সৃষ্টি করেন। আর শুক্রবার তারকারাজি, সূর্য, চন্দ্র ও ফেরেশতা সৃজিত হয়। শুক্রবার দিনের তিন প্রহর বাকি থাকতে এসব কাজ সমাপ্ত হয়। এই প্রহরত্রয়ের দ্বিতীয় প্রহরে সম্ভাব্য বিপদাপদ সৃষ্টি করা হয় এবং তৃতীয় প্রহরে আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হয়। তাঁকে জান্নাতে স্থান দেওয়া হয় এবং ইবলীসকে আদেশ করা হয় আদমের উদ্দেশে সিজদা করতে। ইবলীস অস্বীকার করলে তাকে জান্নাত থেকে বহিষ্কার করা হয়। এসব কাজ তৃতীয় প্রহরের শেষ পর্যন্ত সমাপ্তি লাভ করে।---(ইবনে কাসীর)

ইবনে কাসীরের মতে হাদীসটি غَرِيب (অর্থাৎ তুলনামূলকভাবে দুর্বল সূত্র পরম্পরায় বর্ণিত।)

সহীহ্ মুসলিমে বর্ণিত হযরত আবূ হুরায়রার বাচনিক এক রেওয়ায়েতে জগৎ সৃষ্টির শুরু শনিবার থেকে ব্যক্ত হয়েছে। এই হিসাব মতে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি সাত দিনে হয়েছে বলে জানা যায়। কিন্তু কোরআনের আয়াত থেকে পরিষ্কারভাবে জানা যায় যে, এই সৃষ্টি কাজ ছয় দিনে হয়েছে। এক আয়াতে আছে ঃ

وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَّمَا مَسَّنَا

مِن لُّغُوبٍ ---অর্থাৎ আমি আকাশ, পৃথিবী ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেছি এবং আমাকে কোন ক্লান্তি স্পর্শ করেনি। এ কারণে হাদীসবিদগণ উপরোক্ত রেওয়ায়েতটিকে অগ্রাহ্য বলে সাব্যস্ত করেছেন। কেউ কেউ রেওয়ায়েতটিকে কা'বে আহবারের উক্তি বলেও অভিহিত করেছেন।---(ইবনে কাসীর)

ইবনে আব্বাসের বাচনিক প্রথমোক্ত রেওয়ায়েতও ইবনে কাসীরের মতে অগ্রাহ্য। এর এক কারণ এই যে, এতে আদম (আ)-এর সৃষ্টি আকাশ সৃষ্টির সাথে শুক্রবারের শেষ প্রহরে এবং একই প্রহরেই সিজদার আদেশ ও ইবলীসকে জান্নাত থেকে বহিষ্কারের বিষয় উল্লিখিত হয়েছে।

অথচ কোরআনের একাধিক আয়াতের পূর্বাপর বর্ণনা থেকে সুস্পষ্টরূপে জানা যায় যে, আদম সৃষ্টির ঘটনা আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির অনেক পরে হয়েছে। তখন পৃথিবীতে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল এবং জিন ও শয়তানরা সেখানে বসবাসরত ছিল। সে সময়েই বলা হয়েছিল — إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً —(মাযহারী)

সারকথা এই যে, আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির দিনকাল ও ক্রম সম্পর্কিত বর্ণনা-সমূহের মধ্য থেকে কোনটিকেই কোরআনের ন্যায় অকাট্য ও নিশ্চিত বলা যায় না। বরং এগুলো ইসরাঈলী রেওয়ায়েত হওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল। ইবনে কাসীর মুসলিম ও নাসায়ীর বর্ণনা সম্পর্কেও তাই বলেছেন। তাই কোরআনের আয়াতকেই মূল ভিত্তি সাব্যস্ত করে উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট করা উচিত। আয়াতসমূহকে একত্র করার ফলে নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, আকাশ, পৃথিবী ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু মাত্র ছয় দিনে সৃজিত হয়েছে। সূরা হা-মীম সিজদার আয়াত থেকে দ্বিতীয়ত জানা যায় যে, পৃথিবী, পর্বতমালা, বৃক্ষরাজি ইত্যাদি সৃষ্টিতে পূর্ণ চারদিন লেগেছে। তৃতীয়ত জানা যায় যে, আকাশমণ্ডলী সৃজনে দু'দিন ব্যয়িত হয়েছে। এতে পূর্ণ দু'দিনের বর্ণনা নাই, বরং পুরোপুরি দু'দিন না লাগারও কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সর্বশেষ দিন শুক্রবারের কিছু অংশ বেঁচে গিয়েছিল। এসব আয়াতের বাহ্যিক অর্থ এই বোঝা যায় যে, ছয় দিনের মধ্য থেকে প্রথম চার দিন পৃথিবী সৃজনে এবং অবশিষ্ট দু'দিন আকাশ সৃজনে ব্যয়িত হয়েছে এবং পৃথিবী আকাশের পূর্বে সৃজিত হয়েছে। কিন্তু সূরা নাযিয়াতের আয়াতে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, আকাশ সৃষ্টির পরে পৃথিবীকে বিস্তৃত ও সম্পূর্ণ করা হয়েছে। তাই বয়ানুল কোরআনের বক্তব্য অবান্তর নয় যে, পৃথিবী সৃষ্টির কাজ দু'ভাগে বিভক্ত। প্রথম দু'দিনে পৃথিবী ও তার উপরিভাগের পর্বতমালা ইত্যাদির উপকরণ সৃষ্টি করা হয়েছে। এরপর দু'দিনে সপ্ত আকাশ সৃজিত হয়েছে। এরপর দু'দিনে পৃথিবীর বিস্তৃতি ও তৎমধ্যবর্তী পর্বতমালা, বৃক্ষরাজি, নদনদী, ঝরনা ইত্যাদির সৃষ্টি সম্পন্ন করা হয়েছে। এভাবে পৃথিবী সৃষ্টির চার দিন উপর্যুপরি রইল না। সূরা হা-মীম সিজদার আয়াতে প্রথমে خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ দু'দিনে পৃথিবী সৃষ্টির কথা বলে মুশরিকদেরকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে। অতপর আলাদা করে বলা হয়েছে : وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ এতে তফসীরবিদগণ একমত যে, এই চার দিন প্রথমোক্ত দু'দিনসহ; পৃথক চার দিন নয়। নতুবা সর্বমোট আট দিন হয়ে যাবে, যা কোরআনের বর্ণনার বিপরীত।

এখন চিন্তা করলে জানা যায় যে, خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ বলার পর যদি পর্বতমালা ইত্যাদির সৃষ্টিও দু'দিনে বলা হত, তবে মোট চারদিন আপনা আপনিই জানা যেত, কিন্তু কোরআন পাক পৃথিবী সৃষ্টির অবশিষ্টাংশ উল্লেখ করে বলেছে, এ হল মোট চার দিন। এতে বাহ্যত ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, এই চারদিন উপর্যুপরি ছিল না; বরং দু'ভাগে বিভক্ত ছিল---দু'দিন আকাশ সৃষ্টির পূর্বে এবং দু'দিন তার পরে। আয়াতের خَلَقَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا-বাক্যের আকাশ সৃষ্টির পরবর্তী অবস্থা বর্ণিত হয়েছে।

وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا---ভারসাম্য ঠিক রাখার জন্য পৃথিবীতে পর্বতমালা সৃজিত হয়েছে। কোরআনের একাধিক আয়াতে তাই বর্ণিত হয়েছে। এর জন্য পর্বতমালাকে পৃথিবীর উপরিভাগে সুউচ্চ করে স্থাপন করা জরুরী ছিল না; বরং ভূগর্ভেও স্থাপন করা যেত। কিন্তু পর্বতমালাকে ভূপৃষ্ঠের উপরে স্থাপন করা এবং মানুষ ও জীবজন্তুর নাগালের বাইরে উচ্চ করার মধ্যে পৃথিবীবাসীর জন্য হাজারো বরং অসংখ্য উপকারিতা ছিল। তাই আয়াতে مِنْ فَوْقِهَا বলে এই নিয়ামতের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِّلسَّائِلِينَ---أقوات শব্দটি قوت--এর বহুবচন। অর্থ রিযিক, রুজি, খাদ্য। মানুষের প্রয়োজনীয় অন্য সকল দ্রব্যসামগ্রীও এর অন্তর্ভুক্ত। ---(যাদুল মাসীর)

হযরত হাসান ও সুদ্দী এ আয়াতের তফসীরে বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীর প্রতি অংশে তার অধিবাসীদের উপযোগী রিযিক ও রুজি নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। নির্দিষ্ট করার অর্থ এই যে, প্রত্যেক ভূখণ্ডে নির্দিষ্ট বস্তুসমূহ নির্দিষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হওয়ার নির্দেশ জারি করেছেন। এর ফলে প্রত্যেক ভূখণ্ডের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য হয়ে গেছে। প্রত্যেক ভূখণ্ডে তার অধিবাসীদের মেজাজ ও রুচি মোতাবিক বিভিন্ন প্রকার খনিজ দ্রব্য, বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ, বৃক্ষ ও জন্তু-জানোয়ার সৃষ্টি করে দেওয়া হয়েছে।

এতে প্রত্যেক ভূখণ্ডের শিল্পজাত দ্রব্য ও পোশাক-পরিচ্ছদ বিভিন্নরূপে হয়েছে। কোন ভূখণ্ডে গম, কোন ভূখণ্ডে চাউল ও অন্যান্য খাদ্যশস্য রয়েছে। কোথাও তুলা কোথাও পাট, কোথাও সেব, আঙ্গুর এবং কোথাও আম এবং কলা উৎপন্ন হতে দেখা যায়। ইকরিমা ও যাহ্হাকের উক্তি অনুযায়ী এতে এ উপকারও আছে যে, বিশ্বের সব

দেশের মধ্যে পারস্পরিক বাণিজ্য ও সহযোগিতার পথ উন্মুক্ত হয়েছে। কোন ভূখণ্ডই অন্য ভূখণ্ডের প্রতি অমুখাপেক্ষী নয়। পারস্পরিক স্বার্থের উপরই পারস্পরিক সহ-যোগিতার মজবুত প্রাচীর নির্মিত হতে পারে। ইকরিমা বলেন, কোন কোন ভূখণ্ডে লবণ স্বর্ণের ন্যায় ওজন করেও বিক্রয় করা হয়।

আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীকে যেন তার অধিবাসীদের খাদ্য, বাসস্থান, পোশাক ইত্যাদি প্রয়োজনের একটি মহাগুদামে পরিণত করে দিয়েছেন। এতে কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী ও বসবাসকারী কোটি কোটি মানুষ ও অসংখ্য জীবজন্তুর প্রয়োজনীয় সব দ্রব্যসামগ্রী রেখে দিয়েছেন। পৃথিবীর গর্ভে এগুলো বৃদ্ধি পাবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী কিয়ামত পর্যন্ত নির্গত হতে থাকবে। মানুষের কাজ এই যে, সে এগুলো ভূগর্ভ থেকে বের করে প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করবে। অতপর سَوَاءً لِّلسَّائِلِينَ বাক্যটি অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ-এর সাথে সম্পৃক্ত। অর্থ এই যে, এসব মহান সৃষ্টি ঠিক চারদিনে সমাপ্ত হয়েছে। সাধারণের পরি-ভাষায় যাকে চার বলে দেওয়া হয়, তা কোন সময় চার থেকে কম ও কোন সময় চার থেকে কিছু বেশিও হয়ে থাকে। কিন্তু ভগ্নাংশ বাদ দিয়ে তাকে চারই বলে দেওয়া হয়। আয়াতে سَوَاءً শব্দ যোগ করে এই সম্ভাবনা নাকচ করে বলা হয়েছে যে, এ কাজ পূর্ণ চার দিনেই হয়েছে। لِّلسَّائِلِينَ—এর অর্থ এই যে, যারা আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞেস করে, তাদের জন্য এই গণনা। ইবনে জরীর ও দুররে মনসুরে বর্ণিত আছে যে, ইহুদীরা এই জিজ্ঞাসা করেছিল। তাদেরকে বলে দেওয়া হয়েছে যে, এসব সৃষ্টি ঠিক চারদিনে হয়েছে।---(ইবনে কাসীর, কুরতুবী, রূহুল-মা'আনী)

ইবনে যায়েদ প্রমুখ কোন কোন তফসীরবিদ قَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا لِّلسَّائِلِينَ -এর সাথে সম্পর্কযুক্ত করেছেন। তারা سَائِلِينَ-এর অর্থ নিয়েছেন প্রত্যাশী ও অভাবী। এমতাবস্থায় আয়াতের অর্থ এই যে, পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রকার খাদ্য ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী তাদের উপকারার্থ সৃষ্টি করা হয়েছে, যারা এগুলোর প্রত্যাশী ও অভাবী। প্রত্যাশী ও অভাবী ব্যক্তি অভ্যাসগতভাবে অপরের কাছে সওয়ালের হাত বাড়ায়। তাই তাকে سَائِلِينَ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে।—(বাহরে মুহীত)

ইবনে কাসীর এ তফসীর উদ্ধৃত করে বলেন, এটা কোরআনে এ আয়াতের অনুরূপ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ—অর্থাৎ তোমরা যা চেয়েছ, তা সবই

আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে দিয়েছেন। এখানেও চাওয়ার অর্থ অভাবী হওয়া। চাওয়াই শর্ত নয়। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা এসব বস্তু তাদেরকেও দিয়েছেন, যারা চায়নি।

فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ—কোন কোন তফসীরবিদের মতে আকাশ ও পৃথিবীকে এই আদেশ দেওয়া এবং প্রত্যুত্তরে তাদের আনুগত্য প্রকাশ করা আক্ষরিক অর্থে নয়; বরং রূপক অর্থে বোঝানো হয়েছে যে, আকাশ ও পৃথিবীকে আল্লাহ্ তা'আলার প্রত্যেক আদেশ পালনের জন্য প্রস্তুত দেখা গেছে। কিন্তু ইবনে আতিয়্যা ও অন্যান্য অনুসন্ধানী তফসীরবিদ বলেন যে, এখানে কোন রূপক অর্থ নাই; বরং আক্ষরিক অর্থেই বলা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে সম্বোধন বোঝার চেতনা ও অনুভূতিও সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন এবং জওয়াব দেওয়ার জন্য তাদেরকে বাকশক্তিও দান করা হয়েছিল। তফসীরে বাহ্‌রে মুহীতে এ তফসীরকেই উত্তম বলা হয়েছে।

ইবনে কাসীর এ তফসীর উদ্ধৃত করে কারও কারও এ উক্তিও বর্ণনা করেছেন যে, পৃথিবীর পক্ষ থেকে এই জওয়াব সেই ভূখণ্ড দিয়েছিল, যার উপর বায়তুল্লাহ্ নির্মিত হয়েছে এবং আকাশের সেই অংশ জওয়াব দিয়েছিল, যা বায়তুল্লাহ্‌র বরাবরে অবস্থিত এবং যাকে 'বায়তুল মামুর' বলা হয়।

فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ ۝ إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ۖ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ۝ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ۖ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۖ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ۝ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ ۖ وَهُمْ

لَا يُنْصَرُوْنَ ﴿١٦﴾ وَاَمَّا ثَمُوْدُ فَهَدَيْنٰهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمٰى عَلَى الْهُدٰى

فَاَخَذَتْهُمْ صٰعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُوْنِ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿١٧﴾ وَ

نَجَّيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ﴿١٨﴾ وَيَوْمَ يُحْشَرُ اَعْدَآءُ

اللّٰهِ اِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ ﴿١٩﴾ حَتّٰٓى اِذَا مَا جَآءُوْهَا شَهِدَ

عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَاَبْصَارُهُمْ وَجُلُوْدُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٢٠﴾ وَقَالُوْا

لِجُلُوْدِهِمْ لِمَ شَهِدْتُّمْ عَلَيْنَا ؕ قَالُوْٓا اَنْطَقَنَا اللّٰهُ الَّذِيْٓ اَنْطَقَ كُلَّ

شَيْءٍ وَّهُوَ خَلَقَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٢١﴾ وَمَا كُنْتُمْ

تَسْتَتِرُوْنَ اَنْ يَّشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَآ اَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُوْدُكُمْ

وَلٰكِنْ ظَنَنْتُمْ اَنَّ اللّٰهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٢٢﴾ وَذٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ

الَّذِيْ ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ اَرْدٰىكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٢٣﴾ فَاِنْ

يَّصْبِرُوْا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ ۚ وَاِنْ يَّسْتَعْتِبُوْا فَمَا هُمْ مِّنَ

الْمُعْتَبِيْنَ ﴿٢٤﴾ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَآءَ فَزَيَّنُوْا لَهُمْ مَّا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ

وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِيْٓ اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ

مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ ۚ اِنَّهُمْ كَانُوْا خٰسِرِيْنَ ﴿٢٥﴾

(১৩) অতপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে বলুন, আমি তোমাদেরকে সতর্ক করলাম এক কঠোর আযাব সম্পর্কে আদ ও সামুদের আযাবের মত (১৪) যখন তাদের কাছে রসূলগণ এসেছিলেন সম্মুখ দিক থেকে এবং পেছন দিক থেকে এ কথা বলতে যে, তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত কারও পূজা করো না। তারা বলেছিল, আমাদের পালনকর্তা ইচ্ছা করলে অবশ্যই ফেরেশতা প্রেরণ করতেন, অতএব আমরা তোমাদের আনীত বিষয় অমান্য করলাম। (১৫) যারা ছিল আদ, তারা পৃথিবীতে অযথা

অহংকার করল এবং বলল, আমাদের অপেক্ষা অধিক শক্তিধর কে? তারা কি লক্ষ্য করেনি যে, যে আল্লাহ্ তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাদের অপেক্ষা অধিক শক্তিধর? বস্তুত তারা আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করত। (১৬) অতপর আমি তাদেরকে পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনার আযাব আস্বাদন করানোর জন্য তাদের উপর প্রেরণ করলাম ঝঞ্ঝাবায়ু বেশ কতিপয় অশুভ দিনে। আর পরকালের আযাব তো আরও লাঞ্ছনাকর এমতাবস্থায় যে, তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না। (১৭) আর যারা সামুদ, আমি তাদেরকে পথপ্রদর্শন করেছিলাম, অতপর তারা সৎপথের পরিবর্তে অন্ধ থাকাই পছন্দ করল। অতপর তাদের কৃতকর্মের কারণে তাদেরকে অবমাননাকর আযাবের বিপদ এসে ধৃত করল। (১৮) যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছিল ও সাবধানে চলত, আমি তাদেরকে উদ্ধার করলাম। (১৯) যে দিন আল্লাহ্র শত্রুদেরকে একত্র করা হবে। (২০) তারা যখন জাহান্নামের কাছে পৌঁছবে, তখন তাদের কান, চক্ষু ও ত্বক তাদের কর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে। (২১) তারা তাদের ত্বককে বলবে, তোমরা আমাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিলে কেন? তারা বলবে, যে আল্লাহ্ সবকিছুকে বাকশক্তি দিয়েছেন, তিনি আমাদেরকেও বাকশক্তি দিয়েছেন। তিনিই তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। (২২) তোমাদের কান, তোমাদের চক্ষু এবং তোমাদের ত্বক তোমাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দেবে না—এ ধারণার বশবর্তী হয়ে তোমরা তাদের কাছে কিছু গোপন করতে না। তবে তোমাদের ধারণা ছিল যে, তোমরা যা কর তার অনেক কিছুই আল্লাহ্ জানেন না (২৩) তোমাদের পালনকর্তা সম্বন্ধে তোমাদের এ ধারণাই তোমাদেরকে ধ্বংস করেছে। ফলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছ। (২৪) অতপর যদি তারা সবর করে, তবুও জাহান্নামই তাদের আবাসস্থল। আর যদি তারা ওযরখাহী করে, তবে তাদের ওযর কবুল করা হবে না। (২৫) আমি তাদের পেছনে সঙ্গী লাগিয়ে দিয়েছিলাম, অতপর সঙ্গীরা তাদের অগ্র-পশ্চাতের আমল তাদের দৃষ্টিতে শোভনীয় করে দিয়েছিল। তাদের ব্যাপারেও শাস্তির আদেশ বাস্তবায়িত হল, যা বাস্তবায়িত হয়েছিল তাদের পূর্ববর্তী জিন ও মানুষের ব্যাপারে। নিশ্চয় তারা ক্ষতিগ্রস্ত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

অতপর (তওহীদের প্রমাণাদি শুনেও) যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আপনি বলুন, আমি তোমাদেরকে এমন এক বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করি, যেমন আদ ও সমূদের উপর (শিরক ও কুফরের কারণে) বিপদ এসেছিল। ('বিপদ' বলে ধ্বংস করা বোঝানো হয়েছে। যেমন, কোরায়েশ সরদাররা বদর যুদ্ধে ধ্বংস ও বন্দী হয়েছিল। আদ ও সামূদের এ বিপদ তখন ঘটেছিল,) যখন তাদের কাছে তাদের সম্মুখ দিক থেকে ও পশ্চাদ্দিক থেকেও রসূলগণ আগমন করেছিলেন। (অর্থাৎ পয়গম্বরগণ তাদেরকে বোঝানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। যেমন, কেউ তার প্রিয়জনকে বিপদ ও ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যেতে দেখে কখনও সম্মুখ দিক দেখে এসে

তাকে বাধা দেয় এবং কখনও পশ্চাদ্দিক থেকে এসে তাকে ধরে। কোরআনে ইবলীসের এ উক্তির দৃষ্টান্তঃ لَاٰتِيَنَّهُمْ مِّنْ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ —অর্থাৎ আমি আদম সন্তানকে পথভ্রষ্ট করার জন্য তাদের সম্মুখ দিক থেকেও আসব এবং পশ্চাদ্দিক থেকেও। পয়গম্বরগণ তাদেরকে এ কথাই বলেছেন।) তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত কারও ইবাদত করো না। তারা বলেছিল, (তোমরা যে তওহীদের দিকে দাওয়াত দেওয়ার দাবি কর, এটাই ভ্রান্ত।) কেননা, যদি আমাদের পালনকর্তা (এটা) ইচ্ছা করতেন, (যে, কাউকে পয়গম্বর করে পাঠাবেন,) তবে ফেরেশতাগণকে প্রেরণ করতেন। অতএব আমরা তোমাদের আনীত (তওহীদের) বিষয়ও অমান্য করলাম যা দিয়ে (তোমার দাবি অনুসারে) তোমাকে (পয়গম্বর বানিয়ে) পাঠানো হয়েছে। অতপর (এ অভিন্ন উক্তির পর প্রত্যেক সম্প্রদায়ের বিশেষ অবস্থা এই যে,) যারা ছিল আদ, তারা পৃথিবীতে অযথা অহংকার করতে লাগল এবং (যখন শাস্তিবাণী শুনল, তখন) বলতে লাগল, আমাদের চেয়ে অধিক শক্তিধর কে আছে (যে আমাদেরকে আযাবে ফেলবে আর আমরা তা প্রতিহত করতে পারব না)? তারা কি লক্ষ্য করেনি যে, যে আল্লাহ্ তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাদের অপেক্ষা অধিকতর শক্তিধর? (কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা বিশ্বাস স্থাপন করল না।) বস্তুত তারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করতে থাকে। অতপর আমি তাদেরকে পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনার আযাব আস্বাদন করানোর জন্য তাদের উপর ঝঞ্ঝাবায়ু এমন দিনগুলোতে প্রেরণ করলাম, যা (আযাব অবতরণের কারণে তাদের জন্য) অশুভ ছিল। আর পরকালের আযাব তো আরও লাঞ্ছনাকর। তখন (কারও পক্ষ থেকে) তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না। আর যারা ছিল সামূদ, (তাদের অবস্থা এই যে,) আমি তাদেরকে (পয়গম্বরগণের মাধ্যমে) পথ প্রদর্শন করেছিলাম, তারা হেদায়েতের মোকাবিলায় পথভ্রষ্টতাকেই পছন্দ করল। অতপর তাদের কুকর্মের কারণে তাদেরকে অবমাননাকর আযাবের বিপদ পাকড়াও করল। যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছিল ও সাবধানে চলত, আমি তাদেরকে (এ আযাব থেকে) রক্ষা করলাম। (এখন পরকালের আযাব বর্ণনা করা হচ্ছেঃ তাদেরকে সে দিনটিও স্মরণ করিয়ে দিন, যেদিন আল্লাহ্‌র শত্রুদেরকে অর্থাৎ কাফিরদেরকে) জাহান্নামের দিকে একত্র করার জন্য (হিসাবের জায়গায়) আনা হবে। অতপর (রাস্তায় বিচ্ছিন্ন হওয়া থেকে বাঁচানোর জন্য এবং একত্র রাখার জন্য) তাদেরকে থামানো হবে [যাতে পেছনের লোকও আগের লোকের সঙ্গী হয়ে যায়। সুলায়মান (আ)-এর ঘটনায় সমস্ত সৈন্যকে একত্র করার জন্য فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ বলা হয়েছে অর্থাৎ তাদেরকে থামানো হবে।] যখন তারা (সবাই একত্রিত হয়ে) জাহান্নামের দিকে পেঁছবে (অর্থাৎ হিসাবের জায়গায়—সেখান থেকে জাহান্নাম নিকটেই দৃষ্টিগোচর হবে। হাদীসে বলা হয়েছে, জাহান্নামকে হিসাবের জায়গায় উপস্থিত করা

হবে এবং কাফিররা চতুর্দিকে আগুনই আগুন দেখবে। মোটকথা হিসাবের জায়গায় আসার পর যখন হিসাব শুরু হবে,) তখন তাদের কর্ণ, চক্ষু ও ত্বক তাদের বিরুদ্ধে তাদের কর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে। তারা (অবাক হয়ে) তাদের ত্বককে বলবে, তোমরা আমাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিলে কেন? আমরা তো দুনিয়াতে সবকিছু তোমাদের সুখের জন্যই করতাম। (হাদীসে আনাসের রেওয়ায়েতে তাদের এ উক্তি বর্ণিত আছে।) তারা (অংগসমূহ) বলবে, যে (সর্বশক্তিমান) আল্লাহ্ যিনি সবকিছুকেই বাকশক্তি দিয়েছেন, তিনিই আমাদেরকে বাকশক্তি দিয়েছেন (ফলে আমরা নিজেদের মধ্যে তাঁর কুদরত প্রত্যক্ষ করছি।) তিনি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলেন এবং তাঁরই কাছে (আবার জীবিত হয়ে) তোমরা প্রত্যাবর্তিত হয়েছ। (সুতরং এমন সর্বশক্তিমানের জিজ্ঞাসার জওয়াবে আমরা সত্যকথা কিরূপে গোপন করতে পারি? তাই সাক্ষ্য দিয়েছি। অতপর আল্লাহ্ কাফিরদেরকে বলবেন,) তোমাদের কর্ণ, তোমাদের চক্ষু এবং তোমাদের ত্বক তোমাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দেবে না—এ ধারণার বশবর্তী হয়ে তোমরা তাদের কাছে কিছু গোপন করতে না, কিন্তু তোমাদের বিশ্বাস ছিল যে, তোমরা যা কিছু কর, তার অনেক কিছু আল্লাহ্ জানেন না। তোমাদের পালনকর্তা সম্বন্ধে তোমাদের এ বিশ্বাসই তোমাদেরকে ধ্বংস করেছে। কেননা, এ বিশ্বাসের ফলে কুফরের কাজ-কর্ম করেছ এবং সে কাজকর্মই ধ্বংসের কারণ হয়েছে, ফলে তোমরা (চিরতরে) ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছ। অতপর (এমতাবস্থায়) যদি তারা সবর করে (এবং ওযরখাহী না করে,) তবুও জাহান্নামই তাদের আবাসস্থল। (তাদের সবর দয়ার কারণে হবে না, যেমন দুনিয়াতে প্রায়ই হত।) আর যদি তারা ওযরখাহী করে, তবে তাদের ওযর কবূল হবে না। আমি (দুনিয়াতে) তাদের পেছনে কিছু সঙ্গী (শয়তান) লাগিয়ে দিয়েছিলাম, অতপর সঙ্গীরা তাদের অগ্র-পশ্চাতের আমল তাদের দৃষ্টিতে শোভনীয় করে রেখেছিল। (তাই তারা কুফরকে আঁকড়িয়ে রেখেছিল। কুফরকে আঁকড়িয়ে থাকার কারণে) তাদের ব্যাপারেও শাস্তির আদেশ বাস্তবায়িত হল, যা বাস্তবায়িত হয়েছিল তাদের পূর্ববর্তী জ্বিন ও মানুষ (কাফির)-দের ব্যাপারে। নিশ্চয় তারাও ছিল ক্ষতিগ্রস্ত।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا — এটা صاعقة এরই ব্যাখ্যা, যা পূর্বের আয়াতে আদ ও সামুদের صاعقة বলে বর্ণিত হয়েছে। صاعقة শব্দের আসল অর্থ অচেতন ও বেহুঁশকারী বস্তু। এ কারণেই বজ্রকেও صاعقة বলা হয়। আকস্মিক বিপদ অর্থেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়। আদ সম্প্রদায়ের উপর চাপানো ঝড়ও একটি صاعقة ছিল। একেই ريح صرصر নামে বর্ণনা করা হয়েছে। এর অর্থ ঝন্ঝাবায়ু, যাতে বিকট আওয়ায থাকে।—(কুরতুবী)

যাহ্হাক বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উপর তিন বছর পর্যন্ত বৃষ্টিপাত সম্পূর্ণ বন্ধ রাখেন। কেবল প্রবল শুষ্ক বাতাস প্রবাহিত হত। অবশেষে আট দিন ও সাত রাত্রি পর্যন্ত উপর্যুপরি তুফান চলতে থাকে। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, এ ঘটনা শাওয়ালের শেষদিকে এক বুধবার থেকে শুরু হয়ে পরবর্তী বুধবার পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। বস্তুত যে কোন সম্প্রদায়ের উপর আযাব এসেছে, তা বুধবারেই এসেছে।——(কুরতুবী, মাযহারী)

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা কোন সম্প্রদায়ের মঙ্গল চাইলে তাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং প্রবল বাতাসকে তাদের থেকে নিবৃত্ত রাখেন। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ কোন জাতিকে বিপদগ্রস্ত করতে চাইলে তাদের উপর বৃষ্টিপাত বন্ধ করে দেন এবং প্রবল বাতাস প্রবাহিত হতে থাকে।

فِىْ اَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ—ইসলামের নীতি এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-র হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, কোন দিন ও রাত্রি আপন সত্তার দিক দিয়ে অশুভ নয়। আদ সম্প্রদায়ের ঝঞ্ঝাবায়ুর দিনগুলোকে অশুভ বলার তাৎপর্য এই যে, এই দিনগুলো তাদের পক্ষে তাদের কুকর্মের কারণে অশুভ হয়ে গিয়েছিল। এতে সবার জন্য অশুভ হওয়া জরুরী হয় না।---(মাযহারী, বয়ানুল কোরআন)

فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ—এটা و ز ع থেকে উদ্ভূত। অর্থ বাধা দেওয়া, নিষেধ করা। তফসীরের সার সংক্ষেপে এ অনুবাদই করা হয়েছে। অধিকাংশ তফসীরবিদ এ অর্থই নিয়েছেন যে, বিপুল সংখ্যক জাহান্নামীকে হাশরের ময়দান ও হিসাবের জায়গার দিকে নিয়ে যাওয়ার সময় বিক্ষিপ্ততা এড়ানোর উদ্দেশ্যে অগ্রবর্তী অংশকে থামিয়ে দেওয়া হবে, যাতে যারা পেছনে পড়ে, তারাও তাদের সাথে এসে মিলিত হতে পারে। কেউ কেউ এর অনুবাদ করেছেন, তাদেরকে হিসাবের জায়গায় দিকে হাঁকিয়ে, ধাক্কা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।---(কুরতুবী)

وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُوْنَ اَنْ يَّشْهَدَ عَلَيْكُمْ الخ—আয়াতের অর্থ এই যে, মানুষ গোপনে কোন গোনাহ্ ও অপরাধ করতে চাইলে অপরের কাছে গোপন করতে পারে, কিন্তু নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাছে গোপন করতে পারে না। যখন একথা জানা যায় যে, আমাদের কর্ণ, চক্ষু, হাত-পা ও দেহের ত্বক আসলে আমাদের নয়; বরং রাজসাক্ষী, তাদেরকে আমাদের কর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তারা সত্য সাক্ষ্য দেবে, তখন গোপনে কোন অপরাধ ও গোনাহ্ করার কোন পথই উন্মুক্ত থাকে না। সুতরাং এই অপমান থেকে আত্মরক্ষার একমাত্র উপায় হচ্ছে অপরাধই না করা। কিন্তু তোমরা যারা তওহীদ ও রিসালত স্বীকার কর না, তোমাদের চিন্তাই এদিকে ধাবিত হয় না যে, তোমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও কথা বলতে শুরু করবে এবং তোমাদের বিরুদ্ধে

আল্লাহ্‌র সামনে সাক্ষ্য দেবে। তবে এতটুকু বিষয় প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিই বুঝতে সক্ষম যে, যিনি আমাদেরকে একটি নিকৃষ্ট বস্তু থেকে সৃষ্টি করে শ্রোতা ও চক্ষুষ্মান মানুষ করেছেন, লালন-পালন করে পরিণত বয়সে উপনীত করেছেন তাঁর জ্ঞান কি আমাদের যাবতীয় কর্ম ও অবস্থাকে বেষ্টনকারী হবে না? কিন্তু তোমরা এই জাজ্বল্যমান বিষয়ের বিপরীতে এরূপ বিশ্বাস পোষণ করতে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের অনেক কাজকর্মের খবর রাখেন না। কাজেই তোমরা কুফর ও শিরক করতে সাহসী হয়েছিলে। বলা বাহুল্য, তোমাদের এই বিশ্বাসই তোমাদেরকে বরবাদ করেছে।

হাশরে মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাক্ষ্যদান ঃ সহীহ্ মুসলিমে হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, একদিন আমরা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সঙ্গে ছিলাম। অকস্মাৎ তিনি হেসে উঠলেন, অতপর বললেন, তোমরা জান, আমি কি কারণে হেসেছি? আমরা আরয করলাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলই জানেন। তিনি বললেন, আমি সে কথা স্মরণ করে হেসেছি বা হাশরে হিসাবের জায়গায় বান্দা তার পালনকর্তাকে বলবে। সে বলবে, হে পরওয়ারদিগার, আপনি কি আমাকে জুলুম থেকে আশ্রয় দেননি? আল্লাহ্ বলবেন, অবশ্যই দিয়েছি। তখন বান্দা বলবে, তাহলে আমি আমার হিসাব-নিকাশের ব্যাপারে অন্য কারও সাক্ষ্যে সন্তুষ্ট নই। আমার অস্তিত্বের মধ্য থেকেই কোন সাক্ষী না দাঁড়ালে আমি সন্তুষ্ট হব না। আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا অর্থাৎ ভাল কথা, তুমি নিজেই তোমার হিসাব করে নাও। এরপর তার মুখে মোহর এঁটে দেওয়া হবে এবং তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বলা হবে, তোমরা তার ক্রিয়াকর্ম বর্ণনা কর। এতে প্রত্যেক অঙ্গ কথা বলতে শুরু করবে এবং সত্য সাক্ষ্য দেবে। এরপর তার মুখ খুলে দেওয়া হবে। তখন সে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে বলবে, بعدا لكن و سحقا فعنكن اناضل অর্থাৎ তোমরা ধ্বংস হও, আমি তো দুনিয়াতে যা কিছু করেছি, তোমাদেরই সুখের জন্য করেছি। এখন তোমরাই আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে শুরু করলে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-র রেওয়ায়েতে আছে, এ ব্যক্তির মুখে মোহর এঁটে দেওয়া হবে এবং উরুকে বলা হবে, তুমি কথা বল এবং তার ক্রিয়াকর্ম বর্ণনা কর। তখন মানুষের উরু, মাংস, অস্থি সকলেই তার কর্মের সাক্ষ্য দেবে।---(মাযহারী)

হযরত ম'কাল ইবনে ইয়াসারের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, অনাগত দিন মানুষকে ডেকে বলে, আমি নতুন দিন। তুমি যা কিছু আমার মধ্যে করবে, কিয়ামতের দিন আমি সে সম্পর্কে সাক্ষ্য দেব। তাই তোমার উচিত আমি শেষ হয়ে যাওয়ার আগেই কোন পুণ্যকাজ করে নেওয়া, যাতে আমি এ সম্পর্কে সাক্ষ্য দিতে পারি। যদি আমি চলে যাই, তবে আমাকে কখনও পাবে না। এমনিভাবে প্রত্যেক রাত্রি মানুষকে ডেকে একথা বলে।--(কুরতুবী)

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَسْمَعُوْا لِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَالْغَوْا فِيْهِ
لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُوْنَ ﴿٢٦﴾ فَلَنُذِيْقَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَذَابًا شَدِيْدًا
وَّلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَسْوَاَ الَّذِيْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٢٧﴾ ذٰلِكَ جَزَآءُ اَعْدَآءِ اللّٰهِ
النَّارُ ۚ لَهُمْ فِيْهَا دَارُ الْخُلْدِ ؕ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا
يَجْحَدُوْنَ ﴿٢٨﴾ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا رَبَّنَآ اَرِنَا الَّذَيْنِ اَضَلّٰنَا مِنَ
الْجِنِّ وَالْاِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ اَقْدَامِنَا لِيَكُوْنَا مِنَ الْاَسْفَلِيْنَ ﴿٢٩﴾

(২৬) আর কাফিররা বলে, তোমরা এ কোরআন শ্রবণ করো না এবং এর আবৃত্তিতে হট্টগোল সৃষ্টি কর, যাতে তোমরা জয়ী হও। (২৭) আমি অবশ্যই কাফির-দেরকে কঠিন আযাব আস্বাদন করাব এবং আমি অবশ্যই তাদেরকে তাদের মন্দ ও হীন কাজের প্রতিফল দেব। (২৮) এটা আল্লাহ্‌র শত্রুদের শাস্তি---জাহান্নাম। তাতে তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী আবাস, আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করার প্রতিফল-স্বরূপ। (২৯) কাফিররা বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা, যে সব জ্বিন ও মানুষ আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল, তাদেরকে দেখিয়ে দাও, আমরা তাদেরকে পদদলিত করব, যাতে তারা যথেষ্ট অপমানিত হয়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

কাফিররা (পরস্পর) বলে, তোমরা এ কোরআন শ্রবণই করো না এবং (যদি পয়গম্বর শুনাতে আরম্ভ করে তবে) তাঁতে হট্টগোল সৃষ্টি কর, যাতে (এভাবে) তোমরাই জয়ী হও। (পয়গম্বর হার মেনে চুপ হয়ে যায়। এই নাপাক ইচ্ছা ও দুরভি-সন্ধির কারণে) আমি অবশ্যই কাফিরদেরকে কঠিন আযাব আস্বাদন করাব এবং তাদেরকে তাদের মন্দ কর্মের শাস্তি দেব। শাস্তি আল্লাহ্‌র শত্রুদের এই অর্থাৎ জাহান্নাম। তাতে তাদের জন্য থাকবে স্থায়ী আবাস আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করার প্রতি-ফলস্বরূপ। (আযাবে পতিত হয়ে) কাফিররা বলবে হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে সে দু'শয়তান ও মানবকে দেখিয়ে দিন, যারা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল। আমরা তাদেরকে পদদলিত করব, যাতে তারা যথেষ্ট অপমানিত হয়।

(অর্থাৎ দুনিয়াতে যারা তাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল, তখন তাদের প্রতি কাফিরদের ক্রোধ হবে। এই পথভ্রষ্টকারীরা হবে মানুষ ও শয়তান---এক একজন

করে হোক কিংবা বেশী করে। পথভ্রষ্টকারীরাও জাহান্নামেই থাকবে, কিন্তু এসব কথাবার্তার সময় তারা সামনে থাকবে না। তাই সামনে আনার আবেদন জানাবে। তাদের এ আবেদন মঞ্জুর হবে কি না, তা কোন আয়াত অথবা রেওয়ায়েতে পাওয়া যায়নি)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

لَا تَسْمَعُوْا لِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَالْغَوْا فِيْهِ — কাফিররা কোরআনের মোকাবিলায় অক্ষম হয়ে এবং সমস্ত চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে এ দুষ্কর্মের আশ্রয় নিয়েছিল। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আবু জহল অন্যদেরকে প্ররোচিত করল যে, মুহাম্মদ যখন কোরআন তিলাওয়াত করে, তখন তোমরা তার সামনে গিয়ে হৈ-হুল্লোড় করতে থাকবে, যাতে সে কি বলছে তা কেউ বুঝতে না পারে। কেউ কেউ বলেন, কাফিররা শিস দিয়ে, তালি বাজিয়ে এবং নানারূপ শব্দ করে কোরআন শ্রবণ থেকে মানুষকে বিরত রাখার প্রস্তুতি নিয়েছিল। —(কুরতুবী)

নীরবতার সাথে কোরআন শ্রবণ করা ওয়াজিব ঃ হৈ-হুল্লোড় করা কাফিরদের অভ্যাস ঃ আলোচ্য আয়াত থেকে জানা গেল, তিলাওয়াতে বিঘ্ন সৃষ্টির উদ্দেশ্যে গণ্ডগোল করা কুফরের আলামত। আরও জানা গেল যে, নীরবতার সাথে শ্রবণ করা ওয়াজিব এবং ঈমানের আলামত। আজকাল রেডিওতে কোরআন তিলাওয়াত করা হয় এবং প্রত্যেক হোটেল ও জনসমাবেশে রেডিও খুলে দেওয়া হয়। হোটেলের কর্ম-চারীরা তাদের কাজকর্মে এবং গ্রাহকরা খানা-পিনায় মশগুল থাকে। ফলে দৃশ্যত এমন পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে যায়। যা কাফিরদের আলামত ছিল। আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদেরকে হেদায়েত করুন। এরূপ পরিবেশে কোরআন তিলাওয়াতের জন্য রেডিও খোলা উচিত নয়। যদি বরকত হাসিলের জন্য খোলাই হয়, তবে কয়েক মিনিট সব কাজকর্ম বন্ধ রেখে নিজেরাও মনোযোগ সহকারে শোনা উচিত এবং অপরকে শোনার সুযোগ দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ
الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ
تُوعَدُونَ ۝٣٠ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۚ
وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ۝٣١ نُزُلًا
مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ ۝٣٢ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ

صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ۝ وَلَا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا
السَّيِّئَةُ ؕ اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِىْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهٗ
عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِىٌّ حَمِيْمٌ ۝ وَمَا يُلَقّٰهَاۤ اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا ۚ
وَمَا يُلَقّٰهَاۤ اِلَّا ذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ ۝ وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ
نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝

(৩০) নিশ্চয় যারা বলে, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ্, অতপর তাতেই অবিচল থাকে, তাদের কাছে ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় এবং বলে, তোমরা ভয় করো না, চিন্তা করো না এবং তোমাদের প্রতিশ্রুত জান্নাতের সুসংবাদ শোন। (৩১) ইহকালে ও পরকালে আমরা তোমাদের বন্ধু। সেখানে তোমাদের জন্য আছে যা তোমাদের মন চায় এবং সেখানে তোমাদের জন্য আছে যা তোমরা দাবী কর (৩২) এটা ক্ষমাশীল করুণাময়ের পক্ষ থেকে সাদর আপ্যায়ন। (৩৩) যে আল্লাহ্র দিকে দাওয়াত দেয়, সৎকর্ম করে এবং বলে, আমি একজন আজ্ঞাবহ, তার কথা অপেক্ষা উত্তম কথা আর কার? (৩৪) সমান নয় ভাল ও মন্দ। জওয়াবে তাই বলুন যা উৎকৃষ্ট। তখন দেখবেন আপনার সাথে যে ব্যক্তির শত্রুতা রয়েছে, সে যেন অন্তরঙ্গ বন্ধু। (৩৫) এ চরিত্র তারাই লাভ করে, যারা সবর করে এবং এ চরিত্রের অধিকারী তারাই হয়, যারা অত্যন্ত ভাগ্যবান। (৩৬) যদি শয়তানের পক্ষ থেকে আপনি কিছু কুমন্ত্রণা অনুভব করেন, তবে আল্লাহ্র শরণাপন্ন হোন। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যারা (আন্তরিকভাবে) বলে, আমাদের (সত্যিকার) পালনকর্তা (একমাত্র) আল্লাহ্, (অর্থাৎ শিরক ত্যাগ করে তওহীদ অবলম্বন করে---) অতপর (তাতে) অবিচলিত থাকে (অর্থাৎ তা ত্যাগ করে না), তাদের কাছে (আল্লাহ্র পক্ষ থেকে রহমত ও সুসংবাদের) ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় (মৃত্যুর সময়, কবরে এবং কিয়ামতে) আর বলে, তোমরা (পরকালের) ভয় করো না, (দুনিয়া ত্যাগ করার কারণে) চিন্তা করো না (কেননা, সামনে তোমাদের জন্য এর উত্তম বিকল্প শান্তি ও নিরাপত্তা রয়েছে) এবং তোমরা প্রতিশ্রুত জান্নাতের (অর্থাৎ জান্নাত পাওয়ার) কারণে আনন্দিত হও। আমরা তোমাদের সঙ্গী ছিলাম পার্থিব জীবনে এবং পরকালেও থাকব। (পার্থিব জীবনে ফেরেশতাদের সঙ্গ এই যে, তারা মানুষের অন্তরে সৎকাজের প্রেরণা জাগ্রত করে।

কষ্ট ও বিপদাপদে ফেরেশতাদের সঙ্গীত্বের প্রভাবেই সবর ও স্থিরতা অর্জিত হয়। পরকালে তারা সামনাসামনি সঙ্গী হবে। কোরআনে বলা হয়েছে وَيَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ আরেক আয়াতে আছে وَيَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِّن كُلِّ بَابٍ) যেখানে (অর্থাৎ জান্নাতে) তোমাদের জন্য আছে, যা তোমাদের মন চায় এবং সেখানে তোমাদের জন্য আছে, যা তোমরা দাবি করবে। (অর্থাৎ মুখে যা চাইবে তা পাবেই ; মন যা চাইবে, তাও পাবে।) এটা হবে ক্ষমাশীল, করুণাময়ের পক্ষ থেকে সাদর আপ্যায়ন। (অর্থাৎ এসব নিয়ামত মেহমানদের ন্যায় সসম্মানে ও সাদরে পাওয়া যাবে।) যে আল্লাহ্‌র দিকে (মানুষকে) দাওয়াত দেয়, (নিজেও) সৎকর্ম করে এবং (আনুগত্য প্রকাশের জন্য) বলে, আমি একজন আজ্ঞাবহ, তাঁর কথা অপেক্ষা উত্তম কথা আর কার? [যারা আল্লাহ্‌র দিকে দাওয়াত দেয় এবং সংস্কারমূলক কাজ করে, তারা প্রায়ই মূর্খদের পক্ষ থেকে কষ্ট ও নির্যাতনের সম্মুখীন হয়। তাই অতপর তাদেরকে জুলুমের বিপরীতে ইনসাফ এবং অনিষ্টের বিনিময়ে ইষ্ট করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা গেছে, যে শত্রুপক্ষের নির্যাতনে সবর করে তাদের সাথে সদয় ব্যবহার করাই দাওয়াত কার্যকর ও সফল হওয়ার পন্থা। তাই রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, এতে মুসলমানগণও প্রসঙ্গক্রমে শামিল রয়েছে :] ভাল ও মন্দ সমান হতে পারে না ; (বরং প্রত্যেকটির প্রভাব-প্রতিক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন। অতএব) আপনি (অনুসারিগণসহ) সদ্ব্যবহার দ্বারা (মন্দকে) প্রতিহত করুন। তখন দেখবেন, যে ব্যক্তির মধ্যে ও আপনার মধ্যে শত্রুতা ছিল, সে যেন অন্তরঙ্গ বন্ধু। (অর্থাৎ মন্দের বিনিময়ে মন্দ করলে শত্রুতা বৃদ্ধি পায় এবং ভাল ব্যবহার করলে শত্রুতা হ্রাস পায়। এমনকি প্রায়ই শত্রুতা সম্পূর্ণ লোপ পায় এবং শত্রু অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত হয়ে যায়।) এ চরিত্র তারাই লাভ করে, যারা (চরিত্রের দিক দিয়ে) খুব দৃঢ় এবং এরূপ চরিত্রের তারাই অধিকারী হয়, যারা (সওয়াবের দিক দিয়ে) অত্যন্ত ভাগ্যবান। যদি (এসময়ে) শয়তানের পক্ষ থেকে আপনি কিছু (ক্রোধের) কুমন্ত্রণা অনুভব করেন, তবে (তৎক্ষণাৎ) আল্লাহ্‌র শরণাপন্ন হোন। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ। (মন্দের বিনিময়ে ভাল ব্যবহার করার জন্য প্রতিপক্ষের সুস্থ মনের অধিকারী হওয়া শর্ত। কেননা, মাঝে মাঝে দুষ্টমতি লোকের সাথে ভাল ব্যবহারের উল্টা ফল হতে দেখা যায়। মনের সুস্থতা যারা হারিয়ে ফেলে তাদের ক্ষেত্রেই এ ধরনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। এমন লোকের সংখ্যা খুবই নগণ্য।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরার শুরু থেকে এ পর্যন্ত কোরআন, রিসালত ও তওহীদ অস্বীকারকারীদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। আল্লাহ্‌র কুদরতের নিদর্শনাবলী তাদের দৃষ্টির সামনে উপস্থিত করে তওহীদের দাওয়াত ও অস্বীকারকারীদের পরিণাম এবং পরকালের আযাব তথা

জাহান্নামের বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এখান থেকে মু'মিন ও কামিলদের অবস্থা, ইহকাল ও পরকালে তাদের সম্মান এবং তাদের জন্য বিশেষ পথনির্দেশ উল্লিখিত হয়েছে। মু'মিন ও কামিল তারাই, যারা কর্মে ও চরিত্রে অবিচল পুরোপুরিভাবে শরীয়তের অনুসারী এবং যারা অপরকেও আল্লাহ্র দিকে দাওয়াত দেয় এবং তাদের সংশোধনের চেষ্টা করে। এ প্রসঙ্গেই যারা ইসলামের দাওয়াত দেয়, তাদের জন্য সবর এবং মন্দের জওয়াবে ভাল ব্যবহার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا

استقامت-এর অর্থঃ বলা হয়েছেঃ

অর্থাৎ যারা খাঁটি মনে আল্লাহ্কে পালনকর্তারূপে বিশ্বাস করে ও তা স্বীকারও করে (এটা হল মূল ঈমান) অতপর তাতে অবিচলও থাকে (এটা হল সৎকর্ম)। এভাবে তারা ঈমান ও সৎকর্ম উভয় গুণে গুণান্বিত হয়ে যায়। তফসীরের সার-সংক্ষেপে استقامت শব্দের অর্থ বর্ণিত হয়েছে ঈমান ও তওহীদে কায়েম থাকা, তারা তা পরিত্যাগ করে না। এ তফসীর হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণিত আছে। হযরত উসমান (রা) থেকেও প্রায় তাই বর্ণিত রয়েছে। তিনি استقامت-এর অর্থ করেছেন খাঁটি আমল করা। হযরত উমর (রা) বলেন, الاستقامة ان تستقيم على الامر والنهى ولا تروغ روغان الثعالب -আল্লাহ্ তা'আলার যাবতীয় বিধি তথা আদেশ ও নিষেধের উপর অবিচলিত থাকা এবং তা থেকে শৃগালের ন্যায় এদিক-ওদিক পলায়নের পথ বের না করার নাম استقامة।—(মাযহারী)

তাই আলিমগণ বলেন, استقامت সংক্ষিপ্ত হলেও এতে শরীয়তের যাবতীয় বিধি-বিধান পালন এবং হারাম ও মকরূহ বিষয়াদি থেকে সার্বক্ষণিক বেঁচে থাকা শামিল রয়েছে। তফসীরে-কাশশাফে আছে, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ্—একথাটি বলা তখনই শুদ্ধ হতে পারে, যখন অন্তরে বিশ্বাস করা হয় যে, আমি প্রত্যেক অবস্থায় প্রত্যক্ষ পদক্ষেপেই আল্লাহ্ তা'আলার প্রশিক্ষণাধীন, তাঁর রহমত ব্যতিরেকে আমি একটি শ্বাসও ছাড়তে পারি না। এর দাবি এই যে, মানুষ ইবাদতে অটল-অবিচল থাকবে এবং তার আত্মা ও দেহ কেশাগ্র পরিমাণও আল্লাহ্র দাসত্ব থেকে বিচ্যুত হবে না।

হযরত সুফিয়ান ইবনে আবদুল্লাহ্ ছাকাফী (রা) একবার রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে আরয করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্ (সা)! আমাকে এমন এক পূর্ণাঙ্গ বিষয় বলে দিন, যা শোনার পর অন্য কারও কাছে কিছু জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন থাকবে না। রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, قل امنت بالله ثم استقم—অর্থাৎ তুমি আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের স্বীকারোক্তি কর, অতপর তাতে অবিচল থাক।—(মুসলিম) এর বাহ্যিক অর্থ এই যে, ঈমান ও তার দাবি অনুযায়ী সৎকর্মেও অবিচলিত থাক।

এ কারণেই হযরত আলী ও ইবনে আব্বাস (রা) استقامة এর সংজ্ঞা দিয়েছেনঃ ফরয কর্মসমূহ আদায় করা। হযরত হাসান বসরী (র) বলেন, استقامة এই যে, যাবতীয় কাজে আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর এবং গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাক। এ থেকে জানা গেল যে, استقامة-এর পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা তাই, যা উপরে হযরত উমর (রা) থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে। জাসসাস ও ইবনে-জরীর এই তফসীর আবুল আলিয়া থেকে উদ্ধৃত করে তাই গ্রহণ করেছেন।

تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ—ফেরেশতাগণের এই অবতরণ ও সম্বোধন হযরত ইবনে-আব্বাসের উক্তি অনুযায়ী মৃত্যুর সময় হবে। কাতাদাহ্ বলেন—হাশরে কবর থেকে বের হওয়ার সময় হবে এবং ওকী' ইবনে জাররাহ্ বলেন, তিন সময়ে হবে---প্রথম মৃত্যুর সময়, অতপর কবরের অভ্যন্তরে, অতপর হাশরে কবর থেকে উত্থিত হওয়ার সময়। বাহরে-মুহীতে আবূ হাইয়ান বলেন---আমি তো বলি যে, মু'মিনদের কাছে ফেরেশতাগণের অবতরণ প্রত্যহ হয় এবং এর প্রতিক্রিয়া ও বরকত তাদের কাজকর্মে পাওয়া যায়। তবে চাক্ষুস দেখা ও তাদের কথা শোনা উপরোক্ত সময়েই হবে।

হযরত সাবেত বানানী (র) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি সূরা হা-মীম সিজদা তিলাওয়াত করত আলোচ্য আয়াত পর্যন্ত পৌঁছে বললেন, আমি এই হাদীস প্রাপ্ত হয়েছি যে, মু'মিন যখন কবর থেকে উত্থিত হবে, তখন দুনিয়াতে যেসব ফেরেশতা তার সাথে থাকত, তারা এসে বলবে তুমি ভীত ও চিন্তিত হয়ো না; বরং প্রতিশ্রুত জান্নাতের সুসংবাদ শোন। তাদের কথা শুনে মু'মিন ব্যক্তি আশ্বস্ত হয়ে যাবে। ---(মাযহারী)

لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيٓ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ ---ফেরেশতাগণ মু'মিনদেরকে বলবে, তোমরা জান্নাতে মনে যা চাইবে তাই পাবে এবং যা দাবি করবে তাই সরবরাহ করা হবে। এর সারমর্ম এই যে, তোমাদের প্রতিটি বাসনা পূর্ণ করা হবে---তোমরা চাও বা না চাও। অতপর نُزُلًا তথা আপ্যায়নের কথা বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এমন অনেক নিয়ামতও পাবে, যার আকাঙ্ক্ষাও তোমাদের অন্তরে সৃষ্টি হবে না। যেমন মেহমানের সামনে এমন অনেক বস্তুও আসে যার কল্পনাও পূর্বে করা হয় না, বিশেষত যখন কোন বড় লোকের মেহমান হয়।---(মাযহারী)

হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, জান্নাতে কোন পাখী উড়তে দেখে তোমাদের মনে তার মাংস খাওয়ার বাসনা সৃষ্টি হবে। তৎক্ষণাৎ তা ভাজা করা অবস্থায় সামনে আনীত হবে। কতক রেওয়ায়েতে আছে, তাকে আগুন ও ধোঁয়া কোন কিছুই স্পর্শ করবে না। আপনা আপনি রান্না হয়ে সামনে এসে যাবে।---(মাযহারী)

অন্য এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, যদি জান্নাতী ব্যক্তি নিজ গৃহে সন্তান জন্মের বাসনা করে, তবে গর্ভধারণ, প্রসব, শিশুর দুধ ছাড়ানো এবং যৌবনে পদার্পণ এক মুহূর্তের মধ্যে হয়ে যাবে।---(মাযহারী)

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ---এটা মু'মিনদের দ্বিতীয় অবস্থা। অর্থাৎ তারা কেবল নিজেদের ঈমান ও আমল নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে না বরং অপরকেও দাওয়াত দেয়। বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি মানুষকে আল্লাহ্‌র দিকে ডাকে তার চেয়ে উত্তম কথা আর কার হতে পারে? এ থেকে বোঝা গেল যে, মানুষের সেই কথাই সর্বোত্তম ও সর্বোৎকৃষ্ট যাতে অপরকে সত্যের দাওয়াত দেওয়া হয়। এতে মুখে, কলমে, অন্য কোনভাবে ইত্যাদি সর্বপ্রকার দাওয়াতই শামিল রয়েছে। আযানদাতাও এতে দাখিল আছে। কেননা, সে মানুষকে নামাযের দিকে আহবান করে। একারণেই হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আলোচ্য আয়াত মুয়াযযিন সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে এবং دَعَا إِلَى اللَّهِ বাক্যের পর عَمِلَ صَالِحًا বলে আযান-একামতের মধ্যস্থলে দু'রাকআত নামায বোঝানো হয়েছে।

রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, আযান ও একামতের মাঝখানে যে দোয়া করা হয়, তা প্রত্যাখ্যাত হয় না।---(মাযহারী)

হাদীসে আযান ও আযানের জওয়াব দেওয়ার অনেক ফযিলত ও বরকত বর্ণিত রয়েছে। যদি বেতন ও পারিশ্রমিকের দিকে লক্ষ্য না করে খাঁটিভাবে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আযান দেওয়া হয়।----(মাযহারী)

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ---এখান থেকে আল্লাহ্‌র পথে দাওয়াতকারী-দেরকে বিশেষ পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ তারা মন্দের জওয়াবে ভাল ব্যবহার করবে এবং সবর ও অনুগ্রহ করবে। اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ---অর্থাৎ দাওয়াতকারীরা অতি উত্তম পন্থায় মন্দকে প্রতিহত করবে। এটাই তাদের অভ্যস্ত গুণ হওয়া উচিত যে, মন্দের জওয়াবে মন্দ না করে বরং ক্ষমা করা উত্তম কাজ। অতি উত্তম কাজ এই যে, যে ব্যক্তি তোমাদের সাথে মন্দ ব্যবহার করে তুমি তাকে ক্ষমাও করবে, অধিকন্তু তার সাথে সদ্ব্যবহার করবে। হযরত ইবনে আব্বাস

বলেন—এই আয়াতের নির্দেশ এই যে, যে ব্যক্তি তোমার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করে, তার মুকাবিলায় তুমি সবর কর, যে তোমার প্রতি মূর্খতা প্রকাশ করে, তুমি তার প্রতি সহনশীলতা প্রদর্শন কর এবং যে তোমাকে জ্বালাতন করে, তুমি তাকে ক্ষমা কর। —(মাযহারী)

রেওয়ায়েতে আছে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে জনৈক ব্যক্তি গালি দিল অথবা মন্দ বলল। তিনি জওয়াবে বললেন, যদি তুমি সত্যবাদী হও এবং আমি অপরাধী ও মন্দ হই, তবে আল্লাহ্ তা'আলা যেন আমাকে ক্ষমা করেন। পক্ষান্তরে যদি তুমি মিথ্যা বলে থাক, তবে আল্লাহ্ তা'আলা যেন তোমাকে ক্ষমা করেন।—(কুরতুবী)

وَمِنْ اٰيٰتِهِ الَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۚ لَا تَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ

وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَهُنَّ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ﴿٣٧﴾

فَاِنِ اسْتَكْبَرُوْا فَالَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُوْنَ لَهٗ بِالَّيْلِ

وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْـَٔمُوْنَ ﴿٣٨﴾ وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنَّكَ تَرَى الْاَرْضَ خَاشِعَةً

فَاِذَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَآءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ؕ اِنَّ الَّذِىْٓ اَحْيَاهَا

لَمُحْيِ الْمَوْتٰى ؕ اِنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٣٩﴾

---

(৩৭) তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে দিবস, রজনী, সূর্য ও চন্দ্র। তোমরা সূর্যকে সিজদা করো না, চন্দ্রকেও না; আল্লাহ্কে সিজদা কর, যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা নিষ্ঠার সাথে শুধুমাত্র তাঁরই ইবাদত কর। (৩৮) অতপর তারা যদি অহংকার করে, তবে যারা আপনার পালনকর্তার কাছে আছে, তারা দিবারাত্রি তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে এবং তারা ক্লান্ত হয় না। (৩৯) তাঁর এক নিদর্শন এই যে, তুমি ভূমিকে দেখবে অনুর্বর পড়ে আছে। অতপর আমি যখন তার উপর বৃষ্টি বর্ষণ করি, তখন সে শস্যশ্যামল ও স্ফীত হয়। নিশ্চয় যিনি একে জীবিত করেন, তিনি জীবিত করবেন মৃতদেরকেও। নিশ্চয় তিনি সবকিছু করতে সক্ষম।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

রাত্রি, দিবস, সূর্য ও চন্দ্র তাঁরা (কুদরত ও তওহীদের) অন্যতম নিদর্শন (অতএব) তোমরা সূর্যকে সিজদা করো না, চন্দ্রকেও না, [সাবেয়ী সম্প্রদায় নক্ষত্ররাজির

ইবাদত করত। (কাশশাফ)] আল্লাহ্‌কে সিজদা কর, যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা আল্লাহ্‌রই ইবাদত কর। (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র ইবাদত করতে হলে তা এভাবেই হতে পারে যে, তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরীক করবে না। মুশরিকদের মত আল্লাহ্‌র ইবাদতের সাথে অন্যকে ইবাদতে শরীক করলে তা আল্লাহ্‌র ইবাদত থাকে না।) অতপর যদি তারা (তওহীদের ইবাদত অবলম্বন করতে এবং পৈতৃক বদভ্যাস শিরক পরিত্যাগ করতে লজ্জা ও) অহংকার করে, তবে (সেটা তাদের নির্বুদ্ধিতা। কেননা) যেসব (ফেরেশতা) আপনার পালনকর্তার নৈকট্যশীল, তারা দিবারাত্রি তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করে এবং তারা (এ থেকে সামান্যও) ক্লান্ত হয় না। (তাদের চেয়ে বহুগুণে সম্মানিত ও শ্রেষ্ঠ ফেরেশতাগণ যখন আল্লাহ্‌র ইবাদতে লজ্জাবোধ করে না, তখন এ বোকাদের লজ্জাবোধ করার কি আছে?) তাঁর (কুদরত ও তওহীদের) এক নিদর্শন এই যে, তুমি ভূমিকে দেখবে অনুর্বর পড়ে আছে। অতপর আমি যখন তার উপর বারিবর্ষণ করি, তখন সে আন্দোলিত ও স্ফীত হয়। (এটা তওহীদ ও পুনরুত্থান উভয়েরই দলীল। কেননা) যিনি ভূমিকে (তার উপযুক্ত) জীবন দান করছেন, তিনিই মৃতদেরকে (তাদের উপযুক্ত) জীবন দান করবেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আল্লাহ্ ব্যতীত কাউকে সিজদা করা জায়েজ নয়ঃ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلّٰهِ الَّذِيْ خَلَقَهُنَّ—এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, সিজদা একমাত্র জগৎস্রষ্টা আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য। তিনি ব্যতীত কোন নক্ষত্র অথবা মানব ইত্যাদিকে সিজদা করা হারাম। এই সিজদা ইবাদতের নিয়তে হোক অথবা নিছক সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে হোক, সর্বাবস্থায় উম্মতের ইজমাবলে এটি হারাম। পার্থক্য এই যে, কেউ ইবাদতের নিয়তে সিজদা করলে সে কাফির হয়ে যাবে এবং কেউ নিছক সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে সিজদা করলে তাকে কাফির বলা হবে না, কিন্তু হারামকারী ও ফাসিক বলা হবে।

ইবাদতের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ ব্যতীত অপরকে সিজদা করা কোন উম্মত ও শরীয়তে হালাল ছিল না। কেননা এটা শিরক এবং প্রত্যেক পয়গম্বরের শরীয়তেই শিরক ছিল হারাম। তবে সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে সিজদা করা পূর্ববর্তী শরীয়তসমূহে বৈধ ছিল। পৃথিবীতে আগমনের পূর্বে হযরত আদম (আ)-কে সিজদা করার আদেশ সমস্ত ফেরেশতাকে দেওয়া হয়েছিল। ইউসুফ (আ)-কে তাঁর পিতা ও ভ্রাতাগণ সিজদা করেছিল। কোরআনে এর উল্লেখ আছে। কিন্তু ফিকাহবিদগণ এ বিষয়ে একমত যে, ইসলামে এই আদেশ রহিত করা হয়েছে এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অপরকে সিজদা করা সর্বাবস্থায় হারাম করা হয়েছে।

وَهُمْ لَا يَسْـَٔمُونَ---এ বিষয়ে ফিকাহ্‌বিদগণ একমত যে, এ সূরাতে তিলাওয়াতের সিজদা ওয়াজিব, কিন্তু কোন আয়াতে ওয়াজিব এতে মতভেদ রয়েছে। কাযী আবূবকর আহ্‌কামুল কোরআনে লিখেন, হযরত আলী ও ইবনে মসউদ (রা) প্রথম আয়াত অর্থাৎ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ---এর শেষে সিজদা করতেন। ইমাম মালেক তাই অবলম্বন করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস দ্বিতীয় আয়াত অর্থাৎ لَا يَسْـَٔمُونَ--এর শেষে সিজদা করতেন। হযরত ইবনে উমরও তাই বলেছেন। একারণে মসরূক, আবূ আবদুর রহমান, ইবরাহীম নখয়ী, ইবনে সিরীন, কাতাদাহ্‌ প্রমুখ ফিকাহ্‌বিদ দ্বিতীয় আয়াত শেষেই সিজদা করতেন। আহকামুল কোরআনে আরও বলা হয়েছে, হানাফী মযহাবের আলিমগণও তাই বলেন। এ মতভেদের কারণে দ্বিতীয় আয়াত শেষে সিজদা করাই সাবধানতার প্রতীক। কেননা, আসলে প্রথম আয়াতে সিজদা ওয়াজিব হলে তখন তাও আদায় হয়ে যাবে এবং দ্বিতীয়টিতে ওয়াজিব হলেও আদায় হয়ে যাবে।

إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا ۗ أَفَمَن يُلْقَىٰ فِي النَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ ۖ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝٤٠ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ ۖ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ۝٤١ لَّا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۖ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ۝٤٢ مَّا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ ۝٤٣ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ ۖ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ ۗ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ ۖ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ۚ أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ

بِعَبِيدٍ ۞ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ ۗ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۚ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ۝ مَّنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۗ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ۝

(৪০) নিশ্চয় যারা আমার আয়াতসমূহের ব্যাপারে বক্রতা অবলম্বন করে, তারা আমার কাছে গোপন নয়। যে ব্যক্তি জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে সে শ্রেষ্ঠ, না যে কিয়ামতের দিন নিরাপদে আসবে? তোমরা যা ইচ্ছা কর, নিশ্চয় তিনি দেখেন যা তোমরা কর। (৪১) নিশ্চয় যারা কোরআন আসার পর তা অস্বীকার করে, তাদের মধ্যে চিন্তা-ভাবনার অভাব রয়েছে। এটা অবশ্যই এক সম্মানিত গ্রন্থ (৪২) এতে মিথ্যার প্রভাব নেই সামনের দিক থেকেও নেই এবং পেছন দিক থেকেও নেই। এটা প্রজ্ঞাময়, প্রশংসিত আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। (৪৩) আপনাকেতো তাই বলা হয়, যা বলা হত পূর্ববর্তী রসূলগণকে। নিশ্চয় আপনার পালনকর্তার কাছে রয়েছে ক্ষমা এবং রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (৪৪) আমি যদি একে অনারব ভাষায় কোরআন করতাম, তবে অবশ্যই তারা বলত, এর আয়াতসমূহ পরিষ্কার ভাষায় বিবৃত হয়নি কেন? কি আশ্চর্য যে, কিতাব অনারব ভাষার আর রসূল আরবীভাষী! বলুন, এটা বিশ্বাসীদের জন্য হেদায়েত ও রোগের প্রতিকার। যারা মু'মিন নয়, তাদের কানে আছে ছিপি, আর কোরআন তাদের জন্য অন্ধত্ব। তাদেরকে যেন দূরবর্তী স্থান থেকে আহবান করা হয়। (৪৫) আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম, অতপর তাতে মতভেদ সৃষ্টি হয়। আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকলে তাদের মধ্যে ফয়সালা হয়ে যেত। তারা কোরআন সম্বন্ধে এক অস্বস্তিকর সন্দেহে লিপ্ত (৪৬) যে সৎকর্ম করে, সে নিজের উপকারের জন্যেই করে, আর যে অসৎকর্ম করে, তা তার উপরই বর্তাবে। আপনার পালনকর্তা বান্দাদের প্রতি মোটেই জুলুম করেন না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নিশ্চয় যারা আমার আয়াতসমূহের ব্যাপারে বক্রতা অবলম্বন করে, (অর্থাৎ আমার আয়াতসমূহের দাবি হল ঈমান আনা এবং তাতে অবিচল থাকা, তারা এ দাবি উপেক্ষা করে আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে)।---(দুররে-মনসূর) তারা আমার কাছে গোপন নয়। (আমি তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি দেব।) যে ব্যক্তি জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে সে শ্রেষ্ঠ, না যে ক্বিয়ামতের দিন নিরাপদে (জান্নাতে) আসবে সে? (অতপর কাফিরদেরকে সতর্ক করার জন্য বলা হয়েছে,) তোমরা যা ইচ্ছা,

(খুব) করে নাও। তিনি তোমাদের সমস্ত কর্মই দেখেন। (একবারই শাস্তি দেবেন।) যারা কোরআন পোঁছার পর তাকে অস্বীকার করে, (তাদের মধ্যে চিন্তা-ভাবনার অভাব রয়েছে। কোরআনে কোন অভাব নেই। কেননা,) এটা (কোরআন) এক সম্মানিত গ্রন্থ। এতে অবাস্তব কথা সামনের দিক থেকেও আসে না এবং পেছন দিক থেকেও না। (অর্থাৎ এতে কোন দিক থেকেই এরূপ সম্ভাবনা নেই যে, এটা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ নয়।) কাফিররা এ সন্দেহই করত। আল্লাহ্ তা'আলা কোরআনের সর্বজন স্বীকৃত অলৌকিকতা দ্বারা সন্দেহ দূর করে দিলেন। তাই প্রমাণিত হল যে, এটা প্রজ্ঞাময় প্রশংসিত আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। (এতদসত্ত্বেও তাদের মিথ্যারোপের জওয়াবে একথা জেনে সান্ত্বনা লাভ করুন যে,) আপনাকে (মিথ্যারোপ ও নিপীড়ন প্রসঙ্গে) সে কথাই বলা হয়, যা পূর্ববর্তী রসূলগণকে বলা হয়েছে। (তারা সবর করেছিল, আপনিও সবর করুন এবং এভাবেও সান্ত্বনা লাভ করুন যে,) আপনার পালনকর্তা ক্ষমাশীল এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিদাতাও বটে। (সুতরাং কাফিররা কুফর থেকে বিরত হয়ে ক্ষমাযোগ্য না হলে) আমি তাদেরকে শাস্তিও দেব। (অতএব আপনি পেরেশান হবেন কেন? কাফিরদের এক আপত্তি এই যে, কোরআনের কিছু অংশ অনারব ভাষায়ও থাকা উচিত ছিল। দুররে মনসূরে কাফিরদের এরূপ উক্তি সাঈদ ইবনে যুবায়ের থেকে বর্ণিত রয়েছে। এর ফলে কোরআনের অধিকতর অলৌকিকতা ফুটে উঠত। মানুষ দেখত যে, পয়গম্বর অনারব ভাষা জানেন না তবুও সে ভাষায় কথা বলেন। ব্যাপার এই যে,) যদি আমি একে (সম্পূর্ণ অথবা আংশিক) অনারব ভাষার কোরআন করতাম, (তবে কখনও তারা তাও মানত না, বরং এতে আরও একটি খুঁত বের করত। কারণ, মেনে নেয়ার ইচ্ছা না থাকলে কোন না কোন খুঁত বের করাই নিয়ম। সেমতে এরূপ হলে) অবশ্যই তারা বলত, এর আয়াতসমূহ পরিষ্কার ভাষায় বিবৃত হয়নি কেন? (অর্থাৎ আরবী ভাষায় বিবৃত হয়নি কেন, যাতে আমরা বুঝতাম! আংশিক অনারব ভাষায় থাকলে বলত, সম্পূর্ণই আরবী ভাষা হল না কেন? তারা আরও বলত,) কি আশ্চর্য অনারব ভাষার কিতাব, অথচ রসূল হলেন আরবী! (সার কথা এই যে, তারা এখন আরবী কোরআন দেখে বলে, অনারব ভাষায় হল না কেন? অনারব ভাষায় থাকলে বলত, আরবী হল না কেন? তারা কোন অবস্থাতেই আশ্বস্ত নয়। সুতরাং অনারব ভাষায় হলে তাতে কি ফায়দা হত? অতপর জওয়াব দেওয়ার আদেশ করা হয়েছে,) আপনি বলুন, এটা (কোরআন) মু'মিনদের জন্য (সৎকাজের) পথ প্রদর্শক এবং (মন্দকাজের ফলে অন্তরে যে রোগ সৃষ্টি হয়, কোরআন সে) রোগের প্রতিকার। (মু'মিনদের মধ্যে চিন্তা-ভাবনা ও সত্যান্বেষণের অভাব ছিল না। তাই কোরআন তাদের জন্য উপকারী হয়েছে।) যারা মু'মিন নয়, তাদের কানে আছে ছিপি। (ফলে ইনসাফ ও চিন্তা-ভাবনা সহকারে সত্যকে শোনে না।) আর (এ কারণেই) কোরআন তাদের জন্য অন্ধত্ব। (সূর্য যেমন জগৎকে আলোকিত করে এবং বাদুরকে অন্ধ করে দেয়, তাদের সত্য শোনেও উপকার থেকে বঞ্চিত থাকা এমনি, যেমন) তাদেরকে কোন দূরবর্তী স্থান থেকে ডাকা হয়। [ফলে আওয়ায শোনে, কিন্তু বুঝে না।

আপনার সান্ত্বনার জন্য উপরে সংক্ষেপে পয়গম্বরগণের আলোচনা হয়েছে। এখন বিশেষভাবে মূসা (আ)-র আলোচনা শুনুন,] আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম, অতপর তাতেও মতভেদ সৃষ্টি হয়। (কেউ মেনে নিয়েছে আর কেউ মেনে নেয়নি। কাজেই এটা নতুন বিষয় নয়। আপনি দুঃখিত হবেন না। কাফিরা আযাবেরই যোগ্য। তাই) যদি আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে পূর্ব সিদ্ধান্ত (অনুযায়ী পূর্ণ আযাব পরকালে দেওয়ার ব্যবস্থা) না থাকত, তবে তাদের (চূড়ান্ত) ফয়সালা (দুনিয়াতেই) হয়ে যেত। তারা (প্রমাণাদি কায়েম থাকা সত্ত্বেও) এ (ফয়সালা তথা প্রতিশ্রুত আযাব) সম্বন্ধে দ্বিধা-দ্বন্দ্বপূর্ণ সন্দেহে পতিত রয়েছে। (তারা আযাব বিশ্বাসই করে, অথচ ফয়সালা অবশ্যই হবে। ফয়সালার সারমর্ম এই যে,) সে সৎকর্ম করেনা, সে নিজের উপকারের জন্যই করে (অর্থাৎ, সেখানে তার উপকার ও সওয়াব পাবে) এবং যে মন্দকর্ম করে, তা (অর্থাৎ তার ক্ষতি ও শাস্তি) তারই উপর বর্তাবে। আপনার পালনকর্তা বান্দাদের প্রতি যুলুমকারী নন (অর্থাৎ শর্ত অনুযায়ী সৎকর্ম করা হলে তিনি তা গণনা থেকে বাদ দেন না এবং কোন অসৎকর্ম বাড়িয়ে গণনা করেন না)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

কুফরেরই বিশেষ প্রকার 'এলহাদ'-এর সংজ্ঞা ও বিধান ঃ إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا এর পূর্বের আয়াতে যারা রিসালত ও তওহীদকে খোলাখুলি অস্বীকার করত, তাদেরকে শাসানো হয়েছিল এবং তাদের আযাব বর্ণনা করা হয়েছিল। এখান থেকে অস্বীকারের এক বিশেষ প্রকার এলহাদ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। الحاد ও لحد -এর আভিধানিক অর্থ এক দিকে ঝুঁকে পড়া। এক পার্শ্বে খনন করা কবরকেও একারণেই لحد বলা হয়। কোরআন ও হাদীসের পরিভাষায় কোরআনী আয়াত থেকে পাশ কাটিয়ে যাওয়াকে এলহাদ বলা হয়। খোলাখুলি পাশ কাটিয়ে যাওয়া, আভিধানিক অর্থের দিক দিয়ে উভয়টিকে এলহাদ বলা হয়ে থাকে। কিন্তু সাধারণভাবে এলহাদ হচ্ছে কোরআন ও তার আয়াতসমূহের প্রতি বাহ্যত ঈমান দাবি করা, কিন্তু নিজের পক্ষ থেকে কোরআন, সুন্নাহ্ ও অধিকাংশ উম্মতের বিপরীত অর্থ বর্ণনা করা, যদ্দ্বারা কোরআনের উদ্দেশ্যই পণ্ড হয়ে যায়। আলোচ্য আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও এলহাদের অর্থ তাই বর্ণিত রয়েছে। তিনি বলেন, الالحاد هو وضع الكلام على غير موضعه আয়াতের لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا বাক্যটিও এ অর্থের ইঙ্গিত বহন করে। এ থেকে বোঝা যায় যে, এলহাদ এমন একটি

কুফর, যাকে তারা গোপন করতে চাইত। তাই আল্লাহ্ বলেছেন যে, তারা আমার কাছে তাদের কুফর গোপন করতে পারে না।

আলোচ্য আয়াত স্পষ্ট ব্যক্ত করছে যে, কোরআনের আয়াতকে প্রকাশ্য ভাষায় অস্বীকার করা অথবা অসত্য অর্থ বর্ণনা করে কোরআনের বিধানাবলীকে বিকৃত করার চেষ্টা করা সবই কুফর ও গোমরাহী।

সারকথা এই যে, এলহাদ এক প্রকার কপটতামূলক কুফর। অর্থাৎ মুখে কোরআন ও কোরআনের আয়াতসমূহ মেনে নেওয়ার দাবি ও স্বীকারোক্তি করা, কিন্তু আয়াতসমূহের এমন মনগড়া অর্থ বর্ণনা করা, যা কোরআন ও সুন্নাহ্র অন্যান্য বর্ণনা ও ইসলামী মূলনীতির পরিপন্থী। ইমাম আবু ইউসুফ (রহ) কিতাবুল খেরাজে বলেন, كذالك الزنادقة الذين يلحدون وقد كانوا يظهرون الاسلام সে যিন্দিকরাও তেমনি, যারা এলহাদ করে এবং মুখে মুসলমানিত্বের দাবি করে।

এ থেকে জানা যায় যে, মুলহিদ ও যিন্দীক সম অর্থে এমন কাফিরকে বলা হয়, যে মুখে ইসলাম দাবি করলেও প্রকৃতপক্ষে আয়াতসমূহের কোরআন, সুন্নাহ্ ও ইজমা বিরোধী মনগড়া অর্থ বর্ণনা করার অজুহাতে ইসলামের বিধানাবলীকে পাশ কাটিয়ে চলে।

একটি বিভ্রান্তির অবসান ঃ আকায়েদের কিতাবসমূহে এ নিয়ম বর্ণিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি কোন অর্থ উদ্ভাবনের মাধ্যমে ভ্রান্ত বিশ্বাস ও কুফরী বাক্য অবলম্বন করে, সে কাফির নয়। এখন এ নীতিটি যদি ব্যাপক অর্থে নেয়া হয় যে, যে কোন অকাট্য ও নিশ্চিত বিধানে অর্থ উদ্ভাবন করলেও এবং যে কোন ধরনের অসত্য অর্থ উদ্ভাবন করলেও কাফির হবে না, তবে দুনিয়াতে মুশরিক, প্রতিমা পূজারী ও ইহুদী খৃস্টানদের মধ্যে কাউকেই কাফির বলা যায় না। কেননা, প্রতিমা পূজারী মুশরিকদের অর্থ উদ্ভাবন তো কোরআনে উল্লিখিত আছে যে, مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى

অর্থাৎ আমরা প্রকৃতপক্ষে প্রতিমাদের পূজা এজন্য করি যাতে তারা সুপারিশ করে আমাদেরকে আল্লাহ্র নৈকট্যশীল করে দেয়। অতএব প্রকৃতপক্ষে আমরা আল্লাহ্রই ইবাদত করি। কিন্তু কোরআন তাদের উদ্ভাবিত এ অর্থ বর্ণনা সত্ত্বেও তাদেরকে কাফিরই বলেছে। ইহুদী ও খৃস্টানদের অর্থ বর্ণনা প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত কিন্তু কোরআন ও সুন্নাহ্র বর্ণনায় এতদসত্ত্বেও তাদেরকে কাফির বলা হয়েছে। সুতরাং বোঝা গেল যে, অর্থ উদ্ভাবনকারীকে কাফির না বলার ভাবার্থ ব্যাপক নয়।

এ কারণেই আলিম ও ফিকাহ্বিদগণ বলেন যে, অর্থ উদ্ভাবনের কারণে কাউকে কাফির বলা যায় না, তার জন্য শর্ত এই যে, তা ধর্মের জরুরী বিষয়াদিতে অকাট্য অর্থের বিপরীতে না হওয়া চাই। ধর্মের জরুরী বিষয়াদির শানে ইসলাম ও মুসলমানদের মধ্যে ব্যক্তি পরম্পরায় প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত বিষয়াদি, যেগুলো সম্পর্কে

অশিক্ষিত মূর্খ মহলও ওয়াকিফহাল, যেমন পাঞ্জেগানা নামায ফরয হওয়া, ফজরের দু'রাকআত ও যোহরের চার রাকআত ফরয হওয়া, রমযানের রোযা ফরয হওয়া; সুদ, মদ ও শূকর হারাম হওয়া ইত্যাদি। যদি কোন ব্যক্তি এসব বিষয় সম্পর্কে কোরআনের আয়াতে এমন কোন অর্থ উদ্ভাবন করে, যদ্দ্বারা মুসলমানদের মধ্যে ব্যক্তি পরম্পরায় প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত অর্থ পাল্টে যায়, তবে সে নিশ্চিতরূপে ও সর্বসম্মতভাবে কাফির হয়ে যাবে। কেননা, এটা প্রকৃত প্রস্তাবে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র শিক্ষাকে অস্বীকার করার নামান্তর। অধিকাংশ আলিমের মতে ঈমানের সংজ্ঞাই এই যে, تصديق النبى صلى الله عليه وسلم فيما علم مجيئه به ضرورة —অর্থাৎ এমন সব বিষয়ে নবী করীম (সা)-এর সত্যায়ন করা, যেগুলোর বর্ণনা ও আদেশ জাজ্বল্যমানরূপে তাঁর কাছ থেকে প্রমাণিত রয়েছে; অর্থাৎ আলিমগণ তো জানেনই —সর্বসাধারণও জানে।

কাজেই এর বিপরীতে কুফরের সংজ্ঞা এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) নিশ্চিত ও জাজ্বল্যমানরূপে যেসব বিষয় নিয়ে আগমন করেছেন, সেগুলোর মধ্য থেকে কোনটিকে অস্বীকার করা।

অতএব যে ব্যক্তি ধর্মের জরুরী বিষয়াদিতে অর্থ উদ্ভাবনের মাধ্যমে বিধান পরিবর্তন করে, সে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আনীত শিক্ষাকেই অস্বীকার করে।

বর্তমান যুগে কুফর ও এলহাদের ব্যাপকতা ঃ বর্তমান যুগে একদিকে ইসলাম ও ইসলামের বিধানাবলী সম্পর্কে মূর্খতা ও উদাসীনতা চরমে পেঁৗছেছে। নব্যশিক্ষিত মুসলমানগণ অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় সম্পর্কেও অজ্ঞ। অপরদিকে আধুনিক আল্লাহ্ বিহীন, বস্তুনিষ্ঠ শিক্ষার প্রভাবে এবং ইউরোপের প্রাচ্য শিক্ষাবিশারদ পণ্ডিতদের প্রচারিত ইসলাম বিরোধী সন্দেহ ও সংশয়ের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে অনেকেই ইসলাম ও ইসলামী মূলনীতি সম্পর্কে বিতর্ক ও আলোচনা শুরু করে দিয়েছে; অথচ ইসলামের মূলনীতি ও শাখা এবং কোরআন ও হাদীস সম্পর্কে তাদের জ্ঞান শূন্যের কোটায়। তারা ইসলাম সম্পর্কে কিছু অর্জন করে থাকলেও তা ইসলাম বিদ্বেষী ইউরোপীয় লেখকদের লেখা পাঠ করেই অর্জন করেছে। তারা কোরআন ও হাদীসের অকাট্য ও জাজ্বল্যমান বর্ণনায় নানাবিধ অসত্য অর্থ সংযোজন করে শরীয়তের সর্বসম্মত ও চূড়ান্ত বিধানাবলীর পরিবর্তন করাকে ইসলামের খিদমত মনে করে নিয়েছে। যখন তাদেরকে বলা হয়, এটা প্রকাশ্য কুফর, তখন তারা উপরোক্ত প্রসিদ্ধ নীতির শরণাপন্ন হয়ে বলে, আমরা বিধানটিকে অস্বীকার করি না, বরং এতে অর্থ সংযোজন করি মাত্র। কাজেই আমাদের প্রতি কুফরের অভিযোগ আরোপিত হয় না।

হযরত শাহ্ আবদুল আযীয (রহ) বলেন, যে অসত্য অর্থ বিয়োজনকে কোরআনের আয়াতে এলহাদ নামে অভিহিত করা হয়েছে, তা দু'প্রকার। এক. যে অর্থ কোরআন-হাদীসের অকাট্য ও মুতাওয়াতির বর্ণনা এবং অকাট্য ইজমার পরিপন্থী, এটা

নিঃসন্দেহে কুফর এবং দুই. যা কোরআন ও হাদীসের ধারণাপ্রসূত কিন্তু নিশ্চয়তার নিকটবর্তী বর্ণনার অথবা প্রচলিত ইজমার পরিপন্থী। এটা গোমরাহী ও পাপাচার (ফিস্‌ক)--কুফর নয়। এ দু'প্রকার অসত্য অর্থ বিয়োজন ছাড়া কোরআন ও হাদীসের ভাষায় বিভিন্ন সম্ভাবনার ভিত্তিতে যেসব অর্থ বর্ণনা করা হয়, সেগুলো সাধারণ ফিকাহ্‌বিদগণের ইজতিহাদের ময়দান, যা হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী সর্বাবস্থায় পুরস্কার ও সওয়াবের কাজ।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ—অধিকাংশ তফসীরবিদ বলেন, এ আয়াতে ذكر বলে কোরআনকে বোঝানো হয়েছে। ব্যাকরণের দিক দিয়ে إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا বাক্যটি পূর্ববর্তী إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ—বাক্য থেকে بدل হয়েছে। কাজেই উভয় বাক্যের একই বিধান হবে এবং সারমর্ম হবে এই যে, তারা যেহেতু আমার কাছে গোপন থাকতে পারে না বিধায় আযাব থেকেও বাঁচতে পারবে না।

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ—এতে বর্ণিত হয়েছে যে, কোরআন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সংরক্ষিত। কাতাদাহ্ ও সুদ্দী বলেন, আয়াতে باطل বলে শয়তানকে বোঝানো হয়েছে এবং সম্মুখ দিক ও পশ্চাদ্দিক বলে সমস্ত দিক বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, শয়তান কোনদিক থেকেই এ কিতাবে হস্তক্ষেপ করতে পারে না এবং এতে কোনরূপ পরিবর্তন করতে সক্ষম হয় না।

তফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে, জ্বিন অথবা মানব কোন প্রকার শয়তানই কোরআনে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করতে সক্ষম নয়। রাফেযী সম্প্রদায়ের কেউ কেউ কোরআনে দশটি পারা এবং কেউ কেউ বিশেষ আয়াত সংযোজন করতে চেয়েছিল, কিন্তু তাদের সে প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে।

আবূ-হাইয়্যান বলেন, বাতিল শব্দটি কেবলমাত্র শয়তানের জন্যই প্রযোজ্য নয়; বরং শয়তানের পক্ষ থেকে হোক অথবা অন্য কারও পক্ষ থেকে হোক, যে কোন বাতিল কোরআনে প্রবিষ্ট হতে পারে না। অতপর তিনি তাবারীর বরাত দিয়ে আয়াতের অর্থ এই বর্ণনা করেছেন যে, কোন বাতিলপন্থীর সাধ্য নেই যে, সামনে এসে এ কিতাবে কোনরূপ পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করে। এমনিভাবে পেছন দিক থেকে গোপনে এসে এর অর্থ বিকৃত করার ও এলহাদ করার সাধ্যও কারও নেই।

তাবারীর তফসীর এ স্থানের সাথে খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ। কেননা, কোরআনে এলহাদ ও পরিবর্তনের পথ দু'টিই। এক. খোলাখুলিভাবে কোরআনে কোন পরিবর্তন

করার চেষ্টা করা। একে مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। দুই. বাহ্যত ঈমান দাবি করা কিন্তু গা-ঢাকা দিয়ে অসত্য অর্থ বিয়োজনের মাধ্যমে কোরআনের অর্থে পরিবর্তন সাধন করা। একে مِنْ خَلْفِهٖ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সারকথা এই যে, এ কিতাব আল্লাহ্‌র কাছে সম্মানিত ও সম্ভ্রান্ত। এর ভাষায় পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করার শক্তি যেমন কারও নেই, তেমনি এর অর্থ সম্ভার বিকৃত করে বিধানাবলীর পরিবর্তন করার সাধ্যও কারও নেই। যখনই কোন হতভাগা এরূপ করার ইচ্ছা করেছে, তখনই সে লাঞ্ছিত ও প্রত্যাখ্যাত হয়েছে এবং কোরআন তার নাপাক কৌশল থেকে পাক-পবিত্র রয়েছে। কোরআনের ভাষায় যে পরিবর্তন করার উপায় নেই, তা প্রত্যেকে দেখে এবং বোঝে। কোরআন চৌদ্দ শ বছর অবধি সারা বিশ্বে পঠিত হচ্ছে এবং লাখো মানুষের বুকে সংরক্ষিত আছে। কেউ একটি যের ও যবরে ভুল করলেও বৃদ্ধ থেকে নিয়ে বালক পর্যন্ত এবং আলিম থেকে জাহিল পর্যন্ত লাখো মুসলমান তার ভুল ধরার জন্য দাঁড়িয়ে যায়। مِنْ خَلْفِهٖ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, اِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ বলে আল্লাহ্ তা'আলা কেবল কোরআনের ভাষা সংরক্ষণের দায়িত্বই নেননি; বরং এর অর্থ সম্ভারের হিফাযত করাও আল্লাহ্ তা'আলারই দায়িত্ব। তিনি আপন রসূল ও তাঁর প্রত্যক্ষ শাগরিদ অর্থাৎ সাহাবায়ে কিরামের মাধ্যমে কোরআনের অর্থ সম্ভার এমন সংরক্ষিত করে দিয়েছেন যে, কোন বেদ্বীন-মুলহিদ অসত্য অর্থ বর্ণনার মাধ্যমে এতে পরিবর্তন সাধন করতে চাইলে সর্বত্র সর্বযুগে হাজারো আলিম তা খণ্ডনে প্রবৃত্ত হয়ে যায়। ফলে সে ব্যর্থ ও অপমানিত হয়। সত্য বলতে কি, اِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ বাক্যে لَهٗ-এর সর্বনাম দ্বারা কোরআন বোঝানো হয়েছে এবং কোরআন কেবল ভাষার নাম নয়; বরং ভাষা ও অর্থসম্ভার উভয়ের সমষ্টিকে কোরআন বলা হয়।

আলোচ্য আয়াতসমূহের মোটামুটি বিষয়বস্তু এই যে, যারা বাহ্যত মুসলমান তারা খোলাখুলিভাবে অস্বীকার করতে পারে না। কিন্তু আয়াতসমূহে অসত্য অর্থ বর্ণনার মাধ্যমে কোরআন ও রসূলুল্লাহ্ (সা)-র অকাট্য বর্ণনার বিপরীত উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে। তাদের এ ধরনের পরিবর্তন থেকেও আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কিতাবের হিফাযত করেছেন। ফলে কারও মনগড়া অর্থ প্রসার লাভ করতে পারে না। কোর-আন ও হাদীসের অন্যান্য বর্ণনা এবং আলিমগণ তার মুখোশ উন্মোচিত করে দেন। সহীহ হাদীসসমূহের বর্ণনা অনুযায়ী কিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানদের মধ্যে এমন দল থাকবে, যারা পরিবর্তনকারীদের পরিবর্তনের মুখোশ উন্মোচিত করে কোরআনের সঠিক অর্থ জনসমক্ষে ফুটিয়ে তুলবে। তারা মানুষের কাছে নিজেদের কুফর যতই

গোপন করুক, আল্লাহ্‌র কাছে গোপন করতে পারবে না। আল্লাহ্ তা'আলা যখন তাদের চক্রান্ত সম্পর্কে সতর্ক, তখন তাদের এ অপকর্মের শাস্তি ভোগ করাও অপরিহার্য।

ءَ اَعْجَمِيٌّ وَّعَرَبِيٌّ —আরব ব্যতীত দুনিয়ার অপর জাতিসমূহকে 'আজম' বলা হয়। যদি শব্দটির প্রথমে আলিফ যোগ করে اعجم বলা হয়, তবে এর অর্থ হয় অপ্রাঞ্জল বাক্য। তাই যে ব্যক্তি আরবী নয়, তাকে আজমী বলা হবে যদিও সে প্রাঞ্জল ভাষা বলে। বস্তুত اعجمى বলা হবে তাকেই যে ব্যক্তি প্রাঞ্জল ভাষা বলতে পারে না।---(কুরতুবী)

আয়াতের মর্মার্থ এই যে, আমি যদি আরবী ভাষা ব্যতীত অপর কোন ভাষায় কোরআন নাযিল করতাম, তবে কোরায়েশরা অভিযোগ করত যে, এ কিতাব আমরা বুঝি না। তারা আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলত, রসূল তো আরবী আর কিতাব হল কিনা অনারব, অপ্রাঞ্জল ভাষায়।

قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَاءٌ —এখানে কোরআনের দু'টি গুণ ব্যক্ত হয়েছে---এক. কোরআন হিদায়ত, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মানুষকে কল্যাণের পথপ্রদর্শন করে----দুই. কোরআন আরোগ্যদানকারী। কুফর, শিরক, অহংকার, হিংসা, লোভ-লালসা ইত্যাদি আত্মিক রোগ যে কোরআনের মাধ্যমে নিরাময় হয়, তা বলাই বাহুল্য। কোরআন বাহ্যিক ও দৈহিক রোগেরও প্রতিকার। অনেক দৈহিক রোগের চিকিৎসা কোরআনী দোয়া দ্বারা হয় এবং সফল হয়।

اُولٰٓئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَّكَانٍۭ بَعِيْدٍ —এটা একটা দৃষ্টান্ত। যে ব্যক্তি কথা বোঝে, অনারবরা তাকে বলে انت تسمع من قريب অর্থাৎ তুমি নিকটবর্তী স্থান থেকে শুনছ। আর যে কথা বোঝে না, তাকে বলে انت تنادى من بعيد অর্থাৎ তোমাকে দূর থেকে ডাকা হচ্ছে।---(কুরতুবী)

উদ্দেশ্য এই যে, তারা যেহেতু কোরআনের নির্দেশাবলী শোনার ও বোঝার ইচ্ছা রাখে না, তাই তাদের কান যেন বধির এবং চক্ষু অন্ধ। তাদেরকে হিদায়ত করা এমন, যেমন কাউকে অনেক দূর থেকে ডাক দেওয়া, ফলে তার কানে আওয়ায পৌঁছে না এবং সে সাড়া দিতে পারে না।

شُرَكَآءِى ۙ قَالُوْٓا اٰذَنّٰكَ ۙ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيْدٍ ﴿٤٧﴾ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا
كَانُوْا يَدْعُوْنَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوْا مَا لَهُمْ مِّنْ مَّحِيْصٍ ﴿٤٨﴾
لَا يَسْـَٔمُ الْاِنْسَانُ مِنْ دُعَآءِ الْخَيْرِ ۫ وَاِنْ مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَـُٔوْسٌ
قَنُوْطٌ ﴿٤٩﴾ وَلَئِنْ اَذَقْنٰهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْۢ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُ لَيَقُوْلَنَّ
هٰذَا لِىْ ۙ وَمَآ اَظُنُّ السَّاعَةَ قَآئِمَةً ۙ وَّلَئِنْ رُّجِعْتُ اِلٰى رَبِّىْٓ اِنَّ
لِىْ عِنْدَهٗ لَلْحُسْنٰى ۚ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِمَا عَمِلُوْا ۫ وَلَنُذِيْقَنَّهُمْ
مِّنْ عَذَابٍ غَلِيْظٍ ﴿٥٠﴾ وَاِذَآ اَنْعَمْنَا عَلَى الْاِنْسَانِ اَعْرَضَ وَنَاٰ
بِجَانِبِهٖ ۚ وَاِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُوْ دُعَآءٍ عَرِيْضٍ ﴿٥١﴾ قُلْ اَرَءَيْتُمْ
اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهٖ مَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ
هُوَ فِىْ شِقَاقٍۢ بَعِيْدٍ ﴿٥٢﴾ سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَفِىْٓ اَنْفُسِهِمْ
حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ ۗ اَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ اَنَّهٗ عَلٰى كُلِّ
شَىْءٍ شَهِيْدٌ ﴿٥٣﴾ اَلَآ اِنَّهُمْ فِىْ مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَآءِ رَبِّهِمْ ۗ اَلَآ
اِنَّهٗ بِكُلِّ شَىْءٍ مُّحِيْطٌ ﴿٥٤﴾

(৪৭) কিয়ামতের জ্ঞান একমাত্র তারই জানা। তাঁর জ্ঞানের বাইরে কোন ফল আবরণমুক্ত হয় না এবং কোন নারী গর্ভ ধারণ ও সন্তান প্রসব করে না। যেদিন আল্লাহ্ তাদেরকে ডেকে বলবেন, আমার শরীকরা কোথায়? সেদিন তারা বলবে, আমরা আপনাকে বলে দিয়েছি যে, আমাদের কেউ এটা স্বীকার করে না। (৪৮) পূর্বে তারা যাদের পূজা করত, তারা উধাও হয়ে যাবে এবং তারা বুঝে নেবে যে, তাদের কোন নিষ্কৃতি নেই। (৪৯) মানুষ উন্নতি কামনায় ক্লান্ত হয় না; যদি তাকে অমঙ্গল স্পর্শ করে, তবে সে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হয়ে পড়ে; (৫০) বিপদাপদ স্পর্শ করার পর আমি যদি তাকে আমার অনুগ্রহ আস্বাদন করাই, তখন সে বলতে থাকে, এটা যে আমার

যোগ্য প্রাপ্য; আমি মনে করি না যে, কিয়ামত সংঘটিত হবে। আমি যদি আমার পালনকর্তার কাছে ফিরে যাই, তবে অবশ্যই তার কাছে আমার জন্য কল্যাণ রয়েছে। অতএব আমি কাফিরদেরকে তাদের কর্ম সম্পর্কে অবশ্যই অবহিত করব এবং তাদেরকে অবশ্যই আস্বাদন করাব কঠিন শাস্তি। (৫১) আমি যখন মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করি, তখন সে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং পার্শ্ব পরিবর্তন করে। আর যখন তাকে অনিষ্ট স্পর্শ করে, তখন সুদীর্ঘ দোয়া করতে থাকে। (৫২) বলুন, তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি এটা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হয়, অতপর তোমরা একে অমান্য কর, তবে যে ব্যক্তি ঘোর বিরোধিতায় লিপ্ত, তার চাইতে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে? (৫৩) এখন আমি তাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করব পৃথিবীর দিগন্তে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে; ফলে তাদের কাছে ফুটে উঠবে যে, এ কোরআন সত্য। আপনার পালনকর্তা সর্ববিষয়ে সাক্ষ্যদাতা, এটা কি যথেষ্ট নয়? (৫৪) শুনে রাখ, তারা তাদের পালনকর্তার সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারে সন্দেহে পতিত রয়েছে। শুনে রাখ, তিনি সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে রয়েছেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(উপরে যে কিয়ামতে কাফিররা প্রতিফল পাবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে, সে) কিয়ামতের জ্ঞান আল্লাহ্র দিকেই ফিরিয়ে দেওয়া যায়। (অর্থাৎ কাফিররা অস্বীকৃতি প্রকাশ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করত, কিয়ামত কবে আসবে? এর জওয়াবে একথাই বলা হবে যে, এর জ্ঞান আল্লাহ্র কাছে রয়েছে। মানুষের কাছে এর জ্ঞান নেই বলে এর অবাস্তবতা জরুরী হয় না। আর কিয়ামতেরই কি বিশেষত্ব, আল্লাহ্র জ্ঞান তো সবকিছুকেই পরিবেষ্টন করে রয়েছে। এমনকি,) কোন ফল আবরণমুক্ত হয় না এবং কোন নারী গর্ভধারণ ও সন্তান প্রসব করে না; কিন্তু এসবই তাঁর জ্ঞাতসারে হয়। (কেননা, তাঁর জ্ঞান সত্তাগত, যা চূড়ান্ত ও পরিপূর্ণ হওয়ার কারণে তওহীদের প্রমাণ এবং কিয়ামত সম্পর্কিত জ্ঞানেরও প্রমাণ। অতপর কিয়ামতের একটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, যদ্দ্বারা তওহীদ প্রমাণিত ও শিরক মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়।) যে দিন আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে (অর্থাৎ মুশরিকদেরকে) ডেকে বলবেন, (যাদেরকে তোমরা আমার শরীক স্থির করেছিলে), আমার (সেই) শরীকরা (এখন) কোথায়? (তাদেরকে ডাক, তারা তোমাদেরকে বিপদ থেকে উদ্ধার করুক।) তারা বলবে, (এখন তো) আমরা আপনার কাছে নিবেদন করছি যে, আমাদের কেউ এটা (অর্থাৎ শিরক) স্বীকার করে না। (অর্থাৎ আসল সত্য ফুটে উঠার পর তারা তাদের ভুল স্বীকার করে নেবে। এটা হয় অপারক অবস্থার স্বীকারোক্তি, না হয় কিছুটা মুক্তির আশায় এ স্বীকারোক্তি করা হবে।) পূর্বে (অর্থাৎ দুনিয়াতে) তারা যাদের পূজা করত, তারা সকলেই উধাও হয়ে যাবে এবং তারা (এসব অবস্থা দেখে) বোঝে নেবে যে, তাদের নিষ্কৃতির কোন উপায় নেই। (তখন মিথ্যা খোদাদের অসহায়ত্ব এবং এক আল্লাহ্র সত্যতা জানা যাবে। অতপর মানব-স্বভাবের উপর কুফর ও শিরকের একটি বড়

প্রভাব বর্ণনা করা হয়েছে। যে মানুষ তওহীদ ও ঈমান থেকে মুক্ত, সে) মানুষ (চরিত্র, বিশ্বাস ও কর্মের দিক দিয়ে এত মন্দ যে, প্রথমত স্বাচ্ছন্দ্য ও অভাব-অনটন কোন অবস্থাতেই সে) উন্নতি কামনায় ক্লান্ত হয় না, (এটা চরম লোভ-লালসার আলামত।) আর (বিশেষ দুঃখ-দৈন্যে তার অবস্থা এই যে,) যদি তাকে কিছু অমঙ্গল স্পর্শ করে, তবে সে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। (এটা চরম অকৃতজ্ঞতা ও আল্লাহ্র প্রতি কুধারণা পোষণ করার আলামত।) আর (দুঃখ-দৈন্য দূর হয়ে গেলে তার অবস্থা এই দাঁড়ায় যে,) বিপদাপদ স্পর্শ করার পর আমি যদি তাকে আমার অনুগ্রহ আস্বাদন করাই; তখন সে বলে, এটা তো আমার প্রাপ্যই ছিল। (কেননা, আমার কলাকৌশল, প্রতিভা ও শ্রেষ্ঠত্ব এরই দাবীদার ছিল। বস্তুত এটাও চরম অকৃতজ্ঞতা ও অহংকার।) এবং (এতে সে এতদূর স্ফীত ও বিস্মৃত হয় যে, বলতে শুরু করে,) আমি মনে করি না যে, কিয়ামত সংঘটিত হবে। যদি (অগত্যা সংঘটিত হয়েই যায় এবং) আমি আমার পালনকর্তার কাছে প্রত্যাবর্তিত হই, (যেমন, পয়গম্বর বলে,) তবে অবশ্যই তাঁর কাছে আমার জন্য কল্যাণই রয়েছে। (কেননা, আমি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এরই যোগ্য পাত্র। এটা আল্লাহ্র ব্যাপারে চরম ধোঁকায় লিপ্ত হওয়ার নামান্তর। মোটকথা, কুফর ও শিরক এমনি অনিষ্টকর ব্যাপার।) অতএব (তারা যত যোগ্যতার দাবিই করুক, সত্বরই) আমি কাফিরদেরকে অবশ্যই তাদের সব কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করব এবং তাদেরকে অবশ্যই কঠিন শাস্তি আস্বাদন করাব। (কুফর ও শিরকের আরও একটি প্রতিক্রিয়া এই যে,) আমি যখন (কাফির ও মুশরিক) মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করি, তখন সে (আমার দিক থেকে ও আমার বিধানাবলী থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং পার্শ্ব পরিবর্তন করে (যা চরম অকৃতজ্ঞতার লক্ষণ বটে।) আর (দুঃখ-দৈন্যের ক্ষেত্রে কুফর ও শিরকের এক প্রতিক্রিয়া এই যে,) তাকে যখন অনিষ্ট স্পষ্ট করে, তখন (নিয়ামত হারানোর ফলে হা-হুতাশের ছলে--- যা অনুনয়-বিনয়ের ছলে হয়) খুব লম্বা-চওড়া দোয়া করতে থাকে। (এটা চরম অধৈর্যতা ও দুনিয়াপ্রীতির আলামত। অতপর রিসালত ও কোরআনের সত্যতার দিকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে ঃ হে পয়গম্বর,) আপনি (কাফিরদেরকে) বলুন, (কোরআনের সত্যতার পক্ষে যেসব প্রমাণ বিধৃত রয়েছে, যেমন, এর অনন্যতা, অদৃশ্যের সঠিক খবর দান প্রভৃতি, চিন্তা-ভাবনার অভাবে তোমরা এগুলোকে বিশ্বাস স্থাপনের কারণ মনে না করলে, কমপক্ষে তার সম্ভাব্যতাকে তো অস্বীকার করতে পার না। কেননা, এর পক্ষে তোমাদের কাছে কোন প্রমাণ নেই। অতএব) তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি এ কোরআন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এসে থাকে, অতপর তোমরা একে অস্বীকার কর, তবে সে ব্যক্তির চাইতে অধিক ভ্রান্ত আর কে, যে (সত্যের) ঘোর বিরোধিতায় লিপ্ত? (তাই তড়িঘড়ি অস্বীকার করো না, বরং ভেবে-চিন্তে দেখ, যেন সত্য ফুটে উঠে। অবশ্য তাদের কাছে এরূপ চিন্তা-ভাবনার আশা করা বৃথা। তাই) এখন আমি (নিজেই) তাদেরকে আমার (কুদরতের) নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করব

(যা রয়েছে) পৃথিবীর দিগন্তে (যেমন, ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী সারা বিশ্বে ইসলামের পতাকা উড্ডীন হবে) এবং (যা রয়েছে) তাদের নিজেদের মধ্যে (যেমন, বদরে তারা নিহত হবে এবং তাদের বাসস্থান মক্কা বিজিত হবে।) ফলে (এসব ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবে পরিণত হওয়ার কারণে) তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, এ কোরআন সত্য। (এর ভবিষ্যদ্বাণী সত্যে পরিণত হচ্ছে। এই অপারগ অবস্থার জ্ঞান যদিও গ্রহণীয় নয়; কিন্তু এতে প্রমাণ আরও জোরদার হবে। তবে বর্তমানে তাদের অস্বীকারের দরুন আপনি দুঃখিত হবেন না। কেননা, তারা যদি আপনার সত্যতার সাক্ষ্য না দেয়, তবে) আপনার পালনকর্তার কথা (আপনার সত্যতার সাক্ষ্য ও সান্ত্বনার জন্য) যথেষ্ট নয় কি? তিনি প্রত্যেক (বাস্তব) বিষয়ের সাক্ষ্যদাতা। (তিনি আপনার রিসালতের সাক্ষ্য দিয়েছেন। অতপর কাফিরদের অস্বীকৃতির প্রকৃত কারণ ব্যক্ত করা হয়েছে। এতে সান্ত্বনাও অধিক হতে পারে।) জেনে রাখ, তারা তাদের পালনকর্তার সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারে সন্দেহে পতিত রয়েছে। (ফলে তাদের অন্তরে এমন ভয়ও নেই যার কারণে সত্যান্বেষণ করবে; কিন্তু) জেনে রাখ, তিনি সবকিছুকে (জ্ঞান দ্বারা) পরিবেষ্টন করে রেখেছেন (সুতরাং তাদের সন্দেহ সম্পর্কেও তিনি জানেন এবং এর শাস্তি দেবেন।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

فَذُوْ دُعَاءٍ عَرِيْضٍ---অর্থাৎ কাফির লোকদের অভ্যাস এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে কোন নিয়ামত, ধনসম্পদ, ইজ্জত ও নিরাপত্তা দিলে সে তাতে মগ্ন ও বিভোর হয়ে আল্লাহ্ তা'আলার কাছ থেকে আরও দূরে চলে যায় এবং তার অহংকার ও উদাসীনতা আরও বেড়ে যায়। পক্ষান্তরে সে কোন বিপদের সম্মুখীন হলে আল্লাহ্র কাছে সুদীর্ঘ দোয়া করতে থাকে। সুদীর্ঘ দোয়াকে এ স্থলে عريض অর্থাৎ প্রশস্ত দোয়া বলা হয়েছে। এতে আতিশয্য প্রকাশ পেয়েছে। কেননা, যে বস্তু প্রশস্ত ও বড়, তা যে দৈর্ঘ্যেও বড় হবে, তা আপনা আপনিই বোঝা যায়। এ কারণেই জান্নাতের বিস্তৃতি বর্ণনা করার ক্ষেত্রেও আল্লাহ্ তা'আলা عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ বলেছেন; অর্থাৎ জান্নাত এত বিস্তৃত যে, তার প্রস্থের মধ্যে সমস্ত আকাশ ও পৃথিবীর সংকুলান হয়ে যায়।

সহীহ্ হাদীস থেকে জানা যায় যে, দোয়ার মধ্যে কাকুতি-মিনতি, কান্নাকাটি ও বার-বার বলা উত্তম---।---(বুখারী, মুসলিম) সেমতে দীর্ঘ দোয়া করা প্রশংসনীয় কাজ। কিন্তু এ স্থলে কাফিরদের নিন্দা দীর্ঘ দোয়ার কারণে করা হয়নি; বরং তার এ সামগ্রিক অভ্যাসের কারণে করা হয়েছে যে, আল্লাহ্র নিয়ামত পেলেই সে অহংকারে মেতে

উঠে এবং বিপদের সম্মুখীন হলেই দুঃখ বর্ণনা করে ফিরে। এতে তার উদ্দেশ্য দোয়া নয়; বরং হা-হুতাশ করা ও মানুষের কাছে তা গেয়ে ফেরা।

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ —অর্থাৎ আমি আমার কুদরত ও তওহীদের নিদর্শনাবলী তাদেরকে দেখাই বিশ্বজগতেও এবং তাদের নিজেদের সত্তার মধ্যেও। آفاق শব্দটি أفق--এর বহুবচন, অর্থ দিগন্ত। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, বিশ্ব-জগতের ছোট-বড় সৃষ্টি তথা আকাশ, পৃথিবী ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী যে কোন বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে তা আল্লাহ্র অস্তিত্ব, তাঁর সর্বব্যাপী জ্ঞান ও কুদরত এবং তাঁর একত্বের সাক্ষ্য দেয়। এর চাইতে আরও নিকটবর্তী বস্তু স্বয়ং মানুষের প্রাণ ও দেহ। তার এক-একটি অঙ্গ এবং তাতে কর্মরত সূক্ষ্ম ও নাজুক যন্ত্রপাতির মধ্যে তার আরাম ও সুখের বিস্ময়কর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এসব যন্ত্রপাতিকে এমন মজবুত করা হয়েছে যে, সত্তর-আশি বছর পর্যন্তও ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। মানুষের গ্রন্থিসমূহে যে স্প্রিং লাগানো হয়েছে, তা মানুষের তৈরি হলে ইস্পাত নির্মিত স্প্রিংও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে খতম হয়ে যেত। মানুষের হাতের চামড়া এবং তাতে অঙ্কিত রেখাও সারা জীবনে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। এসব ব্যাপারে যদি সামান্য জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিও চিন্তা-ভাবনা করে, তবে সে এ বিশ্বাসে উপনীত হতে বাধ্য হবে যে, তার অবশ্যই একজন স্রষ্টা ও প্রতিষ্ঠাতা আছেন, যাঁর জ্ঞান ও কুদরত অসীম এবং যাঁর কোন সমকক্ষ হতে পারে না। فتبارك الله احسن الخالقين

سورة الشورى

সূরা শূরা

মক্কায় অবতীর্ণ, ৫৩ আয়াত, ৫ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

حٰمٓ ۝١ عٓسٓقٓ ۝٢ كَذٰلِكَ يُوْحِيْٓ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ ۙ
اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝٣ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ
وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ۝٤ تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ
فَوْقِهِنَّ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ
لِمَنْ فِي الْاَرْضِ ؕ اَلَآ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ۝٥ وَالَّذِيْنَ
اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ اللّٰهُ حَفِيْظٌ عَلَيْهِمْ ۖ وَمَآ اَنْتَ
عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ ۝٦ وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا
لِّتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ
فِيْهِ ؕ فَرِيْقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيْقٌ فِي السَّعِيْرِ ۝٧ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَعَلَهُمْ
اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ يُّدْخِلُ مَنْ يَّشَآءُ فِيْ رَحْمَتِهٖ ؕ وَالظّٰلِمُوْنَ
مَا لَهُمْ مِّنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ۝٨ اَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ ۚ
فَاللّٰهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِ الْمَوْتٰى ؗ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝٩

পরম করুণাময় ও অসীম দাতা আল্লাহ্‌র নামে শুরু--

(১) হা-মীম, (২) আইন, সীন, ক্কা-ফ। (৩) এমনিভাবে পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্ আপনার প্রতি ও আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি ওহী প্রেরণ করেন। (৪) নভোমণ্ডলে যা কিছু আছে এবং ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সমস্তই তাঁর। তিনি সমুন্নত, মহান। (৫) আকাশ উপর থেকে ফেটে পড়ার উপক্রম হয় আর তখন ফেরেশতাগণ তাদের পালনকর্তার প্রশংসাসহ পবিত্রতা বর্ণনা করে এবং পৃথিবীবাসীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। শুনে রাখ, আল্লাহ্‌ই ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়। (৬) যারা আল্লাহ্ ব্যতীত অপরকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করে, আল্লাহ্ তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখেন। আপনার উপর নয় তাদের দায়-দায়িত্ব। (৭) এমনিভাবে আমি আপনার প্রতি আরবী ভাষায় কোরআন নাযিল করেছি, যাতে আপনি মক্কা ও তার আশে-পাশের লোকদের সতর্ক করেন এবং সতর্ক করেন সমাবেশের দিন সম্পর্কে, যাতে কোন সন্দেহ নেই। একদল জান্নাতে এবং একদল জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (৮) আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে সমস্ত লোককে এক দলে পরিণত করতে পারেন। কিন্তু তিনি যাকে ইচ্ছা স্বীয় রহমতে দাখিল করেন। আর জালিমদের কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী নেই। (৯) তারা কি আল্লাহ্ ব্যতীত অপরকে অভিভাবক স্থির করেছে? পরন্তু আল্লাহ্‌ই তো একমাত্র অভিভাবক। তিনি মৃতদেরকে জীবিত করেন। তিনি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হা-মীম, আইন-সীন, ক্কা-ফ---(এর অর্থ আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন। ধর্মের মূলনীতি নিরূপণ ও অন্যান্য মহা-উপকারের জন্য যেমন আপনার প্রতি এ সূরা নাযিল হচ্ছে,) এমনিভাবে পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় আল্লাহ তা'আলা আপনার প্রতি ও আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি (অন্যান্য সূরা ও কিতাবের) ওহী প্রেরণ করেন। (তাঁর শান এই যে,) নভোমণ্ডলে যা কিছু আছে এবং ভূ-মণ্ডলে যা কিছু আছে সমস্তই তাঁর, তিনিই সমুন্নত, মহান। (মর্তবাসীরা যদি তাঁর মাহাত্ম্য না বুঝে ও না মানে, তবে আকাশে তাঁর মাহাত্ম্য সম্পর্কে জ্ঞানী এত বিপুল সংখ্যক ফেরেশতা রয়েছে যে, তাদের বোঝার কারণে) আকাশ উপর থেকে ফেটে পড়ার উপক্রম হয়, (যেমন হাদীসে আছেঃ أطت السماء وحق لها ان تئط ما فيها موضع اربعة اصابع الا وملك واضع جبهته ساجدا لله---অর্থাৎ আকাশে এমন আওয়ায হতে লাগলো, যেমন কোন বস্তুর উপর বেশি বোঝা চেপে যাওয়ার কারণে হয়। আর এরূপ আওয়ায হওয়াই সঙ্গত। কেননা, সমগ্র আকাশে চার আঙ্গুল পরিমাণ জায়গাও এমন নেই, যেখানে কোন ফেরেশতা মস্তক ঠুকে সিজদারত না আছে) ফেরেশতাগণ তাদের পালনকর্তার প্রশংসাসহ পবিত্রতা বর্ণনা করে এবং মর্তবাসীদের (মধ্যে যারা তাঁর মাহাত্ম্য বুঝে না এবং কুফর ও শিরকে লিপ্ত আছে, ফলে আযাবের যোগ্য হয়ে গেছে, সেই ফেরেশতাগণ তাদের) জন্য (বিশেষ সময় পর্যন্ত) ক্ষমা

প্রার্থনা করে। (অর্থাৎ এ দোয়া করে যে, দুনিয়াতে তাদের উপর যেন কঠোর আযাব নাযিল না হয়, যার ফলে সকলেই ধ্বংস হয়ে যায়। দুনিয়ার সামান্য শাস্তি ও পরকালের প্রকৃত আযাব এই ক্ষমার প্রার্থনার বাইরে। আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাদের এই দোয়া কবুল করে কাফিরদেরকে দুনিয়ার ব্যাপক আযাব থেকে বাঁচিয়ে রাখেন।) জেনে রাখ, আল্লাহ্ তা'আলাই ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়। যারা আল্লাহ্র পরিবর্তে অপরকে অভিভাবক গ্রহণ করেছে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের (মন্দ কর্মের) প্রতি দৃষ্টি রাখেন (উপযুক্ত সময়ে এর শাস্তি দেবেন)। আপনি তাদের কার্যনির্বাহী নন (যে যখন ইচ্ছা, তাদের উপর আযাব নাযিল করবেন। তাদের উপর তাৎক্ষণিক আযাব না আসার কারণে আপনার দুঃখিত হওয়া উচিত নয়; কেননা, আপনার প্রচার কাজ আপনি করেছেন। এর বেশী কোন কিছুর চিন্তা করবে না। সেমতে) আমি এমনিভাবে (যেমন আপনি দেখছেন) আপনার প্রতি আরবী ভাষায় কোরআন নাযিল করেছি, যাতে আপনি (সর্বপ্রথম) মক্কা ও তার আশেপাশের লোকদেরকে সতর্ক করেন এবং সতর্ক করেন সমবেত হওয়ার দিন (অর্থাৎ কিয়ামত) সম্পর্কে (যাতে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সব মানুষ এক ময়দানে একত্রিত হবে)—এতে মোটেই সন্দেহ নেই। (সেদিন ফয়সালা হবে যে,) একদল জান্নাতে এবং একদল জাহান্নামে প্রবিষ্ট হবে। (সুতরাং আপনার কাজ কেবল সেদিন সম্পর্কে সতর্ক করা। তাদের ঈমান আনা না আনা আল্লাহ্র ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল।) আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তাদের সকলকে এক সম্প্রদায়ে পরিণত করতে পারতেন (অর্থাৎ সকলেই মু'মিন হতে পারত। যেমন আল্লাহ্ বলেন: وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا অর্থাৎ আমি ইচ্ছা করলে প্রত্যেককে হেদায়েত দিতে পারতাম।) কিন্তু (অনেক রহস্যের কারণে তিনি তা চাননি; বরং) তিনি যাকে ইচ্ছা (ঈমান দিয়ে) স্বীয় রহমতে দাখিল করেন (এবং যাকে ইচ্ছা, কুফর ও শিরকের মধ্যে ছেড়ে দেন। ফলে সে রহমতে দাখিল হয় না।) আর জালিমদের (অর্থাৎ যারা কুফর ও শিরকে লিপ্ত কিয়ামতের দিন) কোন অভিভাবক নেই ও সাহায্যকারী নেই। (অতপর শিরক বাতিল করা হয়েছে,) তারা কি আল্লাহ্ ব্যতীত অপরকে অভিভাবক স্থির করেছে। পরন্তু (যদি অভিভাবক করতে হয়, তবে) আল্লাহ্ তা'আলাই তো অভিভাবক (হওয়ার যোগ্য)। তিনি মৃতদেরকে জীবিত করেন এবং তিনিই সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান (অতএব অভিভাবক করার যোগ্য তিনিই। তাঁর ক্ষমতার বৈশিষ্ট্য এই যে, অন্যান্য বিষয়ের উপর নামেমাত্র কিছু ক্ষমতা অন্যদের রয়েছে, কিন্তু মৃতদেরকে জীবিত করার ক্ষমতায় অন্য কেউ নামেমাত্রও শরীক নয়)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

يَتَفَطَّرْنَ—এতে হাদীসের বরাত দিয়ে উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, ফেরেশতাদের বোঝার চাপে আকাশে এমন আওয়াজ সৃষ্টি হয়, যেমন কোন বস্তুর উপর ভারী বোঝা

পতিত হলে সৃষ্টি হয়। এতে বোঝা গেল যে, ফেরেশতাদের ওজন আছে এবং তা ভারী, এটা অবান্তরও নয়। কেননা, এটা স্বীকৃত যে, ফেরেশতাগণও দেহবিশিষ্ট যদিও তা খুব সূক্ষ্ম। সূক্ষ্ম দেহও বহুসংখ্যক একত্রিত হলে ভারী হওয়া অসম্ভব নয়। ---(বয়ানুল কোরআন)।

لِتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰى—ام القرى-এর অর্থ সকল জনপদ ও শহরের মূল ও ভিত্তি। এখানে মক্কা মোকাররমা বোঝানো হয়েছে। এই নামকরণের হেতু এই যে, এ শহরটি সমগ্র বিশ্বের শহর-জনপদ এমনকি ভূ-পৃষ্ঠ অপেক্ষা আল্লাহ্‌র কাছে অধিক সম্মানিত ও শ্রেষ্ঠ। মসনদে আহমদের রেওয়ায়েতে আদী ইবনে হামরা যুহরী বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মক্কা থেকে হিজরত করছিলেন এবং হাযুরা নামক স্থানে ছিলেন তখন আমি শুনেছি তিনি মক্কাকে সম্বোধন করে বলেছিলেন ঃ

انك لخير ارض الله وحب ارض الله الى ولو لا انى اخرجت منك لما خرجت -—তুমি আমার কাছে আল্লাহ্‌র সমগ্র পৃথিবী থেকে শ্রেষ্ঠ এবং সমগ্র পৃথিবী অপেক্ষা অধিক প্রিয়। যদি আমাকে তোমার থেকে বহিষ্কার করা না হত, তবে আমি কখনও স্বেচ্ছায় তোমাকে ত্যাগ করতাম না।

وَمَنْ حَوْلَهَا---অর্থাৎ মক্কা মোকাররমার আশপাশ। এর অর্থ আশেপাশের আরব দেশসমূহও হতে পারে এবং পূর্ব-পশ্চিম সমগ্র বিশ্বও হতে পারে।

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ۝ فَاطِرُ السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۝ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

---

(১০) তোমরা যে বিষয়েই মতভেদ কর, তার ফয়সালা আল্লাহ্‌র কাছে সোপর্দ। ইনিই আল্লাহ্---আমার পালনকর্তা। আমি তাঁরই উপর নির্ভর করি এবং তাঁরই

অভিমুখী হই। (১১) তিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের স্রষ্টা। তিনি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের জন্য যুগল সৃষ্টি করেছেন এবং চতুষ্পদ জন্তুদের মধ্য থেকে জোড়া সৃষ্টি করেছেন। এভাবে তিনি তোমাদের বংশ বিস্তার করেন। কোন কিছুই তাঁর অনুরূপ নয়। তিনি সব শুনেন, সব দেখেন। (১২) আকাশ ও পৃথিবীর চাবি তাঁর কাছে। তিনি যার জন্য ইচ্ছা রিযিক বৃদ্ধি করেন এবং পরিমিত করেন। তিনি সর্ব বিষয়ে জ্ঞানী।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(যারা তওহীদে আপনার সাথে মতভেদ করে, আপনি তাদেরকে বলুন,) যেসব বিষয়ে তোমরা (সত্যপন্থীদের সাথে) মতভেদ কর, তার ফয়সালা আল্লাহ্ তা'আলার কাছে সোপর্দ রয়েছে। (তা এই যে, তিনি দুনিয়াতে প্রমাণাদি ও মু'জিযার মাধ্যমে তওহীদের সত্যতা প্রকাশ করে দিয়েছেন এবং পরকালে মু'মিনদেরকে জান্নাত দেবেন ও কাফিরদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।) ইনিই আল্লাহ্ (যাঁর এই শান) আমার পালনকর্তা। (তোমাদের বিরোধিতার কারণে যে কষ্ট ও ক্ষতির আশংকা রয়েছে, সে সম্পর্কে) আমি তাঁরই উপর নির্ভর করি এবং (সব কাজে) তাঁরই প্রতি প্রত্যাগমন করি। (এতে তওহীদের বিষয়বস্তু দৃঢ় ভিত্তির উপর সাব্যস্ত হয়ে গেছে। অতপর আরও গুণাবলী বর্ণনা করে একে অধিকতর জোরদার করা হয়েছে।) তিনি আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা (এবং তোমাদেরও স্রষ্টা। সেমতে) তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের সমশ্রেণীর যুগল সৃষ্টি করেছেন এবং (এমনিভাবে) চতুষ্পদ জন্তুদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন। এভাবে (অর্থাৎ জোড়া সৃষ্টির মাধ্যমে) তিনি তোমাদের বংশ বিস্তার করেন। (তাঁর সত্তা ও গুণ এমন পরিপূর্ণ যে,) কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। (অন্যদের শোনা ও দেখা খুবই সীমিত।) আকাশ ও পৃথিবীর চাবি তাঁরই ইখতিয়ারে। (অর্থাৎ এসবে কর্ম পরিচালনার অধিকার একমাত্র তাঁরই। আর তাঁর এক কর্ম পরিচালনা এই যে,) তিনি যার জন্য ইচ্ছা, অধিক রিযিক দেন এবং (যার জন্য ইচ্ছা) জীবিকা পরিমিত করে দেন। নিশ্চয় তিনি সর্ববিষয়ে পূর্ণ জ্ঞানী (প্রত্যেককে উপযোগিতা অনুযায়ী দেন)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ——অর্থাৎ যে ব্যাপারে ও যে কাজে তোমাদের পারস্পরিক মতভেদ হয়, তার ফয়সালা আল্লাহ্র কাছেই সমর্পিত রয়েছে। কেননা, আল্লাহ্র ফয়সালাই আসল ফয়সালা। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ——অন্যান্য অধিকাংশ আয়াতে রসূলের এবং কোন কোন আয়াতে শাসকবর্গের আনুগত্যের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেসব আয়াত এর পরিপন্থী নয়।

কেননা, রসূল ও শাসকবর্গের ফয়সালা একদিক দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলারই ফয়সালা হয়ে থাকে। তাঁরা ওহীর মাধ্যমে অথবা কিতাব ও সুন্নাহ্ অনুযায়ী ফয়সালা করলে তা আল্লাহ্র ফয়সালা হওয়া সুস্পষ্ট। আর যদি তাঁরা ইজতিহাদ দ্বারা ফয়সালা করেন, তবে ইজতেহাদের ভিত্তিও কোরআন ও সুন্নাহ্ হয়ে থাকে। তাই এ ফয়সালাও প্রকারান্তরে আল্লাহ্ তা'আলারই ফয়সালা। মুজতাহিদগণের ইজতিহাদও এ দিক দিয়ে আল্লাহ্র বিধানাবলীর অন্তর্ভুক্ত। এ কারণেই আলিমগণ বলেন, কোরআন ও সুন্নাহ্ বোঝার যোগ্যতা রাখে না, এমন সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে মুফতীর ফতোয়াই শরীয়তের বিধান।

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّ الَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ
اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖٓ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰٓى اَنْ اَقِيْمُوا
الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ ؕ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا تَدْعُوْهُمْ
اِلَيْهِ ؕ اَللّٰهُ يَجْتَبِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ ﴿١٣﴾
وَمَا تَفَرَّقُوْٓا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًاۢ بَيْنَهُمْ ؕ
وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ ؕ
وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْرِثُوا الْكِتٰبَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ ﴿١٤﴾
فَلِذٰلِكَ فَادْعُ ۚ وَاسْتَقِمْ كَمَآ اُمِرْتَ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ ۚ
وَقُلْ اٰمَنْتُ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِتٰبٍ ۚ وَاُمِرْتُ لِاَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ؕ
اَللّٰهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ؕ لَنَآ اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ ؕ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا
وَبَيْنَكُمْ ؕ اَللّٰهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا ۚ وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ﴿١٥﴾

---

(১৩) তিনি তোমাদের জন্য দীনের ক্ষেত্রে সে পথই নির্ধারিত করেছেন, যার আদেশ দিয়েছিলেন নূহকে, যা আমি প্রত্যাদেশ করেছি আপনার প্রতি এবং যার আদেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে এই মর্মে যে, তোমরা দীনকে প্রতিষ্ঠিত কর

এবং তাতে অনৈক্য সৃষ্টি করো না। আপনি মুশরিকদেরকে যে বিষয়ের প্রতি আমন্ত্রণ জানান, তা তাদের কাছে দুঃসাধ্য বলে মনে হয়। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন এবং যে তাঁর অভিমুখী হয়, তাকে পথ প্রদর্শন করেন। (১৪) তাদের কাছে জ্ঞান আসার পরই তারা পারস্পরিক বিভেদের কারণে মতভেদ করেছে। যদি আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশের পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকত, তবে তাদের ফয়সালা হয়ে যেত। তাদের পর যারা কিতাব প্রাপ্ত হয়েছে, তারা অস্বস্তিকর সন্দেহে পতিত রয়েছে। (১৫) সুতরাং আপনি এর প্রতিই দাওয়াত দিন এবং হুকুম অনুযায়ী অবিচল থাকুন; আপনি তাদের খেয়ালখুশীর অনুসরণ করবেন না। বলুন, আল্লাহ্ যে কিতাব নাযিল করেছেন, আমি তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আমি তোমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করতে আদিষ্ট হয়েছি। আল্লাহ্ আমাদের পালনকর্তা ও তোমাদের পালনকর্তা। আমাদের জন্য আমাদের কর্ম এবং তোমাদের জন্য তোমাদের কর্ম। আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে বিবাদ নেই। আল্লাহ্ আমাদেরকে সমবেত করবেন এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন হবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আল্লাহ্ তা'আলা দীনের ক্ষেত্রে তোমাদের জন্য সে পথই নির্ধারিত করেছেন, যার আদেশ তিনি নূহ (আ)-কে দিয়েছিলেন এবং যা আমি আপনার প্রতি প্রত্যাদেশ করেছি যার আর আদেশ ইবরাহীম, মূসা ও ঈসা (আ)-কে দিয়েছিলাম এই মর্মে যে, তোমরা এ ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত রাখ এবং এতে বিভেদ সৃষ্টি করো না। (এখানে 'ধর্ম' বলে সকল শরীয়তের অভিন্ন মূলনীতি বোঝানো হয়েছে। যেমন, তওহীদ, রিসালত, পুনরুত্থান ইত্যাদি। প্রতিষ্ঠিত রাখার অর্থ পরিবর্তন ও বর্জন না করা। বিভেদ সৃষ্টির অর্থ কোন বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করা ও কোন বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন না করা অথবা কোন একজনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ও অন্যদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করা। সার কথা এই যে, তওহীদ ইত্যাদি বিষয় সনাতন ধর্ম এবং শুরু থেকে এ পর্যন্ত সকল শরীয়তে সর্বসম্মত। এ প্রসঙ্গেই রিসালতও সমর্থিত হয়ে গেছে। সুতরাং এটা কবুল করতে কারও ইতস্তত করা উচিত ছিল না, কিন্তু তবুও) মুশরিকদের কাছে সে বিষয় (অর্থাৎ তওহীদ) দুঃসাধ্য মনে হয়, যার প্রতি আপনি তাদেরকে দাওয়াত দেন। (আর এটাও বাস্তব সত্য যে,) আল্লাহ্ নিজের দিকে যাকে ইচ্ছা আকৃষ্ট করেন (অর্থাৎ সত্যধর্ম কবুল করার তওফীক দেন) এবং যে আল্লাহ্র অভিমুখী হয় তাকে পথ প্রদর্শন করেন। মোটকথা, মুশরিকদের পরিচয় হচ্ছে অস্বীকার করা এবং মু'মিনদের গুণ হচ্ছে আল্লাহ্র মনোনয়ন লাভ করা ও সুপথ পাওয়া। ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত রাখা ও বিভেদ সৃষ্টি না করার আদেশের উপর পূর্ববর্তী উম্মতদের অনেকেই কায়েম থাকেনি এবং বিভক্ত হয়ে যায়। এর কারণ সন্দেহ ও সংশয় ছিল না, বরং) তাদের কাছে (অর্থাৎ তাদের শ্রবণে সঠিক) জ্ঞান আসার পরই কেবল তারা পারস্পরিক বিভেদের কারণে মতভেদ করেছে (প্রথমে ধন-সম্পদ, প্রভাব-

প্রতিপত্তি ও নেতৃত্ব-কামনার কারণে তাদের স্বার্থ বিভিন্নরূপ হয়েছে, অতপর বিভিন্ন দল সৃষ্টি হয়েছে। এহেন পরিস্থিতিতে ধর্মকেও পারস্পরিক ছিদ্রান্বেষণ ও দোষারোপের হাতিয়ার করা হয় এবং আস্তে আস্তে ধর্মেও বিভিন্নতা দেখা দেয়। সত্যকে বোঝার পর বিভক্ত হওয়ার এই গুরুতর অপরাধের কারণে তারা এমন কঠোর আযাবের যোগ্য হয়ে গিয়েছিল যে,) যদি আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দেয়ার পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকত (যে, তাদের প্রতিশ্রুত আযাব পরকালে হবে), তবে (দুনিয়াতেই) তাদের (মতভেদের) ফয়সালা হয়ে যেত। (অর্থাৎ আযাব দ্বারা তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হত। পূর্ববর্তী উম্মতদের মধ্যে যারা মু'মিন ছিল না, তাদের উপর আযাব এসেছে। মু'মিনদের মধ্যে যারা বিভেদ সৃষ্টি করেছে, ঈমানের বরকতে তাদের উপর আযাব আসেনি। এর কারণ নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দানের পূর্ব সিদ্ধান্ত।) তাদের (অর্থাৎ পূর্ববর্তী উম্মতদের) পরে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে, [অর্থাৎ আরবের মুশরিক সম্প্রদায়কে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-র মাধ্যমে কোরআন দেয়া হয়েছে।] তারা এ ব্যাপারে অস্বস্তিকর সন্দেহে পতিত রয়েছে। সুতরাং আপনি কারও অস্বীকৃতির দরুন মনঃক্ষুণ্ণ হবেন না, বরং পূর্ব থেকে যে তওহীদের দিকে তাদেরকে দাওয়াত দিচ্ছেন, তারই দিকে দাওয়াত দিন এবং (فَلِذٰلِكَ فَادْعُ) আদেশ অনুযায়ী (তাতেই) অবিচল থাকুন। আপনি তাদের (দুষ্ট) খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করবেন না। (অর্থাৎ তাদের বিরোধিতার উদ্দেশ্য এই যে, আপনি দাওয়াত পরিত্যাগ করুন। কাজেই আপনি দাওয়াত পরিত্যাগ করবেন না।) আপনি বলুন, (যে বিষয়ের দিকে আমি তোমাদেরকে আহবান করি, আমি নিজেও তা পালন করি। সেমতে) আল্লাহ্ যত কিতাব নাযিল করেছেন, (কোরআনও তার মধ্যে একটি) আমি সবগুলোর প্রতি বিশ্বাস রাখি। আমি (আমার ও) তোমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করতে আদিষ্ট হয়েছি। (অর্থাৎ যে বিষয়গুলো তোমাদের উপর ওয়াজিব বলি, নিজের জন্যও তা ওয়াজিব বলেই মনে করি। এতেও যদি তোমরা নমনীয় না হও, তবে শেষ কথা এই যে,) আল্লাহ্ আমাদেরও মালিক তোমাদেরও মালিক (এবং সবার শাসক)। আমাদের কর্ম আমাদের জন্য এবং তোমাদের কর্ম তোমাদের জন্য। আমাদের ও তোমাদের কোন বিবাদ নেই। আল্লাহ্ (যিনি সবার মালিক, কিয়ামতে) আমাদের সবাইকে সমবেত করবেন। (নিঃসন্দেহে) তাঁরই কাছে আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে। (তিনি আমল অনুযায়ী ফয়সালা করবেন। এখন তোমাদের সাথে বিতর্ক অর্থহীন। তবে আমি যথারীতি প্রচারকার্য চালিয়ে যাব।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا —পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলার প্রদত্ত বাহ্যিক ও দৈহিক নিয়ামত উল্লিখিত হয়েছিল। এখান থেকে আধ্যাত্মিক

নেয়ামতসমূহের বর্ণনা শুরু হচ্ছে। তা এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে এক মজবুত ও সুদৃঢ় ধর্ম দান করেছেন, যা সমস্ত পয়গম্বরেরই অভিন্ন ও সর্বসম্মত ধর্ম। আয়াতে পাঁচ জন পয়গম্বরের উল্লেখ রয়েছে। সর্বপ্রথম নূহ (আ) ও সর্বশেষ আমাদের রসূল (সা) এবং মাঝখানে পয়গম্বরগণের পিতা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর নাম উল্লেখ রয়েছে। কুফর ও শিরক সত্ত্বেও আরবের লোকেরা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর নবুয়ত স্বীকার করত। কোরআন অবতরণের সময় হযরত মূসা ও ঈসা (আ)-র ভক্ত ইহুদী ও খৃস্টান সম্প্রদায় বিদ্যমান ছিল। তাই হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পরে এ দু'জন পয়গম্বরের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা আযহাবেও পয়গম্বরগণের অঙ্গীকার গ্রহণ প্রসঙ্গে এ পাঁচজন পয়গম্বরেরই নাম উল্লেখিত হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

وَاِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّيْنَ مِيْثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُّوْحٍ وَّاِبْرَاهِيْمَ

وَمُوْسٰى وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ পার্থক্য এই যে, সূরা আহযাবে শেষ নবী (সা)-র নাম প্রথমে এবং নূহ (আ)-র নাম শেষে রয়েছে। এতে সম্ভবত ইঙ্গিত রয়েছে যে, খাতামুল আম্বিয়া (সা.) যদিও আবির্ভাবের দিক দিয়ে সবার শেষে এসেছেন কিন্তু নবুয়ত বন্টনে সবার অগ্রে। এক হাদীসে বলা হয়েছে, আমি সৃষ্টি ক্ষেত্রে সকল পয়গম্বরের অগ্রবর্তী এবং আবির্ভাবে শেষে।--- (ইবনে মাজা, দারেমী)

এখন প্রশ্ন হয় যে, হযরত আদম (আ) সর্বপ্রথম পয়গম্বর। তাঁর নামের উল্লেখের দ্বারা পয়গম্বরগণের আলোচনা শুরু করা হল না কেন? জওয়াব এই যে, দুনিয়াতে আগমনকারী সর্ব প্রথম পয়গম্বর ছিলেন আদম (আ.)। মৌলিক বিশ্বাস ও ধর্মের প্রধান প্রধান বিষয়াদিতে তিনিও অভিন্ন ছিলেন, কিন্তু তাঁর আমলে মানুষের মধ্যে কুফর ও শিরক ছিল না। কুফর ও শিরকের সাথে দ্বন্দ্ব হযরত নূহ্ (আ.)-র আমল থেকে শুরু হয়েছে। কাজেই এ ধরনের গুরুতর পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ার দিক দিয়ে নূহ (আ.)-ই প্রথম পয়গম্বর। তাই তাঁর মাধ্যমেই পয়গম্বরগণের আলোচনা শুরু করা হয়েছে।

اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ---এটা পূর্ববর্তী বাক্যেরই ব্যাখ্যা। অর্থাৎ যে দীন বা ধর্ম মতে পয়গম্বরগণ সকলেই অভিন্ন ও এক, সে ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত রাখ, তাতে বিভেদ ও অনৈক্য বৈধ নয়; বরং ধ্বংসের কারণ।

ধর্ম প্রতিষ্ঠিত রাখা ফরয এবং বিভেদ সৃষ্টি করা হারাম ঃ এ আয়াতে ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করা এবং তাতে বিভেদ সৃষ্টির নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে। ধর্ম বলে সকল পয়গম্বরের অভিন্ন ধর্মকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ মৌলিক বিশ্বাস---যেমন তওহীদ, রিসালত, পরকালে বিশ্বাস এবং মৌলিক ইবাদত---যেমন নামায, রোযা, হজ্জ ও

যাকাতের বিধান মেনে চলা। এ ছাড়া চুরি, ডাকাতি, ব্যভিচার, মিথ্যা, প্রতারণা, অপরকে বিনা কারণে নিপীড়ন করা, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করার মত অনাচারসমূহের নিষিদ্ধতা। এগুলো সমস্ত ঐশী ধর্মেরই অভিন্ন ও সর্বসম্মত বিষয়। শাখা বিধান-সমূহে পয়গম্বরগণের শরীয়তে আংশিক বিভিন্নতাও রয়েছে। কোরআনে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে : لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ---অতএব পয়গম্বরগণের অভিন্ন বিধানাবলীতে বিভেদ সৃষ্টি করা হারাম এবং ধ্বংসের কারণ।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা) বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের সামনে একটি সরল রেখা টানলেন। অতপর এর ডানে ও বাঁয়ে আরও কয়েকটি রেখা টেনে বললেন, ডান-বামের এসব রেখা শয়তানের আবিষ্কৃত পথ। এর প্রত্যেক-টিতে একটি করে শয়তান নিয়োজিত রয়েছে। সে মানুষকে সে পথেই চলার উপদেশ দেয়। অতপর তিনি মধ্যবর্তী সরল রেখার দিকে ইশারা করে বললেন : وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ----এটা আমার সরল পথ। তোমরা এরই অনুসরণ কর।---(মাযহারী)

এ দৃষ্টান্তে সরল পথ বলে পয়গম্বরগণের অভিন্ন ধর্মের পথই বোঝানো হয়েছে। এতে শাখা-প্রশাখা বের করা ও বিভেদ সৃষ্টি করা হারাম ও শয়তানের কাজ। এ সম্পর্কে হাদীসের কঠোর নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে। রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন :

من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الاسلام عن عنقه ----অর্থাৎ যে ব্যক্তি মুসলমানদের জামাত থেকে অর্ধহাত পরিমাণও দূরে সরে পড়ে, সে ইসলামের বন্ধনই তার কাঁধ থেকে সরিয়ে দিল। তিনি আরও বলেন : يد الله على الجماعة -- অর্থাৎ জামাতের উপর আল্লাহ্‌র রহমতের হাত রয়েছে। হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, শয়তান মানুষের জন্য ব্যাঘ্র-স্বরূপ। বাঘ ছাগলের পেছনে লাগে অতপর যে ছাগল পালের পেছনে অথবা এদিক ওদিক বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে, সেটির উপরই পতিত হয়। তাই তোমাদের উচিত দলের সঙ্গে থাকা--পৃথক না থাকা।---(মাযহারী)

সারকথা এই যে, এ আয়াতে সকল পয়গম্বর কর্তৃক অনুসৃত অভিন্ন ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত রাখার আদেশ রয়েছে। এতে মতভেদকে تفرق শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। হাদীসে এ মতভেদকেই ঈমানের জন্য বিপজ্জনক ও ধ্বংসের কারণ বলা হয়েছে।

মুজতাহিদ ইমামগণের শাখাগত মতভেদ এতে দাখিল নয় : শাখাগত মাস'আ-লার ব্যাপারে যে ক্ষেত্রে কোরআন ও হাদীসে কোন স্পষ্ট বিধান নেই, অথবা কোন

বাহ্যিক বৈপরীত্য আছে, সেখানে মুজতাহিদ ইমামগণ নিজ নিজ ইজতিহাদ দ্বারা বিধান বর্ণনা করেছেন এবং এতে মতাদর্শের বিভিন্নতার কারণে পরস্পরের মধ্যে মত-ভেদও হয়েছে। আয়াতে নিষিদ্ধ মতভেদের সাথে এই মতভেদের কোন সম্পর্ক নেই। এ ধরনের মতভেদ রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আমল থেকে সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে হয়ে আসছে এবং এটা যে উম্মতের জন্য রহমতস্বরূপ, এ বিষয়ে ফিকাহ্‌বিদগণ একমত।

كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا تَدْعُوْهُمْ اِلَيْهِ---অর্থাৎ তওহীদ সত্য প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও তওহীদের দাওয়াত মুশরিকদের কাছে কঠিন ঠেকে। এর কারণ খেয়াল-খুশী ও শয়তানী শিক্ষার অনুসরণ এবং সরল পথ বর্জন। এরপর বলা হয়েছে ঃ

اَللّٰهُ يَجْتَبِىْٓ اِلَيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِىْٓ اِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ---অর্থাৎ সরলপথ প্রাপ্তির দু'টিই উপায়। এক---আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং কাউকে সরল পথের জন্য মনো-নীত করে তার স্বভাব ও মজ্জাকে তার উপযোগী করে দিলে। যেমন, পয়গম্বর ও ওলীগণকে দেওয়া হয়েছিল। তাদের সম্পর্কে কোরআন বলে ঃ

اِنَّآ اَخْلَصْنٰهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ---অর্থাৎ আমি তাদেরকে বিশেষ কাজের জন্য খাঁটিভাবে তৈরি করে নিয়েছি। বিশেষ বিশেষ পয়গম্বর সম্পর্কে কোর-আনে مُخْلَصٌ (অর্থাৎ মনোনীত) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতের অর্থও তাই। এ ধরনের হিদায়ত খুবই সীমিত। সরলপথ প্রাপ্তির দ্বিতীয় উপায় হচ্ছে ---যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র অভিমুখী হয় এবং তাঁর দীন মেনে চলার ইচ্ছা করে, আল্লাহ্ তাকে সত্য ধর্মের হিদায়ত দান করেন। يَهْدِىْٓ اِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ---বাক্যের অর্থ তাই। এ উপায়ের পরিধি ব্যাপক ও বিস্তৃত। অতএব মুশরিকদের কাছে তওহীদের দাওয়াত কঠিন ঠেকার কারণ এই যে, তারা ধর্মকে বোঝার এবং তা মেনে চলার ইচ্ছাও করে না।

وَمَا تَفَرَّقُوْٓا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ---হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এখানে কুরাইশ কাফিরদের অবস্থা বর্ণনা করে বলা হয়েছে, সত্যধর্ম ও সরল পথের প্রতি তাদের বিমুখতা এমনিতেও নির্বুদ্ধিতা প্রসূত ছিল, তদুপরি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে জ্ঞান এসে যাওয়ার পর তারা এরূপ করেছে। জ্ঞান এসে যাওয়ার অর্থ হযরত ইবনে আব্বাসের মতে যাবতীয় জ্ঞান-গরিমার উৎস রসূলে করীম (সা)-এর আগমন। কেউ কেউ এই অর্থ বর্ণনা করেন যে, পূর্ববর্তী উম্মতরা নিজেদের পয়গম্বরগণের ধর্ম

থেকে আলাদা ও বিচ্ছিন্ন রয়েছে, অথচ তাদের কাছে পয়গম্বরগণের মাধ্যমে সরল-পথের সঠিক জ্ঞান এসে গিয়েছিল। পূর্ববর্তী উম্মতদের কথা বলা হোক অথবা কুরাইশ কাফিরদের কথা বলা হোক---উভয় অবস্থায় তারা নিজেরা তো পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত ছিলই, রসূলগণকেও তাদের পথে চালানোর প্রয়াসী ছিল। তাই অতপর রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছেঃ

فَلِذٰلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ اٰمَنْتُ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِتَابٍ وَاُمِرْتُ لِاَعْدِلَ بَيْنَكُمْ - اَللّٰهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ - اَللّٰهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ -

হাফেয ইবনে কাসীর বলেন, দশটি বাক্য সম্বলিত এই আয়াতের প্রত্যেকটি বাক্যে বিশেষ বিশেষ বিধান বর্ণিত হয়েছে। সমগ্র কোরআনে আয়াতুল-কুরসীই এর একমাত্র নযীর। তাতেও দশটি বিধান বিধৃত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতের প্রথম বিধান হচ্ছে فَلِذٰلِكَ فَادْعُ---অর্থাৎ যদিও মুশরিকদের কাছে আপনার তওহীদী দাওয়াত কঠিন মনে হয়, তথাপি আপনি এ দাওয়াত ত্যাগ করবেন না এবং উপর্যুপরি দাও-য়াতের কাজ অব্যাহত রাখুন। দ্বিতীয় বিধান---وَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ অর্থাৎ আপনি এ ধর্মে নিজে অবিচল থাকুন, যেমন আপনাকে আদেশ করা হয়েছে। অর্থাৎ যাবতীয় বিশ্বাস, কর্ম, চরিত্র, অভ্যাস ও সামাজিকতায় যথাযথ সমতা ও ভারসাম্য কায়েম রাখুন। কোন দিকেই যেন কোনরূপ বাড়াবাড়ি না হয়। বলা বাহুল্য, এরূপ দৃঢ়তা সহজসাধ্য নয়। একারণেই কোন কোন সাহাবী রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে তাদের চুলে পাক ধরে যাওয়ার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেনঃ شَيَّبَتْنِىْ هُوْدٌ অর্থাৎ সূরা হূদ আমাকে বৃদ্ধ করে দিয়েছে। সূরা হূদেও এই আদেশ এভাষায়ই ব্যক্ত হয়েছে। চতুর্থ খণ্ডে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় বিধান---وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ---অর্থাৎ প্রচারের দায়িত্ব পালনে আপনি কারও বিরোধিতার পরওয়া করবেন না। চতুর্থ বিধান---قُلْ اٰمَنْتُ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِتَابٍ---অর্থাৎ আপনি ঘোষণা করুনঃ আল্লাহ্ তা'আলা যত কিতাব নাযিল করেছেন, সবগুলোর প্রতি

আমি বিশ্বাসী। পঞ্চম বিধান—أُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ—এর বাহ্যিক অর্থ এই যে, পারস্পরিক বিবাদ-বিসংবাদের কোন মোকদ্দমা আমার কাছে আসলে তাতে ন্যায়বিচার করার নির্দেশ আমাকে দেওয়া হয়েছে। কেউ কেউ এখানে عدل--এর অর্থ করেছেন সাম্য। তারা এ আয়াতের অর্থ করেছেন, আমি আদিষ্ট হয়েছি যে, ধর্মের যাবতীয় বিধি-বিধান তোমাদের মধ্যে সমান সমান রাখি, প্রত্যেক নবী ও প্রত্যেক কিতাবে বিশ্বাস স্থাপন করি এবং সব বিধান পালন করি---এরূপ নয় যে, কোন বিধান মানবো আর কোনটি অমান্য করব। অথবা কোনটির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব ও কোনটির প্রতি করব না। ষষ্ঠ বিধান--- اللَّهُ رَبُّنَا. অর্থাৎ আল্লাহ্ আমাদের সকলের পালনকর্তা। সপ্তম বিধান---لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ---অর্থাৎ আমাদের কর্ম আমাদের কাজে আসবে। তোমাদের তাতে কোন লাভ-লোকসান হবে না। এবং তোমাদের কর্ম তোমাদের কাজে আসবে। আমার তাতে কোন লাভ ও ক্ষতি নেই। কেউ কেউ বলেন, মক্কায় যখন কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার আদেশ অবতীর্ণ হয়নি, তখন এ আয়াত নাযিল হয়েছিল। পরে জিহাদের আদেশ অবতীর্ণ হওয়ায় এই বিধান রহিত হয়ে যায়। কেননা, জিহাদের সারমর্ম এই যে, যারা উপদেশ ও অনুরোধে প্রভাবিত হয় না, যুদ্ধের মাধ্যমে তাদেরকে পরাভূত করতে হবে। তাদেরকে তাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দিলে চলবে না। কেউ কেউ বলেন, আয়াতটি রহিত হয়নি এবং উদ্দেশ্য এই যে, দলীলের মাধ্যমে সত্য প্রমাণিত হওয়ার পর তোমাদের না মানা কেবল শত্রুতা ও হঠকারিতা বশতই হতে পারে। শত্রুতা সৃষ্টি হয়ে যাওয়ার পর এখন প্রমাণাদির আলোচনা অর্থহীন। তোমাদের কর্ম তোমাদের সামনে এবং আমার কর্ম আমার সামনে থাকবে।----(কুরতুবী)

অষ্টম বিধান—لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ—অর্থাৎ সত্য স্পষ্ট ও প্রমাণিত হওয়ার পরও যদি তোমরা শত্রুতাকেই কাজে লাগাও, তবে তর্ক-বিতর্কের কোন অর্থ নেই। কাজেই আমাদের ও তোমাদের মধ্যে এমন কোন বিতর্ক নেই। নবম বিধান---اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا—অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সকলকে একত্র করবেন এবং প্রত্যেকের কর্মের প্রতিদান দেবেন। দশম বিধান- وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ----অর্থাৎ আমরা সকলেই তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন করব।

وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ

دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَّلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۝١٦ اَللّٰهُ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ وَالْمِيْزَانَ ؕ وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيْبٌ ۝١٧ يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهَا ۚ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مُشْفِقُوْنَ مِنْهَا ۙ وَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهَا الْحَقُّ ؕ اَلَآ اِنَّ الَّذِيْنَ يُمَارُوْنَ فِي السَّاعَةِ لَفِيْ ضَلٰلٍۭ بَعِيْدٍ ۝١٨

(১৬) আল্লাহ্‌র দীন মেনে নেয়ার পর যারা সে সম্পর্কে বিতর্কে প্রবৃত্ত হয়, তাদের বিতর্ক তাদের পালনকর্তার কাছে বাতিল, তাদের প্রতি আল্লাহ্‌র গযব এবং তাদের জন্য রয়েছে কঠোর আযাব। (১৭) আল্লাহ্‌ই সত্যসহ কিতাব ও ইনসাফের মানদণ্ড নাযিল করেছেন। আপনি কি জানেন, সম্ভবত কিয়ামত নিকটবর্তী। (১৮) যারা তাতে বিশ্বাস করে না তারা তাকে ত্বরিত কামনা করে। আর যারা বিশ্বাস করে, তারা তাকে ভয় করে এবং জানে যে, তা সত্য। জেনে রাখ, যারা কিয়ামত সম্পর্কে বিতর্ক করে, তারা দূরবর্তী পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত রয়েছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যারা আল্লাহ্ তা'আলা (অর্থাৎ তাঁর) দীন সম্পর্কে (মুসলমানদের সাথে) বিতর্ক করে, তা মেনে নেয়ার পর, (অর্থাৎ অনেক জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে যখন এ ধর্ম মেনে নিয়েছে, তখন দলীল স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর বিতর্ক করা অধিক নিন্দনীয়।) তাদের বিতর্ক তাদের পালনকর্তার কাছে অর্থহীন। তাদের প্রতি (আল্লাহ্‌র) গযব (আসবে) এবং (কিয়ামতে) তাদের জন্য রয়েছে কঠোর আযাব। (সেই আযাব থেকে বাঁচার উপায় এই যে, আল্লাহ্ ও তাঁর দীনকে মেনে নাও। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র হক ও বান্দার হক সম্বলিত তাঁর কিতাবকে অবশ্য পালনীয় মনে কর। কেননা,) আল্লাহ্ তা'আলাই সত্যসহ (এই) কিতাব (অর্থাৎ কোরআন) ও (তাঁর বিশেষ আদেশ) ন্যায়বিচার নাযিল করেছেন। (আল্লাহ্‌র কিতাবকে না মেনে আল্লাহ্‌কে মানা ধর্তব্য নয়। কোন কোন অমুসলিম আল্লাহ্‌কে মানে বলে দাবি করে, কিন্তু কোরআন মানে না। অতএব তাদের এই মানা মুক্তির জন্য যথেষ্ট নয়। তারা আপনাকে কিয়ামতের নির্দিষ্ট দিন-তারিখ জিজ্ঞাসা করে,) আপনি কি জানেন (অবশ্য না জানলেই তা না হওয়া জরুরী হয় না, বরং তা নিশ্চয়ই হবে। দিন-তারিখ সম্পর্কে সংক্ষেপে

এতটুকু জেনে নেয়াই যথেষ্ট যে,) সম্ভবত কিয়ামত আসন্ন। (কিন্তু) যারা তাতে বিশ্বাস করে না, তারা (সেদিনকে ভয় করার পরিবর্তে ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও অস্বীকারকারীর দলে) কিয়ামতের তাগাদা করে (যে, কিয়ামত তাড়াতাড়ি আসে না কেন? আর) যারা বিশ্বাস করে, তারা তাকে ভয় করে। (ও কাঁপে) এবং জানে যে, তা সত্য। জেনে রাখ, (এই দু'প্রকার লোকের মধ্যে প্রথম প্রকার অর্থাৎ) যারা কিয়ামত (মানে না এবং সে) সম্পর্কে বিতর্ক করে, তারা গভীর পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত রয়েছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্বের আয়াতসমূহে পয়গম্বরগণের সর্বসম্মত ধর্মের প্রতি বিশ্ববাসীকে দাওয়াত এবং তাতে প্রতিষ্ঠিত ও অবিচলিত থাকার উপদেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু যেসব কাফির শুনতে ও মানতেই রাযী নয়, তারা এর পরেও মুসলমানদের সাথে বাকবিতণ্ডা শুরু করে দেয়। রেওয়ায়েতে আছে যে, কিছুসংখ্যক ইহুদী ও খৃস্টান এ বিতর্ক উপস্থিত করল যে, আমাদের নবী তোমাদের নবীর পূর্বে এসেছেন এবং আমাদের কিতাব তোমাদের কিতাবের পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে। তাই আমাদের ধর্ম তোমাদের ধর্ম অপেক্ষা উত্তম ও শ্রেষ্ঠ। কোন কোন রেওয়ায়েতে এই বিষয়টি কুরায়শ কাফিরদের উত্থাপিত বলে বর্ণিত রয়েছে। কেননা, তারা নিজেদেরকে প্রাচীন ধর্মের অনুসারী বলে আখ্যায়িত করত।

কোরআন পাক উল্লিখিত আয়াতসমূহে বর্ণনা করেছে যে, ইসলাম ও কোরআনের আবেদন মানুষের মধ্যে সাড়া জাগিয়েছে এবং স্বয়ং তোমাদের জ্ঞানী-গুণী ও ন্যায়পন্থী ব্যক্তিবর্গও মুসলমান হয়ে গেছে। সুতরাং এখন তোমাদের বাকবিতণ্ডা অসার ও পথ-ভ্রষ্টতা বৈ নয়। তোমরা না মানলে গযব তোমাদের উপরই পড়বে। অতপর উল্লেখ করা হয়েছে যে, কোরআন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ এবং এতে আল্লাহ্‌র হক ও বান্দার হকের জন্য পূর্ণাঙ্গ আইন-কানুন রয়েছে। اَنْزَلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ وَالْمِيْزَانَ

এখানে 'কিতাব' বলে কোরআনসহ সমস্ত ঐশী গ্রন্থকে বোঝানো হয়েছে এবং 'হক' বলে পূর্বোক্ত সত্যধর্মকে বোঝানো হয়েছে। مِيزَان-এর শাব্দিক অর্থ দাঁড়িপাল্লা। এটা যেহেতু ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার এবং অধিকার পূর্ণ মাত্রায় দেওয়ার একটি মানদণ্ড তাই হযরত ইবনে আব্বাস এর তফসীর করেছেন ন্যায় বিচার। মুজাহিদ বলেন, মানুষ যে দাঁড়িপাল্লা ব্যবহার করে, এখানে তাই বোঝানো হয়েছে। সুতরাং হক শব্দের মধ্যে আল্লাহ্‌র যাবতীয় হক এবং مِيزَان শব্দের মধ্যে বান্দার যাবতীয় হকের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে।

'মু'মিনরা কিয়ামতকে ভয় করে'—এর অর্থ কিয়ামতের ভয়াবহতাজনিত বিশ্বাসগত ভয়। পরন্তু নিজেদের কর্মগত ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রতি লক্ষ্য করলে এ ভয় অপরিহার্যরূপে

দেখা দেয়। কিন্তু মাঝে মাঝে কোন মু'মিনের মধ্যে আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাতের আগ্রহ প্রবল হয়ে তা এ ভয়কে ছাপিয়ে যায়---তা আয়াতের পরিপন্থী নয়। যেমন, মৃত্যুর পর কবরে কোন কোন মৃতের যথাশীঘ্র কিয়ামতের আগমন কামনার বিষয় প্রমাণিত রয়েছে। কারণ, কবরে ফেরেশতাদের কাছ থেকে রহমত ও মাগফিরাতের সুসংবাদ শুনে কিয়ামতের ভয় স্তিমিত হয়ে যাবে।

اَللّٰهُ لَطِيْفٌۢ بِعِبَادِهٖ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيْزُ ﴿١٩﴾ مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْاٰخِرَةِ نَزِدْ لَهٗ فِيْ حَرْثِهٖ ۚ وَمَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا ۙ وَمَا لَهٗ فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ نَّصِيْبٍ ﴿٢٠﴾

(১৯) আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের প্রতি দয়ালু। তিনি যাকে ইচ্ছা, রিযিক দান করেন। তিনি প্রবল, পরাক্রমশালী। (২০) যে কেউ পরকালের ফসল কামনা করে, আমি তার জন্য সেই ফসল বাড়িয়ে দেই। আর যে ইহকালের ফসল কামনা করে, আমি তাকে তার কিছু দিয়ে দেই এবং পরকালে তার কোন অংশ থাকবে না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(তারা ইহকালের ধন-সম্পদে গর্বিত হয়ে পরকাল বিস্মৃত হয়ে বসেছে। তারা বলে, আমাদের কর্ম আল্লাহ্‌র কাছে অপছন্দনীয় হলে আমাদেরকে এ বিলাস-বৈভব দান করতেন না। মনে রেখো, এটা তাদের ভুল। ইহকালের ধন-সম্পদ সন্তুষ্টির পরিচায়ক নয়; বরং এর কারণ এই যে,) আল্লাহ্ (দুনিয়াতে) তাঁর বান্দাদের প্রতি (সাধারণত) দয়ালু। (এ সাধারণ দয়াবশত তিনি সবাইকে রিযিক দেন, স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য দান করেন। এতে উপযোগিতার ও রহস্যের ভিত্তিতে কমবেশীও হয়।) তিনি যাকে (যে পরিমাণ) ইচ্ছা, রিযিক দান করেন। কিন্তু রিযিক সবাইকেই দেন। ইহকালে এ দয়া দেখে মনে করা যে, তাদের তরীকা সত্য এবং পরকালেও এরূপ দয়া হবে---এটা পরিষ্কার ধোঁকা। সেখানে তাদের কুকর্মের শাস্তি হবে। এ আযাব দেওয়া অসম্ভব নয়; কেননা, তিনি প্রবল, পরাক্রমশালী। (তাদের সকল অনিষ্টের মূল ইহকালীন ধন-সম্পদের গর্ব। তাদের উচিত এ থেকে বিরত হয়ে পরকালের চিন্তা করা; কেননা) যে কেউ পরকালের ফসল কামনা করে, আমি তার সে ফসল বাড়িয়ে দেব। (সৎকর্ম হল ফসল এবং সওয়াব হল তার ফল। 'বাড়িয়ে দেয়া' মানে বহুগুণ সওয়াব দেওয়া। যেমন কোরআনে বলা হয়েছে, একটি সৎকর্মের বিনিময়ে দশগুণ সওয়াব দেওয়া হবে। আর, যে ইহকালের ফসল কামনা করে (অর্থাৎ যাবতীয় চেষ্টা-চরিত্র দুনিয়ার ভোগসম্ভার লাভের লক্ষ্যে করে এবং পরকালের জন্য কিছুই করে

না), আমি তাকে (ইচ্ছা করলে) কিছু দিয়ে দেব এবং পরকালে তার কোন অংশ নেই। (কেননা পরকালে অংশ পাওয়ার জন্য ঈমান শর্ত, যা তাদের মধ্যে নেই।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

اَللّٰهُ لَطِيْفٌ بِعِبَادِهٖ —অভিধানে لطيف শব্দটি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। হযরত ইবনে আব্বাস এর অনুবাদ করেছেন 'দয়ালু' এবং মুকাতিল করেছেন 'অনুগ্রহকারী'।

হযরত মুকাতিল বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত বান্দার প্রতিই দয়ালু। এমনকি কাফির এবং পাপাচারীর উপরও দুনিয়াতে তাঁর নিয়ামত বর্ষিত হয়। বান্দাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ ও কৃপা অসংখ্য প্রকার। তাই তফসীরে কুরতুবী لطيف শব্দের অনেক অর্থ বর্ণনা করেছেন। সবগুলোর সারমর্মই দয়ালু ও অনুগ্রহকারী।

আল্লাহ্ তা'আলার রিযিক সমগ্র সৃষ্টির জন্য ব্যাপক। স্থলে ও জলে বসবাসকারী যেসব জন্তু সম্পর্কে কেউ কিছুই জানে না, আল্লাহ্র রিযিক তাদের কাছেও পৌঁছে। আয়াতে যাকে ইচ্ছা রিযিক দেন, বলা হয়েছে। এ সম্পর্কে তফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলার রিযিক অসংখ্য প্রকার। জীবনধারণের উপযোগী রিযিক সবাই পায়। এরপর বিশেষ প্রকারের রিযিক বণ্টনে তিনি ভিন্ন স্তর ও মাপ রেখেছেন। কাউকে ধন-সম্পদের রিযিক অধিক দান করেছেন। কাউকে স্বাস্থ্য ও শক্তির, কাউকে জ্ঞান ও মারিফতের এবং কাউকে অন্যান্য প্রকার রিযিক দিয়েছেন। এভাবে প্রত্যেক মানুষ অপরের মুখাপেক্ষীও থাকে এবং এই মুখাপেক্ষিতাই তাদেরকে পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতায় উদ্বুদ্ধ করে, যার উপর মানব সভ্যতার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত।

হযরত জা'ফর ইবনে মুহাম্মদ (র.) বলেন, রিযিকের ব্যাপারে বান্দাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার দয়া ও অনুকম্পা দু'রকম। এক—তিনি কাউকে তার সারা জীবনের রিযিক একযোগে দান করেন না। এরূপ করলে তার হেফাযত দুরূহ হয়ে পড়ত এবং শত হেফাযতের পরেও তা পচা-গলা থেকে নিরাপদ থাকত না।—(মাযহারী)

একটি পরীক্ষিত আমল ঃ মওলানা শাহ্ আবদুল গণী ফুলপুরী (র.) বলেন, হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ্ (র.) থেকে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি সকাল ও সন্ধ্যায় সত্তর বার اللّٰهُ لَطِيْفٌ আয়াতটি الْقَوِىُّ الْعَزِيْزُ—পর্যন্ত নিয়মিত পাঠ করবে, সে রিযিকের অভাব-অনটন থেকে মুক্ত থাকবে। তিনি আরও বলেন, এটি বহুল পরীক্ষিত আমল।

اَمْ لَهُمْ شُرَكٰٓؤُا شَرَعُوْا لَهُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا لَمْ يَأْذَنْۢ بِهِ اللّٰهُ

وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۗ وَإِنَّ الظّٰلِمِينَ لَهُمْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢١﴾ تَرَى الظّٰلِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ
بِهِمْ ۗ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فِي رَوْضٰتِ الْجَنّٰتِ ۚ لَهُمْ
مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۗ ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴿٢٢﴾ ذٰلِكَ الَّذِي
يُبَشِّرُ اللّٰهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۗ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ
عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبٰى ۗ وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ
فِيهَا حُسْنًا ۗ إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٢٣﴾

(২১) তাদের কি এমন শরীক দেবতা আছে, যারা তাদের জন্য সে ধর্ম সিদ্ধ করেছে, যার অনুমতি আল্লাহ্ দেননি? যদি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না থাকত, তবে তাদের ব্যাপারে ফয়সালা হয়ে যেত। নিশ্চয় যালিমদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (২২) আপনি কাফিরদেরকে তাদের কৃতকর্মের জন্য ভীতসন্ত্রস্ত দেখবেন। তাদের কর্মের শাস্তি অবশ্যই তাদের উপর পতিত হবে। আর যারা মু'মিন ও সৎকর্মী, তারা জান্নাতের উদ্যানে থাকবে। তারা যা চাইবে, তাই তাদের জন্য তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে। এটাই বড় পুরস্কার। (২৩) এরই সুসংবাদ দেন আল্লাহ্ তাঁর সেসব বান্দাকে, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে। বলুন, আমি আমার দাওয়াতের জন্য তোমাদের কাছে কেবল আত্মীয়তাজনিত সৌহার্দ্য চাই। যে কেউ উত্তম কাজ করে, আমি তার জন্য তাতে পুণ্য বাড়িয়ে দেই। নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাকারী, গুণগ্রাহী।

তফসীরের সার সংক্ষেপ

(সত্য ধর্ম তো আল্লাহ্ তা'আলা নির্ধারিত করেছেন; কিন্তু তারা এটা মানে না। তবে) তাদের কি (খোদায়ীতে) শরীক কোন দেবতা আছে, যারা তাদের জন্য সে কর্ম সিদ্ধ করেছে, যার অনুমতি আল্লাহ্ দেননি? (উদ্দেশ্য এই যে, এমন কোন সত্তা নেই, যার নির্ধারিত ধর্ম আল্লাহ্র বিরুদ্ধে ধর্তব্য হতে পারে।) যদি (আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অর্থাৎ এই পাপিষ্ঠদের প্রকৃত আযাব মৃত্যুর পরে হবে বলে) চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না থাকত, তবে (দুনিয়াতেই কার্যত) তাদের ফয়সালা হয়ে যেত। নিশ্চয় (পরকালে এই) যালিমদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (সেদিন) আপনি কাফিরদেরকে

তাদের কৃতকর্মের (শাস্তির আশংকার) কারণে ভীতসন্ত্রস্ত দেখবেন। তা (অর্থাৎ সে শাস্তি) তাদের উপর (অবশ্যই) পতিত হবে। (এ হচ্ছে কাফিরদের অবস্থা,) আর যারা মু'মিন ও সৎকর্মী, তারা জান্নাতের উদ্যানে (অবস্থান করতে) থাকবে। (জান্নাতের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। প্রত্যেক স্তরই একটা জান্নাত। প্রতি স্তরে বহু উদ্যান রয়েছে। এসব কারণে শব্দটিকে বহুবচন আনা হয়েছে। বিভিন্ন মর্তবা অনুযায়ী জান্নাতীরা বিভিন্ন স্তরে থাকবে।) তারা যা চাইবে, তাই তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে। এটাই বড় পুরস্কার। এরই সুসংবাদ দেন আল্লাহ্ তাঁর সে বান্দাকে, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম সম্পাদন করে। (কাফিররা পূর্ণ বিষয়বস্তু শেষ করার আগে কাফিরদেরকে মধ্যবর্তী বাক্যে এক হৃদয়গ্রাহী বিষয়বস্তু শোনাবার আদেশ করা হচ্ছে ঃ) আপনি (তাদেরকে) বলুন, আমি তোমাদের কাছে আত্মীয়তাজনিত সৌহার্দ্য ব্যতীত অন্য কিছু চাই না। (অর্থাৎ এতটুকুই চাই যে, তোমরা আত্মীয়তার অধিকারের প্রতি লক্ষ্য রাখ। এটা কি আত্মীয়তার অধিকার নয় যে, তোমরা তড়িঘড়ি আমার প্রতি শত্রুতা পোষণ না কর; শান্ত মনে আমার পূর্ণ কথা শুন এবং সত্যের কষ্টি পাথরে যাচাই কর? সঙ্গত হলে মেনে নাও, সন্দেহ থাকলে দূর করে নাও। ভ্রান্ত হলে আমাকে বুঝিয়ে দাও। মোটকথা, সবই শুভেচ্ছার মনোভাব সহকারে হওয়া উচিত। আগপাছ না দেখে উত্তেজিত হওয়া উচিত নয়। অতপর মু'মিনদের জন্য সুসংবাদের পরিশিষ্ট বর্ণিত হয়েছে---) যে কেউ উত্তম কাজ করে, আমি তার জন্য পুণ্য বাড়িয়ে দেই (অর্থাৎ প্রকৃত প্রাপ্য অপেক্ষা অধিক সওয়াব দিয়ে দেই)। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা (অনুগত বান্দাদের পাপ) ক্ষমাকারী (এবং তাদের সৎকর্মের ব্যাপারে) গুণগ্রাহী (সওয়াবদানকারী)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

قُلْ لَّآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبٰى---সার সংক্ষেপে বর্ণিত এ আয়াতের তফসীর অধিকাংশ তফসীরবিদ থেকেই বর্ণিত রয়েছে। এর সারমর্ম এই যে, তোমাদের সবার কাছে আমার আসল হক এই যে, তোমরা আমার রিসালতকে স্বীকৃতি দাও এবং নিজেদের সৌভাগ্য ও সাফল্যের জন্য আমার আনুগত্য কর। তোমরা এটা না করলে আমার বলার কিছু নেই। কিন্তু আমার একটি মানবিক ও পারিবারিক হকও রয়েছে, যা তোমরা অস্বীকার করতে পার না। তোমাদের অধিকাংশ গোত্রে আমার আত্মীয়তা রয়েছে। আত্মীয়তার অধিকার ও আত্মীয় বাৎসল্যের প্রয়োজন তোমরা অস্বীকার কর না। অতএব আমি তোমাদের শিক্ষা, প্রচার ও কর্ম সংশোধনের যে দায়িত্ব পালন করি, এর কোন পারিশ্রমিক তোমাদের কাছে চাই না। তবে এতটুকু চাই যে, তোমরা আত্মীয়তার অধিকারের প্রতি লক্ষ্য রাখ। মানা না মানা তোমাদের ইচ্ছা। কিন্তু শত্রুতা প্রদর্শনে তো কমপক্ষে আত্মীয়তার সম্পর্ক প্রতিবন্ধক হওয়া উচিত।

বলা বাহুল্য, আত্মীয়তার অধিকারের প্রতি লক্ষ্য রাখা স্বয়ং তাদেরই কর্তব্য ছিল। একে কোন শিক্ষা ও প্রচারকার্যের পারিশ্রমিক বলে অভিহিত করা যায় না। আয়াতে একে রূপক অর্থে পারিশ্রমিক বলা হয়েছে। অর্থাৎ আমি তোমাদের কাছে এটাই চাই। এটা প্রকৃতপক্ষে কোন পারিশ্রমিক নয়। তোমরা একে পারিশ্রমিক মনে করলে ভুল হবে। এ বাক্যের নযীর দুনিয়ার প্রত্যেক ভাষাতেই বিদ্যমান রয়েছে। কবি মুতানাব্বী বলেনঃ

ولا عيب فيهم غيران سيوفهم + بهن فلول من قراع الكتائب

অর্থাৎ কোন এক গোত্রের বীরত্ব প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তাদের মধ্যে এছাড়া কোন দোষ নেই যে, অহরহ যুদ্ধ ও মারামারির কারণে তাদের তরবারিতে দাঁত সৃষ্টি হয়ে গেছে। বলাবাহুল্য, বীরের জন্য এটা কোন দোষ নয় বরং নৈপুণ্য। জনৈক উর্দু কবি বলেনঃ — مجھ میں ایک عیب بڑا ہے کہ وفادار ہوں میں

এতে কবি তার বিশ্বস্ততার গুণকে দোষরূপে ব্যক্ত করে নিজের নির্দোষতাকে বড় করে দেখিয়েছেন।

সারকথা এই যে, আত্মীয়বাৎসল্য বাস্তবে পারিশ্রমিক নয়। কাজেই আমি এছাড়া তোমাদের কাছে আর কিছুই চাই না।

বুখারী ও মুসলিমে আলোচ্য আয়াতের এ তফসীরই হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত রয়েছে। যুগে যুগে পয়গম্বরগণ নিজ নিজ সম্প্রদায়কে পরিষ্কার ভাষায় বলে দিয়েছেন, আমি তোমাদের মঙ্গলার্থ যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি, তার কোন বিনিময় তোমাদের কাছে চাই না। আমার প্রাপ্য আল্লাহ্ তা'আলাই দেবেন। অতএব রসূলুল্লাহ্ (সা.) সকলের সেরা পয়গম্বর হয়ে স্বজাতির কাছে কেমন করে বিনিময় চাইবেন?

ইমাম শা'বী বলেন, আমি এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসিত হয়ে হযরত ইবনে আব্বাসের কাছে পত্র লিখলে তিনি জওয়াবে লিখে পাঠালেনঃ

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وسط الناس فى قريش ليس بطن من بطونهم الا وقد ولده فقال الله تعالى قل انى لا اسئلكم اجرا على ما ادعوكم عليه الا المودة فى القربى تودونى لقرابتى منكم وتحفظونى بها -

রসূলুল্লাহ্ (সা) কোরায়শদের যে গোত্রের সাথে সম্পর্ক রাখতেন, তার প্রত্যেকটি শাখা-পরিবারের সাথে তাঁর আত্মীয়তার জন্মগত সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। তাই আল্লাহ্ বলেছেন, আপনি মুশরিকদেরকে বলুন, দাওয়াতের জন্য আমি তোমাদের কাছে কোন বিনিময় চাই না। আমি চাই, তোমরা আত্মীয়তার খাতিরে আমাকে তোমাদের মধ্যে অবাধে থাকতে দাও এবং আমার হেফাযত কর। ——(রূহুল-মা'আনী)

ইবনে জরীব প্রমুখ আরও বর্ণনা করেন ঃ

يا قوم اذا ا بيتم ان تتابعونى فا حفظوا قرابتى منكم ولا تكون غيركم من العرب اولى بحفظى و نصرتى منكم

হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা যদি আমার অনুসরণে অস্বীকৃতিও জ্ঞাপন কর, তবুও তোমাদের সাথে আমার যে আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে অন্তত তার প্রতি তো লক্ষ্য রাখবে। আরবের অন্যান্য লোক আমার হেফাযত ও সাহায্যে অগ্রণী হলে তোমাদের জন্য গৌরবের বিষয় হবে না।---(রূহুল-মা'আনী)

হযরত ইবনে আব্বাস থেকেই আরও বর্ণিত আছে যে, এ আয়াতটি নাযিল হলে কেউ কেউ রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞেস করল, আপনার আত্মীয় কারা? তিনি বললেন, আলী, ফাতেমা ও তাদের সন্তান-সন্ততি। এ রেওয়ায়েতের সনদ খুব দুর্বল। তাই সুয়ূতী ও হাফেয ইবনে হাজার প্রমুখ একে অগ্রাহ্য বলেছেন। এছাড়া এই রেওয়ায়েতের অর্থ এই যে, আমি আমার কাজের বিনিময়ে তোমাদের কাছে এতটুকু চাই যে, তোমরা আমার সন্তান-সন্ততির প্রতি লক্ষ্য রাখ। এটা পয়গম্বরগণ বিশেষত সেরা ও শ্রেষ্ঠ পয়গম্বরের উপযুক্ত কথা হতে পারে না। সুতরাং সঠিক তফসীর তাই, যা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। রাফেযী সম্প্রদায় এ রেওয়ায়েত কেবল পছন্দই করেনি, এর উপর বিরাট বিরাট আশার দুর্গও রচনা করেছে, যা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

নবী পরিবারের সম্মান ও মহব্বত ঃ উপরে এতটুকুই বলা হয়েছে যে, আলোচ্য আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সা) নিজের কাজের বিনিময়ে জাতির কাছে স্বীয় সন্তানদের প্রতি মহব্বত প্রদর্শনের আবেদন করেননি। এর অর্থ এই নয় যে, রসূল পরিবারের মাহাত্ম্য ও মহব্বত কোন গুরুত্বের অধিকারী নয়। যে কোন হতভাগা পথভ্রষ্ট ব্যক্তিই এরূপ ধারণা করতে পারে। সত্য এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সম্মান ও মহব্বত সবকিছুর চাইতে বেশী হওয়া আমাদের ঈমানের অঙ্গ ও ভিত্তি। অতপর রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাথে যার যত নিকট সম্পর্ক আছে, তার সম্মান ও মহব্বত এবং সে অনুপাতে জরুরী হওয়া অপরিহার্য। ঔরসজাত সন্তান সর্বাধিক নিকটবর্তী আত্মীয়। তাই তাদের মহব্বত নিশ্চিতরূপে ঈমানের অঙ্গ। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, বিবিগণ ও অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামকে সম্পূর্ণরূপে ভুলে যেতে হবে, অথচ তাঁদেরও রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নৈকট্য ও আত্মীয়তার বিভিন্নরূপে সম্পর্ক রয়েছে।

সারকথা এই যে, নবী পরিবার ও নবী বংশের মহব্বত নিয়ে কোন সময় মুসলমানদের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়নি। সর্বসম্মতিক্রমে তাঁদের মহব্বত অপরিহার্য। তবে বিরোধ সেখানে দেখা দেয়, যেখানে অন্যদের সম্মানে আঘাত হানা হয়। নতুবা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বংশধর হিসেবে যত দূর সম্পর্কের সৈয়দই হোক না কেন, তাঁদের মহব্বত ও সম্মান সৌভাগ্য ও সওয়াবের কারণ। অনেকেই এ ব্যাপারে শৈথিল্যের পরিচয় দিতে শুরু করলে হযরত ইমাম শাফেয়ী (র.) কয়েক লাইন কবিতায় তাদের

তীব্র নিন্দা করেছেন। তাঁর কবিতা নিম্নে উদ্ধৃত হল। এতে প্রকৃতপক্ষে তিনি অধিকাংশ আলিমের মতাদর্শই তুলে ধরেছেন ঃ

يا راكبا قف بالمحصب من منى
واهتف بساكن خيفها والناهض
سحرا اذا فاض الحجيج الى منى
فيضا كملتطم الفرات الفائض
ان كان رفضا حب ال محمد
فليشهد الثقلان انى رافضى

হে অশ্বারোহী, তুমি মুহাস্‌সাব উপত্যকার অদূরে দাঁড়িয়ে যাও। প্রত্যূষে যখন হাজীদের স্রোত সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের ন্যায় মীনার দিকে রওয়ানা হবে, তখন সেখানকার প্রত্যেক বাসিন্দা ও পথচারীকে ডেকে তুমি ঘোষণা কর, যদি কেবল মুহাম্মদ (সা)-এর বংশধরের প্রতি মহব্বত রাখলেই মানুষ রাফেযী হয়ে যায়, তবে বিশ্বজগতের সমস্ত জ্বিন ও মানব সাক্ষী থাকুক, আমিও রাফেযী।

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۖ فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ ۗ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٢٤﴾ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٢٥﴾ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ ۚ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴿٢٦﴾

(২৪) নাকি তারা একথা বলে যে, তিনি আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মিথ্যা রটনা করেছেন? আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে আপনার অন্তরে মোহর এঁটে দিতেন। বস্তুত তিনি মিথ্যাকে মিটিয়ে দেন এবং নিজ বাক্য দ্বারা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন। নিশ্চয় তিনি অন্তর-নিহিত বিষয় সম্পর্কে সবিশেষ জ্ঞাত। (২৫) তিনি তাঁর বান্দাদের তওবা কবুল করেন, পাপসমূহ মার্জনা করেন এবং তোমাদের কৃত বিষয় সম্পর্কে অবগত রয়েছেন। (২৬) তিনি

মু'মিন ও সৎকর্মীদের দোয়া শোনেন এবং তাদের প্রতি স্বীয় অনুগ্রহ বাড়িয়ে দেন। আর কাফিরদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তারা কি (আপনার সম্পর্কে) বলে যে, তিনি আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মিথ্যা রচনা করেছেন (অর্থাৎ নবুয়ত ও ওহী সম্পর্কে মিথ্যা দাবী উত্থাপন করেছেন? তাদের এ উক্তিই মিথ্যা অপবাদ। কেননা, আপনার মুখে আল্লাহ্‌র অলৌকিক কালাম জারি হয়েছে, যা নবী ব্যতীত কারও মুখে জারি হতে পারে না। আপনি রিসালতের দাবীতে সত্যবাদী না হলে আল্লাহ্ এই কালাম আপনার মুখে জারি করতেন না। সেমতে) আল্লাহ্ (এই ক্ষমতা রাখেন যে,) ইচ্ছা করলে তিনি আপনার অন্তরে মোহর এঁটে দিতেন (এবং এই কালাম আপনার অন্তরে জারি হত না; বরং ছিনিয়ে নেয়া হত এবং আপনি বিস্মৃত হতেন। এমতাবস্থায় তা মুখে প্রকাশ পেত না।) আল্লাহ্ মিথ্যাকে (অর্থাৎ নবুয়তের মিথ্যা দাবীকে) মিটিয়ে দেন (চালু হতে দেন না, অর্থাৎ মিথ্যা দাবীদারের হাতে মোজেযা প্রকাশ পায় না) এবং (নবুয়তের) সত্য (দাবী)-কে আপন নির্দেশাবলী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত (ও প্রবল) করেন। (সুতরাং আপনি সত্যবাদী ও তারা মিথ্যাবাদী। যেহেতু) তিনি (অর্থাৎ আল্লাহ্) অন্তর্নিহিত বিষয় সম্পর্কেও সবিশেষ জ্ঞাত। (মুখের উক্তি ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কর্ম সম্পর্কে তো আরও জ্ঞাত। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা তাদের বিশ্বাস, উক্তি ও কর্ম সম্পর্কে জানেন এবং এগুলোর কারণে শাস্তি দেবেন। তবে যারা কুফর ও কুকর্ম থেকে তওবা করবে, তাদেরকে ক্ষমা করবেন। কেননা, তাঁর আইন এই যে,) তিনি তাঁর বান্দাদের তওবা (শর্ত অনুযায়ী হলে) কবুল করেন, (তওবার বরকতে) অতীত পাপসমূহ মার্জনা করেন এবং তোমরা যা কর, তা (সবই) জানেন। (সুতরাং তওবা খাঁটি কি না তাও তিনি জানেন। যে ব্যক্তি তওবার মাধ্যমে মুসলমান হয়, তার সেসব ইবাদত কবুল হবে যা পূর্বে কবুল হত না। কেননা,) তিনি মু'মিন ও সৎকর্মীদের ইবাদত (রিয়ার উদ্দেশ্যে করা না হলে) কবুল করেন (অর্থাৎ ইবাদতের সওয়াব দেন) এবং (প্রাপ্য সওয়াব ছাড়াও) তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে অধিকতর (সওয়াব) দান করেন (পক্ষান্তরে) যারা কাফির তাদের জন্য (নির্ধারিত) রয়েছে কঠোর শাস্তি।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নবুয়ত, রিসালত ও কোরআনকে ভ্রান্ত ও আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে অপপ্রচার আখ্যা দান-কারীদেরকে একটি সাধারণ নীতি বর্ণনা করে জওয়াব দিয়েছেন। নীতিটি এই যে, পয়গম্বরের মু'জিযা ও যাদুকরের যাদু---এ দুই এর মধ্যে কোনটিই আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ব্যতিরেকে কিছু করতে পারে না। আল্লাহ্ তা'আলাই স্বীয় অনুগ্রহে পয়গম্বরগণের

নবুয়ত সপ্রমাণ করার উদ্দেশ্যে তাদেরকে মু'জিযা দান করেন। এতে পয়গম্বরের কোন এখতিয়ার থাকে না।

এমনিভাবে আল্লাহ্ তা'আলা যাদুকরদের যাদুকেও পরীক্ষার ভিত্তিতে চালু হতে দেন। কিন্তু যাদু ও মু'জিযার মধ্যে এবং যাদুকর ও পয়গম্বরের মধ্যে পার্থক্য করার জন্য তিনি এই নীতি নির্ধারণ করেছেন যে, যে ব্যক্তি মিছামিছি নবুয়ত দাবী করে, তার হাতে কোন যাদুও সফল হতে দেন না; নবুয়ত দাবী করার পূর্ব পর্যন্তই তার যাদু কার্যকর হয়ে থাকে।

পক্ষান্তরে আল্লাহ্ যাকে নবুয়ত দান করেন, তাঁকে মু'জিযাও দেন এবং সমুজ্জ্বল করেন। এভাবে স্বাভাবিক গতিতেই তাঁর নবুয়ত সপ্রমাণ করে দেন। এছাড়া স্বীয় কালামের আয়াতের সত্যায়নও নাযিল করেন।

কোরআন পাকও এক মু'জিযা। সারা বিশ্বের জিন ও মানব এর এক আয়াতের নমুনাও রচনা করতে অক্ষম। তাদের এই অক্ষমতা নবী করীম (সা)-এর আমলেই সপ্রমাণ হয়ে গেছে এবং আজ পর্যন্ত সপ্রমাণ আছে। এমন সুস্পষ্ট মু'জিযা উপরোক্ত নীতি অনুযায়ী কোন মিথ্যা নবীর পক্ষ থেকে প্রকাশ পেতে পারে না। অতএব রসূলুল্লাহ্ (সা)-র ওহী ও রিসালত সম্পর্কিত দাবি সম্পূর্ণ সত্য ও বিশুদ্ধ। যারা একে ভ্রান্ত ও অপপ্রচার বলে, তারা নিজেরাই বিভ্রান্তি ও অপপ্রচারে লিপ্ত।

দ্বিতীয় আয়াতে কাফিরদেরকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, এখনও কুফর থেকে বিরত হও এবং তওবা কর। আল্লাহ্ তা'আলা পরম দয়ালু। তিনি তওবাকারীদের তওবা কবূল করেন এবং তাদের পাপ মার্জনা করেন।

তওবার স্বরূপঃ তওবার শাব্দিক অর্থ ফিরে আসা। শরীয়তের পরিভাষায় কোন গোনাহ্ থেকে ফিরে আসাকে তওবা বলা হয়। তওবা বিশুদ্ধ ও ধর্তব্য হওয়ার জন্য তিনটি শর্ত রয়েছে।

এক. বর্তমানে যে গোনাহে লিপ্ত রয়েছে, তা অবিলম্বে বর্জন করতে হবে, দুই. অতীতের গোনাহের জন্য অনুতপ্ত হতে হবে এবং তিন. ভবিষ্যতে সে গোনাহ্ না করার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করতে হবে এবং কোন ফরয কাজ ছেড়ে থাকলে তা আদায় অথবা কাযা করতে হবে। গোনাহ্ যদি বান্দার বৈষয়িক হক সম্পর্কিত হয়, তবে শর্ত এই যে, প্রাপক জীবিত থাকলে তাকে সে ধনসম্পদ ফেরত দেবে অথবা মাফ করিয়ে নেবে। প্রাপক জীবিত না থাকলে তার ওয়ারিশদেরকে ফেরত দেবে। কোন ওয়ারিশ না থাকলে বায়তুল মালে জমা দেবে। যদি বায়তুলমালও না থাকে অথবা তার ব্যবস্থাপনা সঠিক না হয় তবে প্রাপকের পক্ষ থেকে সদকা দেবে। বৈষয়িক নয়, এমন কোন হক হলে---যেমন কাউকে অন্যায়ভাবে জ্বালাতন করলে, গালি দিলে অথবা কারও গীবত করলে যেভাবেই সম্ভবপর হয় তাকে সন্তুষ্ট করে ক্ষমা নিতে হবে।

সকল তওবার জন্যই আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে গোনাহ্‌ বর্জন করতে হবে, শারীরিক দুর্বলতা ও অক্ষমতার কারণে গোনাহ্‌ বর্জন করলে তওবা হবে না। যাবতীয় গোনাহ্‌ থেকে তওবা করাই শরীয়তের কাম্য। কিন্তু কোন বিশেষ গোনাহ্‌ থেকে তওবা করলেও আহ্‌লে সুন্নতের মতানুযায়ী সে গোনাহ্‌ মাফ হবে, কিন্তু অন্যান্য গোনাহ্‌ বহাল থাকবে।

وَلَوْ بَسَطَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهٖ لَبَغَوْا فِي الْاَرْضِ وَلٰكِنْ يُّنَزِّلُ بِقَدَرٍ
مَّا يَشَآءُ ۚ اِنَّهٗ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرٌۢ بَصِيْرٌ ﴿٢٧﴾ وَهُوَ الَّذِيْ يُنَزِّلُ
الْغَيْثَ مِنْۢ بَعْدِ مَا قَنَطُوْا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهٗ ۚ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيْدُ ﴿٢٨﴾
وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيْهِمَا مِنْ
دَآبَّةٍ ۚ وَهُوَ عَلٰى جَمْعِهِمْ اِذَا يَشَآءُ قَدِيْرٌ ﴿٢٩﴾ وَمَآ اَصَابَكُمْ مِّنْ
مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ ﴿٣٠﴾ وَمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ
فِي الْاَرْضِ ۚ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ﴿٣١﴾
وَمِنْ اٰيٰتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِ ﴿٣٢﴾ اِنْ يَّشَاْ يُسْكِنِ الرِّيْحَ فَيَظْلَلْنَ
رَوَاكِدَ عَلٰى ظَهْرِهٖ ۚ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ﴿٣٣﴾ اَوْ
يُوْبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوْا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيْرٍ ﴿٣٤﴾ وَّيَعْلَمَ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ
فِيْٓ اٰيٰتِنَا ۚ مَا لَهُمْ مِّنْ مَّحِيْصٍ ﴿٣٥﴾

(২৭) যদি আল্লাহ্‌ তাঁর সকল বান্দাকে প্রচুর রিযিক দিতেন, তবে তারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করত। কিন্তু তিনি যে পরিমাণ ইচ্ছা সে পরিমাণ নাযিল করেন। নিশ্চয় তিনি তাঁর বান্দাদের খবর রাখেন ও সবকিছু দেখেন। (২৮) মানুষ নিরাশ হয়ে যাওয়ার পরে তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং স্বীয় রহমত ছড়িয়ে দেন। তিনিই কার্যনির্বাহী, প্রশংসিত। (২৯) তাঁর এক নিদর্শন নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টি এবং এতদুভয়ের মধ্যে তিনি যেসব জীব-জন্তু ছড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি যখন ইচ্ছা, এগুলোকে

একত্র করতে সক্ষম। (৩০) তোমাদের উপর যেসব বিপদ-আপদ পতিত হয়, তা তোমাদের কর্মেরই ফল এবং তিনি তোমাদের অনেক গোনাহ্ ক্ষমা করে দেন। (৩১) তোমরা পৃথিবীতে পলায়ন করে আল্লাহ্কে অক্ষম করতে পার না এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের কোন কার্যনির্বাহী নেই, সাহায্যকারীও নেই। (৩২) সমুদ্রে ভাসমান পর্বতসম জাহাজসমূহ তাঁর অন্যতম নিদর্শন। (৩৩) তিনি ইচ্ছা করলে বাতাসকে থামিয়ে দেন। তখন জাহাজসমূহ সমুদ্রপৃষ্ঠে নিশ্চল হয়ে পড়ে যেন পাহাড়। নিশ্চয় এতে প্রত্যেক সবরকারী, কৃতজ্ঞের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে। (৩৪) অথবা তাদের কৃতকর্মের জন্য সেগুলোকে ধ্বংস করে দেন এবং অনেককে ক্ষমাও করে দেন। (৩৫) এবং যারা আমার ক্ষমতা সম্পর্কে বিতর্ক করে, তারা যেন জানে যে, তাদের কোন পলায়নের জায়গা নেই।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(আল্লাহ্ তা'আলার প্রজ্ঞাগুণের অন্যতম বিকাশ এই যে, তিনি সমস্ত মানুষকে প্রচুর ধনসম্পদ দেননি, কেননা,) যদি আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত বান্দাকে (তাদের বর্তমান মনমানসিকতার অবস্থায়) প্রচুর রিযিক দিতেন, তবে তারা পৃথিবীতে (ব্যাপকাকারে) বিপর্যয় সৃষ্টি করত। (কারণ, সবাই বিত্তশালী হলে কেউ কারও মুখাপেক্ষী থাকত না, ফলে কেউ কারও কাছে নতি স্বীকার করত না।) কিন্তু (তিনি সবাইকে বঞ্চিতও করেননি, বরং) তিনি যতটুকু রিযিক ইচ্ছা করেন, পরিমাণ করে (প্রত্যেকের জন্য) নাযিল করেন। (কেননা,) তিনি তাঁর বান্দাদের (উপযোগিতার) খবর রাখেন, (তাদের অবস্থা) দেখেন। মানুষ নিরাশ হয়ে যাওয়ার পর তিনি (মাঝে মাঝে) বৃষ্টি বর্ষণ করেন, এবং স্বীয় রহমত (এর চিহ্ন পৃথিবীতে) ছড়িয়ে দেন। (উদ্ভিদ, ফলমূল ইত্যাদি রহমতের চিহ্ন।) তিনি (সবার) কার্যনির্বাহী, (এবং এ কারণে) প্রশংসার যোগ্য। তাঁর (কুদরতের) এক নিদর্শন নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল, জীবজন্তুর সৃষ্টি, যা তিনি এতদুভয়ের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি (কিয়ামতের দিন) এগুলোকে (পুনরুজ্জীবিত করে) একত্র করতেও সক্ষম যখন (একত্রীকরণের) ইচ্ছা করেন। (তিনি প্রতিশোধ গ্রহণকারী এবং সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমাকারীও বটে। সেমতে) তোমাদের উপর (হে গোনাহ্গাররা,) যেসব বিপদাপদ পতিত হয়, তা তোমাদেরই (কোন কোন পাপ) কর্মের ফল এবং তিনি অনেক গোনাহ্ (উভয় জাহানে অথবা কেবল দুনিয়াতে) ক্ষমা করে দেন। (তিনি যদি সব গোনাহের কারণে ধরপাকড় শুরু করেন, তবে) তোমরা পৃথিবীতে (অর্থাৎ পৃথিবীর কোন অংশে) পালিয়ে গিয়ে আল্লাহ্কে অক্ষম করতে পারবে না। (সুতরাং এমতাবস্থায়) আল্লাহ্ ব্যতীত তোমার কোন কার্যনির্বাহী ও সাহায্যকারী হতে পারে না। সমুদ্রে ভাসমান পর্বতসম (উচ্চ) জাহাজসমূহ তাঁর (কুদরতের) অন্যতম নিদর্শন। (অর্থাৎ এগুলোর সমুদ্রে চলা আল্লাহ্র অত্যাশ্চর্য কারিগরির দলীল। নতুবা) তিনি ইচ্ছা করলে বাতাসকে থামিয়ে দেন। তখন জাহাজসমূহ সমুদ্রপৃষ্ঠে নিশ্চল হয়ে পড়ে। (তাঁরই কাজ বাতাস চালনা করা। বাতাসে ভর করেই জাহাজসমূহ চলে।) নিশ্চয় এতে প্রত্যেক কৃতজ্ঞ ও

সবরকারীর জন্য (কুদরতের) নিদর্শনাবলী রয়েছে। (সূরা লোকমানে এ রকম বাক্যে এর বিশদ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। মোটকথা, তিনি ইচ্ছা করলে বায়ুকে স্তব্ধ করে জাহাজসমূহকে নিশ্চল করে দেন,) অথবা (তিনি ইচ্ছা করলে প্রবল বাতাস প্রবাহিত করে আরোহীদের সহ) জাহাজসমূহকে তাদের (কুফর ইত্যাদি) কর্মের কারণে ধ্বংস করে দেন এবং অনেককে ক্ষমাও করেন। (অর্থাৎ তাৎক্ষণিকভাবে নিমজ্জিত হয় না) যদিও পরকালে শাস্তি ভোগ করবে এবং (এই ধ্বংসলীলার সময়) আমার ক্ষমতা সম্পর্কে বিতর্ককারীরা যেন জানে যে, (এখন) তাদের আত্মরক্ষার কোন উপায় নেই। (কেননা, এহেন মহা বিপদে তারাও তাদের কল্পিত দেবতাদেরকে অক্ষম মনে করত।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্বাপর সম্পর্ক ও শানে-নুযূল ঃ আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা তওহীদ সপ্রমাণ করার জন্য তাঁর অসাধারণ প্রজ্ঞার উল্লেখ করেছেন, যার মাধ্যমে তিনি বিশ্বজগতকে এক মজবুত ও অটল ব্যবস্থাপনার সূত্রে গ্রথিত করে রেখেছেন। উদ্দেশ্য এই যে, বিশ্বজগতের এই অটল ব্যবস্থাপনা এ বিষয়ের দলীল যে, একজন প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ সত্তা একে পরিচালনা করছেন।

পৃথিবীতে জারিকৃত একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার দিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ্ তা'আলা এই বিষয়বস্তুর সূচনা করেছেন। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের সাথে এই বিষয়টির সম্পর্ক এই যে, পূর্বের আয়াতসমূহে বিবৃত হয়েছিল, আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদের ইবাদত ও দোয়া কবূল করেন। এতে প্রশ্ন দেখা দিতে পারত যে, মুসলমানরা অনেক সময় পার্থিব উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য দোয়া করে, কিন্তু তাদের সে উদ্দেশ্য হাসিল হয় না। এরূপ ঘটনা বিরল নয়; বরং প্রায়ই সংঘটিত হতে দেখা যায়। এ খটকার জওয়াব উল্লিখিত আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে দেওয়া হয়েছে। এর সারমর্ম এই যে, মানুষের প্রত্যেকটি বাসনা পূর্ণ হওয়া মাঝে মাঝে স্বয়ং মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত উপযোগিতার পরিপন্থী হয়ে থাকে। কাজেই কোন সময় কোন মানুষের দোয়া বাহ্যত কবূল না হলে এর পশ্চাতে বিশ্বজগতের এমন কিছু স্বার্থ নিহিত থাকে, যা সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময় স্রষ্টা ব্যতীত অন্য কেউ জানে না। দুনিয়ার প্রত্যেক মানুষকেই সব রকম রিযিক ও নিয়ামত দান করা হলে দুনিয়ার প্রজ্ঞাভিত্তিক ব্যবস্থাপনা অচল হয়ে যেতে বাধ্য। ——(তফসীরে-কবীর)

কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে এই বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়। রেওয়ায়েতে আছে যে, আলোচ্য আয়াত সেসব মুসলমান সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়, যারা কাফিরদের ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য দেখে নিজেরাও সেরূপ প্রাচুর্যের অধিকারী হওয়ার বাসনা প্রকাশ করত। ইমাম বগভীর রেওয়ায়েতে সাহাবী খাব্বাব ইবনে আরত (রা) বলেন, আমরা যখন বনূ-কুরায়যা, বনূ-নুযায়ের ও বনূ কায়নুকার অগাধ ধনসম্পদ দেখলাম, তখন আমাদের মনেও ধনাঢ্য হওয়ার বাসনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। হযরত উমর ইবনে হুরায়স (রা) বলেন, সুফ্ফায় অবস্থানকারীদের

মধ্যে কেউ কেউ রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে এরূপ আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছিল যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকেও বিত্তশালী করে দিন। এর পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।—(রূহুল-মা'আনী)

দুনিয়াতে ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য বিপর্যয়ের কারণ ঃ আয়াতে বলা হয়েছে যে, দুনিয়ার সব মানুষকে সবরকম রিযিক ও নিয়ামত প্রচুর পরিমাণে দেয়া হলে তাদের পারস্পরিক হানাহানি সীমা ছাড়িয়ে যেত। কারণ, ধনসম্পদের প্রাচুর্যের কারণে কেউ কারও মুখাপেক্ষী থাকত না এবং কেউ কারও কাছে নতি স্বীকার করত না। অপরদিকে ধনাঢ্যতার এক বৈশিষ্ট্য এই যে, ধন যতই বাড়ে, লোভ-লালসাও ততই বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে এর অপরিহার্য পরিণতি দাঁড়াত এই যে, একে অপরের সম্পত্তি করায়ত্ত করার জন্য জোরজবরদস্তির প্রয়োগ ব্যাপক হয়ে যেত। মারামারি, কাটাকাটি ও অন্যান্য কুকর্ম সীমা ছাড়িয়ে যেত। তাই আল্লাহ্ তা'আলা সব মানুষকে সব রকম নিয়ামত না দিয়ে এভাবে বন্টন করেছেন যে, কাউকে ধনসম্পদ বেশি দিয়েছেন, কাউকে স্বাস্থ্য ও শক্তি অধিক পরিমাণে যুগিয়েছেন, কাউকে রূপ ও সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন এবং কাউকে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অপরের তুলনায় বেশি সরবরাহ করেছেন। ফলে প্রত্যেকেই কোন না কোন বিষয়ে অপরের মুখাপেক্ষী এবং এই পারস্পরিক মুখাপেক্ষিতার উপরই সভ্যতার ভীত প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। وَلٰكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ বাক্যের অর্থও তাই যে, আল্লাহ্ তাঁর নিয়ামতসমূহ বিশেষ পরিমাণে মানুষকে দান করেছেন। এরপর إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ বাক্যে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা সম্যক জানেন কার জন্য কোন্ নিয়ামত উপযুক্ত এবং কোন্ নিয়ামত ক্ষতিকর। তাই তিনি প্রত্যেককে তার উপযোগী নিয়ামত দান করেছেন। তিনি যদি কারও কাছ থেকে কোন নিয়ামত ছিনিয়ে নেন, তবে সমগ্র বিশ্বের উপযোগিতার ভিত্তিতেই ছিনিয়ে নেন। এটা মোটেই জরুরী নয় যে, আমরা প্রত্যেক ব্যক্তির উপযোগিতা বুঝতে সক্ষম হব। কারণ, এখানে প্রত্যেকেই তার জ্ঞানের এক সীমিত পরিধির মধ্যে চিন্তাভাবনা করে। আর আল্লাহ্ তা'আলার সামনে রয়েছে সমগ্র বিশ্বজগতের অন্তহীন উপযোগিতার ক্ষেত্র। কাজেই তাঁর সমস্ত রহস্য অবগত হওয়া মানুষের পক্ষে সম্ভবপর নয়। এর একটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দৃষ্টান্ত এই যে, একজন ন্যায়পরায়ণ রাষ্ট্রপ্রধান মাঝে মাঝে ব্যক্তি বিশেষের স্বার্থের পরিপন্থী নির্দেশও জারি করেন। ফলে তারা বিপদাপদের সম্মুখীন হয়ে পড়ে। বিপদে পতিত ব্যক্তি যেহেতু নিজ স্বার্থের সীমিত গণ্ডিতে থেকে চিন্তা করে, তাই রাষ্ট্রপ্রধানের এই পদক্ষেপ তার দৃষ্টিতে অযৌক্তিক ও অসমীচীন প্রতিপন্ন হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু যার দৃষ্টি গোটা দেশ ও জাতির প্রতি নিবদ্ধ এবং যে মনে করে যে, ব্যক্তি বিশেষের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে গোটা দেশের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দেয়া যায় না, সে এই পদক্ষেপকে মন্দ বলতে পারে না। অতএব যে সত্তা সমগ্র বিশ্বজগত পরিচালনা করছেন, তাঁর প্রজ্ঞা ও রহস্য মানুষ কিরূপে পুরোপুরি বুঝতে সক্ষম হবে? এই

দৃষ্টিকোণে চিন্তা করলে কোন ব্যক্তিকে বিপদাপদে পতিত দেখে মনে যেসব কুধারণা ও জল্পনা-কল্পনা সৃষ্টি হয়, সেগুলো আপনা আপনিই উবে যেতে পারে।

এ আয়াত থেকে আরও জানা যায় যে, বিশ্বের সব মানুষই সমান ধন-সম্পদের অধিকারী হোক এটা সম্ভবপর নয়, কাম্যও নয় এবং বিশ্ব ব্যবস্থাপনার সৃষ্টিগত উপ-যোগিতাও এর পক্ষে নয়। সূরা যুখরুফের نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ আয়াতের তফসীরে ইন্‌শাআল্লাহ্ এই বিষয়বস্তু সম্পর্কে পুরোপুরি আলোচনা করা হবে।

জান্নাত ও দুনিয়ার পার্থক্য ঃ এখানে খট্‌কা দেখা দিতে পারে যে, জান্নাতে তো সমস্ত মানুষকেই সর্বপ্রকার নিয়ামত প্রচুর পরিমাণে সরবরাহ করা হবে। সেখানে তাতে বিপর্যয় সৃষ্টি হবে না কেন? জওয়াব এই যে, দুনিয়াতে বিপর্যয়ের কারণ ধন-সম্পদের প্রাচুর্যসহ লোভ-লালসার প্রেরণা, যা ধনাঢ্যতার সাথে সাথে সাধারণত বৃদ্ধিই পেতে থাকে। এর বিপরীতে জান্নাতে তো নিয়ামতসমূহের ব্যাপক বৃষ্টি বর্ষিত হবে, কিন্তু লোভ-লালসা ও অবাধ্যতার প্রেরণা নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হবে। ফলে কোনরূপ বিপর্যয় দেখা দেবে না। তফসীরের সার-সংক্ষেপে মওলানা থানভী (রহ) 'বর্তমান অবস্থায়' কথাটি সংযুক্ত করে এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন---(বয়ানুল-কোরআন)

দুনিয়াতে ধন-সম্পদের প্রাচুর্যের মাধ্যমে লোভ-লালসার প্রেরণা নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হল না কেন? এখন এই আপত্তি উত্থাপন করা নিশ্চিতই অর্থহীন। কেননা, দুনিয়া সৃষ্টির উদ্দেশ্যই ভাল ও মন্দের সমন্বিত একটি বিশ্ব রচনা করা। এটা ব্যতীত জগৎ সৃষ্টির মূল রহস্য---মানুষকে পরীক্ষা করা কিছুতেই সম্ভবপর নয়। সুতরাং দুনিয়াতে মানুষের এসব প্রেরণা নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হলে দুনিয়া সৃষ্টির আসল লক্ষ্যই অর্জিত হত না। পক্ষান্তরে জান্নাতে কেবল কল্যাণই কল্যাণ থাকবে----মন্দের কোন অস্তিত্বই থাকবে না। তাই সেখানে এসব প্রেরণা খতম করে দেয়া হবে।

هُوَ الَّذِى يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا——(মানুষ নিরাশ হয়ে গেলে তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন।) ভূ-পৃষ্ঠে পানির তীব্র প্রয়োজন দেখা দিলে বৃষ্টি বর্ষণ করাই আল্লাহ্‌র সাধারণ নিয়ম। কিন্তু এখানে 'নিরাশ হওয়ার পর' বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মাঝে মাঝে আল্লাহ্ তা'আলা সাধারণ নিয়মের বিপরীতে বৃষ্টি বর্ষণে বিলম্বও করেন। ফলে মানুষ নিরাশ ও হতাশাগ্রস্ত হতে থাকে। এতে পরীক্ষা ছাড়া এ বিষয়ে হুঁশিয়ার করাও উদ্দেশ্য থাকে যে, বৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি সবই আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ন্ত্রণাধীন। তিনি যখন ইচ্ছা মানুষের পাপাচারের কারণে বৃষ্টি বন্ধ করে দেন, যাতে মানুষ তাঁর রহমতের প্রতি মনোনিবেশ করে তাঁর সামনে কাকুতি মিনতি প্রকাশ করে। নতুবা বৃষ্টির জন্য এমন ধরাবাঁধা সময় নির্ধারিত থাকলে যার চুল পরিমাণ ব্যতিক্রম হয় না, তবে মানুষ একে বাহ্যিক কারণের অনুগামী মনে করে আল্লাহ্‌র

কুদরতের প্রতি বিমুখ হয়ে পড়ত। এখানে 'নিরাশ' বলে নিজেদের তদ্বির থেকে নিরাশ হওয়া বোঝানো হয়েছে। নতুবা আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নৈরাশ্য কুফর।

وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ ---অভিধানে নিজ ক্ষমতা বলে চলাফেরা ও নড়াচড়া করতে সক্ষম প্রত্যেক বস্তুকে دَابَّةٌ বলা হয়। পরে শব্দটি কেবল জীবজন্তু অর্থে ব্যবহৃত হতে শুরু করে। আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা আকাশ ও পৃথিবীতে অনেক চলমান বস্তু সৃষ্টি করেছেন। পৃথিবীতে চলমান সৃষ্ট বস্তু সম্পর্কে সবাই অবগত। আকাশে চলমান সৃষ্ট বস্তুর অর্থ ফেরেশতাও হতে পারে এবং এমন জীবজন্তুও হতে পারে, যা এখনও মানুষের কাছে আবিষ্কৃত হয়নি।

উদ্দেশ্য এই যে, যদিও বিশ্ব-ব্যবস্থার উপযোগিতাবশত আল্লাহ্ তা'আলা সব মানুষকে ধনাঢ্যতা দান করেন নি; কিন্তু বিশ্বজগতের ব্যাপক উপকারী বস্তু দ্বারা সব মানুষকেই উপকৃত করেছেন। বৃষ্টি, মেঘ, ভূ-পৃষ্ঠ, আকাশ এবং এগুলোর যাবতীয় সৃষ্ট বস্তু মানুষের উপকারার্থে সৃজিত হয়েছে। এগুলো সবই আল্লাহ্‌র তওহীদ ব্যক্ত করে। এর পর কারও কোন কষ্ট হলে তা তার কৃতকর্মের ফলেই হয়। সুতরাং কষ্টে পতিত হয়ে আল্লাহ্ তা'আলাকে ভর্ৎসনা করার পরিবর্তে তার উচিত নিজের দোষত্রুটি দেখা।

وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَن كَثِيرٍ---

বাক্যের অর্থ তাই। হযরত হাসান থেকে বর্ণিত আছে---এ আয়াত অবতীর্ণ হলে রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, সে সত্তার কসম, যাঁর নিয়ন্ত্রণে আমার প্রাণ, যে ব্যক্তির গায়ে কোন কাঠের আঁচড় লাগে, অথবা কোন শিরা ধড়ফড় করে অথবা পা পিছলে যায়, তা সবই তার গোনাহ্‌র কারণে হয়ে থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক গোনাহ্‌র শাস্তি দেন না, বরং যেসব গোনাহ্‌র শাস্তি দেন না, সেগুলোর সংখ্যাই বেশি। হযরত আশরাফুল-মাশায়েখ বলেন, দৈহিক পীড়া ও কষ্ট যেমন গোনাহ্‌র কারণে হয়, তেমনি আত্মিক ব্যাধিও কোন গোনাহ্‌র ফলশ্রুতিতে হয়ে থাকে। এক গোনাহ্ হয়ে গেলে তা অন্য গোনাহে লিপ্ত হওয়ার কারণ হয়ে যায়। হাফেয ইবনে কাইয়্যেম 'দাওয়ায়ে-শফী' গ্রন্থে লিখেন----গোনাহ্‌র এক নগদ শাস্তি এই যে, এর পরেই মানুষ অন্য গোনাহে লিপ্ত হয়ে যায়। এমনিভাবে সৎকর্মের এক নগদ প্রতিদান এই যে, এক সৎকর্ম অন্য সৎকর্মের দিকে আকর্ষণ করে।

বায়যাভী প্রমুখ বলেন, এ আয়াত বিশেষভাবে তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যাদের দ্বারা গোনাহ্ সংঘটিত হতে পারে। পয়গম্বরগণ নিষ্পাপ হয়ে থাকেন। অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক-বালিকা ও উন্মাদ ব্যক্তি দ্বারা কোন গোনাহ্ হতে পারে না। তারা যদি কোন কষ্ট ও বিপদে পড়ে, তবে তারা এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত নয়। তাদের কষ্টের অন্যান্য

কারণ ও রহস্য থাকতে পারে। যেমন মর্যাদা উন্নীত করা ইত্যাদি। প্রকৃতপক্ষে এসব রহস্যও মানুষ পূর্ণরূপে জানতে পারে না।

কোন কোন রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে যে, যেসব গোনাহের শাস্তি দুনিয়াতে হয়ে যায়, মু'মিন ব্যক্তি সেগুলো থেকে পরকালে অব্যাহতি লাভ করবে। হাকেম ও বগভী হযরত আলীর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র এ উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। —(মাযহারী)

فَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ
وَّ اَبْقٰى لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ۝٣٦ وَالَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ
كَبٰٓئِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَاِذَا مَا غَضِبُوْا هُمْ يَغْفِرُوْنَ ۝٣٧ وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا
لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ۠ وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ ۠ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ
يُنْفِقُوْنَ ۝٣٨ وَالَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُوْنَ ۝٣٩ وَجَزٰٓؤُا
سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۚ فَمَنْ عَفَا وَاَصْلَحَ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ ۭ
اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ۝٤٠ وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهٖ فَاُولٰٓئِكَ مَا عَلَيْهِمْ
مِّنْ سَبِيْلٍ ۝٤١ اِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَظْلِمُوْنَ النَّاسَ وَيَبْغُوْنَ فِي
الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۭ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝٤٢ وَلَمَنْ صَبَرَ
وَغَفَرَ اِنَّ ذٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ۝٤٣

(৩৬) অতএব তোমাদেরকে যা দেওয়া হয়েছে, তা পার্থিব জীবনের ভোগ মাত্র। আর আল্লাহ্‌র কাছে যা রয়েছে, তা উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী তাদের জন্য, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও তাদের পালনকর্তার উপর ভরসা করে, (৩৭) যারা বড় গোনাহ ও অশ্লীল কার্য থেকে বেঁচে থাকে এবং ক্রোধান্বিত হয়েও ক্ষমা করে, (৩৮) যারা তাদের পালনকর্তার আদেশ মান্য করে, নামায কায়েম করে, পারস্পরিক পরামর্শক্রমে কাজ করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে, (৩৯) যারা আক্রান্ত হলে প্রতিশোধ গ্রহণ করে। (৪০) আর মন্দের প্রতিফল তো অনুরূপ মন্দই। যে ক্ষমা করে ও

আপস করে তার পুরস্কার আল্লাহ্‌র কাছে রয়েছে; নিশ্চয় তিনি অত্যাচারীদেরকে পছন্দ করেন না। (৪১) নিশ্চয় যে অত্যাচারিত হওয়ার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে, তাদের বিরুদ্ধেও কোন অভিযোগ নেই। অভিযোগ কেবল তাদের বিরুদ্ধে, যারা মানুষের উপর অত্যাচার চালায় এবং পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহ করে বেড়ায়। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (৪৩) অবশ্যই যে সবর করে ও ক্ষমা করে, নিশ্চয় এটা সাহসিকতার কাজ।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(তোমরা উপরে শুনেছ যে, দুনিয়াকামীদের সব আশাই পূর্ণ হয় না এবং তারা পরকাল থেকে বঞ্চিত থাকে, পক্ষান্তরে পরকালকামীরা উন্নতি লাভ করে। আরও শুনেছ যে, ধনসম্পদের প্রাচুর্যের পরিণাম শুভ নয়, প্রায়ই এ থেকে ক্ষতিকর কর্ম জন্মলাভ করে।) অতএব (প্রমাণিত হল যে, অভীষ্ট অর্জনের উপযুক্ত স্থান দুনিয়া নয়----পরকাল। তবে দুনিয়ার দ্রব্যসামগ্রীর মধ্য থেকে) তোমাদেরকে যা দেওয়া হয়েছে, তা (ক্ষণস্থায়ী) পার্থিব জীবনের ভোগমাত্র। (জীবনাবসানের সাথে সাথে এগুলোরও অবসান ঘটবে।) আর আল্লাহ্‌র কাছে যা (অর্থাৎ পরকালের পুরস্কার ও সওয়াব) আছে, তা (গুণগত দিক দিয়েও) উৎকৃষ্ট এবং (পরিমাণগত দিক দিয়েও) অধিক স্থায়ী। (অর্থাৎ সদাসর্বদা থাকবে। সুতরাং দুনিয়ার কামনা বাদ দিয়ে পরকাল কামনা কর। কিন্তু পরকাল অর্জনের জন্য ন্যূনতম শর্ত ঈমান আনা ও কুফর ত্যাগ করা। পরকালের পূর্ণ মর্যাদা লাভ করার জন্য সমস্ত ফরয ও ওয়াজিব কর্ম সম্পাদন করা ও যাবতীয় গোনাহ্ বর্জন করা জরুরী। নৈকট্যের মর্যাদা লাভ করার জন্য নফল ইবাদত করা এবং উত্তম নয়, এমন বৈধ কর্ম বর্জন করাও পছন্দনীয়। সেমতে পরকালের) এ সওয়াব তাদের জন্য যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও তাদের পালনকর্তার উপর ভরসা করে এবং যারা (বিশেষত) বড় গোনাহ্ ও অশ্লীল কার্য থেকে (অধিক) বেঁচে থাকে এবং ক্রোধান্বিত হয়েও ক্ষমা করে এবং যারা তাদের পালনকর্তার আদেশ মান্য করে, নামায কায়েম করে (আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সুনির্দিষ্ট বিধান নেই, এমন) কাজ পারস্পরিক পরামর্শক্রমে সম্পাদন করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে এবং যারা (কোন পক্ষ থেকে) অত্যাচারিত হলে (প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছা থাকলে) সমান প্রতিশোধ গ্রহণ করে (বাড়াবাড়ি করে না। এরূপ অর্থ নয় যে, ক্ষমা করে না। প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য আমি অনুমতি দিয়েছি যে,) মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দই (যদি কাজটি গোনাহ্‌র কাজ না হয়। অতপর প্রতিশোধ গ্রহণের অনুমতি সত্ত্বেও) যে ক্ষমা করে ও (পারস্পরিক ব্যাপারে) আপস-নিষ্পত্তি করে, (যার ফলে শত্রুতা বিলুপ্ত হয়ে বন্ধুত্ব) গড়ে উঠে। তার পুরস্কার (ওয়াদা অনুযায়ী) আল্লাহ্‌র যিম্মায় রয়েছে। (যারা প্রতিশোধ গ্রহণে বাড়াবাড়ি করে, তারা শুনে রাখুক,) নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা

অত্যাচারীদেরকে পছন্দ করেন না। আর যে (বাড়াবাড়ি করে না, বরং) অত্যাচারিত হওয়ার পর সমান প্রতিশোধ গ্রহণ করে, তাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। অভিযোগ কেবল তাদের বিরুদ্ধে, যারা মানুষের উপর (শুরুতেই) অত্যাচার চালায় (কিংবা প্রতিশোধ গ্রহণের সময়) এবং অন্যায়ভাবে পৃথিবীতে বিদ্রোহ করে বেড়ায়। (আর এই বিদ্রোহই অত্যাচারের কারণ হয়ে যায়।) তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। যে ব্যক্তি (অপরের অত্যাচারে) সবর করে ও ক্ষমা করে দেয়, নিশ্চয় এটা সাহসিকতার কাজ (অর্থাৎ এরূপ করা উত্তম ও বীরত্বের পরিচায়ক)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, দুনিয়ার নিয়ামতসমূহ অসম্পূর্ণ ও ধ্বংসশীল এবং পরকালের নিয়ামতসমূহ পরিপূর্ণ ও চিরন্তন। পরকালের নিয়ামত-সমূহ অর্জনের সর্বপ্রধান শর্ত ঈমান। ঈমান ব্যতিরেকে সেখানে এসব নিয়ামত কেউ লাভ করতে পারবে না। কিন্তু ঈমানের সাথে যদি সৎকর্মও পুরোপুরি সম্পাদন করা হয়, তবে পরকালের নিয়ামত শুরুতেই অর্জিত হয়ে যাবে। নতুবা গোনাহ্ ও ত্রুটির শাস্তি ভোগ করার পর অর্জিত হবে। তাই আলোচ্য আয়াতসমূহে সর্বপ্রথম শর্ত اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا বর্ণিত হয়েছে। এরপর বিশেষ বিশেষ কর্মের উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো ব্যতীত আইন অনুযায়ী পরকালের নিয়ামতসমূহ শুরুতেই পাওয়া যাবে না, বরং গোনাহের শাস্তি ভোগ করার পর পাওয়া যাবে। "আইন অনুযায়ী" বলার কারণ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা ইচ্ছা করলে সমস্ত গোনাহ্ মাফ করে শুরুতেই পরকালের নিয়ামতসমূহ মহাপাপীকেও দিতে পারেন। তিনি কোন আইনের অধীন নন। এখন এখানে গুরুত্ব সহকারে উল্লিখিত কর্ম ও গুণাবলী লক্ষ্য করুনঃ

প্রথম গুণ—عَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ—অর্থাৎ সর্বকাজে ও সর্বাবস্থায় পালন-কর্তার উপর ভরসা রাখে। তিনি ব্যতীত অপরকে সত্যিকার কার্যনির্বাহী মনে করে না। দ্বিতীয় গুণ—اَلَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبَائِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ অর্থাৎ যারা মহাপাপ বিশেষত অশ্লীল কার্যকলাপ থেকে বেঁচে থাকে। মহাপাপ তথা কবীরা গোনাহ্ কি, তার বিশদ বিবরণ সূরা নিসায় বর্ণিত হয়েছে।

কবীরা গোনাহ্সমূহের মধ্যে সমস্ত গোনাহ্ই অন্তর্ভুক্ত। তবে অশ্লীল গোনাহ্কে আলাদা করে বর্ণনা করার তাৎপর্য এই যে, অশ্লীল গোনাহ্ সাধারণ কবীরা গোনাহ্ অপেক্ষা তীব্রতর ও সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় হয়ে থাকে। এর দ্বারা অন্যরাও প্রভাবিত হয়। নির্লজ্জ কাজকর্ম বোঝানের জন্য فَوَاحِش শব্দ ব্যবহৃত হয়। যেমন, ব্যভিচার ও তার ভূমিকাসমূহ। এছাড়া যে সব কুকর্ম ধৃষ্টতা সহকারে প্রকাশ্যে করা হয়,

সেগুলোকেও فواحش তথা অশ্লীল বলা হয়। কেননা, এগুলোর কু-প্রভাবও যথেষ্ট তীব্র এবং গোটা মানব সমাজকে কলুষিত করে।

তৃতীয় গুণ—وَاِذَا مَا غَضِبُوْا هُمْ يَغْفِرُوْنَ—অর্থাৎ তারা রাগান্বিত হয়েও ক্ষমা করে। এটা সচ্চরিত্রতার উত্তম নমুনা। কেননা, কারও ভালবাসা অথবা কারও প্রতি ক্রোধ যখন প্রবল আকার ধারণ করে, তখন সুস্থ, বিবেকবান ও বুদ্ধিমান মানুষকেও অন্ধ ও বধির করে দেয়। সে বৈধ-অবৈধ, সত্য-মিথ্যা ও আপন কর্মের পরিণতি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার যোগ্যতাও হারিয়ে ফেলে। কারও প্রতি ক্রোধ হলে সে সাধ্যমত ঝাল মেটানোর চেষ্টা করে। আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিন ও সৎকর্মীদের এ গুণ বর্ণনা করেছেন যে, তারা ক্রোধের সময় কেবল বৈধ-অবৈধের সীমায় অবস্থান করেই ক্ষান্ত হয় না, বরং অধিকার থাকা সত্ত্বেও ক্ষমা প্রদর্শন করে।

চতুর্থ গুণ—اَلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ—استجابة-এর অর্থ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কোন আদেশ পাওয়া মাত্রই বিনা দ্বিধায় তা কবুল করতে ও পালন করতে প্রস্তুত হয়ে যাওয়া। সে আদেশ মনের অনুকূলে হোক অথবা প্রতিকূলে। এতে ইসলামের সকল ফরয কর্ম পালন এবং হারাম ও মাকরূহ কর্ম থেকে বেঁচে থাকা দাখিল রয়েছে। ফরয কর্মসমূহের মধ্যে নামায সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। এর বৈশিষ্ট্যও এই যে, এটা পালন করলে অন্যান্য ফরয কর্ম পালন এবং নিষিদ্ধ বিষয়াদি থেকে বেঁচে থাকারও তওফীক হয়ে যায়। তাই এর উল্লেখ স্বতন্ত্রভাবে করা হয়েছে। বলা হয়েছে وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ—অর্থাৎ তারা সকল ওয়াজিব ও আদবসহ বিশুদ্ধরূপে নামায পড়ে।

পঞ্চম গুণ—وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ—অর্থাৎ তাদের কাজকর্ম পারস্পরিক পরামর্শক্রমে স্থিরীকৃত হয় অর্থাৎ যেসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে শরীয়ত কোন বিশেষ বিধান নির্দিষ্ট করেনি, সেগুলো মীমাংসার কাজে তারা পরস্পর পরামর্শ করে। এখানে امر শব্দের অনুবাদ 'গুরুত্বপূর্ণ বিষয়' করা হয়েছে। কেননা সাধারণের পরিভাষায় امر শব্দ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অর্থে ব্যবহৃত হয়। সূরা আলে ইমরানের وَشَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ আয়াতের তফসীরে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে এবং এ কথাও স্পষ্ট করা হয়েছে যে, রাষ্ট্রীয় ব্যাপারাদি এবং সাধারণ লেন-দেনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি সবই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। ইবনে কাসীর বলেন, রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারাদিতে পরামর্শ গ্রহণ করা ওয়াজিব। ইসলামে রাষ্ট্র প্রধান নির্বাচনও

পরামর্শের উপর নির্ভরশীল করে মূর্খতাযুগের রাজতন্ত্র উৎখাত করা হয়েছে। সে যুগের ক্ষমতাসীনরা উত্তরাধিকারসূত্রে একের পর এক রাজত্ব লাভ করত। ইসলাম সর্বপ্রথম একে উৎখাত করে শাসন-ব্যবস্থায় গণতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপন করেছে। কিন্তু পশ্চিমা গণতন্ত্রের ন্যায় জনগণকে ঢালাও ইখতিয়ার না দিয়ে পরামর্শ-পরিষদের উপর কিছু বিধি-নিষেধ আরোপ করেছে। ফলে ইসলামের রাষ্ট্র-ব্যবস্থা ব্যক্তিগত রাজতন্ত্র ও পশ্চিমা গণতন্ত্র থেকে আলাদা একটি সুষম রাষ্ট্রব্যবস্থার রূপ নিয়েছে। মা'আরেফুল-কোরআন দ্বিতীয় খণ্ডে এ সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

ইমাম জাসসাস আহকামুল-কোরআনে বলেন, এ আয়াত থেকে পরামর্শের গুরুত্ব ফুটে উঠেছে। এতে আমাদের প্রতি পরামর্শসাপেক্ষে কাজে তাড়াহুড়া না করার, নিজস্ব মতকেই প্রাধান্য দিয়ে কাজ না করার এবং জ্ঞানী ও সুধীবর্গের কাছ থেকে পরামর্শ নিয়ে পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ রয়েছে।

পরামর্শের গুরুত্ব ও পন্থা : খতীব বাগদাদী হযরত আলী মুর্তজা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার অবর্তমানে আমরা যদি এমন কোন ব্যাপারের সম্মুখীন হই, যাতে কোরআনের কোন ফয়সালা নেই এবং আপনার পক্ষ থেকেও কোন ফয়সালা না পাই, তবে আমরা সে ব্যাপারে কি করব? রসূলুল্লাহ্ (সা) জওয়াবে বললেন— اجمعوا له العابدين من امتى واجعلوه بينكم شورى ولا تقضوه برأى واحد —এর জন্য আমার উম্মতের ইবাদতকারীদেরকে একত্র করবে এবং পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে কর্তব্য স্থির করবে; কারও একক মতে ফয়সালা করো না।

এ রেওয়ায়েতের কোন কোন ভাষায় عابدين ও فقهاء শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এ থেকে জানা যায় যে, এমন লোকদের কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়া দরকার, যারা ফিকাহ্‌বিদ অর্থাৎ ধর্মীয় জ্ঞানে জ্ঞানী এবং তৎসঙ্গে ইবাদতকারীও।

রূহুল মা'আনীর গ্রন্থকার বলেন, যে পরামর্শ এভাবে না নিয়ে বে-ইলম ও বে-দ্বীন লোকদের কাছ থেকে নেওয়া হয়, তার সুফলের চেয়ে কুফলই বেশি হবে।

বায়হাকী বর্ণিত হযরত ইবনে উমরের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, যে ব্যক্তি কোন কাজের ইচ্ছা করে তাতে পরামর্শ গ্রহণ করে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে সঠিক বিষয়ের দিকে হিদায়ত করবেন। অর্থাৎ যে কাজের পরিণতি তার জন্য মঙ্গল-জনক ও উত্তম, সে কাজের দিকে তার মনের গতি ফিরিয়ে দেবেন। এমনি ধরনের এক হাদীসে ইমাম বুখারী আল-আদাবুল মুফরাদে হযরত হাসান থেকে বর্ণনা করেছেন। তাতে তিনি উল্লিখিত আয়াত তিলাওয়াত করে বলেন:

ما تشاور قوم قط الا هدوا لا رشد امرهم —যখন কোন সম্প্রদায় পরামর্শক্রমে কাজ করে, তখন তাদেরকে অবশ্যই সঠিক পথনির্দেশ দান করা হয়।

এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, যতদিন পর্যন্ত তোমাদের শাসকবর্গ তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি হবে, তোমাদের বিত্তশালীরা দানশীল হবে এবং তোমাদের কাজকর্ম পারস্পরিক পরামর্শক্রমে সম্পন্ন হবে, ততদিন ভূ-পৃষ্ঠে তোমাদের বসবাস করা অর্থাৎ জীবিত থাকা ভাল। পক্ষান্তরে যখন তোমাদের শাসকবর্গ মন্দ ব্যক্তি হবে, তোমাদের বিত্তশালীরা কৃপণ হবে এবং তোমাদের কাজকর্ম নারীদের হাতে ন্যস্ত হবে--তারা যেভাবে ইচ্ছা কাজ করবে, তখন তোমাদের বসবাসের জন্য ভূ-পৃষ্ঠ অপেক্ষা ভূগর্ভই শ্রেয় হবে অর্থাৎ বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়াই উত্তম হবে।---(রূহুল মা'আনী)

ষষ্ঠ গুণ---وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ-----অর্থাৎ তারা আল্লাহ্-প্রদত্ত রিযিক থেকে সৎকাজে ব্যয় করে। ফরয যাকাত, নফল দান-খয়রাত সবই এর অন্তর্ভুক্ত। কোরআনের সাধারণ বর্ণনাপদ্ধতি অনুযায়ী নামাযের সাথে যাকাত ও সদকার উল্লেখ থাকা উচিত ছিল। এখানে নামাযের আলোচনার পরে পরামর্শের বিষয় বর্ণনা করে যাকাতের উল্লেখ করা হয়েছে। এতে সম্ভবত ইঙ্গিত রয়েছে যে, নামাযের জন্য মসজিদ-সমূহে দৈনিক পাঁচ বার লোকজন সমবেত হয়। পরামর্শসাপেক্ষ বিষয়াদিতে পরামর্শ নেওয়ার কাজেও এ সমাবেশকে ব্যবহার করা যায়।---(রূহুল-মা'আনী)

সপ্তম গুণ---وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ ---অর্থাৎ তারা অত্যাচারিত হয়ে সমান সমান প্রতিশোধ গ্রহণ করে এবং এতে সীমালংঘন করে না। এটা প্রকৃতপক্ষে তৃতীয় গুণের ব্যাখ্যা ও বিবরণ। তৃতীয় গুণ ছিল এই যে, তারা শত্রুকে ক্ষমা করে। কিন্তু বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে ক্ষমা করলে অত্যাচার আরও বেড়ে যায়। তখন প্রতিশোধ গ্রহণই উত্তম বিবেচিত হয়। আয়াতে এরই বিধান বর্ণিত হয়েছে যে, কোথাও প্রতিশোধ গ্রহণ শ্রেয় বিবেচিত হলে সেখানে সাম্যের সীমা লংঘন না করার প্রতি লক্ষ্য রাখা জরুরী। সীমা লংঘিত হলে প্রতিশোধ গ্রহণও অত্যাচারে পর্যবসিত হবে। এ কারণেই পরে বলা হয়েছে--- وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا ---অর্থাৎ মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দই হয়ে থাকে। তোমার যতটুকু আর্থিক অথবা শারীরিক ক্ষতি কেউ করে, তুমি ঠিক ততটুকু ক্ষতিই তার কর। তবে শর্ত এই যে, তোমার মন্দ কাজটি যেন পাপকর্ম না হয়। উদাহরণত কেউ তোমাকে বল-পূর্বক মদ পান করিয়ে দিলে তোমার জন্য তাকেও বলপূর্বক মদ পান করিয়ে দেওয়া জায়েয হবে না।

আয়াতে যদিও সমান সমান প্রতিশোধ নেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, কিন্তু পরে এ কথাও বলে দেওয়া হয়েছে যে,---- فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ---অর্থাৎ যে ব্যক্তি ক্ষমা করে এবং আপস-নিষ্পত্তি করে, তার পুরস্কার আল্লাহ্র

দায়িত্বে রয়েছে। এতে নির্দেশ রয়েছে যে, ক্ষমা করাই উত্তম। পরবর্তী দু'আয়াতে এরই আরও বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

ক্ষমা ও প্রতিশোধ গ্রহণে সুষম ফয়সালা ঃ হযরত ইবরাহীম নখয়ী (র) বলেন, পূর্ববর্তী মনীষিগণ এটা পছন্দ করতেন না যে, মু'মিনগণ পাপাচারী লোকদের সামনে নিজেদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করবেন। ফলে তাদের ধৃষ্টতা আরও বেড়ে যাবে। তাই যেক্ষেত্রে ক্ষমা করার ফলে পাপাচারীদের ধৃষ্টতা বেড়ে যাওয়ার আশংকা থাকে, সেক্ষেত্রে প্রতিশোধ নেওয়াই উত্তম। ক্ষমা করা তখন উত্তম, যখন অত্যাচারী ব্যক্তি অনুতপ্ত হয় এবং তার পক্ষ থেকে অত্যাচার বেড়ে যাওয়ার আশংকা না থাকে। কাযী আবূ বকর ইবনে আরাবী ও কুরতুবী এ নীতিই পছন্দ করেছেন। তাঁরা বলেন, ক্ষমা ও প্রতিশোধ দু'টিই অবস্থাভেদে উত্তম। যে ব্যক্তি অনাচার করার পর লজ্জিত হয়, তাকে ক্ষমা করা উত্তম এবং যে ব্যক্তি স্বীয় জেদে ও অত্যাচারে অটল থাকে, তার ক্ষেত্রে প্রতিশোধ নেওয়াই উত্তম।

বয়ানুল কোরআনে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য দু'আয়াতে খাঁটি মু'মিন ও সৎকর্মীদের দু'টি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন। هُمْ يَغْفِرُوْنَ—এ বাক্যে বলা হয়েছে যে, তারা ক্রোধের সময় নিজেদেরকে হারিয়ে ফেলে না ; বরং তখনও ক্ষমা ও অনুকম্পা তাদের মধ্যে প্রবল থাকে। ফলে ক্ষমা করে দেয়। পক্ষান্তরে هُمْ يَنْتَصِرُوْنَ----বাক্যে বলা হয়েছে যে, কোন সময় অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণের প্রেরণা তাদের মধ্যে জাগ্রত হলেও তারা তাতে ন্যায়ের সীমালংঘন করে না, যদিও ক্ষমা করে দেওয়া উত্তম।

وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ وَّلِيٍّ مِّنْۢ بَعْدِهٖ ۗ وَتَرَى الظّٰلِمِيْنَ لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ يَقُوْلُوْنَ هَلْ اِلٰى مَرَدٍّ مِّنْ سَبِيْلٍ ﴿٤٤﴾ وَتَرٰىهُمْ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا خٰشِعِيْنَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُوْنَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ ۗ وَقَالَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ الْخٰسِرِيْنَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ وَاَهْلِيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اَلَآ اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ فِيْ عَذَابٍ مُّقِيْمٍ ﴿٤٥﴾ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنْ اَوْلِيَآءَ يَنْصُرُوْنَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ وَمَنْ

حَفِيظًا ۚ إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلٰغُ ۗ وَإِنَّآ إِذَآ أَذَقْنَا الْإِنْسٰنَ مِنَّا
رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا ۚ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ
الْإِنْسٰنَ كَفُورٌ ﴿٤٨﴾ لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ
يَهَبُ لِمَنْ يَشَآءُ إِنٰثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَآءُ الذُّكُورَ ﴿٤٩﴾ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ
ذُكْرَانًا وَإِنٰثًا ۖ وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَآءُ عَقِيمًا ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿٥٠﴾
يُضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ ﴿٤٦﴾ اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ
قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللّٰهِ ۚ مَا لَكُمْ مِنْ مَلْجَإٍ يَوْمَئِذٍ
وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ ﴿٤٧﴾ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَآ أَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ

(৪৪) আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তার জন্য তিনি ব্যতীত কোন কার্যনির্বাহী নেই। পাপাচারীরা যখন আযাব প্রত্যক্ষ করবে, তখন আপনি তাদেরকে দেখবেন যে, তারা বলছে 'আমাদের ফিরে যাওয়ার কোন উপায় আছে কি?' (৪৫) জাহান্নামের সামনে উপস্থিত করার সময় আপনি তাদেরকে দেখবেন, অপমানে অবনত এবং অর্ধ নিমীলিত দৃষ্টিতে তাকায়। মু'মিনরা বলবে, কিয়ামতের দিন ক্ষতিগ্রস্ত তারাই, যারা নিজেদের ও তাদের পরিবার-পরিজনের ক্ষতি সাধন করেছে। শুনে রাখ, পাপাচারীরা স্থায়ী আযাবে থাকবে। (৪৬) আল্লাহ্ ব্যতীত তাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না, যে তাদেরকে সাহায্য করবে। আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তার কোন গতি নেই। (৪৭) আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবশ্যম্ভাবী দিবস আসার পূর্বে তোমরা তোমাদের পালনকর্তার আদেশ মান্য কর। সেদিন তোমাদের কোন আশ্রয়স্থল থাকবে না এবং তা নিরোধকারী কেউ থাকবে না। (৪৮) যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আপনাকে আমি তাদের রক্ষক করে পাঠাইনি। আপনার কর্তব্য কেবল প্রচার করা। আমি যখন মানুষকে আমার রহমত আস্বাদন করাই, তখন সে উল্লসিত হয়, আর যখন তাদের কৃতকর্মের কারণে তাদের কোন অনিষ্ট ঘটে, তখন মানুষ খুব অকৃতজ্ঞ হয়ে যায়। (৪৯) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রাজত্ব আল্লাহ্রই। তিনি যা ইচ্ছা, সৃষ্টি করেন, যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন, (৫০) অথবা তাদেরকে দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই এবং যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করে দেন। নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ, ক্ষমতাশালী।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(এটা ছিল হিদায়তপ্রাপ্তদের অবস্থা। তারা দুনিয়াতে হিদায়ত এবং পরকালে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সওয়াব পাবে। এবার পথভ্রষ্টদের অবস্থা শোন,) আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তার জন্য আল্লাহ্ ব্যতীত (দুনিয়াতেও) কোন কার্যনির্বাহী নেই (যে, তাকে সৎপথে নিয়ে আসবে) এবং (কিয়ামতেও তার অবস্থা হবে শোচনীয়। সেমতে সেদিন) পাপাচারীরা যখন আযাব প্রত্যক্ষ করবে, আপনি তখন তাদেরকে (পরিতাপ সহকারে) বলতে দেখবেন, "আমাদের (দুনিয়াতে) ফিরে যাওয়ার কোন উপায় আছে কি (যাতে ভাল কাজ করে আসতে পারি)"? (এছাড়া) আপনি দেখবেন, যখন তাদেরকে জাহান্নামের সামনে উপস্থিত করা হবে, তখন অপমানে অবনত থাকবে এবং অর্ধ নিমীলিত দৃষ্টিতে তাকাবে (ভয়ার্ত মানুষ যেমন তাকায়)। (অন্য এক আয়াতে অন্ধ হওয়ার কথা আছে। সেটা হবে হাশরে আর এটা তার পরের ঘটনা। সেখানে نَحْشُرُ৪ বলা হয়েছে। তখন) মু'মিনরা (নিজেদের পরিত্রাণ প্রাপ্তির কৃতজ্ঞতাস্বরূপ এবং জাহান্নামীদেরকে তিরস্কার করার উদ্দেশ্যে) বলবে, পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত তারাই যারা নিজেদের ও তাদের পরিবার-পরিজনের ব্যাপারে (আজ) কিয়ামতের দিন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। (সূরা যুমারের দ্বিতীয় রুকূতে এর তফসীর বর্ণিত হয়েছে।) মনে রেখো, জালিমরা (অর্থাৎ মুশরিক ও কাফিররা) স্থায়ী আযাবে থাকবে। (সেখানে) তাদের আল্লাহ্ ব্যতীত কোন সাহায্যকারী থাকবে না যে তাদেরকে সাহায্য করবে। আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তার (মুক্তির) কোন গতি নেই। (অতপর কাফিরদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে যে, তোমরা যখন কিয়ামতের এই ভয়াবহ অবস্থা শুনলে, তখন) তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (ঈমান ইত্যাদি সম্পর্কিত) আদেশ মান্য কর সে দিবস আসার পূর্বে, যা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অপসারিত হবে না (অর্থাৎ দুনিয়াতে যেমন আযাব অপসারিত হয় পরকালে তেমন পরিস্থিতি হবে না।) সেদিন তোমাদের কোন আশ্রয়স্থল থাকবে না এবং তোমাদের সম্পর্কে কোন নিরোধকারীও থাকবে না। (অর্থাৎ তোমাদের দুর্গতির কারণ জিজ্ঞাসাকারীও কেউ থাকবে না।) হে পয়গম্বর, আপনি তাদেরকে এ কথা শুনিয়ে দিন। অতপর (একথা শুনেও) যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, (এবং ঈমান না আনে), তবে (আপনি চিন্তিত ও দুঃখিত হবেন না। কেননা,) আমি আপনাকে তাদের রক্ষক করে পাঠাইনি (যে, আপনি জিজ্ঞাসিত হবেন তারা আপনার উপস্থিতিতে এরূপ কেন করল? বরং) আপনার কর্তব্য হল কেবল প্রচার করা (যা আপনি করে যাচ্ছেন। কাজেই আপনি এর বেশি চিন্তা করবেন কেন? সত্যের প্রতি তাদের বিমুখ হওয়ার কারণ আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্কের অভাব। এর লক্ষণ এই যে,) আমি যখন (এ ধরনের) মানুষকে আমার রহমত আস্বাদন করাই তখন সে (অহংকারে) উৎফুল্ল হয় (এবং রহমত দাতার শোকর করে না)। আর যদি তাদের কুকর্মের কারণে কোন বিপদ ঘটে, তখন (এ ধরনের) মানুষ অকৃতজ্ঞ হয়ে যায় (এবং তওবা ও ইস্তেগফার করে আল্লাহ্‌র অভিমুখী হয় না। এই উভয় অবস্থাই এ বিষয়ের লক্ষণ যে, তাদের সম্পর্ক আল্লাহ্‌র সাথে নেই অথবা দুর্বল। এ কারণেই তারা কুফরে

লিপ্ত হয়েছে। যেহেতু এটা তাদের মজ্জায় পরিণত হয়ে গেছে, তাই তাদের কাছ থেকে ঈমান আশা করবেন না। অতপর আবার তওহীদ বর্ণিত হয়েছে)—নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রাজত্ব আল্লাহ্ তা'আলারই। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। (সেমতে) যাকে ইচ্ছা, কন্যা সন্তান এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন অথবা তাদেরকে পুত্র ও কন্যা উভয়ই দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করে দেন। নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য প্রাথমিক আয়াতসমূহে তাদের পরিণতি উল্লেখ করা হয়েছে, যারা মু'মিন সৎকর্মীদের বিপরীতে কেবল দুনিয়ার আরাম-আয়েশ ও সুখ-শান্তি কামনা করে। এরপর اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ—বাক্যে তাদেরকে কিয়ামতের আযাব আসার পূর্বে তওবা করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। অতপর রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সান্ত্বনা ও প্রবোধ দেওয়া হয়েছে যে, আপনার বারংবার প্রচার ও প্রচেষ্টা সত্ত্বেও যদি তাদের চৈতন্য ফিরে না আসে, তবে আপনি দুঃখিত হবেন না। فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا —বাক্যের মর্ম তাই।

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ—থেকে শেষ পর্যন্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলার সর্বময় ক্ষমতা ও প্রজ্ঞা বর্ণনা করে তওহীদের দাওয়াত দেওয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টির আলোচনার পর يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ বলে কুদরতের একটি বিধি বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ তিনি প্রত্যেক ছোট বড় বস্তু সৃষ্টি করার পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন এবং যখন ইচ্ছা, যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। এ প্রসঙ্গে মানব সৃষ্টির উল্লেখ করে বলা হয়েছেঃ

يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا

وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ -

অর্থাৎ মানব সৃষ্টিতে কারও ইচ্ছা, ক্ষমতা এমনকি, জ্ঞানেরও কোন দখল নেই। পিতামাতা মানব সৃষ্টির বাহ্যিক মাধ্যম হয়ে থাকে মাত্র। সন্তান প্রজননে তাদের ইচ্ছা ও ক্ষমতারও কোন দখল নেই। দখল থাকা তো দূরের কথা, সন্তান জন্মগ্রহণের পূর্বে মাতাও জানে না যে, তার গর্ভে কি আছে এবং কিভাবে গঠিত হচ্ছে। আল্লাহ্ তা'আলাই

কাউকে কন্যা সন্তান, কাউকে পুত্র সন্তান, কাউকে পুত্র-কন্যা উভয়ই দান করেন এবং কাউকে সম্পূর্ণ বন্ধ্যা করে রাখেন—তার কোন সন্তানই হয় না।

এসব আয়াতে সন্তানের প্রকার বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা সর্বপ্রথম কন্যা সন্তানের উল্লেখ করেছেন, আর পুত্র সন্তানের উল্লেখ করেছেন পরে। এ ইঙ্গিতদৃষ্টে হযরত ওয়াছেলা ইবনে আসকা' বলেন, যে নারীর গর্ভ থেকে প্রথমে কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে, সে পুণ্যময়ী। —(কুরতুবী)

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَآئِ حِجَابٍ
اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا فَيُوْحِيَ بِاِذْنِهٖ مَا يَشَآءُ ؕ اِنَّهٗ عَلِيٌّ حَكِيْمٌ ﴿٥١﴾
وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا ؕ مَا كُنْتَ تَدْرِيْ مَا الْكِتٰبُ
وَلَا الْاِيْمَانُ وَلٰكِنْ جَعَلْنٰهُ نُوْرًا نَّهْدِيْ بِهٖ مَنْ نَّشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا ؕ
وَاِنَّكَ لَتَهْدِيْٓ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٥٢﴾ صِرَاطِ اللّٰهِ الَّذِيْ لَهٗ مَا فِي
السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ اَلَآ اِلَى اللّٰهِ تَصِيْرُ الْاُمُوْرُ ﴿٥٣﴾

(৫১) কোন মানুষের জন্য এমন হওয়ার নয় যে, আল্লাহ্ তার সাথে কথা বলবেন; কিন্তু ওহীর মাধ্যমে অথবা পর্দার অন্তরাল থেকে অথবা তিনি কোন দূত প্রেরণ করবেন, অতপর আল্লাহ্‌র যা চান, সে তা তাঁর অনুমতিক্রমে পেঁৗছে দেবে। নিশ্চয় তিনি সর্বোচ্চ প্রজ্ঞাময়। (৫২) এমনিভাবে আমি আপনার কাছে এক ফেরেশতা প্রেরণ করেছি আমার আদেশক্রমে। আপনি জানতেন না, কিতাব কি এবং ঈমান কি। কিন্তু আমি একে করেছি নূর, যদ্দ্বারা আমি আমার বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করি। নিশ্চয় আপনি সরল পথ প্রদর্শন করেন—(৫৩) আল্লাহ্‌র পথ। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সব তাঁরই। শুনে রাখ, আল্লাহ্‌র কাছেই সব বিষয়ে পেঁৗছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

কোন মানুষের জন্য এমন নয় যে, (বর্তমান অবস্থায়) আল্লাহ তা'আলা তার সাথে কথা বলবেন, কিন্তু (তা তিন উপায়ে হতে পারে।) ইলহামের মাধ্যমে (অর্থাৎ অন্তরে কোন ভাল বিষয় জাগ্রত করে) অথবা যবনিকার অন্তরাল থেকে [কোন কথা শুনিয়ে; যেমন, মূসা (আ) শুনেছিলেন] অথবা তিনি কোন দূত ফেরেশতা প্রেরণ

করবেন এবং তিনি আল্লাহ্‌র আদেশক্রমে তিনি যা চান, তা পৌঁছে দেবেন। (এর কারণ এই যে,) তিনি সমুন্নত, (তিনি শক্তি না দিলে কেউ তাঁর সাথে বাক্যালাপ করতে পারে না। কিন্তু এতদসঙ্গে তিনি) প্রজ্ঞাময়। (এ কারণেই বান্দার সাথে তিনি বাক্যালাপের তিনটি উপায় নির্ধারিত করে দিয়েছেন। মানুষের সাথে আমার কথা বলার যেমন উপায় বর্ণনা করা হয়েছে,) এমনিভাবে (অর্থাৎ এই নিয়মানুযায়ী) আমি আপনার কাছেও ওহী (অর্থাৎ আমার) আদেশ প্রেরণ করেছি (এবং আপনাকে রসূল বানিয়েছি। এই ওহী এমন এক নির্দেশনামা যে, এরই বদৌলতে আপনার তুলনাবিহীন জ্ঞানের উন্নতি হয়েছে। সেমতে এর আগে) আপনি জানতেন না, (আল্লাহ্‌র) কিতাব কি এবং ঈমান (অর্থাৎ ঈমানের পূর্ণ স্তর, যা এখন অর্জিত আছে) কি? (যদিও মূল ঈমান নবুয়তের পূর্বেও নবীর জানা থাকে) কিন্তু আমি (আপনাকে নবুয়ত ও কোরআন দিয়েছি এবং) এ কোরআনকে (প্রথমে আপনার জন্য ও পরে অন্যদের জন্য) করেছি নূর (যদ্দ্বারা আপনার মহান জ্ঞান ও সুউচ্চ মর্যাদা অর্জিত হয়েছে এবং) যদ্দ্বারা আমি আমার বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করি। (সুতরাং এটা যে মহান নূর, এতে সন্দেহ নেই। এখন যে অন্ধ, সে এ নূরের উপকার থেকে বঞ্চিত, বরং একে অস্বীকার করে। যেমন, আপত্তিকারীদের অবস্থা।) নিঃসন্দেহে আপনি (এ কোরআন ও ওহীর মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে) সরল পথ প্রদর্শন করছেন, (অর্থাৎ) আল্লাহ্‌র পথ, সে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সবকিছু যার। (অতপর এসব আদেশ যারা মানে এবং যারা মানে না, তাদের শাস্তি ও প্রতিদান উল্লেখ করা হয়েছে—) মনে রেখ, তাঁরই কাছে সব বিষয় পৌঁছবে (তখন তিনি সব কিছুর প্রতিদান ও শাস্তি দেবেন)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম আয়াত ইহুদীদের এক হঠকারিতামূলক দাবির জওয়াবে অবতীর্ণ হয়েছে! বগভী ও কুরতুবী প্রমুখ লিখেছেন, ইহুদীরা রসূলুল্লাহ্ (স)-কে বলল, আমরা আপনার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে পারি না। কেননা, আপনি মূসা (আ)-র ন্যায় আল্লাহ্ তা'আলাকে দেখেন না এবং তাঁর সাথে সামনাসামনি কথাবার্তাও বলেন না।

রসূলুল্লাহ্ (স) বললেন, একথা সত্য নয় যে, মূসা (আ) আল্লাহ্ তা'আলাকে দেখে-ছিলেন। এরই প্রেক্ষিতে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এর সারমর্ম এই যে, এ দুনিয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে সরাসরি ও সামনাসামনি কথা বলা কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। স্বয়ং হযরত মূসা (আ)-ও সামনাসামনি কথা শুনেন নি, বরং যবনিকার অন্তরাল থেকে আওয়ায শুনেছেন মাত্র।

এ আয়াতে আরও বলা হয়েছে যে, কোন মানুষের সাথে আল্লাহ্ তা'আলার কথা বলার তিনটি মাত্র উপায় রয়েছে। এক—وَحْيًا —অর্থাৎ কোন বিষয় অন্তরে জাগ্রত করে দেওয়া। এটা জাগ্রত অবস্থায়ও হতে পারে এবং নিদ্রাবস্থায় স্বপ্নের আকারেও

হতে পারে। অনেক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) القى فى روعى বলতেন। অর্থাৎ এ বিষয়টি আমার অন্তরে জাগ্রত করা হয়েছে। পয়গম্বরগণের স্বপ্নও ওহী হয়ে থাকে। এতে শয়তানের কারসাজি থাকতে পারে না। এমতাবস্থায় সাধারণত আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে শব্দ অবতীর্ণ হয় না; কেবল বিষয়বস্তু অন্তরে জাগ্রত হয়, যা পয়গম্বর নিজের ভাষায় ব্যক্ত করেন।

দ্বিতীয় উপায়---اَوْ مِنْ وَّرَاءِ حِجَابٍ---অর্থাৎ জাগ্রত অবস্থায় যবনিকার অন্তরাল থেকে কোন কথা শোনা। মূসা (আ) তুর পর্বতে এভাবেই আল্লাহ্ তা'আলার কথা শুনেছিলেন। কিন্তু তিনি আল্লাহ্ তা'আলার সাক্ষাৎ লাভ করেন নি। তাই رَبِّ اَرِنِىْ اَنْظُرْ اِلَيْكَ বলে সাক্ষাতের আবেদন জানান, যার নেতিবাচক জওয়াব لَنْ تَرَانِىْ বলে দেওয়া হয়।

দুনিয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার সাক্ষাতের অন্তরায় যবনিকাটি এমন কোন বস্তু নয়, যা আল্লাহ্ তা'আলাকে ঢেকে রাখতে পারে। কেননা, তাঁর সর্বব্যাপী নূরকে কোন বস্তুই ঢাকতে পারে না। বরং মানুষের দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতাই এ সাক্ষাতের পথে অন্তরায় হয়ে থাকে। জান্নাতে মানুষের দৃষ্টিশক্তি প্রখর করে দেওয়া হবে। ফলে সেখানে প্রত্যেক জান্নাতী আল্লাহ্ তা'আলার দর্শন লাভে ধন্য হবে। সহীহ্ হাদীসসমূহের বর্ণনা অনুযায়ী আহ্লে সুন্নত ওয়াল জমাআতের মযহাবও তাই।

আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত এ নীতি দুনিয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। দুনিয়াতে কোন মানুষ আল্লাহ্ তা'আলার সাথে সামনাসামনি কথা বলতে পারে না। আলোচনা যেহেতু মানুষ সম্পর্কে, তাই আয়াতে বিশেষভাবে মানুষের উল্লেখ করা হয়েছে। নতুবা বাহ্যত ফেরেশতাগণের সাথেও আল্লাহ্ তা'আলার সামনাসামনি কথা হয় না। তিরমিযীর রেওয়ায়েতে জিবরাঈল (আ)-এর উক্তি বর্ণিত আছে যে, আমি অনেক কাছাকাছি চলে গিয়েছিলাম, তবুও আমার এবং আল্লাহ্ তা'আলার মধ্যে সত্তর হাজার পর্দা রয়ে গিয়েছিল। কোন কোন আলিমের উক্তি অনুযায়ী যদি মে'রাজ-রজনীতে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে রসূলুল্লাহ্ (স)-র মুখামুখি কথাবার্তা প্রমাণিত হয়, তবে তা উপরোক্ত নীতির পরিপন্থী নয়। কেননা, সে কথাবার্তা এ জগতে নয়---আরশে হয়েছিল।

তৃতীয় উপায়---اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا---অর্থাৎ জিবরাঈল প্রমুখ কোন ফেরেশতাকে কালাম দিয়ে প্রেরণ করা এবং পয়গম্বরকে তার পাঠ করে শোনানো। এটাই ছিল সাধারণ পন্থা। কোরআন পাক সম্পূর্ণই এ উপায়ে ফেরেশতার মাধ্যমে অবতীর্ণ হয়েছে। উপরোক্ত বিবরণে وحى শব্দটিকে অন্তরে নিক্ষেপ করার অর্থে নেওয়া

হয়েছে। কিন্তু শব্দটি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আল্লাহ্‌র সব ধরনের কালামের অর্থে ব্যবহৃত হয়। বুখারীর এক দীর্ঘ হাদীসে ফেরেশতার মাধ্যমে কথাবার্তাকেও ওহীর একটি প্রকার গণ্য করা হয়েছে। তাতে আরও বলা হয়েছে যে, ফেরেশতার মাধ্যমে আগত ওহীও দু'রকম। কখনও ফেরেশতা আসল আকৃতিতে আসেন এবং কখনও মানুষের আকৃতিতে।

مَا كُنْتَ تَدْرِيْ مَا الْكِتَابُ وَلَا الْاِيْمَانُ ——এ আয়াতটি প্রথম আয়াতে বর্ণিত বিষয়বস্তুরই পরিশিষ্ট। এর সারমর্ম এই যে, দুনিয়াতে মুখোমুখি কথাবার্তা তো কারও সাথে হয়নি---হতে পারেও না। তবে আল্লাহ তা'আলা বিশেষ বান্দাদের প্রতি যে ওহী প্রেরণ করেন, তার তিনটি উপায় প্রথম আয়াতে বিবৃত হয়েছে। এই নিয়ম অনুযায়ী আপনার প্রতিও ওহী প্রেরণ করা হয়। আপনি আল্লাহ তা'আলার সাথে সামনাসামনি কথা বলুন----ইহুদীদের এ দাবি মূর্খতাপ্রসূত ও হঠকারিতামূলক। তাই বলা হয়েছে, কোন মানুষ এমনকি কোন রসূল যে জ্ঞান লাভ করেন, তা আল্লাহ্ তা'আলারই দান। যতক্ষণ আল্লাহ্ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে তা ব্যক্ত না করেন, ততক্ষণ পর্যন্ত রসূলগণ কোন কিতাব সম্পর্কেও জানতে পারেন না এবং ঈমানের বিশদ বিবরণ সম্পর্কেও ওয়াকিফহাল হতে পারেন না। কিতাব সম্পর্কে না জানার বিষয়টি বর্ণনা-সাপেক্ষ নয়। ঈমান সম্পর্কে ওয়াকিফহাল না হওয়ার অর্থ এই যে, ঈমানের বিবরণ, ঈমানের শর্তাবলী এবং ঈমানের সর্বোচ্চ স্তর সম্পর্কে ওহীর পূর্বে জ্ঞান থাকে না। নতুবা এ বিষয়ে আলিমগণের ইজমা তথা ঐকমত্য রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা যাকে রসূল ও নবী করেন, তাকে শুরু থেকেই ঈমানের উপর পয়দা করেন। তাঁর মন-মানাসিকতা ঈমানের উপর ভিত্তিশীল থাকে। নবুয়ত দান ও ওহী অবতরণের পূর্বেও তিনি পাকাপোক্ত মু'মিন হয়ে থাকেন। ঈমান তাঁর মজ্জা ও চারত্রে পরিণত হয়। এ কারণেই যুগে যুগে বিভিন্ন সম্প্রদায় পয়গম্বরগণের বিরোধিতা করে তাদের প্রতি নানা রকম দোষারোপ করেছে, কিন্তু কোন পয়গম্বরকে বিরোধীরা এই দোষ দেয়নি যে, আপনিও তো নবুয়ত দাবির পূর্বে আমাদের মতই প্রতিমা পূজা করতেন। কুরতুবী তাঁর তফসীরে এবং কাযী আয়ায 'শেফা' গ্রন্থে এ বিষয়টি বিশ্লেষণ করেছেন।

سورة الزخرف

সূরা যুখরুফ

মক্কায় অবতীর্ণ, ৮৯ আয়াত, ৭ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

حٰمٓ ① وَالْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ② اِنَّا جَعَلْنٰهُ قُرْءٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ③ وَاِنَّهٗ فِيْٓ اُمِّ الْكِتٰبِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيْمٌ ④ اَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا اَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِيْنَ ○ وَكَمْ اَرْسَلْنَا مِنْ نَّبِيٍّ فِي الْاَوَّلِيْنَ ○ وَمَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ نَّبِيٍّ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ○ فَاَهْلَكْنَآ اَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَّمَضٰى مَثَلُ الْاَوَّلِيْنَ ○

পরম করুণাময় ও অসীম দয়াবান আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) হা-মীম (২) শপথ সুস্পষ্ট কিতাবের (৩) আমি একে করেছি কোরআন, আরবী ভাষায়, যাতে তোমরা বুঝ। (৪) নিশ্চয় এ কোরআন আমার কাছে সমুন্নত, অটল রয়েছে লওহে-মাহফুযে। (৫) তোমরা সীমাতিক্রমকারী সম্প্রদায়—এ কারণে কি আমি তোমাদের কাছ থেকে কোরআন প্রত্যাহার করে নেব? (৬) পূর্ববর্তী লোক-দের কাছে আমি অনেক রসূলই প্রেরণ করেছি। (৭) যখনই তাদের কাছে কোন রসূল আগমন করেছেন, তখনই তারা তাঁর সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছে। (৮) সুতরাং আমি তাদের চেয়ে অধিক শক্তিসম্পন্নদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি। পূর্ববর্তীদের এ ঘটনা অতীত হয়ে গেছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হা-মীম (এর অর্থ আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন।) কসম সুস্পষ্ট কিতাবের যে, আমি একে আরবী ভাষায় কোরআন করেছি, যাতে (হে আরব) তোমরা (সহজে)

বুঝ। এটা আমার কাছে লওহে-মাহ্ফুযে, সমুন্নত ও প্রজ্ঞাপূর্ণ কিতাব। সুতরাং এমন কিতাবকে অবশ্যই মেনে নেয়া উচিত। (তোমরা না মানলেও আমি আমার প্রজ্ঞার তাগিদে একে প্রেরণ ও এর মাধ্যমে তোমাদেরকে সম্বোধন পরিত্যাগ করব না। সেমতে ইরশাদ হয়েছে---) তোমরা (আনুগত্যের) সীমাতিক্রমকারী সম্প্রদায়---(শুধু) এ কারণেই কি আমি তোমাদের কাছ থেকে এ কোরআন প্রত্যাহার করে নেব (অর্থাৎ তোমাদের মানা, না-মানা উভয় অবস্থায় উপদেশ দান করা হবে, যাতে মু'মিনগণ উপকৃত হয় এবং তোমরা জব্দ হও)। আমি পূর্ববর্তীদের মধ্যে (তাদের মিথ্যারোপ সত্ত্বেও) অনেক নবী প্রেরণ করেছি। (তাদের মিথ্যারোপের কারণে নবুয়তের ধারা বন্ধ করে দেয়া হয়নি। হে পয়গম্বর! আমি যেমন তাদের মিথ্যারোপের পরওয়া করিনি, তেমনি আপনিও পরওয়া ও দুঃখ করবেন না। কেননা, আগেকার লোকদের অবস্থা এমন ছিল যে) যখনই তাদের কাছে কোন রসূল আগমন করেছে, তখনই তারা তাঁর সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছে। অতপর আমি তাদের (অর্থাৎ মক্কাবাসীদের) চেয়ে অধিক শক্তিসম্পন্নদেরকে (মিথ্যারোপ ও ঠাট্টা-বিদ্রূপের শাস্তিস্বরূপ) ধ্বংস করে দিয়েছি। পূর্ববর্তীদের এ ঘটনা অতীত হয়ে গেছে। (সুতরাং আপনি দুঃখ করবেন না। তাদেরও এরূপ অবস্থা হবে, যেমন বদর ইত্যাদি যুদ্ধে হয়েছে এবং তাদেরও নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত নয়। কারণ, শাস্তির নমুনা বিদ্যমান রয়েছে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এ সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ। তবে হযরত মুকাতিল (র) বলেন, وَاسْئَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا আয়াতটি মদীনায় অবতীর্ণ। কেউ কেউ বলেন, সূরাটি মি'রাজের সময় আকাশে অবতীর্ণ হয়েছে।---(রূহুল মা'আনী)

وَالْكِتَابِ الْمُبِيْنِ---এতে কোরআনকে বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা যে বস্তুর কসম করেন, তা সাধারণত পরবর্তী দাবির দলীল হয়ে থাকে। এখানে কোরআনের কসম করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কোরআন স্বয়ং তার অলৌকিকতার কারণে নিজের সত্যতার দলীল। কোরআনকে সুস্পষ্ট বলার অর্থ এই যে, এর উপদেশ পূর্ণ বিষয়বস্তু সহজেই বোঝা যায়। কিন্তু এ থেকে শরীয়তের বিধি-বিধান চয়ন করা নিঃসন্দেহে এক দুরূহ কাজ। ইজতিহাদের পূর্ণ যোগ্যতা ব্যতিরেকে এ কাজ করা যায় না। সেমতে অন্যত্র একথা স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ---(নিঃসন্দেহে আমি কোরআনকে উপদেশ হাসিলের জন্য সহজ করে দিয়েছি। অতএব কোন উপদেশ গ্রহণকারী

আছে কি?) এতে বলা হয়েছে যে, কোরআন উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ। এ থেকে ইজতিহাদ ও বিধান চয়ন সহজ হওয়া জরুরী হয় না, বরং অন্যভাবে প্রমাণিত রয়েছে যে, এ কাজের জন্য সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন শাস্ত্রে দক্ষতা অর্জন করা শর্ত।

প্রচারকের পক্ষে নিরাশ হয়ে বসে থাকা উচিত নয়ঃ أَفَنَضْرِبُ عَنكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِينَ ----(আমি কি তোমাদের কাছ থেকে এ উপদেশগ্রন্থ প্রত্যাহার করে নেব এ কারণে যে, তোমরা সীমাতিক্রমকারী সম্প্রদায়?) উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা অবাধ্যতায় যতই সীমা অতিক্রম কর না কেন, আমি তোমাদেরকে কোরআনের মাধ্যমে উপদেশ দান পরিত্যাগ করব না। এ থেকে জানা গেল যে, যে ব্যক্তি দাওয়াত ও তবলীগের কাজ করে, তার উচিত প্রত্যেকের কাছে পয়গাম নিয়ে যাওয়া এবং কোন দলের কাছে তবলীগ শুধু এ কারণে পরিত্যাগ করা উচিত নয় যে, তারা চরম পর্যায়ের মুলহিদ, বে-দ্বীন অথবা পাপাচারী।

وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴿٩﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠﴾ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا ۚ كَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ ﴿١١﴾ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ ﴿١٢﴾ لِتَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴿١٣﴾ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ ﴿١٤﴾ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا ۚ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ ﴿١٥﴾ أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُم بِالْبَنِينَ ﴿١٦﴾ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَٰنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿١٧﴾ أَوَمَن

يُنَشَّؤُا فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ﴿١٨﴾ وَجَعَلُوا
الْمَلٰٓئِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبٰدُ الرَّحْمٰنِ إِنَاثًا ۚ أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ ۚ سَتُكْتَبُ
شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ ﴿١٩﴾ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمٰنُ مَا عَبَدْنٰهُمْ ۗ مَا لَهُمْ
بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۖ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿٢٠﴾ أَمْ اٰتَيْنٰهُمْ كِتٰبًا مِّنْ قَبْلِهِ
فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ ﴿٢١﴾ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا اٰبَاءَنَا عَلٰى أُمَّةٍ وَّإِنَّا
عَلٰى اٰثٰرِهِمْ مُّهْتَدُونَ ﴿٢٢﴾ وَكَذٰلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ
مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا ۙ إِنَّا وَجَدْنَا اٰبَاءَنَا عَلٰى أُمَّةٍ وَّإِنَّا عَلٰى
اٰثٰرِهِمْ مُّقْتَدُونَ ﴿٢٣﴾ قُلْ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدٰى مِمَّا وَجَدْتُّمْ عَلَيْهِ
اٰبَاءَكُمْ ۖ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كٰفِرُونَ ﴿٢٤﴾ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ
كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿٢٥﴾

(৯) আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন কে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছে? তারা অবশ্যই বলবে, এগুলো সৃষ্টি করেছেন পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহ্, (১০) যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে করেছেন বিছানা এবং তাতে তোমাদের জন্য করেছেন পথ, যাতে তোমরা গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পার। (১১) এবং যিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন পরিমিত। অতপর তদ্দ্বারা আমি মৃত ভূ-ভাগকে পুনরুজ্জীবিত করেছি। তোমরা এমনিভাবে উত্থিত হবে। (১২) এবং যিনি সব কিছুর যুগল সৃষ্টি করেছেন এবং নৌকা ও চতুষ্পদ জন্তুকে তোমাদের জন্য যানবাহনে পরিণত করেছেন, (১৩) যাতে তোমরা তাদের পিঠের উপর আরোহণ কর। অতপর তোমাদের পালনকর্তার নিয়ামত স্মরণ কর এবং বল পবিত্র তিনি, যিনি এদেরকে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন এবং আমরা এদেরকে বশীভূত করতে সক্ষম ছিলাম না। (১৪) আমরা অবশ্যই আমাদের পালনকর্তার দিকে ফিরে যাব। (১৫) তারা আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্য থেকে আল্লাহ্র অংশ স্থির করেছে। বাস্তবিক মানুষ স্পষ্ট অকৃতজ্ঞ। (১৬) তিনি কি তাঁর সৃষ্টি থেকে কন্যা সন্তান গ্রহণ করেছেন এবং তোমাদের জন্য মনোনীত

করেছেন পুত্র সন্তান? (১৭) তারা রহমান আল্লাহ্‌র জন্য যে কন্যা সন্তান বর্ণনা করে, যখন তাদের কাউকে তার সংবাদ দেওয়া হয়, তখন তার মুখমণ্ডল কালো হয়ে যায় এবং ভীষণ মনস্তাপ ভোগ করে। (১৮) তারা কি এমন ব্যক্তিকে আল্লাহ্‌র জন্য বর্ণনা করে, যে অলংকারে লালিত-পালিত হয় এবং বিতর্কে কথা বলতে অক্ষম? (১৯) তারা নারী স্থির করে ফিরিশতাগণকে, যা আল্লাহ্‌র বান্দা। তারা কি তাদের সৃষ্টি প্রত্যক্ষ করেছে। এখন তাদের দাবি লিপিবদ্ধ করা হবে এবং তাদের জিজ্ঞাসা করা হবে। (২০) তারা বলে, রহমান আল্লাহ্ ইচ্ছা না করলে আমরা ওদের পূজা করতাম না। এ বিষয়ে তারা কিছুই জানে না। তারা কেবল অনুমানে কথা বলে। (২১) আমি কি তাদেরকে কোরআনের পূর্বে কোন কিতাব দিয়েছি, অতপর তারা তাকে আঁকড়ে রেখেছে? (২২) বরং তারা বলে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে পেয়েছি এক পথের পথিক এবং আমরা তাদেরই পদাংক অনুসরণ করে পথপ্রাপ্ত। (২৩) এমনিভাবে আপনার পূর্বে আমি যখন কোন জনপদে কোন সতর্ককারী প্রেরণ করেছি, তখনই তাদের বিত্তশালীরা বলেছে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে পেয়েছি এক পথের পথিক এবং আমরা তাদেরই পদাংক অনুসরণ করে চলছি। (২৪) সে বলত, তোমরা তোমাদের পূর্বপুরুষদেরকে যে বিষয়ের উপর পেয়েছ, আমি যদি তদপেক্ষা উত্তম বিষয় নিয়ে তোমাদের কাছে এসে থাকি, তবুও কি তোমরা তাই বলবে? তারা বলত তোমরা যে বিষয়সহ প্রেরিত হয়েছ, তা আমরা মানব না। (২৫) অতপর আমি তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিয়েছি। অতএব দেখুন, মিথ্যারোপকারীদের পরিণাম কিরূপ হয়েছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, কে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছে? তারা অবশ্যই বলবে, এগুলো সৃষ্টি করেছেন পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহ্, (বলা বাহুল্য, যে সত্তা একা এসব মহাসৃষ্টির স্রষ্টা, ইবাদতও একমাত্র তাঁরই করা উচিত। সুতরাং তাদের স্বীকারোক্তি দ্বারাই তওহীদ প্রমাণিত হয়ে যায়। অতপর তওহীদকে আরও সপ্রমাণ করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর আরও কিছু কাজ উল্লেখ করেন। অর্থাৎ তিনিই সে আল্লাহ্) যিনি আকাশ ও পৃথিবীকে তোমাদের জন্য বিছানা (সদৃশ) করেছেন। (তোমরা তার উপর আরাম কর) এবং তাতে (পৃথিবীতে) তোমাদের (মনযিলে-মকছুদে পৌঁছার) জন্য পথ করেছেন, যাতে (সেসব পথে চলে) তোমরা মনযিলে মকছুদে পৌঁছতে পার এবং যিনি আকাশ থেকে পরিমিতভাবে (তাঁর ইচ্ছা ও প্রজ্ঞা মুতাবিক) পানি বর্ষণ করেছেন, অতপর আমি তদ্দ্বারা (সে পানি দ্বারা) শুষ্ক ভূমিকে (তার উপযুক্ত) জীবন দান করেছি। (এ থেকে তওহীদ ব্যতীত একথাও বোঝা উচিত যে,) তোমরা এমনিভাবে (কবর থেকে) উত্থিত হবে এবং যিনি বিভিন্ন বস্তুর) বিভিন্ন প্রকার সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের জন্য নৌকা ও চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন, যেগুলোর উপর তোমরা সওয়ার হও, যাতে তোমরা নৌকা (-এর

উপরে) ও চতুষ্পদ জন্তুর পিঠের উপর (স্থিরভাবে) চড়ে বসতে পার। অতপর যখন তোমরা এগুলোর উপর বসবে, তখন তোমাদের পালনকর্তার (এই) নিয়ামত (মনে মনে) স্মরণ কর এবং (মুখে মোস্তাহাব বিধানরূপে) বল, পবিত্র তিনি, যিনি এদেরকে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন। বস্তুত আমরা এমন (শক্তিশালী ও কৌশলী) ছিলাম না যে, এদেরকে বশীভূত করতে পারতাম। কেননা, আমরা জন্তুদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী নই এবং আল্লাহ্‌র জাগ্রত করা বুদ্ধি ব্যতীত নৌকা চালনার কৌশল জানতাম না। উভয় কৌশল আল্লাহ্ তা'আলাই শিক্ষা দিয়েছেন। আমরা অবশ্যই আমাদের পালনকর্তার দিকে ফিরে যাব। (তাই আমরা এগুলোতে সওয়ার হয়ে তাঁর কৃতজ্ঞতা ভুলি না এবং অহংকার করি না। তওহীদের প্রমাণাদি সুস্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও) তারা (শিরক অবলম্বন করেছে, তাও এমন বিশ্রী শিরক যে, ফেরেশতাগণকে আল্লাহ্‌র কন্যা সন্তান বলে এবং তাদের ইবাদত করে। সুতরাং এর এক অনিষ্ট তো এই যে, তারা) আল্লাহ্ কর্তৃক (সৃষ্ট) বান্দাদের থেকে আল্লাহ্‌র অংশ স্থির করেছে (অথবা আল্লাহ্‌র কোন অংশ হওয়া যুক্তিগতভাবে অসম্ভব)। বাস্তবিকই (এ ধরনের) মানুষ স্পষ্ট অকৃতজ্ঞ। (দ্বিতীয় অনিষ্ট এই যে, তারা কন্যা সন্তানকে হীন মনে করার পরেও আল্লাহ্‌র জন্য কন্যা সন্তান স্থির করে তবে) তিনি কি তাঁর সৃষ্টি থেকে (তোমাদের ধারণা অনুযায়ী নিজের জন্য) কন্যা সন্তান পছন্দ করেছেন এবং তোমাদের জন্য পুত্র সন্তান নির্ধারিত করেছেন? অথচ (তোমরা কন্যা সন্তানকে এত খারাপ মনে কর যে,) যখন তোমাদের কাউকে সে কন্যা সন্তানের সংবাদ দেয়া হয়, যাকে সে আল্লাহ্‌র জন্য বর্ণনা করে, তখন (অসন্তুষ্টির কারণে) তার মুখমণ্ডল কাল হয়ে যায় এবং সে ভীষণ মনস্তাপ ভোগ করে। (এ পর্যন্ত তাদের মিথ্যা বিশ্বাসের খণ্ডন বর্ণিত হয়েছে। এর ব্যাখ্যা সূরা সাফফাতে দেওয়া হয়েছে। অতপর তাদের বিশ্বাসের যুক্তিভিত্তিক খণ্ডন করা হচ্ছে। অর্থাৎ কন্যা সন্তান হওয়া যদিও কোন অপমান ও লজ্জার বিষয় নয়; কিন্তু এতে সন্দেহ নেই যে, কন্যা সৃষ্টিগতভাবে স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন ও দুর্বলমনা হয়ে থাকে সুতরাং) তারা কি এমন কন্যা সন্তানকে আল্লাহ্‌র জন্য বর্ণনা করে, যে (স্বভাবত) অলংকারে (ও সাজসজ্জায়) লালিত-পালিত হয় (এর অপরিহার্য ফলশ্রুতি বুদ্ধি-বিবেকের অপরিপক্কতা) এবং সে (চিন্তাশক্তির দুর্বলতার কারণে) বিতর্কে কথা বলতেও অক্ষম? (সেমতে মহিলারা সাধারণত তাদের মনের ভাব জোরেশোরে ব্যক্ত করতে পুরুষদের তুলনায় কম সামর্থ্য রাখে; প্রায়ই অসম্পূর্ণ কথা বলে এবং তাতে অপ্রাসঙ্গিক কথা মিশ্রিত করে দেয়। তৃতীয় অনিষ্ট এই যে,) তারা (কাফিররা) ফেরেশতাগণকে যারা আল্লাহ্‌র (সৃষ্ট) বান্দা (তাই আল্লাহ্ তাদের পূর্ণ অবস্থা জানেন। তারা দৃষ্টিগোচর হয় না, তাই তাদের কোন অবস্থা আল্লাহ্ তা'আলার বর্ণনা ব্যতীত কেউ জানতে পারে না। আল্লাহ্ কোথাও বর্ণনা করেন নি যে, ফেরেশতাগণ নারী। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা তাদেরকে বিনা দলীলে) নারী স্থির করেছে। (এর পক্ষে কোন যুক্তিও নেই, কোন ইতিহাসগত প্রমাণও নেই।) তারা কি তাদের সৃষ্টি প্রত্যক্ষ করেছে? (জওয়াব

সুস্পষ্ট যে, তারা প্রত্যক্ষ করেনি। কাজেই তাদের নির্বোধসুলভ দাবি অসার।) তাদের এই (যুক্তিহীন) দাবি (আমলনামায়) লিপিবদ্ধ করা হবে এবং (কিয়ামতে) তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে। (অতপর ফেরেশতাগণের উপাস্য হওয়া সম্পর্কে বলা হচ্ছেঃ) তারা বলে, যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করতেন (যে, ফেরেশতাগণের ইবাদত না হোক; অর্থাৎ, যদি এই ইবাদতে তিনি অসন্তুষ্ট হতেন,) তবে আমরা (কখনও) তাদের ইবাদত করতাম না। (কেননা, তিনি তা করতেই দিতেন না। বলপূর্বক বন্ধ করে দিতেন। অতএব জানা গেল যে, তিনি তাদের ইবাদত না করলে সন্তুষ্ট নন, বরং ইবাদত করলে সন্তুষ্ট হন। অতপর খণ্ডনে বলা হয়েছে,) তারা এ বিষয়ে কিছুই জানে না। তারা কেবল অনুমানে কথা বলে। (কেননা, আল্লাহ্ কোন বান্দাকে কোন কাজের শক্তি দিলে প্রমাণিত হয় না যে, তিনি এ কাজে সন্তুষ্টও আছেন। অষ্টম পারার প্রথমার্ধে— سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا —আয়াতে এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা হয়ে গেছে। এখন তারা বলুক,) আমি কি তাদেরকে কোরআনের পূর্বে কোন কিতাব দিয়েছি যে, তারা (এ দাবিতে) সেটিকে দলীল করছে? (প্রকৃতপক্ষে তাদের কাছে কোন দলীল নেই।) বরং (কেবল পূর্বপুরুষদের অনুসরণ আছে। সেমতে) তারা বলে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে এ মতাদর্শের অনুসারী পেয়েছি। আমরাও তাদের পদাংক অনুসরণ করে চলছি। (তারা যেমন বিনা দলীলে বরং দলীলের বিপরীতে প্রাচীন প্রথা-পদ্ধতিকে দলীল হিসেবে পেশ করে,) এমনিভাবে আপনার পূর্বে আমি যখনই কোন জনপদে কোন সতর্ককারী পয়গম্বর প্রেরণ করেছি, তখনই তাদের বিত্তশালীরা (প্রথমে ও অনুসারীরা পরে) বলেছে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে এক মতাদর্শের অনুসারী পেয়েছি। আমরাও তাদের পদাংক অনুসরণ করে চলছি। (এতে) সে (অর্থাৎ পয়গম্বর) বলতেন, (তোমরা কি পৈতৃক প্রথা-পদ্ধতিরই অনুসরণ করে যাবে,) যদিও আমি তোমাদের পূর্বপুরুষদের বিষয় অপেক্ষা উত্তম বিষয় নিয়ে তোমাদের কাছে এসে থাকি? তারা (হঠকারিতার ছলে) বলত, তোমরা (তোমাদের ধারণা মতে) যে বিষয়সহ প্রেরিত হয়েছ, আমরা তা মানিই না। অতপর (হঠকারিতা সীমা ছাড়িয়ে গেলে) আমি তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিয়েছি। অতএব দেখুন, মিথ্যারোপকারীদের পরিণাম কেমন (মন্দ) হয়েছে!

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا — (তোমাদের জন্য পৃথিবীকে বিছানা করেছেন।) উদ্দেশ্য এই যে, পৃথিবীর বাহ্যিক আকার বিছানার মতো এবং এতে বিছানার অনুরূপ আরাম পাওয়া যায়। সুতরাং এটা গোলাকার হওয়ার পরিপন্থী নয়।

وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ —(তোমাদের জন্য নৌকা

ও চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা আরোহণ কর।) মানুষের যানবাহন দু'প্রকার। এক. যা মানুষ নিজের শিল্পকৌশল দ্বারা নিজেই তৈরী করে। দুই. যার সৃষ্টিতে মানুষের শিল্পকৌশলের কোন দখল নেই। 'নৌকা' বলে প্রথম প্রকার যান-বাহন এবং চতুষ্পদ জন্তু বলে দ্বিতীয় প্রকার যানবাহন বোঝানো হয়েছে। সর্বাবস্থায় উদ্দেশ্য এই যে, মানুষের ব্যবহারের যাবতীয় যানবাহন আল্লাহ্ তা'আলার মহা অব-দান। চতুষ্পদ জন্তু যে অবদান, তা বর্ণনা সাপেক্ষ নয়। এগুলো মানুষের চেয়ে কয়েক গুণ বেশি শক্তিশালী হয়ে থাকে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা এগুলোকে মানুষের এমন বশীভূত করে দিয়েছেন যে, একজন বালকও ওদের মুখে লাগাম অথবা নাকে রশি লাগিয়ে যথা ইচ্ছা নিয়ে যেতে পারে। এমনিভাবে যেসব যাবনবাহন তৈরিতে মানুষের শিল্পকৌশলের দখল আছে, সেগুলোও আল্লাহ্ তা'আলারই অবদান। উড়োজাহাজ থেকে শুরু করে মামুলি সাইকেল পর্যন্ত যদিও বাহ্যত মানুষ নির্মাণ করে, কিন্তু এগুলো নির্মাণের কৌশল আল্লাহ্ ব্যতীত কে শিক্ষা দিয়েছে? সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'আলাই মানুষের মস্তিষ্কে এমন শক্তি দান করেছেন যে, লোহাকেও মোমে পরিণত করে ছাড়ে। এছাড়া এগুলোর নির্মাণে যে কাঁচামাল ব্যবহৃত হয়, তা এবং তার বৈশিষ্ট্য ও ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সরাসরি আল্লাহ্র সৃষ্টি।

ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ---(এবং যাতে তোমরা তোমাদের পালনকর্তার অবদান স্মরণ কর।) এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, একজন বুদ্ধিমান ও সচেতন মানু-ষের কর্তব্য হল সত্যিকার দাতা আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামতসমূহ ব্যবহার করার সময় অমনোযোগিতা ও উদাসীনতা প্রদর্শন করার পরিবর্তে এ বিষয়ের ধ্যান করা যে, এগুলো আমার প্রতি আল্লাহ্র দান। কাজেই তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ও তাঁর উদ্দেশ্যে বিনয় ও অসহায়ত্ব ব্যক্ত করা আমার উপর ওয়াজিব। সৃষ্ট জগতের নিয়ামতসমূহ মু'মিন ও কাফির উভয়েই ব্যবহার করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মু'মিন ও কাফিরের মধ্যে পার্থক্য এই যে, কাফির চরম উদাসীনতা ও বেপরোয়া মনোভাব নিয়ে ব্যবহার করে আর মু'মিন আল্লাহ্র নিয়ামতসমূহকে চিন্তায় উপস্থিত রেখে তাঁর সামনে বিনয়া-বনত হয়। এ লক্ষ্যেই কোরআন ও হাদীসে বিভিন্ন কাজ আনজাম দেওয়ার সময় সবর ও শোকরের বিষয়বস্তু সম্বলিত বিভিন্ন দোয়া শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। মানুষ যদি দৈনন্দিন জীবনে উঠাবসা ও চলাফেরায় এসব দোয়া নিয়মিত পাঠ করে, তবে তার প্রত্যেক বৈধ কাজই ইবাদত হয়ে যেতে পারে। এসব দোয়া আল্লামা জযরীর কিতাব 'হিসনে হাসীনে' এবং মওলানা আশরাফ আলী থানভীর কিতাব 'মোনাজাতে মকবুলে' দ্রষ্টব্য।

সফরের দোয়া ঃ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هٰذَا—(পবিত্র তিনি, যিনি একে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন।) এটা যানবাহনে বসে পাঠ করার দোয়া। রসূ-লুল্লাহ্ (সা) থেকে একাধিক রেওয়ায়েতে প্রমাণিত আছে যে, তিনি সওয়ারীর জন্তুর

উপর বসার সময় এই দোয়া পাঠ করতেন। আরোহণ করার মোস্তাহাব পদ্ধতি হযরত আলী (রা) থেকে এরূপ বর্ণিত আছে যে, সওয়ারীতে পা রাখার সময় 'বিসমিল্লাহ' বলবে, অতপর সওয়ার হওয়ার পরে 'আলহামদুলিল্লাহ্' পাঠ করে سُبۡحَانَ الَّذِی سَخَّرَ —থেকে শুরু করে لَمُنۡقَلِبُوۡنَ পর্যন্ত পাঠ করবে। --(কুরতুবী) আরও বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) সফরে রওয়ানা হয়ে উপরোক্ত দোয়ার পর নিম্নোক্ত দোয়াও পাঠ করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اَنۡتَ الصَّاحِبُ فِی السَّفَرِ وَالۡخَلِيۡفَةُ فِی الۡاَهۡلِ وَالۡمَالِ - اَللّٰهُمَّ اِنِّیۡ اَعُوۡذُ بِكَ مِنۡ وَّعۡثَاءِ السَّفَرِ وَكَاٰبَةِ الۡمُنۡقَلَبِ وَالۡحَوۡرِ بَعۡدَ الۡكَوۡرِ وَسُوۡءِ الۡمَنۡظَرِ فِی الۡاَهۡلِ وَالۡمَالِ -

এক রেওয়ায়েতে এ বাক্যও বর্ণিত আছে ঃ

اَللّٰهُمَّ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنۡتَ ظَلَمۡتُ نَفۡسِیۡ فَاغۡفِرۡ لِیۡ اِنَّهٗ لَا يَغۡفِرُ الذُّنُوۡبَ اِلَّاۤ اَنۡتَ

---(কুরতুবী)

وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقۡرِنِيۡنَ—(আমরা এমন ছিলাম না যে, একে বশীভূত করব। এটা যান্ত্রিক যানবাহনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা মৌল উপাদান সৃষ্টি না করলে অথবা তাতে প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য ও প্রতিক্রিয়া না রাখলে অথবা মানুষের মস্তিষ্কে সেসব বৈশিষ্ট্য আবিষ্কারের শক্তি দান না করলে সমগ্র সৃষ্টি একত্রিত হয়েও এমন যানবাহন সৃষ্টি করতে সক্ষম হত না।

وَاِنَّاۤ اِلٰی رَبِّنَا لَمُنۡقَلِبُوۡنَ—(নিঃসন্দেহে আমরা আমাদের পালনকর্তার দিকেই ফিরে যাব।) এ বাক্যে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, মানুষের উচিত পার্থিব সফরের সময় পরকালের কঠিন সফরের কথা স্মরণ করা, যা সর্বাবস্থায় সংঘটিত হবে। সে সফর সহজে অতিক্রম করার জন্য সৎকর্ম ব্যতীত কোন সওয়ারী কাজে আসবে না।

وَجَعَلُوۡا لَهٗ مِنۡ عِبَادِهٖ جُزۡءًا—(তারা আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্য থেকে আল্লাহ্র অংশ স্থির করেছে।) এখানে অংশ বলে সন্তান বোঝানো হয়েছে। মুশরিকরা

ফেরেশতাগণকে 'আল্লাহ্র কন্যা সন্তান' আখ্যা দিত। 'সন্তান' না বলে 'অংশ' বলে মুশরিকদের এই বাতিল দাবির যুক্তিভিত্তিক খণ্ডনের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। সংক্ষেপে তা এভাবে যে, আল্লাহ্ তা'আলার কোন সন্তান থাকলে সে আল্লাহ্ তা'আলার অংশ হবে। কেননা, পুত্র পিতার অংশ হয়ে থাকে। যুক্তিসংগত নিয়ম এই যে, প্রত্যেক বস্তু স্বীয় অস্তিত্বের জন্য তার অংশসমূহের প্রতি মুখাপেক্ষী। এ থেকে জরুরী হয়ে পড়ে যে, আল্লাহ্ তা'আলাও তাঁর সন্তানের প্রতি মুখাপেক্ষী হবেন। বলা বাহুল্য যে কোন প্রকার মুখাপেক্ষিতা আল্লাহ্র মর্যাদার সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

أَوَمَن يُنَشَّؤُا فِى الْحِلْيَةِ—(যে অলংকার ও সাজসজ্জায় লালিত-পালিত হয়—) এ থেকে জানা গেল যে, নারীর জন্য অলংকার ব্যবহার এবং শরীয়তসম্মত সাজসজ্জা অবলম্বন করা জায়েয। এ বিষয়ে ইজমাও আছে। কিন্তু বর্ণনাপদ্ধতি থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, সারাদিনমান সাজসজ্জা ও প্রসাধনে ডুবে থাকা সমীচীন নয়। এটা বিবেক-বুদ্ধির দুর্বলতার লক্ষণ ও কারণ।

وَهُوَ فِى الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ—(এবং সে বিতর্কে কথা বলতেও অক্ষম।) উদ্দেশ্য এই যে, অধিকাংশ নারী মনের ভাব জোরেশোরে ও স্পষ্টভাবে বর্ণনা করতে পুরুষদের সমান সক্ষম নয়। এ কারণেই বিতর্কে নিজেদের দাবি সপ্রমাণ করা ও প্রতিপক্ষের দাবি প্রমাণ সহকারে খণ্ডন করা তাদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। কিন্তু এটা অধিকাংশের দিকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে। কাজেই কোন কোন নারী যদি বাকপটুতায় পুরুষদেরকেও হারিয়ে দেয়, তবে সেটা এ আয়াতের পরিপন্থী হবে না। কেননা, অধিকাংশের লক্ষ্যেই সাধারণত নীতি বর্ণনা করা হয়। নারীদের অধিকাংশ এরূপই বটে।

وَإِذْ قَالَ إِبْرَٰهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِۦٓ إِنَّنِى بَرَآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ﴿٢٦﴾ إِلَّا ٱلَّذِى فَطَرَنِى فَإِنَّهُۥ سَيَهْدِينِ ﴿٢٧﴾ وَجَعَلَهَا كَلِمَةًۢ بَاقِيَةً فِى عَقِبِهِۦ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢٨﴾ بَلْ مَتَّعْتُ هَٰٓؤُلَآءِ وَءَابَآءَهُمْ حَتَّىٰ جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ ﴿٢٩﴾ وَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ قَالُوا۟ هَٰذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِۦ كَٰفِرُونَ ﴿٣٠﴾

(২৬) যখন ইবরাহীম তাঁর পিতা ও সম্প্রদায়কে বলল, তোমরা যাদের পূজা কর, তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। (২৭) তবে আমার সম্পর্ক তাঁর সাথে

যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। অতএব তিনিই আমাকে সৎপথ প্রদর্শন করবেন। (২৮) এ কথাটিকে সে অক্ষয় বাণীরূপে তার সন্তানদের মধ্যে রেখে গেছে, যাতে তারা আল্লাহ্‌র আকৃষ্ট থাকে। (২৯) পরন্তু আমিই এদেরকে ও এদের পূর্বপুরুষদেরকে জীবনোপভোগ করতে দিয়েছি, অবশেষে তাদের কাছে সত্য ও স্পষ্ট বর্ণনাকারী রসূল আগমন করেছে। (৩০) যখন সত্য তাদের কাছে আগমন করল, তখন তারা বলল, এটা জাদু, আমরা একে মানি না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(সে সময়টিও স্মরণযোগ্য) যখন ইবরাহীম (আ) তার পিতা ও সম্প্রদায়কে বললেন, তোমরা যাদের পূজা-অর্চনা কর, আমি তাদের (পূজার) সাথে কোন সম্পর্ক রাখি না। (সে আল্লাহ্‌র সাথে আমি সম্পর্ক রাখি) যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। অতপর তিনিই আমাকে (আমার ইহকাল ও পরকালীন স্বার্থের) পথে পরিচালিত করবেন। [উদ্দেশ্য এই যে, কাফিরদের উচিত ইবরাহীম (আ)-এর অবস্থা স্মরণ করা। তিনি নিজেও তওহীদে বিশ্বাসী ছিলেন এবং ওসিয়তের মাধ্যমে] এ বিশ্বাসকে তিনি সন্তানদের মধ্যে চিরন্তন বাণীরূপে রেখে গেছেন, [অর্থাৎ সন্তানদেরকেও এ বিষয়ে ওসিয়ত করেছেন, যার কিছু কিছু প্রতিক্রিয়া রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আমল পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। ফলে জাহিলিয়াত যুগেও আরবে কিছু সংখ্যক লোক শিরককে ঘৃণা করত। এ ওসিয়ত তিনি এজন্য করেন,] যাতে (প্রতি যুগে) তারা (মুশরিকরা তওহীদ পন্থীদের কাছে তওহীদের বিশ্বাস শুনে শিরক থেকে) ফিরে আসে। (কিন্তু তারা তবুও ফিরে আসেনি এবং এ দিকে মনোযোগ দেয়নি।) পরন্তু আমি তাদেরকে ও তাদের পূর্বপুরুষদেরকে (পার্থিব) জীবনোপভোগ করতে দিয়েছি, (তারা এতে মগ্ন হয়ে আছে। অবশেষে (এই মগ্নতা ও উদাসীনতা থেকে জাগ্রত করার জন্য) তাদের কাছে সত্য কোরআন (যা অলৌকিকতার কারণে নিজেই নিজের সত্যতার দলীল) এবং স্পষ্ট বর্ণনাকারী রসূল (আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে) আগমন করেছে। যখন তাদের কাছে সত্য কোরআন আগমন করল, (এবং তার অলৌকিকতা প্রকাশ পেল,) তখন তারা বলল, এটা জাদু। আমরা একে মানি না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ—পূর্ববর্তী আয়াতের শেষে বলা হয়েছিল, মুশরিকদের কাছে তাদের পূর্বপুরুষদের অনুকরণ ব্যতীত শিরকের কোন দলীল নেই। বলা বাহুল্য সুস্পষ্ট যুক্তিভিত্তিক ও ইতিহাসভিত্তিক প্রমাণাদি থাকা সত্ত্বেও কেবল পূর্বপুরুষদের অনুকরণ করা খুবই অযৌক্তিক ও গর্হিত কাজ। এখন আলোচ্য আয়াতসমূহে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যদি পূর্বপুরুষদেরই অনুকরণ করতে চাও, তবে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর অনুসরণ কর না কেন, যিনি তোমাদের সম্ভ্রান্ততম পূর্বপুরুষ এবং যাঁর সাথে সম্পর্ক

রাখাকে তোমরা গর্বের বিষয় মনে কর? তিনি কেবল তওহীদেই বিশ্বাসী ছিলেন না, বরং তাঁর কর্মপন্থা পরিষ্কার ব্যক্ত করে যে, যুক্তিভিত্তিক ও ইতিহাসভিত্তিক প্রমাণাদির উপস্থিতিতে কেবল পূর্বপুরুষদের অনুকরণ করা বৈধ নয়। তিনি যখন দুনিয়াতে প্রেরিত হন, তখন তাঁর গোটা সম্প্রদায় তাদের পূর্বপুরুষদের অনুকরণে শিরকে লিপ্ত ছিল। কিন্তু তিনি পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুকরণের পরিবর্তে সুস্পষ্ট প্রমাণাদির অনুসরণ করে সম্প্রদায়ের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের কথা ঘোষণা করে বলেন, إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ —তোমরা যাদের পূজা কর, তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।

এ থেকে আরও জানা গেল যে, কোন ব্যক্তি যদি কুকর্মী ও অবিশ্বাসী দলের মধ্যে বসবাস করে এবং তাদের ধ্যান-ধারণার ব্যাপারে নীরব থাকে, তাকেও তাদের সমমনা মনে করার আশংকা থাকে, তাহলে কেবল তার বিশ্বাস ও কর্ম ঠিক করে নেয়াই যথেষ্ট হবে না, বরং সেই দলের বিশ্বাস ও কর্মের সাথে তার সম্পর্কহীনতা প্রকাশ করাও জরুরী হবে। সেমতে হযরত ইবরাহীম (আ) কেবল নিজের বিশ্বাস ও কর্মকে মুশরিকদের থেকে স্বতন্ত্র করেই ক্ষান্ত থাকেননি, বরং মুখে ও সর্বসমক্ষে সম্পর্কহীনতা ঘোষণা করেছেন।

وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ —(তিনি একে তাঁর সন্তানদের মধ্যে একটি চিরন্তন বাণীরূপে রেখে গেছেন।) উদ্দেশ্য এই যে, তিনি তাঁর তওহীদি বিশ্বাসকে নিজের সত্তা পর্যন্তই সীমিত রাখেন নি, বরং তাঁর বংশধরকেও এ বিশ্বাসে অটল থাকার ওসিয়ত করেছেন। সেমতে তাঁর বংশধরদের মধ্যে বিরাট সংখ্যক লোক তওহীদপন্থী ছিল। স্বয়ং মক্কা মোকাররমা ও তার আশেপাশে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আবির্ভাব পর্যন্ত অনেক সুস্থমনা ব্যক্তি বিদ্যমান ছিল, যারা শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিবাহিত হওয়ার পরেও ইবরাহীম (আ)-এর মূল ধর্মের উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল।

এ থেকে আরও জানা গেল যে, নিজেকে ছাড়াও সন্তানসন্ততিকে বিশুদ্ধ ধর্মে প্রতিষ্ঠিত করার চিন্তা করাও মানুষের অন্যতম কর্তব্য। পয়গম্বরগণের মধ্যে হযরত ইয়াকুব (আ) সম্পর্কেও কোরআন বর্ণনা করেছে যে, তিনি ওফাতের সময় পুত্রদেরকে বিশুদ্ধ ধর্মে কায়েম থাকার ওসিয়ত করেছিলেন। সুতরাং যে কোন সম্ভাব্য উপায়ে সন্তানসন্ততির কর্ম ও চরিত্র সংশোধনে পূর্ণ প্রচেষ্টা নিয়োজিত করা যেমন জরুরী, তেমনি পয়গম্বরগণের সুন্নতও বটে। সন্তানদের সংশোধনের অনেক পদ্ধতি রয়েছে যা স্থান বিশেষে অবলম্বন করা যায়। কিন্তু শায়েখ আবদুল ওয়াহ্হাব শা'রানী (র) 'লাতায়েফুল মিনান' গ্রন্থে একটি কার্যকরী পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। তা এই যে, পিতা-মাতা সন্তানদের সংশোধনের জন্য সযত্নে দোয়া করবেন। পরিতাপের বিষয়, এই সহজ

পদ্ধতির প্রতি আজকাল ব্যাপক উদাসীনতা প্রদর্শন করা হচ্ছে। অবশ্য স্বয়ং পিতা-মাতাই এর অশুভ পরিণতি প্রত্যক্ষ করে থাকেন।

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ ﴿٣١﴾ اَهُمْ يَقْسِمُوْنَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيْشَتَهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ﴿٣٢﴾

(৩১) তারা বলে, কোরআন কেন দুই জনপদের কোন প্রধান ব্যক্তির উপর অবতীর্ণ হল না? (৩২) তারা কি আপনার পালনকর্তার রহমত বন্টন করে? আমি তাদের মধ্যে তাদের জীবিকা বন্টন করেছি পার্থিব জীবনে এবং একের মর্যাদাকে অপরের উপর উন্নীত করেছি, যাতে একে অপরকে সেবকরূপে গ্রহণ করে। তারা যা সঞ্চয় করে, আপনার পালনকর্তার রহমত তদপেক্ষা উত্তম।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

[কাফিররা কোরআন সম্পর্কে একথা বলেছে, আর রসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পর্কে] তারা বলে, এ কোরআন (আল্লাহ্র কালাম হলে এবং রসূলের মাধ্যমে এসে থাকলে এটি) দুই জনপদের (অর্থাৎ মক্কা ও তায়েফের) কোন প্রধান ব্যক্তির উপর অবতীর্ণ হল না কেন? [অর্থাৎ রসূলের জন্য প্রধান ও প্রতিপত্তিশালী হওয়া জরুরী। রসূলে করীম (সা) ধনাঢ্যও নন, সমাজপতিও নন। কাজেই তিনি রসূল হতে পারেন না। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের কথা খণ্ডন প্রসঙ্গে বলেন,] তারা কি আপনার পালনকর্তার বিশেষ রহমত (অর্থাৎ নবুয়ত) বন্টন করতে চায়? (অর্থাৎ তারা কি বলতে চায় যে, নবুয়ত তাদের মত অনুযায়ী প্রাপ্ত হওয়া উচিত? তারা যেন নবুয়ত বন্টনের দায়িত্ব লাভের আকাঙ্ক্ষা করে; অথচ এটা নিরেট মূর্খতা। কেননা, (পার্থিব জীবনে তাদের জীবিকা আমিই বন্টন করেছি এবং (এ বন্টনে) একের মর্যাদা অপরের উপর উন্নত করেছি, যাতে (এই উপযোগিতা অর্জিত হয় যে,) একে অপরের দ্বারা কাজ করিয়ে নেয় (ফলে জগতের ব্যবস্থাপনা ঠিক থাকে। এটা স্পষ্ট ও নিশ্চিত যে,) আপনার পালনকর্তার (বিশেষ) রহমত (অর্থাৎ নবুয়ত) বহুগুণে সে বস্তু (অর্থাৎ পার্থিব ধনসম্পদ, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও পদমর্যাদা) অপেক্ষা উত্তম, যা তারা সঞ্চয় করে ফিরে। (সুতরাং পার্থিব জীবিকা যখন আমিই বন্টন করেছি; তাদের মতের উপর ছেড়ে দেইনি; অথচ এটা হীন পর্যায়ের বিষয়, তখন নবুয়ত, যা নিজেও উচ্চ পর্যায়ের

বিষয় এবং তার উপযোগিতাসমূহও উৎকৃষ্ট স্তরের, তা কিরূপে তাদের মতানুযায়ী বন্টন করা হবে?

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা মুশরিকদের একটি আপত্তির জওয়াব দিয়েছেন। তারা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র রিসালতের ব্যাপারে এ আপত্তি করত। প্রকৃতপক্ষে তারা শুরুতে এ কথা বিশ্বাস করতেই সম্মত ছিল না যে, রসূল কোন মানুষ হতে পারে। কোরআন পাক তাদের এ মনোভাব কয়েক জায়গায় উল্লেখ করেছে যে, আমরা মুহাম্মদ (সা)-কে কিরূপে রসূল মানতে পারি, যখন সে সাধারণ মানুষের মতই পানাহার করে এবং বাজারে চলাফেরা করে? কিন্তু যখন কোরআনের একাধিক আয়াতে ব্যক্ত করা হল যে, কেবল মুহাম্মদ (সা)-ই নন, দুনিয়াতে এ যাবত যত পয়গম্বর আগমন করেছেন, তারা সবাই মানুষ ছিলেন। তখন তারা পাঁয়তারা পরিবর্তন করে বলতে শুরু করল যে, যদি কোন মানুষকেই নবুয়ত সমর্পণ করার ইচ্ছা ছিল, তবে মক্কা ও তায়েফের কোন বিত্তবান ও প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিকে সমর্পণ করা হল না কেন? মুহাম্মদ (সা) তো কোন প্রভাবশালী, ধনী ব্যক্তি নন। কাজেই তিনি নবুয়ত লাভের যোগ্য নন। রেওয়ায়েতে আছে যে, এ ব্যাপারে তারা মক্কার ওলীদ ইবনে মুগীরা ও ওতবা ইবনে রবীয়া এবং তায়েফের ওরওয়া ইবনে মসউদ সকফী, হাবীব ইবনে আমর সকফী অথবা কেনানা ইবনে আবদে ইয়া'লীলের নাম পেশ করেছিল।---(রূহুল মা'আনী)

মুশরিকদের এ আপত্তি প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা দু'টি উত্তর দিয়েছেন। প্রথম জওয়াব উল্লিখিত আয়াতদ্বয়ের দ্বিতীয় আয়াতে এবং দ্বিতীয় জওয়াব এর পরবর্তী আয়াতে দেওয়া হয়েছে। যথাস্থানেই এর ব্যাখ্যাও করা হবে। প্রথম জওয়াবের সারমর্ম এই যে, এ ব্যাপারে তোমাদের নাক গলানোর কোন অধিকার নেই যে, আল্লাহ্ কাকে নবুয়ত দিচ্ছেন এবং কাকে দিচ্ছেন না। নবুয়তের বন্টন তোমাদের হাতে নয় যে, কাউকে নবী করার পূর্বে তোমাদের মত নিতে হবে। এটা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্র হাতে। তিনিই মহান। উপযোগিতা অনুযায়ী এ কাজ সমাধা করেন। তোমাদের অস্তিত্ব, জ্ঞান-বুদ্ধি ও চেতনা নবুয়ত বন্টনের দায়িত্ব লাভের যোগ্যই নয়। নবুয়ত বন্টন তো অনেক উচ্চস্তরের কাজ, তোমাদের মর্যাদা, অস্তিত্বও স্বয়ং তোমাদের জীবিকা ও জীবিকার আসবাবপত্র বন্টনের দায়িত্ব পালনেরও উপযুক্ত নয়। কারণ, আমি জানি তোমাদেরকে এ দায়িত্ব দেওয়া হলে তোমরা একদিনও জগতের কাজকারবার পরিচালনা করতে সক্ষম হবে না এবং গোটা ব্যবস্থাপনা ভণ্ডুল হয়ে যাবে। তাই আল্লাহ্ তা'আলা পার্থিব জীবনে তোমাদের জীবিকা বন্টনের দায়িত্বও তোমাদের হাতে সোপর্দ করেন নি, বরং এ কাজ নিজের হাতেই রেখেছেন। অতএব যখন নিম্নস্তরের এ কাজ তোমাদেরকে সোপর্দ করা যায় না, তখন নবুয়ত বন্টনের মতো মহান কাজ কিরূপে তোমাদের হাতে সোপর্দ করা যাবে। আয়াতসমূহের উদ্দেশ্য তো এতটুকুই, কিন্তু মুশরিকদেরকে জওয়াব দান প্রসঙ্গে আল্লাহ্

তা'আলা বিশ্বের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে যেসব ইঙ্গিত দিয়েছেন, সেগুলো থেকে কতিপয় অর্থনৈতিক মূলনীতি চয়ন করা যায়। এখানে এগুলোর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা জরুরী।

জীবিকা বন্টনের প্রাকৃতিক ব্যবস্থা ঃ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيْشَتَهُمْ—আমি তাদের মধ্যে জীবিকা বন্টন করেছি। উদ্দেশ্য এই যে, আমি আমার অপার প্রজ্ঞার সাহায্যে বিশ্বের জীবন ব্যবস্থা এমন করেছি যে, এখানে প্রত্যেক ব্যক্তি তার প্রয়োজনাদি মিটানোর ক্ষেত্রে অপরের সাহায্যের মুখাপেক্ষী এবং সকল মানুষ এই পারস্পরিক মুখাপেক্ষিতার সূত্রে গ্রথিত হয়ে সমগ্র সমাজের প্রয়োজনাদি মিটিয়ে যাচ্ছে। আলোচ্য আয়াতটি খোলাখুলি ব্যক্ত করেছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা জীবিকা বন্টনের কাজ (সোশ্যালিজমের ন্যায়) কোন ক্ষমতাশালী মানবিক প্রতিষ্ঠানের কাছে সোপর্দ করেননি, যে পরিকল্পনার মাধ্যমে স্থির করবে যে, সমাজের প্রয়োজনাদি কি কি, সেগুলো কিভাবে মেটানো হবে, উৎপাদিত সম্পদকে কি হারে কি কি কাজে লাগানো হবে এবং এগুলোর মধ্যে আয়ের বন্টন কিসের ভিত্তিতে করা হবে? এর পরিবর্তে এ সমস্ত কাজ আল্লাহ্ তা'আলা নিজের হাতে রেখেছেন। নিজের হাতে রাখার অর্থ এটাই যে, তিনি প্রত্যেককে অপরের মুখাপেক্ষী করে বিশ্ব-ব্যবস্থা এমনভাবে সাজিয়েছেন যে, এতে অস্বাভাবিক ইজারাদারী ইত্যাদির মাধ্যমে বাধা সৃষ্টি না করা হলে এ ব্যবস্থাটি আপনা-আপনি এসব সমস্যার সমাধান করে দেয়। পারস্পরিক মুখাপেক্ষিতার এই ব্যবস্থাকে বর্তমান অর্থনৈতিক পরিভাষায় 'আমদানী-রপ্তানীর' ব্যবস্থা বলা হয়। আমদানী-রপ্তানীর স্বাভাবিক নিয়ম এই যে, যে বস্তুর আমদানী কম অথচ চাহিদা বেশি, তার মূল্য বৃদ্ধি পায়। কাজেই উৎপাদন যন্ত্রগুলো সেই বস্তু উৎপাদনে অধিক মুনাফা দেখে সেদিকেই ঝুঁকে পড়ে। অতপর যখন আমদানী রপ্তানীর তুলনায় বেড়ে যায়, তখন মূল্য হ্রাস পায়। ফলে সে বস্তুর অধিক উৎপাদন লাভজনক থাকে না এবং উৎপাদন যন্ত্রগুলো এর পরিবর্তে অন্য কাজে ব্যাপৃত হয়ে যায়, যার প্রয়োজন বেশি। ইসলাম আমদানী ও রপ্তানীর এসব শক্তির মাধ্যমেই সম্পদ উৎপাদন ও বন্টনের কাজ নিয়েছে এবং সাধারণ অবস্থায় জীবিকা বন্টনের কাজ কোন মানবিক প্রতিষ্ঠানের হাতে সোপর্দ করেনি। এর কারণ এই যে, পরিকল্পনা প্রণয়নের যত উন্নত পদ্ধতিই আবিষ্কৃত হোক না কেন, এর মাধ্যমে জীবিকার প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি প্রয়োজন জানা সম্ভবপর নয়। এ ধরনের সামাজিক বিষয়াদি সাধারণত স্বাভাবিক ব্যবস্থার অধীনেই পরিচালিত হয়। জীবনের অধিকাংশ সামাজিক সমস্যা এমনি-ভাবে স্বাভাবিক পন্থায় আপনা-আপনি সমাধানপ্রাপ্ত হয়। এগুলোকে রাষ্ট্রের পরিকল্পনা প্রণয়নের সোপর্দ করা জীবনে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করা ছাড়া কিছু নয়। উদাহরণত দিন কাজের জন্য এবং রাত্রি নিদ্রার জন্য। এ বিষয়টি কোন চুক্তি অথবা মানবিক পরিকল্পনা প্রণয়নের অধীনে স্থিরীকৃত হয়নি, বরং প্রকৃতির স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা আপনা-আপনি এ ফয়সালা করে দিয়েছে। এমনিভাবে কে কাকে বিয়ে করবে এ বিষয়টি স্বাভাবিক ও প্রকৃতিগত ব্যবস্থার অধীনে আপনা থেকেই সম্পন্ন হয় এবং একে পরিকল্পনা

প্রণয়নের মাধ্যমে সমাধান করার কল্পনা কারও মধ্যে জাগ্রত হয়নি। উদাহরণত কে জ্ঞান ও কারিগরির কোন বিভাগকে নিজের কার্যক্ষেত্র রূপে বেছে নিবে, এ বিষয়টি মানসিক আগ্রহ ও অনুরাগের পরিবর্তে সরকারের পরিকল্পনা প্রণয়নের উপর সোপর্দ করা একটা অযথা জবরদস্তি মাত্র। এতে প্রাকৃতিক নিয়মে বিপর্যয় দেখা দিতে পারে। এমনিভাবে জীবিকার ব্যবস্থাও আল্লাহ্ তা'আলা নিজের হাতে রেখে প্রত্যেকের মনে সেই কাজের প্রেরণা সৃষ্টি করে দিয়েছেন, যা তার জন্যে অধিক উপযুক্ত এবং যা সে সুষ্ঠুভাবে আনজাম দিতে পারে। সেমতে প্রত্যেক ব্যক্তি এমনকি একজন ঝাড়ুদারও নিজের কাজ নিয়ে আনন্দিত ও গর্বিত থাকে— كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ---তবে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ন্যায় ইসলাম প্রত্যেক ব্যক্তিকে বৈধ ও অবৈধ উপায়ে সম্পদ একত্রিত করে অপরের জন্য রিযিকের দ্বার বন্ধ করে দেওয়ার স্বাধীনতা দেয়নি; বরং আমদানীর উপায়সমূহের মধ্যে হালাল ও হারামের পার্থক্য করে সুদ, ফটকাবাজি, জুয়া, মজুদদারি ইত্যাদিকে নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। এরপর বৈধ আমদানীতেও যাকাত, ওশর ইত্যাদি কর আরোপ করে সেসব অনিষ্টের মূলোৎপাটন করেছে, যা বর্তমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পাওয়া যায়। এতদসত্ত্বেও কখনও ইজারাদারী প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে তা ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য সরকারের হস্তক্ষেপ বৈধ রেখেছে।

সামাজিক সাম্যের তাৎপর্য ঃ —وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ—আমি একেকে অপরের উপর মর্যাদায় উন্নীত করেছি। এ থেকে জানা গেল যে, পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষের আয় সম্পূর্ণভাবে সমান হোক----এ অর্থে সামাজিক সাম্য-কাম্যও নয় এবং সম্ভবপরও নয়। আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্ট জগতের প্রত্যেক মানুষের দায়িত্বে কিছু কর্তব্য আরোপ করেছেন এবং কিছু অধিকার দিয়েছেন আর এতদুভয়ের মধ্যে স্বীয় প্রজ্ঞার ভিত্তিতে এ গড় নির্বাচন করে দিয়েছেন যে, যার কর্তব্য যত বেশি, তার অধিকারও তত বেশি। মানুষ ব্যতীত অন্যান্য সৃষ্ট জীবের দায়িত্বে কর্তব্য খুব কম আরোপ করা হয়েছে। তারা হালাল ও হারাম, জায়েয ও নাজায়েযের আওতাধীন নয়। তাই তাদের অধিকার সবচেয়ে কম। সেমতে তাদের ব্যাপারে মানুষকে প্রশস্ত স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। মানুষ নামে মাত্র কিছু বিধি-নিষেধ পালন করে যেভাবে ইচ্ছা, তাদের দ্বারা উপকৃত হতে পারে। সেমতে কোন কোন জীবকে মানুষ কেটে ভক্ষণ করে, কোন কোনটির পিঠে সওয়ার হয় এবং কোনটিকে পদতলে পিষ্ট করে, কিন্তু একে এসব জীবের অধিকার হরণ বলে গণ্য করা হয় না। কারণ তাদের কর্তব্য কম বিধায় তাদের অধিকারও কম। সৃষ্ট জগতের মধ্যে সর্বাধিক কর্তব্য মানুষ ও জ্বিনের দায়িত্বে আরোপ করা হয়েছে। তারা প্রত্যেকটি কথা ও কর্ম এবং উঠা ও বসার ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে কৈফিয়ত দিতে বাধ্য। তারা তাদের দায়িত্ব পালন না করলে পরকালে কঠোর শাস্তির যোগ্য হবে। তাই আল্লাহ্ তা'আলা মানুষ ও জ্বিনকে অধিকারও সবচেয়ে বেশি দিয়েছেন। পরস্পরভাবে মানুষের ক্ষেত্রেও লক্ষ্য রাখা হয়েছে

যে, যার দায়িত্ব ও কর্তব্য অপরের তুলনায় বেশি, তার অধিকারও বেশি। মনুষ্যকুলের মধ্যে সর্বাধিক দায়িত্ব যেহেতু পয়গম্বরগণের উপর আরোপিত হয়েছে, তাই তাঁদেরকে অধিকারও অন্যদের তুলনায় বেশি দেওয়া হয়েছে।

আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায়ও আল্লাহ্ তা'আলা এই মাপকাঠির প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন। প্রত্যেক ব্যক্তি যতটুকু দায়িত্ব বহন করে, তাকে ততটুকু অসুবিধা প্রদান করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। বলা বাহুল্য, মানুষের কর্তব্যে সমতা আনয়ন করা একেবারে অসম্ভব এবং তাতে তফাৎ হওয়া অপরিহার্য। এটা কিছুতেই হতে পারে না যে, প্রত্যেকের নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পূর্ণ অপরের সমান হবে। কেননা, আর্থ-সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য মানুষের সৃষ্টিগত যোগ্যতা ও প্রতিভার উপর নির্ভরশীল। এর মধ্যে দৈহিক শক্তি, স্বাস্থ্য, বিবেক, বয়স, মেধা, দক্ষতা, কর্মতৎপরতা ইত্যাদি সবই অন্তর্ভুক্ত। প্রত্যেকেই খোলা চোখে অবলোকন করতে পারে যে, এসব গুণের দিক দিয়ে সকল মানুষের মধ্যে সমতা সৃষ্টি করার সাধ্য সর্বাধিক উন্নত সমাজতান্ত্রিক সরকারেরও নেই। মানুষের যোগ্যতা ও প্রতিভার মধ্যে যখন পার্থক্য অপরিহার্য, তখন তাদের কর্তব্যেও পার্থক্য অবশ্যম্ভাবী হবে। অর্থনৈতিক অধিকার কর্তব্যের উপরই নির্ভরশীল বিধায় আমদানী-তেও পার্থক্য হওয়া অপরিহার্য। কেননা কর্তব্যে পার্থক্য রেখে যদি সকলের আমদানী সমান করে দেওয়া হয়, তবে এর মাধ্যমে কখনও ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না। এমতাবস্থায় কিছু লোকের আমদানী তাদের কর্তব্যের তুলনায় বেশি এবং কিছু লোকের কম হবে, যা সুস্পষ্ট অবিচার। এ থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, আমদানীতে পূর্ণ সাম্য কোন যুগেই ইনসাফভিত্তিক হতে পারে না। সুতরাং সমাজ-তন্ত্র তার চরম উন্নতির যুগে (পূর্ণ মাত্রায় সাম্যবাদের যুগে) যে সাম্যের দাবি করে, তা কোন অবস্থাতেই গ্রহণীয় ও ইনসাফভিত্তিক নয়। তবে কার কর্তব্য বেশি, কার কম এবং এ হারে কার কতটুকু অধিকার হওয়া উচিত, এটা নির্ধারণ করা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত দুরূহ ও কঠিন কাজ। এটা সঠিকভাবে নির্ধারণ করার জন্য মানুষের কাছে কোন মাপকাঠি নেই। মাঝে মাঝে দেখা যায় একজন দক্ষ ও অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার এক ঘন্টায় এত টাকা আয় করে, যা একজন অদক্ষ শ্রমিক সারাদিন অনেক মণ মাটি বয়েও আয় করতে পারে না। কিন্তু ইনসাফের দৃষ্টিতে দেখলে এক তো শ্রমি-কের সারাদিনের স্বাধীন পরিশ্রম ইঞ্জিনিয়ারকে প্রদত্ত গুরু দায়িত্বের সমান হতে পারে না, এছাড়া ইঞ্জিনিয়ারের আমদানী কেবল এক ঘন্টার পরিশ্রমের প্রতিদান নয়; বরং এতে বছরের পর বছর মস্তিষ্ক ক্ষয় ও অধ্যবসায়ের প্রতিদানেরও অংশ আছে, যা সে ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা অর্জনে ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ এবং তাতে অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা অর্জনে সহ্য করেছে। সমাজতন্ত্র তার প্রাথমিক স্তরে আয়ের এই পার্থক্য স্বীকার করে নিয়েছে।

---

১. সমাজতন্ত্রের বক্তব্য এই যে, আমদানীতে পুরোপুরি সাম্য আনয়ন করা যদিও তাৎক্ষণিক-ভাবে সম্ভবপর নয়, কিন্তু সমাজতন্ত্রের প্রাথমিক মূলনীতিসমূহ পালন অব্যাহত থাকলে ভবিষ্যতে এমন এক যুগ আসবে, যখন আমদানীতে পুরোপুরি সাম্য অথবা মালিকানায় পুরোপুরি অভিন্নতা সৃষ্টি হয়ে যাবে। সেটা হবে পূর্ণ মাত্রায় সাম্যবাদের যুগ।

সেমতে সকল সমাজতান্ত্রিক দেশে জনসংখ্যার বিভিন্ন স্তরের মধ্যে বেতনের বিরাট পার্থক্য দেখা যায়। কিন্তু এ ব্যাপারেই তাদের পদস্খলন ঘটেছে যে, উৎপাদনের সকল উৎস সরকারের তহবিলে দিয়ে জনগণের কর্তব্য নির্ধারণ ও তদনুযায়ী আমদানী বন্টনের কাজও সরকারের কাছে ন্যস্ত করেছে। অথচ উপরে বর্ণিত রয়েছে যে, কর্তব্য ও অধিকারের মধ্যে অনুপাত কায়েম রাখার জন্য মানুষের কাছে কোন মাপকাঠি নেই। সমাজতন্ত্রের কর্মপদ্ধতি অনুযায়ী সারা দেশের মানুষের জীবিকা নির্ধারণের কাজ সরকারের কতিপয় কর্মীর হাতে এসে গেছে। তারা যাকে যতটুকু ইচ্ছা, দেওয়ার এবং যতটুকু ইচ্ছা, না দেওয়ার ক্ষমতা লাভ করেছে। প্রথমত এতে দুর্নীতি ও স্বজন প্রীতির জন্য প্রশস্ত ময়দান খোলা রয়েছে, যার সিঁড়ি বেয়ে আমলাতন্ত্র ফুলে ফলে সমৃদ্ধ হয়। দ্বিতীয়ত যদি সরকারের সকল কর্মীকে ফেরেশতাও ধরে নেওয়া হয় এবং তারা বাস্তবিকই ন্যায় ও সুবিচারের ভিত্তিতে দেশে আমদানী বন্টন করতে আগ্রহী হয়, তবে তাদের কাছে এমন কোন মাপকাঠি আছে কি, যদ্দ্বরা তারা একজন ইঞ্জিনিয়ার ও একজন শ্রমিকের কর্তব্যের পার্থক্য এবং তদনুপাতে তাদের আমদানীর ইনসাফভিত্তিক পার্থক্য সম্পর্কে ফয়সালা দিতে পারে?

বাস্তব ঘটনা এই যে, এ বিষয়ের ফয়সালা মানব বুদ্ধির অনুভূতির উর্ধ্বে। তাই সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ একে নিজের হাতে রেখেছেন। আলোচ্য وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ---আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইঙ্গিত করেছেন যে, এই পার্থক্য নির্ধারণের কাজ আমি মানুষকে সোপর্দ করার পরিবর্তে নিজের হাতে রেখেছি। এর অর্থ এখানে তাই যে, দুনিয়াতে প্রত্যেকের প্রয়োজন অপরের সাথে জড়িত করে দেওয়া হয়েছে। ফলে প্রত্যেকেই নিজের প্রয়োজন মেটানোর জন্য অপরকে ততটুকু দিতে বাধ্য, যতটুকুর সে যোগ্য। এখানেও পারস্পরিক মুখাপেক্ষিতার উপর ভিত্তিশীল আমদানী ও রপ্তানীর ব্যবস্থা প্রত্যেকের আমদানী নির্ধারণ করে। অর্থাৎ প্রত্যেকেই নিজে ফয়সালা করে যে, যতটুকু কর্তব্য সে নিজ দায়িত্বে নিয়েছে, তার কতটুকু বিনিময় তার জন্য যথেষ্ট। এর কম পাওয়া গেলে সে সেই কাজ করতে সম্মত হয় না এবং বেশি চাইলে প্রতিপক্ষ তাকে কাজে নিয়োজিত করে না। لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا---বাক্যের অর্থ তাই যে, আমি আমদানীতে পার্থক্য এ কারণে রেখেছি, যাতে একজন অপরের দ্বারা কাজ করিয়ে নেয়। নতুবা সকলের আমদানী সমান হলে কেউ কারও কোন কাজে আসত না।

তবে কতক অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতেই বড় বড় পুঁজিপতিরা আমদানী ও রপ্তানীর এই প্রাকৃতিক ব্যবস্থা থেকে অবৈধ ফায়দা লুটতে পারে, তা গরীবদেরকে তাদের প্রকৃত প্রাপ্য অপেক্ষা কম মজুরিতে কাজ করতে বাধ্য করতে পারে। ইসলাম প্রথমত হালাল-হারাম ও জায়েয-নাজায়েযের সুদূরপ্রসারী বিধি-বিধানের সাহায্যে এবং দ্বিতীয়ত নৈতিক আচরণাবলী ও পরকাল চিন্তার মাধ্যমে এহেন পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার পথে বাধার প্রাচীর গড়ে তুলেছে। যদি কখনও কোন স্থানে এই পরিস্থিতির উদ্ভব হয়ে যায়, তবে ইসলাম রাষ্ট্রকে অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সীমা পর্যন্ত মজুরি নির্ধারণের ক্ষমতা দান করেছে। বলা বাহুল্য, এটা কেবল অস্বাভাবিক পরিস্থিতি পর্যন্ত সীমিত বিধায় এর জন্য উৎপাদনের সকল উৎস সরকারের হাতে সমর্পণ করার কোন প্রয়োজন নেই। কেননা, এর ক্ষতি উপকারের তুলনায় অনেক বেশি।

ইসলামী সাম্যের অর্থ ঃ উল্লিখিত ইঙ্গিতসমূহ থেকে এ কথা স্পষ্টরূপে ফুটে উঠে যে, আমদানীতে পুরোপুরি সাম্য ন্যায় ও সুবিচারের দাবি নয়। এ সাম্য কার্যত কোথাও কায়েম হয়নি এবং হতে পারে না। এটা ইসলামেরও কাম্য নয়। তবে ইসলাম আইন, সামাজিকতা ও অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠা করেছে। এর অর্থ এই যে, উল্লিখিত প্রাকৃতিক কর্মপদ্ধতি অনুসারে যার যতটুকু অধিকার নির্দিষ্ট হয়ে যায়, তা অর্জন করার আইনগত ও সমাজগত অধিকারে সকলেই সমান। এ বিষয়ের কোন অর্থ হয় না যে, একজন ধনী, প্রভাব প্রতিপত্তিশালী ও পদাধিকারী ব্যক্তি তার অধিকার সসম্মানে ও সহজে অর্জন করবে, আর গরীব বেচারী তার অধিকার অর্জনের জন্য দ্বারে দ্বারে ধাক্কা খেয়ে ফিরবে এবং লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে, আইন ধনীর অধিকার সংরক্ষণ করবে আর গরীবদের বেলায় আইনের বাণী নিভৃতে কাঁদবে। এ বিষয়টি হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) খলীফা হওয়ার পর এক ভাষণে তুলে ধরেছিলেন ঃ واﷲ ما عندى اقوى من الضعيف حتى اخذ الحق له ولا عندى اضعف من القوى حتى اخذ الحق منه---অর্থাৎ আমি যে পর্যন্ত দুর্বলের অধিকার আদায় করে না দেই, সে পর্যন্ত আমার কাছে দুর্বল অপেক্ষা শক্তিশালী কেউ নেই এবং আমি যে পর্যন্ত সবলের কাছ থেকে অধিকার আদায় না করি, সে পর্যন্ত সবল অপেক্ষা দুর্বল আমার কাছে কেউ নেই।

এমনিভাবে নির্ভেজাল অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণে ইসলামী সাম্যের অর্থ এই যে, ইসলামের দৃষ্টিতে প্রত্যেকেই উপার্জনের সমান সুযোগ-সুবিধা লাভ করবে। ইসলাম এটা পছন্দ করে না যে, কয়েকজন বড় বড় ধনপতি ধনসম্পদের উৎস মুখ দখল করে নিজেদের ইজারাদারী প্রতিষ্ঠিত করে নেবে এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য বাজারে বসাও দুরূহ করে তুলবে। সেমতে সুদ, ফটকাবাজি, জুয়া মজুদদারি এবং ইজারাদারী ভিত্তিক বাণিজ্যিক চুক্তি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। এছাড়া যাকাত, ওশর, খারাজ, ভরণ-পোষণের ব্যয়, দান-খয়রাত ও অন্যান্য কর আরোপ করে এমন পরিবেশ গড়ে তোলা হয়েছে, যাতে প্রত্যেক মানুষ তার ব্যক্তিগত যোগ্যতা, শ্রম ও পুঁজি অনুপাতে

উপার্জনের উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা লাভ করতে সক্ষম হয় এবং এর ফলশ্রুতিতে একটি সুখী সমাজ গড়ে উঠতে পারে। এতসবের পরেও আমদানীতে যে পার্থক্য থেকে যাবে, তা প্রকৃতপক্ষে অপরিহার্য। মনুষ্যকুলের মধ্যে যেমন রূপ, সৌন্দর্য, শক্তি, স্বাস্থ্য, জ্ঞানবুদ্ধি, মেধা, সন্তান-সন্ততির বিদ্যমান পার্থক্য মেটানো সম্ভবপর নয়, তেমনি এ পার্থক্যও বিলোপ হওয়ার নয়।

وَلَوْلَآ اَنْ يَّكُوْنَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَنْ يَّكْفُرُ بِالرَّحْمٰنِ لِبُيُوْتِهِمْ سُقُفًا مِّنْ فِضَّةٍ وَّمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُوْنَ ۝ وَلِبُيُوْتِهِمْ اَبْوَابًا وَّسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِـُٔوْنَ ۝ وَزُخْرُفًا ؕ وَاِنْ كُلُّ ذٰلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ؕ وَالْاٰخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِيْنَ ۝

---

(৩৩) যদি সব মানুষের এক মতাবলম্বী হয়ে যাওয়ার আশংকা না থাকত, তবে যারা দয়াময় আল্লাহকে অস্বীকার করে আমি তাদেরকে দিতাম তাদের গৃহের জন্যে রৌপ্য নির্মিত ছাদ ও সিঁড়ি, যার উপর তারা চড়ত (৩৪) এবং তাদের গৃহের জন্য দরজা দিতাম এবং পালংক দিতাম, যাতে তারা হেলান দিয়ে বসত। (৩৫) এবং স্বর্ণ-নির্মিতও দিতাম। এগুলো সবই তো পার্থিব জীবনের ভোগ সামগ্রী মাত্র। আর পরকাল আপনার পালনকর্তার কাছে তাদের জন্যেই যারা ভয় করে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(কাফিররা ধন-সম্পদের প্রাচুর্যকে নবুয়ত লাভের শর্ত মনে করে, অথচ নবুয়ত এক মহান বিষয়---এর যোগ্যতার শর্তও মহানই হওয়া উচিত। পার্থিব ধন-দৌলত ও প্রভাব-প্রতিপত্তি আমার কাছে এত নিকৃষ্ট যে,) যদি (প্রায়) সব মানুষের এক মতাবলম্বী (অর্থাৎ কাফির) হয়ে যাওয়ার আশংকা না থাকত, তবে যারা আল্লাহ্‌র সাথে কুফরী করে, (ফলে আল্লাহ্‌র কাছে খুব ঘৃণিত হয়) আমি তাদেরকে দিতাম তাদের গৃহের জন্য রৌপ্য নির্মিত ছাদ, (রৌপ্য নির্মিত) সিঁড়ি যার উপর তারা উঠত (ও নামত) এবং তাদের গৃহের জন্য (রৌপ্য নির্মিত) দরজা দিতাম এবং (রৌপ্য নির্মিত) পালংক দিতাম, যাতে তারা হেলান দিয়ে বসত এবং (এসব বস্তুই) স্বর্ণ নির্মিতও দিতাম। (অর্থাৎ কিছু রৌপ্য ও কিছু স্বর্ণ নির্মিত দিতাম (কিন্তু এসব আসবাবপত্র সকল কাফিরকে এজন্য দেওয়া হয়নি যে, অধিকাংশ মানুষের স্বভাবে ধন-সম্পদের লালসা প্রবল। কাজেই এসব আসবাবপত্র কুফরের নিশ্চিত কারণ হয়ে যেত। ফলে অল্প সংখ্যক লোক বাদে প্রায় সকলেই কুফরী অবলম্বন করত।

তাই সকল কাফিরকে এই ঐশ্বর্য দান করিনি। এই উপযোগিতা লক্ষ্য না হলে তাই করতাম। বলা বাহুল্য, শত্রুকে মূল্যবান বস্তু দেওয়া হয় না। এ থেকে জানা গেল যে, পার্থিব ধন-সম্পদ প্রকৃতপক্ষে কোন মহৎ বস্তু নয়। কাজেই এটা নবুয়তের ন্যায় মহান পদের যোগ্যতার শর্তও হতে পারে না। পক্ষান্তরে নবুয়তের শর্ত হচ্ছে কতিপয় উচ্চস্তরের নৈপুণ্য, যা আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে পয়গম্বরগণকে দান করা হয়। এসব নৈপুণ্য মুহাম্মদ (সা)-এর মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং নবুয়ত তাঁর জন্যই শোভনীয়—মক্কা ও তায়েফের সর্দারদের জন্য নয়।)। এগুলো সবই (অর্থাৎ উল্লিখিত আসবাবপত্র) তো পার্থিব জীবনের ভোগ-সামগ্রী মাত্র। আর পরকাল (যা চিরন্তন ও তদপেক্ষা উত্তম, তা) আপনার পালনকর্তার কাছে আল্লাহ্ ভীরুদের জন্যেই।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ধন-দৌলতের প্রাচুর্য শ্রেষ্ঠত্বের কারণ নয়ঃ কাফিররা বলেছিল, মক্কা ও তায়েফের কোন বড় ধনাঢ্য ব্যক্তিকে পয়গম্বর করা হল না কেন? আলোচ্য আয়াতসমূহে এর দ্বিতীয় জওয়াব দেওয়া হয়েছে। এর সারমর্ম এই যে, নিঃসন্দেহে নবুয়তের জন্য কিছু যোগ্যতা ও শর্ত থাকা জরুরী। কিন্তু ধন-দৌলতের প্রাচুর্যের ভিত্তিতে কাউকে নবুয়ত দেওয়া যায় না। কেননা, ধন-দৌলত আমার দৃষ্টিতে এত নিকৃষ্ট ও হেয় যে, সব মানুষের কাফির হয়ে যাওয়ার আশংকা না থাকলে আমি সব কাফিরের উপর স্বর্ণ-রৌপ্যের বৃষ্টি বর্ষণ করতাম। তিরমিযীর এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء —অর্থাৎ দুনিয়া যদি আল্লাহ্র কাছে মশার এক পাখার সমানও মর্যাদা রাখত, তবে আল্লাহ্ তা'আলা কোন কাফিরকে দুনিয়া থেকে এক ঢোক পানিও দিতেন না। এ থেকে জানা গেল যে, ধন-সম্পদের প্রাচুর্যও কোন শ্রেষ্ঠত্বের কারণ নয় এবং এর অভাবও মানুষের মর্যাদাহীন হওয়ার আলামত নয়। তবে নবুয়তের জন্য কতিপয় উচ্চস্তরের গুণ থাকা অত্যাবশ্যক। সেগুলো মুহাম্মদ (সা)-এর মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান রয়েছে। কাজেই কাফিরদের আপত্তি সম্পূর্ণ অসার ও বাতিল।

আয়াতে 'সব মানুষ কাফির হয়ে যেত' এর অর্থ বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ কাফির হয়ে যেত। নতুবা আল্লাহ্র কিছু বান্দাহ আজও আছে, যারা বিশ্বাস করে যে, কুফরী অবলম্বন করে তারা ধন-দৌলতে স্নাত হয়ে যেতে পারে। কিন্তু তারা ধন-দৌলতের খাতিরে কুফরী অবলম্বন করে না। এরূপ কিছু লোক সম্ভবত তখনও ঈমানকে আঁকড়ে থাকত। কিন্তু তাদের সংখ্যা হত আটার মধ্যে লবণের তুল্য।

وَمَنْ يَّعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهٗ شَيْطٰنًا فَهُوَ لَهٗ قَرِيْنٌ ﴿٣٦﴾ وَاِنَّهُمْ لَيَصُدُّوْنَهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ﴿٣٧﴾ حَتّٰۤى اِذَا جَآءَنَا

قَالَ يٰلَيْتَ بَيْنِيْ وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِيْنُ ۝ وَلَنْ يَّنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ اِذْ ظَّلَمْتُمْ اَنَّكُمْ فِى الْعَذَابِ مُشْتَرِكُوْنَ ۝ اَفَاَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ اَوْ تَهْدِى الْعُمْىَ وَمَنْ كَانَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝ فَاِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَاِنَّا مِنْهُمْ مُّنْتَقِمُوْنَ ۝ اَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِىْ وَعَدْنٰهُمْ فَاِنَّا عَلَيْهِمْ مُّقْتَدِرُوْنَ ۝ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِىْٓ اُوْحِىَ اِلَيْكَ ۚ اِنَّكَ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝ وَاِنَّهٗ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ۚ وَسَوْفَ تُسْـَٔلُوْنَ ۝ وَسْـَٔلْ مَنْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُّسُلِنَآ اَجَعَلْنَا مِنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ اٰلِهَةً يُّعْبَدُوْنَ ۝

(৩৬) যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে চোখ ফিরিয়ে নেয়, আমি তার জন্য এক শয়তান নিয়োজিত করে দেই, অতপর সে-ই হয় তার সঙ্গী। (৩৭) শয়তান-রাই মানুষকে সৎপথে বাধা দান করে, আর মানুষ মনে করে যে, তারা সৎপথে রয়েছে। (৩৮) অবশেষে যখন সে আমার কাছে আসবে, তখন সে শয়তানকে বলবে, হায়, আমার ও তোমার মধ্যে যদি পূর্ব-পশ্চিমের দূরত্ব থাকত! কত হীন সঙ্গী সে! (৩৯) তোমরা যখন কুফর করছিলে, তখন তোমাদের আজকে আযাব শরীক হওয়া কোন কাজে আসবে না। (৪০) আপনি কি বধিরকে শোনাতে পারবেন? অথবা যে অন্ধ ও যে স্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত, তাকে পথ প্রদর্শন করতে পারবেন? (৪১) অতপর আমি যদি আপনাকে নিয়ে যাই, তবু আমি তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নেব। (৪২) অথবা যদি আমি তাদেরকে যে আযাবের ওয়াদা দিয়েছি, তা আপনাকে দেখিয়ে দেই, তবু তাদের উপর আমার পূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে। (৪৩) অতএব আপনার প্রতি যে ওহী নাযিল করা হয়, তা দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করুন। নিঃসন্দেহে আপনি সরল পথে রয়েছেন। (৪৪) এটা আপনার ও আপনার সম্প্রদায়ের জন্য উল্লিখিত থাকবে এবং শীঘ্রই আপনারা জিজ্ঞাসিত হবেন। (৪৫) আপনার পূর্বে আমি যেসব রসূল প্রেরণ করেছি, তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, দয়াময় আল্লাহ্ ব্যতীত আমি কি কোন উপাস্য স্থির করেছিলাম ইবাদতের জন্যে?

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপদেশ (অর্থাৎ কোরআন ও ওহী) থেকে (জেনেশুনে) অন্ধ হয়ে যায়, (যেমন, কাফিররা পর্যাপ্ত ও সন্তোষজনক প্রমাণাদি সত্ত্বেও মূর্খ সাজে) আমি তার জন্য এক শয়তান নিয়োজিত করে দেই, অতপর সে-ই হয় তার (সর্বকালীন) সহচর। তারাই (অর্থাৎ এসব সহচর শয়তানরাই) তাদেরকে (অর্থাৎ, কোরআন থেকে বিমুখ মানুষকে সর্বদা) সৎপথে বাধাদান করে। (নিয়োজিত করার এটাই ফল।) আর তারা (সৎপথ থেকে দূরে থাকা সত্ত্বেও) মনে করে যে, তারা সৎপথে আছে। (অতএব এরূপ লোকদের সৎপথে আসার আশা নেই। কাজেই আপনি দুঃখ করবেন না এবং মনে সান্ত্বনা রাখুন যে, তাদের এ গাফলতি সত্বরই দূর হবে। তারা সত্বরই নিজেদের ভুল বুঝতে পারবে। কেননা, এটা কেবল দুনিয়া পর্যন্তই সীমাবদ্ধ।) অবশেষে যখন সে আমার কাছে আসবে (এবং তার ভুল প্রকাশ পাবে), তখন (সহচর শয়তানকে) বলবে, হায়, আমার ও তোমার মধ্যে যদি (দুনিয়াতে) পূর্ব ও পশ্চিমের দূরত্ব থাকত (কেননা, তুমি) ছিলে নিকৃষ্ট সহচর! (তুমিই তো আমাকে পথভ্রষ্ট করেছিলে, কিন্তু এ পরিতাপ তখন কাজে আসবে না। এ ছাড়া তাদেরকে বলা হবে,) তোমরা যখন (দুনিয়াতে) কুফর করেছ, তখন আজ যেমন পরিতাপ তোমাদের উপকারে আসেনি তেমনি) আজকের এ বিষয়টিও (অর্থাৎ তোমার ও শয়তানের) আযাবে শরীক হওয়া তোমাদের কোন উপকারে আসবে না। (দুনিয়াতে মাঝে মাঝে অন্যদেরকেও নিজের মত বিপদে শরীক দেখে যেমন, এক প্রকার সান্ত্বনা লাভ হয়, জাহান্নামে তা হবে না। কারণ, জাহান্নামের আযাব হবে খুব তীব্র। অপরের দিকে ভ্রূক্ষেপও হবে না। প্রত্যেকেই নিজেকে সর্বাধিক আযাবে লিপ্ত মনে করবে।) অতএব (আপনি যখন জানলেন যে, তাদের হিদায়তের কোন আশা নেই, তখন) আপনি কি (এমন) বধিরকে শুনাতে পারবেন? অথবা যে অন্ধ ও যে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত, তাকে পথে আনতে পারবেন? (অর্থাৎ তাদের হিদায়ত আপনার ইখতিয়ারের বাইরে।) অতপর (তাদের এই অবাধ্যতার কারণে অবশ্যই শাস্তি হবে---আপনার জীবদ্দশায় অথবা ওফাতের পরে। সুতরাং) আমি যদি আপনাকে (দুনিয়া থেকে) নিয়ে যাই, তবুও আমি তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নেব, অথবা যদি আমি তাদেরকে যে আযাবের ওয়াদা দিয়েছি তা (আপনার জীবদ্দশায় তাদের উপর নাযিল করে) আপনাকে তা দেখিয়ে দেই, তবুও (অবান্তর নয়। কেননা) তাদের উপর আমার পূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে। (অর্থাৎ আযাব অবশ্যই হবে---যখনই হোক। অতএব আপনি সান্ত্বনা রাখুন এবং নিশ্চিন্তে) কোরআনকে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করুন, যা আপনার প্রতি ওহীর মাধ্যমে নাযিল করা হয়েছে। (কেননা) আপনি নিঃসন্দেহে সরল পথে আছেন। (অর্থাৎ নিজের কাজ করে যান, অপরের কাজের জন্য দুঃখ করবেন না।) এ কোরআন (যা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে,) আপনার জন্য ও আপনার সম্প্রদায়ের জন্য খুব সম্মানের বস্তু। (কারণ, এতে আপনাকে প্রত্যক্ষভাবে এবং আপনার সম্প্রদায়কে পরোক্ষভাবে সম্বোধন করা হয়েছে। সাধারণ

রাজা-বাদশাহ্‌র সাথে কথা বলাকে সম্মানের বিষয় মনে করা হয়। রাজাধিরাজ আল্লাহ্ যার সাথে কথা বলেন, তার তো সম্মানের অন্তই থাকে না।) শীঘ্রই (কিয়ামতের দিন) তোমরা (নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে) জিজ্ঞাসিত হবে। (আপনাকে কেবল তবলীগ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে, যা আপনি পূর্ণরূপে সম্পাদন করেছেন। আর তাদেরকে কর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। সুতরাং তাদের কর্ম সম্পর্কে যখন আপনি জিজ্ঞাসিত হবেন না, তখন আপনার চিন্তা কিসের? আমার অবতীর্ণ ওহীতে তওহীদ সম্পর্কেই কাফিরদের বড় আপত্তি। প্রকৃতপক্ষে এর সত্যতার ব্যাপারে সকল পয়গম্বরই একমত। সেমতে আপনি যদি চান, তবে) আপনার পূর্বে আমি যেসব পয়গম্বর প্রেরণ করেছি, তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন (অর্থাৎ তাদের অবশিষ্ট কিতাব ও সহীফায় অনুসন্ধান করে দেখুন), দয়াময় আল্লাহ্ ব্যতীত (কোন সময়) আমি কি কোন উপাস্য স্থির করেছিলাম তাদের ইবাদত করার জন্য? (এতে উদ্দেশ্য অপরকে শুনানো যে, কেউ চাইলে অনুসন্ধান করে দেখুক। কিতাবে খুঁজে দেখাকে "পয়গম্বরগণকে জিজ্ঞাসা করুন" বলে ব্যক্ত করার উদ্দেশ্য কাফিরদের অক্ষমতা ফুটিয়ে তোলা।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে বিমুখতা কুসংসর্গের কারণ ঃ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ

الرَّحْمٰنِ—উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপদেশ অর্থাৎ কোরআন ও ওহী থেকে জেনেশুনে বিমুখ হয়, আমি তার জন্য এক শয়তান নিয়োজিত করে দেই। সে দুনিয়াতেও তার সহচর হয়ে থাকে এবং তাকে সৎকর্ম থেকে নিবৃত্ত করে, কুকর্মে উৎসাহিত করে এবং পরকালেও যখন সে কবর থেকে উত্থিত হবে, তখন তার সঙ্গে থাকবে। অবশেষে উভয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (কুরতুবী) এ থেকে জানা গেল যে, আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে বিমুখতার এতটুকু শাস্তি দুনিয়াতেই পাওয়া যায় যে, তার সংসর্গ খারাপ হয়ে যায় এবং মানুষ-শয়তান অথবা জিন-শয়তান তাকে সৎকর্ম থেকে দূরে সরিয়ে অসৎ কর্মের নিকটবর্তী করে দেয়। সে পথভ্রষ্টতার যাবতীয় কাজ করে, অথচ মনে করে যে, খুব ভাল কাজ করছে। (কুরতুবী) এখানে যে শয়তানকে নিয়োজিত করার কথা বলা হয়েছে, সে সেই শয়তান থেকে ভিন্ন, যে প্রত্যেক মু'মিন ও কাফিরের সাথে নিয়োজিত রয়েছে। কেননা, সেই শয়তান মু'মিনের নিকট থেকে বিশেষ বিশেষ সময়ে সরেও যায়, কিন্তু এ শয়তান সদাসর্বদা জোঁকের মত লেগেই থাকে।—(বয়ানুল কোরআন)

وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ...—এ আয়াতের দু'রকম তফসীর হতে পারে—এক, যখন তোমাদের কুফর ও শিরক প্রমাণিত হয়ে গেছে, তখন পরকালে তোমাদের এ পরিতাপ কোন কাজে আসবে না যে, হায়, এই শয়তান যদি আমা থেকে দূরে থাকত।

কেনেনা, তখন তোমরা সবাই আযাবে শরীক থাকবে। এমতাবস্থায় أَنَّكُمْ فِى الْعَذَابِ -এর অর্থ হবে لانكم

দ্বিতীয় সম্ভাব্য তফসীর এই যে, সেখানে পৌঁছার পর তোমাদের ও শয়তানদের আযাবে শরীক হওয়া তোমাদের জন্য মোটেই উপকারী হবে না। দুনিয়াতে অবশ্য এরূপ হয় যে, একই বিপদে কয়েকজন শরীক হলে প্রত্যেকের দুঃখ কিছুটা হালকা হয় বলে, কিন্তু পরকালে যেহেতু প্রত্যেকেই নিজেকে নিয়ে ব্যাপৃত থাকবে এবং কেউ কারও দুঃখ হটাতে পারবে না, তাই আযাবে শরীক হওয়া কোন উপকার দিবে না। এমতাবস্থায় انكم হবে يَنْفَعُ ক্রিয়ার কর্তা।

সুখ্যাতিও ধর্মে পছন্দনীয়ঃ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ (এ কোরআন আপনার ও আপনার সম্প্রদায়ের জন্য খুবই সম্মানের বস্তু।) ذكر -এর অর্থ এখানে সুখ্যাতি। উদ্দেশ্য এই যে, কোরআন পাক আপনার ও আপনার সম্প্রদায়ের জন্য মহা-সম্মান ও সুখ্যাতির কারণ। ইমাম রাযী বলেন, এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, সুখ্যাতি একটি কাম্য বিষয়। তাই আল্লাহ্ তা'আলা এখানে একে অনুগ্রহস্বরূপ উল্লেখ করেছেন এবং এ কারণেই হযরত ইবরাহীম (আ) এই দোয়া করেছিলেন— وَاجْعَلْ لِّى لِسَانَ صِدْقٍ فِى الْآخِرِيْنَ —(তফসীরে কবীর) কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, সুখ্যাতি তখনই উত্তম, যখন তা জীবনের লক্ষ্য না হয়ে সৎকর্মের দৌলতে আপনা-আপনি অর্জিত হয়। পক্ষান্তরে মানুষ যদি সুখ্যাতির লক্ষ্যেই সৎকর্ম করে, তবে এটা রিয়া, যা সৎকর্মের যাবতীয় উপকারিতা বিনষ্ট করে দেয় এবং পাপের বোঝা বড় হয়। আয়াতে "আপনার সম্প্রদায়" বলে কারও কারও মতে কোরাইশ গোত্রকে বোঝানো হয়েছে। কিন্তু আল্লামা কুরতুবী বলেন, এতে সমগ্র উম্মতকে বোঝানো হয়েছে। কোরআন পাক সকলের জন্যেই সম্মান ও সুখ্যাতির কারণ।

وَاسْئَلْ مَنْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُّسُلِنَا —(আপনার পূর্বে আমি যে সব পয়গম্বর প্রেরণ করেছি, আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন।) এখানে প্রশ্ন হয় যে, পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণ তো ওফাত পেয়ে গেছেন। তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করার আদেশ কিরূপে দেওয়া হল? কোন কোন তফসীরবিদ এর জওয়াবে বলেন যে, আয়াতের উদ্দেশ্য হল আল্লাহ্ তা'আলা যদি মু'জিযাস্বরূপ পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণকে আপনার সাথে সাক্ষাৎ করিয়ে দেন, তবে তাদেরকে একথা জিজ্ঞেস করুন। সেমতে মি'রাজ রজনীতে রসূলুল্লাহ্ (স)-র সকল পয়গম্বরের সাথে সাক্ষাৎ ঘটেছিল। কুরতুবী বর্ণিত

কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায়, রসূলুল্লাহ্ (স) পয়গম্বরগণের ইমামত শেষে তাদেরকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন। কিন্তু এসব রেওয়ায়েতের সনদ জানা যায়নি। অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে আয়াতের অর্থ এই যে, পয়গম্বরগণের প্রতি অবতীর্ণ কিতাব ও সহীফায় খুঁজে দেখুন এবং তাদের উম্মতের আলিমগণকে জিজ্ঞেস করুন। সেমতে বনী ইসরাঈলের পয়গম্বরগণের সহীফাসমূহে বিকৃতি সত্ত্বেও তওহীদের শিক্ষা ও শিরকের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের শিক্ষা আজ পর্যন্ত বিদ্যমান রয়েছে। উদাহরণত বর্তমান বাইবেলের কিছু বাক্য উদ্ধৃত করা হল।

বর্তমান তওরাতে আছেঃ—যাতে তুমি জান যে, খোদাওয়ান্দই খোদা, তিনি ব্যতীত কেউই নেই।-----(এস্তেছনা—৩৫—৪)

শুন হে ইসরাঈল, খোদাওয়ান্দ আমাদেরই এক খোদা।——(এস্তেছনা ৪—৬)

হযরত আশিইয়া (আ)-এর সহীফায় আছেঃ

আমিই খোদাওয়ান্দ, অন্য কেউ নয়। আমাকে ছাড়া কোন খোদা নেই, যাতে পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত লোকেরা জানে যে, আমাকে ছাড়া কেউ নেই, আমিই খোদা-ওয়ান্দ, আমাকে ছাড়া অন্য কেউ নেই।---(ইয়াহিয়া ৬—৫ঃ ৪৫)

হযরত ঈসা (আ)-র এ উক্তিও বর্তমান বাইবেলে রয়েছেঃ

"হে ইসরাঈল, শুন, খোদাওয়ান্দ আমাদের খোদা একই খোদওয়ান্দ। তুমি খোদাওয়ান্দ তোমার খোদাকে সমস্ত মনে সমস্ত প্রাণে এবং প্রিয় বিবেক ও সমগ্র শক্তি দ্বারা ভালবাস। (মরকাস ১২—২৯ মাত্তা ২২—৩৬)

বর্ণিত আছে যে, তিনি একবার মোনাজাতে বলেছিলেনঃ

এবং চিরন্তন জীবন এই যে, তারা তুমি একক ও সত্য আল্লাহ্‌কে এবং ঈসা মসীহ্‌কে—যাকে তুমি প্রেরণ করেছ—চিনবে (ইউহান্না ৩—১৭)

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ
رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٦﴾ فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ ﴿٤٧﴾ وَمَا نُرِيهِم
مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا ۖ وَأَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤٨﴾
وَقَالُوا يَا أَيُّهَ السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ ﴿٤٩﴾

فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ ۝ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي ۖ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۝ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ۝ فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ ۝ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ۝ فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ۝ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ ۝

(৪৬) আমি মূসাকে আমার নিদর্শনাবলী দিয়ে ফিরাউন ও তার পারিষদবর্গের কাছে প্রেরণ করেছিলাম, অতপর সে বলেছিল, আমি বিশ্ব পালনকর্তার রসূল। (৪৭) অতপর সে যখন তাদের কাছে আমার নিদর্শনাবলী উপস্থাপন করল, তখন তারা হাস্য-বিদ্রূপ করতে লাগল। (৪৮) আমি তাদেরকে যে নিদর্শনই দেখাতাম তা-ই হত পূর্ববর্তী নিদর্শন অপেক্ষা বৃহৎ এবং আমি তাদেরকে শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করলাম, যাতে তারা ফিরে আসে। (৪৯) তারা বলল, হে যাদুকর, তুমি আমাদের জন্য তোমার পালনকর্তার কাছে সে বিষয় প্রার্থনা কর, যার ওয়াদা তিনি তোমাকে দিয়েছেন; আমরা অবশ্যই সৎপথ অবলম্বন করব। (৫০) অতপর যখন আমি তাদের থেকে আযাব প্রত্যাহার করে নিলাম, তখনই তারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে লাগলো। (৫১) ফিরাউন তার সম্প্রদায়কে ডেকে বলল, হে আমার কওম, আমি কি মিসরের অধিপতি নই? এই নদীগুলো আমার নিম্নদেশে প্রবাহিত হয়, তোমরা কি দেখ না? (৫২) আমি যে শ্রেষ্ঠ এ ব্যক্তি থেকে, যে নীচ এবং কথা বলতেও সক্ষম নয়। (৫৩) তাকে কেন স্বর্ণবলয় পরিধান করানো হল না অথবা কেন আসল না তার সঙ্গে ফেরেশতাগণ দল বেঁধে? (৫৪) অতপর সে তার সম্প্রদায়কে বোকা বানিয়ে দিল, ফলে তারা তার কথা মেনে নিল। নিশ্চয় তারা ছিল পাপাচারী সম্প্রদায়। (৫৫) অতপর যখন আমাকে রাগান্বিত করল, তখন আমি তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিলাম এবং নিমজ্জিত করলাম তাদের সবাইকে। (৫৬) অতপর আমি তাদেরকে করে দিলাম অতীত লোক ও দৃষ্টান্ত পরবর্তীদের জন্য।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি মূসা (আ)-কে আমার প্রমাণাদি (অর্থাৎ লাঠি ও জ্যোতির্ময় হাতের মু'জিযা দিয়ে ফিরাউন ও তার পারিদবর্গের কাছে প্রেরণ করেছিলাম। অতপর তিনি (তাদের কাছে এসে) বললেন, আমি বিশ্বপালনকর্তার পক্ষ থেকে (তোমাদের হিদায়তের জন্য) রসূল (হয়ে এসেছি। কিন্তু ফিরাউন ও তার পারিষদবর্গ মানল না)। অতপর (আমি অন্যান্য প্রমাণ শাস্তির আকারে তার নবুয়ত সপ্রমাণ করার জন্য প্রকাশ করলাম। অর্থাৎ, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি দিলাম। কিন্তু তাদের অবস্থা তবুও অপরিবর্তিত রইল এবং) যখন মূসা (আ) তাদের কাছে আমার (সেই) নিদর্শনাবলী উপস্থিত করল, তখনই তারা (মু'জিযাগুলোর কারণে) বিদ্রূপ করতে লাগল (যে, এগুলো কিসের মু'জিযা, কেবল মামূলী ঘটনাবলী। কেননা, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি এমনিতেও হয়ে থাকে। কিন্তু এটা ছিল তাদের নির্বুদ্ধিতা। কারণ, অন্যান্য ইঙ্গিত থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল যে, এসব ঘটনা অস্বাভাবিক ও মু'জিযারূপে সংঘটিত হচ্ছে। এ কারণেই তারা তার প্রতি যাদুর অপবাদ আরোপ করেছিল। নিদর্শনগুলো এমন ছিল যে,) আমি তাদেরকে যে নিদর্শনই দেখাতাম, তা হত অন্য নিদর্শন অপেক্ষা বৃহৎ। (উদ্দেশ্য এই যে, সকল নিদর্শনই ছিল বৃহৎ। এরূপ অর্থ নয় যে, প্রত্যেক নিদর্শনই অপর নিদর্শন অপেক্ষা বৃহৎ ছিল। বাকপদ্ধতিতে কয়েক বস্তুর পূর্ণতা বর্ণনা করতে হলে এভাবেই বলা হয় যে, একটি থেকে একটি বড়। বাস্তবেও প্রত্যেক নিদর্শন পূর্ববর্তী নিদর্শন অপেক্ষা বৃহৎ হওয়া সম্ভবপর) এবং আমি তাদেরকে (এসব নিদর্শন স্থাপন করে) আযাব দ্বারা পাকড়াও করেছিলাম, যাতে তারা (কুফর থেকে) ফিরে আসে। অর্থাৎ, নিদর্শনগুলো নবুয়তের প্রমাণও ছিল এবং তাদের জন্য শাস্তিও ছিল। কিন্তু তারা ফিরে এল না। অথচ প্রত্যেক নিদর্শন দেখার সময়ই তারা ফিরে আসার অঙ্গীকার কয়েকবার করেছিল) তারা (মূসা (আ)-কে প্রত্যেক নিদর্শনের পর) বলল, হে যাদুকর (এ শব্দটি পূর্ব অভ্যাস অনুযায়ী অধিক হতভম্বতার কারণে তাদের মুখ দিয়ে বের হয়ে থাকবে। নতুবা এমন সানুনয় আবেদনের সময় এই দুষ্টামিপূর্ণ শব্দ বলা অবান্তর মনে হয়। উদ্দেশ্য ছিল এই যে, হে মূসা) তুমি আমাদের জন্য তোমার পালনকর্তার কাছে এ বিষয়ের দোয়া কর, যার ওয়াদা তিনি তোমাকে দিয়েছেন। (অর্থাৎ আমাদের অন্তরের মোহর দূর করে দেওয়ার দোয়া কর। আমরা অঙ্গীকার করছি যে, এ আযাব দূর হয়ে গেলে) আমরা অবশ্যই সৎপথ অবলম্বন করব। অতপর যখন আমি তাদের থেকে আযাব প্রত্যাহার করে নিলাম, তখনই তারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে লাগল। ফেরাউন (সম্ভবত মু'জিযা দেখে সবার মুসলমান হয়ে যাবার আশংকা করে) তার সম্প্রদায়কে ডেকে বলল, হে আমার সম্প্রদায়, আমি কি মিসরের (ও তৎসংশ্লিষ্ট এলাকার) অধিপতি নই? (আর দেখ) এই নদীগুলো আমার (প্রাসাদের) নিম্নদেশে প্রবাহিত হচ্ছে। তোমরা কি (এসব বিষয়) দেখ না? (মূসার কাছে তো কিছুই নেই। এখন বল, আমি শ্রেষ্ঠ এবং অনুসরণযোগ্য, না মূসা?) বরং আমিই তো শ্রেষ্ঠ এ ব্যক্তি থেকে (অর্থাৎ, মূসা থেকে) যে (ধন-সম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তিতে) নীচ (লোক) এবং কথা বলতেও

অক্ষম। (সে যদি নিজেকে পয়গম্বর বলে, তবে) তাকে (অর্থাৎ, তার হাতে) কেন স্বর্ণবলয় পরিধান করানো হল না (যেমন, দুনিয়ার বাদশাহ্‌দের রীতি এই যে, কেউ কোন ব্যক্তির প্রতি বিশেষ কৃপা করলে তারা তাকে দরবারে-আমে স্বর্ণবলয় পরিধান করায়। উদ্দেশ্য এই যে, এ ব্যক্তি নবুয়ত পেয়ে থাকলে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তার হাতে স্বর্ণবলয় পরানো হত।) অথবা তার সাথে ফেরেশতাগণ দল বেঁধে আগমন করত (যেমন, শাহী ওমরাহদের মিছিল এমনিভাবে বের হয়।) মোটকথা সে (এসব কথাবার্তা বলে) তার সম্প্রদায়কে বোকা বানিয়ে দিল, ফলে তারা তার কথা মেনে নিল। তারা (পূর্ব থেকেও) ছিল পাপাচারী সম্প্রদায়। (তাই ফেরাউনের কথার বেশি প্রতিক্রিয়া হল।) অতপর যখন তারা (উপর্যুপরি কুফর ও হঠকারিতা করে) আমাকে ক্রোধান্বিত করল, তখন আমি তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিলাম এবং তাদের সবাইকে নিমজ্জিত করলাম। অতপর আমি তাদেরকে করে দিলাম অতীত লোক ও পরবর্তী-দের জন্য দৃষ্টান্ত ("অতীত লোক" করার অর্থ এই যে, মানুষ তাদের কাহিনী স্মরণ করে একে অপরকে শিক্ষা দেয় যে, দেখ, আগেকার লোকদের মধ্যে এমন লোকও ছিল এবং তাদের এই অবস্থা ছিল)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

হযরত মূসা (আ)-র ঘটনা পূর্বে বারবার উল্লিখিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াত-সমূহে বর্ণিত ঘটনা বিস্তারিতভাবে সূরা আ'রাফে বিবৃত হয়েছে। এখানে তাঁর ঘটনা স্মরণ করানোর উদ্দেশ্য এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) ধনাঢ্য ছিলেন না বলে কাফিররা তাঁর নবুয়তে যে সন্দেহ করত, তা কোন নতুন নয়, বরং ফেরাউন ও তার সভাসদরা এমন সন্দেহ মূসা (আ)-র নবুয়তেও করেছিল। ফেরাউনের বক্তব্য ছিল এই যে, আমি মিসর সাম্রাজ্যের অধিপতি, আমার প্রাসাদসমূহের পাদদেশে নদ-নদী প্রবাহিত, ফলে আমি মূসা (আ) থেকে শ্রেষ্ঠ। কাজেই আমাকে বাদ দিয়ে সে কিরূপে নবুয়ত লাভ করতে পারে? কিন্তু তার এই সন্দেহ যেমন তার কোন কাজে আসল না, সে সম্প্রদায়সহ নিমজ্জিত হল, তেমনি মক্কার কাফিরদের আপত্তিও তাদেরকে ইহকাল ও পরকালের শাস্তি থেকে পরিত্রাণ দেবে না।

وَلَا يَكَادُ يُبِينُ—(এবং সে কথারও শক্তি রাখে না) যদিও মূসা (আ)-র দোয়ার ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর মুখের তোতলামী দূর করে দিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর পূর্বাবস্থাই ফিরাউনের মনে ছিল। তাই সে মূসা (আ)-র প্রতি এই দোষ আরোপ করল। এখানে "কথা বলার শক্তি" বলে প্রমাণাদির সাবলীলতা ও প্রাঞ্জলতাও বোঝানো যেতে পারে। ফিরাউনের উদ্দেশ্য ছিল এই যে, আমাকে সন্তুষ্ট করার মত পর্যাপ্ত প্রমাণ মূসা (আ)-র কাছে নেই। অথচ এটা ছিল ফিরাউনের নিছক অপবাদ। নতুবা মূসা (আ) দলীল-প্রমাণের সাহায্যে ফিরাউনকে চূড়ান্তরূপে লা জওয়াব করে দিয়েছেন।—(তফসীরে কবীর, রূহুল মা'আনী)

فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ—এর দু'রকম অনুবাদ হতে পারে। এক—ফিরাউন তার সম্প্রদায়কে সহজেই তার অনুগত করে নিল—طلب منهم الخفة فى مطا و عته। দুই—সে তার সম্প্রদায়কে বেওকুফ পেল وجدهم خفيفة احلامهم—(রূহুল-মা'আনী)

فَلَمَّا آسَفُونَا—এটা اسف থেকে উদ্ভূত। আভিধানিক অর্থ অনুতাপ। কাজেই বাক্যের শাব্দিক অর্থ, "অতপর যখন তারা আমাকে অনুতপ্ত করল। অনুতাপ ক্রোধের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। তাই এর পারিভাষিক অনুবাদ সাধারণত এভাবে করা হয়—যখন তারা আমাকে ক্রোধান্বিত করল। আল্লাহ্ তা'আলা অনুতাপ ও ক্রোধের প্রতিক্রিয়ামূলক অবস্থা থেকে পবিত্র। তাই এর অর্থ হবে, তারা এমন কাজ করল যদ্দরুন আমি তাদেরকে শাস্তিদানের সংকল্প গ্রহণ করলাম।—(রূহুল মা'আনী)

وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿٥٧﴾ وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ ۚ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴿٥٨﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿٥٩﴾ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ ﴿٦٠﴾ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ ۚ هَٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٦١﴾ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ ۖ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿٦٢﴾ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿٦٣﴾ إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۚ هَٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٦٤﴾ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ ۖ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ ﴿٦٥﴾

---

(৫৭) যখনই মরিয়ম-তনয়ের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হল, তখনই আপনার সম্প্রদায় হট্টগোল শুরু করে দিল। (৫৮) এবং বলল, আমাদের উপাস্যরা শ্রেষ্ঠ, না সে ? তারা

আপনার সামনে যে উদাহরণ উপস্থাপন করে তা কেবল বিতর্কের জন্যই করে। বস্তুত তারা হল এক বিতর্ককারী সম্প্রদায়। (৫৯) সে তো এক বান্দাই বটে, আমি তার প্রতি অনুগ্রহ করেছি এবং তাকে করেছি বনী ইসরাঈলের জন্য আদর্শ। (৬০) আমি ইচ্ছা করলে তোমাদের থেকে ফেরেশতা সৃষ্টি করতাম, যারা পৃথিবীতে একের পর এক বসবাস করত। (৬১) সুতরাং তা'হল কিয়ামতের নিদর্শন। কাজেই তোমরা কিয়ামতে সন্দেহ করো না এবং আমার কথা মান। এটা এক সরল পথ। (৬২) শয়তান যেন তোমাদেরকে নিবৃত্ত না করে। সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (৬৩) ঈসা যখন স্পষ্ট নিদর্শনসহ আগমন করল, তখন বলল, আমি তোমাদের কাছে প্রজ্ঞা নিয়ে এসেছি এবং তোমরা যে কোন কোন বিষয়ে মতভেদ করছ তা ব্যক্ত করার জন্য এসেছি। অতএব তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং আমার কথা মান। (৬৪) নিশ্চয় আল্লাহ্ই আমার পালনকর্তা ও তোমাদের পালনকর্তা। অতএব তাঁর ইবাদত কর। এটা হল সরল পথ। (৬৫) অতপর তাদের মধ্য থেকে বিভিন্ন দল মতভেদ সৃষ্টি করল। সুতরাং জালিমদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক দিবসের আযাবের দুর্ভোগ।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

[একবার রসূলুল্লাহ্ (স) বলেছিলেন, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যায়ভাবে যাদের পূজা করা হয়, তাদের কারও মধ্যেই কল্যাণ নেই। একথা শুনে কুরাইশদের কেউ কেউ আপত্তি তুলল যে, খৃস্টানরা হযরত ঈসা (আ)-র পূজা করে, অথচ তাঁর সম্পর্কে আপনিও বলেন যে, তিনি ছিলেন কল্যাণময়। এর জওয়াবে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,] যখন মরিয়ম-তনয় [ঈসা (আ)] সম্পর্কে (জনৈক আপত্তিকারীর পক্ষ থেকে) এক অদ্ভুত দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হল, (অদ্ভুত এ কারণে যে, বাহ্য দৃষ্টিতেই স্বয়ং তারা এর অসারতা জানতে পারত। সুতরাং বুদ্ধিমান হয়ে এরূপ আপত্তি করা অদ্ভুতই ছিল বটে। মোটকথা, যখন এই আপত্তি তোলা হয়,) তখন আপনার সম্প্রদায় আনন্দের আতিশয্যে হট্টগোল শুরু করে দিল এবং (আপত্তিকারীর সাথে একমত হয়ে) বলতে থাকে (বলুন, আপনার মতে) আমাদের উপাস্য দেবতাগুলো শ্রেষ্ঠ, না সে (অর্থাৎ ঈসা শ্রেষ্ঠ)? (উদ্দেশ্য এই যে, আপনি ঈসা (আ)-কে তো অবশ্যই শ্রেষ্ঠ মনে করেন, অথচ আপনিই বলেছিলেন যে, আল্লাহ্ ব্যতীত যাদের পূজা করা হয়, তাদের মধ্যে কোন কল্যাণ নেই। কাজেই ঈসা (আ)-র মধ্যেও কোন কল্যাণ না থাকা জরুরী হয়ে পড়ে। সুতরাং আপনার উক্তি যথার্থ নয়। আরো জানা গেল যে, আপনি যাদেরকে শ্রেষ্ঠ বলেন, তাদেরও পূজা করা হয়েছে। এতে শিরকের বিশুদ্ধতাই প্রমাণিত হয়। অতপর এ আপত্তির প্রথমে সংক্ষেপে ও পরে বিস্তারিতভাবে জওয়াব দেওয়া হয়েছে। সংক্ষেপে এই ঃ) তারা কেবল বিতর্কের জন্যই এটা (অর্থাৎ অদ্ভুত আপত্তি) বর্ণনা করে (সত্যান্বেষণের খাতিরে নয়, নতুবা স্বয়ং তারাও এর অসারতা জানে। তাদের বিতর্ক কেবল এতেই সীমিত নয়), বরং তারা (অভ্যাসগতভাবেই) এক বিতর্ককারী সম্প্রদায়। (অধিকাংশ সত্য বিষয়ে বিতর্ক উদ্ভাবন করে। অতপর বিস্তারিত জওয়াব এই ঃ)

ঈসা (আ) তো এক বান্দাই বটে, যার প্রতি আমি (নবুয়ত দিয়ে) অনুগ্রহ করেছি এবং বনী ইসরাঈলের জন্য (প্রথমে ও অন্যদের জন্য পরে আমার) কুদরতের এক নমুনা করেছি (যাতে মানুষ বুঝে নেয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা পিতা ছাড়াই সৃষ্টি করতে পারেন। এতে তাদের উভয় আপত্তির জওয়াব হয়ে গেছে। আমি তো আরও আশ্চর্যজনক কাজ করতে সক্ষম। সেমতে) আমি ইচ্ছা করলে তোমাদের মধ্য থেকে ফেরেশতা সৃষ্টি করতাম (যেমন তোমাদের মধ্য থেকে সন্তান জন্মগ্রহণ করে। যারা পৃথিবীতে (মানুষের ন্যায়) একের পর এক বসবাস করত (অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যু উভয়ই মানুষের মত হত। সুতরাং পিতা ব্যতীত সৃষ্টি করার দরুন জরুরী হয় না যে, ঈসা (আ) আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁর ক্ষমতাধীন হবেন না। কাজেই এটা তার পূজনীয় হওয়ার দলীল নয়। বরং এভাবে সৃষ্টি করার এক রহস্য তো উপরে বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় রহস্য এই যে,) তিনি (অর্থাৎ ঈসা, এভাবে জন্মগ্রহণ করার মধ্যে) কিয়ামতের (সম্ভাব্যতার) নিদর্শন। [অর্থাৎ ঈসা (আ)-র পিতা ব্যতীত জন্মগ্রহণ একটি অস্বাভাবিক ঘটনা। এটা যখন সম্ভবপর হল, তখন কিয়া-মতে পুনরুজ্জীবনের অস্বাভাবিক ঘটনাও সম্ভবপর। সুতরাং এতে কিয়ামত ও পরকাল বিশ্বাসের বিশুদ্ধতা প্রমাণিত হয়ে যায়) কাজেই তোমরা কিয়ামতে (অর্থাৎ তার বিশুদ্ধ-তায়) সন্দেহ করো না এবং (তওহীদ ও পরকাল ইত্যাদি ব্যাপারে) আমার কথা মান। এটা সরল পথ। শয়তান যেন তোমাদেরকে (এ পথে আসা থেকে) নিবৃত্ত না করে। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। [অতপর স্বয়ং ঈসা (আ)-র দাওয়াতের বিষয়বস্তুকে তওহীদের প্রমাণ ও শিরকের খণ্ডনে পেশ করা হয়েছে।] যখন ঈসা (আ) স্পষ্ট মু'জিযা নিয়ে আগমন করলেন, তখন (লোকদেরকে) বললেন, আমি তোমাদের কাছে প্রজ্ঞা নিয়ে এসেছি, (তোমাদের বিশ্বাস ঠিক করার জন্য) এবং তোমরা যে কোন কোন (হালাল ও হারাম কর্মের) বিষয়ে মতভেদ কর, তা ব্যক্ত করার জন্য এসেছি। (ফলে মতভেদ ও সন্দেহ দূর হয়ে যাবে।) অতএব তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর (এবং আমার নবুয়ত অস্বীকার করো না। এটা আল্লাহ্‌র বিরোধিতা) এবং আমার কথা মান। (তিনি আরও বললেন নিশ্চয়) আল্লাহ্‌ই আমার ও তোমাদের পালনকর্তা। অতএব (কেবল তাঁরই ইবাদত কর।) এটাই (তওহীদের) সরল পথ। অতপর [ঈসা (আ)-র এই স্পষ্ট বর্ণনা সত্ত্বেও] তাদের বিভিন্ন দল (এ সম্পর্কে) মতভেদ সৃষ্টি করল। (অর্থাৎ তওহীদের বিরুদ্ধে নানা রকম মযহাব তৈরি করে নিল। সেমতে তওহীদ সম্পর্কে খৃস্টান ও অখৃস্টান-দের মতভেদ সুবিদিত।) সুতরাং জালিমদের (অর্থাৎ কিতাবী মুশরিক ও অকিতাবী মুশরিকদের) জন্য রয়েছে এক যন্ত্রণাদায়ক দিবসের আযাবের দুর্ভোগ। [ঈসা (আ)-র এই দাওয়াতে তওহীদের সমর্থন রয়েছে। সুতরাং তার অন্যায় পূজা দ্বারা শিরকের বিশুদ্ধতা প্রমাণ করা——"বাদী নীরব-সাক্ষী সরব' এর মতই ব্যাপার নয় কি)!

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ——এসব আয়াতের

শানে নুযূলে তফসীরবিদগণ তিন প্রকার রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন। প্রথম এই যে, একবার রসূলুল্লাহ্ (সা) কুরাইশদেরকে সম্বোধন করে বললেন: يا معشر قريش لا خير فى احد يعبد من دون الله ---অর্থাৎ হে কুরাইশগণ, আল্লাহ্ ব্যতীত যারই ইবাদত করা হয়, তার মধ্যে কোন মঙ্গল নেই। কুরাইশরা বলল, খৃস্টানরা হযরত ঈসা (আ)-র ইবাদত করে; কিন্তু আপনি নিজেই বলেন যে, তিনি আল্লাহ্ তা'আলার সৎকর্মপরায়ণ বান্দা ও নবী ছিলেন। তাদের এই আপত্তির জওয়াবে আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে।---(কুরতুবী)

দ্বিতীয় রেওয়ায়েত এই যে, কোরআন পাকের আয়াত ---انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم--- (তোমরা নিজেরা এবং তোমরা যেসব প্রতিমার পূজা কর, তারা জাহান্নামের ইন্ধন হবে) আয়াতটি অবতীর্ণ হলে আবদুল্লাহ্ ইবনুযযিবা'রা (যে তখনও কাফির ছিল) বলল, আমার কাছে এ আয়াতের চমৎকার জওয়াব রয়েছে। তা এই যে, খৃস্টানরা হযরত ঈসা (আ)-র ইবাদত করে এবং ইহুদীরা হযরত ওযায়ের (আ)-এর পূজা করে। অতএব তাঁরা উভয়েই কি জাহান্নামের ইন্ধন হবে? একথা শুনে মুশরিক কুরাইশরা খুবই আনন্দিত হল। এর জওয়াবে আল্লাহ্ তা'আলা ---ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون--- আয়াত এবং সূরা যুখরুফের আলোচ্য আয়াত নাযিল করলেন।---(ইবনে কাসীর)

তৃতীয় রেওয়ায়েত এই যে, একবার মক্কার মুশরিকরা মিছা-মিছিই প্রচার করতে লাগল যে, মুহাম্মদ (সা) খোদায়ী দাবি করার ইচ্ছা রাখেন। তাঁর বাসনা এই যে, খৃস্টানরা যেমন হযরত ঈসা (আ)-র পূজা করে, এমনিভাবে আমরাও তাঁর পূজা করি। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়। প্রকৃতপক্ষে রেওয়ায়েত তিনটির মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। কাফিররা সবগুলো কথাই বলে থাকবে, যার জওয়াবে আল্লাহ্ তা'আলা এমন আয়াত নাযিল করেন, যাতে তিন আপত্তির জওয়াব হয়ে যায়। আয়াতসমূহে সর্বশেষ আপত্তির জওয়াব সুস্পষ্ট। কেননা, যারা হযরত ঈসা (আ)-র ইবাদত শুরু করেছে, তারা তা আল্লাহ্র কোন আদেশ বলে করেনি এবং ঈসা (আ)-রও বাসনা ছিল না, কোরআনও তাদের সমর্থন করে না। পিতা ব্যতীত জন্মগ্রহণের কারণে তারা ঈসা (আ) সম্পর্কে এই বিভ্রান্তিতে পতিত হয়েছে। কোরআন এ বিভ্রান্তি প্রবলভাবে খণ্ডন করে। এমতাবস্থায় এটা কেমন করে সম্ভবপর যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) খৃস্টানদের দেখাদেখি নিজেও খোদায়ী দাবি করে বসবেন?

প্রথম ও দ্বিতীয় রেওয়ায়েতে কাফিরদের আপত্তির সারমর্ম প্রায় এক। আলোচ্য আয়াত থেকে এর জওয়াব এভাবে বের হয়, যারা জাহান্নামের ইন্ধন হবে এবং

যাদের মধ্যে কোন মঙ্গল নেই, তারা হয় নিষ্প্রাণ উপাস্য, যেমন, পাথরের মূর্তি, না হয় প্রাণী; কিন্তু নিজেই নিজের ইবাদতের আদেশ দেয় কিংবা তা পছন্দ করে, যেমন, শয়তান, ফিরাউন, নমরূদ প্রভৃতি। হযরত ঈসা (আ) তাদের অন্তর্ভুক্ত নন। কেননা, তিনি কোন পর্যায়ে নিজের ইবাদত পছন্দ করতেন না। খৃস্টানরা তাঁর কোন নির্দেশের কারণে তাঁর ইবাদত করে না, বরং তাঁকে আমি আমার কুদরতের এক নিদর্শন করে পিতা ব্যতীত সৃষ্টি করেছিলাম, যাতে মানুষ জানে যে, আল্লাহ্ তা'আলা কোন মাধ্যম ব্যতিরেকেও সৃষ্টি করতে সক্ষম। কিন্তু খৃস্টানরা এর ভুল অর্থ নিয়ে তাকে উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে। অথচ এটা স্বয়ং ঈসা (আ)-র দাওয়াতের পরিপন্থী ছিল। তিনি সর্বদা তওহীদ শিক্ষা দিয়েছেন। মোটকথায়, ইবাদতে তাঁর অসন্তুষ্টির কারণে তাঁকে অন্যান্য উপাস্যের কাতারে শামিল করা যায় না।

এতে তফসীরের সারসংক্ষেপে বর্ণিত কাফিরদের আরও একটি আপত্তির জওয়াব হয়ে গেছে। তা এই যে, আপনি নিজে যাকে শ্রেষ্ঠ বলেন [অর্থাৎ ঈসা (আ)] তাঁরও তো ইবাদত হয়েছে। সুতরাং আল্লাহ্ ব্যতীত অপরের ইবাদত মন্দ নয়। আয়াতে এর জওয়াব সুস্পষ্ট যে, ঈসা (আ)-র ইবাদত আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছারও বিরুদ্ধে ছিল এবং স্বয়ং ঈসা (আ)-র দাওয়াতেরও পরিপন্থী ছিল। কাজেই এর মাধ্যমে শিরকের বিশুদ্ধতা প্রমাণ করা যায় না।

وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ——এটা খৃস্টানদের সে বিভ্রান্তির জওয়াব, যার ভিত্তিতে তারা ঈসা (আ)-কে উপাস্য স্থির করেছিল। পিতা ব্যতীত জন্মগ্রহণের বিষয়টিকে তারা তাঁর খোদায়ীর প্রমাণস্বরূপ পেশ করেছিল। আল্লাহ্ তা'আলা এর খণ্ডনে বলেন, এটা তো নিছক আমার কুদরতের এক প্রদর্শনী ছিল। আমি স্বভাবাতীত কাজ করারও ক্ষমতা রাখি। পিতা ব্যতীত জন্মগ্রহণ করা খুব বেশি স্বভাবাতীত কাজ নয়। কেননা হযরত আদমকে পিতা-মাতা ব্যতীত সৃষ্টি করা হয়েছে। আমি ইচ্ছা করলে এমন কাজও করতে পারি, যার নযীর এ পর্যন্ত কায়েম হয়নি। অর্থাৎ মানুষের ঔরসে ফেরেশতাও সৃষ্টি করতে পারি।

وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ——[এবং নিঃসন্দেহে হযরত ঈসা (আ) কিয়ামতে বিশ্বাস স্থাপন করার একটি উপায়।] এর দু'রকম তফসীর করা হয়েছে। তফসীরের সারসংক্ষেপে উল্লিখিত প্রথম তফসীর এই যে, হযরত ঈসা (আ) অভ্যাসের বিপরীতে পিতা ব্যতীত জন্মগ্রহণ করেছেন, এটা এ বিষয়ের দলীল যে, আল্লাহ্ তা'আলা বাহ্যিক কারণ ব্যতিরেকেও মানুষ সৃষ্টি করতে পারেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, মৃতদেরকে পুনরুজ্জীবন দান করা তাঁর জন্য মোটেই কঠিন নয়। কিন্তু অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, হযরত ঈসা (আ)-র পুনরায় আকাশ থেকে অবতরণ

কিয়ামতের আলামত। সেমতে শেষ যুগে তাঁর পুনরাগমন ও দাজ্জাল হত্যা মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে। সূরা মায়েদায় এ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

وَلِأُبَيِّنَ لَكُم بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ —(এবং যাতে আমি তোমাদের কোন কোন বিরোধপূর্ণ বিষয় বর্ণনা করে দেই।) বনী ইসরাঈলের মধ্যে হঠকারিতা প্রবল আকার ধারণ করেছিল। তাই তারা কোন কোন বিধি-বিধান বিকৃত করে দিয়েছিল। হযরত ঈসা (আ) সেগুলোর স্বরূপ তুলে ধরেন। 'কোন কোন' বলার কারণ এই যে, কোন কোন বিষয় একান্তই পার্থিব ছিল। তাই তিনি সেগুলোর মতভেদ দূর করার প্রয়োজন মনে করেন নি।—(বয়ানুল কোরআন)

هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٦٦﴾ الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ ﴿٦٧﴾ يَا عِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ ﴿٦٨﴾ الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ﴿٦٩﴾ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ ﴿٧٠﴾ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ ۖ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ ۖ وَأَنتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٧١﴾ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٧٢﴾ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٧٣﴾ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴿٧٤﴾ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿٧٥﴾ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ ﴿٧٦﴾ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ۖ قَالَ إِنَّكُم مَّاكِثُونَ ﴿٧٧﴾

---

(৬৬) তারা কেবল কিয়ামতেরই অপেক্ষা করছে যে, আকস্মিকভাবে তাদের কাছে এসে যাবে এবং তারা খবরও রাখবে না। (৬৭) বন্ধুবর্গ সেদিন একে অপরের শত্রু হবে, তবে আল্লাহ্‌ভীরুরা নয়। (৬৮) হে আমার বান্দাগণ, তোমাদের আজ কোন

ভয় নেই এবং তোমরা দুঃখিতও হবে না। (৬৯) তোমরা আমার আয়াতসমূহে বিশ্বাস স্থাপন করেছিলে এবং তোমরা আজ্ঞাবহ ছিলে। (৭০) জান্নাতে প্রবেশ কর তোমরা এবং তোমাদের বিবিগণ সানন্দে। (৭১) তাদের কাছে পরিবেশন করা হবে স্বর্ণের থালা ও পানপাত্র এবং তথায় রয়েছে মনে যা চায় এবং নয়ন যাতে তৃপ্ত হয়। তোমরা তথায় চিরকাল থাকবে। (৭২) এই যে জান্নাতের উত্তরাধিকারী তোমরা হয়েছ, এটা তোমাদের কর্মের ফল। (৭৩) তথায় তোমাদের জন্য আছে প্রচুর ফলমূল, তা থেকে তোমরা আহার করবে। (৭৪) নিশ্চয় অপরাধীরা জাহান্নামের আযাবে চিরকাল থাকবে। (৭৫) তাদের থেকে আযাব লাঘব করা হবে না এবং তারা তাতেই থাকবে হতাশ হয়ে। (৭৬) আমি তাদের প্রতি জুলুম করিনি; কিন্তু তারাই ছিল জালিম। (৭৭) তারা ডেকে বলবে, হে মালিক, পালনকর্তা আমাদের কিস্সাই শেষ করে দিন। সে বলবে, নিশ্চয় তোমরা চিরকাল থাকবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তারা (সত্য সুস্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও যে মিথ্যাকে আঁকড়ে আছে, এতে করে তারা) কেবল কিয়ামতেরই অপেক্ষা করছে যে, আকস্মিকভাবে তাদের কাছে এসে যাবে অথচ তারা খবরও রাখবে না। (তাদের অপেক্ষার অর্থ এই যে, তারা যেন চোখে না দেখে মানবে না। সেদিন কিয়ামতের ঘটনা এই যে,) বন্ধুবর্গ সেদিন একে অপরের শত্রু হয়ে যাবে, তবে আল্লাহ্ভীরুরা নয়। (কেননা সেদিন মিথ্যা বন্ধুত্বের ক্ষতি অনুভূত হবে। ফলে বন্ধুদের প্রতি ঘৃণা হবে। পক্ষান্তরে সত্য বন্ধুত্বের উপকার ও সওয়াব অনুভূত হবে। তাই তা অক্ষয় থাকবে। মু'মিনদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে বলা হবে---) হে আমার বান্দাগণ, আজ তোমাদের কোন ভয় নেই এবং তোমরা দুঃখিতও হবে না; (অর্থাৎ সেই বান্দা,) যারা আমার আয়াতে বিশ্বাস স্থাপন করেছিল এবং (জ্ঞানে ও কর্মে আমার) আজ্ঞাবহ ছিল। তোমরা এবং তোমাদের (মু'মিন) সহধর্মিণীরা আনন্দে জান্নাতে প্রবেশ কর (জান্নাতে যাওয়ার পর) তাদের কাছে পরিবেশন করা হবে স্বর্ণের থালা (খাদ্যবস্তুতে পরিপূর্ণ) এবং গ্লাস (পানীয় দ্বারা পরিপূর্ণ স্বর্ণের অথবা অন্য কোন ধাতুর। এগুলো জান্নাতী বালকরা পরিবেশন করবে।) তথায় পাওয়া যাবে মনে যা চায় এবং নয়ন যাতে তৃপ্ত হয়। (তাদেরকে বলা হবে,) তোমরা তথায় চিরকাল থাকবে। (আরও বলা হবে,) তোমরা এই জান্নাতের মালিক হয়ে গেছ তোমাদের (সৎ) কর্মের বিনিময়ে। (তোমাদের কাছ থেকে কখনও এটি ফেরত নেওয়া হবে না) তথায় তোমাদের জন্য রয়েছে প্রচুর ফলমূল, তা থেকে তোমরা আহার করবে। (এরপর কাফিরদের কথা বলা হয়েছে) নিশ্চয় অবাধ্যরা (অর্থাৎ কাফিররা) জাহান্নামের আযাবে চিরকাল থাকবে। তা (অর্থাৎ সে আযাব) তাদের থেকে লাঘব করা হবে না। তারা তাতেই হতাশ হয়ে পড়ে থাকবে। (অতপর আল্লাহ্ বলেন,) আমি তাদের প্রতি বিন্দুমাত্রও জুলুম করিনি (অর্থাৎ অন্যায়ভাবে আযাব দেইনি) কিন্তু তারাই ছিল জালিম (কুফর ও শিরক করে নিজেদের ক্ষতি

করেছে। অতপর তাদের অবশিষ্ট অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যে, সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে) তারা (মৃত্যু কামনা করবে এবং জাহান্নামের রক্ষী মালিক ফেরেশতাকে) ডেকে বলবে, হে মালিক, (তুমিই দোয়া কর) তোমার পালনকর্তা আমাদের জীবনই শেষ করে দিন। সে (অর্থাৎ মালিক) বলবে, তোমরা চিরকাল (এভাবেই) থাকবে (মরবে না)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

প্রকৃত বন্ধুত্ব তা-ই, যা আল্লাহর ওয়াস্তে হয় ঃ اَلْاَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اِلَّا الْمُتَّقِيْنَ —(আল্লাহ্ ভীরুদের ছাড়া সকল বন্ধুই সেদিন একে অপরের শত্রু হয়ে যাবে।) এ আয়াত পরিষ্কার ব্যক্ত করেছে যে, মানুষ যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক নিয়ে দুনিয়াতে গর্ব করে এবং যার জন্য হালাল ও হারাম এক করে দেয়, কিয়ামতের দিন সে সম্পর্ক কেবল নিষ্ফলই হবে না, বরং শত্রুতায় পর্যবসিত হবে। হাফেয ইবনে কাসীর এ আয়াতের তফসীরে হযরত আলী (রা)-র উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে, দুই মু'মিন বন্ধু ছিল এবং দুই কাফির বন্ধু। মু'মিন বন্ধুদ্বয়ের মধ্যে একজনের ইন্তিকাল হলে তাকে জান্নাতের সুসংবাদ শুনানো হল। তখন তার আজীবন বন্ধুর কথা মনে পড়লে সে দোয়া করল,—ইয়া আল্লাহ্, আমার অমুক বন্ধু আমাকে আপনার ও আপনার রসূলের আনুগত্য করার আদেশ দিত, সৎ কাজে উৎসাহ দিত, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করত এবং আপনার সাথে সাক্ষাতের বিষয় স্মরণ করিয়ে দিত। কাজেই হে আল্লাহ্, আমার পরে তাকে পথভ্রষ্ট করবেন না, যাতে সেও জান্নাতের দৃশ্য দেখতে পারে, যা আপনি আমাকে দেখিয়েছেন। আপনি আমার প্রতি যেমন সন্তুষ্ট, তার প্রতিও তেমনি সন্তুষ্ট হোন। এই দোয়ার জওয়াবে তাকে বলা হবে, যাও, তোমার বন্ধুর জন্য আমি যে পুরস্কার ও সওয়াব রেখেছি, তা যদি তুমি জানতে পার তবে কাঁদবে কম, হাসবে বেশি। এরপর অপর বন্ধুর ইন্তিকাল হয়ে গেলে উভয়ের রূহ্ একত্রিত হবে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে বলবেন, তোমরা একে অপরের প্রশংসা কর। তখন তাদের প্রত্যেকেই অপরের সম্পর্কে বলবে, সে শ্রেষ্ঠ ভাই, শ্রেষ্ঠ সঙ্গী ও শ্রেষ্ঠ বন্ধু।

এর বিপরীতে কাফির বন্ধুদ্বয়ের মধ্যে একজন মারা গেলে তাকে জাহান্নামের ঠিকানা জানানো হবে। তখন তার বন্ধুর কথা মনে পড়বে এবং সে দোয়া করবে, ইয়া আল্লাহ্, আমার অমুক বন্ধু আমাকে আপনার ও আপনার রসূলের অবাধ্যতা করার আদেশ দিত, মন্দ কাজে উৎসাহ দিত এবং ভাল কাজে বাধা দিত। সে আমাকে বলত যে, আমি কখনও আপনার কাছে হাযির হব না। কাজেই হে আল্লাহ্, আমার পরে তাকে হিদায়ত দেবেন না, যাতে সেও জাহান্নামের দৃশ্য দেখে, যা আপনি আমাকে দেখিয়েছেন। আপনি আমার প্রতি যেমন অসন্তুষ্ট, তেমনি তার প্রতিও অসন্তুষ্ট থাকুন। এরপর অপর বন্ধুরও মৃত্যু হয়ে যাবে এবং উভয়ের রূহ্

একত্রিত হবে। তাদেরকে বলা হবে, তোমরা একে অপরের সংজ্ঞা বর্ণনা কর। তখন তাদের প্রত্যেকেই পরস্পরের সম্পর্কে বলবে, সে নিকৃষ্ট ভাই, নিকৃষ্ট সঙ্গী এবং নিকৃষ্ট বন্ধু। এ কারণেই ইহকাল ও পরকাল—এ উভয় দিক বিচারে উৎকৃষ্ট বন্ধুত্ব তাই, যা আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে হয়। যে দু'জন মুসলমানের মধ্যে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে বন্ধুত্ব হয়, তাদের ফযীলত ও মহত্ত্ব অনেক হাদীসে বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে একটি এই যে, হাশরের ময়দানে তারা আল্লাহ্‌র আরশের ছায়াতলে থাকবে। 'আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে' বন্ধুত্বের অর্থ অপরের সাথে কেবল সত্যিকার ধর্মপরায়ণতার ভিত্তিতে সম্পর্ক স্থাপন করা। সেমতে ধর্মীয় শিক্ষার ওস্তাদ, শায়েখ, মুর্শিদ, আলিম ও আল্লাহ্ ভক্তদের প্রতি এবং সারা মুসলিম বিশ্বের মুসলমানদের প্রতি নিঃস্বার্থ মুহাব্বত পোষণ করা এর অন্তর্ভুক্ত।

لَقَدْ جِئْنٰكُمْ بِالْحَقِّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كٰرِهُوْنَ ﴿٧٨﴾ اَمْ اَبْرَمُوْٓا
اَمْرًا فَاِنَّا مُبْرِمُوْنَ ﴿٧٩﴾ اَمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوٰىهُمْ ؕ بَلٰى
وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُوْنَ ﴿٨٠﴾ قُلْ اِنْ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ وَلَدٌ ۖۗ فَاَنَا اَوَّلُ
الْعٰبِدِيْنَ ﴿٨١﴾ سُبْحٰنَ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿٨٢﴾
فَذَرْهُمْ يَخُوْضُوْا وَيَلْعَبُوْا حَتّٰى يُلٰقُوْا يَوْمَهُمُ الَّذِيْ يُوْعَدُوْنَ ﴿٨٣﴾
وَهُوَ الَّذِيْ فِي السَّمَآءِ اِلٰهٌ وَّفِي الْاَرْضِ اِلٰهٌ ؕ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْعَلِيْمُ ﴿٨٤﴾
وَتَبٰرَكَ الَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ وَعِنْدَهٗ
عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٨٥﴾ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ
مِنْ دُوْنِهِ الشَّفَاعَةَ اِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿٨٦﴾
وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ فَاَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ﴿٨٧﴾ وَقِيْلِهٖ
يٰرَبِّ اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٨٨﴾ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلٰمٌ ؕ
فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ﴿٨٩﴾

(৭৮) আমি তোমাদের কাছে সত্য ধর্ম পৌঁছিয়েছি ; কিন্তু তোমাদের অধিকাংশই সত্যধর্মে নিস্পৃহ। (৭৯) তারা কি কোন ব্যবস্থা চূড়ান্ত করেছে? তাহলে আমিও এক ব্যবস্থা চূড়ান্ত করেছি। (৮০) তারা কি মনে করে যে, আমি তাদের গোপন বিষয় ও গোপন পরামর্শ শুনি না? হ্যাঁ, শুনি। আমার ফেরেশতাগণ তাদের নিকটে থেকে লিপিবদ্ধ করে। (৮১) বলুন, দয়াময় আল্লাহ্‌র কোন সন্তান থাকলে আমি সর্বপ্রথম তাঁর ইবাদত করব। (৮২) তারা যা বর্ণনা করে, তা থেকে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের পালনকর্তা, আরশের পালনকর্তা পবিত্র। (৮৩) অতএব তাদেরকে বাকচাতুরী ও ক্রীড়াকৌতুক করতে দিন সেই দিবসের সাক্ষাৎ পর্যন্ত, যার ওয়াদা তাদেরকে দেওয়া হয়। (৮৪) তিনিই উপাস্য নভোমণ্ডলে এবং তিনিই উপাস্য ভূমণ্ডলে। তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ। (৮৫) বরকতময় তিনিই, নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সব কিছু যার। তাঁরই কাছে আছে কিয়ামতের জ্ঞান এবং তাঁরই দিকে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। (৮৬) তিনি ব্যতীত তারা যাদের পূজা করে, তারা সুপারিশের অধিকারী হবে না, তবে যারা সত্য স্বীকার করত ও বিশ্বাস করত। (৮৭) যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তবে অবশ্যই তারা বলবে, আল্লাহ্। অতপর তারা কোথায় ফিরে যাচ্ছে? (৮৮) রসূলের এই উক্তির কসম, হে আমার পালনকর্তা, এ সম্প্রদায় তো বিশ্বাস স্থাপন করে না। (৮৯) অতএব আপনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন এবং বলুন, 'সালাম'। তারা শীঘ্রই জানতে পারবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(উপরে বর্ণিত শাস্তির কারণ এই যে,) আমি (তওহীদ ও রিসালতের বিশ্বাস সম্বলিত) সত্য ধর্ম তোমাদের পৌঁছিয়েছি, কিন্তু তোমাদের অধিকাংশই সত্য ধর্মের প্রতি ঘৃণা পোষণ করে। ("অধিকাংশ" বলার এক কারণ এই যে, কিছু লোক ভবিষ্যতে বিশ্বাস স্থাপনকারী ছিল। দ্বিতীয় কারণ, যথার্থ অর্থে কিছু লোকেই ঘৃণা পোষণ করত, আর কিছু লোক দেখাদেখি সত্য ধর্মের প্রতি বিমুখ ছিল। এই ঘৃণা রসূলের বিরোধিতা ও তওহীদের বিরোধিতা উভয় ক্ষেত্রেই ব্যাপক। অতপর উভয়ের বিবরণ দেওয়া হয়েছে—) তারা কি (রসূলের ক্ষতিসাধনের জন্য) কোন ব্যবস্থা চূড়ান্ত করেছে? তাহলে আমিও এক ব্যবস্থা চূড়ান্ত করেছি। (বলা বাহুল্য, আল্লাহ্‌র ব্যবস্থার সামনে তাদের ব্যবস্থা অচল। সেমতে তিনি বিপদমুক্ত থাকেন এবং তারা ব্যর্থ হয়ে শেষ পর্যন্ত দূরে নিহত হয়। সূরা আনফালে এর বিশদ বিবরণ বর্ণিত হয়েছে। তারা কি মনে করে যে, (আপনার ক্ষতি সাধন সম্পর্কিত) তাদের গোপন কথাবার্তা ও গোপন পরামর্শ আমি শুনি না? (যদি শুনি বলে মনে করে, তবে এরূপ দুঃসাহস কেন করবে? অতপর তাদের এই ধারণা খণ্ডন করা হয়েছে—) আমি অবশ্যই শুনি। (এছাড়া) আমার (আমল লিপিবদ্ধকারী) ফেরেশতাগণ তাদের কাছে থেকে লিপিবদ্ধ করে, (যদিও এর প্রয়োজন নেই। সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী পুলিশের লিখিত রিপোর্ট বিচারকের তদন্তের চেয়ে অধিক কার্যকর হয়। অতপর তওহীদের বিরোধিতা

সম্পর্কে বলা হয়েছে—হে পয়গম্বর,) আপনি (মুশরিকদেরকে) বলুন, যদি দয়াময় আল্লাহ্র কোন সন্তান থাকে, তবে সর্বপ্রথম আমি তার ইবাদত করব, (যেমন, তোমরা ফেরেশতাগণকে আল্লাহ্র কন্যা মনে করে তাদের ইবাদত কর। উদ্দেশ্য এই যে, আমি তোমাদের মত সত্যকে মেনে নিতে অস্বীকৃত হই না। তোমরা প্রমাণ করতে পারলে সর্বপ্রথম আমিই মেনে নেব। কিন্তু যেহেতু এটা বাতিল তাই মানব না এবং ইবাদতও করব না। অতপর শিরক থেকে আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা করা হয়েছে।) তারা (মুশরিকরা তাঁর সম্পর্কে) যা বর্ণনা করে, তা থেকে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের এবং আরশের পালনকর্তা পবিত্র। তারা যখন সত্য ফুটে উঠার পরও হঠকারিতা ও ঔদ্ধত্য থেকে বিরত হয় না, তখন) তাদেরকে বাকচাতুরী ও ক্রীড়া-কৌতুক করতে দিন সেই দিবসের সাক্ষাৎ পর্যন্ত, যার ওয়াদা তাদেরকে দেওয়া হয়। (তখন সব স্বরূপ ফুটে উঠবে। 'করতে দেওয়ার' অর্থ প্রচার না করা নয়; বরং অর্থ এই যে, তাদের বিরোধিতার দিকে ভ্রূক্ষেপ করবেন না এবং তাদের ঈমান না আনার কারণে দুঃখিত হবেন না।) তিনিই উপাস্য নভোমণ্ডলে এবং তিনিই উপাস্য ভূমণ্ডলে। তিনি প্রজ্ঞাময় সর্বজ্ঞ। (প্রজ্ঞা ও জ্ঞানে তাঁর কোন শরীক নেই। সুতরাং উপাস্যও তিনিই)। তিনিই মহান নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সব কিছু যার। (তার জ্ঞান এমন পরিপূর্ণ যে,) কিয়ামতের খবরও তাঁর কাছে রয়েছে, (যা কোন সৃষ্টিই জানে না। শাস্তি ও প্রতিদানের মালিকও তিনিই। সেমতে) তাঁরই দিকে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে (এবং হিসাব দেবে। তখন তিনি যে একাই শাস্তি ও প্রতিদানের মালিক, তা এমন স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে,) আল্লাহ্ ব্যতীত তারা যাদের পূজা করে, তারা সুপারিশের (-ও) অধিকারী হবে না। তবে যারা সত্য কথা (অর্থাৎ ঈমানের কালিমা) স্বীকার করেছে এবং (তা মনে-প্রাণে) বিশ্বাস করেছে, (তারা আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে মু'মিনদের জন্য সুপারিশ করতে পারবে। কিন্তু এতে কাফিরদের কি লাভ! তারা যে তওহীদে মতভেদ করে তার প্রাথমিক প্রমাণগুলো তো তারাও স্বীকার করে। সে মতে) যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, কে তাদেরকে (অর্থাৎ তোমাদেরকে) সৃষ্টি করেছে, তবে তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ্ (সৃষ্টি করেছেন।) অতপর (ইবাদতের যোগ্য তিনিই হতে পারেন। সুতরাং) তারা (প্রাথমিক প্রমাণ মেনে নেওয়ার পর প্রকৃত কাম্য বিষয় মেনে নেওয়ার ক্ষেত্রে কোথায় ফিরে যাচ্ছে (খোদাই জানেন!) (এসব বিষয় থেকেই জানা যায়, কাফিরদের অপরাধ কত গুরুতর। কাজেই শাস্তিও অবশ্যই গুরুতর হবে। অতপর একে জোরদার করার জন্য বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা যেমন কিয়ামতের খবর রাখেন, তেমনি) তিনি রসূলের এ উক্তিরও খবর রাখেন। হে আমার পালনকর্তা, তারা (আমার এত উপদেশদান সত্ত্বেও) বিশ্বাস স্থাপন করে না। (এতে রসূলের নালিশও এসে গেছে। কাজেই শাস্তি আরও গুরুতর হবে। তাদের পরিমাণ যখন আপনি জেনে গেলেন, তখন) আপনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন (অর্থাৎ তাদের ঈমানের এমন আশা করবেন না, যা পরে দুঃখের কারণ হয়।) এবং (তারা যদি আপনার অনিষ্ট করতে চায়, তবে আপন অনিষ্ট দূর করার জন্য) বলুন, আমি তোমাদেরকে সালাম করি। (আর কিছু বলি না এবং সম্পর্ক রাখি না।

অতপর সান্ত্বনার জন্য আল্লাহ্ বলেন, আপনি কিছু দিন সবর করুন।) তারা শীঘ্রই (অর্থাৎ মৃত্যুর পরেই) জানতে পারবে (তাদের কৃতকর্মের পরিণতি)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ ---(যদি রহমান আল্লাহ্র কোন সন্তান থাকত, তবে আমিই সর্বপ্রথম তার ইবাদত করতাম।) এর অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ্র সন্তান হওয়া কোন পর্যায়ে সম্ভব। বরং উদ্দেশ্য একথা ব্যক্ত করা যে, আমি কোন শত্রুতা ও হঠকারিতাবশত তোমাদের বিশ্বাস অস্বীকার করছি না; বরং প্রমাণাদির আলোকেই করছি। বিশুদ্ধ প্রমাণাদি দ্বারা আল্লাহ্র সন্তান থাকা প্রমাণিত হলে আমি অবশ্যই তা মেনে নিতাম। কিন্তু সর্বপ্রকার দলীল এর বিপক্ষে। কাজেই মেনে নেওয়ার প্রশ্নই উঠে না। এ থেকে জানা গেল যে, মিথ্যাপন্থীদের সাথে বিতর্কের সময় নিজের সত্যপ্রিয়তা ফুটানোর উদ্দেশ্যে একথা বলা জায়েয ও সমীচীন যে, তোমার দাবি সত্য প্রমাণিত হলে আমি মেনে নিতাম। কেননা মাঝে মাঝে এ ধরনের কথায় প্রতিপক্ষের মনে নম্রতা সৃষ্টি হয়, যা তাকে সত্য গ্রহণে উৎসাহিত করে।

وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ ---এ বাক্যটি অবতারণার উদ্দেশ্য কাফিরদের উপর গযব নাযিল হওয়ার যে বহুবিধ গুরুতর কারণ বিদ্যমান রয়েছে, তা ব্যক্ত করা। একদিকে তাদের অপরাধ এমনিতেই গুরুতর, অপরদিকে "রহমতুল্লিল-আলামীন" ও "শফীউল মুযনিবীন" রূপে প্রেরিত রসূল (সা) স্বয়ং তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন এবং বলেছেন যে, তারা বারবার বলা সত্ত্বেও বিশ্বাস স্থাপন করে না। এখন অনুমান করা যায় যে, তারা রসূল (সা)-এর উপর কি পরিমাণ নির্যাতন চালিয়েছে। মামুলী কষ্ট পেয়ে রহমতুল্লিল আলামীন (সা) আল্লাহ্ তা'আলার কাছে এমন বেদনামিশ্রিত অভিযোগ করতেন না। এ তফসীর অনুযায়ী وَقِيلِهِ এর এক আয়াত পূর্বে السَّاعَةِ শব্দের উপর معطوف হয়েছে। এ আয়াতের আরও কয়েকটি তফসীর করা হয়েছে। উদাহরণত واو অক্ষরটি কসমের অর্থ বোঝায় এবং إِنَّ هَٰؤُلَاءِ কসমের জওয়াব। এসব তফসীর রূহুল মা'আনীতে দ্রষ্টব্য।

وَقُلْ سَلَامٌ---পরিশেষে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, বিরোধীদের দলীল ও আপত্তির জওয়াব দিন, কিন্তু তারা অজ্ঞতা ও মূর্খতা প্রদর্শনে কিংবা দুর্নাম রটনায় প্রবৃত্ত হলে তার জওয়াব তাদের ভাষায় না দিয়ে নিশ্চুপ থাকুন। "সালাম বলুন"-এর অর্থ আসসালামু

আলাইকুম বলা নয়। কেননা কোন অমুসলিমকে এই ভাষায় সালাম করা বৈধ নয়। বরং এটা এক বাকপদ্ধতি। কারও সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করতে হলে বলা হয়, "আমার পক্ষ থেকে সালাম" অথবা "তোমাকে সালাম করি।" এতে সত্যিকারভাবে সালাম উদ্দেশ্য থাকে না, বরং উদ্দেশ্য এই যে, আমি সুন্দরভাবে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে চাই। কাজেই এ আয়াত দ্বারা কাফিরদেরকে السلام عليكم বলা অথবা سلام বলা বৈধ প্রতিপন্ন করা অসঙ্গত।—(রূহুল মা'আনী)

سورة الدخان

সূরা দুখান

মক্কায় অবতীর্ণ, ৫৯ আয়াত, ৩ রুকু

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

حٰمٓ ۚ ﴿١﴾ وَالْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ﴿٢﴾ اِنَّاۤ اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةٍ مُّبٰرَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ ﴿٣﴾ فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيْمٍ ﴿٤﴾ اَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا ؕ اِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ ﴿٥﴾ رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٦﴾ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۘ اِنْ كُنْتُمْ مُّوْقِنِيْنَ ﴿٧﴾ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ؕ رَبُّكُمْ وَرَبُّ اٰبَآئِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٨﴾ بَلْ هُمْ فِيْ شَكٍّ يَّلْعَبُوْنَ ﴿٩﴾

(১) হা-মীম, (২) শপথ সুস্পষ্ট কিতাবের, (৩) আমি একে নাযিল করেছি এক বরকতময় রাতে, নিশ্চয় আমি সতর্ককারী। (৪) এ রাতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয়। (৫) আমার পক্ষ থেকে আদেশক্রমে, আমিই রাসূল প্রেরণকারী (৬) আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে রহমতস্বরূপ। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (৭) যদি তোমাদের বিশ্বাস থাকে দেখতে পাবে ; তিনি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর পালনকর্তা। (৮) তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু দেন। তিনি তোমাদের পালনকর্তা এবং তোমাদের পূর্ববর্তী পিতৃপুরুষদেরও পালনকর্তা, (৯) এতদসত্ত্বেও এরা সন্দেহে পতিত হয়ে ক্রীড়া-কৌতুক করছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হা-মীম-(এর অর্থ আল্লাহ্ জানেন।) কসম সুস্পষ্ট কিতাবের, আমি একে (লওহে-মাহফুয থেকে দুনিয়ার আকাশে) এক বরকতের রাত্রিতে নাযিল করেছি,

(অর্থাৎ শবে-কদরে। কেননা) আমি (অনুকম্পার কারণে নিজের ইচ্ছায় আমার বান্দাদেরকে) সতর্ককারী ছিলাম। (অর্থাৎ আমার ইচ্ছা ছিল যে, বান্দাদেরকে ক্ষতির কবল থেকে বাঁচানোর জন্য তাদেরকে ভাল ও মন্দ সম্পর্কে অবহিত করে দেই। এটা ছিল কোরআন নাযিল করার উদ্দেশ্য। অতপর শবে-কদরের বরকত ও উপকারিতা বর্ণিত হয়েছে।) এ রাত্রিতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাময় বিষয় আমার পক্ষ থেকে আদেশক্রমে স্থিরীকৃত হয়। (অর্থাৎ সারা বছরের প্রজ্ঞাময় বিষয়সমূহ কিভাবে আনজাম দেওয়া হবে, আল্লাহ্ তা স্থির করে সংশ্লিষ্ট ফেরেশতাগণের কাছে সোপর্দ করেন। কোরআন অবতরণও সর্বাধিক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় ছিল। তাই এর জন্য এ রাত্রিকেই বেছে নেওয়া হয়। কোরআন নাযিল করার কারণ এই যে,) আমি আপনার পালনকর্তার রহমতের কারণে আপনাকে রসূল রূপে প্রেরণকারী ছিলাম, (যাতে আপনার মাধ্যমে বান্দাদেরকে অবহিত করে দেই)। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (তাই বান্দাদের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখেন)। তাদের বিশ্বাস থাকলে দেখতে পেতো তিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর পালনকর্তা। (তওহীদে বিশ্বাস স্থাপনের জন্য এগুলো পর্যাপ্ত প্রমাণ। অতপর স্পষ্টরূপে তওহীদ বর্ণিত হয়েছে।) তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি জীবন দান করেন এবং তিনিই জীবন হরণ করেন। তিনি তোমাদের পালনকর্তা ও তোমাদের পূর্বপুরুষদের পালনকর্তা (এরপর তাদের মেনে নেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তবুও তারা মানেনি) বরং তারা (তওহীদের মত সত্য বিষয়ে) সন্দেহে পতিত হয়ে (দুনিয়ায়) ক্রীড়া-কৌতুকে লিপ্ত রয়েছে। (পরকালের চিন্তা করে না। ফলে সত্যান্বেষণ করে না ও এ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে না)।

সূরার ফযীলত ঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-র রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, যে ব্যক্তি জুম'আর রাত্রিতে সূরা দুখান পাঠ করে, সকাল হওয়ার আগেই তার গোনাহ্ মাফ হয়ে যায়। হযরত আবূ উমামার রেওয়ায়েতে আছে, যে ব্যক্তি জুম'আর রাত্রিতে অথবা দিনে সূরা দুখান পাঠ করবে আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে গৃহ নির্মাণ করবেন।—(কুরতুবী)

উল্লিখিত আয়াতসমূহে কোরআনের মাহাত্ম্য ও কতিপয় বিষয়ে গুণ বর্ণিত হয়েছে

كِتَابٍ مُّبِينٍ (সুস্পষ্ট কিতাব) বলে কোরআনকে বোঝানো হয়েছে। এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা কসম করে বলেছেন, আমি একে এক মোবারক রাত্রিতে নাযিল করেছি এবং এর উদ্দেশ্য গাফিল মানুষকে সতর্ক করা।

لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ—অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে এখানে শবে-কদর বোঝানো হয়েছে, যা রমযান মাসের শেষ দশকে হয়। এ রাত্রিকে 'মোবারক' বলার কারণ এই যে, এ রাত্রিতে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে অসংখ্য কল্যাণ ও বরকত নাযিল হয়।

সূরা কদরে إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ —আয়াতে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, কোরআন পাক শবে-কদরে নাযিল হয়েছে। এতে বোঝা গেল যে, এখানেও বরকতের রাত্রি বলে শবে-কদরকেই বোঝানো হয়েছে। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) আরও বলেন, দুনিয়ার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা পয়গম্বরগণের প্রতি যত কিতাব নাযিল করেছেন, তা সবই রমযান মাসেরই বিভিন্ন তারিখে নাযিল হয়েছে। হযরত কাতাদাহ বর্ণিত রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সহীফাসমূহ রমযানের প্রথম তারিখে, তওরাত ছয় তারিখে, যবুর বার তারিখে, ইঞ্জীল আঠার তারিখে এবং কোরআন পাক চাব্বিশ তারিখ অতিবাহিত হওয়ার পর পঁচিশের রাত্রিতে অবতীর্ণ হয়েছে।—(কুরতুবী)

কোরআন শবে-কদরে নাযিল হয়েছে, এর অর্থ এই যে, লওহে-মাহফুয থেকে সমগ্র কোরআন দুনিয়ার আকাশে এ রাত্রিতেই নাযিল করা হয়েছে। অতপর তেইশ বছরে অল্প অল্প করে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রতি নাযিল হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, প্রতি বছর যতটুকু কোরআনের অবতরণ অবধারিত ছিল, ততটুকুই শবে-কদরে দুনিয়ার আকাশে নাযিল করা হত।—(কুরতুবী)

ইকরিমাহ প্রমুখ কয়েকজন তফসীরবিদ থেকে বর্ণিত আছে, এ আয়াতে বরকতের রাত্রি বলে শবে বরাত অর্থাৎ শাবান মাসের পনের তারিখের রাত্রি বোঝানো হয়েছে। কিন্তু এ রাত্রিতে কোরআন অবতরণ কোরআন ও হাদীসের অন্যান্য বর্ণনার পরিপন্থী।

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ এবং شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

-এর ন্যায় সুস্পষ্ট বর্ণনা সত্ত্বেও বলা যায় না যে, কোরআন শবে বরাতে নাযিল হয়েছে। তবে কোন কোন রেওয়ায়েতে শা'বানের পনের তারিখকে শবে বরাত অথবা 'লায়লাতুস্সফ' নামে অভিহিত করা হয়েছে এবং এর বরকতময় হওয়া ও এতে রহমত নাযিল হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এর সাথে কোন কোন রেওয়ায়েতে এখানে উল্লিখিত গুণও বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْرًا مِّنْ عِندِنَا —এ রাত্রিতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয়ের ফয়সালা আমার পক্ষ থেকে করা হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এর অর্থ কোরআন অবতরণের রাত্রি অর্থাৎ শবে কদরে সৃষ্টি সম্পর্কিত সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ফয়সালা স্থির করা হয়, যা পরবর্তী শবে কদর পর্যন্ত এক বছরে সংঘটিত হবে। অর্থাৎ এ বছর কারা কারা জন্মগ্রহণ করবে, কে কে মারা যাবে এবং এ বছর কি পরিমাণ রিযিক দেওয়া হবে। মাহ্দভী

বলেন, এর অর্থ এই যে, আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত তকদীরে পূর্বাহ্নে স্থিরীকৃত সকল ফয়সালা এ রাত্রিতে সংশ্লিষ্ট ফেরেশতাগণের কাছে অর্পণ করা হয়। কেননা কোরআন ও হাদীসের অন্যান্য বর্ণনা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা এসব ফয়সালা মানুষের জন্মের পূর্বেই সৃষ্টিলগ্নে লিখে দিয়েছেন। অতএব এ রাত্রিতে এগুলো স্থির করার অর্থ এই যে, যে ফেরেশতাগণের মাধ্যমে ফয়সালা ও তকদীর প্রয়োগ করা হয়, এ রাত্রিতে সারা বছরের বিধানাবলী তাদের কাছে অর্পণ করা হয়।—(কুরতুবী)

কোন কোন রেওয়ায়েতে শবে বরাত সম্পর্কেও বলা হয়েছে যে, এতে জন্ম-মৃত্যুর সময় ও রিযিকের ফয়সালা লেখা হয়। এ থেকেই কেউ কেউ আলোচ্য আয়াতে 'বরকতের রাত্রি'র অর্থ নিয়েছেন শবে-বরাত। কিন্তু এটা শুদ্ধ নয়। কেননা, এখানে সর্বাগ্রে কোরআন অবতরণের উল্লেখ রয়েছে এবং কোরআন অবতরণ যে রমযান মাসে হয়েছে, তা কোরআনের বর্ণনা দ্বারাই প্রমাণিত। শবে বরাত সম্পর্কিত উল্লিখিত কোন কোন রেওয়ায়েতকে ইবনে কাসীর অগ্রাহ্য বলে সাব্যস্ত করেছেন এবং কাযী আবু বকর ইবনে আরাবী সংশ্লিষ্ট বর্ণনাগুলি নির্ভরযোগ্য নয় বলে মন্তব্য করেছেন। ইবনে আরাবী শবে বরাতের ফযীলত স্বীকার করেন না। তবে কোন কোন মাশায়েখ দুর্বল হলেও হাদীসগুলোকে কবুল করেছেন। কেননা ফযীলত সম্পর্কিত দুর্বল রেওয়ায়েত কবুল করার অবকাশ রয়েছে।

فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ ﴿١٠﴾ يَغْشَى النَّاسَ ۖ هَٰذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١١﴾ رَّبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ﴿١٢﴾ أَنَّىٰ لَهُمُ الذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ﴿١٣﴾ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَّجْنُونٌ ﴿١٤﴾ إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا ۚ إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ﴿١٥﴾ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَىٰ إِنَّا مُنتَقِمُونَ ﴿١٦﴾

---

(১০) অতএব আপনি সেই দিনের অপেক্ষা করুন, যখন আকাশ ধোঁয়ায় ছেয়ে যাবে, (১১) যা মানুষকে ঘিরে ফেলবে। এটা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (১২) হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের উপর থেকে শাস্তি প্রত্যাহার করুন, আমরা বিশ্বাস স্থাপন করছি। (১৩) তারা কি করে বুঝবে, অথচ তাদের কাছে এসেছিলেন স্পষ্ট বর্ণনাকারী রসূল (১৪) অতপর তারা তাকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে এবং বলে, সে তো উন্মাদ—শিখানো কথা বলে। (১৫) আমি তোমাদের উপর থেকে আযাব কিছুটা প্রত্যাহার করব, কিন্তু

তোমরা পুনরায় পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবে। (১৬) যে দিন আমি প্রবলভাবে ধৃত করব, সেদিন পুরাপুরি প্রতিশোধ গ্রহণ করবই।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(তারা সত্য সুস্পষ্ট হওয়ার পরেও মানে না,) অতএব আপনি তাদের জন্য সে দিনের অপেক্ষা করুন, যখন আকাশ ধূম্রাচ্ছন্ন হবে। এটাও এক যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। [এখানে দুর্ভিক্ষ বোঝানো হয়েছে। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বদ-দোয়ার ফলে মক্কা-বাসীরা এ দুর্ভিক্ষে পতিত হয়েছিল। এ বদ-দোয়া একবার মক্কায় ও একবার মদীনায় হয়েছিল। ক্ষুধার তীব্রতায় ও মাটির শুষ্কতায় আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থলে ধোঁয়ার মত দৃষ্টিগোচর হয়। তা-ই এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। দুর্ভিক্ষের কারণে মক্কাবাসীরা অতিষ্ঠ হয়ে কাকুতি-মিনতি শুরু করে দেয়। সেমতে ভবিষ্যদ্বাণীরূপে বলা হয়েছে যে, মক্কাবাসীরা তখন আল্লাহ্র সকাশে আরয করবে,] হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের থেকে এ আযাব সরিয়ে নিন, আমরা অবশ্যই বিশ্বাস স্থাপন করব। [এ ভবিষ্যদ্বাণী এভাবে পূর্ণ হয় যে, আবু সুফিয়ান ও অন্যান্য কুরায়েশ রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে চিঠি লিখে এবং নিজেরাও এসে দোয়ার অনুরোধ করে। ইয়ামামার সরদার সুমামা তাদের খাদ্যশস্য সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছিল, তাকেও বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করে। রূহুল মা'আনীতে আবু সুফিয়ানের ঈমানের ওয়াদাও বর্ণিত রয়েছে। অতপর বলা হয়েছে যে, তাদের ওয়াদা খাঁটি মনে ছিল না।] তারা কি করে উপদেশ লাভ করবে যদ্দ্বারা তাদের ঈমান আশা করা যায়, অথচ (ইতিপূর্বে) তাদের কাছে সুস্পষ্ট পয়গম্বর আগমন করেছেন (অর্থাৎ যাঁর নবুয়ত সুস্পষ্ট ছিল)। অতপর তারা তাঁকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছে এবং বলেছে, সে তো (অন্য লোকের) শিখানো বুলি বলে (এবং) সে উন্মাদ। (সুতরাং এরপরও যখন তারা বিশ্বাস স্থাপন করল না, তখন দুর্ভিক্ষে কিরূপে ঈমান আশা করা যায়। দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে তো অবিবেচকরা একথাও বলতে পারে যে, এটা স্বাভাবিক ঘটনা, যা বোধগম্য কারণে সংঘটিত হয়েছে—কুফরের শাস্তি নয়। সুতরাং তাদের ওয়াদা কেবল উপস্থিত বিপদ টলানোর জন্য।) আমি (নিরুত্তর করার জন্য) কিছুদিন আযাব প্রত্যাহার করব, কিন্তু তোমরা পুনরায় তোমাদের প্রথমাবস্থায় ফিরে যাবে। [এ ভবিষ্যদ্বাণী এভাবে পূর্ণ হয় যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র দোয়ার ফলে বৃষ্টি হয় এবং ইয়ামামার সরদারকে চিঠি লিখে খাদ্যশস্যের সরবরাহ পুনরায় চালু করা হলে মক্কাবাসীরা স্বস্তি লাভ করে। কিন্তু ঈমান দূরের কথা, তাদের নম্রতাও বিদায় নেয় এবং তারা পূর্ববৎ ঔদ্ধত্য প্রদর্শন আরম্ভ করে। 'কয়েকদিন' বলার অর্থ এই যে, এ আযাবের অপসারণকাল পার্থিব জীবন পর্যন্তই সীমিত। মৃত্যুর পর যে আযাব আসবে, তার অবসান হবে না। সেমতে ইরশাদ হয়েছে,] যেদিন আমি প্রবলভাবে পাকড়াও করব, (সেদিন) আমি (পুরোপুরি) প্রতিশোধ নেবই (অর্থাৎ পরকালে পুরোপুরি শাস্তি হবে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহে উল্লিখিত ধোঁয়া সম্পর্কে সাহাবী ও তাবেয়ীগণের তিন প্রকার উক্তি বর্ণিত আছে। প্রথম উক্তি এই যে, এটা কিয়ামতের অন্যতম আলামত যা কিয়ামতের সন্নিকটবর্তী সময়ে সংঘটিত হবে। এই উক্তি হযরত আলী, ইবনে আব্বাস, ইবনে উমর, আবূ হুরায়রা (রা), হাসান বসরী (র) প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে। দ্বিতীয় উক্তি এই যে, এ ভবিষ্যদ্বাণী অতীতে পূর্ণ হয়ে গেছে এবং এতে মক্কার সে দুর্ভিক্ষ বোঝানো হয়েছে, যা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বদ-দোয়ার ফলে মক্কাবাসীদের উপর আপতিত হয়েছিল। তারা ক্ষুধার্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছিল এবং মৃত জন্তু পর্যন্ত খেতে বাধ্য হয়েছিল। আকাশে বৃষ্টি ও মেঘের পরিবর্তে ধূম্র দৃষ্টিগোচর হত। এ উক্তি হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা) প্রমুখের। তৃতীয় উক্তি এই যে, এখানে মক্কা বিজয়ের দিন মক্কার আকাশে উত্থিত ধূলিকণাকে ধূম্র বলা হয়েছে। এ উক্তি আবদুর রহমান আরাজ প্রমুখের। ---(কুরতুবী) প্রথমোক্ত উক্তিদ্বয়ই সমধিক প্রসিদ্ধ। তৃতীয় উক্তি ইবনে কাসীরের মতে অগ্রাহ্য। সহীহ্ হাদীসসমূহে দ্বিতীয় উক্তিই অবলম্বিত হয়েছে। প্রথমোক্ত উক্তিদ্বয়ের রেওয়ায়েত নিম্নরূপ ঃ

সহীহ্ মুসলিমের রেওয়ায়েতে হুযায়ফা ইবনে উসায়েদ বলেন, একবার রসূলুল্লাহ্ (সা) উপর তলার কক্ষ থেকে আমাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন। আমরা তখন পরস্পর কিয়ামতের আলামত সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। তিনি বললেন, যত দিন তোমরা দশটি আলামত না দেখ, ততদিন কিয়ামত হবে না---(১) পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়, (২) দুখান তথা ধূম্র, (৩) দাব্বা, (৪) ইয়াজুজ-মাজুজের আবির্ভাব, (৫) ঈসা (আ)-র অবতরণ, (৬) দাজ্জালের আবির্ভাব, (৭) পূর্বে ভূমিধস, (৮) পশ্চিমে ভূমিধস, (৯) আরব উপদ্বীপে ভূমিধস, (১০) আদন থেকে এক অগ্নি বের হবে এবং মানুষকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে। মানুষ যেখানে রাত্রি যাপন করতে আসবে, অগ্নিও থেমে যাবে, যেখানে দুপুরে বিশ্রামের জন্য আসবে, সেখানে অগ্নিও থেমে যাবে। ---(ইবনে কাসীর)

আবূ মালিক আশ'আরী বর্ণিত রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, আমি তোমাদেরকে তিন বিষয়ে সতর্ক করছি---এক. ধূম্র, যা মু'মিনকে কেবল এক প্রকার সর্দিতে আক্রান্ত করে দেবে এবং কাফিরের দেহে প্রবেশ করে প্রতিটি রন্ধ্রপথে বের হতে থাকবে। দুই. দাব্বা (ভূগর্ভ থেকে নির্গত অদ্ভুত জানোয়ার) এবং তিন. দাজ্জাল। ইবনে কাসীর এমনি ধরনের আরও কয়েকটি রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করে লিখেন ঃ

هذا اسناد صحيح الى ابن عباس حبر الامة و ترجمان القران و هكذا قول من وافقه من الصحابة و التابعين مع الاحاديث المرفوعة من الصحاح و الحسان وغيرهما التى اوردوها مما فيه مقنع و دلالة ظاهرة على ان الدخان من الايات المنتظرة مع انه ظاهر القرأن فارتقب

يوم تاتى السماء بدخان مبين - وعلى ما فسره ابن مسعود انما هو خيال رأوه فى اعينهم من شدة الجوع والجهد وهكذا قوله تعالى يغشى الناس اى يتغشاهم ويعمهم ولوكان امرا خياليا يخص اهل مكة المشركين لما قيل فيه يغشى الناس -

কোরআনের তফসীরকার হযরত ইবনে আব্বাস (রা) পর্যন্ত এই সনদ বিশুদ্ধ। অন্যান্য সাহাবী ও তাবেয়ীর উক্তিও তাই, তারা ইবনে আব্বাসের সঙ্গে একমত হয়েছেন। এছাড়া কিছু সহীহ্ ও হাসান হাদীসও একথা প্রমাণ করে যে, 'দুখান' বা ধূম্র কিয়ামতের ভবিষ্যৎ আলামতসমূহের অন্যতম। কোরআনের বাহ্যিক ভাষাও এর সাক্ষ্য দেয়। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদের তফসীরে উল্লিখিত ধূম্র একটি কাল্পনিক ধূম্র ছিল, যা ক্ষুধার তীব্রতার কারণে তাদের চোখে প্রতিভাত হয়েছিল। এর জন্য 'মানুষকে ঘিরে নেবে' কথাটি অবান্তর মনে হয়। কেননা, এই কাল্পনিক ধূম্র মক্কাবাসীদের মধ্যেই সীমিত ছিল। অথচ يغشى الناس থেকে বোঝা যায় যে, এটা সব মানুষকে ব্যাপকভাবে ঘিরে ফেলবে।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদের উক্তির রেওয়ায়েত বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী ইত্যাদি কিতাবে হযরত মসরূকের বাচনিক বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, একদিন আমরা আবওয়াবে কেন্দার নিকটবর্তী কূফার মসজিদে প্রবেশ করে দেখলাম, জনৈক ওয়ায়েয ওয়াজ করছেন। তিনি يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ — আয়াত সম্পর্কে শ্রোতাদেরকে প্রশ্ন করলেন, এই দুখানের কি অর্থ, আপনারা জানেন? অতপর নিজেই বললেন, এটা এক ধূম্র, যা কিয়ামতের দিন নির্গত হবে এবং মুনাফিকদের কর্ণ ও চক্ষু নষ্ট করে দেবে। পক্ষান্তরে মু'মিনদের মধ্যে এর কারণে কেবলমাত্র সর্দির উপসর্গ সৃষ্টি হবে।

মসরূক বলেন, ওয়ায়েযের এ কথা শুনে আমরা আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদের কাছে গেলাম। তিনি শায়িত ছিলেন—ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে উঠে বসলেন এবং বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের নবী (সা)-কে এই পথনির্দেশ দিয়েছেন: مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ —অর্থাৎ আমি তোমাদের কাছে আমার সেবা-কর্মের কোন বিনিময় চাই না এবং আমি কোন কথা বানিয়ে বলি না। কাজেই যে আলিম হবে, সে যা জানে না, তা পরিষ্কার বলে দেবে, আমি জানি না; আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন। নিজে কোন কথা বানিয়ে বলা উচিত নয়। অতপর তিনি বললেন, এখন আমি তোমাদেরকে এ আয়াতের তফসীর সম্পর্কিত ঘটনা শোনাই।

কাফিররা যখন রসূলুল্লাহ্ (সা)-র দাওয়াত কবুল করতে অস্বীকার করল এবং কুফ্রীকেই আঁকড়ে রইল, তখন রসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের জন্য বদ-দোয়া করলেন যে, হে আল্লাহ্, এদের উপর ইউসুফ (আ)-এর আমলের দুর্ভিক্ষের ন্যায় দুর্ভিক্ষ চাপিয়ে দিন। ফলে কাফিররা ভয়ংকর দুর্ভিক্ষে পতিত হল। এমনকি, তারা অস্থি এবং মৃত জন্তুও ভক্ষণ করতে লাগল। তারা আকাশের দিকে তাকালে ধূম্র ব্যতীত কিছুই তাদের দৃষ্টিগোচর হত না। এক রেওয়ায়েতে আছে, তাদের কেউ আকাশের দিকে তাকালে ক্ষুধার তীব্রতায় সে কেবল ধূম্রের মত দেখত। অতপর আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ তাঁর বক্তব্যের প্রমাণস্বরূপ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ —আয়াতখানি তিলাওয়াত করলেন। দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত জনগণ রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে আবেদন করল, আপনি আপনার মুযার গোত্রের জন্য আল্লাহ্র কাছে বৃষ্টির দোয়া করুন ! নতুবা আমরা সবাই ধ্বংস হয়ে যাব। রসূলুল্লাহ্ (সা) দোয়া করলে, বৃষ্টি হল। তখন إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ আয়াত নাযিল হল। অর্থাৎ আমি কিছু দিনের জন্য তোমাদের থেকে আযাব প্রত্যাহার করে নিচ্ছি। কিন্তু তোমরা বিপদমুক্ত হয়ে গেলে আবার কুফরের দিকে যাবে। বাস্তবে তা-ই হল, তারা তাদের পূর্বাবস্থায় ফিরে গেল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَىٰ إِنَّا مُنتَقِمُونَ —আয়াত নাযিল করলেন। অর্থাৎ যেদিন আমি প্রবলভাবে পাকড়াও করব, সেদিনের ভয় কর। অতপর ইবনে মসউদ বললেন, এই প্রবল পাকড়াও বদর যুদ্ধে হয়ে গেছে। এই ঘটনা বর্ণনা করার পর তিনি আরও বললেন, পাঁচটি বিষয় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। অর্থাৎ দুখান তথা ধূম্র, রোম, চাঁদ, পাকড়াও ও লেযাম।——(ইবনে কাসীর) দুখান অর্থ মক্কার দুর্ভিক্ষ। রোম অর্থ সেই ভবিষ্যদ্বাণী যা সূরা রূমে রোমকদের বিষয় সম্পর্কে বর্ণিত আছে وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ —চন্দ্র অর্থ চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়া, যা اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে। পাকড়াও অর্থ বদর যুদ্ধে কুরাইশ-কাফিরদের পরিণতি। লেযাম অর্থে فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا আয়াতের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতসমূহে গভীরভাবে লক্ষ্য করলে কয়েকটি ভবিষ্যদ্বাণী দেখতে পাওয়া যায়---(১) আকাশে ধূম্র দেখা দেবে এবং সবাইকে আচ্ছন্ন করবে, (২) মুশরিকরা আযাবে অতিষ্ঠ হয়ে ঈমানের ওয়াদা করে আল্লাহ্র কাছে দোয়া করবে, (৩) তাদের ওয়াদা মিথ্যা প্রমাণিত হবে এবং পরে তারা বেঈমানী করবে, (৪) তাদের মিথ্যা ওয়াদা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে জব্দ করার উদ্দেশ্যে কিছুদিনের জন্য আযাব প্রত্যাহার করবেন এবং বলে দেবেন, তোমরা ওয়াদায় কায়েম থাকবে না এবং (৫) আল্লাহ্ তা'আলা পুনরায় তাদেরকে প্রবলভাবে পাকড়াও করবেন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদের তফসীর অনুযায়ী সবগুলো ভবিষ্যদ্বাণীই পূর্ণ হয়ে গেছে। প্রথমোক্ত চারটি মক্কাবাসীর উপর দুর্ভিক্ষ আপতিত হওয়া এবং তা দূর হওয়ার অন্তর্বর্তী সময়েই পূর্ণ হয়েছে এবং পঞ্চম ভবিষ্যদ্বাণীটি বদর যুদ্ধে পূর্ণতা লাভ করেছে। কিন্তু এই তফসীর কোরআনের বাহ্যিক ভাষার সাথে সঙ্গতি রাখে না। কোরআনের ভাষা থেকে বোঝা যায় যে, আকাশ প্রকাশ্য ধোঁয়া দ্বারা আচ্ছাদিত হবে এবং সমস্ত মানুষ এই ধূম্র দ্বারা প্রভাবান্বিত হবে। কিন্তু তফসীর থেকে এগুলো কিছুই প্রমাণিত হয় না। বরং জানা যায় যে, এই ধূম্র তাদের বিপদের তীব্রতার ফলশ্রুতি। এ কারণেই ইবনে কাসীর কোরআনের বাহ্যিক ভাষা দৃষ্টে এ বিষয়কে অগ্রাধিকার দিয়েছেন যে, এ ধূম্র কিয়ামতের অন্যতম আলামত। একে অগ্রাধিকার দেওয়ার আরও কারণ এই যে, এটা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র উক্তি দ্বারা প্রমাণিত। পক্ষান্তরে ইবনে মসউদের তফসীর তাঁর নিজস্ব ধারণাপ্রসূত। কিন্তু ইবনে কাসীরের অগ্রাধিকার দেওয়া তফসীরে বাহ্যত খটকা আছে। তা এই যে, আয়াতে আছে إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ---অথচ কিয়ামতে কাফিরদের থেকে কোন সময় আযাব প্রত্যাহার করা হবে না। সুতরাং কিছু দিনের জন্য আযাব প্রত্যাহারের বিষয়টি কিরূপে শুদ্ধ হবে? ইবনে কাসীর বলেন, এ আয়াতের দু'টি অর্থ হতে পারে---এক. উদ্দেশ্য এই যে, আমি যদি তোমাদের কথা অনুযায়ী আযাব প্রত্যাহার করি এবং তোমাদেরকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে দেই, তবে তোমরা পূর্ববৎ কুফরীই করতে থাকবে।

কোরআনের অন্য আয়াতে এই বিষয়বস্তু এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ لَّلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ---অন্য এক আয়াতে আছে وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ দ্বিতীয় অর্থ এই যে, كشف عذاب -এর মানে যদিও আযাবের কারণ সম্পূর্ণ হয়ে গেছে এবং আযাব তোমাদের নিকটে এসে গেছে; কিন্তু কিছু দিন আমি তা পিছিয়ে দেব। ইউসুফ (আ)-এর কওমের

ব্যাপারেও এমনিভাবে। اِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ বলা হয়েছে। অথচ তাদের উপর আযাবের লক্ষণাদি প্রকাশ পেয়েছিল মাত্র। আযাব আসার তখনও বিলম্ব ছিল। একেই كشف عذاب বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। সারকথা এই যে, ধূম্রের ভবিষ্যদ্বাণীকে কিয়ামতের আলামত গণ্য করা হলে كَاشِفُوا الْعَذَابِ আয়াত দ্বারা কোন খটকা দেখা দেয় না এবং এ তফসীর অনুযায়ী نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرٰى—এর অর্থ হবে কিয়ামত দিবসের পাকড়াও। আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদের তফসীরকে বদর যুদ্ধের পাক-ড়াও বলা হয়েছে। এটাও স্বস্থানে শুদ্ধ। কারণ এটাও প্রবল পাকড়াও ছিল। কিন্তু এতে জরুরী হয় না যে, কিয়ামতে আরও প্রবল পাকড়াও হবে না। এটাও অবান্তর মনে হয় না যে, কোরআন পাক কাফিরদেরকে আলোচ্য আয়াতসমূহে এক ভাবী আযাব সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। এরপর তাদের উপর যে-কোন আযাব এসেছে, তাকেই তাঁরা এ আয়াতের প্রতীক মনে করে আয়াতসমূহ উল্লেখ করেছেন। ফলে এটা যে কিয়ামতের আলামত, তা অস্বীকার করা যায় না। যেমন স্বয়ং ইবনে মসউদ থেকে বর্ণিত আছে ঃ

هما دخانان مضى واحد والذى بقى يملا ما بين السماء والارض ولا يصيب المؤمن الا بالزكمة واما الكافر فيشق مسامعه فيبعث الله عند ذالك الريح الجنوب من اليمن فتقبض روح كل مؤمن ويبقى شرار الناس -

ধূম্র দু'টি। একটি অতিক্রান্ত হয়ে গেছে (অর্থাৎ মক্কার দুর্ভিক্ষের সময়)। আর যেটি বাকি আছে, সেটি আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী শূন্যমণ্ডলকে ভরে দেবে। এতে মু'মিনের মধ্যে কেবল সর্দির অবস্থা সৃষ্টি হবে এবং কাফিরের দেহের সমস্ত রন্ধ্র ছিন্ন করে দেবে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা ইয়ামনের দিক থেকে দক্ষিণা বায়ু প্রবাহিত করবেন, যা প্রত্যেক মু'মিনের প্রাণ হরণ করবে এবং কেবল দুষ্ট প্রকৃতির কাফিরকুল অবশিষ্ট থাকবে।---(রূহুল মা'আনী)

রূহুল মা'আনীর গ্রন্থকার এই রেওয়ায়াতের সত্যতায় সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, কিন্তু এটা প্রমাণিত হলেও কোরআন ও হাদীসের সাথে তাঁর অবলম্বিত তফসীরের কোন বৈপরীত্য থাকে না।

وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ ﴿١٧﴾ أَنْ
أَدُّوٓا إِلَىَّ عِبَادَ ٱللَّهِ ۖ إِنِّى لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٨﴾ وَأَن لَّا تَعْلُوا
عَلَى ٱللَّهِ ۖ إِنِّىٓ ءَاتِيكُم بِسُلْطَٰنٍ مُّبِينٍ ﴿١٩﴾ وَإِنِّى عُذْتُ بِرَبِّى
وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ ﴿٢٠﴾ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِى فَٱعْتَزِلُونِ ﴿٢١﴾
فَدَعَا رَبَّهُۥٓ أَنَّ هَٰٓؤُلَآءِ قَوْمٌ مُّجْرِمُونَ ﴿٢٢﴾ فَأَسْرِ بِعِبَادِى لَيْلًا
إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ ﴿٢٣﴾ وَٱتْرُكِ ٱلْبَحْرَ رَهْوًا ۖ إِنَّهُمْ جُندٌ مُّغْرَقُونَ ﴿٢٤﴾
كَمْ تَرَكُوا مِن جَنَّٰتٍ وَعُيُونٍ ﴿٢٥﴾ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴿٢٦﴾
وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَٰكِهِينَ ﴿٢٧﴾ كَذَٰلِكَ ۖ وَأَوْرَثْنَٰهَا قَوْمًا
ءَاخَرِينَ ﴿٢٨﴾ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَا كَانُوا
مُنظَرِينَ ﴿٢٩﴾ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ مِنَ ٱلْعَذَابِ
ٱلْمُهِينِ ﴿٣٠﴾ مِن فِرْعَوْنَ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ عَالِيًا مِّنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾
وَلَقَدِ ٱخْتَرْنَٰهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٣٢﴾ وَءَاتَيْنَٰهُم مِّنَ ٱلْءَايَٰتِ
مَا فِيهِ بَلَٰٓؤٌا مُّبِينٌ ﴿٣٣﴾

(১৭) তাদের পূর্বে আমি ফিরাউনের সম্প্রদায়কে পরীক্ষা করেছি এবং তাদের কাছে আগমন করেছেন একজন সম্মানিত রসূল, (১৮) এই মর্মে যে, আল্লাহ্‌র বান্দাদেরকে আমার কাছে অর্পণ কর। আমি তোমাদের জন্য প্রেরিত বিশ্বস্ত রসূল (১৯) আর তোমরা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করো না। আমি তোমাদের কাছে প্রকাশ্য প্রমাণ উপস্থিত করছি। (২০) তোমরা যাতে আমাকে প্রস্তরবর্ষণে হত্যা না কর, তজ্জন্য আমি আমার পালনকর্তা ও তোমাদের পালনকর্তার শরণাপন্ন হয়েছি। (২১) তোমরা যদি আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না কর, তবে আমার কাছ থেকে দূরে থাক। (২২) অতপর সে তার পালনকর্তার কাছে দোয়া করল যে, এরা অপরাধী সম্প্রদায় (২৩) তাহলে তুমি আমার বান্দাদেরকে নিয়ে রাত্রিবেলায় বের হয়ে পড়। নিশ্চয় তোমাদের

পশ্চাদ্ধাবন করা হবে। (২৪) এবং সমুদ্রকে অচল থাকতে দাও। নিশ্চয় ওরা নিমজ্জিত বাহিনী! (২৫) তারা ছেড়ে গিয়েছিল কত উদ্যান ও প্রস্রবণ, (২৬) কত শস্যক্ষেত্র ও সুরম্য স্থান, (২৭) কত সুখের উপকরণ, যাতে তারা খোশগল্প করত। (২৮) এমনিই হয়েছিল এবং আমি এগুলোর মালিক করেছিলাম ভিন্ন সম্প্রদায়কে। (২৯) তাদের জন্য ক্রন্দন করেনি আকাশ ও পৃথিবী এবং তারা অবকাশও পায়নি। (৩০) আমি বনী ইসরাঈলকে অপমানজনক শাস্তি থেকে উদ্ধার করেছি। (৩১) ফিরাউন— সে ছিল সীমালংঘনকারীদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়। (৩২) আমি জেনেশুনে তাদেরকে বিশ্ববাসীদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম, (৩৩) এবং আমি তাদেরকে এমন নিদর্শনাবলী দিয়েছিলাম যাতে ছিল স্পষ্ট সাহায্য।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি তাদের আগে ফিরাউনের সম্প্রদায়কে পরীক্ষা করেছি এবং (পরীক্ষা ছিল এই যে,) তাদের কাছে আগমন করেছিলেন একজন সম্মানিত রসূল [অর্থাৎ মূসা (আ)] পয়গম্বরের আগমনে কে ঈমান আনে এবং কে আনে না, তার পরীক্ষা হয়। তিনি এসে ফিরাউন ও তার সম্প্রদায়কে বললেন, আল্লাহ্‌র বান্দাদেরকে (অর্থাৎ বনী ইসরাঈল, যাদেরকে তোমরা নিপীড়ন করছ,) আমার কাছে প্রত্যর্পণ কর (এবং তাদের থেকে হাত গুটাও। আমি যেখানে ও যেভাবে পারি তাদেরকে মুক্ত করে রাখব।) আমি (তোমাদের কাছে আল্লাহ্‌র বিশ্বস্ত) রসূল (হয়ে এসেছি এবং ওহী হুবহু পৌঁছাই। কাজেই তোমাদের মানা উচিত।) তোমরা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে ঔদ্ধত্য করো না। (উপরে বান্দার হক সম্বন্ধে বলা হয়েছিল এবং এখানে আল্লাহ্‌র হক সম্বন্ধে বলা হয়েছে।) আমি তোমাদের সামনে (আমার নবুয়তের) স্পষ্ট দলীল পেশ করছি। (অর্থাৎ লাঠি ও জ্যোতির্ময় হাতের মু'জিযা। কিন্তু ফিরাউন ও তার সম্প্রদায় মানল না এবং তাঁকে হত্যা করার পরামর্শ করল। তিনি শুনে বললেন,) তোমরা যাতে আমাকে প্রস্তরবর্ষণে হত্যা না কর, তজ্জন্য আমি আমার পালনকর্তা ও তোমাদের পালনকর্তার শরণাপন্ন হচ্ছি। তোমরা যদি আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না কর, তবে আমার কাছ থেকে আলাদা থাক (অর্থাৎ আমাকে কষ্ট দেওয়ার চেষ্টা করো না। কারণ, আমার তাতে কোন ক্ষতি হবে না। আল্লাহ্ ওয়াদা করেছেন فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا কিন্তু তোমাদের অপরাধ আরও গুরুতর হয়ে যাবে। তাই এরূপ করো না। কিন্তু তারা মানবার পাত্র ছিল না।) তখন মূসা (আ) তাঁর পালনকর্তার কাছে দোয়া করলেন, এরা বড় অপরাধী সম্প্রদায়। (অপরাধ থেকে বিরত হয় না। কাজেই তাদের ফয়সালা করে দিন। আমি দোয়া কবূল করলাম এবং বললাম,) তুমি আমার বান্দাদেরকে নিয়ে রাত্রি বেলায় বের হয়ে পড়। (কেননা, ফিরাউনের পক্ষ থেকে) তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হবে। (তাই রাত্রি বেলায় বের হলে দূরে যেতে পারবে। ফলে তারা তোমাদেরকে ধরতে পারবে না। চলার পথে যে সমুদ্র পড়বে,) তুমিই (সেই)

সমুদ্রকে (প্রথমে লাঠি দ্বারা আঘাত করবে, এবং তাতে সে শুষ্ক হয়ে পথ দেবে। অতপর পার হওয়ার পর তাকে তদবস্থায় দেখে চিন্তা করো না যে, ফিরাউনও সম্ভবত পার হয়ে যাবে। বরং তুমি তাকে) অচল থাকতে দেবে (এবং নিশ্চিন্ত থাকবে। তাকে অচল থাকতে দেওয়ার রহস্য এই যে,) তাদের সমস্ত বাহিনী (এ সমুদ্রে) নিমজ্জিত হবে। [তারা সমুদ্রকে অচল দেখে তাতে প্রবেশ করবে এবং প্রবেশ করার পরই সমুদ্র চলমান হয়ে যাবে এবং দুদিক থেকে পানি এসে মিলে যাবে। সেমতে তাই হয়েছিল। মূসা (আ) পার হয়ে গেলেন এবং ফিরাউন ও তার বাহিনী তাতে নিমজ্জিত হল।] তারা ছেড়ে গেল কত উদ্যান ও প্রস্রবণ, কত শস্যক্ষেত্র ও সুরম্য প্রাসাদ, কত সুখের উপকরণ, যাতে তারা আনন্দিত থাকত। (এ ঘটনা) এরূপই হয়েছিল এবং আমি ভিন্ন সম্প্রদায়কে (অর্থাৎ বনী ইসরাঈলকে) এগুলোর মালিক করে দিলাম। (যেহেতু তারা খুব ঘৃণিত ছিল, তাই) তাদের জন্য আকাশ ও পৃথিবী ক্রন্দন করেনি এবং তারা (আযাব থেকে) অবকাশও পায়নি। (অর্থাৎ আরও কিছুদিন বেঁচে থাকলে জাহান্নামের আযাব থেকে আরও কিছুদিন অবকাশ পেত।) আমি (এভাবে) বনী ইসরাঈলকে অপমানজনক আযাব থেকে উদ্ধার করেছি (অর্থাৎ ফিরাউন থেকে। তার অত্যাচার ও নিপীড়ন থেকে।) নিশ্চয় সে (দাসত্বের) সীমালংঘনকারীদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় ছিল। আমি বনী ইসরাঈলকে (আরও নিয়ামত দিয়েছি এবং) জেনেশুনে তাদেরকে (কোন কোন ব্যাপারে) বিশ্বাসীদর উপর (অথবা সকল ব্যাপারে তখনকার লোকদের উপর) শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। সেসব নিয়ামত ও পুরস্কার তো ছিলই, আল্লাহ্‌র কুদরতের নিদর্শনও ছিল বটে। অর্থাৎ আমি তাদের এমন নিদর্শনাবলী দিয়েছি, যাতে স্পষ্ট পুরস্কার ছিল। (অর্থাৎ তাদের প্রতি অনুগ্রহের পুরস্কারও ছিল এবং আমার কুদরতের দলীলও। তন্মধ্যে ছিল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নিয়ামত। যেমন, ফিরা-উনের কবল থেকে উদ্ধার করা। আর কিছু ছিল অপ্রকাশ্য। যেমন, জ্ঞান, কিতাব ও মু'জিযা দর্শন)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ---(তোমরা যাতে আমাকে প্রস্তর বর্ষণে হত্যা না কর, তজ্জন্যে আমি আমার পালনকর্তা ও তোমাদের পালনকর্তার শরণাপন্ন হচ্ছি।) رجم শব্দের অর্থ প্রস্তর বর্ষণে হত্যা করা। এর অপর অর্থ কাউকে গালি দেওয়াও হয়। এখানে উভয় অর্থই হতে পারে, কিন্তু প্রথম অর্থ নেয়াই অধিক সঙ্গত। কেননা, ফিরাউনের সম্প্রদায় মূসা (আ)-কে হত্যার হুমকি দিচ্ছিল।

وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا---(সমুদ্রকে শান্ত ও অচল অবস্থায় থাকতে দাও।)

মূসা (আ) সঙ্গীগণসহ সমুদ্র পার হওয়ার পর স্বাভাবিকভাবে কামনা করবেন যে, সমুদ্র

পুনরায় আসল অবস্থায় ফিরে যাক, যাতে ফিরাউনের বাহিনী পার হতে না পারে। তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে বলে দিলেন, তোমরা পার হওয়ার পর সমুদ্রকে শান্ত ও অচল অবস্থায় থাকতে দাও এবং পুনরায় পানি চলমান হওয়ার চিন্তা করো না ---যাতে ফিরাউন শুষ্ক ও তৈরি পথ দেখে সমুদ্রের মধ্যস্থলে প্রবেশ করে। তখন আমি সমুদ্রকে চলমান করে দেব এবং তারা তাতে নিমজ্জিত হবে।---(ইবনে কাসীর)

وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ---(আমি এক ভিন্ন জাতিকে সেসবের উত্তরাধিকারী করে দিলাম।) সূরা শু'আরায় বলা হয়েছে যে, এই 'ভিন্ন জাতি' হচ্ছে বনী ইসরাঈল। অবশ্য বনী ইসরাঈল পুনরায় মিসরে আগমন করেছিল বলে ইতিহাসে প্রমাণ পাওয়া যায় না। সূরা শু'আরার তফসীরে এর জওয়াবও দেওয়া হয়েছে।

আকাশ ও পৃথিবীর ক্রন্দন ঃ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ---(অতপর তাদের জন্য আকাশ ও পৃথিবী ক্রন্দন করেনি।) উদ্দেশ্য এই যে, তারা পৃথিবীতে কোন সৎকর্ম করেনি যে, তাদের মৃত্যুতে পৃথিবী ক্রন্দন করবে এবং তাদের কোন সৎকর্ম আকাশেও পৌঁছায়নি যে, তাদের জন্য আকাশ অশ্রুপাত করবে। একাধিক রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে যে, কোন সৎকর্মপরায়ণ বান্দার মৃত্যু হলে আকাশ ও পৃথিবী ক্রন্দন করে। হযরত আনাস (রা)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, আকাশে প্রত্যেক বান্দার জন্য দু'টি দ্বার নির্দিষ্ট রয়েছে। এক দ্বার দিয়ে তার রিযিক অবতীর্ণ হয় এবং অন্য দ্বার দিয়ে তার কর্ম ও কথাবার্তা উপরে পৌঁছে। এই বান্দার মৃত্যু হলে উভয় দ্বার তাকে স্মরণ করে ক্রন্দন করে। এরপর তিনি প্রমাণস্বরূপ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ আয়াতখানি তিলাওয়াত করেন। ইবনে আব্বাস থেকেও এমনি ধরনের হাদীস বর্ণিত রয়েছে।---(ইবনে কাসীর) শোরায়াহ্ ইবনে ওবায়দ (রা)-এর অন্য এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, প্রবাসে মৃত্যুবরণ করার দরুন যে মু'মিন ব্যক্তির জন্য কোন ক্রন্দনকারী থাকে না, তার জন্য আকাশ ও পৃথিবী ক্রন্দন করে। এর সাথেও তিনি আলোচ্য আয়াত তিলাওয়াত করেন এবং বলেন, পৃথিবী ও আকাশ কোন কাফিরের জন্য ক্রন্দন করে না।---(ইবনে জরীর) হযরত আলী (রা)-ও সৎলোকের মৃত্যুতে আকাশ ও পৃথিবীর ক্রন্দনের কথা উল্লেখ করেছেন।---(ইবনে কাসীর)

কেউ কেউ এ আয়াতকে রূপক অর্থে ধরে নিয়ে বলেন, এতে আকাশ ও পৃথিবীর প্রকৃত ক্রন্দন বোঝানো হয়নি; বরং উদ্দেশ্য এই যে, তাদের অস্তিত্ব এমন অনুল্লেখযোগ্য ছিল যে, তাঁর অবসানে কেউ দুঃখিত ও পরিতপ্ত হয়নি। কিন্তু উল্লিখিত রেওয়ায়েত-দৃষ্টে এটাই অধিক সঙ্গত মনে হয় যে, আয়াতে আক্ষরিক অর্থেই ক্রন্দন বোঝানো হয়েছে। কেননা, এটা সম্ভবপর এবং রেওয়ায়েত দ্বারা সমর্থিত। কাজেই অহেতুক

রূপক অর্থ নেওয়ার প্রয়োজন নেই। এখন প্রশ্ন এই যে, আকাশ ও পৃথিবীতে চেতনা কোথায়? তারা ক্রন্দন করবে কেমন করে? জওয়াব এই যে, জগতের প্রত্যেকটি সৃষ্ট বস্তুতেই কিছু না কিছু চেতনা অবশ্যই বিদ্যমান রয়েছে। এক আয়াতে বলা হয়েছে وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ---আধুনিক বিজ্ঞানও ক্রমান্বয়ে এ সিদ্ধান্তেই উপনীত হচ্ছে। তবে আকাশ ও পৃথিবীর ক্রন্দন মানুষের ক্রন্দনের অনুরূপ হওয়া জরুরী নয়। তারা অবশ্যই অন্যভাবে ক্রন্দন করে, যার স্বরূপ আমাদের জানা নেই।

وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ---(আমি বনী ইসরাঈলকে জেনেশুনে বিশ্ববাসীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।) এতে উম্মতে মুহাম্মদী অপেক্ষা অধিক শ্রেষ্ঠত্ব জরুরী হয় না। কেননা, এখানে তৎকালীন বিশ্ববাসী বোঝানো হয়েছে। তখন তারা নিশ্চিতই জগতের শ্রেষ্ঠতম জাতি ছিল। এরই অনুরূপ কোরআনে হযরত মরিয়মকে বিশ্বের নারীদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দানের কথা বলা হয়েছে। এটাও সম্ভবপর যে, বিশেষ কোন বিষয়ে বনী ইসরাঈলকে সর্বকালের সর্বলোকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সমষ্টিগতভাবে উম্মতে মুহাম্মদীই শ্রেষ্ঠ। عَلَىٰ عِلْمٍ (জেনেশুনে) -এর উদ্দেশ্য এই যে, আমার প্রত্যেক কাজ প্রজ্ঞাভিত্তিক হয়ে থাকে। কাজেই প্রজ্ঞার দাবি অনুযায়ীই আমি শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।

وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ-----(আমি তাদেরকে এমন নিদর্শনাবলী দিয়েছি, যাতে প্রকৃষ্ট পুরস্কার ছিল।) এখানে লাঠি, দীপ্তিময় শুভ্র হাত ইত্যাদি মু'জিযা বোঝানো হয়েছে। শব্দের দু'অর্থ---পুরস্কার ও পরীক্ষা। এখানে উভয় অর্থ অনায়াসে সম্ভবপর।---(কুরতুবী)

إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ ۝ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ ۝ فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۝ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ أَهْلَكْنَاهُمْ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ۝ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ ۝ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ

لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٩﴾ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيْقَاتُهُمْ أَجْمَعِيْنَ ﴿٤٠﴾ يَوْمَ لَا يُغْنِيْ مَوْلًى عَنْ مَّوْلًى شَيْـًٔا وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿٤١﴾ إِلَّا مَنْ رَّحِمَ اللّٰهُ ۚ إِنَّهٗ هُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿٤٢﴾

(৩৪) কাফিররা বলেই থাকে, (৩৫) প্রথম মৃত্যুর মাধ্যমেই আমাদের সবকিছুর অবসান হবে এবং আমরা পুনরুত্থিত হব না। (৩৬) তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে নিয়ে এস। (৩৭) ওরা শ্রেষ্ঠ, না তুব্বার সম্প্রদায় ও তাদের পূর্ববর্তীরা? আমি ওদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি। ওরা ছিল অপরাধী। (৩৮) আমি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করিনি; (৩৯) আমি এগুলো যথাযথ উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছি; কিন্তু তাদের অধিকাংশই বুঝে না। (৪০) নিশ্চয় ফয়সালার দিন তাদের সবারই নির্ধারিত সময়, (৪১) যেদিন কোন বন্ধুই কোন বন্ধুর উপকারে আসবে না এবং তারা সাহায্য প্রাপ্তও হবে না। (৪২) তবে আল্লাহ্ যার প্রতি দয়া করেন, তার কথা ভিন্ন। নিশ্চয় তিনি পরাক্রমশালী দয়াময়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তারা (কিয়ামতের শাস্তির কথা শুনে কিয়ামত অস্বীকার করে এবং) বলে, দুনিয়ার মৃত্যুই আমাদের শেষ অবস্থা এবং আমরা পুনরুজ্জীবিত হব না। (অর্থাৎ পরকালীন জীবন বলতে কিছুই নেই)। দুনিয়ার জীবনের পর কিছুই হবে না। (অতএব হে মুসলমানগণ,) তোমরা (পরকাল সম্পর্কিত দাবিতে) সত্যবাদী হলে (অপেক্ষা সয় না, এখনই) আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে (জীবিত করে) নিয়ে আস। (অতপর তাদেরকে এ মর্মে শাসানো হয়েছে যে, তাদের চিন্তা করা উচিত,) তারা (শৌর্যবীর্যে) শ্রেষ্ঠ, না (ইয়ামেন সম্রাট) তুব্বার সম্প্রদায় ও তাদের পূর্ববর্তীরা? (যেমন, আদ, সামূদ ইত্যাদি। তারা অধিক উন্নত ছিল, কিন্তু) আমি তাদেরকে (ও) ধ্বংস করে দিয়েছি---(কেবল এ কারণে যে,) তারা ছিল অপরাধী। (কাজেই এরা অপরাধে বিরত না হয়ে কেমন করে বাঁচতে পারবে? অতপর কিয়ামতের সত্যতা ও রহস্য বর্ণিত হয়েছে।) আমি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করিনি, (বরং) আমি উভয়কে (অন্যান্য সৃষ্টিসহ) যথাযথ উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছি (যেমন, এগুলো দ্বারা একে তো আল্লাহ্র কুদরত বোঝা যায়, দ্বিতীয়ত প্রতিদান ও শাস্তির প্রমাণ পাওয়া যায়।) তাদের অধিকাংশ বোঝে না (যে, যিনি এমন

বিশাল আকাশ ও পৃথিবী প্রভৃতিকে প্রথমে সৃষ্টি করতে পারেন, তিনি দ্বিতীয় বারও সৃষ্টি করতে সক্ষম।) নিশ্চয় ফয়সালার দিন (অর্থাৎ কিয়ামতের দিন) এদের সকলের (পুনরুত্থান ও শাস্তি-প্রতিদানের) নির্ধারিত সময় (যা যথাসময়ে অবশ্যই সংঘটিত হবে। অতপর কিয়ামতের কিছু ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।) যে দিন কোন সম্পর্কশালী কোন সম্পর্কশালীর উপকারে আসবে না এবং (অন্য কোন তরফ থেকে, যেমন মিথ্যা উপাস্যদের তরফ থেকে) তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না। তবে আল্লাহ্ যার প্রতি দয়া করেন, তার জন্য আল্লাহ্র অনুমতিতে কৃত সুপারিশ কাজে আসবে এবং আল্লাহ্ তার সাহায্যকারী হবেন। তিনি (আল্লাহ্) পরাক্রমশালী (কাফির-দেরকে শাস্তি দেবেন), দয়াময় (মুসলমানদের প্রতি দয়া করবেন)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ—(তোমরা সত্যবাদী হলে আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে উপস্থিত কর।) এই আপত্তির জওয়াব সুস্পষ্ট বিধায় কোরআন পাক এর কোন জওয়াব দেয়নি। পরকালে মানুষ পুনরুজ্জীবিত হবে বলে দাবি করা হয়েছে। দুনিয়াতে জন্ম-মৃত্যু আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ আইন ও উপযোগিতার অধীন। কাজেই আল্লাহ্ তা'আলা কাউকে দুনিয়াতে পুনরুজ্জীবন দান না করলে পরকালেও দান করতে পারবেন না, এটা কেমন করে বোঝা যায়?—(বয়ানুল-কোরআন)

তুব্বার সম্প্রদায়ের ঘটনা ঃ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ—(তারা শৌর্যবীর্যে শ্রেষ্ঠ, না তুব্বার সম্প্রদায়?) কোরআনে দু'জায়গায় তুব্বার উল্লেখ রয়েছে—এখানে এবং সূরা ক্বাফে। কিন্তু উভয় জায়গায় কেবল নামই উল্লেখ করা হয়েছে—কোন বিস্তারিত ঘটনা বিবৃত হয়নি। তাই এ সম্পর্কে তফসীরবিদগণ দীর্ঘ আলোচনা করে-ছেন যে, এরা কোন্ জনগোষ্ঠী? বাস্তবে তুব্বা কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির নাম নয়, বরং এটা ইয়ামেনের হিমইয়ারী সম্রাটদের উপাধিবিশেষ। তারা দীর্ঘকাল পর্যন্ত ইয়ামেনের পশ্চিমাংশকে রাজধানী করে আরব, শাম, ইরাক ও আফ্রিকার কিছু অংশ শাসন করেছে। এ কারণেই تُبَّع শব্দের বহুবচন تبابعة ব্যবহৃত হয় এবং এই সম্রাটগণকে 'তাবাবেয়ায়ে-ইয়ামেন' বলা হয়। এখানে কোন সম্রাট বোঝানো হয়েছে, এসম্পর্কে হাফেজ ইবনে কাসীরের বক্তব্য অধিক সঙ্গত মনে হয়। তিনি বলেন, এখানে মধ্যবর্তী সম্রাট বোঝানো হয়েছে, যার নাম 'আস'আদ আবু কুরায়েব ইবনে মালফিকারেব। যে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নবুয়ত লাভের কমপক্ষে সাতশ বছর পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। হিমইয়ারী সম্রাটদের মধ্যে তার রাজত্বকাল সর্বাধিক ছিল। সে তার শাসনামলে অনেক দেশ জয় করে সমরকন্দ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন, এই দিগ্বিজয়কালে একবার সে মদীনা মুনাওয়ারার জনপদ অতিক্রম করে এবং তা

করায়ত্ত করার ইচ্ছা করে। মদীনাবাসীরা দিনের বেলায় তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করত এবং রাত্রিতে তার আতিথেয়তা করত। ফলে সে লজ্জিত হয়ে মদীনা জয়ের ইচ্ছা পরিত্যাগ করে। এ সময়েই মদীনার দু'জন ইহুদী আলিম তাকে হুঁশিয়ার করে দেয় যে, এই শহর সে করায়ত্ত করতে পারবে না; কারণ এটা শেষ পয়গম্বরের হিজরতভূমি। সম্রাট ইহুদী আলিমদ্বয়কে সাথে নিয়ে ইয়ামেন প্রত্যাবর্তন করে এবং তাদের শিক্ষা ও প্রচারে মুগ্ধ হয়ে ইহুদী ধর্ম গ্রহণ করে। বলা বাহুল্য, তখন ইহুদী ধর্মই সত্য ধর্ম ছিল। অতপর তার সম্প্রদায়ও সত্য ধর্মে দীক্ষিত হয়ে যায়। কিন্তু তার মৃত্যুর পর তারা আবার মূর্তিপূজা ও অগ্নিপূজা শুরু করে দেয়। ফলে তাদের উপর আল্লাহ্‌র গযব নাযিল হয়। সূরা সাবায় এসম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। ---(ইবনে কাসীর) এ থেকে জানা যায় যে, তুব্বার সম্প্রদায় ইসলাম গ্রহণ করেছিল, কিন্তু পরে পথভ্রষ্ট হয়ে আল্লাহ্‌র গযবে পতিত হয়েছিল। একারণেই কোরআনের উভয় জায়গায় 'তুব্বার সম্প্রদায়' উল্লেখ করা হয়েছে; শুধু তুব্বা উল্লিখিত হয়নি। হযরত সহল ইবনে সা'দ ও ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, لا تسبو تبعا فانه قد اسلم তোমরা তুব্বাকে মন্দ বলো না; কারণ সে ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

مَا خَلَقْنٰهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ---(আমি আকাশ ও পৃথিবী যথাযথ উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছি, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা বোঝে না।) উদ্দেশ্য এই যে, বোধশক্তি ও চিন্তাশক্তি থাকলে আকাশ-পৃথিবী ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সৃষ্টিসমূহ অনেক সত্য উদ্‌ঘাটন করে। উদাহরণত এগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার অপার কুদরত ও পরকালের সম্ভাব্যতা বোঝা যায়। কারণ, যে সত্তা এসব মহাসৃষ্টিকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনয়ন করেছেন, তিনি নিশ্চিতই এগুলোকে একবার ধ্বংস করে পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম। তৃতীয়ত এগুলোর মাধ্যমে শাস্তি ও প্রতিদানের প্রয়োজনীয়তাও বোঝা যায়। কারণ, পরকালের প্রতিদান ও শাস্তি না থাকলে সৃষ্টির সমগ্র কাণ্ডকারখানাই ভণ্ডুল হয়ে যায়। পৃথিবী সৃষ্টির রহস্যই তো একে পরীক্ষাগার করা এবং এরপর পরকালের শাস্তি ও প্রতিদান দেওয়া। নতুবা সৎ ও অসৎ উভয়ের পরিণতি এক হওয়া জরুরী হয়ে পড়ে। এটা আল্লাহ্‌র মাহাত্ম্যের পরিপন্থী। চতুর্থত সৃষ্টিজগত চিন্তাশীলদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্যে উদ্বুদ্ধও করে। কেননা, সমগ্র সৃষ্টিই তাঁর বিরাট অবদান। কাজেই এ অবদানের কৃতজ্ঞতা স্রষ্টার আনুগত্যের মাধ্যমে প্রকাশ করা বান্দার অবশ্য কর্তব্য।

اِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّوْمِ ﴿٤٣﴾ طَعَامُ الْاَثِيْمِ ﴿٤٤﴾ كَالْمُهْلِ ۚ يَغْلِيْ فِي الْبُطُوْنِ ﴿٤٥﴾

كَغَلْيِ الْحَمِيْمِ ﴿٤٦﴾ خُذُوْهُ فَاعْتِلُوْهُ اِلٰى سَوَآءِ الْجَحِيْمِ ﴿٤٧﴾ ثُمَّ صُبُّوْا

فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ۝٤٨ ذُقْ ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ
الْكَرِيمُ ۝٤٩ إِنَّ هَٰذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ ۝٥٠ إِنَّ الْمُتَّقِينَ
فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ۝٥١ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۝٥٢ يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ
وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ ۝٥٣ كَذَٰلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ۝٥٤
يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ ۝٥٥ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ
إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَىٰ ۖ وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ۝٥٦ فَضْلًا مِنْ
رَبِّكَ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝٥٧ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝٥٨ فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ ۝٥٩

(৪৩) নিশ্চয় যাক্কুম বৃক্ষ (৪৪) পাপীর খাদ্য হবে; (৪৫) গলিত তাম্রের মত পেটে ফুটতে থাকবে (৪৬) যেমন ফুটে পানি। (৪৭) একে ধর এবং টেনে নিয়ে যাও জাহান্নামের মধ্যস্থলে, (৪৮) অতপর তার মাথার উপর ফুটন্ত পানির আযাব ঢেলে দাও, (৪৯) স্বাদ গ্রহণ কর, তুমি তো সম্মানিত, সম্ভ্রান্ত! (৫০) এ সম্পর্কে তোমরা সন্দেহে পতিত ছিলে। (৫১) নিশ্চয় আল্লাহ্‌ভীরুরা নিরাপদ স্থানে থাকবে —(৫২) উদ্যানরাজি ও নির্ঝরিণীসমূহে। (৫৩) তারা পরিধান করবে চিকন ও পুরু রেশমীবস্ত্র, মুখোমুখি হয়ে বসবে। (৫৪) এরূপই হবে এবং আমি তাদেরকে আনতলোচনা স্ত্রী দেব। (৫৫) তারা সেখানে শান্ত মনে বিভিন্ন ফলমূল আনতে বলবে। (৫৬) তারা সেখানে মৃত্যু আস্বাদন করবে না প্রথম মৃত্যু ব্যতীত এবং আপনার পালনকর্তা তাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করবেন। (৫৭) আপনার পালনকর্তার কৃপায় এটাই মহা সাফল্য। (৫৮) আমি আপনার ভাষায় কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি, যাতে তারা স্মরণ রাখে। (৫৯) অতএব আপনি অপেক্ষা করুন, তারাও অপেক্ষা করছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নিশ্চয় যাক্কুম বৃক্ষ (সূরা ছাফফাতে এসম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে) বড় পাপীর (অর্থাৎ কাফিরের) খাদ্য হবে, যা (দৃষ্টিকটু হওয়ার ব্যাপারে) তেলের তলানির মত হবে এবং ফুটন্ত পানির মত ফুটতে থাকবে। ফেরেশতাগণকে (আদেশ

করা হবে) একে ধর এবং টেনে জাহান্নামের মধ্যস্থলে নিয়ে যাও, অতপর এর মস্তকের উপরে যন্ত্রণাদায়ক ফুটন্ত পানি ঢাল। (তাকে ঠাট্টাচ্ছলে বলা হবে এবার) স্বাদ গ্রহণ কর, তুমি তো বড় সম্মানিত, সম্ভ্রান্ত! (এটা তোমার সম্মান, যেমন তুমি দুনিয়াতে নিজেকে সম্মানিত ও সম্ভ্রান্ত মনে করে আমার আদেশ পালনে লজ্জাবোধ করতে। জাহান্নামীদেরকে বলা হবে,) এ সম্পর্কেই তোমরা সন্দেহ পোষণ (ও অস্বীকার) করতে। (অতপর জান্নাতীদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে,) নিশ্চয় আল্লাহ্‌ভীরুরা নিরাপদ স্থানে থাকবে অর্থাৎ উদ্যানরাজি ও নির্ঝরিণীসমূহে। তারা চিকন ও মোটা রেশমীবস্ত্র পরিধান করবে, সামনাসামনি বসবে। এরূপই হবে এবং আমি তাদেরকে সুন্দরী আনতলোচনা স্ত্রী দেব। তথায় তারা নিশ্চিত মনে বিভিন্ন ফলমূল আনতে বলবে। তথায় দুনিয়ার মৃত্যু ব্যতীত তারা মৃত্যু আস্বাদন করবে না (অর্থাৎ অমর হয়ে থাকবে)। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করবেন। এসবই হবে আপনার পালনকর্তার কৃপায়। এটাই মহাসাফল্য। (হে পয়গম্বর, আপনার কাজ শুধু তাদেরকে বলে যাওয়া। এই উদ্দেশ্যেই) আমি কোরআনকে আপনার (আরবী) ভাষায় সহজ করে দিয়েছি, যাতে তারা (একে বোঝে) উপদেশ গ্রহণ করে। অতএব (ওরা না মানলে) আপনি (এদের উপর বিপদ অবতরণের) অপেক্ষা করুন। তারাও (আপনার উপর বিপদ অবতরণের) অপেক্ষা করছে। (কাজেই আপনি দুঃখ ও চিন্তা না করে তাদের ব্যাপার আল্লাহ্‌র কাছে সোপর্দ করুন। তিনি নিজেই বুঝে নেবেন)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহে পরকালের কতিপয় অবস্থা বিধৃত হয়েছে এবং নিয়ম অনুযায়ী কোরআন পাক জান্নাত ও জাহান্নাম উভয়ের অবস্থা একের পর এক বর্ণনা করেছে।

إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ—যাক্কুমের স্বরূপ সম্পর্কে সূরা ছাফফাতে কিছু জরুরী বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, কোরআনের আয়াত থেকে বাহ্যত জানা যায়, যাক্কুম কাফিরদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করার আগেই খাওয়ানো হবে। কেননা, এখানে যাক্কুম খাওয়ানোর পর জাহান্নামের মধ্যস্থলে টেনে নিয়ে যাওয়ার আদেশ উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া সূরা ওয়াকেয়ার আয়াত هَٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ—থেকেও কেউ কেউ তাই বুঝেছেন। কেননা, দাওয়াতের পূর্বে মেহমানদেরকে যে আদর-আপ্যায়ন করা হয়, তাদের মতে তাকেই نزل—বলা হয়। পরবর্তী খাদ্যকে ضيافة—অথবা مادبة বলা হয়। কোরআনের ভাষায় জাহান্নামে প্রবেশের পরে যাক্কুম খাওয়ানোরও সম্ভাবনা রয়েছে। আলোচ্য আয়াতে

পরে জাহান্নামে টেনে নেওয়ার আদেশের অর্থ এই হবে যে, তারা পূর্বেই জাহান্নামে ছিল ; কিন্তু যাক্কুম খাওয়ানোর পর তাদেরকে আরও লাঞ্ছিত ও কষ্টদানের জন্য জাহান্নামের মধ্যস্থলে নিয়ে যাওয়া হবে।---(বয়ানুল-কোরআন)

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ كَرِيمٍ---এসব আয়াতে জান্নাতের চিরন্তন নিয়ামত-সমূহের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে এবং প্রায় সকল প্রকার নিয়ামতই এখানে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। কেননা, মানুষের প্রয়োজনীয় বস্তু সাধারণত ছয়টি---(১) উত্তম বাসগৃহ (২) উত্তম পোশাক, (৩) আকর্ষণীয় জীবনসঙ্গিনী (৪) সুস্বাদু খাদ্য (৫) এসব নিয়ামতের স্থায়িত্বের নিশ্চয়তা এবং (৬) দুঃখ-কষ্ট থেকে পূর্ণরূপে নিরাপদ থাকার আশ্বাস। এখন এ ছয়টি বস্তুই জান্নাতীদের জন্য প্রমাণিত করে দেওয়া হয়েছে। এখানে বাসস্থানকে 'নিরাপদ' বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বিপদমুক্ত হওয়াই মানুষের বাসস্থানের প্রধান গুণ।

سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ---এর অর্থ যথাক্রমে চিকন ও মোটা রেশমীবস্ত্র।

تَزْوِيج---زَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ-এর অর্থ একককে অন্যের যুগল করে দেওয়া। পরে শব্দটি বিবাহ করানোর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এ অর্থের প্রেক্ষিতে এখানে উদ্দেশ্য এই যে, জান্নাতী পুরুষদের বিয়ে সুন্দরী আনতলোচনা রমণীদের সাথে যথা নিয়মে সম্পন্ন করা হবে। জান্নাতে পার্থিব বিধি-বিধানের বাধ্যবাধকতা থাকবে না কিন্তু সম্মানার্থ এসব বিয়ে সম্পন্ন হবে। প্রথম অর্থের দিক দিয়ে উদ্দেশ্য এই যে, সুন্দরী আনতলোচনা রমণীদেরকে জান্নাতী পুরুষদের যুগল করে দেওয়া হবে এবং দান হিসাবে দেওয়া হবে। এর জন্য দুনিয়ার ন্যায় বিবাহ বন্ধনের প্রয়োজন নেই। لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى- ---অর্থাৎ একবার মৃত্যুর পর আর কোন মৃত্যু হবে না। এ নিয়ম জাহান্নামীদের জন্যও। কিন্তু সেটা তাদের জন্য অধিক কঠোর এবং জান্নাতীদের জন্য অধিক আনন্দ ও সুখের বিষয় হবে। কারণ, যত বড় নিয়ামতই হোক, তা বিলুপ্ত হওয়ার কল্পনা নিশ্চিতরূপেই মনে বিপদের রেখাপাত করে। জান্নাতীরা যখন কল্পনা করবে যে, এসব নিয়ামত তাদের কাছ থেকে কখনও ছিনিয়ে নেওয়া হবে না, তখন এটা তাদের আনন্দকে আরও বৃদ্ধি করে দেবে।

سورة الجاثية

সূরা জাসিয়া

মক্কায় অবতীর্ণ, ৩৭ আয়াত, ৪ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

حٰمٓ ﴿١﴾ تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ﴿٢﴾ اِنَّ فِي السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٣﴾ وَفِيْ خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ
دَآبَّةٍ اٰيٰتٌ لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ﴿٤﴾ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَآ
اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ رِّزْقٍ فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا
وَتَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ اٰيٰتٌ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ﴿٥﴾ تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا
عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِاَيِّ حَدِيْثٍ بَعْدَ اللّٰهِ وَاٰيٰتِهٖ يُؤْمِنُوْنَ ﴿٦﴾
وَيْلٌ لِّكُلِّ اَفَّاكٍ اَثِيْمٍ ﴿٧﴾ يَّسْمَعُ اٰيٰتِ اللّٰهِ تُتْلٰى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ
مُسْتَكْبِرًا كَاَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٨﴾ وَاِذَا عَلِمَ
مِنْ اٰيٰتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿٩﴾
مِنْ وَّرَآئِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِيْ عَنْهُمْ مَّا كَسَبُوْا شَيْئًا وَّلَا
مَا اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْلِيَآءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿١٠﴾ هٰذَا
هُدًى وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّنْ رِّجْزٍ اَلِيْمٌ ﴿١١﴾

পরম করুণাময় ও অসীম দাতা আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) হা-মীম, (২) পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ এ কিতাব। (৩) নিশ্চয় নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে মু'মিনদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে। (৪) আর

তোমাদের সৃষ্টিতে এবং বিক্ষিপ্ত জীবজন্তুর মধ্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে বিশ্বাসীদের জন্য। (৫) দিবারাত্রির পরিবর্তনে, আল্লাহ্ আকাশ থেকে যে রিযিক বর্ষণ করেন অতপর পৃথিবীকে তার মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত করেন, তাতে এবং বায়ুর পরিবর্তনে বুদ্ধিমানদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে। (৬) এগুলো আল্লাহ্‌র আয়াত, যা আমি আপনার কাছে আবৃত্তি করি যথাযথ রূপে। অতএব আল্লাহ্ ও তাঁর আয়াতের পর তারা কোন্ কথায় বিশ্বাস স্থাপন করবে? (৭) প্রত্যেক মিথ্যাবাদী পাপাচারীর দুর্ভোগ। (৮) সে আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ শুনে, অতপর অহংকারী হয়ে জেদ ধরে, যেন সে আয়াত শুনেনি। অতএব তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দিন। (৯) যখন সে আমার কোন আয়াত অবগত হয়, তখন তাকে ঠাট্টা রূপে গ্রহণ করে। এদের জন্যই রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি। (১০) তাদের সামনে রয়েছে জাহান্নাম। তারা যা উপার্জন করেছে, তা তাদের কোন কাজে আসবে না, তারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছে তারাও নয়। তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি। (১১) এটা সৎপথ প্রদর্শন, আর যারা তাদের পালনকর্তার আয়াতসমূহ অস্বীকার করে, তাদের জন্য রয়েছে কঠোর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হা-মীম (এর অর্থ আল্লাহ্ তা'আলা জানেন)। এটা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ কিতাব। (অতএব এর বিষয়বস্তু মনোযোগ দিয়ে শুনা দরকার। এখানে এক বিষয়বস্তু তওহীদ) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে মু'মিনদের (প্রমাণ গ্রহণের) জন্য (কুদরত ও তওহীদের) অনেক নিদর্শন রয়েছে। (এমনিভাবে) তোমাদের সৃজনে এবং (পৃথিবীতে) বিক্ষিপ্ত জীবজন্তুর সৃজনেও প্রমাণাদি রয়েছে বিশ্ববাসীদের জন্য। (এমনিভাবে) দিবারাত্রির পরিবর্তনে, আল্লাহ্ আকাশ থেকে যে রিযিক (অর্থাৎ রিযিকের উপকরণ) বর্ষণ করেন, অতপর তদ্দ্বারা পৃথিবীকে তার মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত করেন, তাতে এবং (এমনিভাবে) বায়ুর পরিবর্তনে (বায়ু কোন সময় পূবালী, কোন সময় পশ্চিমা, কোন সময় গরম এবং কোন সময় শীতল হয়। মোটকথা এসব বিষয়ে) নিদর্শনাবলী রয়েছে (সুস্থ) বিবেকবানদের জন্য। (এটা যে তওহীদের প্রমাণ, তা দ্বিতীয় পারায় إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় বিষয়বস্তু নবুয়তের প্রমাণ এভাবে যে,) এগুলো আল্লাহ্‌র আয়াত, যা আমি যথাযথ রূপে আপনাকে আবৃত্তি করে শুনাই। (এতে নবুয়ত প্রমাণিত হয়। কিন্তু এতবড় অলৌকিক প্রমাণ সত্ত্বেও যদি তারা না মানে তবে) আল্লাহ্ ও তাঁর আয়াতের পর তারা (এর চেয়ে বড়) কোন্ কথায় বিশ্বাস স্থাপন করবে? (তৃতীয় বিষয়বস্তু পরকাল, যেখানে সত্য বিরোধীদের শাস্তি হবে) প্রত্যেক (বিশ্বাস সম্পর্কিত কথাবার্তায়) মিথ্যাবাদী (এবং কর্মে) পাপাচারীর জন্য দুর্ভোগ। যে আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ শুনে অতপর অহংকারী হয়ে (স্বীয় কুফরে) অটল থাকে, যেন সে শুনেনি। অতএব তাকে

যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দিন। (সে এমন দুষ্ট যে,) যখন সে আমার কোন আয়াত অবগত হয়, তখন তাকে ঠাট্টা রূপে গ্রহণ করে। এদের জন্য রয়েছে (পরকালে) অপমানকর আযাব। (উদ্দেশ্য এই যে, যেসব আয়াত তিলাওয়াত শুনে এবং যে সব আয়াত এমনিতে অবগত হয়, সবগুলোকে মিথ্যা মনে করে।) তাদের সামনে রয়েছে জাহান্নাম। (তখন) তারা (দুনিয়াতে) যা উপার্জন করেছে (অর্থাৎ ধনসম্পত্তি ও কর্ম) তা তাদের কোন উপকারে আসবে না এবং তারাও (উপকারে আসবে না) যাদেরকে আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তারা বন্ধু রূপে গ্রহণ করেছে। তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি। (কারণ এই যে,) এই কোরআন আদ্যোপান্ত পথ নির্দেশক। (ফলে) যারা তাদের পালনকর্তার (এসব) আয়াত অস্বীকার করে, তাদের জন্য রয়েছে কঠোর যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সমগ্র সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ। এক উক্তি এই যে, قُلْ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَغْفِرُوْا لِلَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ اَيَّامَ اللّٰهِ আয়াতখানি শুধু মদীনায় অবতীর্ণ।

মক্কায় অবতীর্ণ অন্য সূরাসমূহের ন্যায় এর মৌলিক বিষয়বস্তু হল বিশ্বাস সংশোধন। সেমতে এতে তওহীদ, রিসালাত ও পরকাল সম্পর্কিত বিশ্বাসসমূহকেই বিভিন্নভাবে সপ্রমাণ করা হয়েছে। বিশেষভাবে পরকাল প্রমাণের দলীলাদি, কাফিরদের সন্দেহ ও বেদ্বীনদের খণ্ডন এতে বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে।

اِنَّ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ—এসব আয়াতের উদ্দেশ্য তওহীদ সপ্রমাণ করা। অনুরূপ আয়াত দ্বিতীয় পারায় বর্ণিত হয়েছে। উভয় জায়গায় শব্দ ও ভাষার সামান্য পার্থক্য সম্পর্কিত তাত্ত্বিক আলোচনা বিদ্যান পাঠকবর্গ ইমাম রাযীর তফসীরে কবীরে দেখতে পারেন। এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, এখানে সৃষ্টিজগতের বিভিন্ন নিদর্শন বর্ণনা করে এক জায়গায় বলা হয়েছে, এতে মু'মিনদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে, দ্বিতীয় জায়গায় বলা হয়েছে, বিশ্বাসীদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে এবং তৃতীয় জায়গায় বলা হয়েছে, বিবেকবানদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে। এতে বর্ণনা পদ্ধতির রকমফের ছাড়াও ইঙ্গিত রয়েছে যে, এসব নিদর্শন দ্বারা পূর্ণ উপকার তারাই লাভ করতে পারে, যারা ঈমান আনে, দ্বিতীয় পর্যায়ে তাদের জন্য উপকারী, যারা তৎক্ষণাৎ ঈমান না আনলেও অন্তরে বিশ্বাস সৃষ্টি হয়ে যায় যে, এগুলো তওহীদের দলীল। এই বিশ্বাস কোন না কোন দিন ঈমানের কারণ হতে পারে। তৃতীয় পর্যায়ে তাদের জন্য উপকারী, যারা বর্তমানে মু'মিন ও বিশ্বাসী না হলেও সুস্থ বুদ্ধির

অধিকারী। কারণ, সুস্থ বুদ্ধিসহকারে এসব নির্দর্শন সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে অবশেষে ঈমান ও বিশ্বাস অবশ্যই পয়দা হবে। তবে যারা সুস্থ বিবেক রাখে না অথবা এসব ব্যাপারে বিবেককে কষ্ট দেয়া পছন্দ করে না, তাদের সামনে হাজারো দলীল পেশ করলেও যথেষ্ট হবে না।

وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ---(মিথ্যাবাদী ও পাপাচারীর জন্য ভীষণ দুর্ভোগ)

কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, এই আয়াত নসর ইবনে হারেছ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, কোন রেওয়ায়েত থেকে হারেছ ইবনে কালদাহ্ সম্পর্কে এবং কোন রেওয়ায়েত থেকে আবু জাহ্ল ও তার সঙ্গীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হওয়ার কথা জানা যায়।---(কুরতুবী) আয়াতের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করার জন্য প্রকৃতপক্ষে কোন ব্যক্তি বিশেষকে নির্দিষ্ট করার প্রয়োজন নেই। শব্দ ব্যক্ত করছে যে, যে কেউ এসব বিশেষণে বিশেষিত, তার জন্যই দুর্ভোগ---একজন হোক অথবা তিন জন।

مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ---শব্দটি আরবীতে 'পশ্চাৎ' অর্থে বেশি এবং 'সামনে' অর্থে কম ব্যবহৃত হয়। অনেকেই এখানে 'সামনে' অর্থ নিয়েছেন। তফসীরের সার সংক্ষেপে তাই করা হয়েছে। যারা 'পেছনে' অর্থ নিয়েছেন, তাদের মতে উদ্দেশ্য এই যে, দুনিয়াতে তারা যেভাবে অহংকারী হয়ে জীবন-যাপন করছে, এর পেছনে অর্থাৎ পরে জাহান্নাম আসছে।---(কুরতুবী)

اَللّٰهُ الَّذِىْ سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِىَ الْفُلْكُ فِيْهِ بِاَمْرِهٖ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿١٢﴾ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا مِّنْهُ ۚ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿١٣﴾ قُلْ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَغْفِرُوْا لِلَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ اَيَّامَ اللّٰهِ لِيَجْزِىَ قَوْمًا ۢ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿١٤﴾ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ اَسَآءَ فَعَلَيْهَا ۚ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ تُرْجَعُوْنَ ﴿١٥﴾

---

(১২) তিনি আল্লাহ্ যিনি সমুদ্রকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন, যাতে তাঁর আদেশক্রমে তাতে জাহাজ চলাচল করে এবং যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ তালাশ কর ও তাঁর কৃতজ্ঞ হও। (১৩) এবং অধীন করে দিয়েছেন তোমাদের যা আছে নভো-

মণ্ডলে ও যা আছে ভূমণ্ডলে; তাঁর পক্ষ থেকে। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে। (১৪) মু'মিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদেরকে ক্ষমা করে, যারা আল্লাহ্‌র সে দিনগুলো সম্পর্কে বিশ্বাস রাখে না যাতে তিনি কোন সম্প্রদায়কে কৃতকর্মের প্রতিফল দেন। (১৫) যে সৎকাজ করে, সে নিজ স্বার্থেই তা করে, আর যে অসৎ কাজ করে, তা তার উপরই বর্তাবে। অতপর তোমরা তোমাদের পালন-কর্তার দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আল্লাহ্‌ তা'আলাই তোমাদের (উপকারের) জন্য সমুদ্রকে (কুদরতের) অধীন করে দিয়েছেন, যাতে তাঁর আদেশক্রমে তাতে নৌকা চলাচল করে এবং যাতে (এসব নৌকায় সফর করে) তোমরা তাঁর (দেয়া) রুযী তালাশ কর ও যাতে (রুযী লাভ করে) তোমরা শোকর কর। (এমনিভাবে) যা কিছু নভোমণ্ডলে আছে এবং যা কিছু ভূমণ্ডলে আছে তার পক্ষ থেকে (অর্থাৎ তাঁর আদেশক্রমে) অধীন করে দিয়েছেন, (যাতে তোমাদের উপকারের কারণ হয়।) নিশ্চয় এতে চিন্তাশীলদের জন্য (কুদরতের) দলীল রয়েছে। (কাফিরদের দুষ্টুমি দেখে মাঝে মাঝে মুসলমানদের মধ্যে ক্রোধ দেখা দিত। অতপর তাদেরকে মার্জনা করার আদেশ দেয়া হয়েছে।) আপনি মু'মিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদেরকে ক্ষমা করে, যারা আল্লাহ্‌র ব্যাপারাদির প্রতি (অর্থাৎ পরকালের প্রতিদান ও শাস্তির) বিশ্বাস রাখে না, যাতে আল্লাহ্‌ তা'আলা এক সম্প্রদায়কে (অর্থাৎ মুসলমানদেরকে) তাদের (এই সৎ) কর্মের (উত্তম) প্রতিফল দেন। (কেননা, আল্লাহ্‌র নীতি এই যে,) যে সৎকাজ করে, সে নিজ স্বার্থের (অর্থাৎ সওয়াবের) জন্য করে, আর যে অসৎ কাজ করে, তার শাস্তি তার উপর বর্তাবে। অতপর (সৎ ও অসৎ কাজ করার পর) তোমরা তোমাদের পালনকর্তার কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে। (সেখানে তোমাদেরকে তোমাদের ভাল কর্ম ও চরিত্রের উত্তম প্রতিদান এবং তোমাদের শত্রুদেরকে তাদের কুফর ও কুকর্মের গুরুতর শাস্তি দেয়া হবে। কাজেই এখানে ক্ষমা করাই তোমাদের উচিত।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

اَللّٰهُ الَّذِىْ سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ - - - وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ —কোরআন পাকে অনুগ্রহ তালাশ করার অর্থ সাধারণত জীবিকা উপার্জনের চেষ্টা-প্রচেষ্টা হয়ে থাকে। এখানে এরূপ অর্থও হতে পারে যে, তোমাদেরকে সমুদ্রে জাহাজ চালনার শক্তি দেয়া হয়েছে, যাতে তোমরা ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পার। এরূপ অর্থও সম্ভবপর যে, সমুদ্রে আমি অনেক উপকারী বস্তু সৃষ্টি করে সমুদ্রকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছি, যাতে তোমরা সেগুলো খোঁজ করে উপকৃত হও। আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে

জানা গেছে যে, সমুদ্রে এত অধিক খনিজ সম্পদ এবং ধনদৌলত লুক্কায়িত আছে, যা স্থলেও নেই।

قُلْ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَغْفِرُوْا لِلَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ اَيَّامَ اللّٰهِ —(আপনি মু'মিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদেরকে ক্ষমা করে, যারা আল্লাহ্র সে দিনগুলো সম্পর্কে বিশ্বাস রাখে না।) এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী আয়াতের শানে নুযূল এই যে, মক্কায় জনৈক মুশরিক হযরত উমর (রা)-এর বিরুদ্ধে দুর্নাম রটনা করেছিল। হযরত উমর এর বিনিময়ে তাকে শাস্তি দেওয়ার সংকল্প করেন। তখন এই আয়াত নাযিল হয়। এই রেওয়ায়েত অনুযায়ী আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ। অপর এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী বনী মুস্তালিক যুদ্ধে রসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবিগণসহ মুরাইসী নামক এক কূপের ধারে শিবির স্থাপন করেন। মুনাফিক সরদার আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই ও মুসলিম বাহিনীতে শামিল ছিল। সে তার গোলামকে কূপ থেকে পানি উঠানোর জন্য প্রেরণ করলে তার ফিরে আসতে বিলম্ব হয়ে গেল। আবদুল্লাহ্ এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে বলল, হযরত উমরের এক গোলাম কূপের কিনারায় বসা ছিল। সে রসূলুল্লাহ্ (সা) ও হযরত আবূ বকরের মশক ভর্তি না হওয়া পর্যন্ত কাউকে পানি উঠানোর অনুমতি দিল না। আবদুল্লাহ্ বলল, আমাদের মধ্যে ও তাদের মধ্যে এই প্রবাদ বাক্যই চমৎকার খাটে যে, কুকুরকে মোটাতাজা করলে সে তোমাকেই খেয়ে ফেলবে। হযরত উমর (রা) এ বিষয় অবগত হয়ে তরবারি হস্তে আবদুল্লাহ্র দিকে রওয়ানা হলেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। এই রেওয়ায়েত অনুযায়ী আয়াতটি মদীনায় অবতীর্ণ।---(কুরতুবী, রূহুল মা'আনী) সনদ খোঁজাখুঁজির পর যদি উভয় রেওয়ায়েত সহীহ্ প্রমাণিত হয়, তবে উভয়ের মধ্যে সমন্বয় এভাবে হতে পারে যে, আয়াতটি আসলে মক্কায় নাযিল হয়েছিল, অতপর বনী মুস্তালিক যুদ্ধে একই ধরনের ঘটনা সংঘটিত হওয়ায় রসূলুল্লাহ্ (সা) আয়াতটি সেখানেও তিলাওয়াত করে ঘটনার সাথে খাপ খাইয়ে দেন। শানে নুযূল সম্পর্কিত রেওয়ায়েতসমূহে প্রায়ই এ ধরনের ব্যাপার ঘটেছে। এটাও সম্ভবপর যে, জিবরাঈল (আ) স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য পুনরায় একই আয়াত বনী মুস্তালিক যুদ্ধের সময় নিয়ে আগমন করেন। উসূলে তফসীরের পরিভাষায় একে শানে নুযূলে মুকাররার (বারবার অবতরণ) বলা হয়। অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে আয়াতে اَيَّامَ اللّٰهِ শব্দের অর্থ পরকালে প্রতিদান ও শাস্তি সম্পর্কিত আল্লাহ্ তা'আলার ব্যাপারাদি। اَيَّام শব্দটি ঘটনাবলী ও ব্যাপারাদির অর্থে আরবীতে বহুল প্রচলিত।

এখানে দ্বিতীয় অনুধাবনযোগ্য বিষয় এই যে, আয়াতে 'মুশরিকদেরকে বলে দিন' না বলে 'যারা আল্লাহ্র ব্যাপারাদির প্রতি বিশ্বাস রাখে না, তাদেরকে বলে দিন' বলা হয়েছে। এতে সম্ভবত ইঙ্গিত আছে যে, তাদেরকে আসল শাস্তি পরকালে দেয়া হবে। যেহেতু তারা পরকাল বিশ্বাস করে না, তাই এ শাস্তি তাদের জন্য অপ্রত্যাশিত

হবে। অপ্রত্যাশিত কষ্ট অনেক বেশি হয়ে থাকে। ফলে তাদের ভবিষ্যৎ আযাব খুব কঠোর হবে এবং এর মাধ্যমে তাদের সকল কুকর্মের পুরোপুরি প্রতিশোধ নেয়া হবে। কাজেই দুনিয়াতে ছোটখাট ধরপাকড় করার চিন্তা আপনি করবেন না।

কেউ কেউ বলেন, এই আয়াতের আদেশ জিহাদের বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পর রহিত হয়ে গেছে। কিন্তু অধিকাংশের বক্তব্য এই যে, জিহাদের বিধানের সাথে এই আয়াতের কোন সম্পর্ক নেই। এতে সাধারণ সামাজিক কাজকারবারে ছোটখাট বিষয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ না করার শিক্ষা রয়েছে, যা প্রতি যুগে প্রযোজ্য। আজও এ শিক্ষা কার্যকর রয়েছে। অতএব একে রহিত বলা ঠিক নয়, বিশেষত এর শানে নুযূল যদি বনী মুস্তালিকের যুদ্ধকালীন ঘটনা হয়, তবে জিহাদের আয়াত একে রহিত করতে পারে না। কারণ, জিহাদের আয়াত এর অনেক আগেই অবতীর্ণ হয়েছিল।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿۱۶﴾ وَاٰتَيْنٰهُمْ بَيِّنٰتٍ مِّنَ الْاَمْرِ ۚ فَمَا اخْتَلَفُوْٓا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ ۙ بَغْيًاۢ بَيْنَهُمْ ؕ اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِيْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿۱۷﴾ ثُمَّ جَعَلْنٰكَ عَلٰى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۱۸﴾ اِنَّهُمْ لَنْ يُّغْنُوْا عَنْكَ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا ؕ وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِيْنَ ﴿۱۹﴾ هٰذَا بَصَآئِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ﴿۲۰﴾

(১৬) আমি বনী ইসরাঈলকে কিতাব, রাজত্ব ও নবুয়ত দান করেছিলাম এবং তাদেরকে পরিচ্ছন্ন রিযিক দিয়েছিলাম এবং বিশ্ববাসীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম। (১৭) আরও দিয়েছিলাম তাদেরকে ধর্মের সুস্পষ্ট প্রমাণাদি। অতপর তারা জ্ঞান লাভ করার পর শুধু পারস্পরিক জেদের বশবর্তী হয়ে মতভেদ সৃষ্টি করেছে। তারা যে বিষয়ে মতভেদ করত, আপনার পালনকর্তা কিয়ামতের দিন তার ফয়সালা করে

দেবেন। (১৮) এরপর আমি আপনাকে রেখেছি ধর্মের এক বিশেষ শরীয়তের উপর। অতএব আপনি এর অনুসরণ করুন এবং অজ্ঞানদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করবেন না। (১৯) আল্লাহ্‌র সামনে তারা আপনার কোন উপকারে আসবে না। জালিমরা একে অপরের বন্ধু। আর আল্লাহ্ পরহিযগারদের বন্ধু। (২০) এটা মানুষের জন্য জ্ঞানের কথা এবং বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য হিদায়েত ও রহমত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(নবুয়ত কোন অভিনব বিষয় নয় যে, একে অস্বীকার করতে হবে। সেমতে এর আগে) আমি বনী ইসরাঈলকে (ঐশী) কিতাব, প্রজ্ঞা (অর্থাৎ বিধানাবলীর জ্ঞান) ও নবুয়ত দিয়েছিলাম (অর্থাৎ তাদের মধ্যে পয়গম্বর সৃষ্টি করেছিলাম) এবং তাদেরকে পরিচ্ছন্ন বস্তু খাওয়ার জন্য দিয়েছিলাম (তীহ্ প্রান্তরে মান্না ও সালওয়া নাযিল করে এবং ভূ-জাত কল্যাণের ভাণ্ডার শাম দেশের অধিপতি করে) এবং (কোন কোন বিষয়ে, যেমন সমুদ্র দ্বিখণ্ডিত করা ও মেঘের ছায়া দান করা ইত্যাদি বিষয়ে) বিশ্ববাসীর উপর তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম। আমি তাদেরকে দীনের সুস্পষ্ট প্রমাণাদি দিয়েছিলাম, (অর্থাৎ তাদেরকে প্রকাশ্য মু'জিযা দেখিয়েছিলাম।) অতপর (পূর্ণ আনুগত্য করা উচিত ছিল, কিন্তু) তারা জ্ঞান লাভ করার পর শুধু পারস্পরিক জেদের বশবর্তী হয়ে মতভেদ সৃষ্টি করেছে। (দ্বিতীয় পারায় এ সম্পর্কে এভাবে বর্ণিত হয়ে গেছে। উদ্দেশ্য এই, যে জ্ঞানের সাহায্যে মতভেদ দূর করা উচিত ছিল, সে জ্ঞানকেই তারা মতভেদের কারণ বানিয়ে নিল। অতএব) যে বিষয়ে তারা মতভেদ করত, আপনার পালনকর্তা কিয়ামতের দিন তার (কার্যত) ফয়সালা করে দেবেন। এরপর (অর্থাৎ বনী ইসরাঈলে নবুয়ত খতম হওয়ার পর) আমি আপনাকে (নবুয়ত দান করেছি এবং) দীনের এক বিশেষ পন্থায় প্রতিষ্ঠিত করেছি। অতএব আপনি এরই অনুসরণ করুন (অর্থাৎ কর্মেও প্রচারেও) এবং মূর্খদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করবেন না (অর্থাৎ তাদের কামনা এই যে, আপনি তবলীগ না করুন। তারা আপনাকে উত্ত্যক্ত করে, যাতে আপনি অতিষ্ঠ হয়ে তবলীগ পরিত্যাগ করেন। অতপর এই আদেশের কারণ ব্যক্ত করা হয়েছে যে,) তারা আল্লাহ্‌র মুকাবিলায় আপনার কোন উপকারে আসবে না। (কাজেই তাদের অনুসরণ যেন না হয়।) জালিমরা (অর্থাৎ কাফিররা) একে অপরের বন্ধু (এবং একে অপরের কথা মানে।) আর আল্লাহ্ পরহিযগারদের বন্ধু (পরহিযগাররা তাঁর কথা মানে। সুতরাং আপনি যখন পরহিযগারদের নেতা, তখন আল্লাহ্‌র অনুসরণই আপনার কাজ—তাদের অনুসরণ নয়। মোটকথা, আপনি নবুয়ত ও শরীয়তের অধিকারী আর) এই কোরআন (যা আপনি পেয়েছেন) সাধারণ মানুষের জন্য জ্ঞানের কথা ও হিদায়তের উপায় এবং বিশ্বাসী (অর্থাৎ মু'মিনদের) জন্য রহমত (-এর কারণ)।

অনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহের বিষয়বস্তু রসূলুল্লাহ্ (সা)-র রিসালত সপ্রমাণ করা। এ প্রসঙ্গে কাফিরদের উৎপীড়নের মুখে তাঁকে সান্ত্বনাও দেওয়া হয়েছে। إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ—এ পর্যন্ত আয়াতসমূহ থেকে দু'টি বিষয় জানা যায়---

এক. বনী ইসরাঈলকে কিতাব ও নবুয়ত দিয়ে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সমর্থন এবং দুই. তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়া যে, বনী ইসরাঈল যে কারণে মতভেদ করেছিল, আপনার সম্প্রদায়ও সে কারণেই মতভেদ করছে অর্থাৎ দুনিয়াপ্রীতি ও পারস্পরিক বিদ্বেষ। কারণ এটা নয় যে, আপনার প্রমাণাদিতে কোন ত্রুটি আছে। কাজেই আপনি চিন্তিত হবেন না।---(বয়ানুল কোরআন)

পূর্ববর্তী উম্মতদের শরীয়তের বিধান আমাদের জন্য : ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ (এরপর আমি আপনাকে ধর্মের এক বিশেষ তরীকার উপর রেখেছি।) এখানে স্মর্তব্য যে, ইসলাম ধর্মের কিছু মৌলিক বিশ্বাস রয়েছে, যেমন তওহীদ, পরকাল ইত্যাদি এবং কিছু কর্মজীবন সম্পর্কিত বিধি-বিধান রয়েছে। মৌলিক বিশ্বাস প্রত্যেক নবীর উম্মতের জন্যই এক ও অভিন্ন। এতে কোনরূপ পরিবর্তন-পরিবর্ধন সম্ভবপর নয়। কিন্তু কর্মগত বিধান বিভিন্ন পয়গম্বরের শরীয়তে যুগের চাহিদা অনুসারে পরিবর্তিত হয়েছে। উপরোক্ত আয়াতে এসব কর্মগত বিধানকেই "ধর্মের এক বিশেষ তরীকা" বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। এ কারণেই ফিকাহ্‌বিদগণ এ আয়াত থেকে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য কেবল শরীয়তে মুহাম্মদীর বিধানাবলীই অবশ্য পালনীয়। পূর্ববর্তী উম্মতদের প্রাপ্ত বিধানাবলী কোরআন ও সুন্নাহ্ দ্বারা সমর্থিত না হওয়া পর্যন্ত আমাদের জন্য অবশ্য পালনীয় নয়। সমর্থনের এক প্রকার এই যে, কোরআন অথবা হাদীসে স্পষ্ট বলা হবে যে, অমুক নবীর উম্মতের এ বিধান তোমাদের জন্যও অবশ্য পালনীয়। আর দ্বিতীয় প্রকার এই যে, কোরআন পাক অথবা রসূলুল্লাহ্ (সা) পূর্ববর্তী কোন উম্মতের কোন বিধান প্রশংসাচ্ছলে বর্ণনা করবেন এবং বিধানটি আমাদের যুগে রহিত হয়ে গেছে, এরূপ বলা থেকে বিরত থাকবেন। এতেও বোঝা যায় যে, বিধানটি আমাদের শরীয়তে অব্যাহত রয়েছে। এমতাবস্থায় এই বিধান শরীয়তে মুহাম্মদীর অংশ হিসাবেই অবশ্য পালনীয় হবে।

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ ۚ

سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ۝ وَخَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ
وَلِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍۢ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ۝

(২১) যারা দুষ্কর্ম উপার্জন করেছে তারা কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে সে লোকদের মত করে দেব, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে---এবং তাদের জীবন ও মৃত্যু কি সমান হবে? তাদের দাবি কত মন্দ! (২২) আল্লাহ্ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন, যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি তার উপার্জনের ফল পায়। তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(কিয়ামতে অস্বীকারকারীরা) যারা দুষ্কর্ম (অর্থাৎ কুফর ও শিরক) করে তারা কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে সেই লোকদের মত করে দেব, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তাদের জীবন ও মৃত্যু সমান হবে? (অর্থাৎ মু'মিনদের জীবন ও মৃত্যু কি এ অর্থে সমান হবে যে, জীবিতাবস্থায় যেমন তারা কোন আনন্দ উপভোগ করেনি, মৃত্যুর পরও আনন্দ থেকে বঞ্চিত থাকবে? এমনিভাবে কাফিরদের জীবন ও মৃত্যুও কি এ অর্থে সমান হবে যে, জীবিতাবস্থায় যেমন তারা আযাব ও কষ্ট থেকে বেঁচে রয়েছে, মৃত্যুর পরও তেমনি নিরাপদ থাকবে? উদ্দেশ্য এই যে, পরকাল অস্বীকার করলে এটা জরুরী হয়ে পড়ে যে, আনুগত্যশীলরা তাদের আনুগত্যের ফল পাবে না এবং বিরুদ্ধাচরণকারীরা তাদের বিরোধিতার শাস্তিও ভোগ করবে না।) কত মন্দ এ ফয়সলা! আল্লাহ্ তা'আলা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল প্রজ্ঞাপূর্ণভাবে সৃষ্টি করেছেন। (এক প্রজ্ঞা তো এই যে, এসব মহাসৃষ্টি প্রত্যক্ষ করে প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তি বুঝে নেবে যে, যিনি এগুলো সৃষ্টি করতে পারেন, তিনি ধ্বংসের পর এগুলো পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম। ফলে কিয়ামত ও পরকালের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। আর দ্বিতীয় প্রজ্ঞা এই যে,) যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি তার উপার্জনের ফল লাভ করে। (এটা সবাই জানে যে দুনিয়াতে পূর্ণ ফল নেই, তাই পরকাল থাকা জরুরী। এই ফল দেওয়ার ব্যাপারে) তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পরজগৎ এবং তাতে প্রতিদান ও শাস্তি যুক্তির আলোকেই অপরিহার্য : উল্লিখিত আয়াতদ্বয়ের প্রথম আয়াতে প্রতিদান ও শাস্তি অপরিহার্য হওয়ার একটি যুক্তি বর্ণিত হয়েছে। যুক্তিটি এই যে, এটা প্রত্যক্ষ ও অনস্বীকার্য সত্য যে, দুনিয়াতে ভাল বা মন্দ কাজের পূর্ণ প্রতিফল পাওয়া যায় না, বরং সাধারণভাবে কাফির ও পাপাচারীরা

অঢেল ধনসম্পদ ও ভোগ-বিলাসে জীবন যাপন করে। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্যশীল বান্দা উপবাস, দারিদ্র্য ও বিপদাপদে জড়িত থাকে। প্রথমত দুনিয়াতে দুশ্চরিত্র অপরাধীদের অপরাধ অধিকাংশ সময়ই জানা যায় না, জানা গেলেও অধিকাংশ সময় তারা ধরা পড়ে না। আবার ধরা পড়লেও হালাল-হারাম ও সত্য-মিথ্যার পরওয়া না করে তারা শাস্তির কবল থেকে আত্মরক্ষার পথ খুঁজে নেয়। শত শত অপরাধীর মধ্যে কেউ যদি শাস্তি পায়ও তবে তাও তার অপরাধে পূর্ণ শাস্তি হয় না। এভাবে খোদাদ্রোহী ও খেয়ালখুশীর অনুসারীরা ইহজীবনে সদম্ভে প্রকাশ্য ঘুরে বেড়ায়। আর ঈমানদারগণ শরীয়তের অনুসরণ করে অনেক টাকা-পয়সা ও ভোগ-বিলাসকে হারাম মনে করে ত্যাগ করে এবং বিপদাপদ থেকে আত্মরক্ষার জন্যও কেবল বৈধপন্থা অবলম্বন করে। অতএব যদি ইহজগতের পর পরজগৎ ও পুনরুজ্জীবন এবং প্রতিদান ও শাস্তির ব্যবস্থা না থাকে, তবে ইহজগতে কোন চুরি-ডাকাতি, ব্যভিচার, হত্যা ইত্যাদিকে অপরাধ বলা নির্বুদ্ধিতা বৈ কিছুই নয়। এধরনের অপরাধীরা দুনিয়াতে প্রায়ই সফল জীবন-যাপন করে। চোর ও ডাকাত, এক রাত্রিতে এত ধনসম্পদ উপার্জন করে নেয়, যা একজন গ্রাজুয়েট সারা বছর চাকুরী ও পরিশ্রম করে উপার্জন করতে পারে না। এখন পরকাল ও হিসাব-নিকাশ না থাকলে এই চোর-ডাকাতকে এই ভদ্র-গ্রাজুয়েট অপেক্ষা উত্তম ও শ্রেষ্ঠ বলতে হবে। অথচ এটা কোন বিবেকবান ব্যক্তি বলতে পারে না। তবে ইহজগতে এদের বিরুদ্ধে প্রত্যেক রাষ্ট্রেই কঠোর শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে। কিন্তু অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা যায় যে, কেবলমাত্র সেই অপরাধীই ধরা পড়ে, যে নির্বোধ। চালাক, চতুর ও পেশাদার অপরাধীদের জন্য শাস্তির কবল থেকে আত্মরক্ষার পথ উন্মুক্ত রয়েছে। এ ঘুষের চোরা দরজাই তাদের সাজা এড়ানোর জন্য যথেষ্ট। মোটকথা স্বীকার করে নিন যে, দুনিয়াতে ভাল, মন্দ, সাধুতা ও অসাধুতা বলতে কিছু নেই---যেভাবে পার উদ্দেশ্য হাসিল করে নাও; কিন্তু দুনিয়াতে এর কোন প্রবক্তা নেই। কেউ এটা স্বীকার করে না। অতএব সাধুতা ও অসাধুতায় পার্থক্য স্বীকার করার পর একথাও স্বীকার করতে হবে যে, উভয়ের পরিণাম একরকম হতে পারে না। উভয়ের পরিণাম একরকম হলে এর চেয়ে বড় জুলুম আর কিছুই হবে না। আলোচ্য আয়াতে তাই বলা হয়েছে যে, তোমরা কি চাও, অপরাধী ও নির্দোষ ব্যক্তিকে ইহকালে ও পরকালে সমান করে দেওয়া হোক? এটা খুবই নির্বোধ ফয়সালা। দুনিয়াতে যখন ভাল ও মন্দের প্রতিদান ও শাস্তি পূর্ণরূপে পাওয়া যায় না, তখন এর জন্য পরকালের জীবন অপরিহার্য। দ্বিতীয় আয়াতে এ বিষয়বস্তুকেই পূর্ণতা দানের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে, وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ---আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়াকে কর্মক্ষেত্র ও পরীক্ষা ক্ষেত্র করেছেন---প্রতিদান ক্ষেত্র নয়। তাই প্রত্যেক কর্মের ভাল ও মন্দের প্রতিদান এ দুনিয়াতেই দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়নি।

أَفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلٰهَهُ هَوٰىهُ وَأَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلٰى عِلْمٍ وَّخَتَمَ
عَلٰى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلٰى بَصَرِهِ غِشٰوَةً ۗ فَمَنْ يَّهْدِيْهِ مِنْۢ
بَعْدِ اللّٰهِ ۗ أَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿٢٣﴾ وَقَالُوْا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا
الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَآ إِلَّا الدَّهْرُ ۚ وَمَا لَهُمْ بِذٰلِكَ
مِنْ عِلْمٍ ۚ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّوْنَ ﴿٢٤﴾ وَإِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ
اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّآ أَنْ قَالُوا ائْتُوْا
بِاٰبَآئِنَآ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٢٥﴾ قُلِ اللّٰهُ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ
ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ
النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٢٦﴾

(২৩) আপনি কি তার প্রতি লক্ষ্য করেছেন, যে তার খেয়ালখুশিকে স্বীয় উপাস্য স্থির করেছে? আল্লাহ্ জেনেশুনে তাকে পথভ্রষ্ট করেছেন তার কান ও অন্তরে মোহর এঁটে দিয়েছেন এবং তার চোখের উপর রেখেছেন পর্দা। অতএব আল্লাহ্র পর কে তাকে পথপ্রদর্শন করবে? তোমরা কি চিন্তাভাবনা কর না? (২৪) তারা বলে, আমাদের পার্থিব জীবনই তো শেষ; আমরা মরি ও বাঁচি মহাকালই আমাদেরকে ধ্বংস করে। তাদের কাছে এ ব্যাপারে কোন জ্ঞান নেই। তারা কেবল অনুমান করে কথা বলে। (২৫) তাদের কাছে যখন আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন একথা বলা ছাড়া তাদের কোন যুক্তিই থাকে না যে, তোমরা সত্যবাদী হলে আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে নিয়ে এস। (২৬) আপনি বলুন, আল্লাহ্ই তোমাদেরকে জীবন দান করেন, অতপর মৃত্যু দেন, অতপর তোমাদেরকে কিয়ামতের দিন একত্র করবেন, যাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ বোঝে না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(তওহীদ ও পরকালের এই সুস্পষ্ট বর্ণনার পর) আপনি কি তার প্রতি লক্ষ্য করেছেন, যে তার খেয়ালখুশিকে স্বীয় উপাস্য স্থির করেছে? (অর্থাৎ মন যা চায়, তারই অনুসরণ করে।) আল্লাহ্ তা'আলা তাকে জ্ঞানবুদ্ধি সত্ত্বেও পথভ্রষ্ট

করেছেন (অর্থাৎ সত্যকে শোনা ও বোঝার পরেও সে খেয়ালখুশির অনুসরণে পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে।) তার কান ও অন্তরে মোহর এঁটে দিয়েছেন এবং তার চোখের উপর রেখেছেন পর্দা। (অর্থাৎ প্রবৃত্তিপূজার কারণে সত্য গ্রহণের যোগ্যতা স্তিমিত হয়ে গেছে।) অতএব আল্লাহ্র (পথভ্রষ্ট করে দেওয়ার) পর কে তাকে পথ প্রদর্শন করবে ? (এতে সান্ত্বনাও রয়েছে। অতঃপর কাফিরদেরকে বলা হয়েছে,) তোমরা কি (এসব বর্ণনা শুনেও) বুঝ না ? (তারা বোঝত, কিন্তু উপকারী বোঝা বোঝত না।) তারা (অর্থাৎ কিয়ামত অস্বীকারকারীরা) বলে, আমাদের পার্থিব জীবন ব্যতীত কোন (পারলৌকিক) জীবন নেই। আমরা (এক মৃত্যুই) মরি ও (এক বাঁচাই) বাঁচি। (অর্থাৎ মৃত্যুর মত জীবনও দুনিয়াতেই সীমিত।) মহাকালই (অর্থাৎ মহাকালের চক্রই) আমাদেরকে ধ্বংস করে। (অর্থাৎ কাল অতিক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথে দৈহিক শক্তিও ক্ষয় পেতে থাকে এবং স্বাভাবিক কারণে মৃত্যু আসে। এমনিভাবে জীবনের কারণও স্বাভাবিক বিষয়াদি। এসব স্বাভাবিক বিষয় পরকালের মুখাপেক্ষী নয় বিধায় পরকালীন জীবন নেই।) তাদের কাছে এর কোন দলীল নেই, তারা কেবল অনুমানে কথা বলে। (অর্থাৎ পরকালীন জীবন না হওয়ার কোন দলীল নেই এবং সত্যপন্থীদের দলীলের কোন জওয়াবও তারা দিতে পারে না।) যখন (এ সম্পর্কে) তাদের কাছে আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় (যা উদ্দেশ্য প্রমাণ করতে যথেষ্ট,) তখন এ কথা বলা ছাড়া তাদের কোন জওয়াব থাকে না যে, তোমরা (এ দাবিতে) সত্যবাদী হলে আমাদের পূর্ব-পুরুষদেরকে (জীবিত করে) নিয়ে এস। আপনি (জওয়াবে) বলুন, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে (যতদিন ইচ্ছা,) জীবিত রাখেন, অতঃপর (যখন চাইবেন) মৃত্যু দেবেন। এরপর কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে (জীবিত করে,) একত্র করবেন, যাতে (অর্থাৎ যার বাস্তবতায়) কোন সন্দেহ নেই। (সুতরাং সে দিন জীবিত করার কথা বলা হয়েছে। দুনিয়াতে মৃতকে জীবিত না করলে সেটা না হওয়া জরুরী হয় না।) কিন্তু অধিকাংশ মানুষ বোঝে না (এবং প্রমাণ ছাড়াই সত্যকে অস্বীকার করে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰىهُ——(অর্থাৎ যে ব্যক্তি তার খেয়ালখুশিকে স্বীয় উপাস্য স্থির করে—) বলা বাহুল্য, কোন কাফিরও তার খেয়ালখুশিকে স্বীয় খোদা অথবা উপাস্য বলে না, কিন্তু কোরআন পাকের এ আয়াত ব্যক্ত করেছে যে, ইবাদত ও উপাসনা প্রকৃতপক্ষে আনুগত্যেরই নাম। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্যের মুকাবিলায় অন্য কারও আনুগত্য অবলম্বন করে, তাকেই তার উপাস্য বলা হবে। অতএব যে ব্যক্তি হালাল-হারাম ও জায়েয-নাজায়েযের পরওয়া করে না, আল্লাহ্ যে কাজকে হারাম বলেছেন, সে তাতে আল্লাহ্র আদেশের পরিবর্তে নিজের খেয়াল-খুশির অনুকরণ করে, সে মুখে খেয়ালখুশিকে

উপাস্য না বললেও প্রকৃতপক্ষে খেয়ালখুশিই তার উপাস্য। জনৈক সাধক কবি নিম্নোক্ত কবিতায় এই বিষয়টিই বর্ণনা করেছেন ঃ

سود ه گشت از سجده راه بتان پیشا نیم
چند برخود تهمت دین مسلما نی نهم

এতে খেয়ালখুশিকে প্রতিমা বলা হয়েছে। যে ব্যক্তি খেয়ালখুশিকে স্বীয় ইমাম ও অনুসৃত করে নেয়, তার সে খেয়ালখুশিই যেন তার প্রতিমা। হযরত আবূ ওমামা বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি যে, আকাশের নিচে দুনিয়াতে যত উপাস্যের উপাসনা করা হয়েছে, তন্মধ্যে আল্লাহ্র কাছে সর্বাধিক গর্হিত উপাস্য হচ্ছে খেয়ালখুশি। হযরত শাদ্দাদ ইবনে আওস (রা)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, সে ব্যক্তিই বুদ্ধিমান, যে তার খেয়ালখুশিকে বশে রেখে পরকালের জন্য কাজ করে। আর সে ব্যক্তিই পাপাচারী, যে তার মনকে খেয়ালখুশির পেছনে ছেড়ে দেয় এবং তারপরেও আল্লাহ্র কাছে পরকালের মঙ্গল কামনা করে। হযরত সহল ইবনে আবদুল্লাহ্ তস্তরী (র) বলেন, তোমাদের খেয়ালখুশি তোমাদের রোগ। তবে যদি খেয়ালখুশির বিরোধিতা কর, তবে এ রোগই তোমাদের প্রতিষেধক। —(কুরতবী)

وَمَا يُهْلِكُنَآ اِلَّا الدَّهْرُ—دَهْر শব্দের অর্থ আসলে মহাকাল, অর্থাৎ জগতের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সময়ের সমষ্টি। কখনও দীর্ঘ সময় কালকে دهر বলা হয়। কাফিররা দলীলস্বরূপ বলেছে যে, আল্লাহ্র আদেশ ও ইচ্ছার সাথে জীবন ও মৃত্যুর কোন সম্পর্ক নেই, বরং এগুলো প্রাকৃতিক কারণের অধীন। মৃত্যু সম্পর্কে তো সকলেই প্রত্যক্ষ করে যে, মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও শক্তি-সামর্থ্য ব্যবহারের কারণে ক্ষয়প্রাপ্ত হতে থাকে এবং দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার পর সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। এরই নাম মৃত্যু। জীবনও তদ্রূপ, কোন খোদায়ী আদেশে নয়। বরং উপকরণের প্রাকৃতিক গতিশীলতার মাধ্যমেই তা অর্জিত হয়।

দহর তথা মহাকালকে মন্দ বলা ঠিক নয় ঃ কাফির ও মুশরিকরা মহাকালের চক্রকেই সৃষ্টিজগত ও তার সমস্ত অবস্থার কারণ সাব্যস্ত করতে এবং সবকিছুকে তারই কারকতা বলে অভিহিত করত। অথচ এগুলো সব প্রকৃতপক্ষে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র কুদরত ও ইচ্ছায় সম্পন্ন হয়ে থাকে। তাই সহীহ্ হাদীসসমূহে দহর তথা মহাকালকে মন্দ বলতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা, কাফিররা যে শক্তিকে দহর শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করে, প্রকৃতপক্ষে সেই কুদরত ও শক্তি আল্লাহ্ তা'আলারই। তাই দহরকে মন্দ বলার ফল প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছে। রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, মহাকালকে গালি দিও না, কেননা প্রকৃতপক্ষে মহাকাল আল্লাহ্ই। উদ্দেশ্য এই যে, মূর্খরা যে কাজকে মহাকালের কাজ বলে, সেটা আসলে আল্লাহ্র শক্তি ও কুদরতেরই কাজ। মহাকাল কোন

কিছু নয়। এতে জরুরী হয় না যে, দহর আল্লাহ্ তা'আলার কোন নাম হবে। কেননা হাদীসে রূপক অর্থে আল্লাহ্ তা'আলাকে দহর বলা হয়েছে।

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَّخْسَرُ
الْمُبْطِلُوْنَ ﴿٢٧﴾ وَتَرٰى كُلَّ اُمَّةٍ جَاثِيَةً ۫ كُلُّ اُمَّةٍ تُدْعٰٓى اِلٰى
كِتٰبِهَا ۗ اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٢٨﴾ هٰذَا كِتٰبُنَا يَنْطِقُ
عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ ۗ اِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٢٩﴾
فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِيْ
رَحْمَتِهٖ ۗ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِيْنُ ﴿٣٠﴾ وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۫ اَفَلَمْ
تَكُنْ اٰيٰتِيْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ ﴿٣١﴾
وَاِذَا قِيْلَ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيْهَا
قُلْتُمْ مَّا نَدْرِيْ مَا السَّاعَةُ ۙ اِنْ نَّظُنُّ اِلَّا ظَنًّا وَّمَا نَحْنُ
بِمُسْتَيْقِنِيْنَ ﴿٣٢﴾ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا عَمِلُوْا وَحَاقَ بِهِمْ مَّا
كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٣٣﴾ وَقِيْلَ الْيَوْمَ نَنْسٰىكُمْ كَمَا نَسِيْتُمْ
لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا وَمَاْوٰىكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿٣٤﴾ ذٰلِكُمْ
بِاَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا وَّغَرَّتْكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ۚ
فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُوْنَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ ﴿٣٥﴾ فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ رَبِّ
السَّمٰوٰتِ وَرَبِّ الْاَرْضِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٣٦﴾ وَلَهُ الْكِبْرِيَآءُ فِي
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۪ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٣٧﴾

(২৭) নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের রাজত্ব আল্লাহ্রই। যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন মিথ্যাপন্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (২৮) আপনি প্রত্যেক উম্মতকে দেখবেন নতজানু অবস্থায়। প্রত্যেক উম্মতকে তাদের আমলনামা দেখতে বলা হবে। তোমরা যা করতে, অদ্য তোমাদেরকে তার প্রতিফল দেয়া হবে। (২৯) আমার কাছে রক্ষিত এই আমলনামা তোমাদের সম্পর্কে সত্য কথা বলবে। তোমরা যা করতে আমি তা লিপিবদ্ধ করতাম। (৩০) যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সৎকর্ম করেছে, তাদেরকে তাদের পালনকর্তা স্বীয় রহমতে দাখিল করবেন। এটাই প্রকাশ্য সাফল্য। (৩১) আর যারা কুফর করেছে, তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমাদের কাছে কি আয়াতসমূহ পঠিত হত না? কিন্তু তোমরা অহংকার করেছিলে এবং তোমরা ছিলে এক অপরাধী সম্প্রদায়। (৩২) যখন বলা হত, আল্লাহ্র ওয়াদা সত্য এবং কিয়ামতে কোন সন্দেহ নেই, তখন তোমরা বলতে আমরা জানি না কিয়ামত কি? আমরা কেবল ধারণাই করি এবং এ বিষয়ে আমরা নিশ্চিত নই। (৩৩) তাদের মন্দ কর্মগুলো তাদের সামনে প্রকাশ হয়ে পড়বে এবং যে আযাব নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত, তা তাদেরকে গ্রাস করবে। (৩৪) বলা হবে, আজ আমি তোমাদেরকে ভুলে যাব, যেমন তোমরা এ দিনের সাক্ষাৎকে ভুলে গিয়েছিলে। তোমাদের আবাস স্থল জাহান্নাম এবং তোমাদের সাহায্যকারী নেই। (৩৫) এটা এ জন্য যে তোমরা আল্লাহ্র আয়াতসমূহকে ঠাট্টা-রূপে গ্রহণ করেছিলে এবং পার্থিব জীবন তোমাদেরকে প্রতারিত করেছিল। সুতরাং আজ তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে না এবং তাদের কাছে তওবা চাওয়া হবে না। (৩৬) অতএব বিশ্ব-জগতের পালনকর্তা, ভূ-মণ্ডলের পালনকর্তা ও নভোমণ্ডলের পালনকর্তা আল্লাহ্রই প্রশংসা। (৩৭) নভোমণ্ডলে ও ভূ-মণ্ডলে তাঁরই গৌরব। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(উপরে বলা হয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে একত্র করবেন, একে কঠিন মনে করা উচিত নয়। কেননা,) নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের রাজত্ব আল্লাহ্ তা'আলারই (তিনি যা ইচ্ছা করেন। কাজেই মৃত্যুর পর তোমাদেরকে জীবিত করাও তাঁর জন্য কঠিন নয়)। যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন মিথ্যাপন্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আপনি (সেদিন) প্রত্যেক দলকে (ভয়ে) নতজানু অবস্থায় দেখবেন। প্রত্যেক দলকে তাদের আমলনামার (হিসাবের) দিকে আহ্বান করা হবে। (আহ্বান করার অর্থ তাই। নতুবা আমলনামা তো তাদের কাছেই থাকবে। তাদেরকে বলা হবে,) আজ তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্মের প্রতিফল দেওয়া হবে। (আরও বলা হবে,) এটা আমার (লেখানো) আমলনামা, যা তোমাদের বিরুদ্ধে সত্য বলছে (অর্থাৎ তোমাদের কর্মকাণ্ড প্রকাশ করছে।) তোমরা (দুনিয়াতে) যা করতে, আমি (ফেরেশতা দ্বারা) তা লিপিবদ্ধ করাতাম। (এটা সেগুলোরই সমষ্টি।) অতপর (হিসাবের ফয়সালা এই হবে যে,) যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে তাদেরকে তাদের পালনকর্তা স্বীয়

রহমতে দাখিল করবেন। এটা প্রকাশ্য সাফল্য আর যারা কুফর করেছে, (তাদেরকে বলা হবে,) তোমাদেরকে কি আমার আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনানো হত না? কিন্তু তোমরা (সেগুলো মেনে নিতে) অহংকার করেছিলে এবং (এ কারণে) তোমরা ছিলে অপরাধী। যখন (তোমাদেরকে) বলা হত, (পুনরুজ্জীবিত করে শাস্তি ও প্রতিদান সম্পর্কিত) আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য এবং কিয়ামতে কোন সন্দেহ নেই, তখন তোমরা (তাচ্ছিল্য ভরে) বলতে, আমরা জানি না কিয়ামত কি? (কেবল শুনে শুনে) আমরা নিছক ধারণাই করি এবং এ বিষয়ে আমরা নিশ্চিত নই। (তখন) তাদের মন্দ কর্ম-গুলো তাদের সামনে প্রকাশ হয়ে পড়বে এবং যে আযাব নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত, তা তাদেরকে গ্রাস করবে। (তাদেরকে) বলা হবে, আজ আমি তোমাদেরকে বিস্মৃত করব, (অর্থাৎ রহমত থেকে বঞ্চিত করব) যেমন তোমরা এ দিনের সাক্ষাতে বিস্মৃত হয়েছিলে। (আজ থেকে) তোমাদের আবাসস্থল জাহান্নাম এবং তোমাদের কোন সাহায্যকারী নেই। এটা (অর্থাৎ এই শাস্তি) এ কারণে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র আয়াত-সমূহকে ঠাট্টা-রূপে গ্রহণ করেছিলে এবং পার্থিব জীবন তোমাদেরকে প্রতারিত করেছিল (তাতে মশগুল হয়ে পরকাল থেকে গাফিল বরং পরকাল স্বীকারই করতে না।) সুতরাং আজ তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে না। এবং তাদের কাছে তওবা চাওয়া হবে না, (অর্থাৎ তওবা করে আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করে নেয়ার সুযোগ দেওয়া হবে না। এসব বিষয়বস্তু থেকে এ কথাও জানা গেল যে,) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌রই যিনি নভো-মণ্ডলের পালনকর্তা, ভূ-মণ্ডলের পালনকর্তা, (শুধু তাই নয়) বিশ্ব-জগতেরও পালনকর্তা। গৌরব তাঁরই (যার আলামত প্রকাশ পায়) আকাশে ও পৃথিবীতে। তিনিই পরাক্রম-শালী, প্রজ্ঞাময়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً — جثو—এর অর্থ নতজানু হয়ে বসা। ভয়ের কারণে এভাবে বসবে। كل امة (প্রত্যেক দল) শব্দ থেকে বাহ্যত বোঝা যায় যে, মু'মিন, কাফির, সৎ ও অসৎ নির্বিশেষে সকলেই হাশরের ময়দানে ভয়ে নতজানু হয়ে বসবে। কোন কোন আয়াত ও রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, হাশরের ময়দানে পয়গম্বর ও সৎকর্ম-পরায়ণ ব্যক্তিগণ ভীত হবেন না। এটা আলোচ্য আয়াতের পরিপন্থী নয়; কেননা অল্প কিছুক্ষণের জন্য এই ভয় ও ত্রাস পয়গম্বর ও সৎ লোকদের মধ্যেও দেখা দেওয়া সম্ভবপর। কিন্তু যেহেতু খুব অল্প সময়ের জন্য এই ভয় দেখা দেবে, তাই একে না হওয়ার পর্যায়ে রেখে দেওয়া হয়েছে। এটাও সম্ভবপর যে, 'প্রত্যেক দল' বলে অধিকাংশ হাশরবাসী বোঝানো হয়েছে। كل শব্দটি মাঝে মাঝে অধিকাংশের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। কেউ কেউ جاثية এর অর্থ করেছেন নামাযে বসার ন্যায় বসা। এমতাবস্থায় কোন খট্‌কা থাকে না। কেননা, এটা আদবের বসা—ভয়ের নয়।

كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا—অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে এখানে কিতাব অর্থ দুনিয়াতে ফেরেশতাগণের লিখিত আমলনামা। হাশরের ময়দানে এসব আমলনামা উড়িয়ে দেওয়া হবে এবং প্রত্যেকের আমলনামা তার হাতে পৌঁছে যাবে। তাকে বলা হবে, اِقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا—অর্থাৎ তুমি তোমার আমলনামা পাঠ কর এবং নিজেই হিসাব কর কি প্রতিফল তোমার পাওয়া উচিত। আমলনামার দিকে আহবান করার অর্থ আমলের হিসাবের দিকে আহবান করা।

سورة الاحقاف

সূরা আহ্কাফ

মক্কায় অবতীর্ণ, ৪ রুকূ, ৩৫ আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

حٰمٓ ۚ تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ مَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ
وَ الْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ وَ اَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ وَ الَّذِيْنَ
كَفَرُوْا عَمَّآ اُنْذِرُوْا مُعْرِضُوْنَ ۝ قُلْ اَرَءَيْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ
مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَرُوْنِيْ مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ الْاَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ
فِي السَّمٰوٰتِ ؕ اِيْتُوْنِيْ بِكِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ هٰذَآ اَوْ اَثٰرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ اِنْ كُنْتُمْ
صٰدِقِيْنَ ۝ وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ يَّدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَنْ لَّا
يَسْتَجِيْبُ لَهٗٓ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَآئِهِمْ غٰفِلُوْنَ ۝ وَاِذَا
حُشِرَ النَّاسُ كَانُوْا لَهُمْ اَعْدَآءً وَّكَانُوْا بِعِبَادَتِهِمْ كٰفِرِيْنَ ۝

পরম করুণাময় ও অসীম দাতা আল্লাহ্‌র নামে শুরু—

(১) হা-মীম, (২) এই কিতাব পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। (৩) নভোমণ্ডল, ভূ-মণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু আমি যথাযথ-ভাবেই এবং নির্দিষ্ট সময়ের জন্যই সৃষ্টি করেছি। আর কাফিররা যে বিষয়ে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে, তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। (৪) বলুন, তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত যাদের পূজা কর, তাদের বিষয়ে ভেবে দেখেছ কি? দেখাও আমাকে তারা পৃথিবীতে কি সৃষ্টি করেছে? অথবা নভোমণ্ডল সৃজনে তাদের কি কোন অংশ

আছে ? এর পূর্ববর্তী কোন কিতাব অথবা পরম্পরাগত কোন জ্ঞান আমার কাছে উপস্থিত কর—যদি তোমরা সত্যবাদী হও। (৫) যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পরিবর্তে এমন বস্তুর পূজা করে, যে কিয়ামত পর্যন্তও তার ডাকে সাড়া দেবে না, তার চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে ? তারা তো তাদের পূজা সম্পর্কেও বেখবর। (৬) যখন মানুষকে হাশরে একত্র করা হবে, তখন তারা তাদের শত্রু হবে এবং তাদের ইবাদত অস্বীকার করবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হা-মীম (-এর অর্থ আল্লাহ্ তা'আলা জানেন), এই কিতাব পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। (তাই এর বিষয়বস্তু অনুধাবনযোগ্য। অতপর তওহীদ ও পরকাল বর্ণিত হয়েছে,) আমি নভোমণ্ডল, ভূ-মণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু প্রজ্ঞা সহকারে এবং নির্দিষ্ট সময়ের জন্যই সৃষ্টি করেছি। যারা কাফির, তাদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হয় (যেমন তওহীদ না মানলে কিয়ামতে তোমাদের আযাব হবে), তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় (এবং ভ্রূক্ষেপও করে না)। আপনি (তাদেরকে তওহীদ সম্পর্কে) বলুন, বল তো, আল্লাহ্র (তওহীদের) পরিবর্তে তোমরা যাদের পূজা কর, (তাদের পূজনীয় হওয়ার কি দলীল আছে। যুক্তিভিত্তিক দলীল থাকলে) আমাকে দেখাও যে, তারা কোন্ পৃথিবী সৃষ্টি করেছে অথবা আকাশ সৃজনে তাদের কোন্ অংশ আছে ? (বলা বাহুল্য, তোমরাও তাদেরকে স্রষ্টা স্বীকার কর না, যা পূজনীয় হওয়ার দলীল হতে পারে, বরং সৃষ্টই বলে থাক, যা পূজনীয় হওয়ার পরিপন্থী। সুতরাং যুক্তিভিত্তিক দলীল তো নেই। যদি তোমাদের কাছে ইতিহাস-ভিত্তিক দলীল থাকে, তবে) এর (অর্থাৎ কোরআনের) পূর্ববর্তী কোন (বিশুদ্ধ) কিতাব আমার কাছে উপস্থিত কর (যাতে শিরকের আদেশ রয়েছে। কেননা, তোমরাও জান যে, কোরআনে শিরকের খণ্ডন রয়েছে। সুতরাং অন্য কোন কিতাবের দরকার হবে।) অথবা (যদি কিতাব না থাকে, তবে) কোন (নির্ভরযোগ্য) পরম্পরাগত জ্ঞান (যা কিতাবে লিখিত হয়নি; বরং মৌখিক) আন—যদি তোমরা (শিরকের দাবিতে) সত্যবাদী হও। (উদ্দেশ্য এই যে, ইতিহাসভিত্তিক দলীলটি সমর্থনযোগ্য ও সনদসহ হওয়া দরকার, যেমন কোন নবীর কিতাব অথবা তার মৌখিক উক্তি হওয়া চাই। বলা বাহুল্য, এরূপ দলীলও কেউ পেশ করতে পারবে না। এতদসত্ত্বেও যারা মিথ্যা বিশ্বাস পরিত্যাগ করে না, অতপর তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে,) তার চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে, (যে দলীল দিতে অক্ষম হওয়া এবং বিপক্ষে দলীল কায়েম থাকা সত্ত্বেও) আল্লাহর পরিবর্তে এমন বস্তুর পূজা করে, যে কিয়ামত পর্যন্তও তার ডাকে সাড়া দেবে না এবং যে তার পূজারও খবর রাখে না ? অতপর যখন (কিয়ামতে) সমস্ত মানুষকে (হিসাবের জন্য) একত্র করা হবে, তখন তারা (অর্থাৎ উপাস্যরা) তাদের শত্রু হয়ে যাবে এবং তাদের ইবাদত অস্বীকার করবে। (সুতরাং এমন

উপাস্যদের উপাসনা করা নিতান্তই ভুল, যাদের উপাসনা করার কোন যুক্তি নেই এবং উপাসনা না করার যথেষ্ট কারণ মজুদ রয়েছে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

قُلْ أَرَءَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ—এসব আয়াতে মুশরিকদের দাবি বাতিল করার জন্য তাদের দাবির সপক্ষে দলীল চাওয়া হয়েছে। কেননা, সাক্ষ্য-প্রমাণ ব্যতীত কোন দাবি গ্রহণীয় হয় না। দলীলের যত প্রকার রয়েছে, সবগুলো আয়াতে উল্লেখ করে প্রমাণ করা হয়েছে যে, মুশরিকদের দাবির পক্ষে কোন প্রকার দলীল নেই। তাই এহেন দলীলবিহীন দাবিতে অটল থাকা নিরেট পথভ্রষ্টতা। আয়াতে দলীলকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এক. যুক্তিভিত্তিক দলীল। এর খণ্ডনে বলা হয়েছেঃ أَرُونِى مَاذَا خَلَقُوا۟ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ—দ্বিতীয় প্রকার ইতিহাসভিত্তিক দলীল। বলা বাহুল্য, আল্লাহ্‌র ব্যাপারে কেবল সেই ইতিহাসভিত্তিক দলীলই গ্রহণীয় হতে পারে, যা স্বয়ং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আসে। যেমন, তাওরাত, ইঞ্জীল, কোরআন ইত্যাদি ঐশী কিতাব অথবা আল্লাহ্‌র মনোনীত নবী ও রসূলগণের উক্তি। এই দুই প্রকারের মধ্যে প্রথম প্রকারের খণ্ডনে বলা হয়েছেঃ ٱئْتُونِى بِكِتَٰبٍ مِّن قَبْلِ هَٰذَآ— অর্থাৎ তোমাদের মূর্তি পূজার কোন দলীল থাকলে কোন ঐশী কিতাব পেশ কর, যাতে মূর্তি পূজার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ রসূলগণের উক্তি খণ্ডন করতে বলা হয়েছে, أَوْ أَثَٰرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ অর্থাৎ কিতাব আনতে না পারলে কমপক্ষে রসূলগণের পরম্পরাগত কোন উক্তি পেশ কর। তাও পেশ করতে না পারলে তোমাদের কথা ও কাজ পথভ্রষ্টতা বৈ কিছুই নয়।

أَثَٰرَةٍ —শব্দটি سماحة ও شجاعة-এর ওজনে একটি ধাতু। অর্থ নকল, রেওয়ায়েত। এ কারণে ইকরিমা ও মুকাতিল এর তফসীরে 'পয়গম্বরগণ থেকে রেওয়ায়েত' বলেছেন।—(কুরতুবী) সারকথা এই যে, দু'রকম ইতিহাসভিত্তিক দলীল গ্রহণযোগ্য—কোন পয়গম্বরের প্রতি অবতীর্ণ কিতাব এবং লোক পরম্পরায় প্রমাণিত পয়গম্বরের উক্তি। আয়াতে أَثَٰرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ বলে তাই বোঝানো হয়েছে। কেউ কেউ অন্যান্য আরও কিছু তফসীর করেছেন, যা কোরআনের ভাষার সাথে সামঞ্জস্য-পূর্ণ নয়।

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۝ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۖ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۖ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ ۖ كَفَىٰ بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۖ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝ قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ ۖ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۝ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝

(৭) যখন তাদেরকে আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনানো হয়, তখন সত্য আগমন করার পর কাফিররা বলে এ তো প্রকাশ্য যাদু। (৮) তারা কি বলে যে, রসূল একে রচনা করেছে? বলুন, যদি আমি রচনা করে থাকি তবে তোমরা আল্লাহ্র শাস্তি থেকে আমাকে রক্ষা করার অধিকারী নও। তোমরা এ সম্পর্কে যা আলোচনা কর, সে বিষয়ে আল্লাহ্ সম্যক অবগত। আমার ও তোমাদের মধ্যে তিনি সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট। তিনি ক্ষমাশীল, দয়াময়। (৯) বলুন, আমি তো কোন নতুন রসূল নই। আমি জানি না, আমার ও তোমাদের সাথে কি ব্যবহার করা হবে। আমি কেবল তারই অনুসরণ করি, যা আমার প্রতি ওহী করা হয়। আমি স্পষ্ট সতর্ক-কারী বৈ নই। (১০) বলুন, তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি এটা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হয় এবং তোমরা একে অমান্য কর এবং বনী-ইসরাইলের একজন সাক্ষী এর পক্ষে সাক্ষ্য দিয়ে এতে বিশ্বাস স্থাপন করে; আর তোমরা অহংকার কর, তবে তোমাদের চেয়ে অবিবেচক আর কে হবে? (১১) নিশ্চয় আল্লাহ্ অবিবেচকদেরকে পথ দেখান না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যখন আমার (রিসালতের দলীল) সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ তাদেরকে (অর্থাৎ রিসালত অমান্যকারীদেরকে) পাঠ করে শোনানো হয়, তখন সত্য আগমন করার পর

কাফিরগণ বলে, এটা প্রকাশ্য যাদু। (অথচ যাদুর মতন যাদু হতে পারে ; কিন্তু এসব আয়াতের অনুরূপ আয়াত কেউ রচনা করতে পারে না। এটাই তাদের উক্তির অসারতা প্রমাণের প্রকাশ্য দলীল।) তারা কি বলে যে, এ ব্যক্তি (অর্থাৎ আপনি) একে (অর্থাৎ কোরআনকে) নিজে রচনা করে (আল্লাহ্‌র কোরআন বলে) অভিহিত করেন? আপনি বলে দিন, যদি আমি রচনা করে থাকি (আর আল্লাহ্‌র নামে চালু করে থাকি,) তবে (আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রীতি অনুযায়ী মানুষকে প্রতারণা থেকে বাঁচানোর জন্য মিথ্যা নবুয়ত দাবির অপরাধে আমাকে শীঘ্রই ধ্বংস করে দেবেন। ধ্বংস করার সময়) তোমরা (অথবা অন্যরা) আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে আমাকে রক্ষা করতে পারবে না। (উদ্দেশ্য এই যে, নবুয়তের মিথ্যা দাবির কারণে শাস্তি হওয়া অপরিহার্য। কেউ এ শাস্তি প্রতিরোধ করতে সক্ষম নয়। কিন্তু আমাকে শাস্তি দেওয়া হয়নি। এটাই এ বিষয়ের দলীল যে, আমি নবুয়ত দাবিতে মিথ্যাবাদী নই। অতএব মনে রেখো,) তোমরা কোরআন সম্পর্কে যা আলোচনা করছ, সে বিষয়ে আল্লাহ্ সম্যক জ্ঞাত (তাই তোমাদেরকে শাস্তি দেবেন)। আমার ও তোমাদের মধ্যে (সত্যমিথ্যার ফয়সালার জন্য) তিনি সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট (অর্থাৎ খবরদার! আমি মিথ্যাবাদী হলে আমাকে শাস্তি দেবেন ও তোমরা মিথ্যাবাদী হলে তোমাদেরকে শীঘ্র অথবা বিলম্বে আযাব দেবেন। যদি তোমরা মনে কর যে, নবুয়ত দাবিকারীর উপর আযাব না আসা যেমন তার সত্যতার দলীল, তেমনি তোমাদের উপর আযাব না আসাও তোমাদের সত্যতার দলীল, তবে এর জওয়াব এই যে,) তিনি ক্ষমাশীল, (তাই দুনিয়াতে কাফিরদের উপর আযাব না আসা যে এক প্রকার ক্ষমা, সে ক্ষমাও তিনি করেন এবং) দয়াময় (তাই ব্যাপক দয়া কাফিরদের প্রতিও করেন। অতএব কাফিরদের উপর দুনিয়াতে আযাব না আসা তাদের সত্যতার দলীল নয়। পক্ষান্তরে নবুয়তের মিথ্যা দাবিদার আর আযাব ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কেননা, মিথ্যা নবুয়ত দাবির পরেও আযাব না দেওয়া মানুষকে পথভ্রষ্টতায় ঠেলে দেওয়ার নামান্তর)। আপনি বলুন, আমি কোন অভিনব রসূল নই (যে, তোমরা আশ্চর্য বোধ করবে। আমার পূর্বে অনেক রসূল আগমন করেছেন, যা লোক পরম্পরায় তোমরাও শুনেছ। এমনিভাবে আমি কোন বিস্ময়কর দাবিও করি না, যেমন আমি বলি না যে, আমি অদৃশ্যের খবর জানি। বরং আমি নিজেই বলি যে, অদৃশ্যের খবর ততটুকুই জানি, যতটুকু ওহীর মাধ্যমে আমাকে বলে দেওয়া হয়। এছাড়া অন্য কিছু জানি না। এমনকি,) আমি জানি না যে, আমার ও তোমাদের সাথে কি ব্যবহার করা হবে। (সুতরাং আমি যখন নিজের ও তোমাদের ভবিষ্যৎ অবস্থা জানার দাবি করি না, তখন অদৃশ্যের বিষয়াদি জানার দাবি কিরূপে করব? তবে ওহীর মাধ্যমে যে সব বিষয়ের জ্ঞান লাভ করেছি, তা নিজের সম্পর্কে অথবা অপরের সম্পর্কে অথবা ইহকাল ও পরকালের অবস্থা সম্পর্কে হলেও তা অবশ্যই পরিপূর্ণ। সেমতে বলা হয়েছে,) আমি (জ্ঞান ও কর্মে) কেবল তারই অনুসরণ করি, যা আমার প্রতি ওহী করা হয়। (তোমরা তা না মানলে আমার কোন ক্ষতি নেই। কেননা,) আমি স্পষ্ট সতর্ককারী বৈ নই। (অতপর নিজে কোরআন

রচনা করার উপরোক্ত অভিযোগ বিস্তারিতভাবে খণ্ডন করা হয়েছে,) আপনি বলুন, তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি এই কোরআন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হয় আর তোমরা একে অমান্য কর এবং (এই দলীল দ্বারা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হওয়া জোরদার হয় যে,) বনী ইসরাইলের (আলিমদের মধ্যে) একজন (আলিম) সাক্ষী এর পক্ষে সাক্ষ্য দিয়ে এতে বিশ্বাস স্থাপন করে আর তোমরা (তা জানা সত্ত্বেও) অহংকার কর, তবে তোমাদের অপেক্ষা অধিক অবিবেচক আর কে হবে? (অবিবেচকদের অবস্থা এই যে,) নিশ্চয় আল্লাহ্ অবিবেচকদেরকে (তাদের হঠকারিতার কারণে) পথ প্রদর্শন করেন না (তারা সর্বদা পথভ্রষ্টতায় থাকে **এবং** পথভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এ—وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ

আয়াতে إِنْ أَتَّبِعُ বাক্যটি ব্যতিক্রম নির্দেশ করে। অর্থ এই যে, আমার প্রতি যা ওহী করা হয়, তা ব্যতীত আমি জানি না। এর ভিত্তিতে তফসীরবিদ যাহ্হাক এ আয়াতের যে তফসীর করেছেন, তার সারমর্ম এই যে, আমি একমাত্র ওহীর মাধ্যমে অদৃশ্য বিষয়াদির জ্ঞান লাভ করতে পারি। ওহীর মাধ্যমে আমাকে যে বিষয় জানানো হয় না, তা আমার ব্যক্তিগত বিষয় হোক অথবা উম্মতের মু'মিন ও কাফিরের বিষয় হোক অথবা ইহকালের বিষয় হোক কিংবা পরকালের বিষয় হোক—তা আমি জানি না। অদৃশ্য বিষয়াদি সম্পর্কে আমি যা কিছু বলি, তা সবই ওহীর আলোকে বলে থাকি। কোরআন পাকে উল্লিখিত আছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে অনেক অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান দান করেছিলেন। এক আয়াতে আছে : تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ—জাহান্নাম, জান্নাত, হিসাব, নিকাশ, শাস্তি, প্রতিদান ইত্যাদি পারলৌকিক বিষয়ের বিবরণ তো স্বয়ং কোরআন পাকে অনেক রয়েছে। ইহকালের ভবিষ্যৎ ঘটনাবলীর অনেক বিবরণও পরম্পরাগত সহীহ্ হাদীসসমূহে রসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে বর্ণিত আছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, উল্লিখিত আয়াতের সারমর্ম এতটুকু যে, আমি অদৃশ্য বিষয়াদির জ্ঞানে আল্লাহ্ তা'আলার মত নই এবং এসব জ্ঞানে স্বেচ্ছাধীনও নই; বরং ওহীর মাধ্যমে আমাকে যতটুকু বলে দেওয়া হয়, আমি ততটুকুই বর্ণনা করি।

তফসীরে রূহুল মা'আনীতে এ উক্তি উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে যে, আমার বিশ্বাস, রসূলুল্লাহ্ (সা) ততদিন পর্যন্ত দুনিয়া থেকে বিদায় নেন নি, যতদিন আল্লাহ্র সত্তা, গুণাবলী এবং পরকালের ও ইহকালের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি সম্পর্কে তাঁকে ওহীর মাধ্যমে অবহিত করা হয়নি। তবে যায়েদ আগামীকাল কি করবে, তার পরিণাম কি হবে

ইত্যাদি ব্যক্তি বিশেষের খুঁটিনাটি অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান থাকা কোন উৎকর্ষের বিষয় নয় এবং এগুলো না জানলেও নবুয়তের উৎকর্ষ হ্রাস পায় না।

রসূলুল্লাহ্ (সা)-র অদৃশ্য জ্ঞান সম্পর্কিত আদব ঃ এ ব্যাপারে আদব এই যে, তিনি অদৃশ্যের জ্ঞান রাখেন না, এরূপ বলা সঙ্গত নয়। বরং এভাবে বলা দরকার যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে অদৃশ্য বিষয়াদির অনেক জ্ঞান দান করেছিলেন, যা অন্য কোন পয়গম্বরকে দেন নি। কেউ কেউ বলেন, এ আয়াতে পার্থিব অদৃশ্য বিষয়াদি সম্পর্কে 'আমি জানি না' বলা হয়েছে—পারলৌকিক অদৃশ্য বিষয়াদি সম্পর্কে নয়। কেননা, পারলৌকিক বিষয়ে তিনি খোলাখুলি বলে দিয়েছেন যে, মু'মিন জান্নাতে যাবে এবং কাফির জাহান্নামে যাবে।—(কুরতুবী)

وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ أَوَلَمْ يَكُن لَّهُمْ آيَةً أَن يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ —এ আয়াতের এবং সূরা শু'আরার আয়াতের অর্থ একই রকম। সারমর্ম এই যে, যেসব ইহুদী ও খৃস্টান রসূলুল্লাহ্ (সা)-র রিসালত ও কোরআন অমান্য করে, তারা স্বয়ং তাদের কিতাব সম্পর্কেও অজ্ঞ। কেননা, বনী ইসরাইলের অনেক আলিম তাদের কিতাবে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নবুয়ত ও নিদর্শন প্রত্যক্ষ করে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছেন। সে আলিমগণের সাক্ষ্যও কি এই মূর্খদের জন্য যথেষ্ট নয়? এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, তোমরা আমার নবুয়ত দাবিকে ভ্রান্ত এবং কোরআনকে আমার রচনা বল। এর এক জওয়াবে পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, কেউ বাস্তবে নবী না হয়ে নিজেকে নবী বলে মিথ্যা দাবি করলে তার দুনিয়াতেই নিপাত হয়ে যাওয়া জরুরী, যাতে জনসাধারণ প্রতারিত না হয়। এ জওয়াবই যথেষ্ট, কিন্তু তোমরা যদি না মান, তবে এ সম্ভাবনার প্রতিও লক্ষ্য কর যে, আমার দাবি যদি সত্য হয় এবং কোরআন আল্লাহ্র কিতাব হয় আর তোমরা একে অমান্য করেই যাও, তবে তোমাদের পরিণতি কি হবে, বিশেষত যখন তোমাদের বনী ইসরাইলেরই কোন মান্যবর ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় যে, এটা আল্লাহ্র কিতাব, অতপর সে নিজেও মুসলমান হয়ে যায়? এ জ্ঞান লাভের পরও যদি তোমরা জিদ ও অহংকারে অটল থাক, তবে তোমরা গুরুতর শাস্তির যোগ্য হয়ে যাবে।

আয়াতে বনী ইসরাইলের কোন বিশেষ আলিমের নাম উল্লেখ করা হয়নি এবং এটাও নির্দিষ্ট করা হয়নি যে, এ সাক্ষ্য আয়াত অবতরণের পূর্বেই জনসমক্ষে এসে গেছে, না ভবিষ্যতে আসবে। তাই বনী ইসরাইলের কোন ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট করার উপর আয়াতের অর্থ নির্ভরশীল নয়। খ্যাতনামা ইহুদী আলিম হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালামসহ যত ইহুদী ও খৃস্টান ইসলামে দীক্ষিত হয়েছেন, তারা সবাই এ

আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। যদিও আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম এই আয়াত নাযিল হওয়ার পরে মদীনায় ইসলাম গ্রহণ করেন। এ আয়াতটি মক্কায় নাযিল হয়েছিল।

হযরত সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, এ আয়াত হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, যাহ্হাক প্রমুখ তফসীরবিদ তাই বলেছেন। এ আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ হওয়ার পরিপন্থী নয়। এমতাবস্থায় আয়াতটি ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে গণ্য হবে।—(ইবনে কাসীর)

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ ۚ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَٰذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ ﴿١١﴾ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً ۚ وَهَٰذَا كِتَابٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبِيًّا لِّيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ ﴿١٢﴾

(১২) আর কাফিররা মু'মিনদের বলতে লাগল যে, যদি এ দীন ভাল হত, তবে এরা আমাদেরকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যেতে পারত না। তারা যখন এর মাধ্যমে সুপথ পায়নি, তখন শীঘ্রই বলবে, এ তো এক পুরাতন মিথ্যা। (১৩) এর আগে মূসার কিতাব ছিল পথপ্রদর্শক ও রহমতস্বরূপ। আর এই কিতাব তার সমর্থক আরবী ভাষায়, যাতে জালিমদেরকে সতর্ক করে এবং সৎকর্মপরায়ণদেরকে সুসংবাদ দেয়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর কাফিররা মু'মিনদের (ঈমান আনা) সম্পর্কে বলে, যদি এটা (অর্থাৎ কোরআন) ভাল (অর্থাৎ সত্য) হয়, তবে তারা (অর্থাৎ নীচ লোকেরা) আমাদের থেকে এগিয়ে যেতে পারত না। (অর্থাৎ আমরা খুব বুদ্ধিমান আর তারা নির্বোধ, ভাল বিষয়কে বুদ্ধিমানরা প্রথম গ্রহণ করে। কাজেই কোরআন সত্য হলে আমরাই আগে গ্রহণ করতাম। কাফিরদের এই উক্তি তাদের চরম ঔদ্ধত্যের পরিচায়ক)। যখন (হঠকারিতা ও ঔদ্ধত্যের কারণে) তারা কোরআনের মাধ্যমে সুপথ পায়নি, তখন (জিদের বশবর্তী হয়ে) শীঘ্রই বলবে, (পৌরাণিক মিথ্যা কাহিনীগুলোর মত) এ-ও এক পৌরাণিক মিথ্যা। এর (অর্থাৎ কোরআনের) আগে মূসার কিতাব (নাযিল হয়ে) ছিল, যা (তার উম্মতের জন্য) পথপ্রদর্শক, (এবং বিশেষভাবে মু'মিনদের জন্য) রহমত ছিল। (তওরাতে যেমন ভবিষ্যদ্বাণী আছে) এটা (তেমনি) এক কিতাব যা তাকে (অর্থাৎ তার ভবিষ্যদ্বাণীকে) সত্যায়ন করে, আরবী ভাষায় যাতে জালিমদেরকে সতর্ক করে এবং সৎলোকদেরকে সুসংবাদ দেয়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُوْنَا اِلَيْهِ—অহংকার ও গর্ব মানুষের জ্ঞানবুদ্ধিকেও বিকৃত করে দেয়। অহংকারী ব্যক্তি নিজের বুদ্ধিকেই ভালমন্দের মাপকাঠি বলে মনে করতে থাকে। সে যা পছন্দ করে না, অন্যেরা তা পছন্দ করলে সে সবাইকে বোকা মনে করে, অথচ বাস্তবে নিজেই বোকা। কাফিরদের এ ধরনের অহংকার ও গর্বই আলোচ্য আয়াতে বিবৃত হয়েছে। ইসলাম ও ঈমান তাদের পছন্দনীয় ছিল না। তাই অন্যান্য ঈমান-প্রেমিকদের সম্পর্কে তারা বলত, ঈমান যদি ভালই হত, তবে সর্বাগ্রে তা আমাদের পছন্দনীয় হত। এই হতচ্ছাড়াদের পছন্দের কি মূল্য!

ইবনে মুনযির প্রমুখ এক রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত উমর (রা) যখন মুসলমান ছিলেন না, তখন তাঁর রানীন নাম্নী এক বাঁদী ইসলাম গ্রহণ করেছিল। এই অপরাধে তিনি বাঁদীকে প্রচুর মারধর করতেন, যাতে সে ইসলাম ত্যাগ করে। তখন কুরাইশ কাফিররা বলত, ইসলাম ভাল হলে রানীনের মত নীচ বাঁদী আমাদেরকে পেছনে ফেলে যেতে পারত না। এর পরিপ্রেক্ষিতেই আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়।—(মাযহারী)

وَمِنْ قَبْلِهٖ كِتٰبُ مُوْسٰٓى اِمَامًا وَّرَحْمَةً—এ আয়াত থেকে প্রথমত প্রমাণ পাওয়া গেল যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) কোন অভিনব রসূল এবং কোরআন কোন অভিনব কিতাব নয় যে, এতে বিশ্বাস স্থাপনে আপত্তি হবে। বরং এর আগে মূসা (আ) রসূলরূপে আগমন করেছেন এবং তাঁর প্রতি তওরাত নাযিল হয়েছিল। ইহুদী ও খৃস্টান কাফিররাও তা স্বীকার করে। দ্বিতীয়ত এতে شَهِدَ شَاهِدٌ বাক্যেরও সমর্থন আছে। কেননা, মূসা (আ) ও তওরাত রসূলুল্লাহ্ (সা) ও কোরআনের সত্যতার সাক্ষ্যদাতা।

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝ وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسٰنًا ۚ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ كُرْهًا وَّوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۚ وَحَمْلُهٗ وَفِصٰلُهٗ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا ۚ

حَتّٰۤى اِذَا بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَبَلَغَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً ۙ قَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِىْۤ اَنْ
اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِىْۤ اَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلٰى وَالِدَىَّ وَاَنْ اَعْمَلَ
صَالِحًا تَرْضٰىهُ وَاَصْلِحْ لِىْ فِىْ ذُرِّيَّتِىْ ۚ اِنِّىْ تُبْتُ اِلَيْكَ
وَاِنِّىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿١٥﴾ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ اَحْسَنَ
مَا عَمِلُوْا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّاٰتِهِمْ فِىْۤ اَصْحٰبِ الْجَنَّةِ ؕ وَعْدَ الصِّدْقِ
الَّذِىْ كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ ﴿١٦﴾ وَالَّذِىْ قَالَ لِوَالِدَيْهِ اُفٍّ لَّكُمَاۤ
اَتَعِدٰنِنِىْۤ اَنْ اُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُوْنُ مِنْ قَبْلِىْ ۚ وَهُمَا يَسْتَغِيْثٰنِ
اللّٰهَ وَيْلَكَ اٰمِنْ ۖۗ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ ۚۖ فَيَقُوْلُ مَا هٰذَاۤ اِلَّاۤ اَسَاطِيْرُ
الْاَوَّلِيْنَ ﴿١٧﴾ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِىْۤ اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ
قَبْلِهِمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا خٰسِرِيْنَ ﴿١٨﴾ وَلِكُلٍّ
دَرَجٰتٌ مِّمَّا عَمِلُوْا ۚ وَلِيُوَفِّيَهُمْ اَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿١٩﴾
وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَلَى النَّارِ ؕ اَذْهَبْتُمْ طَيِّبٰتِكُمْ فِىْ
حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا ۚ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ
بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ
تَفْسُقُوْنَ ﴿٢٠﴾

(১৩) নিশ্চয় যারা বলে, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ্, অতপর অবিচল থাকে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিত হবে না। (১৪) তারাই জান্নাতের অধিকারী। তারা তথায় চিরকাল থাকবে। তারা যে কর্ম করত, এটা তারই প্রতিফল। (১৫) আমি

মানুষকে তার পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহারের আদেশ দিয়েছি। তার জননী তাকে কষ্ট সহকারে গর্ভে ধারণ করেছে এবং কষ্ট সহকারে প্রসব করেছে। তাকে গর্ভে ধারণ করতে ও তার স্তন্য ছাড়তে লেগেছে ত্রিশ মাস। অবশেষে সে যখন শক্তি-সামর্থ্যের বয়সে ও চল্লিশ বছরে পেঁছেছে, তখন বলতে লাগল হে আমার পালনকর্তা আমাকে এরূপ ভাগ্য দান কর যাতে আমি তোমার নিয়ামতের শোকর করি, যা তুমি দান করেছ আমাকে ও আমার পিতামাতাকে এবং যাতে আমি তোমার পছন্দনীয় সৎকাজ করি। আমার সন্তানদেরকে সৎকর্মপরায়ণ কর, আমি তোমার প্রতি তওবা করলাম এবং আমি আজ্ঞাবহদের অন্যতম। (১৬) আমি এমন লোকদের সুকর্মগুলো কবুল করি এবং মন্দ কর্মগুলো মার্জনা করি। তারা জান্নাতীদের তালিকাভুক্ত সেই সত্য ওয়াদার কারণে, যা তাদেরকে দেওয়া হত। (১৭) আর যে ব্যক্তি তার পিতামাতাকে বলে, ধিক তোমাদেরকে, তোমরা কি আমাকে খবর দাও যে, আমি পুনরুত্থিত হব, অথচ আমার পূর্বে বহু লোক গত হয়ে গেছে? আর পিতামাতা আল্লাহ্‌র কাছে ফরিয়াদ করে বলে, দুর্ভোগ তোমার, তুমি বিশ্বাস স্থাপন কর। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য। তখন সে বলে, এটা তো পূর্ববর্তীদের উপকথা বৈ নয়। (১৮) তাদের পূর্বে যে সব জ্বিন ও মানুষ গত হয়েছে তাদের মধ্যে এ ধরনের লোকদের প্রতিও শাস্তিবাণী অবধারিত হয়ে গেছে। নিশ্চয় তারা ছিল ক্ষতিগ্রস্ত। (১৯) প্রত্যেকের জন্য তাদের কৃতকর্ম অনুযায়ী বিভিন্ন স্তর রয়েছে, যাতে আল্লাহ্‌ তাদের কর্মের পূর্ণ প্রতিফল দেন। বস্তুত তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না। (২০) যেদিন কাফিরদেরকে জাহান্নামের কাছে উপস্থিত করা হবে সেদিন বলা হবে, তোমরা তোমাদের সুখ পার্থিব জীবনেই নিঃশেষ করেছ এবং সেগুলো ভোগ করেছ। সুতরাং আজ তোমাদেরকে অপমানকর আযাবের শাস্তি দেওয়া হবে; কারণ, তোমরা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে অহংকার করতে এবং তোমরা পাপাচার করতে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যারা (সত্যমনে) বলে, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ্‌ (অর্থাৎ রসূলের শিক্ষা অনুযায়ী তওহীদ মেনে নেয়), অতপর (তাতেই) অবিচল থাকে (অর্থাৎ তা ত্যাগ করে না,) তাদের (পরকালে) কোন ভয় নেই, এবং তারা (সেথায়) চিন্তিত হবে না। তারা জান্নাতের অধিকারী, তথায় চিরকাল থাকবে সেই কর্মের প্রতিফল-স্বরূপ, যা তারা করত (অর্থাৎ উল্লিখিত ঈমান আনা ও তাতে অবিচল থাকা। আল্লাহ্‌র এ সমস্ত হকের ন্যায় আমি বান্দার হকও ওয়াজিব করেছি। তন্মধ্যে একটি প্রধান হক হচ্ছে পিতামাতার হক। তাই) আমি মানুষকে তার পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহারের আদেশ দিয়েছি (বিশেষত মাতার সাথে বেশি। কেননা) তার মাতা তাকে কষ্ট সহকারে গর্ভে ধারণ করেছে এবং কষ্ট সহকারে প্রসব করেছে। তাকে গর্ভে ধারণ করা ও তার স্তন্য ছাড়ানো (প্রায়ই) ত্রিশ মাসে হয়। (এতদিন পর্যন্ত মাতা নানা রকম কষ্ট ভোগ করে। এসব কষ্টে পিতাও কম বেশি শরীক হয়, বরং

অধিকাংশ বিষয়ে ব্যবস্থাপনা পিতাকেই করতে হয়। উভয়ের আরামেই সমান বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। এ কারণেই মানুষের উপর পিতামাতার হক অপরিহার্য ও ওয়াজিব করা হয়েছে। মোটকথা, এরপর সন্তান ক্রমশ বড় হতে থাকে।) অবশেষে যখন যৌবন (অর্থাৎ প্রাপ্ত বয়সে) পৌঁছে যায় এবং (প্রাপ্ত বয়সের পর এক সময়) চল্লিশ বছরে উপনীত হয়, তখন (ভাগ্যবান হলে) বলে, হে আমার পালনকর্তা, আমাকে সার্বক্ষণিক শক্তি দিন, যাতে আমি আপনার নিয়ামতের শোকর করি, যা আপনি আমাকে ও আমার পিতামাতাকে দান করেছেন। (পিতামাতা মুসলমান হলে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয় প্রকার নিয়ামতই এর অন্তর্ভুক্ত। অন্যথায় কেবল ইহলৌকিক নিয়ামত বোঝানো হয়েছে। পিতামাতার নিয়ামতের প্রভাব সন্তানের উপরও প্রতিফলিত হয়। যেমতে অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব একটি ইহলৌকিক নিয়ামত। এরই দৌলতে সন্তানের অস্তিত্ব হয়ে থাকে। আর তাদের পারলৌকিক নিয়ামতের প্রভাব এই যে, তাদের শিক্ষা ও লালন-পালন সন্তানের জ্ঞান ও কর্মের উপায় হয়ে থাকে। সে আরো বলে) যাতে আমি আপনার পছন্দনীয় সৎকাজ করি এবং আমার সন্তানদেরকেও (আমার উপকারার্থ) সৎকর্মপরায়ণ করুন (চোখে দেখে আনন্দ লাভ করা ইহলৌকিক উপকার এবং সওয়াব পাওয়া পারলৌকিক উপকার।) আমি আপনার প্রতি (গোনাহ্ থেকেও) তওবা করলাম এবং আমি আপনার আজ্ঞাবহ। (এর উদ্দেশ্য দাসত্ব স্বীকার করা। অতপর এ দোয়ার ফল বর্ণনা করা হয়েছে যে,) আমি এমন লোকদের সৎকর্মগুলো কবুল করব এবং তাদের মন্দ কর্মগুলো মার্জনা করব। তারা জান্নাতীদের তালিকাভুক্ত হবে সে সত্য ওয়াদার কারণে, যা তাদেরকে (দুনিয়াতে) দেওয়া হত। (অতপর জালিম ও হতভাগাদের কথা বলা হয়েছে,) আর যে ব্যক্তি (আল্লাহ্র হক ও বান্দার হক উভয়ই নষ্ট করেছে; যেমন তার এই অবস্থা থেকে জানা যায় যে, সে) তার পিতামাতাকে বলে, (যাদের হক আদায় করতে সর্বাধিক তাকীদ রয়েছে, বিশেষত যখন তারা মুসলমান হয় এবং তাকেও মুসলমান হতে বলে) ধিক তোমাদেরকে, তোমরা কি আমাকে এই ওয়াদা (অর্থাৎ খবর) দাও যে, আমি (কিয়ামতে পুনরুজ্জীবিত হয়ে) কবর থেকে উত্থিত হব, অথচ আমার পূর্বে অনেক সম্প্রদায় গত হয়ে গেছে, (যাদেরকে প্রতি যুগে তাদের পয়গম্বরগণ এ কথাই বলত, কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন কিছুই প্রকাশ পেল না? এতে বোঝা গেল যে, এগুলো ভিত্তিহীন কথাবার্তা।) আর তারা উভয়ে (অর্থাৎ পিতামাতা তার এই কুফরী কথাবার্তা শুনে অস্থির হয়ে) আল্লাহ্র কাছে ফরিয়াদ করে (এবং খুব দরদ সহকারে তাকে বলে,) আরে দুর্ভোগ তোর, তুই ঈমান আন (এবং কিয়ামতকেও সত্য মনে কর।) নিশ্চয় আল্লাহ্র ওয়াদা সত্য। তখন (এরপরও) সে বলে, এটা তো পূর্ববর্তীদের উপকথা বৈ নয়। (উদ্দেশ্য, সে এমন হতভাগা যে, কুফর ও পিতামাতার সাথে অসদ্ব্যবহার উভয় গোনাহেই লিপ্ত। পিতামাতার বিরোধিতা তো করেই—কথাবার্তায়ও ধৃষ্টতা দেখায়। অতপর এসব কুকর্মের ফল বর্ণিত হয়েছে,) তাদের পূর্বে যেসব (কাফির) জিন ও মানুষ গত হয়ে গেছে তাদের মধ্যে এ ধরনের লোকদের প্রতিও আল্লাহ্র শাস্তিবাণী অবধারিত হয়ে গেছে। নিশ্চয় তারা (সবাই) ছিল ক্ষতিগ্রস্ত। (অতপর উপরোক্ত বিশদ বর্ণনার সারবস্তু

সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে যে, উপরোক্ত উভয় দলের মধ্য থেকে) প্রত্যেকের (অর্থাৎ প্রত্যেক দলের) জন্য তাদের (বিভিন্ন) কর্মের কারণে আলাদা আলাদা স্তর (কারও জান্নাতের স্তর এবং কারও জাহান্নামের স্তর) রয়েছে (এ কারণে,) যাতে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের কর্মের পূর্ণ প্রতিফল দেন। আর তাদের প্রতি (কোন প্রকার) অবিচার করা হবে না। (উপরে নির্দিষ্ট করে বলা হয়েছে যে, সৎকর্মীদের প্রতিদান জান্নাত। কিন্তু জালিমদের শাস্তি নির্দিষ্ট করা হয়নি, কেবল সংক্ষেপে حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ এবং كَانُوا خَاسِرِيْنَ বলা হয়েছে। তাই অতপর তাদের আযাব নির্দিষ্ট করা হয়েছে যে, সেদিনটি স্মরণ-যোগ্য—) যেদিন কাফিরদেরকে জাহান্নামের কাছে উপস্থিত করা হবে (এবং বলা হবে, তোমরা তোমাদের সুখের সামগ্রী পার্থিব জীবনেই নিঃশেষ করেছ। এখানে তোমরা কোন সুখের সামগ্রী পাবে না।) এবং সেগুলো ভোগ করেছ, (এমনকি তাতে মগ্ন হয়ে আমাকেও ভুলে গিয়েছিলে,) সুতরাং আজ তোমাদেরকে অপমানজনক আযাবের শাস্তি দেওয়া হবে। (সে মতে শাস্তি হচ্ছে জাহান্নাম এবং অপমান হচ্ছে ধিক্কার ও তিরস্কার।) কারণ, তোমরা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে অহংকার করতে (অর্থাৎ এমন অহংকার করতে, যা তোমাদেরকে ঈমান থেকে বিরত রাখত। এরূপ অহংকারই চিরকালীন আযাবের কারণ।) এবং তোমরা পাপাচার করতে (এতে কুফর, ফিস্ক ও সর্বপ্রকার জুলুম অন্তর্ভুক্ত)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্বোক্ত আয়াতসমূহে জালিমদের জন্য শাস্তিবাণী এবং মু'মিনদের জন্য সাফল্যের সুসংবাদ ছিল। আলোচ্য প্রথম দু'আয়াত তারই পরিশিষ্ট। প্রথম অর্থাৎ إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا—আয়াতে অত্যন্ত অলংকারপূর্ণ ভঙ্গিতে সমগ্র ইসলাম, ঈমান ও সৎকর্মসমূহকে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। رَبُّنَا اللّٰهُ বাক্যে সমগ্র ঈমান এবং استقامة শব্দের মধ্যে মৃত্যু পর্যন্ত ঈমানে অবিচল থাকা ও তদনুযায়ী পূর্ণমাত্রায় আমল করা দাখিল রয়েছে। استقامة-এর গুরুত্বের ব্যাখ্যা সূরা হা-মীম সিজদায় বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে ঈমান ও ঈমানে অবিচল থাকার কারণে ওয়াদা করা হয়েছে যে, তাদের ভবিষ্যতে কোন দুঃখ কষ্টের ভয় নেই এবং অতীত কষ্টের কারণেও তারা পরিতাপ করবে না। পরের আয়াতে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, তাদের এই সুখ চিরন্তন ও স্থায়ী হবে। পরবর্তী চার আয়াতে মানুষকে পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং এর বিপরীত কর্মের নিন্দা করা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে মানুষের প্রতি পিতামাতার অনুগ্রহ, সন্তানের জন্য শ্রম ও কষ্ট স্বীকার এবং পরিণত বয়সে পেঁছার পর মানুষকে আল্লাহ্‌র প্রতি মনোনিবেশ করার বিশেষ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। ইবনে কাসীরের ভাষায় পূর্ববর্তী আয়াতের

সাথে এর সম্পর্ক ও যোগসূত্র এই যে, কোরআন পাক সাধারণভাবে যেখানে মানুষকে আল্লাহ্‌র আনুগত্য ও ইবাদতের দিকে দাওয়াত দেয়, সেখানে সাথে সাথে পিতামাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার, তাদের সেবাযত্ন ও আনুগত্যের নির্দেশও দান করে। বিভিন্ন সূরার অনেক আয়াত এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। এই পদ্ধতি অনুযায়ী এখানেও আল্লাহ্‌র তওহী-দের প্রতি দাওয়াতের সাথে সাথে পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহারের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। কুরতুবীতে বর্ণিত যোগসূত্র এই যে, এতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এক প্রকার সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, আপনি ঈমান ও তওহীদের দাওয়াত অব্যাহত রাখুন। কেউ কবুল করবে এবং কেউ করবে না। এতে আপনি দুঃখিত হবেন না। কেননা, মানুষ তাদের পিতামাতার ক্ষেত্রেও সবাই সমান নয়। কেউ পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করে এবং কেউ সদ্ব্যবহার করে না।

মোটকথা, এ আয়াত চতুষ্টয়ের আসল বিষয়বস্তু হল পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার শিক্ষা দেওয়া। অবশ্য এতে প্রসঙ্গক্রমে অন্যান্য শিক্ষাও এসে গেছে। কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, এসব আয়াত হযরত আবূ বকর (রা) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। এর ভিত্তিতেই তফসীরে মাযহারীতে وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ বাক্যে انسان -এর অর্থ নেওয়া হয়েছে, হযরত আবূ বকর (রা)। বলা বাহুল্য, কোরআনের কোন আয়াত অবতরণের কারণ কোন বিশেষ ব্যক্তি অথবা ঘটনা হলেও আয়াতের নির্দেশ সবার জন্যেই ব্যাপক হয়ে থাকে। এখানেও যদি আয়াতটির অবতরণের কারণ হযরত আবূ বকর হয়ে থাকেন এবং আয়াতে উল্লিখিত বিশেষ গুণাবলী তাঁরই গুণাবলী হয়ে থাকে, তবুও আয়াতসমূহের উদ্দেশ্য ব্যাপকভাবে সবাইকে শিক্ষা দান করা। আসল আয়াতকে ব্যাপক রাখা হলে হযরত আবূ বকর আয়াতে বর্ণিত শিক্ষার প্রথম প্রতীক হবেন এবং যৌবনে পদার্পণ ও চল্লিশ বৎসর বয়সে উপনীত হওয়া সম্পর্কিত বিশেষ গুণাবলী হবে দৃষ্টান্তস্বরূপ। এখন আয়াতসমূহের বিশেষ বিশেষ শব্দের ব্যাখ্যা দেখুন ঃ

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا — وصية শব্দের অর্থ তাকীদপূর্ণ নির্দেশ এবং احسان -এর অর্থ সদ্ব্যবহার। এতে সেবাযত্ন, আনুগত্য, সম্মান ও সম্ভ্রম প্রদর্শনও অন্তর্ভুক্ত।

حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا — كُرْهٌ শব্দের অর্থ সে কষ্ট, যা মানুষ কোন কারণবশত সহ্য করে থাকে এবং كَرْهٌ-এর অর্থ সে কষ্ট, যা সহ্য করতে অন্য কেউ বাধ্য করে। এ থেকেই اكراه শব্দের উৎপত্তি। এ বাক্যটি প্রথম বাক্যেরই তাকীদ। অর্থাৎ পিতামাতার সেবাযত্ন ও আনুগত্য জরুরী হওয়ার এক কারণ এই যে, তারা তোমাদের জন্য অনেক কষ্টই সহ্য করেন। বিশেষত মাতার কষ্ট অনেক বেশি

হয়ে থাকে। তাই এখানে কেবল মাতার কষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে। মাতা দীর্ঘ নয় মাস তোমাদেরকে গর্ভে ধারণ করে। এ ছাড়াও এ সময়ে তাকে অনেক দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে হয়। এরপর প্রসবকালে অসহনীয় প্রসব বেদনার পর তোমরা ভূমিষ্ঠ হও।

মাতার হক পিতা অপেক্ষা বেশি ঃ আয়াতের শুরুতে পিতামাতা উভয়ের সাথে সদ্ব্যবহারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু এ স্থলে কেবল মাতার কষ্টের কথা উল্লেখ করার তাৎপর্য এই যে, মাতার পরিশ্রম ও কষ্ট অপরিহার্য ও জরুরী। গর্ভ ধারণের সময়ে কষ্ট, প্রসব বেদনার কষ্ট সর্বাবস্থায় ও সব সন্তানের ক্ষেত্রে মাতাকেই সহ্য করতে হয়। পিতার জন্য লালন-পালনের কষ্ট সহ্য করা সর্বাবস্থায় জরুরী হয় না। পিতা ধনাঢ্য হলে এবং তার চাকর-বাকর থাকলে অপরের মাধ্যমে সন্তানের দেখাশুনা করতে পারে, কিংবা বিদেশে অবস্থান করে ভরণ-পোষণের অর্থ প্রেরণ করতে পারে। এ কারণেই রসূলুল্লাহ্ (সা) সন্তানের উপর মাতার হক বেশি রেখেছেন। এক হাদীসে তিনি বলেনঃ صل امک ثم امک ثم امک ثم اباک ثم ادناک فادناک — অর্থাৎ মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর, অতপর মাতার সাথে, অতপর মাতার সাথে, অতপর পিতার সাথে, অতপর নিকট আত্মীয়ের সাথে।

وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا—এ বাক্যেও মাতার কষ্ট বর্ণিত হয়েছে যে, সন্তানকে গর্ভে ধারণ ও প্রসবের কষ্টের পরও মাতা রেহাই পায় না। এর পরে সন্তানের খাদ্যও আল্লাহ্ তা'আলা মাতার স্তনে রেখে দিয়েছেন। মাতা তাকে স্তন্যদান করে। আয়াতে বলা হয়েছে যে, সন্তানকে গর্ভে ধারণ এবং স্তন্য ছাড়ানো ত্রিশ মাসে হয়। হযরত আলী (রা) এই আয়াতদৃষ্টে বলেন যে, গর্ভ ধারণের সর্বনিম্ন সময়কাল ছয় মাস। কেননা, وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ আয়াতে স্তন্যদানের সর্বোচ্চ সময়কাল পূর্ণ দু'বছর নির্দিষ্ট করা হয়েছে এবং এখানে গর্ভ ধারণ ও স্তন্যদান উভয়ের সময়কাল বর্ণিত হয়েছে ত্রিশ মাস। অতএব স্তন্যদানের দু'বছর অর্থাৎ চব্বিশ মাস বাদ দিলে গর্ভ ধারণের জন্যে ছয় মাসই অবশিষ্ট থাকে। সুতরাং এটাই হবে গর্ভ ধারণের সর্বনিম্ন সময়কাল। রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, হযরত উসমান গনী (রা)-এর খিলাফতকালে জনৈকা মহিলার গর্ভ থেকে ছয় মাসে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়ে গেলে তিনি একে অবৈধ গর্ভ সাব্যস্ত করে শাস্তির আদেশ জারি করেন। কেননা, সাধারণ নিয়ম ছিল নয় এবং সর্বনিম্ন সাত মাসে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া। হযরত আলী (রা) এই সংবাদ অবগত হয়ে খলীফাকে শাস্তি কার্যকর করতে বারণ করলেন এবং আলোচ্য আয়াত দ্বারা প্রমাণ করে দিলেন যে, গর্ভ ধারণের সর্বনিম্ন সময়কাল ছয় মাস। খলীফা তার যুক্তিপ্রমাণ কবূল করে শাস্তির আদেশ প্রত্যাহার করে নেন।—(কুরতুবী)

এ কারণেই সমস্ত আলিম একমত যে, গর্ভ ধারণের সর্বনিম্ন সময়কাল ছয় মাস হওয়া সম্ভবপর। এখন সর্বোচ্চ সময়কাল কি, এ সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। তবে কোরআন এ সম্পর্কে কোন ফায়সালা দেয়নি।

আয়াতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, গর্ভ ধারণের সর্বনিম্ন সময়কাল ছয়মাস নির্ধারিত। এর কম সময়ে সন্তান সুস্থ ও পূর্ণাঙ্গ জন্মগ্রহণ করতে পারে না। তবে সর্বোচ্চ কতদিন সন্তান গর্ভে থাকতে পারে, এ সম্পর্কে অভ্যাস বিভিন্ন রূপ। এমনিভাবে স্তন্যদানের সর্বোচ্চ সময়কাল দু'বছর নির্ধারিত। কিন্তু সর্বনিম্ন সময়কাল নির্দিষ্ট নেই। কোন কোন নারীর দুধই হয় না এবং কারও কারও দুধ কয়েক মাসেই শুকিয়ে যায়। কতক শিশু মায়ের দুধ পান করে না অথবা মায়ের দুধ শিশুর পক্ষে ক্ষতিকর হয়। ফলে অন্য দুধ পান করাতে হয়।

গর্ভ ধারণের ও স্তন্যদানের সর্বোচ্চ সময়কালের ব্যাপারে ফিকাহ্‌বিদদের মতভেদঃ ইমাম আবূ হানীফা (র)-র মতে গর্ভ ধারণের সর্বোচ্চ সময়কাল দু'বছর। ইমাম মালেক থেকে চার বছর, পাঁচ বছর, সাত বছর ইত্যাদি বিভিন্ন রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে। ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদের মতে চার বছর। (মাযহারী) স্তন্যদানের সর্বোচ্চ সময়কালের সাথে স্তন্যদান হারাম হওয়ার বিধানও সম্পৃক্ত। অধিকাংশ ফিকাহ্‌বিদের মতে এই সময়কাল দু'বছর। একমাত্র ইমাম আবূ হানীফা (র)-র মতে আড়াই বছর পর্যন্ত শিশুকে স্তন্যদান করা যায়। এর অর্থ এই যে, শিশু দুর্বল হলে, স্তনের দুধ ব্যতীত অন্য কোন খাদ্য গ্রহণ না করলে অতিরিক্ত ছ'মাস স্তন্যদানের অনুমতি রয়েছে। কারণ, এ বিষয়ে সবাই একমত যে, স্তন্যদানের দু'বছরের সময়কাল অতিবাহিত হয়ে গেলে মায়ের দুধ শিশুকে পান করানো হারাম।

حَتّٰى اِذَا بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَبَلَغَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً—اشد-এর শাব্দিক অর্থ শক্তি-সামর্থ্য। সূরা আন'আমে এর তফসীর করা হয়েছে 'প্রাপ্তবয়স' বলে। এ আয়াতেও কেউ কেউ এ অর্থ নিয়েছেন। অতপর بَلَغَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً-কে বয়সের অপর একটি স্তর সাব্যস্ত করেছেন। হাসান বসরীর মতে بَلَغَ اَشُدَّهٗ ও بَلَغَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً উভয়টি সমার্থবোধক। আয়াতে প্রথমে সন্তানের গর্ভ ধারণ, অতপর স্তন্যপানের সময়কাল বর্ণনা করার পর حَتّٰى اِذَا بَلَغَ বলার অর্থ এই যে, এরপর সে প্রাপ্ত-বয়স্ক ও শক্তিশালী হল এবং জ্ঞানবুদ্ধি পূর্ণতা লাভ করল। এ সময় সে স্রষ্টা ও পালনকর্তার অভিমুখী হওয়ার তওফিক লাভ করল। ফলে এই বলে দোয়া করতে

লাগল ঃ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ অর্থাৎ হে আমার পালনকর্তা! আমাকে শক্তি দিন, যাতে আমি আপনার নিয়ামতের শোকর আদায় করি, যা আপনি আমাকে ও আমার পিতামাতাকে দান করেছেন এবং যাতে আমি আপনার পছন্দনীয় সৎকর্ম করি, আমার সন্তানদেরকেও সৎকর্মপরায়ণ করুন। আমি আপনারই অভিমুখী হলাম এবং আমি আপনার একজন আজ্ঞাবহ। এখানে সবগুলো ক্রিয়ার অতীত পদবাচ্য ব্যবহৃত হয়েছে। এ থেকে বাহ্যত বোঝা যায় যে, এটা কোন বিশেষ ঘটনা ও বিশেষ ব্যক্তির বর্ণনা, যা আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বে সংঘটিত হয়ে থাকবে। এ কারণেই তফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে যে, এগুলো সব হযরত আবু বকর (রা)-এর অবস্থা। এগুলোই ব্যাপক ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে অন্য মুসলমানগণও এতে উদ্বুদ্ধ হয় এবং এরূপ করে। কুরতুবীতে বর্ণিত হযরত ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতের দলীল। সে রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, রসূলুল্লাহ্ (সা) যখন বিশ বছর বয়সে হযরত খাদীজা(রা)-র অর্থকড়ি দিয়ে ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে সিরিয়া সফরে যান, তখন হযরত আবু বকর (রা) সে সফরে তাঁর সঙ্গী ছিলেন। সে সময় তাঁর বয়স ছিল আঠার বছর। এ বয়সকেই بَلَغَ أَشُدَّهُ বলা হয়েছে। এ সফরে তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র অসাধারণ অবস্থা অবলোকন করে তাঁর একান্ত ভক্ত হয়ে যান। সফর থেকে ফিরে এসে তিনি অধিকাংশ সময় রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাহচর্যে অতিবাহিত করতেন। অতপর রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বয়স চল্লিশ বছর পূর্ণ হলে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে নবুয়ত দান করলেন। তখন আবু বকর (রা)-এর বয়স ছিল আটত্রিশ বছর। পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম তিনিই ইসলাম গ্রহণ করেন। অতপর তাঁর বয়স যখন চল্লিশ বছর হয়ে গেল, তখন তিনি উল্লিখিত দোয়া করলেন। আয়াতে بَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً—বলে তাই বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ—দোয়াও কবুল করেন এবং নয় জন মুসলমান ও কাফিরের হাতে নির্যাতিত গোলাম ক্রয় করে, মুক্ত করার তওফিক দান করেন। এমনিভাবে তাঁর দোয়া وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي--কবুল

হয়। বস্তুত তাঁর সন্তানদের মধ্যে এমন কেউ ছিল না, যে ইসলাম গ্রহণ করে নি। আল্লাহ্ তা'আলা সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে হযরত আবূ বকরকেই এই বৈশিষ্ট্য দান করেন যে, তিনি নিজেও মুসলমান হন এবং পিতা মাতা ও সন্তান-সন্ততি সবাই মুসলমান হয়ে যায়। তারা সবাই রসূলে করীম (সা)-এর পবিত্র সংসর্গও লাভ করেন। তফসীরে রূহুল মা'আনীতেও একথা বর্ণিত রয়েছে। এখন প্রশ্ন হয় যে, তাঁর পিতা আবূ কুহাফা মক্কা বিজয়ের পর মুসলমান হয়েছিলেন, আর এ আয়াত মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। কাজেই তখন পিতামাতার প্রতি নিয়ামত দেওয়ার কথা কেমন করে উল্লেখ করা হল? জওয়াব এই যে, কেউ কেউ আয়াতটিকে মদীনায় অবতীর্ণ বলে উল্লেখ করেছেন। এরূপ হলে কোন প্রশ্ন দেখা দেয় না। আর যদি মক্কায় অবতীর্ণ হয়, তবে অর্থ হবে ইসলামের নিয়ামত দ্বারা গৌরবান্বিত হওয়ার দোয়া। (রূহুল মা'আনী) এই তফসীর দৃষ্টে যদিও সবগুলো অবস্থা হযরত আবূ বকরের বর্ণিত হয়েছে; কিন্তু আয়াতের বিধান সবার জন্যই প্রযোজ্য। আয়াতের উদ্দেশ্য সমস্ত মুসলমানকে নির্দেশ দেওয়া যে, মানুষের বয়স চল্লিশ বছরের নিকটবর্তী হয়ে গেলে তার মধ্যে পরকাল চিন্তা প্রবল হওয়া উচিত। অতীত গোনাহ্ থেকে তওবা করে ভবিষ্যতে সেগুলো থেকে আত্মরক্ষায় পুরাপুরি যত্নবান হওয়া দরকার। কেননা, অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা গেছে, চল্লিশ বছর বয়সে যে অভ্যাস ও চরিত্র গড়ে উঠে, তা পরিবর্তন করা কঠিন হয়ে থাকে।

হযরত উসমান (রা) বর্ণিত রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, মু'মিন বান্দা যখন চল্লিশ বছর বয়সে উপনীত হয়, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তার হিসাব সহজ করে দেন, ষাট বছর বয়সে পৌঁছালে সে আল্লাহ্র দিকে রুজু হওয়ার তওফিক লাভ করে, সত্তর বছর বয়সে পৌঁছালে আকাশের অধিবাসীরা তাকে ভালবাসতে শুরু করে, আশি বছর বয়সে পৌঁছালে আল্লাহ্ তা'আলা তার সৎকর্মসমূহ সুপ্রতিষ্ঠিত করেন এবং মন্দ কর্মগুলোকে মিটিয়ে দেন এবং যখন সে নব্বই বছর বয়সে পৌঁছে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তার সমস্ত অতীত গোনাহ্ মাফ করে দেন, তাকে তার পরিবারের লোকজনের জন্য সুপারিশ করার অধিকার দেন এবং আকাশে তার নামের সাথে اسير الله فى الارض লিখে দেন। অর্থাৎ সে পৃথিবীতে আল্লাহ্র কয়েদী। —(ইবনে কাসীর) বলা বাহুল্য, হাদীসে সে মু'মিন বান্দাকে বোঝানো হয়েছে, যে শরীয়তের বিধি-বিধানের অনুসারী হয়ে আল্লাহ্ভীতি সহকারে জীবন অতিবাহিত করে।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ

—অর্থাৎ উপরোক্ত গুণে গুণান্বিত মু'মিন-মুসলমানের সৎকর্মসমূহ কবুল করে নেওয়া হয় এবং গোনাহ্সমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়। এটাও ব্যাপক বিধান। তবে হযরত আবূ বকরের ক্ষেত্রে এটা সর্বপ্রথম প্রযোজ্য। হযরত আলী (রা)-র নিম্নোক্ত উক্তি থেকেও আয়াতের ব্যাপকতা বোঝা যায়। মুহম্মদ ইবনে হাতেব বর্ণনা করেন, একবার আমি আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী (রা)-র নিকট উপস্থিত ছিলাম। তখন তাঁর কাছে

আরও কিছু লোক উপস্থিত ছিল। তারা হযরত উসমান (রা)-এর চরিত্রে কিছু দোষ আরোপ করলে তিনি বললেনঃ

كان عثمان رضى الله عنه من الذين قال الله تعالى فيهم اولئك الذين نتقبل عنهم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم فى اصحاب الجنة وعد الصدق الذى كانوا يوعدون قال والله عثمان واصحاب عثمان رضى الله عنهم قالها ثلاثا ـ

অর্থাৎ হযরত উসমান (রা) সে লোকদের অন্যতম ছিলেন, যাঁদের কথা আল্লাহ্ তা'আলা أُولَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ আয়াতে ব্যক্ত করেছেন। আল্লাহ্‌র কসম! উসমান ও তাঁর সঙ্গীদের ক্ষেত্রেই এই আয়াত প্রযোজ্য। এ বাক্যটি তিনি তিনবার বললেন।—(ইবনে কাসীর)

وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا—পূর্বের আয়াতসমূহে মাতাপিতার সেবা-যত্ন ও আনুগত্য সম্পর্কিত নির্দেশ ব্যক্ত হয়েছিল। এ আয়াতে সে ব্যক্তির আযাব ও শাস্তি উল্লিখিত হয়েছে, যে পিতামাতার সাথে অসদ্ব্যবহার ও কটূক্তি করে। বিশেষত পিতামাতা যখন তাকে ইসলাম ও সৎকর্মের দিকে দাওয়াত দেয়, তখন তাদের কথা অমান্য করা দ্বিগুণ পাপ। ইবনে কাসীর বলেন, যে কোন লোক পিতামাতার সাথে অসদ্ব্যবহার করবে, তার ক্ষেত্রেই এ আয়াত প্রযোজ্য হবে।

মারওয়ান এক ভাষণে বলেছিল, এ আয়াত হযরত আবু বকর (রা)-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সহীহ্ বুখারীর রেওয়ায়েতে আছে যে, হযরত আয়েশা (রা) মারওয়ানের এই দাবি মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলেন। কোন সহীহ্ রেওয়ায়েতে আয়াতটি কোন বিশেষ ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে বর্ণিত নেই।

أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا—অর্থাৎ কাফিরদেরকে বলা হবে, তোমরা কিছু ভাল কাজ দুনিয়াতে করে থাকলে তার প্রতিদানও তোমাদেরকে পার্থিব আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসের আকারে দেওয়া হয়েছে। এখন পরকালে তোমাদের কোন প্রাপ্য নেই। এ থেকে জানা যায় যে, কাফিরদের যেসব সৎকাজ ঈমানের অনুপস্থিতিতে আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণীয় নয়, পরকালে সেগুলো মূল্যহীন; কিন্তু দুনিয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে সেগুলোর প্রতিদান দিয়ে দেন। কাজেই কাফিররা দুনিয়াতে যেসব বিষয়-বৈভব, ধন-দৌলত, মান-সম্ভ্রম, প্রভাব-প্রতিপত্তি ইত্যাদি লাভ করে, সেগুলো তাদের দানশীলতা, সহানুভূতি, সততা ইত্যাদি সৎকর্মের প্রতিফল

হয়ে থাকে। মু'মিনদের জন্যে এরূপ নয়। তারা দুনিয়াতে ধনসম্পদ, মান-সম্মান, প্রভাব-প্রতিপত্তি ইত্যাদি নিয়ামত লাভ করলেও পরকালের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হবে না।

দুনিয়ার সুখ-সামগ্রী ভোগ-বিলাস থেকে বেঁচে থাকার শিক্ষা ঃ আলোচ্য আয়াতে দুনিয়ার ভোগ-বিলাসে মগ্ন থাকার কারণে কাফিরদের উদ্দেশ্যে শাস্তিবাণী উচ্চারিত হয়েছে। তাই রসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবায়ে-কিরাম ও তাবেয়ীগণ দুনিয়ার ভোগ-বিলাস বর্জন করার অভ্যাস গড়ে তুলেছিলেন। তাঁদের জীবনালেখ্য এর সাক্ষ্য দেয়। রসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত মু'আয (রা)-কে ইয়ামেন প্রেরণ করার সময় এ উপদেশ দেনঃ দুনিয়ার ভোগ-বিলাস থেকে বেঁচে থেকো। হযরত আলী (রা)-র রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র কাছ থেকে অল্প রিযক নিতে সম্মত হয়ে যায়, আল্লাহ্ তা'আলাও তার অল্প আমলে সন্তুষ্ট হয়ে যান।---(মাযহারী)

وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٢١﴾ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ آلِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٢٢﴾ قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ﴿٢٣﴾ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَٰذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُم بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٤﴾ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ﴿٢٥﴾ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُم مِّن شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٢٦﴾

(২১) 'আদ সম্প্রদায়ের ভাইয়ের কথা স্মরণ করুন, তার পূর্বে ও পরে অনেক সতর্ককারী গত হয়েছিল, সে তার সম্প্রদায়কে বালুকাময় উচ্চ উপত্যকায় এ মর্মে সতর্ক করেছিল যে, তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত কারও ইবাদত করো না। আমি তোমাদের জন্যে এক মহাদিবসের শাস্তির আশংকা করি। (২২) তারা বলল, তুমি কি আমাদেরকে আমাদের উপাস্য দেব-দেবী থেকে নিবৃত্ত করতে আগমন করেছ? তুমি সত্যবাদী হলে আমাদেরকে যে বিষয়ের ওয়াদা দাও তা নিয়ে আস। (২৩) সে বলল, এ জ্ঞান তো আল্লাহ্র কাছেই রয়েছে। আমি যে বিষয়সহ প্রেরিত হয়েছি তা তোমাদের কাছে পৌঁছাই। কিন্তু আমি দেখছি তোমরা এক মূর্খ সম্প্রদায়। (২৪) (অতপর) তারা যখন শাস্তিকে মেঘরূপে তাদের উপত্যকা অভিমুখী দেখল তখন বলল, এ তো মেঘ, আমাদেরকে বৃষ্টি দেবে। বরং এটা সেই বস্তু, যা তোমরা তাড়াতাড়ি চেয়েছিলে। এটা বায়ু এতে রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি। (২৫) তার পালনকর্তার আদেশে সে সব কিছুকে ধ্বংস করে দেবে। অতপর তারা ভোর বেলায় এমন হয়ে গেল যে তাদের বসতিগুলো ছাড়া কিছুই দৃষ্টিগোচর হল না। আমি অপরাধী সম্প্রদায়কে এমনিভাবে শাস্তি দিয়ে থাকি। (২৬) আমি তাদেরকে এমন বিষয়ে ক্ষমতা দিয়েছিলাম, যে বিষয়ে তোমাদেরকে ক্ষমতা দেইনি। আমি তাদেরকে দিয়েছিলাম কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয়। কিন্তু তাদের কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয় তাদের কোন কাজে আসল না, যখন তারা আল্লাহ্র আয়াতসমূহকে অস্বীকার করল এবং তাদেরকে সেই শাস্তি গ্রাস করে নিল, যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি 'আদ সম্প্রদায়ের ভাইয়ের [অর্থাৎ হূদ (আ)-এর] কথা স্মরণ করুন, যখন তার সম্প্রদায়কে বালুকাময় উচ্চ উপত্যকায় (দর্শকদের স্মৃতিতে বিষয়টি উপস্থিত করার জন্য স্থান চিহ্নিত করা হয়েছে) এ মর্মে সতর্ক করেছিলেন যে, তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত কারও ইবাদত করো না। (করলে তোমাদের উপর আযাব নাযিল হবে। এটা এমন জরুরী ও খাঁটি কথা যে,) তার (অর্থাৎ হূদের) পূর্বে ও পরে (এই বিষয়বস্তু সম্পর্কে) অনেক সতর্ককারী (পয়গম্বর এ পর্যন্ত) গত হয়ে গেছেন। [আশ্চর্য নয় যে, হূদ (আ) সম্প্রদায়ের কাছে একথাও প্রকাশ করেছিলেন যে, সতর্ককারীরা সবাই তওহীদের দাওয়াতে একমত ছিলেন। দাওয়াতের বিষয়বস্তু জোরদার করার জন্য وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ বাক্যটি মাঝখানে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। হূদ (আ) আরও বলেছিলেন,] আমি তোমাদের জন্য এক মহা (কঠিন) দিবসের শাস্তির আশংকা করি (এ থেকে বাঁচতে হলে তওহীদ কবূল করে নাও)। তারা বলল, তুমি কি আমাদেরকে আমাদের উপাস্য দেবদেবী থেকে নিবৃত্ত করতে আগমন করেছ? অতএব (আমরা তো নিবৃত্ত হব না, তবে) তুমি সত্যবাদী হলে আমাদেরকে যে শাস্তির ওয়াদা দিচ্ছ, তা বাস্তবায়িত

কর। তিনি বললেন, এ জ্ঞান তো আল্লাহ্‌র কাছেই রয়েছে (যে, আযাব কবে আসবে।). আমি যে বিষয়সহ প্রেরিত হয়েছি, তা তোমাদের কাছে পৌঁছাই। (তন্মধ্যে আমাকে বলা হয়েছে যে, তোমাদের উপর আযাব আসবে। আমি তা বলে দিয়েছি, এর বেশি আমার জানাও নেই, ক্ষমতাও নেই।) কিন্তু আমি দেখছি তোমরা এক মূর্খ সম্প্রদায়। (একে তো তওহীদ স্বীকার কর না, তদুপরি বিপদ ত্বরান্বিত করতে চাও এবং আমাকেও তা এনে দিতে আদেশ কর। মোটকথা তারা যখন কিছুতেই সত্যকে কবুল করল না, তখন আযাবের প্রস্তুতি এভাবে শুরু হল যে, প্রথমে একটি মেঘখণ্ড উঠল,) যখন তারা মেঘখণ্ডকে তাদের উপত্যকা অভিমুখী দেখল। তখন বলল, এ তো মেঘ, আমাদেরকে বৃষ্টি দেবে। (আল্লাহ্ বলেন,) না, (এটি বৃষ্টি বর্ষণকারী মেঘ নয়) বরং এটি সে শাস্তি, (যে শাস্তি শীঘ্র নিয়ে আস বলে) যা তোমরা তাড়াতাড়ি চেয়েছিলে। এতে (এই মেঘখণ্ডে) রয়েছে এক বায়ু, যাতে রয়েছে মর্মন্তুদ আযাব। সে সবকিছুকে ধ্বংস করে দেবে তার পালনকর্তার আদেশে। অতপর (সে বায়ু মানুষ ও জন্তু-জানোয়ারকে শূন্যে তুলে মাটিতে নিক্ষেপ করল। ফলে) তারা এমন হয়ে গেল যে, তাদের বসতিগুলো ছাড়া কিছুই (অর্থাৎ মানুষ ও জন্তু-জানোয়ার) দৃষ্টিগোচর হল না। আমি অপরাধীদেরকে এমনিভাবে সাজা দিয়ে থাকি। আমি তাদেরকে (অর্থাৎ 'আদ সম্প্রদায়কে) এমন বিষয়ে ক্ষমতা দিয়েছিলাম, যে বিষয়ে তোমাদেরকে ক্ষমতা দেইনি। (অর্থাৎ দৈহিক ও আর্থিক শক্তির উপর নির্ভরশীল কাজকর্ম।) আমি তাদেরকে দিয়েছিলাম কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয়, কিন্তু তারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ অস্বীকার করত, এ কারণে তাদের কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয় তাদের কোন কাজে আসল না এবং তাদেরকে সে শাস্তি গ্রাস করে নিল, যা নিয়ে তারা ঠাট্টাবিদ্রূপ করত (অর্থাৎ তাদের ইন্দ্রিয় তাদেরকে শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারল না, হৃদয়ের অনুভূতিপ্রসূত কৌশল ও দৈহিক শক্তিও তাদেরকে বাঁচাতে পারল না। সুতরাং তোমাদের কি শক্তি আছে)!

وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِّنَ الْقُرٰى وَصَرَّفْنَا الْاٰيٰتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ۝٢٧ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ قُرْبَانًا اٰلِهَةً ؕ بَلْ ضَلُّوْا عَنْهُمْ ۚ وَذٰلِكَ اِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ۝٢٨

(২৭) আমি তোমাদের আশেপাশের জনপদসমূহ ধ্বংস করে দিয়েছি এবং বারবার আয়াতসমূহ শুনিয়েছি, যাতে তারা ফিরে আসে। (২৮) অতপর আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তারা যাদেরকে সান্নিধ্য লাভের জন্যে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিল, তারা তাদেরকে সাহায্য করল না কেন? বরং তারা তাদের কাছ থেকে উধাও হয়ে গেল। এটা ছিল তাদের মিথ্যা ও মনগড়া বিষয়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আয়াতসমূহের যোগসূত্র ঃ (উপরে 'আদ সম্প্রদায়ের কাহিনী বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছিল। এখন তাদেরই মত অন্যান্য সম্প্রদায়ের উল্লেখ করা হয়েছে, যাদেরকে কুফর ও পয়গম্বরগণের বিরোধিতার কারণে বিভিন্ন আযাবের মাধ্যমে ধ্বংস করা হয়েছিল। তাদের জনপদের ধ্বংসাবশেষ মক্কাবাসীদের সফরের পথে অবস্থিত ছিল। এসব ধ্বংসাবশেষ থেকে শিক্ষা গ্রহণের জন্যে সংক্ষেপে তাদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে)।

আমি তোমাদের আশেপাশের আরও জনপদ (কুফর ও শিরকের কারণে) ধ্বংস করে দিয়েছি (যেমন, সামূদ ও লূতের সম্প্রদায়। মক্কাবাসীরা সিরিয়া সফরে এসব জনপদ অতিক্রম করত। মক্কার এক দিকে ইয়ামেন ও অপরদিকে সিরিয়া অবস্থিত ছিল। তাই مَا حَوْلَكُمْ বলা হয়েছে।) এবং আমি (ধ্বংস করার পূর্বে তাদের উপদেশের জন্য) বারবার নিদর্শনসমূহ দেখিয়েছি, যাতে তারা (কুফর ও শিরক থেকে) বিরত হয়। (কিন্তু তারা বিরত হল না এবং ধ্বংস হয়ে গেল।) অতপর আল্লাহ্র পরিবর্তে তারা যাদেরকে নৈকট্য লাভের জন্য উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিল (ধ্বংস ও আযাবের সময়) তারা তাদেরকে সাহায্য করল না কেন ? বরং তারা তাদের কাছ থেকে উধাও হয়ে গেল। এটা (অর্থাৎ তাদেরকে উপাস্য ও সুপারিশ-কারী মনে করা) ছিল তাদের মিথ্যা ও মনগড়া বিষয় (বাস্তবে তারা উপাস্য ছিল না)।

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ ۚ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا ۖ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ ﴿٢٩﴾ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٣٠﴾ يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣١﴾ وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ ۚ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٣٢﴾

(২৯) যখন আমি একদল জিনকে আপনার প্রতি আকৃষ্ট করেছিলাম, তারা কোরআন পাঠ শুনছিল। তারা যখন কোরআন পাঠের জায়গায় উপস্থিত হল, তখন পরস্পর বলল, চুপ থাক। অতপর যখন পাঠ সমাপ্ত হল, তখন তারা তাদের সম্প্রদায়ের কাছে সতর্ককারীরূপে ফিরে গেল। (৩০) তারা বলল, হে আমাদের সম্প্রদায়, আমরা এমন এক কিতাব শুনেছি, যা মূসার পর অবতীর্ণ হয়েছে। এ কিতাব পূর্ববর্তী সব কিতাবের সত্যায়ন করে, সত্য ধর্ম ও সরল পথের দিকে পরিচালিত করে। (৩১) হে আমাদের সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহ্র দিকে আহবানকারীর কথা মান্য কর এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। তিনি তোমাদের গোনাহ্ মার্জনা করবেন। (৩২) আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র দিকে আহবানকারীর কথা মানবে না, সে পৃথিবীতে আল্লাহ্কে অপারগ করতে পারবে না এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তার কোন সাহায্যকারী থাকবে না। এ ধরনের লোকই প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(তাদের কাছে সে সময়কার কাহিনী আলোচনা করুন,) যখন আমি একদল জিনকে আপনার প্রতি আকৃষ্ট করেছিলাম। তারা (শেষ পর্যন্ত এখানে পৌঁছে) কোরআন পাঠ শুনছিল। যখন তারা কোরআনের কাছে (অর্থাৎ কোরআন পাঠের জায়গায়) উপস্থিত হল, তখন (পরস্পর) বলল, চুপ থাক (এবং এই কালাম শোন।) অতপর যখন কোরআন পাঠ সমাপ্ত হল (অর্থাৎ নামাযে পয়গম্বরের যতটুকু পড়ার ছিল, পড়া হয়ে গেল,) তখন তারা (তাতে বিশ্বাস স্থাপন করল এবং) তাদের সম্প্রদায়ের কাছে (এই সংবাদ পৌঁছানোর জন্য) ফিরে গেল। তারা (ফিরে গিয়ে) বলল, ভাইসব, আমরা এক (আশ্চর্য) কিতাব শুনেছি, যা মূসা (আ)-র পরে অবতীর্ণ হয়েছে। এ কিতাব পূর্ববর্তী সব কিতাবের সত্যায়ন করে এবং সত্য (ধর্ম) ও সরল পথের দিকে পরিচালিত করে। (অতপর সত্য ধর্ম ইসলাম কবূল করার জন্য প্রথমে প্রেরণা যুগিয়ে ও পরে ভয় দেখিয়ে আদেশ করা হয়েছে।) ভাইসব, তোমরা আল্লাহ্র দিকে আহবানকারীর কথা মান্য কর (অর্থাৎ কোরআনের অথবা পয়গম্বরের আদেশ পালন কর। কথা মান্য করা অর্থ,) তাতে বিশ্বাস স্থাপন কর (এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সে ঈমানের দিকে আহবান করে—কোন জাগতিক স্বার্থের দিকে নয়। তোমরা এরূপ করলে) আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের গোনাহ মাফ করবেন এবং তোমাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তি থেকে রক্ষা করবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র দিকে আহবানকারীর কথা মানবে না, সে পৃথিবীতে (অর্থাৎ পৃথিবীর কোন অংশে পলায়ন করে আল্লাহ্কে) অপারগ করতে পারবে না, (অর্থাৎ আল্লাহ্ তাকে পাকড়াও করতে পারবেন না তা নয়।) এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তার কোন সাহায্যকারী থাকবে না (যে তাকে বাঁচাতে পারে।) এ ধরনের লোকই প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত (সে প্রমাণাদি সত্ত্বেও সত্যের দিকে আহবানকারীর ডাকে সাড়া দেয় না)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

মক্কার কাফিরদেরকে শোনানোর জন্য পূর্বেকার আয়াতসমূহে কুফর ও অহং-কারের নিন্দা ও ধ্বংসকারিতা বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে তাদেরকে লজ্জা দেওয়ার উদ্দেশ্যে জিনদের ইসলাম গ্রহণের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, জিনরা অহংকার ও গর্বে তোমাদের চেয়েও বেশি, কিন্তু কোরআন শুনে তাদের অন্তরও বিগলিত হয়ে গেছে এবং ইসলাম গ্রহণ করেছে। তোমাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা জিনদের চেয়ে বেশি জ্ঞান-বুদ্ধি ও চেতনা দান করেছেন; কিন্তু তোমরা ইসলাম গ্রহণ করছ না! জিনদের কোরআন শ্রবণ ও ইসলাম গ্রহণের ঘটনা সহীহ্ হাদীসসমূহে এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ

রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নবুয়ত লাভের পর থেকে জিন জাতিকে আকাশের সংবাদ সংগ্রহ থেকে নিবৃত্ত রাখা হয়। সেমতে তাদের কেউ সংবাদ শোনার মানসে উপরে গেলে তাকে উল্কাপিণ্ড নিক্ষেপ করে বিতাড়িত করা হত। জিনরা এই নতুন পরিস্থিতির কারণ উদঘাটনে সচেষ্ট হল এবং তাদের বিভিন্ন দল কারণ অনুসন্ধানে পৃথিবীর বিভিন্ন ভূখণ্ডে ছড়িয়ে পড়ল। একদল হিজাযেও পেঁৗছাল। সেদিন রসূলুল্লাহ্ (সা) কয়েকজন সাহাবীসহ 'বাতনে নাখলা' নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। তাঁর "ওকায" বাজারে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল। আরবরা আমাদের যুগের প্রদর্শনীর মত বিভিন্ন জায়-গায় বিশেষ বিশেষ দিনে মেলার আয়োজন করত। এসব মেলায় বহু লোক উপস্থিত থাকত, দোকান খোলা হত এবং সভা-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হত। ওকায নামক স্থানে প্রতি বছর এমনি ধরনের এক মেলা বসত। রসূলুল্লাহ্ (সা) সম্ভবত ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে সেখানে গমন করছিলেন। নাখলা নামক স্থানে তিনি যখন ফযরের নামাযে কোরআন পাঠ করছিলেন, তখন জিনদের অনুসন্ধানী দলটি সেখানে গিয়ে পেঁৗছাল। তারা কোরআন পাঠ শুনে বলতে লাগল, এই সে নতুন ঘটনা, যার কারণে আমাদেরকে আকাশের সংবাদ সংগ্রহে নিবৃত্ত করা হয়েছে। ---(বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী)

অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে যে, জিনরা সেখানে পেঁৗছে পরস্পর বলতে লাগল, চুপ করে কোরআন শোন। রসূলুল্লাহ্ (সা) নামায শেষ করলে জিনরা ইসলামের সত্যতায় বিশ্বাস স্থাপন করে তাদের সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গেল এবং তদন্ত কার্যের রিপোর্ট পেশ করে একথাও বলল, আমরা মুসলমান হয়ে গেছি। তোমাদেরও ইসলাম গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা) সূরা জিন অবতীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত এই জিনদের গমনাগমন এবং তাদের কোরআন পাঠ শুনে ইসলাম গ্রহণের বিষয় কিছুই জানতেন না। সূরা জিনে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে এ বিষয়ে অবহিত করেন। ---(ইবনুল-মুনযির)

আরও এক রেওয়ায়েতে আছে, নসীবাঈন নামক স্থানের অধিবাসী এই জিনদের সংখ্যা ছিল নয় অথবা সাত। তাদের প্রচারের ফলে পরবর্তীকালে আরও তিন শত

জিন ইসলাম গ্রহণের জন্য রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে উপস্থিত হয়।---(রূহুল মা'আনী)

অন্যান্য হাদীসে জিনদের আগমনের ঘটনা অন্যভাবেও ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে একাধিক ঘটনা বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত হওয়ার কারণে এসব বর্ণনায় কোন বৈপরীত্য নেই। হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে যে, জিনরা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে বারবার আগমন করেছে।

খাফফাযী বলেন, সবগুলো হাদীস একত্র করলে দেখা যায় যে, জিনদের আগমনের ঘটনা ছয় বার সংঘটিত হয়েছে।---(বয়ানুল-কোরআন)

জিনদের আগমনের ঘটনাই উপরোক্ত আয়াতসমূহে বিধৃত হয়েছে।

كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى---"মূসার পরে" বলার কারণে কোন কোন তফসীরবিদ বলেন যে, আগন্তুক জিনরা ইহুদী ধর্মাবলম্বী ছিল। কেননা মূসা (আ)-র পর ঈসা (আ)-র প্রতি যে ইঞ্জিল অবতীর্ণ হয়েছিল, তাদের উক্তিতে তার উল্লেখ নেই, কিন্তু ইঞ্জীলের উল্লেখ না করাই তাদের ইহুদী হওয়ার যথেষ্ট প্রমাণ নয়। কেননা ইঞ্জিলের উল্লেখ না করার এক কারণ এও হতে পারে যে, ইঞ্জীল অধিকাংশ বিধি-বিধানে তওরাতেরই অনুসারী। কিন্তু কোরআন তওরাতের মত একটি স্বতন্ত্র কিতাব। এর বিধি-বিধান ও শরীয়ত তওরাত থেকে অনেক ভিন্নতর। তাই একথা ব্যক্ত করা উদ্দেশ্য হতে পারে যে, কোরআনই তওরাতের অনুরূপ স্বতন্ত্র কিতাব।

يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ---مِنْ অব্যয়টি আসলে "কোন কোন"-এর অর্থ নির্দেশ করে। এখানে এই অর্থ নেওয়া হলে বাক্যের ফায়দা এই হবে যে, ইসলাম গ্রহণ করলে কোন কোন গোনাহ্ মাফ হবে, অর্থাৎ আল্লাহ্র হক মাফ হবে---বান্দার হক মাফ হবে না। কেউ কেউ مِنْ অব্যয়টিকে অতিরিক্ত সাব্যস্ত করেছেন। এমতাবস্থায় এ ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ
بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ ۚ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ ۝ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ ۚ أَلَيْسَ هَٰذَا
بِالْحَقِّ ۚ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا ۚ قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ
تَكْفُرُونَ ۝ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا

تَسْتَعْجِلْ لَّهُمْ ؕ كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوْعَدُوْنَ ۙ لَمْ يَلْبَثُوْۤا اِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ ؕ بَلٰغٌ ۚ فَهَلْ يُهْلَكُ اِلَّا الْقَوْمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝

(৩৩) তারা কি জানে না যে, আল্লাহ্ যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন এবং এগুলোর সৃষ্টিতে কোন ক্লান্তি বোধ করেন নি, তিনি মৃতকে জীবিত করতে সক্ষম? কেন নয়, নিশ্চয় তিনি সব বিষয়ে সর্বশক্তিমান। (৩৪) যে দিন কাফিরদেরকে জাহান্নামের সামনে পেশ করা হবে, সেদিন বলা হবে, এটা কি সত্য নয়? তারা বলবে, হ্যাঁ আমাদের পালনকর্তার শপথ। আল্লাহ্ বলবেন, আযাব আস্বাদন কর। কারণ, তোমরা কুফরী করতে। (৩৫) অতএব আপনি সবর করুন, যেমন উচ্চ সাহসী পয়গম্বরগণ সবর করেছেন এবং ওদের বিষয়ে তড়িঘড়ি করবেন না। ওদেরকে যে বিষয়ে ওয়াদা দেওয়া হত, তা যেদিন তারা প্রত্যক্ষ করবে, সেদিন তাদের মনে হবে যেন তারা দিনের এক মুহূর্তের বেশি পৃথিবীতে অবস্থান করেনি। এটা সুস্পষ্ট অবগতি। এখন তারাই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে, যারা পাপাচারী সম্প্রদায়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তারা কি জানে না যে, আল্লাহ্ যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন এবং এগুলোর সৃষ্টিতে কোন ক্লান্তি বোধ করেন নি, তিনি (কিয়ামতে) মৃতদেরকে জীবিত করতে (আরও উত্তমরূপে) সক্ষম? নিশ্চয় তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। (এতে কিয়ামতের সম্ভাব্যতা প্রমাণিত হল।) আর যেদিন (কিয়ামত সংঘটিত হবে এবং) কাফিরদেরকে জাহান্নামের সামনে পেশ করা হবে (এবং জিজ্ঞাসা করা হবে---)

এটা (অর্থাৎ জাহান্নাম) কি সত্য নয়? (তোমরা দুনিয়াতে এর বাস্তবতা অস্বীকার করতে এবং وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ বলতে।) সেদিন তারা বলবে, আমাদের পালনকর্তার কসম, নিশ্চয় এটা সত্য। আল্লাহ্ বলবেন, (জাহান্নামের) আযাব আস্বাদন কর। কারণ তোমরা (জাহান্নাম অস্বীকার করতে এবং) কুফরী করতে। [অতপর রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, কাফিরদেরকে শাস্তি দেওয়ার কথা যখন জানা গেল,] অতএব আপনি সবর করুন যেমন, অসীম সাহসী পয়গম্বরগণ সবর করেছেন এবং ওদের বিষয়ে (আল্লাহ্‌র শাস্তিদানে) তড়িঘড়ি করবেন না। (মুসলমানদের মনোরঞ্জনের খাতিরে রসূলুল্লাহ্ (সা) কাফিরদের দ্রুত আযাব কামনা করতেন। অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আযাবের পাত্র কাফিররা স্বয়ং আযাব ত্বরান্বিত করতে চাইত। বাদী যদি বিবাদীর দ্রুত শাস্তি কামনা করে, তবে তা বোধগম্য ব্যাপার কিন্তু বিবাদী নিজেই নিজের শাস্তি দ্রুত চাইলে তা অবাক কাণ্ড বৈ কি! আল্লাহ্‌র

রহস্যের কারণে তাদের তাৎক্ষণিক শাস্তি হবে না ঠিক, কিন্তু কিয়ামতে আযাব প্রত্যক্ষ
করার সময় তাৎক্ষণিক আযাবের মতই মনে হবে। কেননা,) ওদেরকে যে শাস্তির
ওয়াদা দেওয়া হয়, ওরা যেদিন সে শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে, সেদিন (শাস্তির তীব্রতার
কারণে) তাদের মনে হবে যেন তারা দিনের এক মুহূর্তের বেশি (দুনিয়াতে) অবস্থান
করেনি। অর্থাৎ দুনিয়ার দীর্ঘ সময়কাল খুব সংক্ষিপ্ত মনে হবে এবং তাৎক্ষণিক
আযাব এসে গেছে বলেই মনে হবে। অতপর কাফিরদেরকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে,
কাফিরদেরকে জব্দ করার উদ্দেশ্যে) এটা সুস্পষ্ট অবগতি যা [রসূলুল্লাহ্ (সা)-র
মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে গেছে।] সুতরাং (এরপর) তারাই বরবাদ হবে, যারা পাপাচারী
সম্প্রদায়। (কেননা, অবগতির পর কোন ওযর আপত্তি শোনা হবে না। এতে রসূলের
কোন ক্ষতি নেই। এভাবে এ বাক্যেও রসূলের জন্য অতিরিক্ত সান্ত্বনা রয়েছে)।

যাদের সহযোগিতায় গ্রন্থখানি সংগৃহীত হয়েছে তাদের আখেরাতের কল্যাণের জন্য দয়া করে একটু দোয়া করবেন।